অর্থনৈতিক ভূগোল

(কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী
কোর্সের পাঠ্যক্রম অনুসারে লিখিত ।)

সুধাংশু শেখর ভট্টাচার্য, এম্. কম্., সি. এ. আই. আই. বি.
সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপক ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ;
বাণিজ্যিক ও শিল্প-আইন, আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল, উচ্চতর
মাধ্যমিক অর্থনৈতিক ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ।

ও

কুমারেশ বসু, এম্. কম্.
সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক এবং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ।

IPP

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

[redacted]াশক :
[redacted] ভট্টাচার্য, বি. এ., বি. টি.
সম্পাদক : ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
[illegible]০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ…জুলাই, ১৯৫২
দ্বিতীয় সংস্করণ…ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩
তৃতীয় (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত) সংস্করণ… জুলাই, ১৯৫৫

মুদ্রাকর :
[redacted]
মুদ্রণী
৭১ কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণও অধ্যাপকগণ ও ছাত্রগণ কর্তৃক সমাদৃত হওয়ায় তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ পাইয়া পুস্তকখানির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিয়াছি। এই সংস্করণে অধিকাংশ স্থানে ১৯৬৪ সালের উৎপাদন-পরিসংখ্যান দেওয়া হইয়াছে এবং ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র সংযোজিত হইয়াছে।

এই পুস্তকখানির উৎকর্ষ সাধনে বহু অধ্যাপকের সহায়তা লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের নিকট আমরা ঋণী।

বিনীত

সুধাংশু শেখর ভট্টাচার্য

কুমারেশ বসু

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বঙ্গভাষার মাধ্যমে বর্তমানে কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ দেওয়ার জন্য কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমে কঠিন বিষয়বস্তুও হৃদয়ঙ্গম করা অনেক সহজ। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্সের জন্য নূতন পাঠ্যক্রম (Syllabus) প্রস্তুত করিয়াছেন। অর্থনৈতিক ভূগোলের নূতন পাঠ্যক্রমে সম্পদ (Resources) সম্বন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র সম্বন্ধে ছাত্রগণের মৌলিক জ্ঞানলাভ হইবে সন্দেহ নাই; অন্য বিষয়েও পাঠ্যক্রমে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। এইজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসরের নূতন পাঠ্যক্রম অনুসারে লিখিত হইয়াছে। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি যাহাতে পাঠ্যক্রম বজায় রাখিয়া সহজবোধ্য ভাষায় বিষয়টিকে বুঝানো যায়। এই আশা লইয়া আমরা পুস্তকখানি লিখিয়াছি যে, ইহা দ্বারা ছাত্রগণ

অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু মৌলিক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে এবং এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু ছাত্রগণের নিকট রসহীন মনে হইবে না। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলাইয়া এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই ছাত্রগণ ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। সুতরাং আধুনিক তথ্যাদি না জানিলে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে। সেইজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালের পরিসংখ্যান দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি। কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ডিগ্রী কোর্সের প্রশ্নপত্র বিভিন্ন অধ্যায়ে সংযোজিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার উৎপাদন-লক্ষ্য ও কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমান জগতের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্যগ্‌ভাবে অনুধাবন করিতে হইলে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ, ইহাদের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক জীবনে ইহাদের পরিবর্তনশীল ভূমিকা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। আশা করি, এই পুস্তকখানি কৌতূহলী পাঠককে জটিল আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিতে সাহায্য করিবে।

প্রথমাবস্থায় পুস্তকখানিতে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ে অধ্যাপকগণের মন্তব্য সাদরে গৃহীত হইবে। ইহাতে ভবিষ্যতে পুস্তকের সংশোধনে অনেক সাহায্য হইবে।

এই পুস্তকখানি লিখিবার সময় সুরেন্দ্রনাথ কলেজের (সান্ধ্য) বাণিজ্য-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সুধাংশু কুমার রায় ও উপাধ্যক্ষ মণীন্দ্র দাশগুপ্ত, জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যাপক বিলাস বিশ্বাস, নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক সুনীল দত্ত এবং আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীসুব্রত বাগচীর নিকট হইতে অনেক উপদেশ ও সাহায্য পাইয়াছি। ইঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। কলিকাতার বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য সূক্ষ্মভাবে মানচিত্র অঙ্কন করিয়া আমাদের প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন।

পুস্তকখানি অধ্যাপক ও ছাত্রগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইলে পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

পৃষ্ঠা

১। অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনাক্ষেত্র ও কার্যাবলী ১—১১

অর্থনৈতিক ভূগোলের গতিশীল চরিত্র, অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ।

২। সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ১২-২৮

সম্পদ সম্পর্কে অর্থনৈতিক চিন্তাধারা, ঐতিহাসিক পটভূমি, গতিশীল ধারণা, সংজ্ঞা, সম্পদের কার্যকারিতা, তত্ত্ব, প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা, সম্পদ ও চাহিদা, প্রকৃতি ও সংস্কৃতি, আধুনিক চিন্তাধারা, সম্পদ-সংরক্ষণ।

৩। প্রাকৃতিক সম্পদ ২৮—৪৭

প্রকৃতির আপাতবিরোধী স্বভাব, প্রকৃতি—অনুকূল ও প্রতিকূল, কৃপণ ও মুক্তহস্ত, অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনশীল, প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ—প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন, সঞ্চিত সম্পদ ও প্রবহমান সম্পদ, শক্তি—পদার্থশক্তি, জৈবশক্তি ও জড়শক্তির ব্যবহার, মনুষ্যশক্তি, জড়শক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ, ভূমির পরিবর্তনশীল ভূমিকা,—দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ভূমি, ভূমির সীমাবদ্ধতা ও প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবর্তনশীলতা, ভূমির কৃষিযোগ্যতা—কৃষিযোগ্যতার সীমা, ভূমির কৃষিযোগ্যতার সাংস্কৃতিক ও মানবিক সীমাবদ্ধতা, বিনিময় অর্থনীতিতে ভূমির কৃষিযোগ্যতা।

৪। মনুষ্য-সম্পদ ৪৮—৬৬

মানুষ ও জমির অনুপাত এবং লোকবসতি-ঘনত্ব, লোকবসতির ধরন ও ইহার বৈশিষ্ট্য, লোকবসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণ, আয়তনযুক্ত, বসতিযুক্ত ও শিল্পোন্নত পৃথিবী, আধুনিক লোক-বসতির গতি-প্রকৃতি, আদর্শ-লোকবসতি ও বসতি-ঘনত্ব

পৃষ্ঠা

৫। সাংস্কৃতিক সম্পদ ৬৪—৮৭

সংস্কৃতি—মানুষ ও প্রকৃতির যুগ্ম সৃষ্টি, সংস্কৃতি ও যান্ত্রিক যুগ, সংস্কৃতি ও কৃষিকার্য, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামঞ্জস্য-বিধান, সংস্কৃতি স্থানান্তরের একটি উদাহরণ।

৬। মৎস্য-চাষ ৮৮—১০৪

সমুদ্রের অর্থনৈতিক তাৎপর্য, মৎস্য-চাষের শ্রেণীবিভাগ, বাণিজ্যিক মৎস্য-শিকারের পদ্ধতি, বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতির কারণ, পৃথিবীর মৎস্যক্ষেত্রসমূহ, মৎস্য-চাষের ভবিষ্যৎ।

৭। অরণ্য ও অরণ্য-সম্পদ ১০৫—১২০

প্রত্যক্ষ ব্যবহার, পরোক্ষ ব্যবহার, পৃথিবীর অরণ্যবলয়সমূহ, কাষ্ঠশিল্প, অরণ্য-সংরক্ষণ।

৮। পশুপালন ১২১—১৪২

পৃথিবীর বাণিজ্যিক পশুচারণক্ষেত্রসমূহ, গবাদি পশু, মেষ পশম, শূকর, দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প।

৯। খনিজ সম্পদ ১৪৩—১৮০

প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবহারে নিযুক্ত খনিজ পদার্থসমূহ, লবণ, গন্ধক, বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন খনিজ সার, লৌহ আকরিক, লৌহ-সঙ্কর ধাতুসমূহ, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, নিকেল, মলিবডেনাম, টাংস্টেন, ভ্যানাডিয়াম, লৌহেতর ধাতুসমূহ, তাম্র, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, সীসা, রাং ও অভ্র।

১০। শক্তিসম্পদ ১৮১—২৩২

শক্তি-ব্যবহারের অর্থনৈতিক তাৎপর্য, কয়লা, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস, জলশক্তি, পারমাণবিক শক্তি।

১১। মৃত্তিকা ২৩৩—২৩৬

মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ

১২ কৃষিকার্য ২৩৭—৩১৬

কৃষিকার্যের শ্রেণীবিভাগ, কৃষিকার্যের প্রকৃতি, শিল্পোন্নত জগতে কৃষির আস্থা, গম, ধান, ইক্ষু, বীট, চা, কফি, কোকো, রবার, তৈলবীজ, তুলা, পাট, অতসী, শণ, রেশম, তামাক।

পত্রাঙ্ক

১৩। শ্রমশিল্প ৩১৭—৩৮৬
যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার ও ইহার তাৎপর্য, শিল্পায়নের ফল, পৃথিবীর শ্রমশিল্পের অবস্থানের কারণ, শিল্পাঞ্চল, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, পূর্তশিল্প (কৃষি-যন্ত্রপাতি, শিল্প-যন্ত্রপাতি, রেল-ইঞ্জিন, জাহাজ, মোটর-গাড়ি, বিমানপোত), গুরু রাসায়নিক শিল্প, লিনেন শিল্প, কার্পাসবয়ন শিল্প, পশমবয়ন শিল্প, রেশম-বয়ন শিল্প, কৃত্রিম রেশমবয়ন শিল্প।

১৪। পরিবহণ-ব্যবস্থা ৩৮৭—৪১৫
পরিবহণের ক্রমবিকাশ, পৃথিবীর পরিবহণ-ব্যবস্থার ধরন, পরিবহণ-ব্যবস্থার সমন্বয়-সাধন ও সংহতি-স্থাপন, উৎপাদন-অঞ্চলের বণ্টনের উপর পরিবহণ-ব্যয়ের প্রভাব, পরিবহণ-ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক বিশেষীকরণ, বাণিজ্যকেন্দ্র, পৃথিবীর প্রসিদ্ধ বন্দর, শহর ও নগর।

১৫। বাণিজ্য ৪১৬—৪২৪
অর্থনৈতিক উন্নতির পরিমাপক বহির্বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মৌলিক কারণসমূহ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ।

দ্বিতীয় খণ্ড

১। ইউরোপ —১১৬
রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স*, জার্মানী*।

২। উত্তর আমেরিকা ১১৭—১৭০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা*।

৩। দক্ষিণ আমেরিকা* ১৭১—১৯০
ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা।

৪। অস্ট্রেলিয়া ১৯১—২০৮

পৃষ্ঠা

৫। আফ্রিকা* ২০৯—২২৬

মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা।

৬। এশিয়া ২২৭—২৯৭

জাপান, চীন*, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান।

৭। ভারত ২৯৮—৫৩৫

প্রাকৃতিক অঞ্চল, জলবায়ু, মৃত্তিকা, বনভূমি, জলসেচ, জলবিদ্যুৎ, বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা। ২৯৮—৩৫৪

কৃষিকার্য—ধান, গম, ইক্ষু, পাট, তূলা, চা, কফি, রবার, তৈলবীজ, তামাক। ৩৫৪—৩৯৫

খনিজ সম্পদ—কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ আকরিক, তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যালুমিনিয়াম, স্বর্ণ, অভ্র, চুনাপাথর। ৩৯৫—৪২৫

শ্রমশিল্প—লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কার্পাসবয়ন শিল্প, পাট-শিল্প, কাগজ-শিল্প, সিমেন্ট-শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, পূর্ত-শিল্প (মোটর-গাড়ি, রেল-ইঞ্জিন, জাহাজ ও বিমান-পোত-নির্মাণ শিল্প), অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প, কুটির-শিল্প। ৪২৬—৪৮৩

পরিবহণ ব্যবস্থা—রাজপথ, রেলপথ, আভ্যন্তরীণ জলপথ, সমুদ্রপথ, বিমানপথ, বন্দর ও পোতাশ্রয়, প্রধান ও অপ্রধান বন্দর। ৪৮৪—৫০৯

লোকবসতি ৫০৯—৫১৪

আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ৫১৫—৫৩৫

৮। অর্থনৈতিক অঞ্চল ৫৩৬—৫৪৪

ইউরোপীয় সাধারণ বাজার, ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল, কমিশন, কলম্বো পরিকল্পনা, কমনওয়েলথ, ইকাফে, আফ্রিকার সাধারণ বাজার।

পরিশিষ্ট

(ক) সিলেবাস্ ৫৪৬—৫৪৯

(খ) কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬২ সালের প্রশ্নপত্র ৫৫০—৫৫৯

*সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রথম খণ্ড

অর্থনৈতিক ভূগোলের সাধারণ সূত্রাবলী

অর্থনৈতিক ভূগোল

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনাক্ষেত্র ও কার্যাবলী
(The Field and Function of Economic Geography)

গতিশীল জগতে সকল বিজ্ঞানেরই পরিবর্তন হইতেছে। ভূগোলশাস্ত্র সম্বন্ধেও মানুষের ধারণা ক্রমশঃই পরিবর্তিত হইতেছে। পূর্বে ভূগোলশাস্ত্র বলিতে মানুষ বুঝিত পর্বত, মালভূমি, মহাসাগর, সাগর, নদী, অন্তরীপ বন্দর; শহর প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা। কিন্তু বর্তমানে ভূগোলশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় 'মানুষ'। কিভাবে প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে মানুষ তাহার জীবনকে খাপ খাওয়াইয়া লইতেছে, কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের উন্নতিতে সাহায্য করিতেছে বা ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতেছে, কিরূপে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের আহার, পরিচ্ছদ, বাসস্থান, ধর্ম, দর্শন, সমাজ-সংগঠন ও রাজনীতি উহার দ্বারা প্রভাবিত হইতেছে, কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষ নিজের কল্যাণে ব্যবহার করিতেছে, ইহাই বর্তমান যুগের ভৌগোলিকগণের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এইভাবে দেখা যায় ভূগোলশাস্ত্রের আলোচনাক্ষেত্র যুগে যুগে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। সেইজন্য এই শাস্ত্রকে **গতিশীল বিজ্ঞান (Dynamic Science)** বলা হয়।

অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা (Definition of Economic Geography)—পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করিবার জন্য ভূগোলশাস্ত্র বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

এইভাবে প্রাকৃতিক ভূগোল (Physical Geography), রাজনৈতিক ভূগোল (Political Geography) প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। অনুরূপভাবে ভূগোলশাস্ত্রের যে শাখায় মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সহিত তাহার পরিবেশের সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করা হয় তাহা অর্থনৈতিক ভূগোল

(Economic Geography) নামে পরিচিত। মানুষের জীবনধারণের জন্য খনিজ পদার্থ উত্তোলিত হয়, মৎস্য শিকার করা হয়, অরণ্যসম্পদ সংগৃহীত হয়, কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, শিল্প-কলকারখানা গড়িয়া উঠে ও পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান হয়। মানুষের এই সকল অর্থনৈতিক কাজকর্ম তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর কতটা নির্ভরশীল, ইহাই অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয়। যুগে যুগে মানুষের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ (উৎপাদন, পরিবহণ-ব্যবস্থা, বাণিজ্য, বসতিস্থাপন প্রভৃতি) কিভাবে পরিবেশ (Environment) দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কিভাবে প্রভাবিত হইতে পারে, তাহাও অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রকে আলোচনা করিতে হইবে। আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রের জনক চিশল্‌ম্ (Chisholm) মানুষের ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক কার্যকলাপ কিভাবে ভৌগোলিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে, ইহার আলোচনার উপর অধিকতর জোর দিয়াছেন।

যে পরিবেশের উপর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি নির্ভরশীল, তাহাকে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রাকৃতিক **পরিবেশ** গঠিত হয় অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি (পর্বত, সমভূমি, মালভূমি, নদী, সৈকতরেখা ইত্যাদি), ভূমির গঠন, জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু এই উপাদানগুলি লইয়া। যে দেশে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূল, সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সহজসাধ্য হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ, জাপান ও বৃটেনের ভগ্ন সৈকতরেখা ও অবস্থান, জার্মানীর কয়লা-সম্পদ এই সকল দেশের উন্নতির সহায়ক হইয়াছে। অবশ্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকিলেও কোন দেশ সমৃদ্ধিশালী নাও হইতে পারে। অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপীয়গণ না আসা পর্যন্ত এবং রাশিয়ায় বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ সকল দেশ মোটেই উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ মানুষের উন্নতির পক্ষে সাংস্কৃতিক পরিবেশও অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক পরিবেশ বলিতে সাধারণতঃ ধর্ম, ভাষা, আচার-ব্যবহার, প্রথা, সামাজিক সংগঠন, জাতীয় চরিত্র, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, লোকবসতির ঘনত্ব ইত্যাদি বুঝায়। এইভাবে দেখা যায়, মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ উভয়ের প্রভাব বিদ্যমান।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। মানুষ তাহার বুদ্ধিবলে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে আয়ত্তে আনিয়া নিজের উন্নতির কাজে লাগাইতেছে। নদীর উপর বাঁধ দিয়া বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ-উৎপাদন ও জলসেচের ব্যবস্থা হইতেছে, সার প্রয়োগ করিয়া অনুর্বর জমিকে কৃষির উপযোগী করা হইতেছে। ক্রমেই অধিকতর দ্রুতগামী যানবাহন আবিষ্কার করিয়া দূরত্বের উৎসাদন করা হইতেছে। অবশ্য সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিকে বশ করা হয়তো কখনই সম্ভব হইবে না। তুন্দ্রা অঞ্চলে হয়তো কোনদিনই শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে না, সাহারা মরুভূমিতে হয়তো কখনই ঘন লোকবসতি হইবে না, বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রাকে হয়তো কখনই সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আনা যাইবে না। তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বশ করা সম্ভব। সুতরাং একদিকে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজের কল্যাণে নিয়োজিত করিবার শক্তি মানুষের প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার পারস্পরিক সম্পর্ক কিভাবে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে, ইহাই অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয়। সুতরাং, যে শাস্ত্র প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সহিত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতির পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝাইয়া দেয়, তাহাকেই অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র (Economic Geography) বলে।

বিভিন্ন ভৌগোলিক অর্থনৈতিক ভূগোলের বিভিন্ন দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ম্যাক্‌ফারলেন (J. McFarlane) প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর গুরুত্ব দিয়া বলিয়াছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের গঠন, জলবায়ু, অবস্থান ইত্যাদি মানুষের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তাহার তত্ত্ব-বিচারকেই অর্থনৈতিক ভূগোল বলা হয়। হান্টিংটনের (Ellsworth Huntington) মতে মানুষের জীবনধারণের জন্য যাহা-কিছু প্রয়োজন তাহাই অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।

মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়া অর্থনৈতিক ভূগোল আলোচনা করে। সুতরাং ইহা একটি সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science)। **অর্থনীতি (Economics)** মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা অর্থাৎ অর্থনৈতিক

কার্যাবলী, দ্রব্যের উৎপাদন ও বিতরণ, অভাব ও ইহার পরিপূরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে। অর্থনৈতিক ভূগোল মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝাইয়া দেয়। অর্থনীতি বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের নীতি নির্ধারণ করে; অর্থনৈতিক ভূগোল কোন্ অঞ্চলে কি প্রকারের দ্রব্য উৎপন্ন হওয়া সম্ভব এবং ইহার বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করে। এইভাবে দেখা যাইবে যে, অর্থনীতির সহিত অর্থনৈতিক ভূগোলের নিকট-সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থনীতির জ্ঞান না থাকিলে অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র অধ্যয়ন করা সম্ভব নহে। অনেকে মনে করেন যে, অর্থনৈতিক ভূগোল ভূগোলশাস্ত্রের শাখা নহে, ইহা অর্থনীতি-শাস্ত্রের অঙ্গীভূত। এইজন্য কোন কোন দেশে অর্থনৈতিক ভূগোলকে ভৌগোলিক অর্থনীতি (Geonomics বা Geo-Economics) বলা হয়।

অর্থনৈতিক ভূগোলের গতিশীল চরিত্র (Dynamic nature of Economic Geography)—ভূগোলশাস্ত্রের মতো অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রও একটি গতিশীল বিজ্ঞান। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদার পরিমাণ ও বৈচিত্র্য ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। অথচ এই চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরিমাণ সীমাবদ্ধ। সেইজন্য মানুষকে অভাব মোচনের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের দিকে নিয়ত প্রচেষ্টা চালাইতে হয়। সমাজ-বিবর্তনের প্রথম দিকে মানুষ **পশু-শিকার**, মৎস্য আহরণ করিয়া এবং বন্য ফলমূল সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। ক্রমে ক্রমে কৃষিকার্যের সৃষ্টি হইল। মানুষের অভাব মোচনের জন্য আরম্ভ হইল বিনিময়-প্রথা। প্রথমে বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনের জন্য মানুষ নিজের পেশী-শক্তির উপর নির্ভর করিত। ক্রমে ক্রমে পশুকে বশে আনিয়া পশু-শক্তিকে বিভিন্ন দ্রব্য-উৎপাদনে নিয়োজিত করা হইল। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পূর্বপর্যন্ত সকল দেশেই মানুষের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল অনেক কম। সেইজন্য হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষ কায়ক্লেশে জীবনধারণ করিয়াছে। উদ্বৃত্ত সম্পদ না থাকায় মানুষের জীবনে বিশ্রামের কোন অবকাশ ছিল না। সেই যুগে শিল্পোৎপাদনের পদ্ধতি ছিল সরল ও কষ্টসাধ্য এবং পরিমাণ ছিল খুব কম। উদ্বৃত্ত সম্পদের পরিমাণ কম থাকায় এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে বিনিময়ের পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। সমগ্র পৃথিবী **কয়েকটি প্রায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক সমাজের সমবায়ে** গঠিত ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাষ্পশক্তি ও বৃহৎ যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে ইউরোপে **শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution)** শুরু হইল; ইহার ফলে মানুষের পেশী-শক্তি ও পশু-শক্তির সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে উদ্ভূত জড়শক্তি যুক্ত হইল সম্পদ-সৃষ্টির কাজে। ক্রমশঃ মানুষ কয়লা, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও জলপ্রবাহ হইতে শক্তি উৎপন্ন করিয়া উৎপাদনের কাজে লাগাইল। উন্নততর যন্ত্রপাতি কৃষি, শিল্প ও পরিবহণ-ব্যবস্থায় নিয়োজিত হইতে লাগিল।

এইভাবে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটিল। একদিকে যেমন উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িল অন্যদিকে অনেক কম পরিশ্রমে ও স্বল্পভে যন্ত্রপাতির সাহায্যে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতে লাগিল। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইল। ক্রমশঃ রেলগাড়ী, মোটর-গাড়ী, বিমানপোত, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ায় যাতায়াত ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইল। ইহার ফলে ও উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি হওয়ায় বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটিল। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি-সাধন এবং স্থানগত বিশেষীকরণের (Regional specialisation) ফলে বর্তমান যুগে মানুষ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও সংঘাত সত্ত্বেও বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের দ্বারা এক নূতন **আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যুগের** সূচনা করিয়াছে।

গতিশীল জগতের বিভিন্ন যুগে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে এইভাবে পরিবর্তন আসিলেও সকল স্থানে একই রকম উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। হিমমণ্ডলের এস্কিমোদের অর্থনৈতিক অবস্থা এখনও সেই প্রাচীন যুগের অবস্থার মতোই আছে; ইহারা এখনও প্রধানতঃ পশুশিকার ও মৎস্যশিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। মধ্য আফ্রিকার পিগ্‌মি এবং দক্ষিণ আমেরিকার সর্বদক্ষিণপ্রান্তের অধিবাসী ইয়াগান ইণ্ডিয়ান এখনও যন্ত্র-সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হয় নাই। কিন্তু রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি দেশ অর্থনৈতিক উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার এই বৈষম্যের প্রধান কারণ স্থানীয় পরিবেশ। কয়েকটি দেশ **প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical Environment)** অনুকূলে থাকায় সহজে উন্নতি লাভ করিয়াছে। সম্পদ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কোন্ দেশে কতটা পাওয়া যায়, ইহা নির্ভর করে প্রধানতঃ

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে সেই দেশের অপর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ এবং কৃষিকার্যের উপযোগী জলবায়ু ও মৃত্তিকা। যে সকল দেশে প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিকূল, সেখানে অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন সহজসাধ্য নহে। আফ্রিকার সাহারা অঞ্চল এবং এশিয়ার তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া কোনদিনই অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে না। ইহা সত্ত্বেও মানুষ তাহার অস্তিত্বের প্রথম দিন হইতেই প্রাকৃতিক বাধা অপসারণের এবং প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের নিরলস সাধনায় ব্যাপৃত। বিশেষতঃ গত দুইশত বৎসরের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার বিস্ময়কর উন্নতির ফলে মানুষ প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে বহুল পরিমাণে নিজের ভোগ-সুখবৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কাঠের চাকা আবিষ্কার হইতে মহাকাশ-বিজয় অভিযানের জন্য স্পুটনিক প্রেরণ প্রাকৃতিক পরিবেশের অসুবিধা অতিক্রমেরই সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, কলিকাতা, লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক বা মস্কোর মতো অতি আধুনিক কৃত্রিম পরিবেশের মানুষও সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক পবিবেশের প্রভাবমুক্ত। একদিকে যেমন রেলগাড়ী, বিমানপোত, রেডিও, টেলিভিসনের ন্যায় বিভিন্ন যোগাযোগ-ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, জলস্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন হইতেছে, জলসেচের সাহায্যে বন্ধ্যা মরুভূমি শস্যশ্যামলা হইয়াছে, অন্যদিকে একটা সমগ্র দেশের জলবায়ু-নিয়ন্ত্রণ এখনও মানুষের সাধ্যের অতীত, নদীর বন্যা পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নাই, কৃষিকার্য এখনও বহুলাংশে প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত। সভ্যতার সকল স্তরেই মানুষের জীবন বহুলাংশে প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সত্ত্বেও, কি আমাজন নদীর অববাহিকায় গভীর অরণ্যের অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান, কি নিউগিনি দ্বীপের পাপুয়ান, কি কৃষিসমৃদ্ধ গাঙ্গেয় উপত্যকার ভারতীয়, কি নিউ ইয়র্ক শহরের আমেরিকান— প্রত্যেক মানুষের জীবন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত।

প্রাকৃতিক পরিবেশ **সর্বত্র সমান নহে**; নিরক্ষরেখা হইতে বিভিন্ন দেশের দূরত্ব সমান নহে; কোথাও সুউচ্চ পর্বতমালা, কোথাও বন্ধুর মালভূমি, কোথাও বা বিস্তীর্ণ সমতলভূমি বিদ্যমান। ভূমির গঠনও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর তারতম্যও খুব স্পষ্ট।

বিষুবরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলের উষ্ণ ও আর্দ্র একঘেয়ে জলবায়ুর সহিত উষ্ণ সাহারা মরুভূমির শুষ্ক ও চরম জলবায়ুর কোনও সম্পর্ক নাই। গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাতযুক্ত ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু শীতকালীন বৃষ্টিপাতযুক্ত ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বিপরীত। জলবায়ুর তারতম্য অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ্ ও প্রাণী দেখা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই বিভিন্নতার জন্যই পৃথিবীতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিভিন্নতা ও উৎপাদনে বৈচিত্র্য দেখা যায়। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন অববাহিকায় ও বদ্বীপ অঞ্চলে ধান ও পাটচাষের কেন্দ্রীভবন ও কিউবায় ইক্ষুচাষের প্রাধান্য প্রাকৃতিক পরিবেশের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। অরণ্যসম্পদের উপর ফিনল্যাণ্ডের অর্থনীতি, মৎস্য-শিকারের উপর আইসল্যাণ্ডের অর্থনীতি, খনিজ তৈলের উপর কুওয়েত (Kuwait) বা ভেনেজুয়েলার অর্থনীতি এবং কফিচাষের উপর ব্রেজিলের অর্থনীতির নির্ভরশীলতা প্রাকৃতিক পরিবেশেরই ফল। জাপান ও নরওয়ের মৎস্যশিল্পের সমৃদ্ধি এবং বৃটেনের বাণিজ্যিক উন্নতিও প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্যই সম্ভব হইয়াছে।

পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চল একই প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত হইলেও মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার তারতম্যের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে জীবনযাত্রার মানের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। উত্তর আমেরিকার মেরু অঞ্চলের এস্কিমোগণ এখনও পশুশিকার ও মৎস্য আহরণ করিয়া প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর একান্ত নির্ভরশীল অবস্থায় জীবন যাপন করে। কিন্তু ইউরোপের ল্যাপ্‌গণ একই পরিবেশে বাস করিয়াও বন্য হরিণকে পোষ মানাইয়া, শৈবালজাতীয় পশুখাদ্যের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিয়া উত্তর আমেরিকার এস্কিমোগণের তুলনায় জীবনধারণের অনিশ্চয়তা কিছুটা কমাইতে সক্ষম হইয়াছে। প্রায় একই রকম প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত ভারত ও চীন কৃষিকার্যে যতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে ক্রান্তীয় আফ্রিকার দেশসমূহ এখনও ততটা করিতে পারে নাই। ইহার কারণ মানুষের **সাংস্কৃতিক পরিবেশের (Cultural Environment)** পার্থক্য। একই প্রাকৃতিক পরিবেশে, শিক্ষা-বিজ্ঞানে উন্নত, বুদ্ধিমান্, পরিশ্রমী ও উদ্ভাবনী-ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ যতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে, অলস, শ্রমবিমুখ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পশ্চাদ্পদ মানুষ ততটা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন সম্পদ আবিষ্কার ও প্রাকৃতিক সম্পদের নূতন ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন স্থানের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের

বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশও স্থাণু নহে। আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে; বৃষ্টিপাত কোন বৎসরে বেশী, কোন বৎসরে কম হয়। শীত ও গ্রীষ্মের তারতম্য প্রায়ই অনুভব করা যায়; নদীর গতিপথেরও পরিবর্তন ঘটে। নদীর পলিমাটির দ্বারা নূতন ভূভাগের সৃষ্টি হয়। প্রবল ভূমিকম্পে পুরাতন ভূভাগ ধ্বংস হয়, ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। যুগে যুগে প্রকৃতি এইভাবে পরিবর্তিত হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনে মানুষও তাহার হস্ত প্রসারিত করিয়াছে। রাশিয়ার স্টেপ্‌স্ তৃণভূমি ও উত্তর আমেরিকার প্রেইরী তৃণভূমি কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে; মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার অরণ্য পরিষ্কার করিয়া রবারের বাগিচা তৈয়ারী হইয়াছে। সুয়েজ যোজকের উপর খাল কাটিয়া ভূমধ্যসাগরের সহিত লোহিত সাগরের সংযোগ সাধন করা হইয়াছে; হল্যাণ্ডের উপকূলবর্তী সমুদ্রে স্থলভাগ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

এইভাবে দেখিতে পাই একদিকে যেমন স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিতেছে, অন্যদিকে তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের প্রকৃতির সহিত খাপ খাওয়াইবার ক্ষমতা, প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রমের ক্ষমতা, প্রকৃতিকে অধিকতর সার্থকভাবে ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে; অর্থাৎ মানুষের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক সতত পরিবর্তনশীল। ফলে এই সম্পর্ক লইয়া যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হইয়াছে, সেই **অর্থনৈতিক ভূগোলও গতিশীল বিজ্ঞান** (Dynamic Science)।

সমশ্রেণীভুক্ত অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত অর্থনৈতিক ভূগোলের সম্বন্ধ (Relation of Economic Geography to other allied Sciences)—আধুনিক ভূগোলশাস্ত্র অংশতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Physical Science)। আবার ইহা প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত সামাজিক পরিবেশের সম্পর্ক নির্ণয় করে বলিয়া, ইহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছে। আবহবিদ্যা (Climatology), ভূ-তত্ত্ব (Geology), উদ্ভিদ্-বিদ্যা (Botany), প্রাণিবিদ্যা (Zoology) প্রাকৃতিক ভূগোলের (Physical Geography) অন্তর্গত। অর্থনৈতিক ভূগোল প্রধানতঃ একটি সমাজ-বিজ্ঞান; রাজনৈতিক ভূগোল (Political Geography), ঐতিহাসিক ভূগোল (Historical Geography) ইত্যাদি সমাজ-বিজ্ঞানের মতো ইহাও মানুষের কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মৌলিক উপাদানসমূহের তারতম্য অর্থনৈতিক ভূগোলের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু।

কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার প্রভাবিত হয় তাহার মূল্যায়ন, বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির তারতম্য, পরিবহণ-ব্যবস্থা, বাণিজ্য-পথ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ইহার আলোচনার বিষয়বস্তু।

অর্থনৈতিক ভূগোলের সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রের নিকট-সম্পর্ক বিদ্যমান। এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্গত বিভিন্ন শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য উদ্ভিদ্-বিদ্যা, জলবায়ু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আবহবিদ্যা, প্রাণিজ সম্পদ সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হয়। সেইরূপ ভূ-পৃষ্ঠের রাজনৈতিক বিভাগ, শাসনপদ্ধতি, মানুষের সাংস্কৃতিক মান ও উপজীবিকা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য রাজনৈতিক ভূগোল অধ্যয়ন করা আবশ্যক। ইহা ছাড়া অর্থনীতি (Economics), রসায়নবিদ্যা (Chemistry), পদার্থবিদ্যা (Physics), নৃ-তত্ত্ব (Anthropology), সমাজতত্ত্ব (Sociology), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Politics), ইতিহাস (History), জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলে অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র অধ্যয়নের সুবিধা হয়। এইভাবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন শাস্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক ভূগোলের যোগসূত্র বিদ্যমান।

প্রশ্নাবলী

1. **"Economic Geography is a Dynamic Science"—Elucidate.**

উঃ—'অর্থনৈতিক ভূগোলের গতিশীল চরিত্র' (৬ পৃঃ—১০ পৃঃ) লিখ।

2. **Define Economic Geography and discuss its field and function.**

উঃ—'অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা' (৩ পৃঃ—৬ পৃঃ) এবং 'অর্থনৈতিক ভূগোলের গতিশীল চরিত্র' (৬ পৃঃ—১০ পৃঃ) লিখ।

3. **Discuss the relation of Economic Geography with other allied subjects.**

উঃ—'সমশ্রেণীভুক্ত অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত অর্থনৈতিক ভূগোলের সম্বন্ধ' (১০ পৃঃ—১১ পৃঃ) লিখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

(Meaning and Nature of Resources)

সম্পদ (Resources) মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান অবলম্বন। সম্পদহীন দেশের পক্ষে উন্নতি লাভ করা যেমন কঠিন, আবার সম্পদশালী দেশের পক্ষে উন্নতি লাভ করা তেমনি সহজ। সম্পদশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সম্পদহীন নেপালের অর্থনৈতিক উন্নতির আলোচনা হইতেই ইহা সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে।

সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতগণ বিভিন্নভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এক একজন তাঁহাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টিকে বিচার করিয়াছেন। পূর্বে সম্পদ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল অত্যন্ত স্থূল এবং তাহারা শুধুমাত্র প্রকৃতি-প্রদত্ত সম্পদ ভিন্ন আর কোনও কিছুকেই সম্পদের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিত না। তা ছাড়া সম্পদের কার্যকারিতা, সম্পদের সংরক্ষণ সম্বন্ধেও তাহাদের ধারণা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

বর্তমান যুগে সম্পদ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ক্রমশঃই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে। সম্পদের সংজ্ঞার পরিধি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমান যুগের মানুষ সম্পদ সম্বন্ধে আরও সচেতন হইয়াছে। কারণ সম্পদ মানুষের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির ভিত্তিস্বরূপ। কি যুদ্ধের সময়ে, কি শান্তির সময়ে মানুষের ভাগ্য বহুলাংশে সম্পদের উপর নির্ভরশীল। সম্পদ সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ নূতন না হইলেও, সমসাময়িক কালে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে আমরা সম্পদ-চেতনায় নূতন ধারা লক্ষ্য করি। এই **নূতন সম্পদ-চেতনার (New Resource-consciousness)** ধারা বুঝিতে হইলে গত দুইশত বৎসরে **অর্থনৈতিক চিন্তাধারায়** যে বিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা অনুধাবন করিতে হইবে এবং সম্পদ-সম্পর্কীয় নূতন ধারণার **ঐতিহাসিক পটভূমিকা** বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

***সম্পদ সম্পর্কে অর্থনৈতিক চিন্তাধারা* (Economic Thoughts on Resources)**—হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষ (অন্তত: অধিকাংশ

মানুষ) দাস, ভূমিদাস (Serf) বা অধীনস্থ প্রজা হিসাবে নানারূপ বাধা-নিষেধের কঠিন শৃঙ্খলের মধ্যে বাস করিয়াছে।

তারপর পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে এক পরিবর্তনের জোয়ার আসে। পাশ্চাত্ত্যের অধিবাসিবৃন্দ নূতন নূতন সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। শক্তিচালিত বৃহদাকার কলকারখানার দ্রুত প্রসার ঘটিতে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদের নূতন ও অধিকতর সুষ্ঠু ব্যবহার হইতে থাকে। ব্যক্তির ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া উঠিতে থাকে। **বিবর্তন (evolution) ও বিপ্লবের মধ্য দিয়া সামাজিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল** হইয়া পড়ে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক নিগড় হইতে এই মুক্তি অবাধ বাণিজ্যাধিকার ও স্বাধীন শিল্পোদ্যোগের (Free Enterprise system) মধ্যে প্রকাশ পায়। ইহার ফলে সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগতে, বিশেষ করিয়া ইংরাজী-ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহে মানুষের কর্মশক্তির ব্যাপক ও বিপুল স্ফূর্তি ঘটে। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও তাহার ফলে জীবনযাত্রার মানের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। অবাধ শিল্পোদ্যোগ ব্যবস্থার এই সাফল্যের ফলে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইতে থাকে যে, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বিপুল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সামাজিক ও সরকারী বাধানিষেধের অপসারণের ফলেই সম্ভব হইয়াছে, এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং বাণিজ্য ও মুনাফা অর্জনের অবাধ অধিকার থাকিলেই সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধিত হইবে; অর্থাৎ **অবাধ প্রতিযোগিতার** মধ্য দিয়াই ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইবে।

এই মতাদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষপর্যন্ত ইংরাজী-ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহের অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করিতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ আল্‌ফ্রেড মার্শাল (Alfred Marshall) সর্বপ্রথম **অবাধ বাণিজ্য-নীতির** এই মতাদর্শ খণ্ডন করেন। *তিনি ঘোষণা করেন যে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ স্বার্থ অনুসরণ করিলেই সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হয় না এবং জনস্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য সুনির্দিষ্ট ও সচেতন সরকারী নীতির (Public policy) প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।* পিগু এবং আরও অনেকে মার্শালের এই মত সমর্থন করেন। পরবর্তী কালে ফিন্‌স্ এই মত আরও জোরের সহিত প্রচার করেন।

ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক স্বার্থের সহিত সরকারের যে সকল বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে, দেশের সম্পদ, বিশেষ করিয়া মৃত্তিকা, জল, অরণ্য, শক্তিসম্পদ, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি মৌলিক সম্পদের সংরক্ষণ তাহাদের অন্যতম। ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য **মুনাফা-অর্জন**। তাহার দৃষ্টি বর্তমান অথবা নিকট-ভবিষ্যতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একশত বা দুইশত বৎসর পরে দেশের কয়লা ফুরাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা এবং থাকিলে এখন হইতে কয়লা-সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ইহা লইয়া কোন কয়লা-খনির মালিক বা কয়লা-ব্যবসায়ী মাথা ঘামাইবে না। যে-কোন প্রকারে বর্তমান লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করাই তাহার লক্ষ্য। এইজন্য দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে **সরকারী হস্তক্ষেপ** আবশ্যক হইয়া পড়ে। জনগণের সামগ্রিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কয়লা, তৈল, মৃত্তিকা প্রভৃতি সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সরকার অগ্রসর হন, যাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নতির গতি অব্যাহত থাকে।

সম্পদ-সম্পর্কীয় নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিক পটভূমিকা (Historical background of the New Attitude on Resources)—উল্লিখিত অর্থনৈতিক চিন্তাধারার পরিবর্তনের পিছনে রহিয়াছে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ :

(১) **প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয়িষ্ণুতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা :** বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসতিবিস্তার সম্পূর্ণ হইবার পর হইতেই, অর্থাৎ যখন হইতে বিনামূল্যে জমিসংগ্রহ আর সম্ভব হইল না, তখন হইতেই এই নবচেতনার উন্মেষ হয়।

(২) দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে বিশ্বব্যাপী **বাণিজ্যমন্দা (Great Depression)** দেখা দেওয়ার ফলে অবাধ বাণিজ্য-নীতির দুর্বলতা প্রকট হইয়া উঠে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ অনিবার্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডিলেনো রুজভেল্টের **'নিউ ডিল' (New Deal)** এই স্বীকৃতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মৌলিক সম্পদসমূহ যাহাতে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বণিকস্বার্থের জন্যই বরাবর ব্যবহৃত না হয় তাহার ব্যবস্থা করাই সরকারী হস্তক্ষেপের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(৩) পর পর দুইটি **মহাযুদ্ধের** ফলে সম্পদ-চেতনা মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে। আধুনিক বিশ্বগ্রাসী মহাসমর সাফল্যের

সহিত পরিচালনা করিতে হইলে দেশের সমগ্র সম্পদ সংহত করা প্রয়োজন। আধুনিক যুদ্ধের অপ্রতিরোধ্য তাগিদ মানুষকে সম্পদ-সচেতন করিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে দুই বৃহৎ শক্তিশিবিরের মধ্যে যে **ঠাণ্ডা লড়াই** চলিতেছে তাহাও মানুষের সম্পদ-চেতনাকে তীব্রতর করিয়াছে।

(৪) আধুনিক **রাষ্ট্রের গঠন** ক্রমেই বৃহত্তর ও জটিলতর হইতেছে। ইহার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব-বৃদ্ধি প্রয়োজন হইতেছে এবং এই কর্তৃত্ব ক্রমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সমেত নাগরিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত হইতেছে।

(৫) অবাধ বাণিজ্য-নীতির ভিত্তি ছিল অবাধ প্রতিযোগিতা। কিন্তু বিভিন্ন দেশে ক্রমেই অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে **একচেটিয়া কারবারের** উৎপত্তি হইতেছে এবং মুষ্টিমেয় কয়েক জনের হাতে ধন কেন্দ্রীভূত হইতেছে। এইরূপে অবাধ বাণিজ্য-নীতির ভিত্তি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের দাবি প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে দেশের সমস্ত সম্পদ সরকার কর্তৃক পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবার পক্ষে জনমত ঝুঁকিতেছে।

(৬) প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়া এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ ও এশিয়ার বহুদেশে **সমাজতন্ত্র** প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা সর্বদাই সম্পদ-সচেতন এবং এই ব্যবস্থার অধীনে পরিকল্পনার সাহায্যে মৌলিক সামাজিক সম্পদসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়।

সর্বশেষে, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণের মধ্যেও ধীরে ধীরে **সামাজিক দায়িত্ববোধের** উন্মেষ হইতেছে। এই দায়িত্ববোধ হইতে সম্পদের প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে আগ্রহও বৃদ্ধি পাইতেছে।

সম্পদ, একটি গতিশীল ধারণা (Resources, A Dynamic Concept)—উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, শত শত বৎসর ধরিয়া অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে সম্পদ অবহেলিত হইয়াছে। সম্পদের মূল্য নিছক ব্যক্তিগত মুনাফার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হইয়াছে। অর্থনীতিবিদ্‌গণের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত হওয়ায় ইহা শুধু প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিশেষ করিয়া প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

সম্পদ সম্বন্ধে ধারণা অপেক্ষাকৃত নূতন বলিয়া ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার অবকাশ রহিয়াছে। সম্পদের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে

প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীর মধ্যে মতৈক্য স্থাপন করিতে হইবে এবং ইহার সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলি (Popular misconceptions) দূর করিতে হইবে।

সম্পদ সম্পর্কে **ভুল ধারণাগুলি (Misconceptions)** নিম্নরূপ :

(১) সাধারণতঃ লোকে যে সকল জিনিসের **বস্তুগত অস্তিত্ব (Tangible things)** রহিয়াছে, শুধু সেইগুলিকেই সম্পদ বলিয়া গণ্য করে। সম্পদ সম্বন্ধে ইহা অন্যতম ভুল ধারণা। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, কয়লা, লৌহ, কাঠ, মাটি প্রভৃতি বস্তু সম্পদ হিসাবে কার্য করিয়া থাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, **বস্তুগত অস্তিত্ব** নাই এমন সকল জিনিস **(Intangible things)**—যথা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জাতীয় সংহতি, সামাজিক নিরাপত্তা, সরকারের শাসন-কুশলতাও কম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ নহে। বরঞ্চ বলা চলে যে, এই উভয় প্রকার উপাদানের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়াই সম্পদের সৃষ্টি হয়।

(২) অনুরূপভাবে এতদিন পর্যন্ত **সাংস্কৃতিক ও মানবিক সম্পদসমূহ (Cultural and Human resources)** বাদ দিয়া শুধু **প্রাকৃতিক সম্পদকে (Natural resources)** সম্পদ বলিয়া গণ্য করা হইত। ইহার ফলে সম্পদের সত্য প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা বিকাশ লাভ করে নাই।

(৩) সম্পদ সম্বন্ধে আর একটি ভুল ধারণা হইল কোন জিনিসকে বিচ্ছিন্নভাবে সম্পদ হিসাবে গণ্য করা। যেমন, খনিজ তৈলকে সম্পদ বলা হয়, অথচ খনিজ তৈল সম্পদ নহে; উহার **কার্যকারিতাই সম্পদ**। খনিজ তৈলের কার্য আবার নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, কারিগরী দক্ষতা, সমাজ-সংগঠন, সরকারী প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ের উপর এবং এই সকল বিষয়ের স্থান ও কাল অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং সম্পদ হিসাবে বিচার করিবার সময় একক খনিজ তৈলকে না ধরিয়া একটি বিশেষ স্থান ও কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, সরকারী নীতি ও শাসন-কুশলতা, অর্থনৈতিক উন্নতি, কয়লা, জলবিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তির অন্যান্য উৎসের লভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উহাকে বিচার করিতে হইবে।

(৪) শুধু বিচ্ছিন্ন বস্তুসম্পদকে সম্পদ হিসাবে গণ্য করার ফলে মানুষ সম্পদকে **নির্দিষ্ট (fixed)** ও **স্থাণু (static)** বলিয়া মনে করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সম্পদ **অনির্দিষ্ট ও গতিশীল (Dynamic)**।* মানুষের

প্রয়োজন ও প্রচেষ্টা অনুযায়ী ইহার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।* বহুলাংশে সম্পদ **মানুষের নিজের সৃষ্টি**। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহার উপরেই তাহার সম্পদ-সৃষ্টির ক্ষমতা নির্ভর করে।

(৫) সর্বশেষে, ইহা অনুধাবন করিতে হইবে যে, পৃথিবীতে যেমন দিন ও রাত্রি উভয়ই আছে, যেমন লাভের সহিত লোকসান, সুখের সহিত দুঃখ বিদ্যমান তেমনই **সম্পদের সহিত বাধা ও প্রতিরোধও (Resistances)** অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রহিয়াছে। একটিকে বাদ দিয়া আর একটির চিন্তা করিলে ভুল হইবে।

সম্পদের সংজ্ঞা

(Resources Defined)

সম্পদ বলিতে কোন জিনিস বা বস্তু বুঝায় না। কোন জিনিস বা বস্তু যে **কার্য (function)** করিতে পারে তাহাই সম্পদ এবং এই কার্যের লক্ষ্য হইল মানুষের অভাব মোচন করা। সুতরাং **সম্পদ নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উপায় মাত্র**। এই লক্ষ্য হইল ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক চাহিদা মিটানো। কোন জিনিসকে সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে হইলে প্রথমতঃ, উহার **উপযোগিতা (utility)** থাকা চাই এবং দ্বিতীয়তঃ, উহাকে **মানুষের অভাব মোচনের কার্য** করিতে হইবে†। গুজরাটের ক্যাম্বে, আঙ্কলেশ্বর ও কালোলের মাটির নীচে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া তৈল সঞ্চিত রহিয়াছে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত ভারতের মানুষ ঐ তৈলের সন্ধান পায় নাই এবং উহা আমাদের কোন কাজে আসে নাই। অল্পদিন হইল ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের প্রচেষ্টায় এবং রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের সহায়তায় ঐ সকল স্থানের তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং

* Those who still insist that the natural environment is constant and that the supply of 'land' is fixed face a powerful array of opposing authorities".
—*E. W. Zimmermann.*

† The word 'resource' does *not refer to a thing or a substance but* to a function which a thing or a substance *may perform or to an operation* in which it may take part, namely, the function or operation of attaining a given end such as satisfying a want."
—*E. W. Zimmermann.*

নহে। সামাজিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মানুষ নিত্য নব **কলা-কৌশল উদ্ভাবন** করিতেছে। নূতন আবিষ্কারের ফলে পুরাতন কলা-কৌশল দ্রুত বাতিল হইয়া যাইতেছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা (Paucity of Natural Resources)—সভ্যমানুষের সম্পদের অর্থ ও প্রকৃতি বুঝিবার জন্য পশু-মানুষের সভ্যমানুষে উত্তরণের এই কাহিনী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সভ্যমানুষের সম্পদ বহুল পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ নয়। প্রকৃতি তাহার ভাণ্ডারের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশমাত্র মুক্তহস্তে দান করে। অবশিষ্ট অংশ যে সে দান করে না শুধু তাহাই নহে, সম্পদ-সন্ধানী সভ্যমানুষের সম্পদলাভের প্রয়াসে সে দুরতিক্রম্য **বাধার সৃষ্টি** করে। সভ্যমানুষের অধিকাংশ সম্পদ তাহার বহু আয়াসে লব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনী কৌশলের সম্মিলিত ফল। জলস্রোত প্রকৃতির দান, কিন্তু তাহা হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ মানুষের সংস্কৃতির অবদান। প্রকৃতিতে সমস্ত মৌলিক পদার্থ রহিয়াছে। কিন্তু পশু-মানুষের নিকট ইহাদের কোন মূল্যই নাই। কারণ সে ইহাদের ব্যবহার জানিত না। এমনকি সে ইহাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সচেতন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে প্রকৃতিতে একশত মৌলিক পদার্থ থাকিলে সভ্যমানুষ তাহা হইতে লক্ষ লক্ষ যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারে।

এই কারণে মিশেল বলিয়াছেন যে, **মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হইল তাহার জ্ঞান (Knowledge)**।* কারণ জ্ঞানই সমস্ত সম্পদের উৎস। প্রস্তর যুগের মানুষ যাহারা ক্ষুধা ও শত্রুর সঙ্গে লড়াই করিয়া দুঃখের জীবন যাপন করিত তাহাদের সঙ্গে এবং বর্তমান যুগের অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তা ও সুখের ভিতর লালিত মানুষের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল জ্ঞান। কয়লা ও খনিজ তৈল, বিদ্যুৎ ও পারমাণবিক শক্তি, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি এবং বিজ্ঞানের অসংখ্য বিস্ময়কর আবিষ্কারের যে জ্ঞান আধুনিক মানুষের রহিয়াছে, প্রস্তর যুগের মানুষের তাহা ছিল না। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও প্রয়োগবিদ্যার যত উন্নতি হইবে এবং মানুষের চাহিদা যত বাড়িবে ততই নূতন নূতন সম্পদ আবিষ্কৃত হইবে এবং পুরাতন সম্পদের নূতনভাবে প্রয়োগের

* "Incomparably greatest among human resources is knowledge. It is greatest because it is the mother of other resources."—*Welsey C. Mitchell.*

ব্যবস্থা হইবে।* সুতরাং দেখা যায় যে, সম্পদের বিচার তাহার **কার্য-কারিতার** দিক হইতে করিতে হইবে।

সম্পদ ও চাহিদা (Resources and Wants)—সম্পদের পরিবর্তন শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রয়োগ-কৌশলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে না, এই পরিবর্তন মানুষের **ব্যক্তিগত চাহিদা** ও **সামাজিক লক্ষ্যের** পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেও ঘটিয়া থাকে। ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষের লক্ষ্য এবং স্বাধীন ভারতের লক্ষ্যের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রহিয়াছে। ইহার ফলে ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতে যে সম্পদ ছিল ১৯৪৭ সালের পর তাহার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রগঠন। ফলে পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পদবৃদ্ধির জোর প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ দামোদর, মহানদী, কোশী প্রভৃতি নদীগুলি পূর্বে বিশেষ কাজে লাগিত না। বিভিন্ন নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া বর্তমানে ঐগুলি হইতে বিদ্যুৎ, মৎস্য, সেচের জল ইত্যাদি পাওয়া যাইতেছে।

প্রকৃতি ও সংস্কৃতি (Nature and Culture)—মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ-সৃষ্টিতে সংস্কৃতি ক্রমেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক প্রগতি প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ নিজেও ইহার দ্বারা প্রভাবিত হয়। কেবলমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত চাহিদা ও সামর্থ্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয় না। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক সংস্থা, প্রথা ও পদ্ধতিও ইহার প্রভাব এড়াইতে পারে না। মানবগোষ্ঠী ক্রমেই প্রসারিত ও জটিল হইতেছে। শ্রমবিভাগ ও শ্রম-বিশেষী-করণ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে। উন্নততর যাতায়াত ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার ফলে দূর-দূরান্তের মানুষ পরস্পরের নিকট-সান্নিধ্যে আসিতেছে এবং পৃথিবীব্যাপী পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে জনসংখ্যারও পরিবর্তন ঘটিতেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরী দক্ষতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা প্রভৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। অবশ্য কালক্রমে জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির গতি হ্রাস পাইতে পারে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে জনসংখ্যাও হ্রাস পাইতে পারে।

---

* **"It is technology which gives value to the stuffs which it possesses; and as the useful arts advance, the gifts of nature are remade."**

—*Walton H. Hamilton.*

সুতরাং দেখা যাইতেছে সংস্কৃতি দুই প্রকারের পরিবর্তন ঘটায়, একদিকে প্রকৃতি এবং মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রয়োগ-কৌশল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে পরিবর্তন ঘটায়, অন্যদিকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, গোষ্ঠীর সহিত ব্যক্তির এবং গোষ্ঠীর সহিত গোষ্ঠীর সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটায়। সরকার, ধর্মীয় সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, চেম্বার অব কমার্স, জীবনযাত্রার মান, রাজনৈতিক মতবাদ প্রভৃতি সংস্কৃতির অবদান।

সম্পদের সৃষ্টি ও ধ্বংস (Resource-creation and Destruction)—মানুষ যেমন সম্পদ সৃষ্টি করে তেমনি সে সম্পদ ধ্বংসও করে। কয়লা, তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস বা অরণ্যের কাষ্ঠ ব্যবহার করিতে গেলে এইগুলির ধ্বংস হইবেই। আবার অনেকসময় **নূতন আবিষ্কারের** ফলে কোন কোন সম্পদ ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। বৃহদাকার ইস্পাত-কারখানা-স্থাপনের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহখনি ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বর্তমানে ঐগুলি আর সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে না। উহারা **নিরপেক্ষ সামগ্রীতে (Neutral Stuff)** পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মানুষের **নির্বুদ্ধিতা** ও **অদূরদর্শিতার** ফলে আরও অনেক বেশী সম্পদ ধ্বংস হয়। ত্রুটিপূর্ণ কৃষিকার্য, অপরিমিত পশুচারণ অথবা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অরণ্য-সম্পদ আহরণের ফলে ভূমিক্ষয় (soil-erosion) ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অনেকের মতে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেতু নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের অনেক নদীনালা মজিয়া গিয়াছে। গৃহযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ, শ্রেণী-সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব ও কলহের ফলে কি বিপুল পরিমাণ সম্পদের ধ্বংস হয় তাহার হিসাব কে রাখে?

সম্পদ-সৃষ্টির উদাহরণ হিসাবে আমরা ব্রেজিলের মিনাস্ গেরাইস্ (Minas Geraes) অঞ্চলের লৌহ আকরিকের উল্লেখ করিতে পারি। এই অঞ্চলে যে লৌহ আকরিকের ভাণ্ডার রহিয়াছে তাহা বহুদিন হইতেই মানুষের জানা ছিল। মধ্যে মধ্যে ইহা ব্যবহারের চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত ইহা 'নিরপেক্ষ সামগ্রী' ছিল। মাত্র কয়েক বৎসর হইল এই লৌহ-ভাণ্ডারের উপর ভিত্তি করিয়া একটি আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠায় ইহা সম্পদে পরিণত হইয়াছে। নিরপেক্ষ সামগ্রীর এইরূপ সম্পদে রূপান্তর নিম্নলিখিত **উপাদানগুলির** উপর নির্ভর করিয়াছে :

(১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৎ-প্রতিবেশী নীতি (The Good Neighbour Policy)—যাহার মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বার্থ, জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি এবং

বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে পারস্পরিক বুঝাপড়ার ফল প্রতিফলিত হইয়াছে। (২) মূলধন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৎ-প্রতিবেশী নীতি গ্রহণ করার ফলে ঐ দেশ হইতে একটি আধুনিক ইস্পাত-কারখানা স্থাপনের জন্য ঋণ, কারিগর ও যন্ত্রপাতি ব্রেজিলে সরবরাহ করা হয়। (৩) স্থানীয় অঞ্চল মনুষ্যবাসের উপযোগী করিবার জন্য জনস্বাস্থ্যমূলক ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। (৪) ভিটোরিয়া বন্দর পর্যন্ত রেলপথের সংস্কার ও যাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা হয়। (৫) শ্রমিক—শ্রমিকের সামর্থ্য ও কাজ করিবার ইচ্ছা বাড়াইবার জন্য শ্রমিক আইন, মজুরি নীতি ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। (৬) ইস্পাত-দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ানো হয়। (৭) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ব্রেজিলের লৌহ আকরিকের বৈদেশিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। (৮) সরকারী নীতি—ব্রেজিল সরকার দেশে ইস্পাতশিল্পের উন্নতিতে আগ্রহী ছিলেন এবং এই শিল্পকে সাহায্য (subsidy) দিয়াছিলেন। (৯) আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা (technology)—লৌহ আকরিক-উত্তোলন, ধাতব লৌহ-নিষ্কাশন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ইস্পাত-উৎপাদন কারিগরী বিদ্যার উন্নতির ফলেই সম্ভব হইয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, **প্রাকৃতিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান-সমূহের গতিশীল ঘাত-প্রতিঘাতের (Dynamic interaction) মধ্য দিয়াই কোন জিনিস সম্পদে পরিণত হয়।**

সম্পদের উন্নতিসাধন সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তাধারা (Modern Trends in Resource Development)—মানুষের জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির জন্যই সম্পদের প্রয়োজন। মানুষের জীবনমানের উন্নতিই সম্পদ-সৃষ্টির প্রধান লক্ষ্য।* এই লক্ষ্যসাধনের জন্য মানুষ বুদ্ধিবলে সংস্কৃতির সাহায্যে প্রচণ্ড বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির দানকে সম্পদে পরিণত করিয়া জীবনধারণ বা জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত করে। প্রাকৃতিক বাধা-বিঘ্ন অনেকসময় মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতিতে ও সম্পদ-সৃষ্টিতে সাহায্য করে (৬৬ পৃঃ)। আধুনিক শিল্পোন্নত দেশসমূহের সম্পদ-সৃষ্টির দিকে তাকাইলেই দেখা যায়, কিভাবে চাহিদার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, কিভাবে কলা,

* "The only final value is human life, or rather human living, with all its richness and fullness of experience."—*Albert B. Wolfe.*

বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির উচ্চ মান প্রকৃতির দানকে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে নিয়োজিত করিতেছে। চাহিদা মিটাইবার জন্য শুধু যে সম্পদ-সৃষ্টিই হইতেছে তাহা নহে, সম্পদের অধিকতর কার্যকারিতার জন্য অপেক্ষাকৃত কম কার্যকরী সম্পদ ধ্বংস করা হইতেছে। কারণ মানুষ বিচার করে কিভাবে প্রকৃতি হইতে সুলভে সর্বাপেক্ষা বেশী সম্পদ উৎপন্ন করা যায়। অনেকে মনে করেন যে, অধিকতর কম কার্যকরী সম্পদের ধ্বংসসাধন মানুষের অবনতি ঘটাইবে এবং শেষপর্যন্ত শিল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক পতন আসন্ন হইয়া উঠিবে। অবশ্য সকল দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ্ এই ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত একমত নহেন।

সম্পদ-সংরক্ষণ
(Conservation of Resources)

সম্পদ ও ইহার ব্যবহার লইয়া পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিতে হইলে সম্পদ-সংরক্ষণের সমস্যা লইয়াও আলোচনা করিতে হইবে। কারণ সংরক্ষণ বলিতে সম্পদের উপযুক্ত হারে উৎপাদন ও ব্যবহার বুঝায়। সংরক্ষণ-সমস্যার মধ্য দিয়া ব্যক্তি-স্বার্থের সহিত সমষ্টি-স্বার্থের সংঘাত অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে।

সংরক্ষণ-সম্বন্ধীয় ধারণা (Concept of Conservation)—সংরক্ষণের অর্থ—স্থান ও কাল অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। এইজন্য ইহার কোন একটি চরম সংজ্ঞা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। সংরক্ষণের দুইপ্রকার অর্থ করা যাইতে পারে। সংরক্ষণ বলিতে কম উৎপাদন ও ব্যবহার বুঝায়। আবার সংরক্ষণ বলিতে বুঝায় **অপচয়-নিবারণ**। প্রথম অর্থে সংরক্ষণ বলিতে বুঝায় ব্যবহারে সংযম অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানের ত্যাগস্বীকার। সংরক্ষণের দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী অপচয়-নিবারণের অর্থ হইল উৎপাদনে দক্ষতা-বৃদ্ধি। কিন্তু দক্ষতা বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন-খরচ কম হইবে, খরচ কম হইলে স্বভাবতঃই বাজার-দরও কম হইবে; ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে সাধারণতঃ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। সম্পদের উৎপাদন-বৃদ্ধি নিশ্চয়ই সম্পদ-সংরক্ষণ নয়। সংরক্ষণের আরও বহু সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু সেগুলি মোটেই স্পষ্ট নয়।

অনেকে সংরক্ষণ বলিতে **মিতব্যয়িতা** বুঝাইয়াছেন। কিন্তু দুইটি শব্দ সমার্থক নহে। সংরক্ষণ বলিতে বুঝায় কম করিয়া ব্যবহার, যাহার ফলে

একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তে অপেক্ষাকৃত বেশী সম্পদ মজুত থাকিবে। কিন্তু মিতব্যয়িতা বলিতে যে স্বভাবতঃই কম করিয়া ব্যবহার বুঝাইবে তাহা নহে। মিতব্যয়িতা বলিতে বুঝায় যথাসম্ভব ত্যাগস্বীকার করিয়া যথাসম্ভব অধিক ফললাভ। অনেকসময় মিতব্যয়িতার ফলে সংরক্ষণ হইতে পারে। কিন্তু তাহা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ নাই যে, সংরক্ষণ ও মিতব্যয়িতা একই অর্থ প্রকাশ করে। যেখানে অপচয়-নিবারণ অর্থাৎ মিতব্যয়িতার ফলে উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি পায় সেখানে মিতব্যয়িতা সংরক্ষণের সূচনা করে না।

সংরক্ষণ বলিতে কেবলমাত্র সম্পদের উৎপাদন হ্রাস করা বুঝায় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কোন কোন সময় মিতব্যয়িতার ফলে সংরক্ষণ হইতে পারে। এই মিতব্যয়িতা বা অপচয়-নিবারণ উৎপাদনে হইতে পারে, আবার ব্যবহার বা ভোগেও হইতে পারে। ব্যবহারে মিতব্যয়িতা বলিতে কেবল কম ব্যবহার বুঝায় না, **বিচার-বিবেচনার সহিত ব্যবহার** বুঝায়। কিন্তু বিচার-বিবেচনার সহিত সম্পদ ভোগ করিতে হইলে দুইটি জিনিসের প্রতি নজর রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, কোন বিশেষ সম্পদ প্রধানতঃ সেই সকল কাজে ব্যবহার করিতে হইবে, যে সকল কাজের পক্ষে ইহা বিশেষভাবে উপযোগী। খনিজ তৈল উত্তাপ-সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু উত্তাপ-সৃষ্টি কয়লার দ্বারাও হইতে পারে। অথচ খনিজ তৈল পরিশোধনের পর পেট্রোল উৎপাদন করিয়া মোটর-গাড়ী, বিমান চালানো যায়, যাহা কয়লার দ্বারা সম্ভব নহে। সুতরাং বিচার-বিবেচনার সহিত ব্যবহার করিতে হইলে খনিজ তৈল উত্তাপ-সৃষ্টির জন্য ব্যবহার না করিয়া মোটর-গাড়ী, বিমান-পোত প্রভৃতি চালাইবার জন্য ব্যবহার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সঞ্চিত সম্পদের স্থলে যথাসম্ভব প্রবহমান সম্পদ ব্যবহার করিতে হইবে (৩৩ পৃঃ)। উদাহরণস্বরূপ কয়লা ও খনিজ তৈলের স্থলে যথাসম্ভব জলবিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে হইবে।

সম্পদ সংরক্ষণ করিতে হইলে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ লইয়া বিবেচনা করিলে চলিবে না। শ্রম, মূলধন অর্থাৎ উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলিও বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ একটি বিশেষ অনুপাতে শ্রম, মূলধন ও ভূমি অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বয়ের ফলেই উৎপাদন সংঘটিত হয় এবং এই **অনুপাতের পরিবর্তন** ঘটানো সম্ভব। সুতরাং সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের ফলে যদি প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান হ্রাস পায়, তাহা হইলে

শ্রম এবং মূলধনের চাহিদা এবং ব্যবহার সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে। অতএব সংরক্ষণের সমস্যা বিবেচনা করিবার সময় উৎপাদনের সকল উপাদান একসঙ্গে লইয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

একথাও মনে রাখা দরকার যে, সকল প্রকার সম্পদ-সংরক্ষণের জন্য একই **নিয়ম** ও **পদ্ধতি** অবলম্বন করিলে চলিবে না। সম্পদের প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী সংরক্ষণের নিয়ম ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হইবে। কারিগরী বিদ্যার দ্রুত উন্নতির ফলে নূতন নূতন সম্পদ আবিষ্কৃত হইতেছে, সম্পদের নূতন ব্যবহারের প্রচলন হইতেছে এবং নূতন উৎস হইতে প্রচলিত সম্পদ আহরণের ব্যবস্থা হইতেছে ; ফলে বিভিন্ন সম্পদের গুরুত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তারও হ্রাস-বৃদ্ধি হইতেছে। সাধারণ মাটি হইতে অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদন যদি সহজসাধ্য হয়, তাহা হইলে অ্যালুমিনিয়াম সংরক্ষণকে আর কতটা গুরুত্ব দেওয়া হইবে? আণবিক শক্তি-উৎপাদন সহজসাধ্য ও সুলভ হইলে কয়লা ও খনিজ তৈলের গুরুত্বের পরিবর্তন ঘটিবে। এই সকল পরিবর্তনের জন্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম প্রণয়ন করা কঠিন।

ব্যবহারের ফলে সম্পদের পরিমাণ, বিশেষ করিয়া সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ কমিয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সম্পদের ব্যবহারোপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়া অথবা পরিবর্ত-সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়া উহা আবার কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা সম্পদ হিসাবে গণ্য করিলে আমরা উপরোক্ত ঘটনা এইভাবে ব্যক্ত করিতে পারি যে, ক্রমেই সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক সম্পদ বস্তুগত সম্পদের স্থান গ্রহণ করে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে **জনসংখ্যা** দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়। ফলে সাংস্কৃতিক উন্নতির ফলে যেটুকু সম্পদ বাঁচে তাহা বর্ধিত জনসংখ্যার ব্যবহারের ফলে খরচ হইয়া যায়। এই অবস্থায় সাংস্কৃতিক উন্নতির দ্বারা সম্পদ-সংরক্ষণের কোন সাহায্য হয় না। যদি সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহা হইলেই সম্পদ-সংরক্ষণ সম্ভব হয়।

পৃথিবীতে সম্পদের সর্বাধিক বিনাশ ঘটে যুদ্ধের ফলে। বিশেষ করিয়া আধুনিক সর্বগ্রাসী **মহাযুদ্ধ** অপরিমেয় সম্পদ-ধ্বংসের প্রধান কারণ।

সুতরাং সম্পদ-সংরক্ষণের সমস্ত রকমের ব্যবস্থার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হইল পৃথিবীতে চিরকালের জন্য যুদ্ধবন্ধের ব্যবস্থা করা এবং শান্তি চিরস্থায়ী করা।

প্রশ্নাবলী

1. Account for the growing resource-consciousness in the modern world.

উ:—'সম্পদ সম্পর্কে অর্থনৈতিক চিন্তাধারা' (১২ পৃ:—১৪ পৃ:) লিখ।

2. Define 'resources'. Discuss some of the popular misconceptions about resources and trace the evolution of the concept of resources.

উ:—'সম্পদ একটি গতিশীল ধারণা' (১৫ পৃ:—১৭ পৃ:) এবং 'সম্পদের সংজ্ঞা' (১৭ পৃ:—১৮ পৃ:) লিখ।

3. "Resource is a dynamic concept"—Explain.

উ:—'সম্পদ একটি গতিশীল ধারণা' (১৫ পৃ:—১৭ পৃ:) লিখ।

4. "The extent of want-satisfaction is a function of resources and resistances, not of resources alone"—Elucidate.

উ:—'সম্পদের কার্যকারিতা-তত্ত্ব' (১৮ পৃ:—২১ পৃ:) লিখ।

5. Analyse the functional theory of resources and indicate the modern trends in resource development.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1962]

উ:—'সম্পদের সংজ্ঞা' (১৭ পৃ:—১৮ পৃ:) এবং 'সম্পদের কার্যকারিতা-তত্ত্ব' (১৮ পৃ:—২১ পৃ:) লিখ।

6. Explain fully the concept of *conservation of resources* and indicate briefly the need for the conservation of forest resources and their utilization in some countries of the world,

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com., 1962]

উ:—'সম্পদ-সংরক্ষণ' (২৪ পৃ:—২৭ পৃ:) লিখ এবং 'অরণ্য ও অরণ্যসম্পদ' অধ্যায়ের 'অরণ্য-সংরক্ষণ' লিখ।

7. Explain fully how resources evolve out of the dynamic interaction of natural, human and cultural forces. Illustrate your answer by suitable examples. [C. U. Three-Year Degree Course, B. Com., 1963]

উ:—'প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা' (২০ পৃ:—২১ পৃ:), 'সম্পদ ও চাহিদা' (২১ পৃ:), 'প্রকৃতি ও সংস্কৃতি' (২১ পৃ:—২২ পৃ:), 'সম্পদের সৃষ্টি ও ধ্বংস' (২২ পৃ:—২৩ পৃ:) লিখ।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদ

(Natural Resources)

যে সকল সম্পদের উপর ভিত্তি করিয়া মানুষের অর্থনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠে এবং কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যে সকল সম্পদ লইয়া সৃষ্টি হয়, তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) প্রাকৃতিক সম্পদ; যথা, খনিজ পদার্থ, জলস্রোত, অরণ্য, জলবায়ু ইত্যাদি; (২) মনুষ্য-সম্পদ; (৩) সাংস্কৃতিক সম্পদ; যথা, সংগঠন, কারিগরী দক্ষতা ইত্যাদি। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সহিত তাহার পরিবেশের সম্পর্ক বুঝিতে হইলে এই তিন শ্রেণীর সম্পদের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রকৃতির আপাতবিরোধী স্বভাব

(Some Paradoxes of Nature)

প্রকৃতি—অনুকূল ও প্রতিকূল (Nature, Friend and Foe)—প্রাকৃতিক সম্পদ লইয়া আলোচনা করিবার সময় প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতি একদিকে মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার জিনিস প্রতিনিয়ত সরবরাহ করিতেছে, অন্যদিকে মানুষের জীবনে নানা বিঘ্নও সৃষ্টি করিতেছে। বৃষ্টিপাতের ফলে ধরণী শস্যশ্যামলা হয়, নদী-নালা, খাল-বিল পুষ্ট হয়; কিন্তু ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাতে বহু গৃহ, শস্য, পশু, ও মানুষের ক্ষতি হয়। পৃথিবীতে যেমন উর্বর পলিমাটি দ্বারা গঠিত নদী-উপত্যকা ও বদ্বীপ রহিয়াছে তেমনি আছে উষর কঠিন পার্বত্য অঞ্চল ও শুষ্ক মরুভূমি। নদীপথে যাতায়াতের সুবিধা হয়, নদী হইতে পানীয় জল, সেচের জল ও মৎস্য পাওয়া যায়। আবার সেই নদীতে বন্যা হইলে ধন-প্রাণের সমূহ ক্ষতি হয়। পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদের সাহায্যে একদিকে যেমন জলসেচের ব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন ও যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে, অন্যদিকে ১৯৫৯ সালে এই দামোদরের বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরে কান্নার রোল পড়িয়া গিয়াছিল। মানুষ প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক সম্পদগুলি

সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার ও জীবনযাত্রার প্রণালী আরামপ্রদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি যেখানে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে মানুষ চেষ্টা করিতেছে সেই বাধা অতিক্রম করিবার। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, তাপ-নিয়ন্ত্রণ, জলসেচের ব্যবস্থা, যানবাহন ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। প্রকৃতি মানুষের **বন্ধু** আবার **শত্রু**ও বটে।

প্রকৃতি—কৃপণ ও মুক্তহস্ত (Nature, Niggardly, and Bountiful)—প্রকৃতি একদিকে যেমন কৃপণ, অন্যদিকে তেমনি মুক্তহস্ত। জীবনধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় বাতাস ও জল প্রকৃতির মুক্তহস্তের দান (Free gift of Nature)। অনুকূল জলবায়ু, উর্বর ভূমি, বন্যপশু ও অরণ্যসম্পদও প্রকৃতি মানুষকে দিয়াছে। কিন্তু লোকসংখ্যা যতই বাড়িতে থাকে ততই অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমি ও প্রতিকূল জলবায়ুতে মানুষ বসতি স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। প্রকৃতির কৃপণ রূপটি তখন বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষ উদ্যোগী ও পরিশ্রমী হইলে অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল পরিবেশেও জীবনধারণের বন্দোবস্ত করিতে পারে। বুদ্ধি, কৌশল ও পরিশ্রমের দ্বারা প্রতিকূল পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া, প্রকৃতিকে বশে আনিয়া প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে সম্পদ আহরণ করিয়া মানুষ নিজেকে ঐশ্বর্যশালী করিয়াছে। এইভাবে অনুর্বর জমিতে সার দিয়া ইহাকে উর্বর করা হইতেছে; নূতন ধরনের ফসল ও বীজ আবিষ্কার করিয়া অত্যধিক শুষ্ক ও শীতল অঞ্চলে কৃষিকার্য হইতেছে; নদীতে বাঁধ দিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে; নূতন খনিজ পদার্থ আবিষ্কার করিয়া যন্ত্রপাতির সাহায্যে নূতন পদ্ধতিতে ইহা উত্তোলনের ব্যবস্থা করিয়া এবং খনিজ পদার্থের নূতন নূতন ব্যবহার প্রচলন করিয়া সহস্র রকমের জিনিস প্রস্তুত হইতেছে।

প্রকৃতি—অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনশীল (Nature, Constant and Changing)—জড়বিজ্ঞানের (Natural Science) দৃষ্টিকোণ হইতে প্রকৃতিকে অপরিবর্তনীয় (Constant) বলিয়া মনে হয়। কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর আয়তন বাড়েও নাই কমেও নাই। পৃথিবীতে মোট স্থলভাগের পরিমাণও প্রায় নির্দিষ্ট। সাগর-মহাসাগরে জলের পরিমাণেও কোনও পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানের (Social Science) দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে প্রকৃতিকে আর অপরিবর্তনীয় বলিয়া মনে হয় না;

প্রকৃতি নিয়ত-পরিবর্তনশীল (Changing)। ভূগর্ভে সঞ্চিত কয়লা, লৌহ ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ; মানুষ ইচ্ছামতো ইহার পরিমাণ বাড়াইতে পারে না। কিন্তু খনিজ পদার্থের ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা অর্জন করিয়া কিংবা নূতন ব্যবহার আবিষ্কার করিয়া ইহার উপযোগিতা বৃদ্ধি করিতে পারে। যেমন, কয়লা প্রধানতঃ শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ কয়লা সঞ্চিত ছিল, আজ তাহার পরিমাণ কিছুই বাড়ে নাই ; ব্যবহারের ফলে বরং কিছু কমিয়াছে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এক টন কয়লা হইতে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করা যাইত বর্তমানে কারিগরী জ্ঞানের উন্নতির ফলে তাহা অপেক্ষা অন্ততঃ সাতগুণ বেশী শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব। সুতরাং সঞ্চিত কয়লার দৈহিক পরিমাণ গত পঞ্চাশ বৎসরে না বাড়িলেও উপযোগিতার দিক দিয়া ইহার পরিমাণ প্রায় সাতগুণ বাড়িয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কয়লা হইতে শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার উপজাত দ্রব্যও (যথা, ক্রিয়োসোট, ন্যাপথালিন, স্যাকারিণ, আলকাতরা, পিচ ইত্যাদি) পাওয়া যাইতেছে। ফলে কয়লার উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য খনিজ পদার্থ সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়। পৃথিবীতে জমির পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই ; কিন্তু জলসেচ, সার, ভালো বীজ ও উন্নততর পদ্ধতির সাহায্যে জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে ; চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে আরও বাড়িবে। সুতরাং উপযোগিতার দিক দিয়া বিচার করিলে জমি বাড়িয়াছে বলিতে হইবে। আবহমানকাল ধরিয়া নদীতে জলস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। নদী হইতে মৎস্যশিকার, যাতায়াত-ব্যবস্থা ও পানীয় জলসংগ্রহ পূর্বেও হইত, এখনও হয়। কিন্তু আধুনিক কালে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের ব্যবস্থা হওয়ায় নদীতে স্রোতের পরিমাণ না বাড়িলেও মানুষের কাছে ইহার উপযোগিতা লক্ষগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। *বহুক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ব্যবহারের ফলে কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতির পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে।* ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে অরণ্যসম্পদ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর বুক হইতে অনেক পশু দ্রুত লোপ পাইতেছে।

প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য
(Significant Aspects of Nature)

প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন (Distribution of Natural Endowment)—পৃথিবীতে প্রাকৃতিক সম্পদ সকল অঞ্চলে সমানভাবে পাওয়া যায় না। মেরু অঞ্চল বাদ দিলে পৃথিবীর মোট স্থলভাগের শতকরা মাত্র ৪০ ভাগ জমি কৃষিকার্যের উপযোগী। ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জমির পরিমাণ আরও কম এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। চীনের হোয়াংহো, ইয়াং-সি-কিয়াং ও সিকিয়াং নদীর অববাহিকা, ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি অঞ্চল, উত্তর আফ্রিকায় নীলনদের উপত্যকা, পূর্ব ইউরোপের স্টেপ্‌স্‌, উত্তর আমেরিকার প্রেইরী, আর্জেন্টিনার পম্পাস্‌ ও অস্ট্রেলিয়ার ডাউনস অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কৃষি-জমি রহিয়াছে। কিন্তু মঙ্গোলিয়া, সিংকিয়াং, তিব্বত, বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান, আরব ও উত্তর আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ খুব সামান্য। প্রধান প্রধান খনিজ পদার্থের বণ্টনও অত্যন্ত অসমান: পৃথিবীর মোট কয়লার খুব সামান্য অংশই দক্ষিণ গোলার্ধে রহিয়াছে; উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে খনিজ তৈল নাই বলিলেই চলে। বিভিন্ন দেশে নানাপ্রকারের জলবায়ু দেখা যায়। ভূ-প্রকৃতি সর্বত্র একপ্রকার নহে। প্রাকৃতিক সম্পদের এই **অসমান বণ্টনের** ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক উন্নতি ও জীবনযাত্রার মানে তারতম্য দেখা যায়। অবশ্য প্রকৃতির সহিত মানুষের এই সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ নহে। নানাপ্রকার জটিল উপাদানের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এই সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, নিউ ইয়র্কের অতি আধুনিক জটিল সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব খুব স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নহে। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, কারিগরী ও সাংগঠনিক অগ্রগতির ফলে এই সম্পর্ক জটিল ও অস্পষ্ট।

প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন শুধু অসমান নহে, বিভিন্ন সম্পদের বণ্টন **বিভিন্ন হারে অসমান**; যথা:

(ক) কোন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায় (Ubiquities); যেমন, বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন।

(খ) কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদ সর্বত্র পাওয়া না গেলেও অনেক

জায়গায় পাওয়া যায় (Commonalities); যেমন, কৃষিযোগ্য ভূমি ও অরণ্যসম্পদ।

(গ) কোন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ দুষ্প্রাপ্য (Rarities); পৃথিবীর মাত্র অল্প কয়েকটি স্থানেই ইহা পাওয়া যায়; যথা, মলিবডেনাম (পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত হয়), নিকেল (মোট উৎপাদনের শতকরা ৭৫ ভাগ কানাডায় পাওয়া যায়), টিন (অধিকাংশ টিন মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় পাওয়া যায়) ইত্যাদি।

(ঘ) কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদ শুধু একটিমাত্র স্থানেই পাওয়া যায় (Uniquities); যেমন, বাণিজ্যিক ক্রায়োলাইট শুধু গ্রীনল্যাণ্ডেই পাওয়া যায়।

কোন প্রাকৃতিক সম্পদ কি পরিমাণে কোন্ কোন্ জায়গায় পাওয়া যায় তাহা নানাদিক দিয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অধিকাংশ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য একাধিক প্রাকৃতিক সম্পদের **একত্র সমাবেশ** প্রয়োজন। যেমন, লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের জন্য প্রধানতঃ প্রয়োজন লৌহ আকরিক ও কয়লা। লৌহ আকরিক ও কয়লা পৃথকভাবে বহুস্থানে পাওয়া গেলেও, ইহাদের পাশাপাশি অবস্থান কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ।

কোন প্রাকৃতিক সম্পদ কোথাও সঞ্চিত থাকিলেই যে তাহা ব্যবহার করা যাইবে তাহা নহে। সকল উৎপাদনের ক্ষেত্রেই **খরচের প্রশ্ন** বড় হইয়া দেখা দেয়। সুতরাং সঞ্চিত সম্পদ সংগ্রহ করিতে হইলে কি পরিমাণ অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় হইবে তাহার উপরেই ইহার ব্যবহার নির্ভর করিবে।

বর্তমান পৃথিবীতে কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ খুব অল্প; যেমন, টিন। আবার কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদ মোট পরিমাণের দিক দিয়া কম না হইলেও এবং পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গায় পাওয়া গেলেও উৎপাদন-খরচের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ সহজলভ্য নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে অল্পবিস্তর বক্সাইট পাওয়া যায়। অথচ বক্সাইট হইতে অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন-খরচ অত্যন্ত বেশী; কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের বাজারদর তেমন বেশী নহে। ফলে যে সকল স্থানে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বক্সাইট একসঙ্গে অধিক পরিমাণে সহজে পাওয়া যায় সেই সকল স্থানেই ইহা সংগ্রহ করা হয়। যে সকল বক্সাইটে খাঁটি অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম তাহা উত্তোলন করিলে খরচ পোষাইবে না। সুতরাং অন্যনিরপেক্ষভাবে অ্যালুমিনিয়াম

সুলভ হইলেও আপেক্ষিক ভাবে ইহা দুর্লভ; অর্থাৎ ব্যবহারোপযোগী অ্যালুমিনিয়াম অনেক কম।

সকল প্রাকৃতিক সম্পদের **গুরুত্ব** সমান নহে। অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় সম্পদ দুর্লভ হইলে যতটা চিন্তার কারণ হইবে, অবশ্য-ব্যবহার্য জিনিস দুর্লভ হইলে তাহা অপেক্ষা বেশী চিন্তার কারণ হইবে।

সঞ্চিত সম্পদ ও প্রবহমান সম্পদ (Flow and Fund Resources) —কোন্ প্রাকৃতিক সম্পদ কোথায় কি পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করিবার সময় ইহাদের স্থায়িত্ব (Permanency) বা ক্ষয়িষ্ণুতার (Exhaustibility) প্রশ্নটি ও বিবেচনা করা প্রয়োজন। কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ফলে কমিয়া যায় না, ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে পূরণ হয়। এইগুলিকে বলা হয় প্রবহমান সম্পদ (Flow Resources)। জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ, সূর্যকিরণ প্রভৃতি প্রবহমান সম্পদ। উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করিলে অরণ্য ও মৃত্তিকাও প্রবহমান সম্পদ। আর এক শ্রেণীর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যেগুলি যে পরিমাণে ব্যবহার করা হয় সেই পরিমাণে স্থায়িভাবে কমিয়া যায়। যেমন, কয়লা, খনিজ তৈল ইত্যাদি। ইহাদের বলা হয় সঞ্চিত সম্পদ (Fund Resources)। প্রবহমান সম্পদ অপেক্ষা সঞ্চিত সম্পদ দুর্লভ হইলে মানুষের দুশ্চিন্তার কারণ হয়। অবশ্য **সকল সঞ্চিত সম্পদই ক্ষয়িষ্ণু (Exhaustible) নহে**। কয়লা পোড়াইলে নিঃশেষ হইয়া যায়; কিন্তু লৌহ হইতে নির্মিত দ্রব্যাদি (যথা, যন্ত্রপাতি, সেতু ইত্যাদি) বহুদিন টেঁকে এবং ব্যবহারের অনুপযোগী হইলে ঐগুলি গলাইয়া আবার নূতন জিনিস প্রস্তুত করা যায়।

শক্তিসম্পদের মধ্যে কয়লা ও তৈল ক্ষয়িষ্ণু বলিয়া বর্তমানে ইহাদের ব্যবহার কমাইয়া প্রবহমান শক্তির (যথা, জলবিদ্যুতের) ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং অন্যান্য প্রবহমান শক্তি (যথা, সূর্যশক্তি) ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা হইতেছে। মানব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে এই সকল প্রয়াসের সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

শক্তি
(Energy)

প্রকৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান শক্তি। সমস্ত উৎপাদনমূলক কাজের মূলে রহিয়াছে শক্তি। মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা

যায় যে, মূলতঃ উহার পিছনে রহিয়াছে নূতন নূতন শক্তির উৎসের আবিষ্কার ও উৎপাদনকার্যে তাহার ব্যবহার। সর্বপ্রথমে মানুষ জীবনধারণের জন্য কেবলমাত্র নিজের পেশীশক্তির উপর নির্ভর করিত। তারপর ধীরে ধীরে সে পশুকে বশ করিতে শিখে এবং সমস্ত উৎপাদনকার্য পশু ও মানুষের পেশীশক্তির ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠে। প্রাচীন মিশর, ভারত, চীন ও অন্যান্য স্থানের **উদ্ভিদ-সভ্যতা** (Vegetable civilization) এইরূপ মানুষ ও পশুর শক্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে মানুষ বৃহৎ যন্ত্রের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে কয়লা, খনিজ তৈল, জলবিদ্যুৎ প্রভৃতি উন্নততর শক্তির উৎস আবিষ্কার ও উৎপাদনকার্যে ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছে। ইহার ফলে মানুষের উৎপাদন-ক্ষমতা অবিশ্বাস্যরকমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদন-খরচ বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং মানুষের শ্রমের ভার লাঘব হইয়াছে।

পদার্থ ও শক্তি (Matter and Energy)—পূর্বে পদার্থ ও শক্তির মধ্যে যে ভেদরেখা টানা হইত বর্তমানে তাহা আর হয় না। পদার্থকে শক্তিরই প্রকাশ বলিয়া মনে করা হয়। শক্তিকে পদার্থে ও পদার্থকে শক্তিতে পরিণত করিবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদন এই আবিষ্কারের ফল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ পদার্থ ও শক্তির মধ্যে আজ আর কোন ভেদরেখা না টানিলেও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে পদার্থ ও শক্তি দুই ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। সেইজন্য খনিজ তৈল শক্তি হইলেও যে ঘন কালো তরল পদার্থ খনি হইতে উত্তোলন করা হয় এবং জাহাজে, রেলগাড়ীতে করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয় এবং ইহা হইতে উৎপাদিত যে শক্তির সাহায্যে মোটর-গাড়ী, বিমানপোত, কলকারখানা প্রভৃতি চালানো হয় তাহা সাধারণের দৃষ্টিতে এক নহে। একই খাদ্য একদিকে আমাদের দেহ গঠন করে অন্যদিকে কর্মশক্তি সৃষ্টি করে।

জৈবশক্তি ও জড়শক্তি (Animate and Inanimate Energy)—শক্তিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। গাছ, পশু, ব্যাক্‌টিরিয়া, ছত্রাক-জাতীয় উদ্ভিদ ইত্যাদি জীবন্ত পদার্থের (Living Organism) মধ্য দিয়া যে শক্তির প্রকাশ তাহাকে জৈবশক্তি (Animate energy) বলে। কয়লা, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস, জলপ্রবাহ প্রভৃতি জড়পদার্থ (Non-living matter) হইতে যে শক্তি উৎপন্ন করা হয় তাহা জড়শক্তি (Inanimate energy)।

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, জৈবশক্তিই হউক আর জড়শক্তিই হউক সূর্যই সকল শক্তির উৎস। পশু ও মানুষ শক্তি সংগ্রহ করে খাদ্য হইতে। এই খাদ্য আসে উদ্ভিদজগৎ হইতে। উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধি আবার নির্ভর করে সৌরশক্তির উপর। সুতরাং **সূর্যই শক্তির মূল উৎস।** সূর্যদেহে প্রতিনিয়ত হাইড্রোজেন-কণা হিলিয়ামে পরিণত হইবার ফলে প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদিত হইতেছে। এই শক্তি উদ্ভিদের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটাইতেছে। পশু এই উদ্ভিদ খাদ্যহিসাবে গ্রহণ করিয়া, এবং মানুষ উদ্ভিদ ও পশু উভয়কেই খাদ্যহিসাবে গ্রহণ করিয়া জৈবশক্তি উৎপাদন করিতেছে। এই প্রক্রিয়া অন্তহীনভাবে চলিয়াছে। এই কারণে **জৈবশক্তি প্রবহমান সম্পদ (Flow resource)**।

কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি জড়শক্তির উৎস ও সূর্য। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে ভূগর্ভে প্রোথিত উদ্ভিদদেহ হইতে কয়লা ও খনিজ তেলের সৃষ্টি হইয়াছে; এই উদ্ভিদদেহ যে সূর্যকিরণের দ্বারা গঠিত হয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি জড়শক্তি সঞ্চিত সৌরশক্তি। এই কারণে ইহারা **ক্ষয়িষ্ণু** (exhaustible) এবং ইহাদিগকে **সঞ্চিত সম্পদ (Fund resource)** বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। অবশ্য জলপ্রবাহ হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জড়শক্তি হইলেও ক্ষয়িষ্ণু নহে। জলবিদ্যুৎ প্রবহমান সম্পদ।

জৈবশক্তির দুইটা দিক রহিয়াছে—(১) **পেশীশক্তি (Muscular energy)** ও (২) **প্রাণশক্তি (Biotic energy)**। যে শক্তির সাহায্যে ঘোড়া গাড়ী টানে, গাধা মাল বহন করে, হাতী বড় বড় কাঠের গুঁড়ি গাড়াতে বোঝাই করে তাহা পেশীশক্তি। প্রাণের সৃষ্টি ও বৃদ্ধির মধ্য দিয়া যে শক্তির প্রকাশ তাহা হইল প্রাণশক্তি। এই শক্তির বলেই বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়, অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হয়, বৃক্ষ শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া উঠে, ফুল ও ফল ধারণ করে। সেইভাবে পশু ও মানুষের সন্তান-উৎপাদন এবং সেই সন্তানের পূর্ণতাপ্রাপ্তি প্রাণশক্তির ফল। পেশীশক্তি প্রাণশক্তির উপর নির্ভরশীল। একটা ঘোড়াকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবেই তাহাকে দিয়া কাজ করানো যাইবে। পশু বা মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ করে তাহার অধিকাংশ প্রাণধারণ ও বৃদ্ধিসাধনের জন্য খরচ হয়; অল্প অংশমাত্র পাওয়া যায় কর্মশক্তি সৃষ্টির জন্য। **জড়শক্তির তুলনায় জৈবশক্তি নিকৃষ্ট।** কোন একটি পশু বা একজন মানুষে শক্তির পরিমাণ অতি সামান্য;

ফলে পশু ও মানুষের মাথাপিছু উৎপাদন-ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। একটি রেলের ইঞ্জিন যে পরিমাণ মাল টানিয়া লয় সেই পরিমাণ মাল বহন করিতে কতসংখ্যক মানুষ বা পশুর প্রয়োজন হইবে? পশু বা মানুষের সাহায্যে, তাহা যত অধিকসংখ্যকই হউক না কেন, শব্দের চেয়ে দ্রুতগতি বিমান চালানো সম্ভব নয়। কোন শ্রমিক বা পশু যন্ত্রের মতো না থামিয়া চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করিতে পারে না। মানুষ বা পশুর কাজ যন্ত্রের মতো কাঁটায় কাঁটায় নির্ভুল হওয়া প্রায় অসম্ভব। জড়শক্তির তুলনায় পেশীশক্তির খরচ অনেক বেশী। শিল্পোন্নত দেশসমূহে গড়পড়তা হিসাবে জড়শক্তির তুলনায় পশুশক্তির খরচ ৩০ হইতে ১০০ গুণ এবং মনুষ্যশক্তির খরচ ৩০০ হইতে ১০০০ গুণ বেশী। অনুন্নত দেশসমূহে মনুষ্যশক্তি অপেক্ষাকৃত সুলভে পাওয়া যায়।

আমাদের খাদ্য ও পরিধেয়ের প্রায় সবটাই পাওয়া যায় বৃক্ষ, ফুল, ফল, মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রকাশিত প্রাণশক্তি হইতে। বাসস্থানের সরঞ্জাম, তৈজসপত্র ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য অনেক জিনিস ইহা হইতে পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া শিল্পবিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগের অর্থাৎ **কৃষিপ্রধান সমাজের অর্থনীতি** মূলতঃ পেশীশক্তি ও প্রাণশক্তির অর্থাৎ **জৈবশক্তির উপর নির্ভরশীল** ছিল। কয়লা, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি জড়শক্তির ব্যবহার প্রধানতঃ শিল্পবিপ্লবের সময় হইতেই আরম্ভ হয়। **জড়শক্তির ব্যবহার শিল্পপ্রধান সমাজের বৈশিষ্ট্য।** (এই বিষয়টি শক্তিসম্পদ অধ্যায়ের 'শক্তি-ব্যবহারের অর্থনৈতিক তাৎপর্য' অংশে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।)

মনুষ্যশক্তি (Human Energy)—শক্তির ক্ষেত্রে মনুষ্যশক্তির স্থান অতুলনীয়। মনুষ্যশক্তি দুইরূপে প্রকাশিত হয়: **(১) দৈহিক শক্তি, (২) মনঃশক্তি** বা **চিন্তাশক্তি**। দৈহিক শক্তিতে মানুষ জড়শক্তি-চালিত যন্ত্র ও পশুর তুলনায় নগণ্য। একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক টন কয়লা হইতে উৎপাদিত শক্তি যন্ত্রের সাহায্যে যে পরিমাণ কাজ করিবে এক সহস্র মানুষের পক্ষেও তাহা সম্ভব হইবে না। উপরন্তু ঐ মানুষগুলির যে আহার্যের প্রয়োজন হইবে তাহার মূল্য এক টন কয়লা অপেক্ষা অনেক বেশী।

কিন্তু মনঃশক্তিতে মানুষ অনন্য। একজন মানুষের চিন্তা, আবিষ্কার, উদ্যোগ ও আকাঙ্ক্ষা সভ্যতার অগ্রগতিতে যে প্রেরণা যোগাইতে পারে, পৃথিবীর সমস্ত কয়লা বা তৈলের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। মানুষের প্রকৃত

শক্তির উৎস তাহার মস্তিষ্ক—পেশী নহে, এবং এই মস্তিষ্কের ক্ষমতায় জীবজগতে তাহার তুলনা নাই। মানুষের শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাহার চিন্তা, আবিষ্কার ও আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া এবং এই সকল কাজ মানুষ ছাড়া আর কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে। এই কারণে উৎপাদন-ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ও দক্ষ তখনই হইবে যখন মানুষ দৈহিক শ্রম হইতে মুক্ত হইয়া শুধু আবিষ্কার, পরিকল্পনা, সংযোগসাধন, নিয়ন্ত্রণ, সংগঠন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার কাজে নিযুক্ত থাকিবে; আর সমস্ত রকমের কায়িক শ্রমের কাজ করিবে পশু ও জড়শক্তি-চালিত যন্ত্র। মানুষ অধিকাংশ সময় দৈহিক শ্রমের কাজে নিযুক্ত থাকিলে তাহার চিন্তাশক্তির স্ফূর্তি ঘটিবে না। ফলে সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত হইবে। এইজন্য মানুষকে দৈহিক শ্রমের ভার হইতে মুক্তি দিতে হইবে যাহাতে সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, আবিষ্কার, পরিকল্পনা ও পরিচালনার কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখিতে পারে। কোন সমাজ মানুষকে এই সুযোগ কতটা দিতে পারে তাহার উপরেই সেই সমাজের উন্নতি ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

জৈবশক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সভ্যতাসমূহের সর্বপ্রধান ত্রুটি হইল এই সকল সভ্যতায় অধিকাংশ মানুষ প্রায় সর্বক্ষণ কায়িক শ্রমের কাজে নিযুক্ত থাকিত। ফলে চিন্তাশক্তি-বিকাশের সুযোগ মুষ্টিমেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতায় জড়শক্তি-চালিত যন্ত্র মানুষের কায়িক শ্রমের ভার; এমনকি কিছু কিছু মানসিক শ্রমের ভারও নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লওয়ায় ব্যাপকভাবে মানুষের চিন্তাশক্তি-বিকাশের সুযোগ ঘটিয়াছে।

জড়শক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Inanimate Energy)—জৈবশক্তির তুলনায় জড়শক্তি অর্থাৎ কয়লা, তৈল, জলপ্রবাহ, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতিতে শক্তি অনেক ঘনীভূতরূপে পাওয়া যায়। জড়শক্তি নিয়ন্ত্রণ করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। জড়শক্তির সাহায্যে অতিকায় যন্ত্রসমূহ প্রচণ্ড শক্তিতে ও গতিতে চালানো যায় যাহা জৈবশক্তির দ্বারা সম্ভব নহে। পশু বা মানুষের পেশীশক্তির সাহায্যে দ্রুতগতি বিমান বা বিশ-ত্রিশ হাজার টনের দ্রুতগামী জাহাজ চালানো আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ-স্থাপন এবং চন্দ্রগ্রহে রকেট-প্রেরণ জড়শক্তি ব্যতীত কোন দিনই সম্ভব হইত না। জড়শক্তি ব্যবহার করিতে হইলে একদিকে ধাতুনির্মিত মূল্যবান্ যন্ত্রপাতি অন্যদিকে উচ্চস্তরের প্রযুক্তিবিদ্যা (technical knowledge) এবং অনুকূল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রয়োজন। এই সকল

যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর জন্য নানারূপ খনিজ পদার্থ বিশেষ করিয়া লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতব খনিজ প্রয়োজন। আবার এই সকল খনিজ পদার্থ ব্যাপকহারে উত্তোলন, নিষ্কাশন ও ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য কয়লা বা তৈলের ন্যায় জড়শক্তি প্রয়োজন। শক্তিচালিত যন্ত্র এমন সূক্ষ্ম, নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে কাজ করিতে পারে যাহা মানুষ বা পশুর পক্ষে অসম্ভব। জড়শক্তি ব্যবহারের ফলেই শ্রমবিভাগ, শ্রমবিশেষীকরণ, স্ট্যানডার্ডাইজেসন ও র‍্যাশানালাইজেসন সম্ভব হইয়াছে। মানুষের উৎপাদন-ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, উৎপাদন-খরচ বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং মানুষের শ্রমের ভার লাঘব হওয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ললিতকলা-চর্চার অধিকতর সুযোগ ঘটিয়াছে; ইহা সভ্যতার অগ্রগতি দ্রুততর করিয়াছে। (এই বিষয়টি 'শক্তিসম্পদ' অধ্যায়ে 'শক্তি-ব্যবহারের অর্থনৈতিক তাৎপর্য' অংশে আরও বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।)

ভূমির পরিবর্তনশীল ভূমিকা
(Changing Role of Land)

ভূমি-ব্যবহারের সম্ভাবনা (Land-use potentials)—সমগ্র পৃথিবী স্থলভাগ ও জলভাগে বিভক্ত। মহাদেশসমূহ, সাগর-মহাসাগরে অবস্থিত অসংখ্য দ্বীপ ও মেরু অঞ্চল লইয়া স্থলভাগ গঠিত। স্থলভাগ বিভিন্নভাবে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়:

(১) গ্রাম, নগর, রাস্তাঘাট, কল-কারখানা ও বাসস্থান নির্মাণের জন্য;

(২) বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল হিসাবে;

(৩) পশুপালন ও কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য;

(৪) পদার্থের রূপান্তরপ্রাপ্তির প্রধান কারক হিসাবে; যেমন, ভূগর্ভে চাপ ও তাপের ক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদদেহ কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে;

(৫) খনিজ পদার্থের সর্বপ্রধান উৎস হিসাবে। ইহা ছাড়া ভূপৃষ্ঠ তুষার, সূর্যরশ্মি, বৃষ্টিপাত ও জলবায়ুর অন্যান্য উপাদান নিজদেহে গ্রহণ করিয়া মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করে।

পৃথিবীতে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ। অবশ্য এই সীমাবদ্ধ ভূমির কতটা কিভাবে সদ্ব্যবহার করা যাইবে তাহা নির্ভর করে মানুষের উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার উপর। পৃথিবীতে

স্থলভাগের মোট আয়তন প্রায় ১৫ কোটি বর্গ-কিলোমিটার। ইহার মধ্যে ১'৫ কোটি বর্গ-কিলোমিটার ভূমি মেরু অঞ্চলে অবস্থিত। অবশিষ্ট ১৩'৫ কোটি বর্গ-কিলোমিটার ভূমির মধ্যে কৃষি-বিশেষজ্ঞগণের অভিমত অনুযায়ী ৫'৫ বর্গ-কিলোমিটার ভূমি কৃষিকার্যের উপযোগী বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ভূমি (Two-Dimensional and Three-Dimensional Land)—গতিশীল জগতে ভূমির ভূমিকাও রূপান্তরিত হইয়াছে। শিল্পবিপ্লবের পূর্বপর্যন্ত প্রকৃতিকে কাজে লাগাইবার প্রচেষ্টা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভূমি বলিতে দ্বিমাত্রিক ভূমি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমন্বিত ভূমির উপরিভাগকেই বুঝাইত। এই **দ্বিমাত্রিক ভূমি (Two-Dimensional Land)** মৃত্তিকারূপে প্রধানত: কৃষি ও পশুপালনে ব্যবহৃত হইত। ভূমির উর্বরতার উপর কোন দেশের উন্নতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ নির্ভর করিত। এই অবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদ বলিতে সাধারণভাবে ভূমিকেই বুঝাইত। কারণ মানুষের যাহা-কিছু প্রয়োজন তাহার অধিকাংশই ভূমি হইতে সংগ্রহ করা হইত। কৃষিকার্য, পশুপালন, অরণ্যসম্পদ আহরণ ইত্যাদি সেকালের অধিকাংশ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ছিল মৃত্তিকার দান। কাহার অধীনে কি পরিমাণ ভূমি আছে তাহার দ্বারাই কে কতটা প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক তাহা বুঝানো হইত। কৃষিপ্রধান যুগে এই ভূমির উপর ভিত্তি করিয়া পৃথিবীর সকল দেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যবস্থায় অধিকাংশ মানুষ ছিল ভূমির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং ভূমির মালিকানার উপর নির্ভর করিত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভূমির কার্যকারিতাও পরিবর্তিত হইয়াছে। যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি জড়শক্তি, এবং এই সকল শক্তিসম্পদ উৎপাদন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগের জন্য লৌহ, তাম্র প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতু উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। ফলে ভূগর্ভের অজানা জগতে মানুষ প্রবেশ করিয়াছে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ সংগ্রহের জন্য। তাই বর্তমানে ভূমির ব্যবহার শুধু ইহার উপরিভাগে বা মৃত্তিকায় সীমাবদ্ধ নহে। অধিকাংশ খনিজ সম্পদের আধার ভূগর্ভও সমানভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। কেবল মাটির নীচের দিকে নহে, উপরের দিকেও মানুষের হস্ত প্রসারিত হইয়াছে। বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা হইতেছে,

সূর্যরশ্মি কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূমি বলিতে আজকাল শুধু দৈর্ঘ্যপ্রস্থ-সমন্বিত দ্বিমাত্রিক ভূমি বুঝায় না, ইহার সহিত ঘনত্বও যুক্ত হইয়াছে। তাই ভূমি বর্তমানে **ত্রিমাত্রিক (Three-Dimensional Land)**। শিল্পবিপ্লবের পূর্বে ভূমি প্রধানতঃ ব্যবহার করা হইত কৃষিকার্য ও পশুপালনের জন্য। বর্তমানে কৃষি ও পশুপালন ব্যতীত খনিজ সম্পদ-সংগ্রহ, শক্তি-উৎপাদন ও অন্যান্য বহু কাজে ভূমি ব্যবহৃত হইতেছে। যে অঞ্চলের ভূগর্ভ হইতে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করা হয় তাহার আয়তনের তুলনায় ঐ পদার্থের গুরুত্ব অনেক বেশী হওয়ায় আজকাল নিছক হেক্টর বা বর্গ-কিলোমিটারের হিসাবে ভূমির পরিমাপ করা সম্ভবপর নয়।

ভূমির সীমাবদ্ধতা ও প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবর্তনশীলতা (Fixity of Land and Dynamics of Nature)—ভূমি বলিতে যখন দ্বিমাত্রিক ভূমি অর্থাৎ ভূমির উপরিভাগকে বুঝায়, তখন ইহা নির্দিষ্ট। কিন্তু যখন ভূমির অর্থ সকল রকমের প্রাকৃতিক সম্পদ, তখন ইহা আর নির্দিষ্ট নহে; ইহা তখন পরিবর্তনশীল। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রয়োগবিদ্যা ও সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারও পরিবর্তন ঘটে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে নিত্য নূতন প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কৃত হইতেছে। পুরাতন সম্পদ নূতন কাজে ব্যবহারের কিংবা অধিকতর সার্থকভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা হইতেছে। প্রথমে অ্যালুমিনিয়াম হইতে শুধু বাসনপত্র প্রস্তুত হইত; ক্রমে ইহা দ্বারা বিমানপোত, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতে থাকে। আজকাল অ্যালুমিনিয়ামের সাহায্যে যানবাহন, সেতু, গৃহাদির কাঠামো ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। আজ পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার শুধু জ্বালানি হিসাবে সীমাবদ্ধ নহে; ইহা হইতে কিটোন, অ্যাসিটোন, ইথার, ন্যাপথালিন, মোম প্রভৃতি নানাবিধ উপজাত দ্রব্য উৎপাদন করিয়া অসংখ্য কাজে ব্যবহার করা হইতেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম, প্রয়োগবিদ্যা ও সংগঠন পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ইহাদের সম্মিলিত ফল। পৃথিবীতে দ্বিমাত্রিক ভূমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ হইলেও ত্রিমাত্রিক ভূমি অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ নহে।

স্থূল অর্থে ভূমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ হইলেও **কার্যকারিতার** দিক হইতে বিচার করিলে ভূমি সীমাবদ্ধ নহে। ভারতে বর্তমানে এক হেক্টর জমিতে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হয়, ভালো বীজ, সার, জলসেচ, উন্নত কৃষিপদ্ধতি

ও যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে একই পরিমাণ জমি হইতে বর্তমানের তুলনায় বেশী ফসল পাওয়া যাইবে; অর্থাৎ কার্যকারিতার দিক হইতে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ছাড়া বিশেষ সামাজিক সংগঠন ও আইন একটি বিশেষ সময়ে জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে পারে এবং সেই আইন ও সংগঠনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভূভাগ মানুষের নিকট উন্মুক্ত হইয়া যায়। বিভিন্ন দেশে সামন্ত-তন্ত্রের যুগে আইন করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী জমি ব্যবহার করিতে কিংবা নূতন জমির সন্ধানে বাহির হইতে দেওয়া হইত না। ফলে জমির পরিমাণ ছিল নির্দিষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঔপনিবেশিকগণ আসিয়া প্রথমে দেশের পূর্বদিকে বসতি স্থাপন করে। সেই সময় ইহাদের ব্যবহারে যে জমি ছিল গৃহযুদ্ধের পর হইতে পশ্চিমদিকে বসতিবিস্তারে কার্যতঃ কোন বাধা না থাকায় ব্যবহারযোগ্য জমির পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জমির পরিমাণের বিষয় যখন বিবেচনা করা হইবে তখন একটি নির্দিষ্ট স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা করিতে হইবে।

ভূমির কৃষিযোগ্যতা
(Cultivability of Land)

কৃষিযোগ্যতার সীমা (Agricultural Limitations)—গত দেড় শত দুই শত বৎসরে যন্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছে এবং তুলনামূলকভাবে কৃষিকার্যের গুরুত্ব সেই অনুপাতে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু অন্যদিকে পৃথিবীতে জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কোন কোন অঞ্চলে এই বৃদ্ধির হার একটা বিস্ফোরণের পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দ্রুতবর্ধমান এই লোক-সংখ্যার খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য কৃষিযোগ্য কি পরিমাণ জমি পৃথিবীতে আছে তাহা নির্ধারণ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীতে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ। অবশ্য এই সীমাবদ্ধ ভূমির কতটা কিভাবে সদ্ব্যবহার করা যাইবে তাহা নির্ভর করে মানুষের উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার উপর। পৃথিবীতে স্থলভাগের মোট আয়তন প্রায় ১৫ কোটি বর্গ-কিলোমিটার। ইহার মধ্যে ১'৫ কোটি বর্গ-কিলোমিটার ভূমি মেরু অঞ্চলে অবস্থিত। অবশিষ্ট ১৩'৫ কোটি বর্গ-কিলোমিটার ভূমির মধ্যে কৃষি-বিশেষজ্ঞগণের অভিমত অনুযায়ী ৫'৫ বর্গ-

কিলোমিটার ভূমি কৃষিকার্যের উপযোগী বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু কি পরিমাণ জমি কৃষিকার্যের জন্য পাওয়া যাইতে পারে তাহার হিসাব করিবার সময় একথা মনে রাখা দরকার যে, কিছু পরিমাণ জমি আছে যাহাতে মানুষের বর্তমান জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী কোন কিছু উৎপাদন, করা সম্ভব নহে। আবার কিছু জমিতে উৎপাদন সম্ভব হইলেও তাহা এত কম যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া কৃষকের পক্ষে স্থায়িভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব নহে ; ফলে সেই জমি কাগজপত্রে কৃষিকার্যের উপযোগী হইলেও কার্যতঃ নহে। ভূমির কৃষিযোগ্যতা (অর্থাৎ কি পরিমাণ জমি কৃষিকার্যের উপযোগী) নিম্নলিখিত চারিটি **প্রাকৃতিক উপাদানের (Physical factors)** উপর নির্ভর করে :

(ক) **উত্তাপ (Temperature)**—মনুষ্যজীবনের ন্যায় উদ্ভিদজীবনের অস্তিত্ব ও বৃদ্ধির জন্য একটা নিম্নতম তাপমাত্রা প্রয়োজন। মেরু অঞ্চলে এই নিম্নতম উত্তাপ পাওয়া যায় না বলিয়াই কৃষিকার্য সম্ভব নহে। কৃষিকার্য সম্পর্কে কোন অঞ্চলের তাপমাত্রা বিবেচনা করিবার সময় বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা এবং শরৎকালে কখন তুষারপাত শুরু হয় ও বসন্তকালে কখন উহা শেষ হয় তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(খ) **আর্দ্রতা (Moisture conditions)**—বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ও বাষ্পীভবনের হার ইত্যাদিকে এখানে আদ্রতা নামে অভিহিত করা হইতেছে। উদ্ভিদজীবনের জন্য নিম্নতম পরিমাণ আর্দ্রতা প্রয়োজন। কোথাও এই আর্দ্রতা না থাকিলে কৃষিকার্য সম্ভব নহে। নিম্নতম আর্দ্রতা না থাকিবার জন্যই মরু অঞ্চল কৃষিযোগ্য নহে।

(গ) **মৃত্তিকা (Soil)**—মনুষ্যজীবনের ন্যায় উদ্ভিদজীবনের জন্যও খাদ্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। উদ্ভিদ এই খাদ্য সংগ্রহ করে মাটি হইতে। কৃষিকার্যের জন্য মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ গাছের খাদ্য থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ মাটি উর্বর হওয়া প্রয়োজন। মাটির গুণাগুণ বিবেচনা করিবার সময় উহার দৈহিক ও রাসায়নিক গঠন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করিতে হইবে।

(ঘ) **ভূ-প্রকৃতি (Landform or Topography)**—ভূগোলের সকল ছাত্রই জানে যে পার্বত্য অঞ্চলে কৃষিকার্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য অথবা একেবারেই অসম্ভব। অথচ সমভূমি অঞ্চলে ইহা সহজ ও সুলভ। একখণ্ড নীরস কঠিন প্রস্তরের উপর শস্য-উৎপাদন সম্ভব নহে।

উপরোক্ত চারিটি প্রাকৃতিক উপাদানের উপর কৃষিকার্য নির্ভরশীল; এইজন্য এই চারিটি উপাদানকে ভূমির কৃষিযোগ্যতার **প্রাকৃতিক চতুঃসীমা** (**Physical frontiers**) আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কৃষিকার্য এই চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ; অর্থাৎ উপযুক্ত উত্তাপ, আর্দ্রতা, ভূ-প্রকৃতি ও মৃত্তিকার উপর ভূমির কৃষিযোগ্যতা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

উপরোক্ত চারিটি উপাদান ব্যতীত **স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জও** (**Natural vegetation**) ভূমির কৃষিযোগ্যতা নির্ধারণে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ—বৃক্ষ ও তৃণ—আর্দ্রতা ও উর্বরতা সংরক্ষণে সাহায্য করে। যে মাটিতে কোনপ্রকার উদ্ভিদ্ নাই, তাহা শুষ্ক ও অনুর্বর হইয়া পড়ে এবং কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত হয়।

এই প্রাকৃতিক চতুঃসীমার জন্য সকল জমিকেই মানুষের কার্যে নিযুক্ত করা যায় না। একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টিকে আরও ভালোভাবে বুঝানো যাইবে। পৃথিবীর মোট ১৫ কোটি বর্গ-কিলোমিটার জমির মধ্যে গম-উৎপাদনের উপযোগী তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা এবং ভূ-প্রকৃতি দেখা যায় মাত্র ২ কোটি বর্গ-কিলোমিটার স্থানে।

ভূমির কৃষিযোগ্যতার সাংস্কৃতিক ও মানবিক সীমাবদ্ধতা (Cultural and Human Limitations of Cultivability)—প্রাকৃতিক চতুঃসীমার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কতটা জমিতে কিভাবে কৃষিকার্য করা যাইবে, তাহা নির্ভর করে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও সামাজিক সংগঠনের উপর। বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ও যন্ত্রশিল্পে উন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অপেক্ষাকৃত অনুন্নত চীনদেশের অবস্থার তুলনা করিলে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। কোন কোন ভৌগোলিকের হিসাব অনুযায়ী চীনে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ ২৮ কোটি হেক্টর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ কোটি হেক্টর। অন্যদিকে চীনে লোকবসতির ঘনত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশী এবং চীনদেশে যেখানে শতকরা ৮০ জন লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেখানে মাত্র শতকরা ২০ জন। অথচ চীনদেশে মাত্র ৯ কোটি হেক্টর জমিতে কৃষিকার্য হয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হয় ১৪ কোটি হেক্টর জমিতে।*

কৃষিযোগ্য ভূমির ভিত্তিতে চীনদেশে লোকবসতির ঘনত্ব মার্কিন

* এই হিসাবের মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে চীনে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা ধরা হয় নাই।

যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ৪'৫ গুণ বেশী হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিযোগ্য ভূমির শতকরা ৩৬ ভাগে প্রকৃতপক্ষে কৃষিকার্য হয় আর চীনে হয় শতকরা ৩১ ভাগ জমিতে। দুই দেশের মধ্যে এই পার্থক্যের প্রধান কারণ, কৃষিকার্যে জড়-শক্তির ব্যবহার। চীনদেশে কৃষিকার্য হয় প্রধানতঃ কৃষকের কায়িক শ্রমের সাহায্যে; কৃষিক্ষেত্রে পশুও ব্যবহৃত হয়। এই দেশে কৃষি-যন্ত্রপাতি ও কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি জড়শক্তির ব্যবহার নাই বলিলেই চলে। কৃষি-জমি প্রস্তুত করা হইতে শুরু করিয়া ফসল-কাটা, ঝাড়াই-করা প্রভৃতি প্রায় সকল কাজই কৃষকের দৈহিক শক্তির সাহায্যে করা হইয়া থাকে এবং এই শক্তি কৃষক সংগ্রহ করে কৃষিজাত দ্রব্য খাদ্যহিসাবে গ্রহণ করিয়া। অর্থাৎ চীন-দেশে কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি কৃষিক্ষেত্র হইতেই সংগ্রহ করা হয়। শুধু তাহাই নহে, কৃষিকার্যের জন্য দেশের অধিকাংশ লোকের প্রায় সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় দেশের এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে মানুষের যাতায়াতও কম। ইহার ফলে দেশটি হাজার হাজার প্রায়-স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ লইয়া গঠিত হইয়াছে।

যন্ত্রশক্তির তুলনায় কায়িক শ্রমের সাহায্যে ভূমিকর্ষণ করিতে ও ফসল কাটিতে অনেক বেশী সময় লাগে। এক হেক্টর জমি কোদাল দিয়া প্রস্তুত করিতে ছয়দিন সময় দরকার হয়। ফলে বৎসরের মধ্যে যে সময়টুকু কৃষিকার্যের উপযোগী তাহার একটা অংশ বৃথা নষ্ট হয়। এক বৎসরের মধ্যে ৬ মাস যদি কৃষিকার্যের উপযোগী হয় এবং ইহার মধ্যে ১/১½ মাস জমি প্রস্তুত করিতে এবং ১ মাস ফসল কাটিতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে ফসলের বৃদ্ধি ও পরিণতির জন্য পাওয়া যায় মাত্র ৩½/৪ মাস সময়। ইহার ফলে বিভিন্ন রকমের ফসলের চাষ সম্ভব হয় না। যন্ত্রের ব্যবহার না থাকিলেও চীনদেশে হেক্টর-প্রতি উৎপাদনের হার যথেষ্ট; কিন্তু মাথাপিছু উৎপাদন অত্যন্ত কম।

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হেক্টর-প্রতি উৎপাদনের হার কম হইলেও কৃষকের মাথাপিছু উৎপাদন খুব বেশী। ইহার প্রধান কারণ কৃষিকার্যে জড়-শক্তির ব্যবহার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিকার্য হয় ট্রাক্টর, হারভেস্টার প্রভৃতি কৃষি-যন্ত্রের সাহায্যে। এই সকল যন্ত্র চলে কয়লা, তৈল বা বিদ্যুতের ন্যায় জড়শক্তির সাহায্যে; অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি চীনের ন্যায় কৃষিক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করা হয় না। এই শক্তি আসে খনি হইতে। এই জড়শক্তির সাহায্যে একজন কৃষক একসঙ্গে শত শত হেক্টর জমি

চাষ করিতে ও ইহার ফসল তুলিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষক ফসল উৎপাদনের জন্য শুধু যে প্রত্যক্ষভাবে কয়লা, তৈল প্রভৃতি জড়শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতেছে তাহা নহে; তাহার কাজের পিছনে রহিয়াছে শত শত কল-কারখানা। এই সকল কারখানায় যন্ত্র ও শক্তির সাহায্যে কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৃষি-যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ছাড়া কৃষকের জন্য আছে অতি উন্নত সুসংগঠিত কৃষি-গবেষণাগারসমূহ, যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে নিত্য নূতন কৃষিপদ্ধতি ও ফসল আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু উৎপাদনের হার অত্যন্ত বেশী, কৃষিকার্যের গতি অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত এবং কৃষকের পক্ষে বহু বিচিত্র ফসল উৎপাদন করা সম্ভবপর। জড়শক্তি ও উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা রাশিয়ায় যে সকল জমি কৃষিকার্যের আওতায় আনা সম্ভব হইয়াছে, চীনদেশে (এবং কারিগরী বিদ্যায় অনুন্নত সকল দেশেই) অত্যধিক শীতল বা শুষ্ক আবহাওয়া বা ঐরূপ কোন প্রাকৃতিক বাধার জন্য সেইজাতীয় জমি এখনও পতিত রহিয়াছে।

বিনিময় অর্থনীতিতে ভূমির কৃষিযোগ্যতা (Cultivability in an Exchange Economy)—অনুন্নত দেশের কৃষক শস্য উৎপাদন করে প্রধানতঃ নিজের ও পরিবারের ব্যবহারের জন্য। উৎপাদনের খুব সামান্য অংশ বাজারে বিক্রয়ের জন্য অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় শিল্পোন্নত দেশে কৃষক ফসল উৎপাদন করে প্রধানতঃ বাজারে বিক্রয়ের জন্য। উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পায় তাহা দিয়া সে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস বাজার হইতে ক্রয় করে। সুতরাং যে সকল দেশে বিনিময় অর্থনীতি পরিপূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানে কতটা জমিতে চাষ করা হইবে তাহা নির্ভর করে ফসল উৎপাদনের খরচ ও ফসলের বিক্রয়মূল্যের উপর। বিক্রয়মূল্য যদি বেশ চড়া থাকে এবং উৎপাদিত ফসল কৃষিক্ষেত্র হইতে শহর ও বন্দর অঞ্চলে লইয়া যাইবার সুবিধা থাকে এবং পরিবহণের খরচ কম হয়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতেও ফসল উৎপন্ন হইবে। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রের সহিত বাজার অঞ্চলের যোগাযোগের ব্যবস্থা যদি ভালো না থাকে এবং উৎপাদিত ফসলের বিক্রয়মূল্য যদি কম হয় তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে কৃষিকার্য করিলে তাহা লাভজনক হইবে না। ফলে কিছু জমি পতিত থাকিয়া যাইবে। ফসল উৎপাদনের

খরচ শুধু জমির উৎপাদিকা-শক্তির উপর নির্ভর করে না। কৃষকের দক্ষতা, কৃষি-সংগঠনের দক্ষতা, কয়লা ও তৈলের ন্যায় জড়শক্তির ব্যবহার, কৃষিঋণ, জলসেচ, উন্নত বীজ, সার, যন্ত্রপাতি. কীটনাশক ঔষধপত্র পাইবার সুবিধা, যাতায়াতের সুব্যবস্থা প্রভৃতির উপরও উৎপাদন-খরচ নির্ভর করে। সুতরাং কি পরিমাণ জমিতে কৃষিকার্য করা সম্ভব হইবে তাহা একদিকে যেমন কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়মূল্যের উপর নির্ভর করে, অন্যদিকে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনের খরচের উপরও নির্ভর করে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ সকল দেশে সকল সময়ের জন্য নির্দিষ্ট নহে। যে দেশ শিল্প-বাণিজ্যে যত উন্নত, কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদায় যত সমৃদ্ধ, কৃষকের দক্ষতা, যাতায়াত-ব্যবস্থা, জলসেচ, উন্নত বীজ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি ও শক্তির সরবরাহে যত উন্নত, এককথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে যত অগ্রসর, সেই দেশে মোট স্থলভাগের তত বেশী অংশ কৃষিকার্যের আওতায় আসা সম্ভব হইয়াছে। পৃথিবীতে মানুষ যুগে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানে কারিগরী দক্ষতায় যত উন্নত হইবে, ততই অধিক পরিমাণে জমি কৃষিযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

প্রশ্নাবলী

1. **Discuss some of the paradoxes of nature.**

উঃ—'প্রকৃতির আপাতবিরোধী স্বভাব' (২৮ পৃঃ—৩০ পৃঃ) লিখ।

2. **"Nature is constant and also it is changing." Explain how it happens.**

উঃ—'প্রকৃতি—অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনশীল' (২৯ পৃঃ—৩০ পৃঃ) লিখ।

3. **Discuss some of the significant aspects of nature.**

উঃ—'প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ' (৩০ পৃঃ—৩৩ পৃঃ) লিখ।

4. **Discuss the pattern of distribution of natural endowment in the world and show how it has influenced the economic activities of man.**

উঃ—'প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন' (৩০ পৃঃ—৩৩ পৃঃ) লিখ।

5. **Attempt a comparative analysis of the characteristic features and merits and demerits of animate and inanimate energy.**

[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উঃ—'জৈবশক্তি ও জড়শক্তি' (৩৪ পৃঃ—৩৬ পৃঃ), 'মনুষ্যশক্তি' (৩৬ পৃঃ—৩৭ পৃঃ) এবং 'জড়শক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ' (৩৭ পৃঃ—৩৮ পৃঃ) লিখ।

6. What do you mean by Two-Dimensional and Three-Dimensional land? Also describe how land has changed its role as a factor of production.
[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com., 1963]

Or, Describe how the role of land in the economic activities of man has changed with the changes in human culture.

উঃ—'ভূমির পরিবর্তনশীল ভূমিকা' (৩৮পৃঃ— ৪১পৃঃ) লিখ।

7. Describe and explain with the help of specific examples the physical as well as the cultural and human limitations of culturability.
[B. U. Three-Year Degree Course, B Com., 1964]

Or, Discuss the factors which determine the cultivability of land with suitable examples.

উঃ—'ভূমির কৃষিযোগ্যতা' (৪১ পৃঃ—৪৬ পৃঃ) লিখ।

8. Discuss how cultivability of land is affected by the energy use.

Or, "A key to availability in general and to cultivability in particular is the use made of energy—more specially, inaminate energy"—Explain.

উঃ—'ভূমির কৃষিযোগ্যতার সাংস্কৃতিক ও মানবিক সীমাবদ্ধতা' (৪৩ পৃঃ— ৪৫ পৃঃ) লিখ।

9. Evaluate the land-use potentials in different parts of the world and discuss in this connection the agricultural limitations in terms of climate, soil, natural vegetation and land-form.
[C. U. Three-Year Degree Course B. Com., 1963]

উঃ—'কৃষিযোগ্যতার সীমা' (৪১ পৃঃ— ৪৩ পৃঃ) লিখ।

10. Attempt a comparative analysis of the characteristic features and the merits and demerits of animate and inanimete energy.
[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com., 1964]

উঃ—'শক্তি' (৩৩ পৃঃ—৩৮ পৃঃ) লিখ।

চতুর্থ অধ্যায়

মনুষ্য-সম্পদ

(Human Resources)

প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া নিজের অভাব পরিতৃপ্তির জন্য ইহা ব্যয় করে। শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলেই তাহা মানুষের ব্যবহার্য হয় না। ইহার সহিত মানুষের বুদ্ধি ও শ্রম যোগ করিলে তবেই ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়। বুদ্ধিবলে মানুষ নূতন আবিষ্কারের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদকে নূতন নূতন কার্যে নিয়োজিত করিয়াছে। জমি প্রাকৃতিক সম্পদ ; কিন্তু জমিতে বীজ বপন না করিলে ধান ও গম প্রভৃতি হইতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে না। আবার খনিজ সম্পদের আবিষ্কারের দ্বারা মানুষ প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছে। নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা কয়লা শুধু শক্তি-উৎপাদনের জন্যই ব্যবহৃত হইতেছে না, নানাবিধ উপজাত দ্রব্যাদি (আলকাতরা, পিচ, গ্যাস, অ্যামোনিয়া, স্যাকারিণ প্রভৃতি) কয়লা হইতে প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে মানুষের বুদ্ধি ও শ্রমের যোগাযোগ হইলেই ভোগ্যদ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে। এইভাবে দেখা যায় মানুষ নিজেই সম্পদ-উৎপাদনের একটি প্রধান অঙ্গ। অন্যদিকে উৎপাদিত সম্পদ মানুষই ভোগ করে। প্রকৃতির দান কৃষি-জমি হইতে মানুষ খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিয়া নিজেই তাহা খাইয়া জীবন ধারণ করে। সুতরাং মানুষ একদিকে সম্পদ উৎপাদনের অঙ্গ, অন্যদিকে সম্পদের ভোগকর্তা। সম্পদ-উৎপাদনে ও ব্যবহারে মানুষ এইভাবে **দ্বৈত ভূমিকা** (Dual Role) অবলম্বন করে।

ইহা ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে নিজের বুদ্ধিবলে ও কর্মপ্রচেষ্টায় নানাবিধ জিনিস প্রস্তুত করিয়া বা আবিষ্কার করিয়া মানুষ প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। সৃষ্টির আনন্দ ব্যবহারের আনন্দের চেয়ে কম নহে। নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে মানুষের শ্রমের লাঘব হওয়ায় অবসর বিনোদনের জন্য মানুষ ক্রমশঃই বেশী সময় পাইতে থাকে। অবসর সময়ে মানুষ চিত্তবিনোদন করিয়া, কলাচর্চা করিয়া বা শিক্ষার প্রসার করিয়া সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করে।

মানুষ ও জমির অনুপাত এবং লোকবসতি-ঘনত্ব (Man-Land Ratio and Population Density)—সম্পদ-উৎপাদনে জমির দান অসামান্য। জমির সাহায্যে মানুষ কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন করে ও ভূগর্ভ হইতে খনিজ সম্পদ আহরণ করে। জমি হইতে এই সকল সম্পদ উৎপন্ন হইলেও, সকল সময় জমির মোট পরিমাণ বেশী হইলেই বেশী সম্পদ উৎপন্ন হইবে না, কারণ সকল জমি মানুষের প্রয়োজনে আসে না। কানাডার তুন্দ্রা অঞ্চল, মিশরের মরু অঞ্চল সম্পদ-উৎপাদনে মানুষকে সাহায্য করে না। অন্যদিকে মানুষের কর্মক্ষমতা থাকিলেই সম্পদ উৎপন্ন হইবে না. প্রকৃতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে ইহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। মানুষের কর্মক্ষমতা এবং জমির উৎপাদিকা-শক্তির অনুপাতের উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। জমির পরিমাণ লোকসংখ্যাব তুলনায় অপর্যাপ্ত হইলে দেশের উন্নতি ব্যাহত হইবে; অন্যদিকে লোকসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ বেশী হইলে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি সহজসাধ্য হইবে।

এখানে জমি বলিতে সমগ্র ভূমিভাগকেই বুঝাইবে না, শুধু **কার্যকরী জমিকে** বুঝাইবে। যে জমি হইতে মানুষ সম্পদ উৎপাদন করিতে পারে, তাহাকেই কার্যকরী জমি বলা হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ উর্বর জমি থাকিবার জন্য ঐ দেশ ১৮ কোটি লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছে। অন্যদিকে ব্রেজিলের আয়তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা বেশী হইলেও, জমি অনুর্বর বলিয়া এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য এই দেশের মাত্র ৬½ কোটি লোকের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয় নাই।

লোকবসতি-ঘনত্বের (Population Density) সঙ্গে মানুষ ও জমির অনুপাতকে (Man-land ratio) কখনই একভাবে দেখা উচিত নহে। লোকবসতির ঘনত্ব বলিতে আমরা বুঝি মোট জমি ও লোকসংখ্যার অনুপাত; কিন্তু মানুষ ও জমির অনুপাত বলিতে আমরা বুঝি লোকসংখ্যার সঙ্গে 'কার্যকরী জমি'র অনুপাত। এক্ষেত্রে কার্যকরী জমির সঙ্গে দেশের সমগ্র প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। সাধারণতঃ যে জমিকে সম্পদ-উৎপাদনে নিয়োজিত করা যায় বা যে জমি মানুষের ব্যবহারে প্রয়োজন হয়, তাহাই কার্যকরী জমি। যেমন, মিশরের লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ২৬ জন; কিন্তু এই দেশের মোট আয়তন হইতে বসতিহীন মেরু অঞ্চল বাদ দিলে কার্যকরী জমির (নীলনদের উপত্যকা)

পরিমাণ দাঁড়াইবে মাত্র ৩৪,৮১৫ বর্গ-কিলোমিটারে। এই কার্যকরী জমির সঙ্গে সমগ্র দেশের লোকসংখ্যার অনুপাত প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৭৫০ জন। এক্ষেত্রে মিশরের প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে লোকবসতির ঘনত্ব ২৬ জন এবং মানুষ ও কার্যকরী জমির অনুপাত ৭৫০ জন। সুতরাং কোন দেশের শুধু আয়তন ও লোকসংখ্যা বিচার করিয়াই সেই দেশকে অত্যধিক ঘনবসতি-যুক্ত বা বিরল-বসতিযুক্ত অঞ্চল বলা যায় না। কোন দেশের মানুষ-জমির অনুপাত বুঝিতে হইলে দেশের কার্যকরী জমি, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং উৎপাদনক্ষম মানুষের সংখ্যার বিচার করিতে হইবে। অনেকে চীনদেশকে একটি অত্যধিক ঘনবসতিযুক্ত অঞ্চল বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু চীনের জমির উর্বরতা ও কার্যকারিতা এবং চীনাদের অধ্যবসায় ও কর্মক্ষমতা বিচার করিলে দেখা যায় আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে চীন মোটেই অত্যধিক বসতিযুক্ত দেশ নহে; কার্যকরী জমির তুলনায় এখানকার লোকসংখ্যা অধিক নহে।

জমির কার্যকারিতা **গতিশীল** মানব-সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়াছে। সভ্যতার বিকাশের প্রথমার্ধে মানুষ জমি হইতে শুধু কৃষিজ সম্পদ উৎপন্ন করিত এবং বনজ সম্পদ সংগ্রহ করিত। সেই সময়ে জমির কার্যকারিতা বলিতে শুধু জমি হইতে উৎপন্ন কৃষিজ ও বনজ দ্রব্যকেই বুঝাইত। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জমির অভ্যন্তরস্থ খনিজ সম্পদ আহরণ করিতে শিখিল। বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য মানুষের বিভিন্ন চাহিদা মিটাইতে শুরু করিল। এই সময় ভূমি বলিতে **ত্রিমাত্রিক ভূমি** বুঝাইত। খনিজ দ্রব্য বিনিময় করিয়া মানুষ অন্য দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিতে শুরু করিল। এইভাবে জমির কার্যকারিতার পরিধি বিস্তৃত হইল। বৃটেন স্থানীয় কৃষিজ দ্রব্যের সাহায্যে যত লোকের ভরণপোষণ করিতে পারে, খনিজ সম্পদ বিনিময় করিয়া ইহার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী লোকের সমৃদ্ধি লাভ করাইতে পারে। ইহা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য-বাদী দেশসমূহের নিজেদের জমির উপরই শুধু স্থানীয় লোকের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করিত না; ইহাদের দখলীকৃত **উপনিবেশসমূহের জমির** কার্যকারিতাও এই সকল দেশের উন্নতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে শুরু করিল। বৃটেনের ক্ষুদ্র ভূভাগের উপর কিভাবে ৫½ কোটি লোক স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করিতেছে, ইহা বুঝিতে হইলে বৃটেনের সকল উপনিবেশের জমির

কার্যকারিতা সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। পূর্বে ভারতের জমিতে উৎপাদিত পাট, তুলা বৃটেনের শিল্পে নিয়োজিত হইত; ভারতের জমির অভ্যন্তরস্থ লৌহ আকরিক বৃটেনের ইস্পাতশিল্পের উন্নতির জন্য নিয়োজিত হইত। এখনও রোডেশিয়ার তাম্র বৃটেনের শিল্পসমৃদ্ধির জন্যই নিয়োজিত হয়। এইভাবে দেখা যায়, বর্তমান যুগে লোকসংখ্যা ও জমির অনুপাত (Man-land ratio) বুঝিতে হইলে স্থানীয় জমি হইতে প্রাপ্ত কৃষিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদের পরিমাণ, উপনিবেশের বা রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত অঞ্চলের জমির কার্যকারিতা প্রভৃতির সঙ্গে স্থানীয় লোকসংখ্যার অনুপাত বুঝিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জমির কার্যকারিতা বুঝিতে হইলে স্থানীয় জমির উৎপাদিকা-শক্তির সহিত এই দেশের রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত ফরমোসা, ফিলিপাইন, পাকিস্তান ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহের জমির কার্যকারিতাও কিয়দংশে যোগ করিতে হইবে। কারণ এই সকল দেশের কৃষিজ, প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিয়োজিত হয়। সুতরাং মানুষ-জমির অনুপাত বুঝিতে হইলে, একদিকে কার্যকরী ত্রিমাত্রিক জমি ও উপনিবেশের জমি এবং অন্যদিকে মানুষের সংখ্যা, সংস্কৃতি ও কর্মক্ষমতার অনুপাত বুঝিতে হইবে।

লোকবসতির ধরন ও ইহার বৈশিষ্ট্য (Settlement Patterns and their associated Features)—প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বসতি-ঘনত্বে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া গতিশীল পৃথিবীতে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং একস্থান হইতে মানুষ অন্যস্থানে যাতায়াত করিতেছে। ইহার ফলে বিভিন্ন স্থানের বসতি-ঘনত্ব পরিবর্তিত হইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বসতি-ঘনত্বের উপর ভিত্তি করিয়া পৃথিবীকে নিম্নলিখিত চারিটি **বসতি-ঘনত্ব অঞ্চলে (Density Zones)** বিভক্ত করা যায়:

(ক) **নিবিড়-বসতিযুক্ত অঞ্চল**—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ (চীন, ভারত, পূর্ব পাকিস্তান, জাপান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি), পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ (বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, ইটালি প্রভৃতি), রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশ এবং মিশরের নীলনদের উপত্যকা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিযুক্ত অঞ্চল; পৃথিবীর

মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ লোক এই অঞ্চলে বাস করে। প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে এখানকার লোকসংখ্যা ৫০ জনের বেশী।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে অধিক বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া কৃষিকার্যের উন্নতি হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতেই এই সকল দেশে বিশেষতঃ চীন ও ভারতে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং কৃষিকার্যের উন্নতি হইয়াছিল। ১৬০০ সালেও এই অঞ্চলে ৩৩ কোটি লোক বাস করিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের প্রধান **বৈশিষ্ট্য** এই যে, এখানকার লোকবসতি প্রধানতঃ কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল। যে সকল স্থানে কৃষিকার্য অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেখানেই বসতি-ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার এবং চীনের ইয়াং-সি-কিয়াং ও সিকিয়াং নদীর উপত্যকার কৃষি অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী লোক বাস করে। এখানকার কোন কোন অঞ্চলে জলসেচের সাহায্যে কৃষিকার্য হইয়া থাকে; ইহার ফলে লোকবসতি প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৪০০ জন পর্যন্ত হয়। ইন্দোনেশিয়ার জাভা নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও উর্বর মৃত্তিকার সাহায্যে কৃষিকার্যের উন্নতি হওয়ায় লোকবসতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। চীনের গড় লোকবসতি প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ৬০ জন; কিন্তু ইহার নদী-উপত্যকার কৃষি অঞ্চলের লোকবসতি প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ১২০০ জন। জাপানের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, ভগ্ন তটরেখা ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি এই দেশের নিবিড় লোকবসতির প্রধান কারণ।

পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ কৃষিকার্যে মোটামুটি উন্নতি লাভ করিলেও এই সকল দেশের সম্পদ-সৃষ্টির প্রধান উপায় শিল্পগঠন। স্থানাভাবে এই সকল দেশ শ্রমশিল্পের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হইয়াছে। স্থানীয় খনিজ সম্পদ ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এই বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। এই অঞ্চলের প্রধান **বৈশিষ্ট্য** শিল্পের উপর নির্ভরশীলতা এবং অতি-উৎপাদন কৃষি-ব্যবস্থার মাধ্যমে কম জমিতে অধিক শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় বাণিজ্যেও এই সকল দেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষার উন্নতি, উপনিবেশসমূহ হইতে আনীত প্রচুর সম্পদ, এখানকার মানুষের কর্মদক্ষতা এই অঞ্চলের সম্পদ-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। ফলে লোকবসতির ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে বৃটেনে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ২১৪ জন,

বেলজিয়ামে ২৮০ জন, জার্মানীতে ১৭০ জন, হল্যাণ্ডে ২৫৫ জন এবং ইটালিতে ১৪৪ জন লোক বাস করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশে ঘনলোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলের বসতি-ঘনত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার পূর্বাংশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল অবস্থিত এবং পশ্চিমাংশে বিস্তীর্ণ কৃষি-বলয়সমূহ অবস্থিত। শিল্পাঞ্চলে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ২৩০ জন এবং কৃষি-অঞ্চলে প্রায় ১০০ জন লোক বাস করে। উৎকৃষ্ট নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, উর্বর মৃত্তিকা, পরিমিত বৃষ্টিপাত, অপর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ, উৎকৃষ্ট বন্দর এই দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধনে সহায়তা করিয়াছে। উন্নত ধরনের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতি, স্থায়ী সরকার, অন্যদেশের উপর রাজনৈতিক প্রভাবও এই অঞ্চলের সম্পদ-বৃদ্ধিতে ও লোকবসতির ঘনত্ব-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে।

রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি ও শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়ায় লোকবসতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিশরের নীলনদের উপত্যকায় কৃষিকার্য উন্নতি লাভ করায় এই অঞ্চলে ঘনলোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া পৃথিবার বড় বড় শহরেও ঘন লোকবসতি বিদ্যমান।

(খ) **নাতিনিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল**—ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, মালয়, পশ্চিম পাকিস্তান, পশ্চিম এশিয়ার মালভূমি (তুরস্ক, ইরাণ, ইরাক), আফ্রিকার উপকূল (ঘানা, নাইজেরিয়া, গিনি), দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর আলজেরিয়া ও মরক্কো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, মধ্য আমেরিকা, ইউরোপীয় রাশিয়ার মধ্যাংশ ও পূর্বাংশে নাতিনিবিড় লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের অল্পাংশও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল দেশে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ২৮ হইতে ৫০ জন লোক বাস করে। এই অঞ্চলের দেশসমূহের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানকার অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী এবং কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনে ইহারা মোটামুটি স্বাবলম্বী। কোন কোন্ দেশ উদ্‌বৃত্ত কৃষিজ দ্রব্য রপ্তানিও করিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে খনিজ সম্পদ বিদ্যমান; ইউরোপের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন কোন অংশে শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

(গ) **বিরল-বসতিযুক্ত অঞ্চল**—উত্তর আমেরিকার 'প্রেইরী', দক্ষিণ আমেরিকার 'পম্পাস্', রাশিয়ার 'স্টেপ্স্', অস্ট্রেলিয়ার 'ডাউন্স্' এবং দক্ষিণ

আফ্রিকার 'ভেলড্' তৃণভূমি, আফ্রিকার স্যাভানা অঞ্চল ইহার অন্তর্গত। ইহার প্রধান **বৈশিষ্ট্য** এই যে, এখানকার অধিকাংশ লোক তৃণভূমিতে পশুচারণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। কোন কোন অঞ্চলে তৃণভূমি পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্যও হইয়া থাকে। বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে অল্প লোক অধিকসংখ্যক পশু পালন করিতে পারে। সেইজন্য এখানে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে মাত্র ১ হইতে ২০ জন লোক বাস করে।

(ঘ) **প্রায়-জনহীন অঞ্চল**—এই অঞ্চলের অন্তর্গত স্থানসমূহে লোক-বসতি প্রায় নাই বলিলেই চলে। যে সকল স্থানে কিছু কিছু লোক আছে, সেখানেও প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে লোকবসতি ১ জনেরও কম। শীতল মেরু অঞ্চল, বিভিন্ন মরুভূমি ও পার্বত্য ভূমি এবং নিরক্ষীয় বনভূমি, ইন্দোনেশিয়ার কালিমান্তান (বোর্ণিও), নিউগিনি দ্বীপ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। উত্তর আমেরিকা ও উত্তর ইউরোপের তুন্দ্রা অঞ্চলেও কদাচিৎ কোন লোক দেখা যায়। অত্যধিক শীতের প্রকোপে তুন্দ্রা অঞ্চলে কোন গাছপালা হয় না এবং বন্য হরিণ ও মৎস্য ভিন্ন খাদ্যের অন্য কোন বন্দোবস্ত নাই। মরু অঞ্চলের মধ্যে আফ্রিকার সাহারা ও কালাহারি, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা, এশিয়ার আরব, তুর্কিস্তান ও গোবি মরুভূমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মরুভূমিতে জলের অভাব, চরম জলবায়ু এবং ধূসর বালুকাময় বা বন্ধুর ভূ-প্রকৃতির জন্য বাস করা কঠিন। নিরক্ষীয় অঞ্চলের অত্যধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়; এখানকার জমি স্যাঁৎসেঁতে হওয়ায় জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। কঙ্গো-উপত্যকায় লোকবসতি সম্ভব হইলেও আমাজন-উপত্যকায় লোকবসতি প্রায় নাই বলিলেই চলে। অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং নানাপ্রকার বিষাক্ত কীটপতঙ্গ ও সরীসৃপের উপদ্রবের জন্য ইন্দোনেশিয়ার নিউগিনি ও কালিমান্তান দ্বীপে লোকবসতি অত্যন্ত কম। বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে কৃষিকার্যের অসুবিধা হয় বলিয়া এবং পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবে বসতিস্থাপন করা কঠিন; এইজন্য ভারতের হিমালয় পর্বত, চীনের তিব্বত, উত্তর আমেরিকার রকি পর্বত, দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিজ পর্বত আয়তনের তুলনায় প্রায় জনমানবশূন্য।

লোকবসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণ (Factors of Density of Population)—পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বসতি-ঘনত্বের তারতম্য সম্বন্ধে

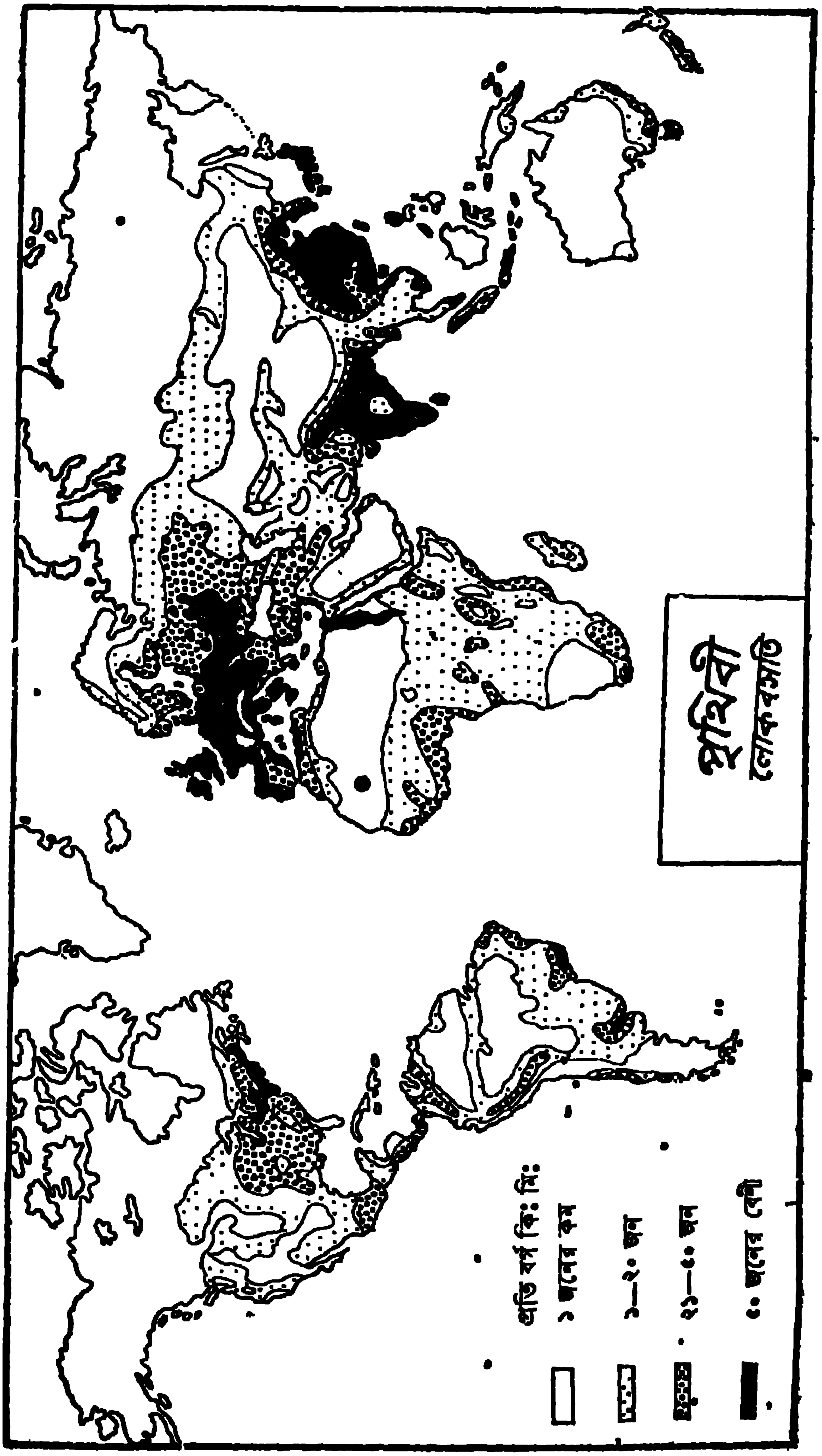
পৃথিবী
লোকবসতি
প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ
১ জনের কম
১—২০ জন
২১—৫০ জন
৫০ জনের বেশী

উপরে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের জন্য এই তারতম্য হইয়া থাকে।

(ক) **প্রাকৃতিক পরিবেশ**—প্রাকৃতিক পরিবেশ লোকবসতি-ঘনত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। **জলবায়ুর** উপর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল। বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার উপর কৃষিকার্য, মানুষের কর্মক্ষমতা, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি নির্ভর করে। কৃষিকার্য হইতে মানুষের অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান হইয়া থাকে। সুতরাং যে অঞ্চলে কৃষিকার্য উন্নতি লাভ করে সেখানে লোকবসতি বেশী হয়। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মানুষের কর্মক্ষমতা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ইহাতে শিল্পের উন্নতি হয় ও লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। **ভূ-প্রকৃতি** সমতল হইলে কৃষিকার্যের উন্নতি হয় এবং লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রসার সমতলভূমিতেই সম্ভব। পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিকূল ভূ-প্রকৃতির জন্য ও কৃষিকার্যের অভাবে লোকবসতির ঘনত্ব বেশী হইতে পারে না। **মৃত্তিকা** উর্বর হইলে কৃষিকার্যের উন্নতি হয় ও লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দেশের শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে **খনিজ সম্পদ**। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। খনিজ সম্পদের লোভে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলেও মানুষ ছুটিয়া গিয়াছে।

(খ) **অর্থনৈতিক পরিবেশ**—কোনও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইলে, সেই দেশে লোকবসতির ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে বিভিন্ন কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির উপর। কৃষি-কার্যের উপর বসতি-ঘনত্বের নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে দেশের কাঁচামাল সংগ্রহের, মানুষের কর্মক্ষমতার ও বাজারের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতার উপর। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহে বসতি-ঘনত্বের কারণ শুধু স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ নহে, উপনিবেশসমূহের অনুকূল পরিবেশও এই সকল দেশের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে (৫০পৃষ্ঠা)। ভারতের তুলা ও লৌহের সাহায্যে বৃটেনের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। কঙ্গোর খনিজ সম্পদের সাহায্যে বেলজিয়ামের শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল। বাণিজ্যের উন্নতি হইলেও লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। বৃটেন পূর্বে সমগ্র জগতের বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিত বলিয়া ক্ষুদ্র আয়তনেও ঐ দেশে বহুলোক বাস করিতে সক্ষম হইয়াছে। বিদেশে নিয়োজিত মূলধন হইতে কোন কোন দেশের বাৎসরিক আয়

হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কিং, জাহাজ, বীমা প্রভৃতি ব্যবসায় হইতেও বিদেশ হইতে অর্থ আমদানি করা সম্ভব। এইভাবে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্ত করিতে পারিলে লোকবসতি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; বৃটেন ইহার জলন্ত উদাহরণ।

(গ) **সামাজিক পরিবেশ**—সমাজের বিভিন্ন সংস্কারের জন্য লোক-সংখ্যা হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ **ধর্মে** পুত্র দ্বারা পিতামাতার পরলোকের কার্যাদি করিবার সংস্কার প্রচলিত থাকায় চীনা ও ভারতীয়গণের পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষা গভীর। **রাজনৈতিক** কারণেও জন্মহার বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে হিটলার সৈন্যের প্রয়োজনে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য জার্মানীর সকল পিতামাতাকে অধিক হারে সন্তান-উৎপাদনের আদেশ দিয়াছিল। মানুষের **সাংস্কৃতিক** মান উন্নয়নের ফলেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়; শিক্ষার উন্নতি-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী আবিষ্কারের সাহায্যে মানুষ নূতন নূতন জিনিস সৃষ্টি করে। ফলে অধিকতর সম্পদের সৃষ্টি হয় এবং লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, শিল্পবিপ্লবের পরে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার হইয়াছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। বিভিন্ন দেশের **সরকারের কর্মকুশলতা** লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কোন কোন দেশের সরকার সম্পদের অভাবে পরিবার-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কার্যকরী করে; ফলে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার কমিয়া যায়। পৃথিবীর কোন কোন দেশ পরিবার-পরিকল্পনায় বিশ্বাসী নহে। তাহারা খাদ্যোৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে, লোকসংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য নহে। এই সকল দেশে স্বভাবতঃই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সরকারের কর্মকুশলতায় খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে মৃত্যুর হার কমিয়া যায়; ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। চীনদেশে বিপ্লবের সাফল্যের সময় (১৯৪৯ সাল) লোকসংখ্যা ছিল ৪৬ কোটি। ১৯৫৯ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৬৭ কোটিতে। ১১ বৎসরে এই দেশে ২১ কোটি লোক বাড়িয়াছে।* কারণ এই দেশ খাদ্যে স্বাবলম্বী এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য মৃত্যুর হার অনেক কম।

আয়তনযুক্ত, বসতিযুক্ত ও শিল্পোন্নত পৃথিবী (The Three Worlds of Space, People and Industry)—পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে

* U. N. O. Monthly Bulletin, Sept. 1960 সংখ্যা হইতে সংগৃহীত।

বিভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন স্থান শুধু পৃথিবীর আয়তন-বৃদ্ধির জন্য শোভা পাইতেছে; এই সকল স্থান মানুষের কোনও প্রয়োজনে আসে না। কানাডার উত্তরাংশ, সাইবেরিয়ার উত্তরাংশ, অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ স্থান, আমাজন-উপত্যকা প্রভৃতি এখনও মানুষের বসবাসের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। অবশ্য পৃথিবীর মোট আয়তনের বহু অংশ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হইয়াছে। স্থলভাগের সমগ্র অংশকে **আয়তনযুক্ত পৃথিবী** বলা যায়

পৃথিবীর স্থলভাগের যে অংশে মানুষ বসবাস করে, সেই অংশকে **বসতিযুক্ত পৃথিবী** বলা হয়। বসতিযুক্ত পৃথিবীতে জনহীন অঞ্চল বাদ যাইবে। যে সকল স্থানে মানুষ বসবাস করিয়া সেখানকার সম্পদ আহরণ করিতে পারে, পৃথিবীর স্থলভাগের সেই অংশ সর্বাপেক্ষা বেশী কার্যকরী। বসতিযুক্ত অঞ্চলের মানুষ কৃষিকার্য, খনিজ সম্পদ-আহরণ, শিল্পগঠন, বাণিজ্য প্রভৃতির সাহায্যে জীবন ধারণ করে। কোনস্থান কৃষিসমৃদ্ধ, কোনস্থান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, আর কোনস্থান শিল্পে সমৃদ্ধ।

পৃথিবীর স্থলভাগের যে অংশের মানুষ প্রধানতঃ শিল্পের উপর নির্ভরশীল, সেই অংশকে **শিল্পোন্নত পৃথিবী** বলা যায়। পৃথিবীর সকল স্থানে শিল্প-স্থাপন সম্ভব নহে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর শিল্পের উন্নতি নির্ভরশীল। পৃথিবীর অতি অল্প অংশই শিল্পোন্নত পৃথিবীর আওতায় আসিবে। সাধারণতঃ ইস্পাতকে শিল্পোন্নতির মাপকাঠি হিসাবে ধরা হইয়া থাকে। সুতরাং যে সকল দেশ প্রধানতঃ ইস্পাত-উৎপাদনে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, মোটামুটি সেই সকল দেশ শিল্পোন্নত পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডার দক্ষিণ-পূর্বাংশ, ইউরোপের দেশসমূহ, জাপান, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশ শিল্পোন্নত পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত।

এইভাবে তিন প্রকারের পৃথিবীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জমির পরিমাণ, লোকবসতি ও শিল্পোন্নতির বণ্টন অত্যন্ত অসমান।

আধুনিক লোকবসতির গতি-প্রকৃতি (Modern Demographic Pattern)—পৃথিবীর লোকবসতির ঘনত্ব, লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির কারণ সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে হইলে লোকসংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। জন্ম ও মৃত্যুর হার এবং সম্পদের উৎপাদন-সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে

পৃথিবীর লোকবসতি সম্বন্ধে নানাবিধ সিদ্ধান্তে আসিতে হয়। পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের হার মোটামুটি বেশী হইয়াছে। ১৬৫০ সালে পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যা ছিল ৫৪·৫ কোটি ; ১৯৬০ সালে লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৯৭ কোটিতে।

পৃথিবীর লোকসংখ্যার গতি-প্রকৃতি (কোটি)

মহাদেশ	১৬৫০	১৭৫০	১৮০০	১৯০০	১৯৫০	১৯৬০
উত্তর আমেরিকা	·১	·১	·৬	৮·১	২১·৫	২৪
দক্ষিণ আমেরিকা	১·২	১·১	১·৯	৬·৩	১১	১৪
ইউরোপ	১০	১৪	১৯	৪০	৫৫	৬০
এশিয়া	৩৩	৪৮	৬০	৯৪	১৩২	১৭৩·৭
আফ্রিকা	১০	৯·৫	৯	১২	২০	২৪
ওশিয়ানিয়া	·২	·২	·২	·৬	১·২	১·৩
পৃথিবী	৫৪·৫	৭২·৯	৯০·৭	১৬১	২৪০·৭	২৯৭

শিল্পবিপ্লবের পূর্বে কৃষিকার্য ও পশুপালনের উপর মানুষ অধিকতর নির্ভরশীল ছিল। সেই সময় জন্ম ও মৃত্যু উভয়ের হার ছিল অত্যন্ত বেশী ; **জন্মের হার** ছিল হাজারে ৪০ জন এবং **মৃত্যুর হার** ছিল হাজারে ৩৫ জন। জন্ম ও মৃত্যুর হারে বিশেষ পার্থক্য না থাকায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইত না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি না হওয়ায় এবং জনস্বাস্থ্যরক্ষার ভালো ব্যবস্থা না থাকায় মৃত্যুর হার ছিল বেশী। অধিকাংশ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই অথবা কর্মক্ষম হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ইহার ফলে শিশুকে লালনপালনের জন্য যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হইত তাহা সমাজের কল্যাণে লাগিত না ; কারণ শিশু বড় হইয়া সম্পদ-উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারিত না। সেই সময় জীবনধারণের জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত বলিয়াও মানুষের আয়ু অল্প হইত। ইহা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিল।

শিল্পবিপ্লবের পর লোকসংখ্যাতত্ত্বের ধরন পাল্টাইয়া যায় ; এই সময় মানুষ 'উদ্ভিদ-সভ্যতা' (Vegetable civilization) হইতে যান্ত্রিক সভ্যতায় *পদার্পণ করে। যন্ত্রের সাহায্যে অল্প পরিশ্রমে মানুষ দ্রব্যাদি উৎপাদন* করিতে শিখে। ইহার ফলে মানুষের আয়ু ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বিভিন্ন ঔষধপত্রের আবিষ্কার হওয়ায় মানুষের মৃত্যুর হার অনেক কমিয়া যায়। অন্যদিকে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার আওতায় আসিয়া জন্মের হারও কমিতে থাকে। শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পরিবার-পরিকল্পনার কথা চিন্তা করিতে শিখে। মৃত্যুর হার কমিয়া যাওয়ায় শিশুদের লালন-পালন করিবার জন্য যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, শিশু বড় হইয়া তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা দ্বারা সমাজের সেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। ইহার ফলে উৎপাদনক্ষম শ্রমিকের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উদ্‌বৃত্ত শ্রমিকের সাহায্যে শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। যে সকল দেশ তাহাদের শ্রমশক্তিকে শুধু কৃষিকার্যে নিয়োজিত করিয়া রাখে, তাহাদের উন্নতি হওয়া কষ্টসাধ্য; কিন্তু যে সকল দেশ শ্রমশক্তির কিয়দংশকে কৃষিকার্য হইতে সরাইয়া খনিজ সম্পদ-আহরণে ও শিল্পে নিয়োজিত করিতে পারে, সেই দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার অধিকাংশ লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমান সমাজতান্ত্রিক শাসনে কৃষিকার্যে যন্ত্রপাতি নিযুক্ত হওয়ায় কৃষিক্ষেত্র হইতে বহু শ্রমিককে সরাইয়া খনিতে ও শিল্পে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ফলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। এইভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা হইলে, মানুষ সমস্ত উৎপাদনকার্য বজায় রাখিয়াও অবসর বিনোদনের জন্য প্রচুর সময় পায়; ইহাতে মানুষের সাংস্কৃতিক মান উন্নত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিক্ষার মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সম্পদ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা আরও বাড়িয়া যায়, সৎ ও বলিষ্ঠ সরকার-গঠন সম্ভবপর হয়।

শিল্পবিপ্লবের পর হইতে বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের ফলে ক্রমশঃ **জন্ম এবং মৃত্যু উভয়ের হার কমিয়া যাইতেছে**; কিন্তু যে হারে জন্মের হার কমিয়াছে, ইহার তুলনায় মৃত্যুর হার কমিয়াছে অনেক বেশী। ইহার ফলে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাই আধুনিক লোকসংখ্যাতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পৃথিবীতে বর্তমানে যে হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাতে অনেকেই আতঙ্কিত হইতেছেন। বিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির গড় হার ১% হইলেও বিভিন্ন মহাদেশে ইহার হার বিভিন্ন রকমের; উত্তর আমেরিকায় বৃদ্ধির হার শতকরা ১·৯, ইউরোপে ১·১, মধ্য আমেরিকায় ২·৭, ওশিয়ানিয়ায়

২'১, আফ্রিকায় '৮ এবং এশিয়ায় '৬ জন। কোন কোন লোকসংখ্যাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ১৯৭৫ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা হইবে ৩৪১ কোটি এবং ২০০০ সালে ৪৯৪ কোটি। অবশ্য এই হিসাবের সঙ্গে সকল লোকসংখ্যাতত্ত্ববিদ্ একমত নহেন। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার সর্বদাই' কমবেশী হওয়া স্বাভাবিক। মানুষের প্রজনন-ক্ষমতার হার, সম্পদ-উৎপাদনের গতি, যুদ্ধ, মহামারী, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি প্রভৃতির উপর ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সংখ্যা নির্ভর করে।

আদর্শ লোকবসতি ও বসতি-ঘনত্ব (Optimum Population and Population Density)—কোন দেশের লোকসংখ্যা যদি সেই দেশের 'কার্যকরী' জমির অনুপাতে গড়িয়া ওঠে, তাহাকেই আদর্শ লোকবসতি (Optimum population) বলা যায়। কার্যকরী জমি সম্বন্ধে ৪৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। যতক্ষণ কোন দেশের উৎপন্ন সম্পদের দ্বারা দেশের মানুষের ভোগসুখের বন্দোবস্ত করা যায়, ততক্ষণ সেই দেশে আদর্শ লোকবসতি বিদ্যমান থাকিবে; কিন্তু যদি কোন দেশে সম্পদ-সৃষ্টির পরিমাণ লোকসংখ্যার অনুপাতে কম হয়, তাহা হইলে সেই দেশের বসতি-ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী বলিতে হইবে। আবার যদি সম্পদের তুলনায় লোকসংখ্যা কম থাকে এবং শ্রমিকের অভাবে সম্পদ-সৃষ্টির ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে সেই দেশের বসতি-ঘনত্ব অত্যন্ত কম বলিতে হইবে। অনেক লোক-সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন চীনে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু বিপ্লবের পর সম্পদের উৎপাদন ঐ দেশে এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সেখানকার মানুষ স্থানীয় সম্পদের সাহায্যে সুখে বাস করিতেছে। সেইদিক হইতে বিচার করিলে চীনে অত্যধিক লোকবসতি আছে বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।

সম্পদের উৎপাদন নির্ভর করে প্রধানতঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও মানুষের কর্মক্ষমতার উপর। এই তিনটি পরিবেশের পা- মিলন সম্ভব হইলে সম্পদ-সৃষ্টি সার্থক হইয়া থাকে। সকল অনুপাত সমান নহে। কোথাও প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ম ক্ষমতার অভাবে তাহাকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা সম্ভ- কোথাও প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবে মানুষ দেশ ছাড়িয়া চলি- সম্পদ উৎপাদনের এই ত্রয়ী পরিবেশের কার্যকারিতার সঙ্গে দে মিল থাকা প্রয়োজন। এই ত্রয়ী পরিবেশের সঙ্গে লোকবসতি

ঠিক না থাকিলেই বসতি-ঘনত্বের আধিক্য বা অল্পতা হেতু বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থা লোকবসতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিল্পবিপ্লবের পর হইতেই যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও শক্তিসম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করিতেছে। ইহা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের অর্থনীতি উপনিবেশের অর্থনীতির সহিত যুক্ত হইয়াছে। উপনিবেশ হইতে শোষিত সম্পদ এই সকল দেশের সম্পদ-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। ইহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি দেশ-বিদেশে পুঁজি নিয়োগ করিয়া প্রভূত সুদ ও লাভ বিদেশ হইতে আনিয়া থাকে। ইহাও দেশের সম্পদ-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় মানুষ সর্বদাই একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইয়া বসবাস করে। সুতরাং বর্তমান যুগে কোন দেশের বসতি-ঘনত্ব অধিক বা অল্প ইহা নির্ধারণ করিতে হইলে স্থানীয় শক্তিসম্পদ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বিদেশ হইতে আনীত সম্পদ, পুঁজি হইতে আহৃত লাভ এবং বসবাসের স্থান-পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয় বিচার করিতে হইবে।

গতিশীল পৃথিবীতে লোকসংখ্যাও সর্বদাই কমবেশী হওয়া স্বাভাবিক। আজ যে সকল দেশে আদর্শ লোকবসতি বিদ্যমান, জন্ম-মৃত্যুর হার এবং সম্পদের উৎপাদন কমবেশী হওয়ায় কিছুদিন পরে বসতি-ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী বা কম হইতে পারে। লোকবসতির গতি কখন কোন্‌দিকে মোড় ফিরিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারে না।

৪৭ ২।৫০

বেশী। ইহ

লোকসংখ্যাত

পৃথিবীতে

অনেকেই আ

৯% হইলেও

বৃদ্ধির হার শা

প্রশ্নাবলী

ibe the present-day settlement patterns and explain the principal ciated with the settlement.

'বসতির ধরন ও ইহার বৈশিষ্ট্য' (৫১ পৃঃ—৫৪ পৃঃ) লিখ।

t are the reasons for wide variations in population density in s of the world ?

'বসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণ' (৫৪ পৃঃ—৫৭ পৃঃ) লিখ।

3. "Nearly two-thirds of the human population are concentrated in about one-tenth of the land surface."—Describe and account for this peculiar distribution.

উঃ—'নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল' (৫১ পৃঃ—৫৩ পৃঃ) এবং 'লোকবসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণ' (৫৪ পৃঃ—৫৭ পৃঃ) লিখ।

4. Describe briefly the modern demographic pattern of the world.

উঃ—'আধুনিক লোকবসতির গতি-প্রকৃতি' (৫৮ পৃঃ— ৬১পৃঃ) লিখ।

5. What do you mean by Optimum population ? How should you judge the population density of a country and decide whether it has an Optimum population or not ?

উঃ—'আদর্শ লোকবসতি ও বসতি-ঘনত্ব' (৬১ পৃঃ—৬২ পৃঃ) লিখ।

6. Explain fully the concept of *man-land ratio* and indicate how far population optima can be explained in terms of ideal man-land ratios.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1962]

উঃ—'মানুষ ও জমির অনুপাত এবং লোকবসতি ঘনত্ব' (৪৯ পৃঃ—৫১ পৃঃ) এবং 'আদর্শ লোকবসতি' ও বসতি-ঘনত্ব' (৬১ পৃঃ—৬২ পৃঃ) লিখ।

7. What do you understand by Man-Land ratio ? How does it differ from population density ?

[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1963]

উঃ—'মানুষ ও জমির অনুপাত এবং লোকবসতি-ঘনত্ব' (৪৯ পৃঃ—৫১ পৃঃ) লিখ।

8. Define optimum population. Discuss the factors which determine this with specific examples.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com., 1965]

উঃ—'আদর্শ লোকবসতি ও বসতি-ঘনত্ব' (৬১ পৃঃ— ৬২ পৃঃ) এবং 'লোকবসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণ' (৫৪ পৃঃ—৫৭ পৃঃ) লিখ।

পঞ্চম অধ্যায়

সাংস্কৃতিক সম্পদ

(Cultural Resources)

মানুষের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভাব হয় প্রাকৃতিক সম্পদের ; তারপর আসে মানুষ। প্রথমে মানুষের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদকে নিয়োজিত করা হইল। বন্যপশু, মৎস্য, ও ফলমূল ছিল মানুষের বাঁচিবার প্রধান সহায়। পরবর্তী কালেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষ স্বীয় বুদ্ধিবলে আহরণ করিতে শিখিল ; তন্মধ্যে খনিজ সম্পদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতি সর্বদা মানুষের অনুকূলে ছিল না ; কিন্তু মানুষ বাঁচিবার তাগিদে ক্রমশঃ প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজের বুদ্ধিবলে কিয়দংশ আয়ত্তে আনিয়া নিজের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিল। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে মানুষ আয়ত্ত করিল বিভিন্ন কলাবিদ্যা, আবিষ্কার করিল বিজ্ঞানের অমোঘ অস্ত্র। কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করা হইল প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিয়া মানুষের কল্যাণ-সাধনে। অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ আরও অনেক কলাকৌশল আয়ত্ত করিল প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য। ক্রমে ক্রমে সভ্যতা গড়িয়া উঠিল, ভাষার আবিষ্কার হইল, মানুষের পশুপ্রবৃত্তি সংযত হইল, সমাজের সৃষ্টি হইল এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা হইল।

এইভাবে মানুষের সংস্কৃতির সৃষ্টি হইল। বর্তমানে **সংস্কৃতি (Culture)** বলিতে আমরা বুঝি শিক্ষা, কলা ও বিজ্ঞানের উন্নতি, ধর্মের প্রসার, সভ্য ব্যবহার, অভিজ্ঞতার দরুন লব্ধ জ্ঞান, মানুষের আদিম প্রবৃত্তির সংযম, যুদ্ধের পরিবর্তে সহযোগিতা, বন্য আইনের পরিবর্তে ন্যায়বিচার ও সমাজশৃঙ্খলার প্রবর্তন।* মানুষই পৃথিবীর একমাত্র প্রাণী যে সংস্কৃতির সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। মানুষের এই সংস্কৃতি সর্বদাই তাহার কল্যাণ-সাধনে নিয়োজিত হইয়াছে।

"Caltute means education, learning, experience, religion, civilised behaviour, suppression of vicious animal instincts, co-operation replacing conflict, the law of fair play and justice suppressing the law of the jungle."

—E. W. Zimmermann

এই সংস্কৃতির বলে মানুষ বাস করিতেছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে—তুন্দ্রাঞ্চলে, নিরক্ষীয় অঞ্চলে ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে। অবশ্য মানুষ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈসাদৃশ্য এখনও এক করিতে পারে নাই; কিন্তু প্রকৃতিকে কিছুটা আয়ত্তে আনিয়া বা নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ বসবাস করিতেছে। প্রকৃতির প্রভাব এখনও বহুলাংশে মানুষের বসতিস্থাপনের উপর বিদ্যমান; কারণ গৃহাদিতে তাপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইলেও এখনও অধিকাংশ মানুষ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট জলবায়ুতেই থাকিতে ভালবাসে।

সংস্কৃতি—মানুষ ও প্রকৃতির যুগ্ম সৃষ্টি (Culture, a Joint Product of Man and Nature)—পৃথিবীতে প্রথম সৃষ্টি হয় প্রকৃতির; তারপর আসে মানুষ। প্রকৃতি ও মানুষের যুগ্ম প্রচেষ্টার ফলেই সৃষ্টি হইয়াছে সংস্কৃতি। প্রকৃতির সাহায্য ছাড়া মানুষ কখনই তাহার সংস্কৃতির মান উন্নয়ন করিতে পারিত না। প্রকৃতির 'সাহায্য', 'উপদেশ' ও 'সম্মতি' নিয়াই মানুষ সৃষ্টি করিযাছে তাহার সংস্কৃতি; প্রকৃতি হইতে সংগৃহীত সম্পদ এবং প্রাকৃতিক শক্তির সহিত মানুষের বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার যোগাযোগের ফলেই সৃষ্টি হইয়াছে সংস্কৃতি। প্রকৃতির দান ভূমি হইতে মানুষের বুদ্ধিবলে উৎপন্ন হইয়াছে গম, ধান প্রভৃতি খাদ্যশস্য; প্রকৃতির দান কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ হইতে মানুষ তাহার বুদ্ধির সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছে শক্তি ও নানাবিধ উপজাত দ্রব্য। প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকিলে মানুষ তাহার বুদ্ধি-বিকাশের সুযোগ পাইত না। এইভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের কর্মক্ষমতায় সৃষ্টি হইয়াছে কলা ও বিজ্ঞান; ইহার সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছে মানুষের সংস্কৃতি। সুতরাং প্রকৃতি ও মানুষের যুগ্ম প্রচেষ্টায় সংস্কৃতি জন্মলাভ করিয়াছে।

প্রকৃতি মানুষের সাংস্কৃতিক মান-উন্নয়নের **সীমা** নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। মানুষ কম পরিশ্রমে ও ব্যয়ে চায় সর্বাপেক্ষা বেশী সম্পদ, উৎপাদন ও ভোগ। প্রকৃতির সাহায্যেই তাহাকে সম্পদ উৎপন্ন করিয়া মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে হয়। সুতরাং মানুষ কখনই সরাসরি প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে না। প্রকৃতি যেখানে মানুষকে বাধা দেয়, সেখানে মানুষ সরাসরি প্রকৃতির সহিত সংঘর্ষে না আসিয়া ইহার পাশ কাটাইবার চেষ্টা করে। প্রকৃতির 'উপদেশ ও সম্মতি' নিয়াই মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ইউরোপীয়গণ প্রচুর আলু খায়, উত্তর আমেরিকার লোকেরা ভুট্টা-খাদক পশুর মাংস খায়, এশিয়াবাসী মানুষ চাউল খায়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ইউরোপের জলবায়ু আলুচাষের উপযোগী, উত্তর আমেরিকার জলবায়ু ভুট্টাচাষের উপযোগী এবং এশিয়ার মৌসুমী অঞ্চল ধানচাষের উপযোগী। মানুষ কম পরিশ্রমে এই সকল খাদ্যদ্রব্য উপরে বর্ণিত স্থানসমূহে উৎপন্ন করিতে পারে বলিয়াই তাহারা এই খাদ্যে অভ্যস্ত হইয়াছে। প্রকৃতি মানুষকে পথ দেখাইয়া দেয়, কিভাবে চলিলে সে কম আয়াসে বেশী সম্পদ উৎপন্ন করিতে পারিবে। সেইজন্য প্রকৃতি মানুষকে কখনই উত্তর মেরুতে বা সাহারা মরুভূমিতে বসবাস করিতে উপদেশ দেয় না। এইভাবে প্রকৃতির সাহায্যে মানুষ তাহার সাংস্কৃতিক মান-উন্নয়নের কার্যে সফলতা অর্জন করিয়াছে।

অনেকসময় মানুষের সংস্কৃতি প্রাকৃতিক সম্পদকে **অনুকরণ** করিয়া নূতন নূতন সম্পদ সৃষ্টি করে। রেশমের কাপড় প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু সাংস্কৃতিক উন্নতির ফলে মানুষ রেশমকে অনুকরণ করিয়া রেয়ন সৃষ্টি করিয়াছে। কয়লা ও খনিজ তৈল হইতে শক্তি উৎসারিত হয়। মানুষের সংস্কৃতি পারমাণবিক শক্তির সৃষ্টি করিয়া প্রাকৃতিক সম্পদ কয়লা ও খনিজ তৈল হইতে অধিকতর শক্তিশালী শক্তিসম্পদ সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রকৃতি সম্পদ-উৎপাদনে বিভিন্ন বাধা সৃষ্টি করায় মানুষ তাহার সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন করিয়া এইসব বাধা অতিক্রম করিয়াছে। সুতরাং পরোক্ষভাবে **প্রাকৃতিক বাধা-বিঘ্ন** মানুষের সংস্কৃতিকে উন্নত করিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদ অনেকসময় যথাস্থানে, যথাসময়ে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর অধিকাংশ পশম উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশমবয়ন-শিল্পে নিয়োজিত হইলেও, প্রকৃতি বহুদূরে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশ-সমূহে (অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা) অধিক পশম-উৎপাদনে সাহায্য করে। রবার প্রধানতঃ উৎপন্ন হয় মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায়; কিন্তু ইহা ব্যবহৃত হয় প্রধানতঃ সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মোটর-গাড়ী-নির্মাণ-শিল্পে। এইভাবে দেখা যায় প্রকৃতি সকল জিনিস যথাস্থানে উৎপন্ন করে না। প্রকৃতির এই **স্থানগত ত্রুটি** সংশোধনের জন্য মানুষকে রেলগাড়ী, মোটর-গাড়ী, জাহাজ, বিমানপোত ইত্যাদি বিভিন্ন যানবাহন, হিমায়নযন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। খাদ্য প্রতিদিন মানুষের প্রয়োজনে লাগে।

একদিনে মানুষ পৃথিবীর সকল খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন খাদ্যশস্য প্রতিদিন উৎপন্ন করা যায় না বলিয়া খাদ্যশস্য মজুত করিয়া প্রতিদিন মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে হয়। প্রকৃতির এই **সময়গত ত্রুটি** সংশোধনের জন্য মানুষকে আবিষ্কার করিতে হইয়াছে গুদামঘর, হিমশীতল ঘর এবং আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের। প্রাচীনকালে সম্পদের পরিমাণ ছিল অতি অল্প। ইহার পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্য মানুষকে বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। পূর্বে গরু হইতে যে দুগ্ধ পাওয়া যাইত, তাহা শুধু বাছুরের প্রয়োজন মিটাইত। ক্রমশঃ মানুষের সংস্কৃতিকে নিয়োজিত করিতে হইয়াছে দুগ্ধের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য। কৃষিকার্যের মারফত পুষ্টিকর পশুখাদ্য উৎপন্ন করিয়া, তৃণভূমিকে পশুপালনের জন্য নিয়োজিত করিয়া, মিশ্র প্রজননের সাহায্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গরু সৃষ্টি করিয়া মানুষ বর্তমানে গরু হইতে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ সংগ্রহ করে। এইভাবে প্রকৃতির **পরিমাণগত ত্রুটি** মানুষ সংশোধন করিয়াছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন **প্রাকৃতিক দুর্যোগ** মানুষের সংস্কৃতির উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা হইতে জাহাজ ও বিমানকে রক্ষা করিবার জন্য মানুষকে আবিষ্কার করিতে হইয়াছে বেতারের মারফত যোগাযোগ-ব্যবস্থার। এইভাবে দেখা যায় প্রকৃতি বিভিন্ন বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া মানুষকে বিভিন্ন আবিষ্কারের মারফত সাংস্কৃতিক মান-উন্নয়নে সাহায্য করিয়াছে। মানুষের বুদ্ধিবলে এইসব আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতি ও মানুষের যুগ্ম প্রচেষ্টার ফলেই সংস্কৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।

সংস্কৃতি ও যান্ত্রিক যুগ (Culture and the 'Machine')—বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি হয় প্রধানতঃ শিল্পবিপ্লবের সময় হইতে। ইহার পূর্বে মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের; সেই সময় মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে হাত মিলাইয়া চলিত। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিবার মতো সাহস মানুষের ছিল না। সেই সময় মানুষ সাধারণতঃ জমির কাঠামো বজায় রাখিয়া সাধারণ লাঙল বা কোদালের সাহায্যে জমি চাষ করিত। বাড়ী, রাস্তা, শহর প্রভৃতি নির্মাণের ধরন ছিল খুব সাধারণ; নিকটবর্তী সামগ্রী হইতেই এই সকল নির্মিত হইত। এইভাবে দেখা যায়, সেই সময় প্রাকৃতিক পরিবেশের গতিকে অস্বাভাবিকভাবে পরিবর্তনের কোন ইচ্ছা মানুষের ছিল না। মানুষের **প্রাচীন সংস্কৃতি** প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে

কখনও জয় করিতে চাহিত না; প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে যতটা সম্ভব মানাইয়া চলিত।

যান্ত্রিক সভ্যতা শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে যন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃতিকে জয় করিবার অদম্য আগ্রহ প্রকাশ পায়; যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। পূর্বে মানুষ হস্তচালিত তাঁতের সাহায্যে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত। কাজ করিবার প্রধান হাতিয়ার ছিল সামান্য হাতুড়ি, করাত ও কোদাল। গাড়ী চালানো হইত পশুর সাহায্যে। যান্ত্রিক যুগে আবিষ্কৃত হইল বয়নযন্ত্র, কৃষি-যন্ত্রপাতি, আগ্নেয় অস্ত্রশস্ত্র, আরও কত কি! সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থায় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবার ক্রমেই প্রচেষ্টা হইল। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একথা ঠিক যে পৃথিবীর সকল স্থানে সমান ভাবে যান্ত্রিক সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করে নাই। এখনও বহু দেশে প্রাচীন যুগের উৎপাদন-ব্যবস্থা বিদ্যমান। আবার কোন কোন দেশ যান্ত্রিক সভ্যতার চরম শিখরে উঠিয়াছে। পৃথিবীর বহু অনুন্নত দেশে এখনও পশুর সাহায্যে গাড়ী চলে, পশুশিকার করিয়া মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে, লাঙ্গলের সাহায্যে কৃষিকার্য হয়। অন্যদিকে রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি দেশে অধিকাংশ উৎপাদন-ব্যবস্থা যন্ত্রের সাহায্যে হইয়া থাকে। কৃষিকার্যে কৃষি-যন্ত্রপাতি (ট্র্যাক্টর, হারভেস্টার) নিযুক্ত হয়, পরিবহণে বিমান, মোটর-গাড়ী ও দ্রুতগামী রেলগাড়ী ব্যবহৃত হয়, অত্যন্ত আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয়। যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রকৃতিকে জয় করিবার অদম্য আগ্রহ যান্ত্রিক-সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইভাবে **যান্ত্রিক যুগের সংস্কৃতি** এক নূতন রূপ ধারণ করে। এই সংস্কৃতির মূল কথা কিভাবে যন্ত্রের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের প্রয়োজনে নিয়োজিত করা যায়। এই সংস্কৃতি প্রাচীন সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আধুনিক যে-কোনও বিখ্যাত শিল্প-নগরীর সহিত প্রাচীনকালের কোনও শহরের তুলনা করিলে সংস্কৃতির এই রূপান্তর পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠে। নিউ ইয়র্ক, মস্কো ও লণ্ডনের সঙ্গে প্রাচীনকালের নালন্দা, কাশী ও আগ্রার তুলনা করিলেই ইহা সহজে বুঝা যায়।

সংস্কৃতি ও কৃষিকার্য (Culture and Agriculture)—প্রাচীন সভ্যতার যুগেও কৃষিকার্যের প্রচলন ছিল। মানুষ সহজভাবে কৃষিজ দ্রব্য

(প্রধানতঃ খাদ্যশস্য) উৎপন্ন করিয়া নিজেদের প্রয়োজন মিটাইত। প্রথমে মনুষ্যশক্তির সাহায্যে এবং পরে পশুশক্তির সাহায্যে কৃষিকার্য করা হইত। সেই যুগে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল অনেক কম—প্রকৃতি যতটা দিত তাহাতেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকিত।

মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্যের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছে। কৃষি-জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কৃষি-পদ্ধতির উন্নতি হইয়াছে, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সাংস্কৃতিক মান-উন্নয়নের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে দ্রুতগামী **পরিবহণ-ব্যবস্থার**। ইহার ফলে মানুষ এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাতায়াত শুরু করিয়াছে। এক দেশ হইতে শস্যের বীজ আনিয়া অন্যদেশে কৃষিকার্যের উন্নতি হইয়াছে; শস্যের আদি-ভূমি বহুক্ষেত্রে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহার ফলে উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন-উপত্যকায় অধিকাংশ রবার উৎপন্ন হইত। আণ্ডিজ পর্বতের পাদদেশে অধিকাংশ আলু ও সিঙ্কোনা উৎপন্ন হইত। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বীজ স্থানান্তরিত করা সম্ভব হইল। বর্তমানে মালয় ও ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ রবার, উত্তর ইউরোপের অধিকাংশ আলু এবং ইন্দোনেশিয়া অধিকাংশ সিঙ্কোনা উৎপন্ন করে। অন্যদিকে দক্ষিণ আমেরিকায় অন্যান্য মহাদেশ হইতে বীজ আনিয়া কফি, কোকো ও ইক্ষু-চাষের উন্নতি হইয়াছে। আমদানীকৃত উৎকৃষ্টশ্রেণীর পশুর সাহায্যে প্রজননের ফলে পশুপালনের উন্নতি হইয়াছে। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এক দেশের কৃষিজ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা সহজসাধ্য হইল। ইহার ফলে **আমদানি-রপ্তানির** সৃষ্টি হইল, কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদা এবং উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল।

সংস্কৃতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। **বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের** ফলে উন্নত ধরনের সার ও বীজের সাহায্যে এবং জলসেচের বন্দোবস্ত করিয়া অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে কৃষিকার্য করা সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে কৃষি-জমির পরিমাণ ও কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজস্থানের মরুপ্রায় অঞ্চলে অবস্থিত সুরতগড় সুন্দর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। উত্তর আমেরিকার 'প্রেইরী' ও রাশিয়ার 'স্টেপস্' তৃণভূমির অধিকাংশ কৃষি-ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গম-উৎপাদক অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে ট্র্যাক্টর ও ফসল-কাটা

যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় একদিকে যেমন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্যদিকে শ্রমের লাঘব হওয়ায় কম শ্রমিকের সাহায্যে বিস্তীর্ণ জমিতে কৃষিকার্য করা সম্ভব হইয়াছে।

বর্তমান যুগে শুধু কৃষিকার্যের উৎপাদনই বৃদ্ধি পায় নাই, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে কৃষিজ ও বনজ **সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি** পাওয়ায় ইহার চাহিদাও বাড়িয়া গিয়াছে। পাট হইতে থলিয়া, কার্পেট প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ায় পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরলবর্গীয় বৃক্ষের কাঠ হইতে কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এইজাতীয় বৃক্ষের কার্যকারিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশুপালন সম্বন্ধেও একই নীতি প্রযোজ্য। পশু হইতে সংগৃহীত দ্রব্যাদির নূতন নূতন ব্যবহার আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনের উন্নতি হইয়াছে। পশম, হাড়, চর্ম প্রভৃতি পশুজাত দ্রব্য বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত হয়। কলম্বাসের উত্তর আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্বে ঐ মহাদেশে পশুপালনের কোন বন্দোবস্ত ছিল না; কিন্তু পরে পশুখাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া মিশ্র প্রজননের বন্দোবস্ত করিয়া এই মহাদেশ পশুপালনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছে। পশুপালনের উন্নতিতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

এইভাবে দেখা যায় যে, মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-কার্যের উৎপাদনের প্রকৃতি ও পরিমাণ, চাহিদা ও ব্যবহার প্রভৃতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সর্বোপরি, কৃষিকার্যে প্রকৃতির উপর মানুষের নির্ভর-শীলতা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ
(Natural and Cultural Environment)

অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রের প্রধান কাজ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝাইয়া দেওয়া। কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ও সাংস্কৃতিক সম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করিতেছে, কিভাবে মানুষ তাহার সাংস্কৃতিক সম্পদের সাহায্যে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিয়াছে, এই সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা না থাকিলে কোনও দেশের অর্থনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা করা কঠিন।

বর্তমান যুগে প্রাকৃতিক পরিবেশকে কখনই সাংস্কৃতিক পরিবেশ হইতে পৃথক করিয়া চিন্তা করা যায় না। এই দুইটি পরিবেশ মানুষের প্রয়োজনে **পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত**। যেমন মৃত্তিকার উর্বরতা সম্পূর্ণতঃ প্রাকৃতিক সম্পদ, কিন্তু উর্বর মৃত্তিকার কার্যকারিতা নির্ভর করে মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির উপর। কৃষিক্ষেত্রের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করিয়া, সারের বন্দোবস্ত করিয়া, উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করিয়া, পরিবহণ-ব্যবস্থার সাহায্যে কৃষিজ দ্রব্যের আন্তর্জাতিক চাহিদার সৃষ্টি করিয়া মানুষ কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদের আর একটি উদাহরণ—বনভূমি। কিন্তু মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বনভূমির কাঠের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কৃত হওয়ায় বনভূমির চেহারা পাল্টাইয়া গিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে বনভূমি কাটিয়া নিঃশেষ করা হইয়াছে; আবার কোথাও বনজ সম্পদ-বৃদ্ধির জন্য মানুষ প্রচেষ্টা চালাইতেছে। এইভাবে দেখা যায় প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ উভয়েই একসঙ্গে কাজ করে এবং মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ
(Natural Environment)

প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পূর্ণতঃ প্রকৃতির সৃষ্টি। বিখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী বার্ণার্ড (L. L. Bernard) প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রধানতঃ দুইভাবে বিভক্ত করিয়াছেন—জৈব (Organic) এবং অজৈব (Inorganic)। বিভিন্ন পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, মৎস্য প্রভৃতি জৈব পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। ভূ-প্রকৃতি, নদী, সৈকতরেখা, মৃত্তিকা, জলবায়ু, অবস্থান, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি অজৈব পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাহায্যে এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে সোজাসুজি বা কিছুটা পরিবর্তিত আকারে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। এই সকল জৈব ও অজৈব প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে:

(ক) ভূ-প্রকৃতি (Topography)—ভূ-পৃষ্ঠের সকল স্থানের উচ্চতা সমান নহে। কোথাও সুউচ্চ পর্বত, কোথাও সমভূমি, কোথাও বা মালভূমি বিদ্যমান; কোনস্থান আবার সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতেও নিম্ন। প্রকৃতির এই

বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির ফলে কোন দেশ সমৃদ্ধিশালী, কোন দেশ অনুন্নত। ভূ-প্রকৃতিকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—পার্বত্যভূমি, মালভূমি ও সমভূমি।

পার্বত্যভূমি একদিকে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে অসুবিধার সৃষ্টি করে, অন্যদিকে পরোক্ষভাবে মানুষের বহু উপকারে আসে। পার্বত্য অঞ্চলের জমি অসমতল বলিয়া রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য ; এখানকার নদী খরস্রোতা বলিয়া জলপথের উন্নতি হয় না। এই সকল কারণে পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি না হওয়ায় শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার লাভ করে না। অসমতল জমিতে কৃষিকার্যের উন্নতি করা কষ্টকর। সেইজন্য এখানকার লোকবসতি অত্যন্ত বিরল। পার্বত্য অঞ্চল হইতে মানুষের বহু উপকারও সাধিত হয়। পর্বতের অবস্থান হেতু বৃষ্টিপাত হয়, পর্বত হইতে নদী-নদীর উৎপত্তি হয়, পার্বত্য অঞ্চলে বনভূমির সৃষ্টি হয়। কৃষিকার্যের জন্য বৃষ্টিপাত প্রয়োজন ; নদ-নদী দেশের সমৃদ্ধি-সাধনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। বনভূমি হইতে মানুষ কাঠ, জ্বালানি ও শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ করে ; কোন কোন পার্বত্য অঞ্চলে বিস্তীর্ণ পশুচারণ-ভূমি দেখা যায়। পর্বত হইতে নদী যখন সমতলভূমিতে প্রবেশ করে, সেই সময় ইহার স্রোত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। শিল্পে ও মানুষের বাসস্থানে এই জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া পার্বত্য অঞ্চল গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে বলিয়া পৃথিবীর বিখ্যাত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি পার্বত্য অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়।

মালভূমি অঞ্চলের অধিবাসিগণ বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। এখানে প্রচুর খনিজ সম্পদ থাকিলেও পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবে শিল্পের উন্নতি বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। এখানকার মৃত্তিকা সাধারণতঃ অনুর্বর বলিয়া চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে।

সমভূমি প্রধানতঃ নদীর উপত্যকায় সমুদ্রোপকূলে পরিলক্ষিত হয়। সমভূমিতে নদীবাহিত উর্বর পলিমাটি থাকায় কৃষিকার্যের উন্নতি হয়। সমতলভূমিতে উঁচু-নীচু না হওয়ায় পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি সহজসাধ্য হইয়া থাকে ; নদীগুলি নাব্য হওয়ায় জলপথের উন্নতি হয়। ইহার ফলে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয় এবং লোকবসতির ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। জীবিকা-নির্বাহের সুবন্দোবস্ত থাকায় অবসর সময় মানুষ সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সুযোগ পায়। এইভাবে দেখা যায় যে, ভূ-প্রকৃতি মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর বিশেষ

প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃতিকে মানুষ কিয়দংশে বশ করিলেও ভূ-প্রকৃতিকে পরিবর্তন করিবার মতো ক্ষমতা মানুষ এখনও অর্জন করিতে পারে নাই।

(খ) ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location)—কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। দেশের অবস্থানের উপর জলবায়ু নির্ভরশীল; নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলের দেশসমূহে অত্যধিক তাপমাত্রা থাকাই স্বাভাবিক। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত দেশসমূহে মৃদু জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। কৃষিকার্য এই জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল বলিয়া দেশের অবস্থানের উপর পরোক্ষভাবে কৃষিকার্যও নির্ভরশীল। বসতি-স্থাপনের উপর ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশের অত্যধিক গরমের জন্য বিরললোকবসতি বিদ্যমান; কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত দেশসমূহে মৃদু জলবায়ু থাকায় লোকবসতির ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী। ভৌগোলিক অবস্থানের উপর দেশের রাজনৈতিক নিরাপত্তা নির্ভর করে। দ্বৈপ অবস্থানযুক্ত দেশসমূহের প্রাকৃতিক সীমারেখা থাকায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া সহজসাধ্য। ইহা ছাড়া কোন দেশের অবস্থান পৃথিবীর মধ্যস্থলে হইলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা হয়। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ায় সকল দেশের সঙ্গে পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করিতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন দেশে **মহাদেশীয় অবস্থান** পরিলক্ষিত হয়; এই সকল দেশের চতুর্দিকে স্থলভাগ থাকায় বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে; সমুদ্রতীর হইতে দূরে অবস্থিত হওয়ায় বন্দরের উন্নতি হয় না বলিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইহারা উন্নতি লাভ করিতে পারে না। বলিভিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে এইজাতীয় অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। নরওয়ে, সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি দেশের **সমুদ্র-প্রান্তীয়** অবস্থান পরিলক্ষিত হয়; এই সকল দেশের এক অংশ সমুদ্রতীরে অবস্থিত হওয়ায় বন্দর-স্থাপন ও বাণিজ্যের উন্নতি বিশেষ কষ্টসাধ্য হয় না। বৃটেন, জাপান প্রভৃতি দেশ **দ্বৈপ** অবস্থানযুক্ত বলিয়া বন্দর-স্থাপন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়াছে। **উপদ্বীপীয়** অবস্থানযুক্ত দেশসমূহে তিনদিকে জল এবং একদিকে স্থল থাকায় বন্দর-গঠন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের

উন্নতিসাধন সম্ভব। সমুদ্রের নিকটবর্তী দেশসমূহ মৎস্য-শিকারেও উন্নতি লাভ করিতে পারে।

(গ) নদী (River)—মানব-সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, নদীমাতৃক দেশসমূহে প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ হইয়াছিল। নীলনদের উপত্যকায় মিশর, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় ব্যাবিলন, সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকায় ভারতবর্ষ এবং হোয়াংহো ও ইয়াংসি নদীর উপত্যকায় চীন প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান। নদী হইতে মানুষ বিভিন্ন সাহায্য পাইয়াছে বলিয়াই নদীতীরে সভ্যতার এই বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল। বর্তমান যুগেও নদী মানুষের পানীয় জল সরবরাহ করে, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে ও জলসেচনের কার্যে সাহায্য করে, জল-নিষ্কাশনের প্রণালীরূপে ব্যবহৃত হয়; জলপথে পণ্য

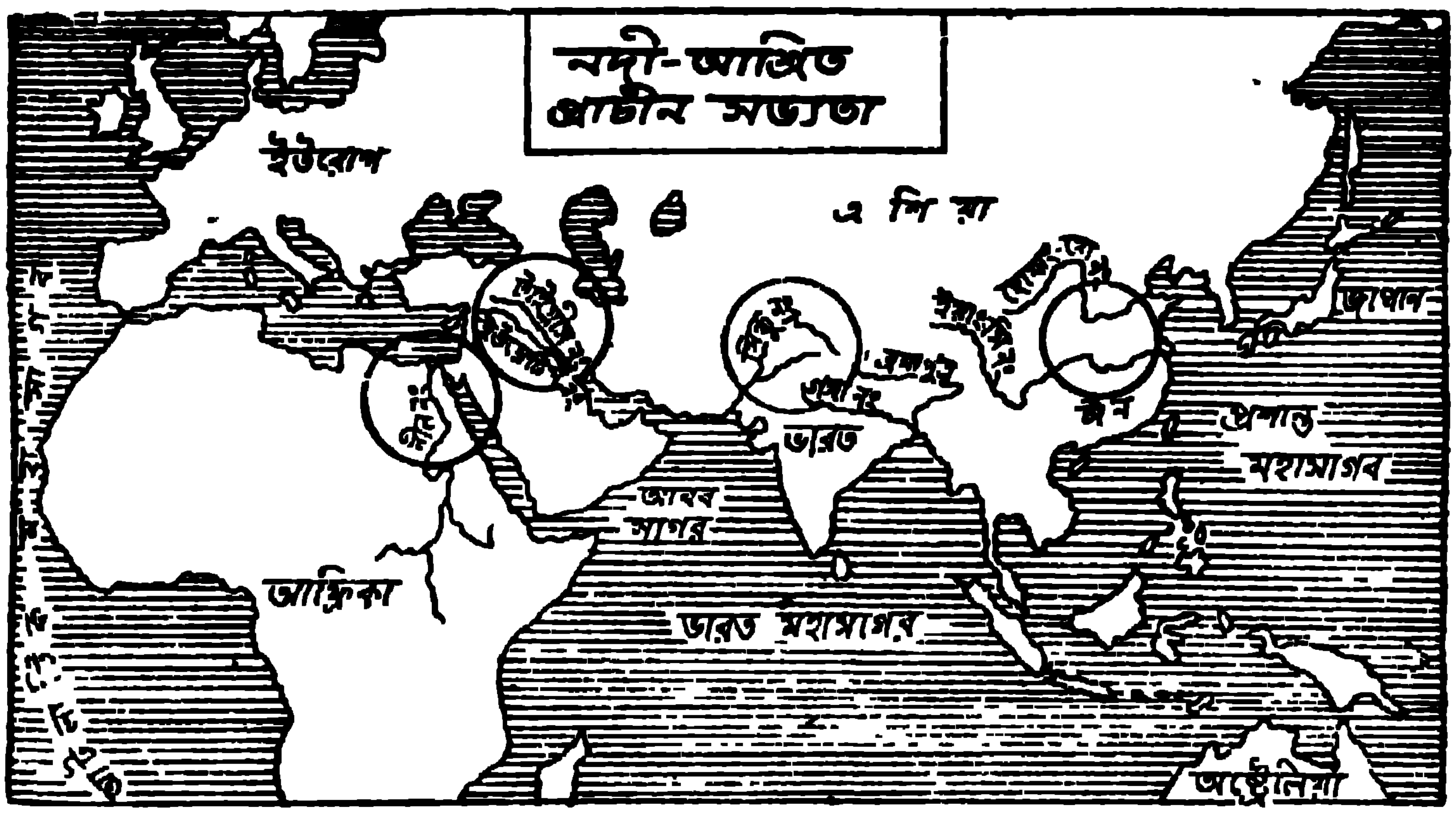

ও যাত্রী পরিবহণে সহায়তা করে এবং পলিমাটি বহন করিয়া নদী-উপত্যকাকে উর্বর করে। নদী মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে এইভাবে সাহায্য করিলেও, বন্যাদ্বারা নদী বহুবার মানুষের ঘরে ঘরে কান্নার রোল বহাইয়া দিয়াছে। অবশ্য বন্যায় প্রাথমিক ক্ষতি হইলেও বন্যার জলে জমি উর্বর হওয়ায় কৃষি-কার্যের উন্নতিতে সাহায্য করে।

(ঘ) সৈকতরেখা (Coast-line)—সৈকতরেখার প্রকৃতির উপর দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য নির্ভরশীল। সৈকতরেখা ভগ্ন হইলে বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ করা সহজ; অবশ্য এইজন্য সমুদ্রের গভীরতাও প্রয়োজন। বন্দরের উন্নতি না হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতিসাধন সম্ভবপর নহে। যে সকল

দেশে অভগ্ন সৈকতরেখা বিদ্যমান, সেখানে বন্দর-স্থাপন সম্ভব হয় না। বৃটেনের বহির্বাণিজ্যের উন্নতির মূলে আছে দেশের ভগ্ন সৈকতরেখা। আফ্রিকার দেশসমূহের অনুন্নতির অন্যতম কারণ ঐ সকল দেশের অভগ্ন সৈকতরেখা।

(ঙ) **জলবায়ু (Climate)**—মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর জলবায়ু যতটা প্রভাব বিস্তার করে, অন্য কোন প্রাকৃতিক পরিবেশ ততটা করে না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জলবায়ু মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমতঃ, **কৃষিকার্য** জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল; বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ও তুষারপাত কৃষিকার্য নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের খাদ্য কি প্রকারের হইবে তাহাও নির্ভর করে স্থানীয় জলবায়ুর উপর। এইজন্য বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত এবং পাঞ্জাবীর প্রধান খাদ্য গমের রুটি। বাংলাদেশের জলবায়ু ধান উৎপাদনের এবং ভাত পরিপাকের সহায়ক; পাঞ্জাবের জলবায়ু গম উৎপাদনের ও রুটি পরিপাকের সহায়ক। দ্বিতীয়তঃ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর প্রধানতঃ স্বাভাবিক **উদ্ভিজ্জ** নির্ভরশীল। জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে; কিন্তু নিরক্ষীয় জলবায়ুতে চিরহরিৎ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, **পশুপালন** স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের উপর নির্ভরশীল। কারণ, তৃণভূমি অঞ্চলে পশুপালন উন্নতি লাভ করে। জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে তৃণ ছোট বা বড় হয়। দীর্ঘ তৃণ গবাদি পশুপালনের এবং ক্ষুদ্রকায় তৃণ মেষ, ছাগল প্রভৃতি পশুপালনের উপযোগী। চতুর্থতঃ, জলবায়ুর তারতম্যের ফলে সৃষ্ট শীতল ও উষ্ণ স্রোতের মিলন হয় বলিয়া পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে বিখ্যাত **মৎস্যক্ষেত্র** গড়িয়া উঠিয়াছে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু প্রধানতঃ মৎস্যশিকারের উপযোগী। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক মৎস্য-চাষের উপর নির্ভরশীল। পঞ্চমতঃ, মানুষের **বসবাসের** স্থানও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। জলবায়ুর বিভিন্নতার জন্য কোনস্থান অত্যধিক গরম, কোনস্থান অত্যধিক ঠাণ্ডা, কোনস্থান মরুভূমি, কোনস্থান বরফাচ্ছন্ন। নাতিশীতোষ্ণ ও মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল জীবনধারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল বলিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এই সকল জলবায়ু অঞ্চলে বাস করে। উপনিবেশ-স্থাপনও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। ঔপনিবেশিকের দল তাহাদের দেশের অনুরূপ জলবায়ু-যুক্ত অঞ্চলেই সাধারণতঃ উপনিবেশ স্থাপন করে।

ষষ্ঠতঃ, **যন্ত্রশিল্পের** উপর জলবায়ু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শিল্পগঠনের জন্য প্রয়োজন কাঁচামাল, শ্রমনৈপুণ্য, পরিবহণ-ব্যবস্থা ও চাহিদা। শিল্পের এই সকল উপাদানের উপর জলবায়ুর প্রভাব খুব স্পষ্ট। **কাঁচামাল** অধিকাংশই কৃষিজ, বনজ ও পশুজাত দ্রব্য ; ইহাদের উৎপাদন জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। পাটচাষের উপযোগী জলবায়ু থাকিলেই পাট-উৎপাদন ও পাটশিল্পের উন্নতি সম্ভবপর। তূলা উৎপাদনের উপযোগী জলবায়ু এবং সূক্ষ্ম সূতা উৎপাদনের উপযোগী আর্দ্র জলবায়ু থাকিলেই কার্পাসবয়ন-শিল্প উন্নতি লাভ করিবে। **শ্রমনৈপুণ্য** নির্ভর করে জলবায়ুর উপর। উষ্ণ জলবায়ুতে শ্রমিক অল্প সময় কাজ করিবার পরেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শ্রমিক অধিক সময় নিপুণভাবে কাজ করিতে পারে। শিল্পের উন্নতির জন্য **পরিবহণ-ব্যবস্থা** একান্ত প্রয়োজন। কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদ শিল্পকেন্দ্রে আনিতে এবং শিল্পজাত দ্রব্য বাজারে পাঠাইতে পরিবহণ-ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। উত্তাপ, বায়ুপ্রবাহ, তুষারপাত ও বৃষ্টিপাতের উপর পরিবহণ-ব্যবস্থা বহুলাংশে নির্ভরশীল। অত্যধিক ঘূর্ণিবায়ুর জন্য বিমান-চলাচল ব্যাহত হয়, অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে অথবা বরফ জমিয়া রেলপথ, রাস্তাঘাট বা নদ-নদী পরিবহণের অনুপযোগী হইয়া যায়। শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন নির্ভর করে **চাহিদার** উপর। জলবায়ু এই চাহিদা-সৃষ্টির উপরও প্রভাব বিস্তার করে। শীতপ্রধান দেশে পশমী দ্রব্যের চাহিদা বেশী, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কার্পাসবস্ত্রের চাহিদা বেশী। সেইজন্য বৃটেন, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশমবয়ন-শিল্পে এবং ভারত ও চীন কার্পাসবয়ন-শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

(চ) মৃত্তিকা (Soil)—কৃষিকার্যের উন্নতি নির্ভর করে মৃত্তিকার উর্বরা-শক্তির উপর। চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ভারতের কৃষিকার্যের উন্নতির মূলে রহিয়াছে তাহাদের মৃত্তিকার উর্বরতা। মহারাষ্ট্র রাজ্যের শোলাপুরে কৃষ্ণমৃত্তিকা থাকার জন্যই প্রচুর পরিমাণে তূলা ঐ অঞ্চলে উৎপন্ন হইতেছে। প্রাচীনকালের ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, মানব-সভ্যতার বিকাশের সহিত মৃত্তিকার উর্বরতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রাচীনকালে সভ্যমানুষ যেখানে কৃষিকার্যের উপযোগী উর্বর জমি পাইয়াছে, সেখানেই বসতি স্থাপন করিয়াছে। ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর বলিয়া এখানে সভ্যতার উন্মেষ হইয়াছিল।

(ছ) খনিজ সম্পদ (Minerals)—বিভিন্ন খনিজ সম্পদ বিশেষতঃ কয়লা ও খনিজ তৈলের ন্যায় জড়শক্তির উৎসসমূহ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। শিল্প-বিপ্লবের পর হইতে খনিজ সম্পদ যন্ত্রশিল্পের উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। খনিজ সম্পদের সন্ধানে মানুষ ছুটিয়া চলিয়াছে দূর-দূরান্তরে মরুভূমিতে বা বসবাসের অযোগ্য স্থানে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি অঞ্চলে স্বর্ণখনি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতকায় মানুষ সেখানে ছুটিয়া চলিল। আটাকামা মরুভূমিতে খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়ায় এই মরু অঞ্চলেও মানুষ বসবাস করিতে দ্বিধা করিতেছে না। কারণ খনিজ সম্পদ দেশের শ্রীবৃদ্ধিতে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। বর্তমান যুগে ইস্পাতশিল্পের উন্নতি দ্বারা দেশের শিল্পোন্নতির পরিমাপ করা হয়। ইস্পাতশিল্পের উন্নতি নির্ভর করে কয়লা লৌহ আকরিক প্রভৃতি খনিজ সম্পদের উপর। বর্তমান যুগে যে সকল দেশে এই সকল খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়, সাধারণতঃ সেই সকল দেশেই শিল্পোন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান যুগে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে খনিজ সম্পদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

(জ) উদ্ভিজ্জ (Vegetation)—দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে উদ্ভিজ্জের অবদান কম নহে। জলবায়ুর প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রণে, মৃত্তিকার ক্ষয়রোধে, বন্যা-নিয়ন্ত্রণে, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে, প্রবল ঝঞ্ঝা-দমনে উদ্ভিজ্জ প্রভূত সাহায্য করে। ইহা ছাড়া বনভূমি হইতে ফলমূল ও কাঠ সংগ্রহ করিয়া মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। জ্বালানি, আসবাবপত্র, বাড়ীঘর নির্মাণের সাজ-সরঞ্জাম, মোটর-গাড়ী, বাস্, নৌকা, জাহাজ, রেলের কামরা, প্যাকিং বাক্স, দিয়াশলাই ও কাষ্ঠমণ্ড প্রভৃতি তৈয়ারীর জন্য বনভূমির কাঠ ব্যবহৃত হয়। কাষ্ঠমণ্ড হইতে কাগজ, রেয়ন ও কৃত্রিম সুরাসার প্রস্তুত হয়। তৃণভূমি অঞ্চলে পশুপালন উন্নতি লাভ করে। পশু হইতে মাংস, চর্ম, পশম ও দুগ্ধজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

এই সকল প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও, বর্তমান যুগে মানুষ সম্পূর্ণতঃ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল নহে। নিজের প্রয়োজনের তাগিদে প্রাকৃতিক সম্পদের রূপ-পরিবর্তন করিয়া প্রকৃতিকে নিজের বশে আনিয়া মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে নিয়োজিত করিবার নিরলস প্রচেষ্টায় মানুষ ব্যস্ত। তাপ-নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে মানুষ

জলবায়ুর প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, সারের সাহায্যে অনুর্বর জমিকেও কৃষিকার্যে নিয়োজিত করিতেছে, মরুভূমিতে নলযোগে জল আনিয়া বসবাসের বন্দোবস্ত করিতেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ যেখানে মানুষের উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করিতেছে, সেখানেই ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সেই বাধা অতিক্রম করা হইতেছে।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ
(Cultural Environment)

গতিশীল জগতে মানুষের সাংস্কৃতিক মান ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার ক্রমশঃই অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। সাংস্কৃতিক পরিবেশের কার্যকারিতা অনুসারে বিখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী বার্ণার্ড (L. L. Bernard) ইহাকে নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :

(ক) আবিষ্কার ও শিক্ষা-দীক্ষার পরিবেশ—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শিখিল কিভাবে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব সম্পদ হইতে মানুষের প্রয়োজনীয় নানাবিধ সামগ্রী সৃষ্টি করা যায়। প্রথমতঃ, **অজৈব পদার্থ** হইতে মানুষ তাহার বুদ্ধিবলে বিভিন্ন সম্পদ উৎপন্ন করিয়া এক নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। খনিজ সম্পদের নূতন নূতন ব্যবহার আবিষ্কার করিয়া, খনিজ দ্রব্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্যে যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়া, পরিবহণ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করিয়া, গৃহাদি নির্মাণ করিয়া ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া মানুষ এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। এই পরিবেশ মানুষেব অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, **জৈব সম্পদকে** বুদ্ধিবলে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া মানুষ একটি সুন্দর নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। মিশ্র প্রজননের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশুর সৃষ্টি হইতেছে। বন্য পশুকে বশ করিয়া মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে। কৌশলে বন্য হস্তী ধরিয়া ইহার প্রচণ্ড শক্তিকে ব্যবহার করা হইতেছে কাষ্ঠ-পরিবহণে। সঙ্কর বীজের সাহায্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। এমনকি অশিক্ষিত মানুষকে অধিকতর বুদ্ধিমান মানুষ নানাবিধ কাজ শিখাইয়া বিভিন্ন কার্যে নিয়োগ করিতেছে। দাস-প্রথার সাহায্যে মানুষকে জোরপূর্বক কার্যে নিয়োজিত করিবার কথা মানুষ এখনও ভুলিয়া যায় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

নিগ্রোদের দাস হিসাবে আমদানি করিয়া কাজ শিখাইয়া বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত করা হইয়াছে। বর্তমান যুগে ছাত্রকে শিক্ষা দিয়া উন্নততর মানুষে পরিণত করা হয়, যুবককে চর্চাদ্বারা সৈনিক তৈয়ার করা হয়, খেলাধুলা শিক্ষার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের উৎকৃষ্ট খেলোয়াড়ে পরিণত করা হয়। মানুষ শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে এইভাবে জৈব শক্তিকে বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত করিয়া এক নূতন সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে।

(খ) মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক পরিবেশ—ভাষা ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক পরিবেশ গড়িয়া ওঠে। প্রথমতঃ, আদিম সভ্যতার যুগে ভাষা আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ **ভাবভঙ্গী** দিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিত। এই ভাবভঙ্গীর ভাষার মধ্যেও গড়িয়া উঠিয়াছিল এক সামাজিক ঐক্য পরিবেশ। বর্তমানেও যে এইজাতীয় পরিবেশ পৃথিবীর কোন অঞ্চলে নাই একথা বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, মানব-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় **কথ্য ভাষার**। মানুষ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কথ্য ভাষার সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত করে। ইহার ফলে ভাষাভিত্তিক সমাজের সৃষ্টি হয়। একই ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব ব্যক্ত হওয়ায় মানুষের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যও গড়িয়া ওঠে। যে সকল লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে তাহাদের মধ্যে একটি মানসিক ঐক্য বিদ্যমান। এক ভাষা-ভাষী লোক প্রায় একই রকম বিশ্বাস, সংস্কার, মতবাদ ও নিয়মকানুনের সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

তৃতীয়তঃ, সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আবিষ্কার করিল **লিখিত ভাষা**। লিখিত ভাষা আবিষ্কারের ফলে মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হইয়া গেল। মানুষ তাহার লব্ধ জ্ঞান পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। একস্থান হইতে অন্যস্থানে চিঠির মারফত খবর পাঠানো সম্ভব হইল। সৃষ্টি হইল উচ্চাঙ্গের ভাষা, কাব্য, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য; উন্নতি হইল বিভিন্ন বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার; লিখিত ভাষার আবিষ্কার না হইলে বিজ্ঞান, কলা ও দর্শন যুগে যুগে প্রবাহিত হইতে পারিত না এবং উন্নতি লাভ করিতে পারিত না। বিজ্ঞানের উন্নতি না হইলে শিল্পের প্রসার হইত না, ঔষধ আবিষ্কার হইত না, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হইত না, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইত না। সুতরাং লিখিত ভাষা বর্তমান সভ্যতার প্রধান বাহক। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন

যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে। ডাক, তার, টেলিফোন, টেলিভিসন, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, রেকর্ড প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষ একস্থান হইতে অন্যস্থানে তাহার ভাব প্রেরণ করিতে পারে। এইভাবে লিখিত ভাষা ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা বর্তমান সাংস্কৃতিক পরিবেশকে উন্নততর করিয়াছে।

(গ) সাংগঠনিক পরিবেশ—প্রধানতঃ সাংগঠনিক কার্যকলাপের ফলে এই পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পরিবেশ প্রধানতঃ মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান যুগে রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার উন্নতি হওয়ায় রাষ্ট্র ও সরকারের সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্র ও সরকার-সৃষ্ট পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

সাংস্কৃতিক পরিবেশের তারতম্য—পৃথিবীর সকল স্থানের সাংস্কৃতিক পরিবেশ এক নহে। কোন কোন অঞ্চলে মানুষ এখনও অশিক্ষিত, বর্বর এবং পশু শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে ; আবার কোন কোন দেশে মানুষ শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে অত্যন্ত উন্নত। কঙ্গোর আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক মানের সঙ্গে স্পুটনিক-আবিষ্কারক রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের সাংস্কৃতিক মানের কোনও তুলনা হয় না। অনেক ভৌগোলিক মনে করেন যে, বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের সামাজিক পরিবেশ থাকিবার জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক পরিবেশের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের মতে এই পার্থক্যের কারণ সরকারের কর্মকুশলতা, লোকবসতির ঘনত্ব, জাতি, ধর্ম প্রভৃতির প্রভাব। সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার ফলে বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির তারতম্য হইয়া থাকে।

(১) সরকারের কর্মকুশলতা—প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকিলেও যতক্ষণ পর্যন্ত সেই দেশের সরকার প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের প্রয়োজনে নিযুক্ত করিবার সুবন্দোবস্ত না করে, ততক্ষণ সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়া কঠিন। সরকারের কর্মকুশলতা ও সদিচ্ছার উপর বর্তমান যুগে দেশের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। রাশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ জারের রাজত্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। কিন্তু জারের সময় সরকারের অকর্মণ্যতায় সেই দেশের কোনও উন্নতি হয় নাই। বিপ্লবের পর নূতন সরকার সমাজতান্ত্রিক পন্থায় সেই দেশের দ্রুত উন্নতি সাধন করিয়াছে। বর্তমানে রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। ইহা ছাড়া পরাধীন দেশ

কখনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে সক্ষম হয় না। কারণ সেখানকার সরকার দখলকারী সাম্রাজ্যবাদী দেশের উন্নতিসাধনের জন্যই সর্বদা সচেষ্ট থাকে। ভারত যখন পরাধীন ছিল, সেই সময় বৃটিশ সরকার সর্বদাই ভারতের সম্পদ শোষণ করিয়া বৃটেনের অর্থনৈতিক উন্নতিতে নিয়োজিত করিত। ইহার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয় নাই। স্বাধীনতার পর স্বাধীন সরকার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত দেশের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে। এইভাবে দেখা যায়, সরকারের কর্মকুশলতা ও সদিচ্ছা মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(২) **লোকবসতি**—দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে জনসংখ্যার প্রভাব বিদ্যমান। জনবহুল দেশ মানুষের অভাব মিটাইবার জন্য সচেষ্ট হয় এবং দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করে। যে সকল দেশে আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা কম, সেখানে কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিয়া এবং শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ ও আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম থাকিলে উন্নতি ব্যাহত নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও লোকাভাবে অস্ট্রেলিয়া আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। 'শ্বেত অস্ট্রেলিয়া নীতি'র ফলে এখানকার লোকবসতি বৃদ্ধি পাইতেছে না; অন্যদিকে ভারত, চীন ও জাপান তাহাদের জনসম্পদকে কাজে লাগাইয়া দেশের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতেছে। বর্তমান যুগে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে লোকসংখ্যার অভাবে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয় না। রাশিয়ার আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা কম; কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি প্রয়োগের ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অল্প লোকের সাহায্যে চাষ-আবাদ করা সম্ভব হইয়াছে।

(৩) **জাতি**—বিংশ শতাব্দীতে মানব-সভ্যতার যথেষ্ট অগ্রগতি হইলেও এখনও বহুস্থানে জাতি ও ধর্ম অর্থনৈতিক উন্নতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। পৃথিবীর মানুষকে সাধারণতঃ তিনটি জাতিতে বিভক্ত করা যায়—শ্বেতকায়, পীতকায় ও কৃষ্ণকায় জাতি। শ্বেতকায় জাতি বলিতে শ্বেতবর্ণের মানুষ ও আর্যগণকে বুঝায়; যথা, ইউরোপীয়, ভারতীয় ও উত্তর আমেরিকার অধিবাসিগণ। পীতকায় জাতি বলিতে প্রধানতঃ মঙ্গোলীয় জাতিকে বুঝায়। ইহাদের গায়ের রং হরিদ্রাভ এবং চেহারা খর্বকায়। চীন, জাপান, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ এই জাতির অন্তর্ভুক্ত।

কৃষ্ণকায় জাতি বলিতে সাধারণতঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলের কৃষ্ণকায় অধিবাসিগণকে বুঝায়। ইহাদের গায়ের রং অত্যন্ত কালো এবং দেহের গঠন অত্যন্ত শক্ত। আফ্রিকার নিগ্রোজাতীয় লোকেরা এই জাতির অন্তর্ভুক্ত।

অনেক ভৌগোলিক মনে করেন যে, শ্বেতকায় লোকেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী, এইজন্য ইহারা শিল্পে ও বাণিজ্যে অত্যন্ত উন্নত। বর্তমান পৃথিবীতে এইজন্য ইহারা প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। পীতকায় লোকেরাও অত্যন্ত কর্মঠ ও বুদ্ধিমান্। ইহার ফলে এই জাতির লোকেরাও কৃষিকার্য, শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতেছে। এই সকল ভৌগোলিকদের মতে কৃষ্ণকায় লোকেরা শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারিলেও বুদ্ধিমত্তায় ততটা পারদর্শী নহে; ইহার জন্য কৃষ্ণকায়গণ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

বর্তমান সভ্য জগতে অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে জাতিভেদ প্রথার প্রভাব অনেকেই স্বীকার করেন না। নৃতত্ত্বশাস্ত্রের পণ্ডিতগণও এই মতবাদকে সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে পারেন নাই। মানুষের জন্মের স্থান-নির্ণয় আকস্মিক ঘটনা মাত্র। কোন লোক আফ্রিকায় কোন নিগ্রোর বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই মূর্খ হইবে, এই কথা কোন সৎ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি কখনই স্বীকার করিবেন না। অনুন্নত কৃষ্ণকায় জাতিসমূহের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ উহাদের বর্ণ বা জাতি নহে; এর মূল কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ কর্তৃক ইহাদের সম্পদ-শোষণ। বৃটিশ রাজত্বে ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ ছিল বৃটিশের শোষণ; অন্য যুক্তি বর্তমানে অচল। কঙ্গোর অনুন্নতির প্রধান কারণ বেলজিয়ানগণ কর্তৃক ঐ দেশের খনিজ সম্পদের শোষণ। বেলজিয়ামের লোক কঙ্গোর অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ খুঁজিতে যাইয়া জাতিভেদ প্রথার দোহাই দিলেও বর্তমানে কেহই তাহা বিশ্বাস করিবে না।

(৪) **ধর্ম**—বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও অর্থনৈতিক জীবনে ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। পৃথিবীতে প্রধানতঃ চারিটি ধর্ম বিদ্যমান—হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ ও খৃস্টধর্ম। হিন্দুধর্মাবলম্বিগণ গরুকে ভক্তি করে বলিয়া গো-মাংসের ব্যবসায়ে তাহারা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ভারত গবাদি পশুপালনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিলেও, গো-মাংসের রপ্তানি-বাণিজ্যে এই দেশ অংশগ্রহণ করে না। হিন্দুধর্মে জাতিভেদ প্রথার কুসংস্কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। ইসলাম

ধর্মে সুদগ্রহণ ও মদ্যপান নিষিদ্ধ বলিয়া মুসলমান-অধ্যুষিত দেশসমূহে ব্যাঙ্কিং ও মদ্যশিল্প ভালোভাবে গড়িয়া ওঠে নাই। বৌদ্ধধর্মাবলম্বিগণ অহিংস বলিয়া এই ধর্মে মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম-প্রধান দেশে মাংসের ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ না করা স্বাভাবিক। খৃস্টধর্মে সামাজিক অনুশাসন কম থাকায় এই ধর্মাবলম্বিগণ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বর্তমান যুগে ধর্মের অনুশাসন ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে এবং ধর্মের প্রতিপত্তিও কমিয়া আসিতেছে। মার্ক্সীয় দর্শনের আবির্ভাবে পৃথিবীর বহু লোক ভগবানের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না এবং ধর্মীয় অনুশাসন মানিয়া চলে না। এইজন্য চীন ও জাপানের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অধিবাসিগণ মাংসভক্ষণে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। কাবুলিওয়ালারা ইসলাম-ধর্মাবলম্বী হইয়াও সুদের ব্যবসায়ে সিদ্ধহস্ত। বহু হিন্দু কুক্কুটমাংসে পরম তৃপ্তি লাভ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্তমান যুগে ধর্মের অনুশাসন অর্থনৈতিক উন্নতিতে বিশেষ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। যাহারা ভারত ও চীনের অনুন্নতির জন্য ধর্মের অনুশাসনকে দায়ী করিয়াছিল, তাহারা আজকের চীন ও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে তাকাইয়া দেখিলে তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিবে। ভারত ও চানের বর্তমান অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির মূলে রহিয়াছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা—ধর্ম নহে।

পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামঞ্জস্য-বিধান (Direct and Indirect adjustment of Environment)—যুগে যুগে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে, অথবা প্রকৃতিকে নিজের সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা পরিবর্তিত করিয়া নিজের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিয়াছে। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশেই সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধিসম্ভূত নানাবিধ আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের ফলেই প্রতিকূল পবিবেশকে মানুষের অনুকূলে আনা হইয়াছে। একদিকে মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশ এইভাবে প্রকৃতিকে বশে আনিবার কার্যে নিয়োজিত হইয়াছে—কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে; অন্যদিকে প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূলে আনিবার জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের সংস্কৃতি।

প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক পরিবেশকে বশে আনিতে **প্রত্যক্ষভাবে** মানুষের সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে। অত্যধিক শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানুষ বুদ্ধিবলে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছিল; কঠিন প্রস্তরকে ভাঙ্গিবার

জন্য মানুষের চেষ্টা ও বুদ্ধির ফলে সৃষ্টি হইয়াছিল কুঠার। ইহাই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সাংস্কৃতিক পরিবেশের সামঞ্জস্য-বিধানের বা খাপ খাওয়াইবার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সাংস্কৃতিক মানেরও উন্নতি হইয়াছে। এই যুগে মানুষকে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য-বিধান করিতে হয় নাই। বর্তমানের জটিল অবস্থার যুগে এই সামঞ্জস্য-বিধানও প্রত্যক্ষ না হইয়া **পরোক্ষভাবে** হইয়া থাকে। শিল্প-বিপ্লবের পর হইতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইতেছে। নূতন নূতন যন্ত্রপাতি-আবিষ্কারের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে আরও সুন্দরভাবে খাপ খাওয়াইবার চেষ্টাই লুক্কায়িত আছে। পূর্বে যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জন্য সাধারণ ইস্পাত-দ্রব্য ব্যবহৃত হইত। ক্রমশঃ উচ্চতাপে অত্যধিক ধারালো অস্ত্রের প্রয়োজন হওয়ায় সৃষ্টি হইল টাংস্টেন-ইস্পাত ও কোবাল্ট-ইস্পাত। এই সকল আবিষ্কার মানুষের সাংস্কৃতিক মান-উন্নয়নের পরিচায়ক; ইহা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনকে খাপ খাওয়াইবার পরোক্ষ সামঞ্জস্য-বিধান ছাড়া আর কিছুই নহে।

বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার জন্য মানুষেরই পরোক্ষ প্রচেষ্টা। আদিম যুগে মানুষ বন্যপশুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দলবদ্ধ হইয়াছিল। মানুষের এই দলবদ্ধতা প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ ফল। সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হইল বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; সর্বশেষে সৃষ্টি হইল রাষ্ট্র ও সরকার। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যে 'গণতন্ত্র' (Democracy) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সংস্কৃতির পরোক্ষ সামঞ্জস্য-বিধান; আদিম কালের দলবদ্ধ মানুষের সংগঠন হইতে বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক সমাজগঠনের ইতিহাস আলোচনা করিলেই এই পরোক্ষ সামঞ্জস্য-বিধানের চরিত্রটি উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। রাশিয়া ও চীনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও তৎকালীন পরিবেশ আলোচনা করিলেও এই পরোক্ষ সামঞ্জস্য-বিধানেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। **এইভাবে দেখা যাইবে, মানুষের উন্নতি নির্ভর করে একদিকে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং অন্যদিকে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও জীবনমান রক্ষার প্রচেষ্টার উপর।**

সংস্কৃতি স্থানান্তরের একটি উদাহরণ (An example of Culture Transfer)—প্রাচীন যুগ হইতেই মানুষ বিভিন্ন ভাগে দলবদ্ধ হইয়া পৃথক-ভাবে স্বীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি করিত। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর সংস্কৃতির উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করিত। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা অনুসারে সাংস্কৃতিক পরিবেশের পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত এবং এখনও হয়। কঙ্গোর প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রতিষ্ঠিত তৎস্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিশ্চয়ই মস্কোর স্পুটনিক-আবিষ্কারক সংস্কৃতির তুলনা করা যায় না। প্রাকৃতিক পরিবেশ এই পার্থক্যের জন্য বহুলাংশে দায়ী। অবশ্য এক অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের মানুষের মিলনের ফলে এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশের সংস্কৃতিকে কিছুটা প্রভাবিত করিয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্যের দরুন দুই অঞ্চলের সংস্কৃতিকে এক ছাঁচে ঢালা প্রায় অসম্ভব। কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসারে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে। সুতরাং একস্থানের সংস্কৃতিকে অন্যস্থানে জোরপূর্বক প্রয়োগ করিলে তাহার কুফল দেখা দিবে। বৃটিশ আমলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হইবার ইতিহাসের দৃষ্টান্ত হইতেই সংস্কৃতি-স্থানান্তরের কুফলের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

ভারত প্রায় দুইশত বৎসর বৃটেনের দখলে ছিল। বৃটেনের সকল আইন-কানুন, কর ও শুল্ক-ব্যবস্থা এবং শাসন-ব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছে। ভারতের উন্নতিতে স্থানীয় লোকের বিশেষ কোনও হাত ছিল না; ভারতের ভাগ্য লইয়া খেলা করিত বৃটেনের ভাগ্যনিয়ন্তাগণ। তাহারা বৃটেনের শিল্পোন্নত সংস্কৃতিকে ভারতের উপর সমভাবে চাপাইয়া দিল। কিন্তু এই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে বৃটেনের প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনও মিল নাই, বরঞ্চ উল্টো। যেমন:

বৃটেন	ভারত
১। আয়তন ক্ষুদ্র।	আয়তন অত্যন্ত বৃহৎ।
২। প্রধানতঃ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা বেশী।	কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয়তা বেশী
৩। কৃষিকার্য-প্রসারের উপযোগী বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যমান নাই।	কৃষিকার্য-প্রসারের জন্য স্থানের কোনও অভাব নাই।
৪। অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ দেশ।	মাঝারি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ।

বৃটেন	ভারত
৫। প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষতঃ খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য।	প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষতঃ কৃষিজ সম্পদের প্রাচুর্য বেশী।
৬। জীবনমান অত্যন্ত উন্নত।	জীবনমান অত্যন্ত নিম্ন।
৭। পরিবহণের সুবন্দোবস্ত বিদ্যমান।	পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাব।

এইভাবে দেখা যায় দুইটি দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পূর্ণ বিপরীত। বৃটেন তাহার সংস্কৃতি এই দেশে 'রপ্তানি' করার ফলে ভারতের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইয়াছিল। এই দুইটি দেশে প্রায় একই শুল্ক-নীতি প্রবর্তিত ছিল। কিন্তু ভারত প্রধানতঃ চা ও পাট রপ্তানি করিত এবং বৃটেন ঐ সব দ্রব্য আমদানি করিত। সুতরাং এই দুই দেশের শুল্ক-নীতি কখনই এক হইতে পারে না। অবশ্য চা ও পাট সংক্রান্ত শুল্ক-নীতি বৃটেনের স্বার্থে এবং ভারতের অর্থনীতির প্রতিকূলে রচিত হইত। লোকবসতি সম্বন্ধেও এই দুই দেশে কখনও একই নীতি চলিতে পারে না। বৃটেনে অত্যধিক ঘনবসতি থাকিলেও শিল্পের তুলনায় শ্রমিকের অভাব কখনও কখনও অনুভূত হয়। সেইজন্য এই দেশে শ্রম লাঘব করিবার যন্ত্রপাতি (Labour saving devices) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ভারতে লোকসংখ্যা সম্পদের তুলনায় বেশী বলিয়া এইসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইলে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া অর্থনীতি বিপর্যস্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রশ্নাবলী

1. **What do you mean by Culture? What is the relation between Culture and the Machine?**

উঃ—৬৪ পৃঃ—৬৫ পৃঃ হইতে সংস্কৃতির সংজ্ঞা লিখ এবং 'সংস্কৃতি ও যান্ত্রিক যুগ' (৬৭ পৃঃ—৬৮ পৃঃ) লিখ।

2. **"Culture is a joint product of Man and Nature."—Elucidate.**

উঃ—'সংস্কৃতি—মানুষ ও প্রকৃতির যুগ্ম সৃষ্টি' (৬৫ পৃঃ—৬৭ পৃঃ) লিখ।

3. **Explain how Culture has helped in the development of agriculture.**

উঃ—'সংস্কৃতি ও কৃষিকার্য' (৬৮ পৃঃ—৭০ পৃঃ) লিখ।

4. **'Man is a product of Environment'—Explain this statement with reference to Natural and Cultural Environments.**

উঃ—'প্রাকৃতিক পরিবেশ' (৭২ পৃঃ—৭৮ পৃঃ) এবং 'সাংস্কৃতিক পরিবেশ' (৭৮ পৃঃ—৮৩ পৃঃ) হইতে সংক্ষেপে লিখ।

5. Explain the classifications of Cultural Environment as suggested by Bernard.

উঃ—'সাংস্কৃতিক পরিবেশ' (৭৮ পৃঃ—৮০ পৃঃ) লিখ।

6. What do you mean by Direct and Indirect adjustment of Environment ? Explain, with an example, the effect of Culture transfer.

উঃ—'পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামঞ্জস্য-বিধান' (৮৩ পৃঃ—৮৪ পৃঃ) এবং 'সংস্কৃতির স্থানান্তরের একটি উদাহরণ' (৮৫ পৃঃ—৮৬ পৃঃ) লিখ।

7. Examine the correlation between physical and cultural environment on the one hand and man's economic activity and living standard on the other. [C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উঃ—'প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ১ম ও ২য় প্যারাগ্রাফ (৭০ পৃঃ— ৭১ পৃঃ), 'সাংস্কৃতিক পরিবেশ' (৭৮ পৃঃ— ৮৩ পৃঃ) এবং 'পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামঞ্জস্য বিধান' (৮৩ পৃঃ— ৮৪ পৃঃ) সংক্ষেপে লিখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৎস্য-চাষ
(Fisheries)

সমুদ্রের অর্থনৈতিক তাৎপর্য (Economic Significance of Sea)—পৃথিবীব্যাপী সাগর-মহাসাগরের অগাধ জলরাশি মানুষের খাদ্য, নানাবিধ কাঁচামাল ও শক্তির বিপুল ভাণ্ডার। পৃথিবীর সমস্ত কলকারখানায় যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহৃত হয় তাহা অপেক্ষা বেশী সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা, স্রোত ও ঢেউ হইতে উৎপাদিত হইতে পারে। সমুদ্র হইতে শক্তি উৎপাদনের কারিগরী অসুবিধা হয়তো নিকট-ভবিষ্যতে দূর করা সম্ভব হইবে।

সমুদ্রজল হইতে নানাবিধ **খনিজ পদার্থ** উৎপাদনেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া সমুদ্রজল হইতে লবণ উৎপাদন করা হইতেছে। অধিক পরিমাণ সমুদ্রজল একসঙ্গে ব্যবহারের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য আজকাল সমুদ্র হইতে ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও ব্রোমিন উৎপাদিত হইতেছে। সমুদ্রজল হইতে ব্রোমিন তৈয়ারীর প্রথম কারখানা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৪ সালে স্থাপিত হয়। সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ হইতে আইয়োডিন ও পটাশ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে নিঃসন্দেহে জানা গিয়াছে যে, মহাসমুদ্রের তলদেশে তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং প্রায় সর্বপ্রকারের খনিজ সম্পদ বিপুল পরিমাণে স্তূপীকৃত এবং পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। একদিন হয়তো প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের জন্য মানুষকে ভূগর্ভ হইতে সমুদ্রগর্ভের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইবে।

সমুদ্রের সর্বপ্রাচীন ব্যবহার **মৎস্য** উৎপাদনের জন্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে মানুষের খাদ্যের একাংশ সমুদ্র হইতে সংগ্রহ করা হইতেছে। আজও সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চাউলভোজী জনসাধারণের আমিষজাতীয় খাদ্যের প্রধান উপকরণ মৎস্য। এই সকল দেশে মাংসের ব্যবহার কম। অধিক পশুমাংস-ব্যবহারকারী ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলিতেও দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় মৎস্যের স্থান রহিয়াছে। মেরু অঞ্চলের জনগণের সর্বপ্রধান খাদ্য সামুদ্রিক মৎস্য। সামুদ্রিক মৎস্যে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিবিধ খনিজ লবণ, ভিটামিন ডি ও আইয়োডিন পাওয়া যায়। সেইজন্য

সুষম পুষ্টিকর খাদ্যতালিকায় ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয়। নরওয়ে, স্কটল্যাণ্ড, বৃটানি, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও লাব্রাডার উপকূল প্রভৃতি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি উষর ও পর্বতময় বলিয়া কৃষি-উপযোগী ভূমি সামান্য। ফলে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ **খাদ্যের উৎস** ও **কর্মসংস্থানের উপায়** হিসাবে সামুদ্রিক মৎস্য-শিকার, নৌ-চালনা ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। মৎস্য শুধু খাদ্য নহে; ঔষধ, সার প্রভৃতিও সামুদ্রিক মৎস্য হইতে প্রস্তুত হয়। তিমি মাছের চামড়া ও তৈল, বিশেষ জাতীয় সিল মাছের ফার, মুক্তা, প্রবাল, স্পঞ্জ, শঙ্খ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমুদ্র হইতে সংগ্রহ করা হয়। গ্লিসারিণ, সাবান, বার্নিস প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য তিমির তৈল ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে **যাতায়াত** ও **বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে** সমুদ্রের স্থান অনন্য। বৃটেন, জাপান, আইস্‌ল্যাণ্ড, জাভা, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার ন্যায় পৃথিবীর বহু অঞ্চল, দেশ ও মহাদেশ জলভাগের দ্বারা অন্য সমস্ত অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন। স্বভাবতঃই এই সকল অঞ্চলের মানুষের পক্ষে বাণিজ্যিক লেনদেন এবং অন্যান্য দেশে যাতায়াতের জন্য স্থলপথের উপায় না থাকায় ও আকাশপথ ব্যয়বহুল হওয়ায় সমুদ্রপথই প্রধান অবলম্বন। নানাকারণে রেলপথ, রাজপথ ও আকাশপথের তুলনায় সমুদ্রপথে যাত্রী ও মাল পরিবহণের খরচ কম। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সকল রকম যাতায়াত-ব্যবস্থার মধ্যে সমুদ্রপথ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

বৃষ্টিপাত ও তুষারগলা জলে ধরণী প্রাণময় ও শস্যশ্যামল হইয়া উঠে, নদী-নালা পুষ্ট হয়। কিন্তু বৃষ্টি ও তুষার বাষ্পীভূত সমুদ্রজলেরই রূপান্তর। সুতরাং **জলবায়ুর** উপর সমুদ্রের প্রভাব অপরিসীম। সমুদ্রতীরস্থ অঞ্চল-গুলির ও সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন, স্বাস্থ্যকর ও কঠোর পরিশ্রমের উপযোগী।

মৎস্য-চাষের শ্রেণীবিভাগ (Types of Fisheries)—পৃথিবীর মোট আয়তনের তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। জলভাগের অধিকাংশই সমুদ্র; বাকী অংশ নদী, নালা, খাল, বিল, হ্রদ ইত্যাদি। প্রাচীনকাল হইতে মানুষ জীবনধারণের জন্য এই সকল জলাশয় হইতে মৎস্য ও অন্যান্য জীব সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। বর্তমান যুগে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ হইলেও মৎস্য-চাষ, কৃষি, শিল্প, পশুপালন ইত্যাদির ন্যায় মানুষের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্যকলাপ।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত লোকবসতিপূর্ণ সমুদ্রোপকূলে, হ্রদ, নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে মৎস্যশিকার করা হইয়া থাকে। কোন কোন অঞ্চলে মৎস্যশিকার করা হয় শিকারীর নিজের অথবা সীমাবদ্ধ **স্থানীয় অঞ্চলের প্রয়োজন** (Subsistence fishing) মিটাইবার জন্য। তুন্দ্রা অঞ্চলে, উত্তরে সরলবর্গীয় অরণ্য অঞ্চলের মেরু-প্রান্তে, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-প্রান্তে ইয়াগান, ওনা প্রভৃতি উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে, উষ্ণমণ্ডলের অধিকাংশ স্থানে প্রধানতঃ স্থানীয় অঞ্চলের ব্যবহারের জন্য মৎস্য শিকার করা হইয়া থাকে। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বিভিন্ন স্থানেও অবসর সময়ে উপার্জন-বৃদ্ধির বা চিত্ত-বিনোদনের জন্য মৎস্যশিকার করা হয়। এইভাবে প্রতিবৎসর পৃথিবীতে মোট কি পরিমাণ মৎস্যশিকার করা হয় এবং তাহার মোট মূল্য কত তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব।

প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ ও বিদেশের বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে মস্য-শিকার করা হয়, তাহাকে **বাণিজ্যিক মৎস্য-চাষ** (Commercial Fishing) বলে। স্থলভাগের অভ্যন্তরস্থ নদী-নালা, খাল-বিল, হ্রদ প্রভৃতির স্বাদুজলে যে মৎস্য-চাষ হইয়া থাকে, তাহাকে **স্বাদুজলের মৎস্য-চাষ** (Fresh-water fishing) বলা হয়। আবার সমুদ্রতীরে, গভীর সমুদ্রে ও সমুদ্র-চড়ায় যে মৎস্য-চাষ করা হয়, তাহা **সামুদ্রিক মৎস্য-চাষ** (Sea-fishing) নামে পরিচিত। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে সামুদ্রিক মৎস্য-চাষ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সুসংগঠিত। পৃথিবীর মোট মৎস্য-উৎপাদনের তিন-চতুর্থাংশ সমুদ্র হইতে উত্তোলিত হয়।

বাণিজ্যিক মৎস্য-শিকারের বিভিন্ন পদ্ধতি (Diverse methods of Commercial Fishing)—কাষ্ঠ ও লৌহনির্মিত নানা আকৃতি ও গঠন-ভঙ্গীর ডিঙ্গা, নৌকা ও জাহাজে করিয়া মৎস্য-শিকার করা হয়। এই সকল জলযান দাঁড়, পাল, কয়লা বা তৈলের সাহায্যে চালানো হইয়া থাকে। মৎস্য-শিকারের পদ্ধতিও নানারকম। ইহাদের মধ্যে তিনটি প্রধান: (১) **ড্রিফ্‌ট্‌ নেট** (Drift net) প্রথায় নৌকা বা ট্রলারের সামনে জলের মধ্যে পর্দার মতো জাল ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। জলের উপরের স্তরে ভ্রমণকারী মৎস্য এই জালে ধরা পড়ে। হেরিং বা ম্যাকারেল জাতীয় মৎস্যের মতো যে সকল মৎস্য ঝাঁক বাঁধিয়া (Shoal fish) বেড়ায়, প্রধানতঃ সেইগুলি ধরিবার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। (২) **ট্রল নেট** (Trawl net) বা টানা-জাল

পদ্ধতি সমুদ্রের তলদেশে বিচরণকারী মৎস্য ধরিবার জন্য প্রয়োগ করা হয়। বড় থলিয়ার মতো জালে বিশেষ উপায়ে মুখ খোলা রাখিয়া সমুদ্রের তলদেশের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। স্বভাবতঃই অগভীর সমুদ্র ভিন্ন এই পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব নহে এবং মগ্ন পাহাড় বা ভাঙ্গা জাহাজ ডুবিয়া থাকিলে এই পদ্ধতিতে বিপদের সম্ভাবনাও আছে। (৩) **লং লাইন** (Long line) প্রথায় একটি লম্বা মোটা তার বা দড়ি হইতে অনেকগুলি বঁড়সি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল বঁড়সিতে আধার (মাছের খাদ্য) গাঁথা থাকে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের সমুদ্রোপকূলে এই পদ্ধতিতে কড্ মাছ ধরা হয়। এই তিনটি পদ্ধতি ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মৎস্য আহরণের জন্য আরও পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে।

বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতির কারণ (Factors of Commercial Development)—সামুদ্রিক মৎস্য-শিল্পের উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় কয়েকটি প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণের একত্র সমাবেশের ফলেই গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যক্ষেত্র গড়িয়া ওঠে।

(ক) প্রাকৃতিক কারণসমূহ (Physical Factors)—বিস্তীর্ণ অগভীর সমুদ্র ও মগ্ন চড়া, ভগ্ন তটরেখা, মৎস্যের খাদ্যের প্রাচুর্য, অনুকূল জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, ব্যবহারোপযোগী অরণ্যসম্পদের নৈকট্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণসমূহের একত্র সমাবেশ মৎস্য-শিল্পের উন্নতির মৌলিক কারণ। প্রাকৃতিক কারণসমূহ নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল :—

(১) **অগভীর সমুদ্র ও মগ্ন চড়া (Shallow Seas and Banks)**—উত্তর আমেরিকা, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, চীন, জাপান ও রাশিয়ার সমুদ্র-উপকূলে বিস্তীর্ণ মহীসোপান রহিয়াছে। এই সকল মহীসোপানের সমস্ত অংশে মৎস্য-শিকার না হইলেও বিশেষ করিয়া অগভীর সমুদ্রখাঁড়ি ও মগ্ন চড়া অঞ্চলে মৎস্য-চাষ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে এই ধরনের মগ্ন চড়ার মোট আয়তন প্রায় ৪০ হাজার বর্গ-কিলোমিটার। ইউরোপে উত্তর সাগর এবং আইসল্যাণ্ড, ফিরি দ্বীপপুঞ্জ (Faeroe Islands) ও লফোটেন দ্বীপপুঞ্জের (Lofoten Islands) সন্নিহিত সামুদ্রিক চড়ার মোট আয়তন প্রায় ১·২ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার। পূর্ব এশিয়ায় ৪৫ হাজার বর্গ-কিলোমিটারেরও অধিক

সামুদ্রিক চড়া রহিয়াছে। চড়াগুলির নরম, ঢালু উপরিভাগ মৎস্য ধরিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহাদের অনেকগুলি তীরভূমির নিকটেই অবস্থিত। উত্তর সাগরে অবস্থিত মৎস্যসমৃদ্ধ বিখ্যাত ডগার্স ব্যাঙ্ক (Doggers Bank) স্থলভাগ হইতে মাত্র ১৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কের (Grand Bank) কেন্দ্রস্থল হইতে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের দূরত্ব ২৯০ কিলোমিটার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্নিহিত জর্জেস ব্যাঙ্ক (Georges Bank) হইতে বোস্টন বা পোর্টল্যাণ্ড বন্দরের দূরত্ব মাত্র ২৭০ কিলোমিটার।

(২) **সৈকতরেখা (The Coast-line)**—মৎস্য-শিল্পে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলির ভগ্ন সৈকতরেখা এই শিল্পের উন্নতিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, জাপান ও রাশিয়ার তটরেখা ভগ্ন হওয়ায় অসংখ্য সমুদ্রখাঁড়ির সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল খাঁড়ি স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয় গড়িয়া উঠিবার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। ধৃত মৎস্য দেশ-বিদেশে পাঠাইবার জন্য, ঝড়-তুফানের সময় মৎস্যশিকারে নিযুক্ত নৌকা, জাহাজ প্রভৃতির নিরাপদ আশ্রয়-গ্রহণের জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে মৎস্য-শিল্পের পক্ষে বন্দর ও পোতাশ্রয় একান্ত প্রয়োজন। কোন কোন মৎস্য নদীর মুখে ও অগভীর সমুদ্রখাঁড়িতে ডিম পাড়ে। ফলে ভগ্ন সমুদ্রতীরে এই সকল মৎস্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। দীর্ঘ সৈকতরেখা দেশের অধিকসংখ্যক মানুষকে সমুদ্রের সংস্পর্শে আনে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের শতকরা ৯০ ভাগ অধিবাসী সমুদ্রতীরে বাস করে। লাব্রাডারের প্রায় সমস্ত এবং নরওয়ের জনসংখ্যার বৃহদংশ সমুদ্রতীরের অধিবাসী।

(৩) **জলের প্রকৃতি (Character of the Waters)**—প্রধান প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলির জলের গভীরতা, প্রবাহ, তাপমাত্রা ইত্যাদি মৎস্যের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য এবং মৎস্যশিকারের সুবিধা ও পদ্ধতির উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে, অগভীর সমুদ্রেই মৎস্যশিকার সম্ভব। মোটামুটিভাবে ২০০ মিটার পর্যন্ত গভীর জলে সুবিধাজনকভাবে মৎস্যশিকার করা যায়। অবশ্য কোথাও কোথাও অধিকতর গভীর জলেও মৎস্যশিকার করা হইয়া থাকে। ৬০০ মিটার গভীর সমুদ্রে হ্যালিবাট ধরা হয়। উত্তর আমেরিকা, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, জাপান ও রাশিয়ার সমুদ্র-উপকূল ও সমুদ্র মধ্যে অবস্থিত মগ্ন চড়াগুলির গভীরতা অধিকাংশ স্থলেই মৎস্যচাষের উপযোগী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকটবর্তী জর্জেস ব্যাঙ্কে জলের গভীরতা

গড়ে ১৫ হইতে ৩০ মিটার। গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কের অধিকাংশ স্থলেই জল ৯০ মিটারের কম গভীর। ইউরোপের ডগার্স ব্যাঙ্কে জলের গভীরতা ১৩ হইতে ৩০ মিটার। অগভীর জলে সূর্যের আলো ও উত্তাপ সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে।

চড়াগুলির উপর প্রতিনিয়ত বিভিন্ন তাপমাত্রা ও রাসায়নিক গুণ-বিশিষ্ট জলের স্রোত আসিয়া মিলিত হইতেছে। উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে শীতল লাব্রাডার স্রোত উপসাগরীয় স্রোতের সহিত মিলিত হইতেছে। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত আটলান্টিক স্রোতের সহিত মিশিয়া উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের উপকূল ধরিয়া উত্তর নরওয়ে পর্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। ইহার তলদেশ দিয়া উত্তর হইতে আবার প্রবাহিত হইতেছে শীতল আর্কটিক স্রোত। অনুরূপভাবে এশিয়ার পূর্ব উপকূলে শীতল কাম্‌চাট্‌কা স্রোতের সহিত উষ্ণ জাপান স্রোতের মিলন ঘটিতেছে। ইহা ছাড়া এই সকল অঞ্চলের সমুদ্রে অসংখ্য নদী প্রচুর পরিমাণ জলরাশি আনিয়া ঢালিতেছে। এই জলে নাইট্রোজেন ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ থাকায় ইহা মৎস্য ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের পুষ্টির পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

(৪) **প্ল্যাঙ্কটন (Plankton)**—মৎস্যের খাদ্য হিসাবে বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ, বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীর ডিম ও লার্ভা এবং ক্ষুদ্র মৎস্য ব্যবহৃত হইলেও ইহার প্রধান খাদ্য প্ল্যাঙ্কটন। প্ল্যাঙ্কটন সমুদ্রজলে ভাসমান এক-প্রকার অতিক্ষুদ্র উদ্ভিদ (Phytoplankton) ও প্রাণী (Zooplankton)। সমুদ্রে কোথায় কি পরিমাণ প্ল্যাঙ্কটন পাওয়া যাইবে তাহা প্রধানতঃ সূর্যালোক, সমুদ্রস্রোত, উপরের জলের সহিত তলদেশের জলের মিশ্রণ, জলের রাসায়নিক উপাদান প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদজাতীয় প্ল্যাঙ্কটনের জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধির জন্য সূর্যকিরণ প্রয়োজন। ২০০ মিটার গভীর জল পর্যন্ত সূর্যের আলো প্রবেশ করিতে পারে। এইজন্য এইরূপ গভীরতার মধ্যে অধিক মৎস্য পাওয়া যায়। সমুদ্রোপকূলের নিকটেই সাধারণতঃ প্ল্যাঙ্কটনের বংশবৃদ্ধির হার অধিক। কারণ এখানে নদীগুলি প্ল্যাঙ্কটনের বৃদ্ধির সহায়ক বিভিন্ন খনিজ পদার্থ বিশেষ করিয়া নাইট্রেট ও ফস্‌ফেট জাতীয় লবণ বহন করিয়া আনে। তাহা ছাড়া এই সকল অঞ্চলে বিরুদ্ধাভিমুখী জলস্রোতের মিলনের ফলে প্রতিনিয়ত জল ওঠানামা করে বলিয়া প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ খনিজ লবণ জলের উপরের স্তরে পাওয়া যায়। ইহার জন্য উষ্ণ ও

শীতল স্রোতের সঙ্গমস্থলে বিশেষ করিয়া মগ্ন চড়াগুলির উপর প্ল্যাঙ্কটনের প্রাচুর্য দেখা যায়। ফলে মৎস্যও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

(৫) নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু (Temperate Climate)—পৃথিবীর বৃহৎ মৎস্যক্ষেত্রগুলির শীতল জলবায়ু বোধহয় ইহাদের মৎস্য-শিল্পে উন্নতির প্রধান কারণ। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সমুদ্রের উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রের তুলনায় খাদ্যোপযোগী মৎস্য অনেক বেশী পাওয়া যায়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের মৎস্য সুস্বাদু। শীতল জলবায়ুতে মৎস্য অধিকক্ষণ টাট্কা থাকে। সুতরাং সমুদ্রে মৎস্য ধরিয়া ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার বা মৎস্য কাটিয়া লবণ মাখাইয়া কৌটায় ভর্তি করিবার বা শুকাইবার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। শীতকালে এই সকল অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবে যথেষ্ট পরিমাণ বরফ পাওয়া যায় বলিয়া মৎস্য-সংরক্ষণের খরচও কম। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু প্ল্যাঙ্কটনের সংখ্যাবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শীতল জলবায়ুর প্রভাবে এখানকার ধীবরগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়া থাকে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সরল-বর্গীয় ও পর্ণমোচী বৃক্ষসমূহ ধীবরগণের মৎস্য ধরিবার নৌকা, ট্রলার ও জাহাজ নির্মাণে সাহায্য করে। মৎস্যক্ষেত্রগুলির উত্তরাংশে গ্রীষ্মকাল হ্রস্ব ও গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা কম হওয়ায় কৃষিকার্য সীমাবদ্ধ। দীর্ঘ শীতকালে তুষারপাত হয় বলিয়া এই সকল অঞ্চলে গৃহপালিত পশুর খাদ্য মজুত করিয়া রাখিতে হয়। ফলে পশুপালনও সীমাবদ্ধ। এই সকল কারণে এই অঞ্চল-গুলিতে খাদ্য হিসাবে মৎস্যের চাহিদা অনেক বেশী।

(৬) ভূ-প্রকৃতি (Character of the Land)—বৃহৎ মৎস্যক্ষেত্রগুলির সন্নিকটস্থ দেশসমূহের ভূ-প্রকৃতি কৃষিকার্য ও পশুপালনের উপযোগী নহে। নরওয়ের মোট আয়তনের শতকরা মাত্র ৪ ভাগ জমিতে কৃষিকার্য ও পশুপালন করা হয়। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের শতকরা ·৫ ভাগ জমিতে কৃষিকার্য হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেইন রাজ্যের শতকরা ৭·৬ ভাগ জমিতে কৃষিকার্য ও ৮·২ ভাগ জমিতে পশুপালন করা হইয়া থাকে। কানাডার নোভাস্কোশিয়া ও নিউ ব্রান্সউইকের শতকরা ১১ ভাগ জমিতে কৃষিকার্য ও পশুপালন করা হইয়া থাকে। স্কটল্যাণ্ড ও জাপানে কৃষিকার্য হয় ঐ দেশগুলির মোট আয়তনের মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ জমিতে। ফলে এই সকল অঞ্চলের অধিবাসিগণের একাংশ খাদ্য ও জীবিকার জন্য সমুদ্রের উপর নির্ভর করিয়াছে।

প্ল্যাঙ্কটনের প্রাচুর্য, উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলন, প্রচুর সূর্যকিরণ, জলের লঘু আপেক্ষিক গুরুত্ব (Low specific gravity) ও সমুদ্রতলের অনুকূল গঠনের ফলে উত্তর আটলান্টিক ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের মৎস্যক্ষেত্রগুলিতে প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন জাতের মৎস্য আসে ও ডিম পড়ে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতের **ডিম প্রসব** করিবার ক্ষমতা বিস্ময়কর। কড্, টারবট, প্লেইস বা হেক জাতের একটি মৎস্য বৎসরে ৫০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ডিম পাড়ে। সোল, ম্যাকারেল বা হ্যালিবাট জাতের একটি মাছ ডিম পাড়ে বৎসরে ১ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ। অধিকাংশ জাতের মৎস্য আবার বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে এবং সেই অনুযায়ী তাহাদের ধরিবার ব্যবস্থা হয়। সামুদ্রিক মৎস্য প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) অল্প জলে বসবাসকারী মৎস্য (Pelagic fish) ; ইহাদের অধিকাংশ ঝাঁক বাঁধিয়া চলে। (২) গভীর জলে বিচরণকারী মৎস্য (Demersal fish)। অগভীর সমুদ্রের মৎস্যের মধ্যে হেরিং ও ম্যাকারেল প্রধান। গভীর জলের মৎস্যের মধ্যে প্রধান হইল কড্। কি ধরনের মৎস্য ধরা হইবে, গভীর না অল্পজলের, তাহার উপর ধরিবার পদ্ধতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি নির্ভর করে। গভীর-জলের মৎস্য ধরিবার জাহাজগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির এবং অধিকক্ষণ সমুদ্রে থাকিবার উপযোগী ; এই সকল জাহাজ বৃহৎ জাল টানিবার ক্ষমতা-সম্পন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। অল্পজলের মৎস্য একসঙ্গে এক জাতেরই ধরা হয় ; কিন্তু গভীরজলের মৎস্য একসঙ্গে বহু জাতের ধরা হইয়া থাকে।

(খ) অর্থনৈতিক কারণসমূহ (Economic Factors)—উল্লিখিত প্রাকৃতিক উপাদানগুলি পৃথিবীর বৃহৎ মৎস্যক্ষেত্রগুলির উন্নতির মৌলিক কারণ হইলেও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণও এই সকল অঞ্চলের মৎস্যশিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে। কোটি কোটি টাকা **মূলধন** লইয়া গঠিত বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এই সকল অঞ্চলে মৎস্য-শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান মৎস্য-শিকারের জন্য শুধু যন্ত্রচালিত জাহাজই নহে, এরোপ্লেন, জলের মধ্যে মৎস্যের অস্তিত্ব জানিবার ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্র, রেডিও, হিমায়ন যন্ত্র ইত্যাদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক **যন্ত্রপাতি** ও সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার ফলে মৎস্য-শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। গ্রাম্‌স্‌বি, হাল, লণ্ডন, ইয়ার-মাউথ, এবারডিন, সেণ্ট জন্‌স্, হ্যালিফাক্স,

বোস্টন, নিউ বেডফোর্ড, ভ্যাঙ্কুভার, লস্ এঞ্জেলস্, সান ডিয়েগো, মন্টিরে, বার্গেন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট **বন্দর** মৎস্য-শিল্পের বৃহৎ সুসংগঠিত কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রতীরস্থ এই সকল কেন্দ্র হইতে অভ্যন্তরভাগের বাজারগুলিতে দ্রুত যাতায়াতের জন্য রেলপথ, রাজপথ ও জলপথের চমৎকার **পরিবহণ-ব্যবস্থা** রহিয়াছে। ধৃত মৎস্য মজুত রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা-সমন্বিত বিরাট বিরাট গুদামঘর নির্মিত হইয়াছে। মৎস্য শুকাইবার, লবণ মাখাইবার, কৌটাজাত করিবার ও জমাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কোনও মৎস্য যাহাতে নষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাছের কাঁটা, হাড় ও অন্যান্য অংশ হইতে কৃষি-সার তৈয়ারীর এবং মৎস্যের তৈল বাহির করিয়া সেই তৈল হইতে বিভিন্ন **দ্রব্য** প্রস্তুতের জন্য কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

বৃহৎ মৎস্যক্ষেত্রগুলির অনেক স্থানেই লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। জাপানে প্রতিবর্গ-কিলোমিটারে ২৫ জন লোক বাস করে। বেলজিয়ামে বাস করে ২৮০ জন, ইংল্যাণ্ড ও রোড আইল্যাণ্ডে বাস করে যথাক্রমে ৩০৫ ও ২৮৮ জন। এই সকল দেশের সমুদ্রোপকূলের অনেক জায়গায় লোকবসতি অপেক্ষাকৃত বেশী ঘন; ইহার ফলে মৎস্যের **চাহিদা** অধিক। ধর্মীয় সংস্কারের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার ক্যাথলিক জনসাধারণের পক্ষে বৎসরের কোন কোন দিন মাংসাহার নিষিদ্ধ। জাপান ও চীনের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জনসাধারণের অনেকে গোমাংস ও শূকরমাংস গ্রহণ করে না। ফলে ধর্মীয় কারণে এই সকল দেশে মৎস্যের চাহিদা অধিক। ঘন লোকবসতি, কৃষি ও পশুপালনের উপযোগী ভূমির অভাব ও শীতল জলবায়ুর একত্র সমাবেশ এই সকল অঞ্চলে মৎস্য অপেক্ষা মাংস অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। স্বভাবতঃই দেহগঠনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় আমিষজাতীয় খাদ্যের জন্য জনসাধারণ অনেকাংশে মৎস্যের উপর নির্ভর করিয়াছে।

পৃথিবীর মৎস্যক্ষেত্রসমূহ (Fisheries of the World)—পৃথিবীর মৎস্যের মোট উৎপাদন প্রায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ মেঃ টন। ইহার অধিকাংশই সামুদ্রিক মৎস্য। সমুদ্রোপকূলের দেশসমূহ সাধারণতঃ মৎস্যশিকারে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

পৃথিবীর মৎস্য-উত্তোলন

(লক্ষ মে: টন)

জাপান	৫৫	নরওয়ে	১৪
চীন	৩০	ভারত	১১
মা: যুক্তরাষ্ট্র	২৭	কানাডা	১০
রাশিয়া	২৬	বৃটেন	১০

পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে মৎস্য শিকার করা হইলেও বাণিজ্যিক হারে মৎস্য-চাষ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে সামাবদ্ধ :

(ক) চীন ও জাপানের তীরবর্তী অঞ্চল—দক্ষিণ চীন হইতে উত্তর কামৃচাট্‌কা পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। ইহার মধ্যে জাপানের সমুদ্রোপকূল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। উষ্ণ কুরোসিও ও শীতল কিউরাইল স্রোতের মিলন, ভগ্ন উপকূল, খাদ্যোপযোগী মৎস্যের প্রাচুর্য প্রভৃতি কারণে এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের চতুর্দিকে প্রচুর পরিমাণে হেরিং, ট্রাউট, স্যামন, কড্ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এখান হইতে কৌটাভর্তি কাঁকড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হইত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে এই দুইটি অঞ্চল (সাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ) রাশিয়ার অধীনে আসিয়াছে। পূর্ব সাইবেরিয়ার সমুদ্রোপকূলে ও নদীসমূহে প্রচুর স্যামন মৎস্য পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের মৎস্যক্ষেত্র ক্রমেই উত্তরদিকে সরিয়া যাইতেছে। জাপানের চতুর্দিকের সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায় এবং এই দেশে মাংস-প্রদায়ী পশু নাই বলিলেই চলে। ফলে জাপানের অধিবাসিগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মৎস্য শিকার ও আহার করিয়া থাকে। জাপানের সমুদ্রে পিলকার্ড, ম্যাকারেল, হেরিং, কড্, পোলক, বোনিটো, টুনা, কাট্‌ল ফিস; ঝিনুক, চিংড়ি, কাঁকড়া, হাঙ্গর, এমনকি অক্টোপাস পর্যন্ত ধরা হয়। অখাদ্য মৎস্য নষ্ট না করিয়া সার প্রভৃতি তৈয়ারীর কাজে ব্যবহার করা হয়। চীন সামুদ্রিক মৎস্য-শিল্পে দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। দক্ষিণ চীন সাগর হইতে পীত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলে প্রচুর মৎস্য ধরা হয়।

(খ) উত্তর-পূর্ব আটলাণ্টিক উপকূল—স্পেনের উত্তর উপকূল হইতে শুরু করিয়া রাশিয়ার উত্তরে অবস্থিত শ্বেত সাগর (White Sea) পর্যন্ত

এই অঞ্চল বিস্তৃত। ইহা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৎস্যক্ষেত্র। প্রতিবৎসর গড়ে ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য এখানে ধরা হয়। ধৃত মৎস্যের মধ্যে কড্, হেরিং, হ্যাড্ডক ও ম্যাকারেল প্রধান। উত্তর সাগরে সর্বাধিক পরিমাণে মৎস্য শিকার করা হয়। এই সাগরে অসংখ্য অগভীর চড়া (Bank) রহিয়াছে এবং চতুর্দিকে ঘন লোকবসতিপূর্ণ বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, জার্মানী, নরওয়ে ও সুইডেন অবস্থিত। উত্তর সাগরের ডগার্স ব্যাঙ্ক হইতে নরওয়ে ও বৃটেন সর্বাধিক মৎস্য শিকার করে। বৃটেনের গ্রীম্‌সৃবি পৃথিবীর

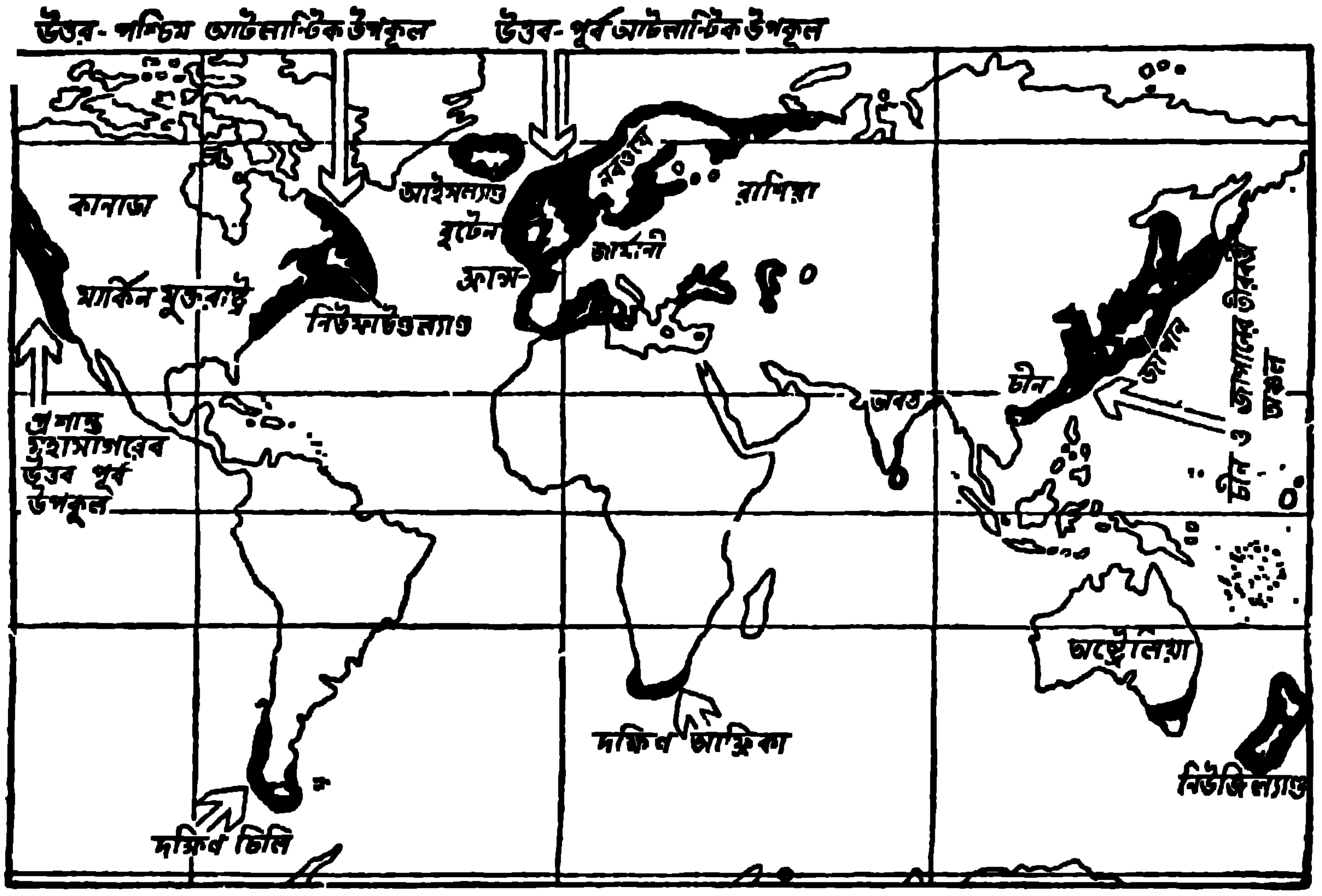

পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যক্ষেত্রসমূহ

শ্রেষ্ঠ মৎস্যের বাজার। পৃথিবীর মধ্যে নরওয়ে ও আইস্‌ল্যাণ্ডের অর্থনীতি মৎস্যশিকার ও মৎস্য-ব্যবসায়ের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরশীল। প্রায় ১,১৫,০০০ নরওয়েবাসী মৎস্যশিকারে নিযুক্ত। মাথা-পিছু মৎস্যশিকারে আইস্‌ল্যাণ্ড শ্রেষ্ঠ—বাৎসরিক প্রায় ৩,২০০ কিলোগ্রাম। এই দেশের মোট রপ্তানির শতকরা ৯৫ ভাগ মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য।

(গ) উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক উপকূল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যারোলিনা রাজ্যের হ্যাটেরাস অন্তরীপ (Cape Hatteras) হইতে আরম্ভ করিয়া লাব্রাডারের উত্তর উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলের সমুদ্রে

মৎস্য আহরণের উপযোগী অসংখ্য অগভীর চড়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপকূলবর্তী গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক সর্ববৃহৎ। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সহিত শীতল লাব্রাডার স্রোতের মিলন হওয়ায় এখানে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে ধৃত মৎস্যের মধ্যে হ্যাড্ডক, রোজ ফিস, ফ্লাউণ্ডার, কড্, হোয়াইটিং, হেরিং, হ্যালিবাট, পোলক এবং হেক প্রধান; চিংড়ি প্রভৃতি মৎস্যও এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঝিনুক, স্যাড ও ক্ল্যাম ধরা হইয়া থাকে। আটলান্টিক উপকূলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মৎস্য-বন্দর বোস্টন, গ্লুসেস্টার, পোর্টল্যাণ্ড ও নিউ ইয়র্ক, কানাডার সেণ্ট জন, হ্যালিফাক্স এবং লুনেনবার্গ মৎস্য-শিল্প ও মৎস্য-রপ্তানির জন্য বিখ্যাত।

(ঘ) প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পূর্ব উপকূল—উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যের উত্তরাংশ হইতে শুরু করিয়া বেরিং সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলের মহীসোপান উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের তুলনায় সংকীর্ণ। এখানে স্যামন, হ্যালিবাট, সার্ডিন, পিলকার্ড, টুনা, হেরিং, সোল, কড্ প্রভৃতি মাছ ধরা হয়। এই অঞ্চল হইতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবৎসর গড়ে ১·২ লক্ষ মেঃ টন এবং কানাডার বৃটিশ কলম্বিয়ায় ৬০ হাজার হইতে ৯০ হাজার মেঃ টন স্যামন মৎস্য ধরা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হইতে প্রচুর পরিমাণে কৌটাভর্তি স্যামন বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পৃথিবীর অর্ধেক হ্যালিবাট এই অঞ্চলের সমুদ্রে ধরা হয়। হ্যালিভার তৈল এখানকার গুরুত্বপূর্ণ উপজাত দ্রব্য। এখানে ঝিনুক-শিল্পও উন্নতি লাভ করিয়াছে। বেরিং সাগরে অবস্থিত প্রিবিলফ দ্বীপপুঞ্জ পৃথিবীর বৃহত্তম ফার-সিল (Fur-Seal) শিকারের ক্ষেত্র। এই অঞ্চলে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার ও প্রিন্স রুপার্ট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল, লস্ এঞ্জেলস্, স্যান ডিয়েগো ও মন্টিরে প্রধান মৎস্য-বন্দর। মন্টিরে পৃথিবীর সার্ডিন-রাজধানী নামে খ্যাত (Sardine Capital of the World)।

উল্লিখিত চারিটি উল্লেখযোগ্য মৎস্যক্ষেত্র ছাড়াও দক্ষিণ আমেরিকায় **চিলির** দক্ষিণাংশের সমুদ্রোপকূল, **দক্ষিণ আফ্রিকার** দক্ষিণাংশ ও দক্ষিণ **অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের** সমুদ্রোপকূল উল্লেখযোগ্য মৎস্যক্ষেত্র।

পৃথিবীর প্রধান চারিটি মৎস্যক্ষেত্রে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক মৎস্যশিকারে নিযুক্ত। ইহা ছাড়া আরও বহুলোক মৎস্যশিকারের আনুষঙ্গিক শিল্পে (মৎস্য শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় নৌকা ও জাহাজ-নির্মাণ ও মেরামত, মৎস্য-

শিকারের অন্যান্য সরঞ্জাম প্রস্তুত, মৎস্যবিক্রয়, কৌটাভর্তি ও গুদামজাত করা প্রভৃতি কার্যে) নিযুক্ত। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান, রাশিয়া ও চীন, পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরে কানাডা (বিশেষ করিয়া লাব্রাডার ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড) ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (বিশেষ করিয়া নিউ ইংল্যাণ্ড রাজ্য-সমূহ) এবং পূর্ব আটলান্টিক মহাসাগরে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ মৎস্যশিকারে নিযুক্ত। বৃটেন, ফ্রান্স, নরওয়ে, জার্মানী ও পর্তুগাল হইতেও ধীবরগণ পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরে মৎস্য শিকার করিতে আসে।

ক্রান্তীয় মণ্ডলে মৎস্য-চাষ (Fishing in the Tropics)—উপরের আলোচনা হইতে ইহা লক্ষ্য করা যায় যে, গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রগুলি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। ক্রান্তীয় মণ্ডলের সমুদ্রে বাণিজ্যিক মৎস্য-চাষ উন্নতি লাভ করে নাই। ক্রান্তীয় মণ্ডলে মৎস্য-চাষ নিম্নলিখিত কারণে উন্নতি লাভ করে নাই :—

(ক) অগভীর সমুদ্রখাঁড়ি, মহীসোপান ও সমুদ্রচড়া মৎস্যের প্রধান বিচরণক্ষেত্র। ক্রান্তীয় মণ্ডলে মহীসোপান ও সমুদ্রচড়ার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। ক্রান্তীয় মণ্ডলে অবস্থিত ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের তীরভাগ বিশেষ ভগ্ন নহে। ইহার ফলে স্বাভাবিকভাবে বন্দর গড়িয়া উঠিবার সুযোগ কম এবং ইহা মৎস্যশিল্পের উন্নতিতেও বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

(খ) মৎস্যের প্রধান খাদ্য প্ল্যাঙ্কটন। অগভীর সমুদ্রে, শীতল আবহাওয়ায়, উষ্ণ ও শীতল স্রোতের সঙ্গমস্থলে প্ল্যাঙ্কটনের বংশবৃদ্ধি ঘটে। ক্রান্তীয় মণ্ডলের সমুদ্রে এই সকল অনুকূল অবস্থা না থাকায় প্ল্যাঙ্কটনের পরিমাণ কম। ফলে মৎস্যও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তুলনায় কম পাওয়া যায়।

(গ) ক্রান্তীয় মণ্ডলের সমুদ্রে বিচরণকারী অনেক জাতের মাছ খাদ্যোপ-যোগী নয়। তাহা ছাড়া এখানে এক জাতের মাছ একসঙ্গে অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় না বলিয়া বাণিজ্যিক হারে মৎস্য-আহরণ অসুবিধাজনক।

(ঘ) ক্রান্তীয় মণ্ডলের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু নানাদিক দিয়া মৎস্য-চাষের অনুকূল নয়। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় মাছ শীঘ্র পচিয়া যায়। ফলে সমুদ্রে মাছ ধরিয়া দূরবর্তী অঞ্চলে পাঠানো অসুবিধাজনক এবং মৎস্য-সংরক্ষণের খরচও বেশী। এইরূপ জলবায়ু কঠোর পরিশ্রমের অনুকূল নয়। ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলের সমুদ্র বর্ষাকালে অধিকাংশ দিন নৌকা, ছোট জাহাজ প্রভৃতি চলাচলের পক্ষে বিশেষ নিরাপদ নয়।

(ঙ) ক্রান্তীয় মণ্ডলের দেশগুলি অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান নিম্ন, ফলে মৎস্যের চাহিদা কম।

(চ) এই সকল দেশে মূলধনের সরবরাহ কম বলিয়া জাপান ও পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির ন্যায় মৎস্য-ব্যবসায়ের জন্য ব্যয়বহুল, আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। আফ্রিকা এমনকি ভারতবর্ষের মতো দেশেও মৎস্যশিকারের জন্য বিমানপোত, রেডিও ইলেকট্রনিক যন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহারের কথা এখনও আমরা ভাবিতে পারি না। হিমায়ন যন্ত্রের ব্যবহারও প্রয়োজনানুরূপ প্রসার লাভ করে নাই।

(ছ) মৎস্যশিল্পের উন্নতির জন্য বন্দর অঞ্চল হইতে দেশের অভ্যন্তরভাগে যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রয়োজন, ক্রান্তীয় মণ্ডলের দেশগুলিতে যাতায়াত-ব্যবস্থা এখনও উন্নত নয়।

(জ) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের দেশগুলিতে মাছ খাদ্যহিসাবে ব্যবহার করা ছাড়াও অখাদ্য মাছ হইতে সার, তৈল, চামড়া প্রস্তুত করা হয়। মাছের তৈল হইতে নানাপ্রকার ঔষধ (যথা, কডলিভার অয়েল, শার্কলিভার অয়েল ইত্যাদি), সাবান, বার্নিস ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। মাছের কাঁটা, আঁইশ প্রভৃতিও বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ক্রান্তীয় মণ্ডলে ধৃত মৎস্যের এইরূপ সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পপ্রসার ঘটে নাই।

(ঝ) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তুলনায় ক্রান্তীয় মণ্ডলের দেশগুলিতে মৎস্য-গবেষণার ব্যবস্থা অনুন্নত।

ক্রান্তীয় মণ্ডলের সমুদ্রে মৎস্য-চাষের উন্নতির জন্য ইদানীং কিছু কিছু চেষ্টা করা হইতেছে। ভারতবর্ষ ও সিংহল ইহার জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। ভারতে সরকারী উদ্যোগে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিবার চেষ্টা হইয়াছে। সরকার ধীবরগণকে ঋণদান করিয়া, ধীবর সমবায় গঠন করিয়া এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মৎস্য-গবেষণাগার গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

বাণিজ্য (Trade)—দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া অধিকাংশ উৎপাদনকারী দেশ মৎস্য রপ্তানি করিতে পারে না। সেইজন্য মৎস্যের উৎপাদনের তুলনায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক কম। কানাডা, নরওয়ে, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ মৎস্য

রপ্তানি করে। আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে স্পেন, পর্তুগাল, ইটালি, জার্মানী ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মৎস্যচাষের ভবিষ্যৎ (The Future of the Fisheries)—অরণ্য-সম্পদের ন্যায় মৎস্যসম্পদও প্রবহমান সম্পদ (Flow Resource)। কোন অঞ্চলের মৎস্যসম্পদ ব্যবহার করিতে থাকিলে অরণ্যের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে ধীরে ধীরে উহার পূরণ হইতে থাকে। কিন্তু এ পর্যন্ত মানুষ বিভিন্ন অঞ্চলের সমুদ্র হইতে যে হারে মৎস্য সংগ্রহ করিয়াছে, স্বাভাবিক ভাবে নূতন মৎস্যের সৃষ্টি তাহা অপেক্ষা কম হারে হইয়াছে। ফলে দীর্ঘদিন ব্যবহৃত সুপরিচিত মৎস্যক্ষেত্রগুলিতে মৎস্যের পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। এই কারণে ধীবরগণকে মৎস্য সংগ্রহের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি করিবার জন্য, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান সংগ্রহের পরিমাণ বজায় রাখিবার জন্যও অপেক্ষাকৃত বেশী ও দক্ষ সাজ-সরঞ্জাম লইয়া দ্রুতগামী জাহাজেকরিয়া তীরভূমি হইতে আরও দূরে গভীরতর সমুদ্রে যাইতে হইতেছে। অবশ্য উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল এবং দক্ষিণ আমেরিকার চিলি ও আর্জেন্টিনার উপকূলের মৎস্যক্ষেত্রগুলি অপেক্ষাকৃত নূতন বলিয়া এই সকল অঞ্চলের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকায় এখনও বহু অব্যবহৃত মৎস্যক্ষেত্র রহিয়াছে। কিন্তু এইগুলি লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া এবং অত্যধিক শীতের জন্য বৎসরের অধিকাংশ সময় কার্যোপযোগী না হওয়ায় এই সকল ক্ষেত্রে মৎস্যশিকারের খরচ অনেক বেশী।

সম্প্রতি মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের প্রতি মানুষের দৃষ্টি কিছুটা আকৃষ্ট হইয়াছে। নরওয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, বৃটেন, কানাডা ও রাশিয়ার বহু বৈজ্ঞানিক মৎস্যসম্পদের গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষেও মৎস্য-গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও মাছের ডিম হইতে কৃত্রিম উপায়ে পোনা জন্মাইয়া দেশের অভ্যন্তরভাগের বিভিন্ন জলাশয়ে ও সমুদ্র-উপকূলে উহা ছাড়িয়া দিয়া মৎস্যের চাষ করা হইতেছে। ঝিনুক ও অন্যান্য খোলস-বিশিষ্ট মৎস্যের (Shell-fish) চাষ কোন কোন দেশে নিয়মিতভাবে করা হইতেছে। কিন্তু মৎস্য-শিল্পের গুরুত্ব বজায় রাখিবার ও উহার শ্রীবৃদ্ধির জন্য আরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন জাতের মৎস্যের অভ্যাস ও জীবন-ইতিহাস পর্যবেক্ষণ, মৎস্যের ডিম ছাড়িবার ঋতুতে আইন করিয়া মৎস্য-শিকার নিষিদ্ধকরণ, চাহিদার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া

মৎস্য-শিকার, এবং মিহি জালের পরিবর্তে মোটা জালের প্রবর্তন ইত্যাদি ব্যবস্থা আশু গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই সকল ক্ষেত্রে কোন একটি দেশের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে না। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও যুক্তভাবে ব্যবস্থাগ্রহণের মধ্য দিয়া মৎস্য-সম্পদ সংরক্ষণের সমস্যাগুলির সমাধান করিতে হইবে। সুখের বিষয়, এইভাবে কিছু কিছু কাজ ইতিমধ্যে শুরু হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে হ্যালিবাট মাছ সংরক্ষণের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক কমিশন ইহার উদাহরণ। ১৯৩৬, ১৯৪৩ ও ১৯৪৬ সালের উত্তর সাগর কন্‌ভেন্‌সনে (North Sea Convention) ইউরোপের দেশগুলি জালের বুনানি এবং ছোট মাছ না ধরা সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

সর্বশেষে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের সহিত জটিল সমস্যাসমূহ জড়িত রহিয়াছে এবং এই ব্যাপারে মানুষের জ্ঞান এখনও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তবুও আমেরিকার বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বাস করেন যে, মহাসমুদ্রে বিজ্ঞান-গবেষণার সুফল একমাত্র মৎস্যশিকারের ক্ষেত্রেই এত বিপুল হইতে পারে যে, খাদ্যের জন্য পৃথিবীর মৎস্য-আহরণ পাঁচগুণ বর্ধিত করিলেও এই সঞ্চয় কখনও ফুরাইয়া যাইবে না। বিশেষজ্ঞগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মৎস্য-বিচরণ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানলাভের দ্বারা এবং মৎস্যের বংশবিস্তারের পক্ষে অনুকূল নূতন নূতন অঞ্চলে মৎস্য উৎপাদনের দ্বারা এবং আরও কিছু কিছু উপায়ে আমরা পূর্বোক্ত ফলাফল লাভ করিতে পারি।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the economic significance of sea.

উঃ—'সমুদ্রের অর্থনৈতিক তাৎপর্য' (৮৮ পৃঃ— ৮৯ পৃঃ) লিখ।

2. Describe the important sea-fisheries of the world.

উঃ—'পৃথিবীর মৎস্যক্ষেত্রসমূহ' (৯৬ পৃঃ— ১০০ পৃঃ) লিখ।

3. What are the different types of fisheries found in the world?

উঃ—'মৎস্য-চাষের শ্রেণীবিভাগ' (৮৯ পৃঃ— ৯০ পৃঃ) লিখ।

4. Account for the location of the principal fishing grounds of the world and indicate their chief markets. Give a comparative idea of their total catch. [C. U. B. Com. 1956]

উঃ—'পৃথিবীর মৎস্যক্ষেত্রসমূহ' (৯৬ পৃঃ—১০০ পৃঃ) এবং 'বাণিজ্য' (১০১পৃঃ—১০২ পৃঃ) হইতে লিখ।

5. Account for the location of principal sea-fisheries in temperate seas and discuss the prospects of development of sea-fisheries in India.

[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com., 1961]

উঃ—'বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতির কারণ' (৯১ পৃঃ—৯৬ পৃঃ) এবং ভারতের মৎস্য-চাষ সম্বন্ধে লিখ।

6. Locate the major fishing grounds of the world and give their characteristics. Explain why commercial fishing is undeveloped in tropical waters. [C. U. Three-Year Degree Course, B. Com., 1964]

উঃ—'পৃথিবীর মৎস্যক্ষেত্রসমূহ' (৯৬ পৃঃ— ১০০ পৃঃ), 'বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতির কারণ' (৯১ পৃঃ— ৯৬ পৃঃ) এবং 'ক্রান্তীয় মণ্ডলে মৎস্য-চাষ' (১০০ পৃঃ— ১০১ পৃঃ) লিখ।

7. What are the physical factors favourable for the development of sea-fisheries ? Describe the location of the chief marine fishing grounds of the world and discuss the modern methods of see.fishing.

[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com., 1964]

উঃ—'বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতির কারণ' অংশে 'প্রাকৃতিক কারণসমূহ' (৯১ পৃঃ— ৯৫ পৃঃ), 'পৃথিবীর মৎস্যক্ষেত্রসমূহ' (৯৬ পৃঃ— ১০০ পৃঃ) এবং 'বাণিজ্যিক মৎস্য-শিকারের বিভিন্ন পদ্ধতি' (৯০ পৃঃ— ৯১ পৃঃ) লিখ।

সপ্তম অধ্যায়

অরণ্য ও অরণ্যসম্পদ

(Forest and Forest Products)

মৃত্তিকা, জলবায়ু এবং ভূ-প্রকৃতির উপর উদ্ভিজ্জের সৃষ্টি নির্ভর করে। বহু উদ্ভিদ, বিশেষ করিয়া বৃক্ষের সমাহার বা একত্র সমাবেশকে অরণ্য বা বনভূমি বলে। পৃথিবীতে প্রায় ৪ কোটি বর্গ-কিলোমিটার পরিমিত ভূমি অরণ্য দ্বারা আবৃত। ইহার মধ্যে ২.৬ কোটি বর্গ-কিলোমিটার বনভূমি উৎপাদনশীল। অবশ্য বর্তমানে এই অরণ্যসম্পদের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হয় না। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে এখনও পর্যন্ত অত্যন্ত আদিম পদ্ধতিতে বনভূমি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ফলে অপচয়ের পরিমাণ খুব বেশী।

প্রত্যক্ষ ব্যবহার (Direct Uses)—অরণ্যের প্রধান সম্পদ কাঠ। বিভিন্ন প্রকারের কাঠ অরণ্য হইতে সংগ্রহ করা হয়। পৃথিবীতে কাঠের মোট উৎপাদন ও ব্যবহার নিম্নে প্রদত্ত হইল:

ব্যবহার	কোটি মে: টন	শতকরা	ব্যবহার	কোটি মে: টন	শতকরা
নির্মাণ-কার্য	৪০	৩৩.০	রেয়ন	.৫	০.৪
কাগজ	৬	৫.০	জ্বালানি	৬৪	৫৪.০
রেলপথ	২.৫	২.০	অন্যান্য	৫	৪.০
খনি	২	১.৬	মোট ব্যবহার	১২০	১.০০০

পৃথিবীতে প্রতিবৎসর মোট যে পরিমাণ কাঠ ব্যবহৃত হয় তাহার শতকরা ৫৪ ভাগ হয় জ্বালানি হিসাবে। দুই-একটি অঞ্চল ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদিম পদ্ধতিতেই কাঠ জ্বালানো হয় এবং এইভাবে অপচয়ের পরিমাণ খুব বেশী। রেলের স্লিপার ও খনির ছাদের খুঁটি হিসাবে কাঠের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কাঠের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগত ব্যবহার গৃহাদি নির্মাণের সরঞ্জাম হিসাবে। বাসগৃহ, কারখানা, ধর্মস্থান, সেতু প্রভৃতি নির্মাণের জন্য কাঠ ব্যবহার করা হয়। প্রতিবৎসর পৃথিবীতে মোট ব্যবহৃত কাঠের শতকরা ৩৩ ভাগ এইরূপ নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ক্রমেই বিভিন্ন ধাতু, সিমেন্ট, ইট প্রভৃতি নির্মাণকার্যে কাঠের স্থান দখল করিয়া লইতেছে। গৃহাদি

নির্মাণের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসাবে কাঠের গুরুত্ব বজায় রাখিতে হইলে প্রতিনিয়ত ইহার প্রয়োগ ও প্রস্তুতিকার্যে উন্নতি বিধান করিতে হইবে। সুখের বিষয় এইদিকে যথেষ্ট অগ্রগতি হইতেছে। কাঠ সহনশীল করিবার জন্য রাসায়নিক পদার্থ ও বিদ্যুতের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করিয়া কাঠের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা যায়; এই ব্যাপারে ক্রিয়োসোট বহুদিন হইতেই ব্যবহৃত হইতেছে এবং উন্নততর রাসায়নিক সামগ্রী আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে। রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করিয়া অগ্নিরোধক কাঠ প্রস্তুতের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে; অবশ্য এখনও পর্যন্ত ইহার খরচ অত্যন্ত বেশী। কাঠের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা আয়তনগত অস্থায়িত্ব; ঋতুতে ঋতুতে কাঠের আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে; অনেকসময় বাঁকিয়া দুমড়াইয়া যায়। এই ত্রুটি দূর করিবারও বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাঠের গুঁড়া ও অব্যবহৃত অংশ হইতে কৃত্রিম কাঠ (Synthetic timber), প্লাস্টিক, সুরাসার, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, আলকাতরা প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে। বর্তমানে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার উন্নতির ফলে কয়লা ও খনিজ তৈলের ন্যায় জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার না করিয়া কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করিয়া কাঠ হইতে অসংখ্য মূল্যবান্ দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হইতেছে।

শিল্পোন্নত দেশসমূহে কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ-শিল্পে কাঠ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কাষ্ঠমণ্ড হইতে পূর্বে শুধু কাগজ প্রস্তুত হইত। এখন রেয়ন ও অনুরূপ দ্রব্যাদিও প্রস্তুত হইতেছে। মণ্ডশিল্পে (Pulp industry) কাঠের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। কাঠ হইতে চিনি ও কৃষিসার উৎপাদন করাও সম্ভব। নিকট-ভবিষ্যতে হয়তো এই চিনি ব্যাপকভাবে মানুষ ও পশুর খাদ্য হিসাবে এবং সুরাসার উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

কাঠ সর্বপ্রধান বনজ সম্পদ হইলেও আরও নানাপ্রকার সম্পদ অরণ্য হইতে সংগ্রহ করা হয়। বন্যপশুর মাংস, চামড়া, লোম, শিং ও দাঁত, মধু, মোম, লাক্ষা, রবার, তার্পিন তৈল, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল, রেশমগুটি, কুইনাইন প্রভৃতি মূল্যবান্ সম্পদ অরণ্য হইতে সংগৃহীত হয়।

অরণ্যের পরোক্ষ ব্যবহার (Indirect Uses)—অরণ্যের গুরুত্ব শুধু প্রত্যক্ষ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ নহে। জলবায়ু, জলস্রোত ও মৃত্তিকার উপরও অরণ্য প্রভাব বিস্তার করে। বনভূমি বায়ু ও মৃত্তিকায় আর্দ্রতা বৃদ্ধি করে;

বন্যা ও ঝড়ের বেগ-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে সাহায্য করে, ভূমিক্ষয় নিবারণ করে, মরুভূমির প্রসার রোধ করে এবং গৃহপালিত জীবজন্তুর খাদ্য সরবরাহ করে। অরণ্যের প্রাকৃতিক শোভায় ভ্রমণকারিগণ আকৃষ্ট হয়। অরণ্য বন্যপশুর আশ্রয়স্থল। কাঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণ করিয়া বহুলোক জীবিকা অর্জন করে। অনেক দেশে অরণ্য সরকারী আয়ের অন্যতম উৎস।

মানবজাতির ভবিষ্যতের পক্ষে অরণ্যসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উপযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে অরণ্য প্রয়োজনীয় অসংখ্য জিনিসের অক্ষয় উৎস। এই দিক দিয়া অরণ্যের সহিত মৃত্তিকার তুলনা করা যাইতে পারে। পৃথিবীতে যেদিন সমস্ত খনি নিঃশেষ হইয়া যাইবে সেদিনও অরণ্য মানুষের বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া যাইবে; কারণ অরণ্য প্রবহমান সম্পদ।

পৃথিবীর অরণ্যবলয়সমূহ (Forest-belts of the World)—জলবায়ু, মৃত্তিকা ও ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার বনভূমি দেখা যায়। কিন্তু বৃক্ষের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ধারণে মৃত্তিকা ও ভূ-প্রকৃতি অপেক্ষা জলবায়ু অধিক গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ুর তারতম্য অনুযায়ী কোন অরণ্যের গাছের কাঠ নরম হয়, কোন অরণ্যের গাছের কাঠ শক্ত হয়; কোন অরণ্যের গাছের পাতা হয় বড়, আবার কোথাও গাছের পাতা হয় সরু ও ছোট। কোথাও অরণ্যের সমস্ত গাছের পাতা বৎসরের কোন নির্দিষ্ট ঋতুতে ঝরিয়া পড়ে, আবার কোন অরণ্যের সমস্ত পাতা কখনও একসঙ্গে ঝরিয়া পড়ে না; ফলে অরণ্য হয় চিরহরিৎ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বনভূমিকে মোটামুটি-ভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; অর্থাৎ পৃথিবীতে নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান অরণ্যবলয় রহিয়াছে:

(ক) ক্রান্তীয় শক্তকাঠের অরণ্য

(Tropical Hardwood Forests)

উষ্ণমণ্ডলে সারাবৎসরব্যাপী প্রচুর বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে শক্তকাঠের গহন অরণ্য দেখা যায়। এই অরণ্যে মেহগনি, সেগুন, এবনি, সেইবা, রোজউড, সীডার, রবার, ব্রেজিল নাট প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। যে সকল স্থানে বৎসরে কোন সময়ে তাপমাত্রা ২০° সেঃ এর কম হয় না, বৃষ্টিপাত প্রচুর, প্রতি মাসেই কিছু-না-কিছু বৃষ্টিপাত হয় এবং প্রচুর সূর্যকিরণ ও গভীর মৃত্তিকা পাওয়া যায়,

সেই সকল স্থানেই এইজাতীয় অরণ্য দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকায়, মধ্য আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মালয়, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন, সিংহল এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল ও পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে বিস্তীর্ণ ক্রান্তীয় শক্তকাঠের অরণ্য পরিলক্ষিত হয়। মৃত্তিকায় সারাবৎসর প্রচুর রস থাকে বলিয়া অরণ্যের বৃক্ষাদি ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া জন্মে এবং সূর্যকিরণ পাইবার জন্য যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া উপরের দিকে বাড়িতে থাকে। ফলে এই অরণ্যে ৩০ হইতে ৬০ মিটার পর্যন্ত উঁচু বৃক্ষ দেখা যায়। এই সকল গাছের কাঠ খুব শক্ত, গুঁড়ি মোটা ও শাখাপত্রহীন ; ইহাদের পাতা খুব বড় হয় এবং কখনও একসঙ্গে ঝরিয়া পড়ে না। অরণ্যের উপরের অংশ ঘন শাখাপ্রশাখা ও পত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়া চাঁদোয়ার মতো দেখায়। অনেক স্থানে অরণ্য এত ঘন যে, বৎসরের কোন সময়েই সূর্যকিরণ শাখাপত্রের আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। অরণ্যের মধ্যে বৃহদাকার বৃক্ষাদি অবলম্বন করিয়া মোটা মোটা লতা উপরের দিকে ওঠে, অর্কিড-জাতীয় পরগাছারও অভাব নাই। ব্রেজিলে এইজাতীয় অরণ্যকে ‘সেল্‌ভা’ (Selvas) বলে। অরণ্যের মধ্যে কীটপতঙ্গ, রংবেরঙের পাখী, সরীসৃপ ও বানরজাতীয় প্রাণী বেশী দেখা যায়। অরণ্যের অভ্যন্তরভাগের আবহাওয়া স্যাঁৎসেঁতে, উষ্ণ, গুমোট, অস্বাস্থ্যকর ও কঠোর পরিশ্রমের অনুপযোগী। এইজাতীয় অরণ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এক জায়গায় নানাজাতীয় বৃক্ষের একত্র সমাবেশ। সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যের ন্যায় এই অরণ্যে কখনও একটা অঞ্চল জুড়িয়া শুধু একজাতীয় বৃক্ষ দেখা যায়।

উষ্ণমণ্ডলের যে সকল স্থানে বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত প্রচুর হইলেও উহা বৎসরের একটা নির্দিষ্ট ঋতুতে সীমাবদ্ধ, সেখানে চিরহরিৎ অরণ্যের পরিবর্তে শক্তকাঠের পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। বৃষ্টিহীন ঋতুতে গাছগুলি জলের খরচ বাঁচাইবার জন্য পত্রত্যাগ করে। দক্ষিণ আমেরিকার কুইব্রাকো (Quibracho), ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও ইন্দোচীনের সেগুন, ভারতবর্ষের শাল, বাঁশ, আম প্রভৃতি এইজাতীয় অরণ্যের মূল্যবান্ বৃক্ষ। শিমুল, পলাশ, শিরীষ, মহুয়া, পাদুয়াক, বেত প্রভৃতি বৃক্ষও এইজাতীয় অরণ্যে দেখা যায়। উষ্ণমণ্ডলের যে সকল স্থানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১০০ সেঃ মিঃ-এর কম সেই সকল স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৃক্ষ-সমন্বিত তৃণভূমি বা ডাঙানা

(Savannah) দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্রিকার সুদান, চাড্, রোডেসিয়া, কেনিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, এঙ্গোলা প্রভৃতি স্থানে, দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা, গায়না প্রভৃতি দেশে এবং মধ্য ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া এই তৃণভূমি দেখা যায়। উষ্ণমণ্ডলীয় উদ্ভিজ্জ ক্রমে ছোট ছোট ঝোপ ও কাঁটাগাছে পরিণত হইয়া মরুভূমির সহিত মিশিয়া যায়।

উপজাত দ্রব্য (By-products)—জাপোট গাছের (Zapote) রস হইতে প্রস্তুত চিক্‌ল (Chicle) মূল্যবান্ সম্পদ। ইহা হইতে চিউইং গাম

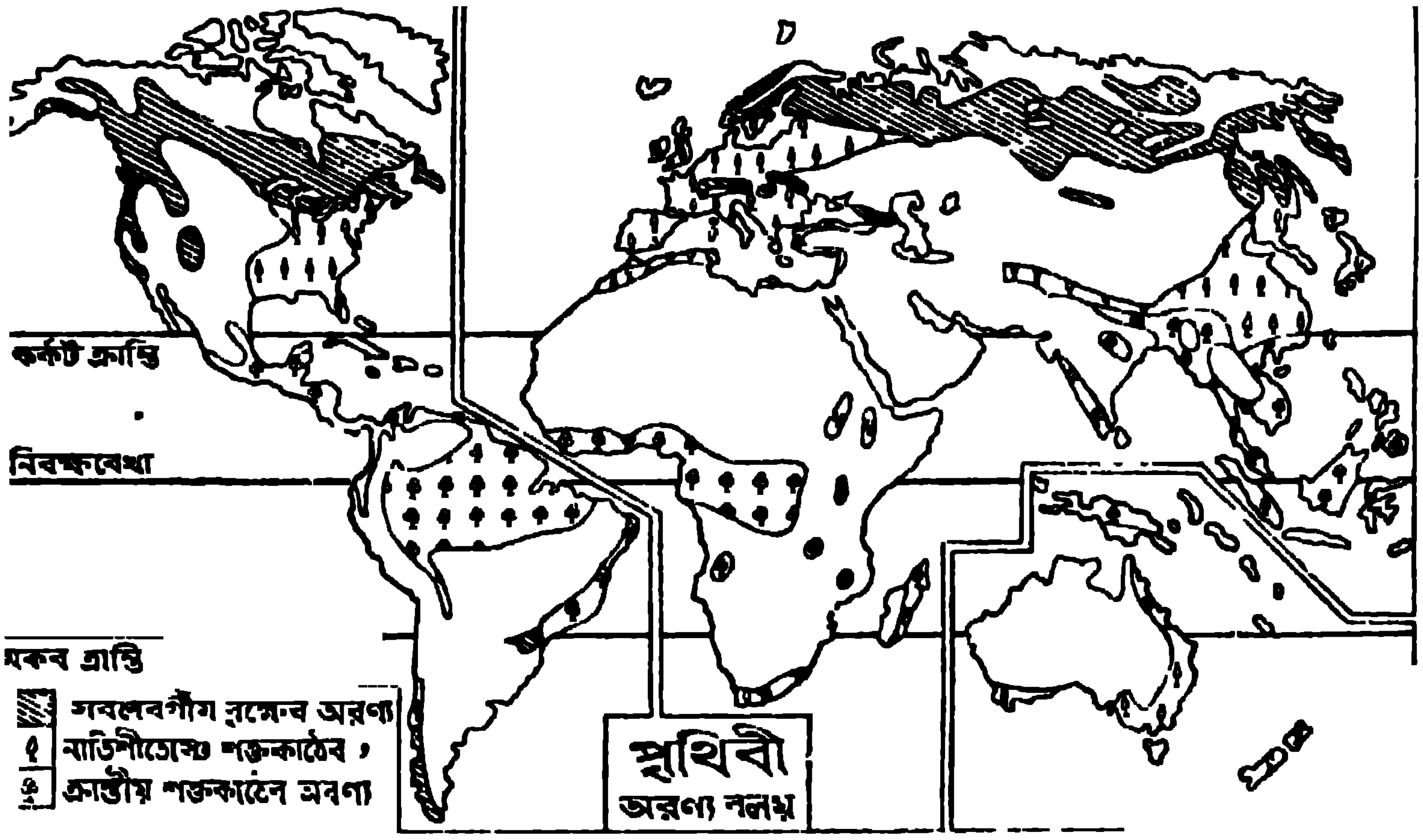

প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ মেক্সিকো হইতে ব্রেজিল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় চিরহরিৎ অরণ্যে ইহা সংগৃহীত হয়। এখানে নানাজাতীয় বাদাম সংগ্রহ করিয়া খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পশ্চিম আফ্রিকার অয়েল পাম হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের অরণ্যে বিশেষ করিয়া আমাজন ও কঙ্গো নদীর অববাহিকায় রবার সংগ্রহ করা হয়। ভারতবর্ষ, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে ক্রান্তীয় অরণ্য হইতে গোলমরিচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি মসলা সংগৃহীত হয়। ভারত ও পাকিস্তানের বনভূমি হইতে লাক্ষা ও মোম সংগ্রহ করা হয়। লাক্ষা রপ্তানি করিয়া ভারত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ক্রান্তীয় অরণ্যে কলা, আনারস, পেয়ারা, আম, জাম প্রভৃতি নানাবিধ সুস্বাদু পুষ্টিকর ফলের বৃক্ষ জন্মে। এই সকল ফল

সংগ্রহ করিয়া বহুলোক জীবিকা নির্বাহ করে। এই অরণ্য হইতে নানাবিধ মূল্যবান্ ঔষধ সংগ্রহ করা হয়। ইহার মধ্যে কর্পূর ও কুইনাইন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। টোকিলা পাম (Toquilla palm)-এর পাতা হইতে ইকুয়েডর, কলম্বিয়া এবং পানামা অঞ্চলে তন্তু বাহির করা হয়। বিখ্যাত পানামা টুপি-প্রস্তুতে এই তন্তু ব্যবহৃত হয়। চামড়া পাকা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বনজ দ্রব্যও এই অরণ্য হইতে সংগ্রহ করা হয়। ভেনেজুয়েলা ও ব্রেজিলের অরণ্য হইতে বালাটা (balata) সংগ্রহ করা হয়। ইহা সামুদ্রিক কেবল্-প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

কাষ্ঠশিল্প (Lumbering)—গৃহাদি নির্মাণের সাজ-সরঞ্জামের জন্য, নৌকা ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জন্য এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের জন্য ক্রান্তীয় বনভূমির শক্তকাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। ক্যারিবিয়ান উপসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ ও জাভার ন্যায় কতিপয় অঞ্চলে মূল্যবান্ অরণ্যসম্পদ প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিলেও ক্রান্তীয় অরণ্যবলয়ের অধিকাংশ স্থানেই এখনও পর্যন্ত অরণ্যসম্পদকে বিশেষ প্রয়োজনে লাগানো যায় নাই। কারণ, সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য বা নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যের তুলনায় ক্রান্তীয় অরণ্যসম্পদ ব্যবহারের পক্ষে কয়েকটি বাধা রহিয়াছে। প্রথমতঃ, উষ্ণমণ্ডলের দেশগুলি সমৃদ্ধিশালী না হওয়ায় এখানে কাষ্ঠের চাহিদা কম। দ্বিতীয়তঃ, ক্রান্তীয় শক্তকাষ্ঠের অরণ্যে এক জায়গায় নানাপ্রকারের বৃক্ষ জন্মায়। ফলে কোন একজাতের অনেকগুলি বৃক্ষ সংগ্রহ করিতে হইলে অরণ্যের মধ্যে বহুদূর পরিভ্রমণ করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, অরণ্যের নীচের অংশ লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন বলিয়া ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করাও দুঃসাধ্য। চতুর্থতঃ, অধিকাংশ বৃক্ষ অত্যন্ত শক্ত ও ভারী। ফলে এই সকল কাষ্ঠ কাটা এবং কারখানা ও বন্দর অঞ্চলে লইয়া যাওয়া পরিশ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য। পঞ্চমতঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বনভূমি যাতায়াতের পথ ও ভোগকেন্দ্র হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। ষষ্ঠতঃ, অরণ্যের অভ্যন্তরভাগের আবহাওয়া স্যাঁৎসেঁতে, উষ্ণ, আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর। নানা প্রকার বিষাক্ত কীটপতঙ্গ ও রোগ-জীবাণুর প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। ফলে শ্রমশক্তি দুর্লভ ও অদক্ষ। এই সকল কারণে বৃক্ষচ্ছেদন ও কাষ্ঠ-উৎপাদন প্রধানতঃ সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে, নদী-প্রবাহের সন্নিকটে এবং শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহের সন্নিহিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। উষ্ণমণ্ডলের অনেক স্থানে অরণ্য এত দুর্ভেদ্য ও কাষ্ঠ-উৎপাদন এত ব্যয়বহুল যে,

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অরণ্য হইতে কাঠ আমদানি করিয়া ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত লাভজনক। ব্রেজিলের মানাও (Manaos) শহরের প্রয়োজনীয় কাঠ সন্নিহিত চিরহরিৎ বনভূমি হইতে সংগ্রহ না করিয়া উত্তর আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য হইতে আমদানি করা হয়। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও ক্রান্তীয় অরণ্য হইতে ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে মেহগনি, সীডার, চন্দন, সেগুন, শাল, এবনি, রোজউড, গ্রান-হার্ট, নারা, গুইজো এবং অন্যান্য জাতের কাঠ উষ্ণমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহে সরবরাহ করা হইতেছে। এই অঞ্চল হইতে প্রধানতঃ কাঠের গুঁড়ি চালান দেওয়া হয়। কোন কোন স্থানে আধুনিক করাতকল স্থাপন করিয়া, গুঁড়িগুলি চেরাই করিয়া কাঠের কড়ি, তক্তা ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া চালান দেওয়া হয়।

ক্রান্তীয় বনভূমির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ কাঠ হইল মেহগনি। ক্যারিবিয়ান সাগরের তীরবর্তী দেশসমূহ, বিশেষ করিয়া বৃটিশ হণ্ডুরাস্ ও ডোমিনিকান রিপাবলিক, পশ্চিম আফ্রিকার সমুদ্রোপকূল, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে এই কাঠ সংগ্রহ করা হয়। বাণিজ্যিক গুরুত্বের দিক দিয়া মেহগনির পরেই সীডারের স্থান। দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ এশিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা এবং ক্যারিবিয়ান সাগরের দেশগুলি হইতে বিভিন্ন জাতের সীডার রপ্তানি করা হয়। সেগুন কাঠও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী অরণ্যের ওক্ কাঠের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে, জাহাজ-নির্মাণের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন ও যবদ্বীপে (জাভা) সেগুন কাঠ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশের রপ্তানি-বাণিজ্যে সেগুন কাঠ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ শক্তকাঠের অরণ্য দ্রুত নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। নরম সরলবর্গীয় বৃক্ষ শক্তকাঠের স্থান পূরণ করিতে পারে না। ফলে এখনও পর্যন্ত প্রায়-অব্যবহৃত ক্রান্তীয় শক্তকাঠের বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চল ভবিষ্যতে নাতিশীতোষ্ণ শক্তকাঠের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অবশ্য ক্রান্তীয় শক্তকাঠের মূল্য অধিক বলিয়া গৃহাদি নির্মাণ, আসবাবপত্র তৈয়ারী ও অন্যান্য কাজে ক্রমশঃই ইহার পরিবর্তে ইস্পাত ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহার করা হইতেছে।

(খ) সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য
(Coniferous Forests)

তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণে ৫০° হইতে ৭০° অক্ষাংশের মধ্যে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। এই অঞ্চলে প্রচুর তুষারপাত হইয়া থাকে। যাহাতে গাছে তুষার জমিয়া থাকিতে না পারে সেইজন্য এইজাতীয় অরণ্যের গাছের মাথা উপরের দিকে ক্রমশঃ পিরামিডের মতো সরু হইয়া যায়। এখানকার গাছগুলির কাষ্ঠ নরম। প্রধান প্রধান বৃক্ষ হইল নানাজাতীয় পাইন, ফার, স্প্রুস ও লার্চ। মাঝে মাঝে অ্যাস্পেন, পপ্লার এবং বার্চ জাতীয় পর্ণমোচী বৃক্ষ দেখা যায়। সরলবর্গীয় অরণ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া একজাতীয় গাছের অবস্থান। রাশিয়ায় সরলবগায় বৃক্ষের অরণ্য 'তৈগা' (Taiga) নামে পরিচিত। এইজাতীয় অরণ্যের যে সকল স্থানে গ্রীষ্মকাল আর্দ্র ও গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ১৬° সেঃ-এর বেশী নহে সেখানে গাছগুলি ভালোভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তৈগার উত্তর অংশে ক্রমশঃ গাছের উচ্চতা ও বৃদ্ধির হার হ্রাস পাইতে থাকে এবং অরণ্য ফাঁকা হইয়া আসে। উত্তর অংশে একটা গাছের পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য ২০০ বৎসর পর্যন্ত সময় লাগে। উত্তর গোলার্ধে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য মহাদেশগুলির পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত ধরিয়া দক্ষিণদিকে বহুদূর পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। উত্তর আমেরিকার পশ্চিমদিকে কোস্ট রেঞ্জ, সিয়েরা নেভাডা, ক্যাস্কেড এবং রকি পর্বতের মৃদু ও আর্দ্র জলবায়ুতে চমৎকার ডগলাস ফার, শ্বেত পাইন, রেডউড, পীত পাইন প্রভৃতি বৃক্ষের অরণ্য সৃষ্টি হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বপ্রান্তে, মধ্য ইউরোপে, মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলেও বেলেমাটিতে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে ভার্জিনিয়া হইতে টেক্সাস্ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অনুর্বর বেলেমাটিতে পাইনবৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে। এই ধরনের পাইনবন দক্ষিণ ফ্রান্সে, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উত্তরাংশে, ককেশাস্ পর্বতমালায়, দক্ষিণ চীন ও জাপানের পর্বতপৃষ্ঠে দেখিতে পাওয়া যায়।

এশিয়ার উত্তর অংশে সরলবর্গীয় বনাঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি বনভূমির সদ্ব্যবহারের অনুকূল নহে। এখানে নদীগুলি দক্ষিণদিক হইতে উত্থিত হইয়া উত্তরে মেরুসাগরে গিয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘ শীতকালে মেরুসাগর ও এই

নদীগুলি বরফে জমিয়া থাকে। বসন্তে যখন নদীগুলির দক্ষিণ অংশ গলিতে থাকে তখনও উত্তর অংশ বরফে জমাট-বাঁধা। ফলে নদীখাতে বাহির হইবার পথ না পাইয়া জলস্রোত কূল ছাপাইয়া চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়া বিরাট জলাভূমির সৃষ্টি করে। ইহার ফলে অনেক গাছ পচিয়া যায় এবং অরণ্যের সদ্ব্যবহারের পক্ষে বাধার সৃষ্টি হয়। সরলবর্গীয় বনভূমিতে শীত তীব্র বলিয়া মূল্যবান্ ঘন লোমওয়ালা জীবজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়।

উপজাত দ্রব্য (By-products)—সরলবর্গীয় বনভূমি হইতে সংগৃহীত পাইনগাছের পীচ, আলকাতরা, তার্পিন তৈল প্রভৃতি নানাবিধ কার্যে ব্যবহৃত হয়। খেঁকশিয়াল, উইসেল, স্যাবল্, মিঙ্ক, মাসক্র্যাট প্রভৃতি প্রাণীর লোম (Fur) সংগ্রহ ও বিক্রয় সরলবর্গীয় অরণ্যের অন্যতম লাভজনক ব্যবসায়। ফার-প্রদায়ী পশু অনেক স্থানে দুর্লভ হওয়ায় কোথাও কোথাও (যেমন কানাডার দক্ষিণ অংশে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশে) এইজাতীয় পশুর চাষ হইতেছে।

কাষ্ঠশিল্প (Lumbering)—পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ কাষ্ঠ ব্যবহার করা হয় তাহার অর্ধেক আসে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য হইতে। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই অরণ্যের গাছের কাষ্ঠ নরম। এই কাষ্ঠ জাহাজের মাস্তুল ও পাটাতন, আসবাবপত্র, দিয়াশলাই, প্যাকিং বাক্স, কাষ্ঠমণ্ড প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। কাষ্ঠমণ্ড হইতে কাগজ, কৃত্রিম রেশম, সুরাসার ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। নরম কাষ্ঠের শিল্পগত ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব খুব বেশী।

সরলবর্গীয় অরণ্যবলয়ের অধিকাংশ স্থানেই কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশে কাষ্ঠ উৎপাদন করা হয়। এই সকল স্থানে লোকবসতি কম এবং কৃষিকার্য প্রসার লাভ করে নাই। তবে কৃষিকার্যের প্রতিকূল কয়েকটি প্রাকৃতিক অবস্থা কাষ্ঠশিল্পের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছে। দীর্ঘ শীতকালে ভূমি তুষারে আবৃত থাকে। নদীগুলিও থাকে বরফে জমাট-বাঁধা। বসন্তে এই সকল অসংখ্য নদীর বরফ গলিয়া নূতন জলের জোয়ার আসে। ইহার ফলে কাষ্ঠ-পরিবহণের খুব সুবিধা হয়।

মাটিতে তুষার খুব পুরু হইয়া পড়িবার পূর্বেই শরৎকালে গাছগুলি কাটা হয়। কুইবেক, ফিনল্যাণ্ড এবং সুইডেনের মতো যে সকল স্থানে অরণ্যভূমির নিকট কৃষি-ভূমি রহিয়াছে সেখানে কৃষকেরা শরৎকাল হইতে কাঠুরিয়া বনিয়া

যায়। অন্যান্য স্থানে, যেমন ইউরোপীয় রাশিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশে দূরবর্তী প্রদেশ হইতে শ্রমিক আমদানি করিতে হয় এবং এই সকল ক্ষেত্রে প্রভূত মূলধন বিনিয়োগ করিয়া বৃহদাকারে কাষ্ঠ উৎপাদন করা হয়। তুষারের উপর দিয়া ঘোড়া কিংবা ট্রাক্টরের সাহায্যে সহজেই কাষ্ঠের গুঁড়িগুলি টানিয়া আনিয়া বরফে জমাট-বাঁধা নদীর উপর জড়ো করা হয়। বসন্তে নদীর বরফ গলিতে আরম্ভ করিলে গুঁড়িগুলি ভাসাইয়া নদীতীরে অবস্থিত করাত-কলে অথবা মণ্ড তৈয়ারার কারখানায় লইয়া আসা হয়। অনেক অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া সুইডেনে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া কাষ্ঠ ভাসাইয়া আনিবার জন্য জলপথগুলির উন্নতি বিধান করা হইয়াছে। ইহার জন্য অনেক জায়গায় খাল খনন করা হইয়াছে, জলপ্রপাত বন্ধ করা হইয়াছে এবং নদীর মধ্যের চড়া পরিষ্কার করা হইয়াছে।

উত্তর রাশিয়ার নদীগুলি মেরুসাগরে পতিত হইয়াছে। ফলে দক্ষিণদিকে নদীর উৎপত্তিস্থলে যখন বরফ গলিতে থাকে, উত্তরদিকে নিম্ন অববাহিকা তখনও বরফে জমাট-বাঁধা। স্বভাবতঃই জল বাহির হইবার পথ না পাইয়া দুই কূল ছাপাইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং উহার সঙ্গে ভাসমান কাষ্ঠের গুঁড়িগুলিও চতুর্দিকে ভাসিয়া যাইতে পারে। উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে গাছের গুঁড়িগুলি খুব বড়, নদীগুলি অত্যন্ত খরস্রোতা এবং জলপ্রপাতের সংখ্যাও অধিক। ফলে জলপথে কাষ্ঠ ভাসাইয়া আনিবার সুবিধা নাই। বাধ্য হইয়াই হয় ডাঙ্কি এঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে অথবা ক্যাটারপিলার ট্রাক্টর ও রেলপথের সাহায্যে কাষ্ঠ পরিবহণ করা হয়। বহুস্থানে কাষ্ঠ পরিবহণের জন্য বনভূমি হইতে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত রেল-লাইন বসানো হইয়াছে। এইভাবে সারাবৎসর কাষ্ঠ-উৎপাদন সম্ভব হয়।

(গ) নাতিশীতোষ্ণ শক্তকাষ্ঠের অরণ্য

(Temperate Hard-wood Forests)

তৈগার দক্ষিণে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশে, পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ ও মধ্য চীনের সমভূমি ও মালভূমিতে নাতিশীতোষ্ণ শক্তকাষ্ঠের অরণ্য দেখা যায়। এই সকল অঞ্চলের গভীর মৃত্তিকা, বাৎসরিক ৬০ সেঃ মিঃ-এর অধিক বৃষ্টিপাত এবং বসন্ত ও গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত এইজাতীয় অরণ্য-সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। এই অরণ্যের গাছের কাঠ শক্ত হয় এবং

গাছের পাতা শীতের তুষারপাত শুরু হইবার পূর্বেই শরৎকালে ঝরিয়া পড়ে। সেইজন্য এই অরণ্যের অন্য নাম নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য (Temperate Deciduous forest)। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ শক্তকাষ্ঠের অরণ্যবলয়ের বিভিন্ন অংশে মৃত্তিকা, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার পার্থক্য থাকায় অরণ্যের রূপেরও পার্থক্য দেখা যায়। কোথাও শুধু পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য, আবার কোথাও মিশ্র পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-অঞ্চলে কোথাও গহন, কোথাও অপেক্ষাকৃত ফাঁকা পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় বৃক্ষের মিশ্র অরণ্য দেখা যায়; এই অরণ্যে প্রধান প্রধান বৃক্ষ হইল ওক্, হিকরি, চেস্টনাট, ম্যাপ্‌ল্, অ্যাস, এল্‌ম্, ওয়ালনাট, বীচ ইত্যাদি। ইহার উত্তরে বার্চ, বীচ, ম্যাপ্‌ল্, হেমলক ও স্প্রুসের মিশ্র অরণ্য দেখা যায় এবং ইহার দক্ষিণে আর্দ্র নিম্নভূমিতে টুপেলো, গাম এবং সাইপ্রেস জাতীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের গভীর বনভূমি রহিয়াছে। নাতিশীতোষ্ণ শক্তকাষ্ঠের অরণ্যের মৃত্তিকা উর্বর এবং জলবায়ু কৃষির অনুকূল হওয়ায় অনেক স্থানে বনভূমি ধ্বংস করিয়া কৃষিক্ষেত্র ও পশুচারণক্ষেত্র রচনা করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের সমভূমি অঞ্চলের শক্তকাষ্ঠের বনভূমি কৃষিকার্যের তাগিদে প্রায় ধ্বংস করিয়া ফেলা হইয়াছে।

দক্ষিণ গোলার্ধে ৩০° অক্ষরেখার দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, টাস্‌মেনিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সমুদ্র-সন্নিকটস্থ শীতল ও আর্দ্র অঞ্চলে মিশ্র পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য সৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগ দক্ষিণদিকে ক্রমশঃ সংকীর্ণ হওয়ায় তৈগা বনভূমি দেখা যায় না বলিলেই চলে। ফলে সরলবর্গীয় অরণ্যের শতকরা ৮০.ভাগ উত্তর গোলার্ধে ২৫° হইতে ৬৫° অক্ষরেখার মধ্যে পৃথিবীর ঘন লোকবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলির ব্যবহার-সান্নিধ্যে অবস্থিত।

উপজাত দ্রব্য (By-products)—বাদাম, আখরোট, খুবানি প্রভৃতি ফল এই বনভূমি হইতে সংগ্রহ করা হয়। এই অরণ্যের কোন কোন স্থানে (যথা পর্তুগাল) ওক্ গাছের পুরু ছাল হইতে শিশি-বোতলের ছিপি (Cork) প্রস্তুত হয়। চামড়া পাকা করিবার দ্রব্যাদিও এই অরণ্য হইতে সংগ্রহ করা হয়।

কাষ্ঠশিল্প (Lumbering)—নাতিশীতোষ্ণ শক্তকাষ্ঠের অরণ্যের কাষ্ঠ আসবাবপত্র, জাহাজ, মোটর-গাড়ী ও রেলগাড়ী নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর বাৎসরিক চেরাই-কাঠ (Timber) উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ এই অরণ্য হইতে পাওয়া যায়; শতকরা ৬৬ ভাগ পাওয়া যায় সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য হইতে এবং মাত্র ৯ ভাগ পাওয়া যায় ক্রান্তীয় শক্তকাষ্ঠের অরণ্য হইতে।

পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেণীর অরণ্যের আয়তন

(লক্ষ হেক্টর)

মহাদেশ	সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য	নাতিশীতোষ্ণ শক্তকাষ্ঠের অরণ্য	ক্রান্তীয় শক্তকাষ্ঠের অরণ্য
এশিয়া	৩,৫৫৬	২,২৮৮	২,৫৪০
আফ্রিকা	২৮	৬৮	৩,০৯২
ইউরোপ	২,৩১৬	৭৮০	০
অস্ট্রেলেশিয়া	৬০	৬০	১,০১২
উত্তর আমেরিকা	৪,১৮৪	১,১৬০	৪৩২
দক্ষিণ আমেরিকা	৪৩৬	৪৬০	৭,৪৭৬
	১০,৫৮০ (৩৫%)	৪,৮১৬ (১৬%)	১৪,৫৫২ (৪৯%)

অরণ্য-সংরক্ষণ (Conservation of Forests)—দুর্ভাগ্যের বিষয় পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে অরণ্যসম্পদ হয় উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা হয় না, অথবা অপব্যবহার করা হয়; অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ বর্তমানে এমন জ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতার অধিকারী হইয়াছে যাহার দ্বারা অরণ্য চিরকালের জন্য মানুষের অন্যতম বৃহত্তম সম্পদের উৎস হিসাবে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু ইহা উপযুক্তভাবে ব্যবহার না করিলে শুধু যে এই মূল্যবান্ সম্পদ হইতে মানুষ বঞ্চিত হইবে তাহা নহে, বন্যা, ভূমিক্ষয় ইত্যাদির সৃষ্টি করিয়া ইহা ভবিষ্যতে বিপদেরও কারণ হইবে।

অরণ্যের অপব্যবহারের প্রধান কারণ মানুষের অজ্ঞতা। এতদিন পর্যন্ত মানুষ জানিত না যে, একই জমিতে যেমন বৎসরের পর বৎসর ধান বা গম উৎপাদন করা সম্ভব, তেমনি একই অরণ্য হইতে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া নিয়মিতভাবে অসংখ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। বিশেষ করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার যে সকল অঞ্চলে হয় নাই বা কম হইয়াছে—যেমন আফ্রিকার নিরক্ষীয় বনাঞ্চলে—সেই সকল স্থানে অরণ্যের অপব্যবহার সর্বাপেক্ষা

বেশী। অনেক জায়গায় অরণ্য পোড়াইয়া চা-এর জমি প্রস্তুত করা হয়। একখণ্ড জমিতে কয়েক বৎসর কৃষিকার্যের পর ইহা ত্যাগ করিয়া আবার অরণ্য পোড়াইয়া নূতন জমি বাহির করা হয়। পরিত্যক্ত জমিতে আর নূতন অরণ্য গড়িয়া উঠে না; উহা তৃণভূমিতে পরিণত হয় অথবা ছোট ছোট ঝোপঝাড়ে পূর্ণ হয়। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ন্যায় উন্নত অঞ্চলেও অনেকসময় গাছ উপযুক্ত পরিণতি-প্রাপ্তির পূর্বেই কাটা হয়। অনেকসময় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন না করার জন্য বড় গাছ কাটিবার সময় আশেপাশের ছোট চারাগাছগুলি নষ্ট হইয়া যায়। আর পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে অরণ্য হইতে যে হারে বৃক্ষ কর্তন করা হয় সেই হারে নূতন বৃক্ষ রোপণ করা হয় না। **প্রাকৃতিক** কারণেও **অরণ্য ধ্বংস** হয়। দাবানল ইহার অন্যতম উদাহরণ। ঝড়েও অনেক গাছ নষ্ট হয়। পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণেও অরণ্য নষ্ট হইতে দেখা যায়, তবে প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষ অরণ্যের অনেক বেশী হিংস্র শত্রু।

নিয়মিতভাবে অরণ্যজাত দ্রব্য পাইতে হইলে বনভূমি হইতে যে হারে বৃক্ষ সংগ্রহ করা হইবে সেই হারে নূতন বৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে। কিন্তু একটি বৃক্ষ রোপণ করিবার পর তাহা ব্যবহারোপযোগী হইতে বহুদিন সময় লাগে। কানাডা বা সাইবেরিয়ার সরলবর্গীয় অরণ্যে একটি বৃক্ষের পূর্ণতা-প্রাপ্তির জন্য ১০০, ১৫০, এমনকি ২০০ বৎসর পর্যন্ত সময় লাগে এবং এতদিন ধরিয়া ইহার উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হয়। স্বভাবতঃই ব্যক্তিগত মালিকানায় মুনাফা অর্জনের জন্য যেখানে অরণ্য পরিচালিত হয় সেখানে ১৫০ বা ২০০ বৎসরের মেয়াদে অর্থ বিনিয়োগ করিতে কেহ উৎসাহিত হইবে না। এই সকল ক্ষেত্রে নূতন বৃক্ষরোপণ ও **অরণ্যরচনা** অবহেলিত হইতে বাধ্য। অরণ্য হইতে একসঙ্গে বহু জিনিস উৎপাদন করা হয়। ফলে বহু জিনিসের বাজারদরের সঙ্গে অরণ্যজাত দ্রব্যের উৎপাদনের সামঞ্জস্যবিধান করিতে হয়। এই ধরনের আরও অনেক অসুবিধা রহিয়াছে। এই সকল কারণে অরণ্যের ন্যায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সর্বার্থসাধক (Multi-purpose)-জাতীয় সম্পদ আদৌ ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকা উচিত কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই অরণ্যসম্পদ **রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ** হিসাবে পরিচালনার পক্ষে জনমত ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

অরণ্য হইতে বৃক্ষকর্তনের সহিত তাল রাখিয়া নূতন বৃক্ষরোপণ ছাড়াও

অরণ্যসম্পদ সংরক্ষণের জন্য যে-কোন দেশের অরণ্য-নীতিতে (Forest policy) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন :

(ক) দেশের সমস্ত জমি জরিপ করিয়া যে সকল জমিতে লাভজনকভাবে কৃষিকার্য বা পশুচারণ সম্ভব নয় সেখানে অরণ্য রচনা করিতে হইবে ;

(খ) কেবলমাত্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত গাছই কাটা হইবে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এমনভাবে কাটিতে হইবে যাহাতে আশেপাশের চারাগাছগুলি নষ্ট না হয় ;

(গ) দাবানলের আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য অরণ্য হইতে শুক্‌না ডালপালা ও গাছ নিয়মিতভাবে সরাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অগ্নি-নিরোধের অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে হইবে ;

(ঘ) কীট-নাশক ও রোগ-প্রতিরোধক ঔষধপত্র প্রয়োগ করিয়া পোকা-মাকড় ও রোগের আক্রমণ বন্ধ করিতে হইবে ;

(ঙ) অনেকসময় জীবজন্তু ছোট চারা মুড়াইয়া খাইয়া ফেলে ; ইহা বন্ধ করিতে হইবে।

অরণ্যপ্রদেশে যাতায়াতের সুব্যবস্থা করিয়া কারখানা, শহর, বন্দর ইত্যাদি ভোগকেন্দ্রের সহিত অরণ্যের উত্তম সংযোগ-সাধন করিতে হইবে। পরিশেষে মনে রাখিতে হইবে যে, অরণ্য-সংরক্ষণের অর্থ অরণ্যসম্পদ ব্যবহারে সংকোচ-সাধন নহে, উপযুক্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত ইহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার।

কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজশিল্প

(Wood-pulp and Paper Industry)

আধুনিক কালে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ প্রস্তুত হয় নরম কাঠ হইতে। অধিকতর পরিমাণে কাঠের ব্যবহারের ফলে কাগজের উৎপাদন-খরচ ক্রমেই কমিয়াছে এবং ইহার ফলে অরণ্য-সম্পদ-সংরক্ষণের দিকে অধিকতর সচেতনতা দেখা দিয়াছে। কাগজ প্রস্তুতের পক্ষে নরম কাঠের সরলবর্গীয় বৃক্ষ (যথা, স্প্রুস, পীত পাইন, হেমলক ও ফার) সর্বাপেক্ষা উপযোগী। উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই অন্যান্য শ্রেণীর বৃক্ষ কাগজ-উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতেছে।

কাঠ হইতে মণ্ড প্রস্তুতের জন্য প্রধানতঃ দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় ; (১) যান্ত্রিক পদ্ধতি (Mechanical method), (২) রাসায়নিক

পদ্ধতি (Chemical method)। যান্ত্রিক পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত পুরাতন এবং নিউজপ্রিণ্টের ন্যায় সস্তা কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় মূল্যবান্ উৎকৃষ্টশ্রেণীর কাগজ প্রস্তুতের জন্য।

পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগ কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত হয় ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশের মধ্যভাগে। উত্তর আমেরিকার হ্রদ অঞ্চল, আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী রাজ্যসমূহ ও কানাডার দক্ষিণ অংশে প্রভূত পরিমাণে কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত হয়। এখানে কাষ্ঠমণ্ড-প্রস্তুতকারী কারখানাগুলি অরণ্যের কাছাকাছি অবস্থিত। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশের অরণ্য অঞ্চলেও কাষ্ঠমণ্ড-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই দেশে মণ্ড-উৎপাদনের অর্ধাংশ এবং কাগজ-উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ দক্ষিণ অঞ্চল হইতে আসে।

উত্তর আমেরিকা অপেক্ষা ইউরোপের **মণ্ডশিল্প** (Pulp industry) অধিকতর সুপরিচালিত। সুইডেন, নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ডে এই শিল্প সর্বাধিক গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। দেশের অভ্যন্তর হইতে সমুদ্রতীরে যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা থাকায় এই দেশগুলি অল্পখরচে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া নিকটবর্তী ইউরোপীয় দেশসমূহে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করিতে পারে। এখানে সরলবর্গীয় বৃক্ষের সুবিস্তীর্ণ অরণ্য হইতে নিয়মিতভাবে প্রচুর নরম কাষ্ঠ পাওয়া যায়। পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি ও যথেষ্ট বৃষ্টি ও তুষারপাতের ফলে পরিষ্কার জল ও জলশক্তিরও কোন অভাব নাই। ফলে মণ্ড ও কাগজশিল্পের উন্নতিতে কোন বাধা হয় নাই। ইউরোপে মণ্ড প্রস্তুতের জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতি অপেক্ষা রাসায়নিক পদ্ধতি অধিক ব্যবহার করা হয়। ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই কাগজের কলগুলি ভোগকেন্দ্রের কাছাকাছি, যেখানে যাতায়াত-ব্যবস্থা, নরমজল ও শক্তি-সরবরাহের সুবিধা রহিয়াছে, সেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে।

উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বাহিরে জাপান কাগজ ও মণ্ডশিল্পে সর্বাপেক্ষা উন্নত। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইদানীং শিল্পোন্নতি ও শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মণ্ড ও কাগজশিল্পের উন্নতিরও সূচনা হইয়াছে।

কাগজের শ্রেণীর উপর আধুনিক কাগজ-শিল্পের অবস্থান নির্ভর করে। নিউজপ্রিন্ট-উৎপাদনকারী আধুনিক বৃহৎ কাগজকলগুলি অরণ্যের নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হয়। উৎকৃষ্টশ্রেণীর কাগজ-উৎপাদনকারী কারখানাগুলি ভোগকেন্দ্রের কাছাকাছি, যেখানে শক্তি ও কাঁচামাল পাইবার সুবিধা আছে,

সেখানে অবস্থিত হয়। মোড়কের কাগজ, কাগজের বোর্ড, টিস্যু কাগজ প্রভৃতির উৎপাদনের ক্ষুদ্রাকৃতি কারখানাগুলির অবস্থান সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম প্রয়োগ করা যায় না।

প্রশ্নাবলী

1. Give an account of the principal types of forests and their world distribution. Indicate the relationship between the climate and the development of forests. [C. U. Inter. 1957]

উঃ—'পৃথিবীর অরণ্যবলয়সমূহ' (১০৭ পৃঃ—১১৬ পৃঃ) সংক্ষেপে লিখ।

2. Describe the economic potentialities of the tropical hard-wood forests.

উঃ—'ক্রান্তীয় শক্তকাষ্ঠের অরণ্য' (১০৭ পৃঃ—১১১ পৃঃ) লিখ।

3. Locate the principal soft-wood forest-belt of the world and describe the various commercial uses of the products of these forests.
[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com., 1962]

উঃ—'সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য' (১১২ পৃঃ— ১১৪ পৃঃ) লিখ।

4. Explain fully the concept of *conservation of resources* and indicate briefly the need for the conservation of forest resources and these utilization in some countries of the world.
[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com., 1962]

উঃ—দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সম্পদ-সংরক্ষণ' এবং সপ্তম অধ্যায়ের 'অরণ্য-সংরক্ষণ' (১১৬ পৃঃ—১১৮ পৃঃ) লিখ।

5. Describe the region of soft-wood forests in the world and enumerate the geographical factors leading to the localisation of paper industry in their vicinity. [B. U. Three-Year Degree Course, B. Com., 1963]

উঃ—'সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য' (১১২ পৃঃ—১১৪ পৃঃ) ও 'কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজশিল্প' (১১৮ পৃঃ—১২০ পৃঃ) লিখ।

6. Classify forests on the basis of climate and give their world distribution. Narrate the commercial uses of the products of temperate forests.
[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com., 1965]

উঃ—'পৃথিবীর অরণ্যবলয়সমূহ' (১০৭ পৃঃ—১১৬পৃঃ) হইতে এবং 'কাষ্ঠশিল্প' ও 'উপজাত দ্রব্য' (১১৩ পৃঃ—১১৪ পৃঃ এবং ১১৫ পৃঃ—১১৬ পৃঃ) হইতে লিখ।

অষ্টম অধ্যায়

পশুপালন

(The Pastoral Industry)

প্রাচীনকালে মানুষ বন্যপশু শিকার করিয়া জীবন ধারণ করিত। পশুর মাংস খাইয়া এবং চর্ম পরিধান করিয়া তাহারা দিন কাটাইত। সেই যুগের মানুষ পশুকে বশ করিয়া গৃহপালিত পশু হিসাবে পালন করিত না, কারণ তাহারা সর্বদাই একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া যাইত। ক্রমে ক্রমে সভ্যতার আলোকে আসিয়া মানুষ পশুপক্ষীকে পোষ মানাইবার বৈপ্লবিক পদ্ধতি আবিষ্কার করিল এবং পশুকে বিবিধ কার্যে নিয়োজিত করিতে শিখিল। ইহার পর জীবজন্তু হইতে দুগ্ধ, মাংস, চর্ম, চর্বি, শিং, হাড়, পশম প্রভৃতি দ্রব্য আহরণ করিতে লাগিল। এই সকল জিনিস মানুষের নানাবিধ কার্যে নিয়োজিত হইল। ক্রমশঃই গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিভিন্ন গৃহপালিত পশুর মধ্যে গবাদি পশু ও অশ্ব মানুষ প্রথমে পালন করিতে শিখে। প্রথমে গবাদি পশু ও অশ্ব বনে বাস করিত এবং মানুষ বনে এই সকল পশু শিকার করিয়া জীবন ধারণ করিত। ক্রমে অশ্বকে পোষ মানাইয়া ইহাতে চড়িয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে মানুষ ঘুরিয়া বেড়াইত ও পশু-শিকার করিত। যখন ইহারা গৃহে বাস করিতে শিখিল, তখন গবাদি পশুচারণ করিয়া দুগ্ধ ও মাংস মানুষের **খাদ্য** হিসাবে ব্যবহার করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের জীবনেও গো-পালনের বিচিত্র ইতিহাস পাওয়া যায়। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মেষ, ছাগল প্রভৃতি পালন করিয়া ইহাদের লোম হইতে পশম-শিল্প ও চর্ম হইতে চর্ম-শিল্প গড়িয়া তুলিল। ইহা ছাড়া জীবজন্তুর হাড়, শিং প্রভৃতি দ্রব্যও বিভিন্ন **শিল্পের কাঁচামাল** হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। শীতপ্রধান দেশে পশম পরিধানের অন্যতম প্রধান বস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

প্রাচীন যুগ হইতেই পশু **পরিবহণের** অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এখনও ভারত ও ব্রহ্মদেশে হাতী ভার-বহনে নিযুক্ত হয়। অশ্বপৃষ্ঠে মালপত্র ও মানুষ বহন করা হয়; মরুভূমিতে উষ্ট্রই পরিবহণের প্রধান অবলম্বন। কলিকাতার মতো আধুনিক শহরেও গরু এবং মহিষের গাড়ীতে প্রচুর

মালপত্র প্রেরিত হয়। তুন্দ্রা ভূমিতে বল্গা-হরিণ ও কুকুর পরিবহণের প্রধান অঙ্গ।

বিভিন্ন শ্রমশিল্পে যে-কোন প্রকার **শক্তির** (Power) প্রয়োজন। বর্তমান যুগে কয়লা, খনিজ তৈল বা জলবিদ্যুৎ হইতেই অধিকাংশ শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে পশুশক্তির সাহায্যে অধিকাংশ কাজকর্ম করা হইত। এখনও বিভিন্ন কুটীরশিল্পে পশুশক্তি ব্যবহৃত হয়। ভারতের গ্রামাঞ্চলে তৈলের ঘানিতে ও ইক্ষু-পেষণযন্ত্রে এখনও গবাদি পশু ব্যবহৃত হয়। বহু দেশে কৃষিকার্যে গরু-মহিষাদির সাহায্যে লাঙ্গল চালানো হয়।

মানুষ শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজনে পশুপালন আরম্ভ করিলেও, ক্রমশঃ পশুজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌বৃত্ত পশুজাত দ্রব্যাদির বাণিজ্য গড়িয়া ওঠে। পূর্বে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ উন্নত না থাকায় পশুজাত দ্রব্যাদির চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের পর এবং উত্তর আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নতি আরম্ভ হইবার পর পশুজাত দ্রব্যাদির চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ক্রমশঃ একদেশ হইতে অন্যদেশে পশুজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হইতে থাকে। আন্তর্জাতিক চাহিদা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনের অনুকূল জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে বৃহদাকার বাণিজ্যিক পশুচারণ-ক্ষেত্র সৃষ্টি হইতে থাকে।

পৃথিবীর বাণিজ্যিক পশুচারণ-ক্ষেত্রসমূহ (Commercial Grazing Grounds of the World)—পশুপালনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন তৃণভূমি, যেখানে পশুর প্রধান খাদ্য তৃণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তৃণভূমি পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায় না। যে সকল স্থানে তৃণভূমি জন্মাইবার উপযোগী জলবায়ু ও মৃত্তিকা বিদ্যমান, সেই সকল স্থানেই পশুপালন উন্নতি লাভ করে। পৃথিবীর দুইটি মণ্ডলে প্রধানতঃ বিস্তীর্ণ তৃণভূমি দেখা যায়—(ক) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি এবং (খ) ক্রান্তীয় মণ্ডলের তৃণভূমি। স্বভাবতঃই এই দুইটি মণ্ডলে পশুপালন-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। যে সকল তৃণভূমিতে দীর্ঘ তৃণ জন্মে, সেখানে গবাদি পশুপালন করা হয়। কারণ গরু, মহিষ প্রভৃতি পশু ইহাদের বৃহদাকার মুখে দীর্ঘকায় তৃণ খাইতে পারে। যেখানে ক্ষুদ্রকায় তৃণ দেখা যায়, সেখানে ছাগল, মেষ প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় পশু পালিত হয়।

(ক) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি (Temperate grasslands)—নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি বিদ্যমান। এই তৃণভূমি জন্মিবার জন্য প্রায় ২০° সেঃ গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ এবং ২৫ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে দীর্ঘকায় তৃণ এবং কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্রকায় তৃণ জন্মে। এইজন্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি বসন্তকালে নয়নতৃপ্তিকর সবুজ রং ধারণ করে, গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে দগ্ধ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যায় এবং শীতকালে তুষারাবৃত হইয়া শুভ্র বর্ণে শোভা পায়। বিভিন্ন দেশে এই তৃণভূমি বিভিন্ন নামে পরিচিত। রাশিয়ায় 'স্টেপ্‌স্' (Steppes) নামে, উত্তর আমেরিকায় 'প্রেইরী' (Prairies) নামে, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বাংশে 'পম্পাস্' (Pampas) নামে, দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ভেল্‌ড্' (Veldt) নামে এবং অস্ট্রেলিয়ায় 'ডাউন্‌স্' (Downs) নামে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন তৃণভূমি পরিচিত। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের নিম্নলিখিত অঞ্চলের তৃণভূমিতে পশুপালন-শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে :—

(১) **উত্তর আমেরিকার** পশ্চিমাংশে কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থলে এবং মেক্সিকোর উত্তরাংশে অবস্থিত 'প্রেইরী' তৃণভূমিতে এই মহাদেশের অধিকাংশ পশু পালিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভুট্টাবলয়ে প্রচুর ভুট্টা উৎপন্ন হওয়ায় ইহ পশুপালন-শিল্পের উন্নতির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বর্তমানে এই ভুট্টাবলয় উত্তর আমেরিকার শ্রেষ্ঠ পশুপালন-কেন্দ্র। প্রেইরী অঞ্চল ছাড়াও পশ্চিমাংশের ইণ্টারমনটেন মালভূমিতে বহুসংখ্যক পশু পালিত হয়।

উত্তর আমেরিকার তৃণভূমির অধিকাংশ স্থানে গবাদি পশু ও মেষ পালিত হয়। টেক্সাস্ অঞ্চলে অ্যাঙ্গোরা ছাগলও পালিত হয়। পশুখাদ্য হিসাবে এখানকার ভুট্টা ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া এখানে প্রচুর খড় উৎপন্ন হয়। বিস্তীর্ণ প্রেইরী অঞ্চলের **গবাদি পশু** প্রধানতঃ মাংসের জন্য ব্যবহৃত হয়। কারণ এখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের তৃণভূমিতে বা ভুট্টাক্ষেতে মাংস-প্রদায়ী গবাদি পশু ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বহুদিন পরে ইহাদের একবার তাড়াইয়া বধ্য-ভূমিতে আনিয়া কাটা হয়। ঘুরিয়া খাইবার ফলে ইহাদের দেহে মাংসের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়। প্রতিদিন বাসস্থানে ইহাদের ফিরিয়া আসিতে হয় না। কিন্তু দুগ্ধ-প্রদায়ী গবাদি পশুকে প্রত্যহ বাসস্থানে আনিয়া

দুগ্ধ দিতে হয় বলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরযুক্ত পশুচারণক্ষেত্রে ইহা পালিত হয়। জলসেচযুক্ত অঞ্চলে অল্প পরিসর স্থানে অধিক তৃণ ও শস্যাদি জন্মে বলিয়া ইহা দুগ্ধ-প্রদায়ী গবাদি পশুপালনের বিশেষ উপযোগী। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে মেষ পালন করা হইয়া থাকে। পশ্চিমাংশের মেষপালনক্ষেত্র হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিন-চতুর্থাংশ পশম আসে। টেক্সাসের পশ্চিমাংশে ও মধ্যাংশে প্রচুর মেষ পালিত হয়। টেক্সাসে এই অঞ্চলের অধিকাংশ অ্যাঙ্গোরা ছাগল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে পূর্বে পরিবহণের জন্য প্রচুর অশ্ব পাওয়া যাইত। বর্তমানে আধুনিক পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় অশ্বের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে এই অঞ্চলের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গো-পালনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান, মেষ-পালনে অষ্টম স্থান, শূকর-পালনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

(২) **দক্ষিণ আমেরিকার** নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির অন্তর্গত আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও দক্ষিণ ব্রেজিল বর্তমানে পশুপালনে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। এখানকার এই তৃণভূমির নাম 'পম্পাস্'। এই তৃণভূমি উচ্চশ্রেণীর গবাদি পশুপালনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পশ্চিমাংশে ৪৫ সেঃ মিঃ এবং পূর্বাংশে ১০০ সেঃ মিঃ। এই বৃষ্টিপাত তৃণ-উৎপাদনের উপযোগী। মৃদু জলবায়ুর দরুন প্রায় সারাবৎসর পশুপালন করা সম্ভব। শীতের সময় পশুর দেহে প্রচুর মাংসের সৃষ্টি হয় বলিয়া এখানকার মাংস-প্রদায়ী পশুর সংখ্যা অনেক বেশী। গো-মাংস-রপ্তানিতে এই অঞ্চলের আর্জেন্টিনা পৃথিবীতে প্রথম স্থান (৪৪%) অধিকার করে। স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় অধিকাংশ মাংস রপ্তানি হইয়া থাকে। গমের রপ্তানি-মূল্য বৃদ্ধি পাইলে এখানকার লোক অনেকসময় তৃণভূমি পরিষ্কার করিয়া গমচাষ করে। এই অঞ্চলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মেরিণো মেষ পালিত হয়। এইজাতীয় মেষের গায়ে প্রচুর পশম পাওয়া যায়। মেষ-মাংস-রপ্তানিতে আর্জেন্টিনা পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান (২০%) অধিকার করে। উরুগুয়ের তিন-চতুর্থাংশ জমিতে গবাদি পশু ও মেষ পালিত হয়। এই দেশের মোট রপ্তানির দুই-তৃতীয়াংশ পশুজাত দ্রব্য। এই দেশের যই পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ব্রেজিলের দক্ষিণাংশে এই দেশের অধিকাংশ পশু পালিত হয়। উরুগুয়ে ও ব্রেজিলের পশু মাঝে মাঝে 'টেক্সাস্ জ্বরে' আক্রান্ত হয়। ইহার ফলে বহু পশু মারা যায়। বর্তমানে দক্ষিণ আমেরিকার এই সকল দেশের সরকার পশুপালনের

উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে ; ইহার ফলে এই অঞ্চলের পশুপালনের আরও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

(২) **অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের** বিস্তীর্ণ তৃণভূমি পশুপালনের বিশেষ উপযোগী। আমদানিকারক দেশসমূহ বহুদূরে অবস্থিত হইলেও এই দুইটি দেশ পশুজাত দ্রব্যাদির রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। অস্ট্রেলিয়ার মোট রপ্তানির শতকরা ৬৫ ভাগ এবং নিউজিল্যাণ্ডের মোট রপ্তানির শতকরা ৮০ ভাগ পশুজাত দ্রব্য। অস্ট্রেলিয়ায় জনপ্রতি ১৫টি এবং নিউজিল্যাণ্ডে ২০টি মেষ আছে। অস্ট্রেলিয়া অপেক্ষা নিউজিল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশ পশুপালনের পক্ষে অধিক উপযোগী। অস্ট্রেলিয়ায় কোন কোন বৎসর বৃষ্টিপাতের অভাবে পশুপালনের অসুবিধা হয় ; কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডে বৃষ্টিপাতের অভাব কখনই পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া পশুপালনের কোন অসুবিধা হয় না। ইহা ছাড়া নিউজিল্যাণ্ডে সারা-বৎসর তৃণভূমি সবুজ থাকায় খড় মজুত রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। ফলে এখানকার পশুজাত দ্রব্যের খরচ কিছুটা কম। এই অঞ্চলের মেষপালন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মেষপালনে অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। পশম-রপ্তানিতে পৃথিবীতে অস্ট্রেলিয়া প্রথম স্থান এবং নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। অস্ট্রেলিয়ায় ২৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত-রেখার পূর্বে অধিকাংশ পশু পালিত হইলেও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশেও পশুপালন-শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। আর্টেজিয়ান কূপ এই দেশের পশুপালনের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। পূর্বে অস্ট্রেলিয়ার বন্য কুকুর (ডিঙ্গো) বহু মেষ মারিয়া ফেলিত এবং বন্য খরগোশ মেষের খাদ্য তৃণ ও জল খাইয়া ফেলিত। এই সকল জন্তুর উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বেড়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া বহু খরগোশের শরীরে বিষাক্ত রোগের জীবাণু ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল জীবাণুযুক্ত খরগোশ অন্যান্য খরগোশের সঙ্গে মিশিয়া রোগ ছড়ায়, ফলে লক্ষ লক্ষ খরগোশ মরিয়া যায়। এই জীবাণু সহ্য করিবার শক্তি খরগোশ অর্জন করিলে পুনরায় মেষপালনের অসুবিধা দেখা দিতে পারে। ডিঙ্গো মারিয়া আনিলে পুরস্কার পাইবার ব্যবস্থা থাকায় বহু ডিঙ্গো শিকারীর কবলে পড়িয়াছে। এই সকল অসুবিধা দূর হইবার ফলে বর্তমানে পশুপালনে এই অঞ্চল পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

(৪) **দক্ষিণ আফ্রিকার** 'ভেল্‌ড্‌' তৃণভূমি পশুপালনে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইউরোপীয়গণ আসিবার পূর্বে এই তৃণভূমিতে বন্যপশু ঘুরিয়া বেড়াইত এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ইহা শিকার করিত। এই অঞ্চলে ২৫ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র উভয় প্রকার তৃণ জন্মে। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ তৃণভূমির উচ্চতা ৯০০ মিটার হইতে ১,৮০০ মিটার। এই সকল মালভূমির উচ্চ অংশে শীতকালে বরফ পড়ে বলিয়া বৎসরে প্রায় এক শত দিন পশুপালনে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এখানকার মেষপালন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ মেষ উচ্চশ্রেণীর মেরিণো-জাতীয়। পশম-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। এই দেশের বৃষ্টিবহুল স্থানে গবাদি পশুপালন করা হয়। কিন্তু এখানকার গোমাংস নিম্নশ্রেণীর। ইহা ছাড়া কোন কোন স্থানে ছাগল পালিত হয়।

(৫) উত্তর-পশ্চিম **ইউরোপের** ডেনমার্ক, বৃটেন, হল্যাণ্ড ও জার্মানী এবং পূর্ব ইউরোপের রাশিয়া, হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডের তৃণভূমিতে প্রচুর গরু ও মেষ পালিত হয়। পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ দুগ্ধ-সংক্রান্ত (Dairy) শিল্পে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। কারণ এই সকল দেশসমূহে গবাদি পশুর সংখ্যাই বেশী। **রাশিয়ার** স্টেপ্‌স্‌ তৃণভূমি এবং বৃটেনের ইয়র্কশায়ার মেষপালনে খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছে। রাশিয়া বর্তমানে মেষপালনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান এবং গবাদি পশুপালনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই দেশের অল্প বৃষ্টিপাত তৃণভূমি-সৃষ্টির পক্ষে খুবই উপযোগী। রাশিয়ার বিভিন্ন কৃষি-খামারেও বহু পশু পালিত হয়। বিপ্লবের পরে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই দেশে বিভিন্ন পশুর সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে নানাবিধ পশুজাত দ্রব্য-উৎপাদনেও এই দেশ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে।

(খ) ক্রান্তীয় মণ্ডলের তৃণভূমি (Tropical Grasslands)—ক্রান্তীয় মণ্ডলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল অপেক্ষা বেশী—৫০ সেঃ মিঃ হইতে ১৬০ সেঃ মিঃ। ইহার ফলে অধিকাংশ স্থানে দীর্ঘকায় তৃণ পরিলক্ষিত হয়। এইজাতীয় তৃণ গবাদি পশুপালনের উপযোগী বলিয়া মেষ অপেক্ষা গবাদি পশু ক্রান্তীয় অঞ্চলে অধিক পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টিপাত হইলেও অত্যধিক তাপমাত্রায় বৃষ্টিপাতের জল শুকাইয়া জলীয়

বাষ্পে পরিণত হয়। অধিক তাপমাত্রা ও আর্দ্র জলবায়ুর জন্য এখানকার তৃণ পুষ্টিকর হয় না বলিয়া গবাদি পশু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হয় না। ইহা ছাড়া নানাবিধ ক্রান্তীয় ব্যাধির জন্য এখানকার বহু পশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাপ এবং বন্যপশুও এখানকার বহু পশুর মৃত্যুর কারণ। বর্তমানে এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে পশু-চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার ফলে পশু-মৃত্যুর হার অনেক কমিয়াছে। তাপমাত্রা বেশী বলিয়া এখানকার মেষের পশম খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হয় না। বর্তমানে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সঙ্গে গো-মাংসের রপ্তানি-বাণিজ্যে ক্রান্তীয় অঞ্চল প্রতিযোগিতায় পারিয়া ওঠে না। উপযুক্ত ও পুষ্টিকর পশুখাদ্য-উৎপাদন, পরিবহণের সুব্যবস্থা, পশুরোগ নিবারণের ব্যবস্থা, উচ্চশ্রেণীর পশু দ্বারা প্রজননের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে এই অঞ্চল পশুপালনে আরও উন্নতি লাভ করিবে। ক্রান্তীয় মণ্ডলের নিম্নলিখিত অঞ্চলে পশুপালন বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে :—

(১) **আফ্রিকার স্যাভানা অঞ্চলে** পশুপালন উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই মহাদেশের এক-তৃতীয়াংশে স্যাভানা ঘাস জন্মে। এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬০ সেঃ মিঃ হইতে ১২৫ সেঃ মিঃ। নাইজেরিয়া, সুদান, উগাণ্ডা, কেনিয়া, রোডেসিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, অ্যাঙ্গোলা প্রভৃতি দেশ স্যাভানা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ইউরোপীয়গণ এই মহাদেশে আসিবার পূর্বেই স্থানীয় অধিবাসিগণ পশুপালনে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। দীর্ঘকায় তৃণ থাকায় এবং তাপমাত্রা অধিক বলিয়া গরু এখানকার প্রধান গৃহপালিত পশু। স্যাভানা অঞ্চলে মাংস-প্রদায়ী গরুর সংখ্যাই বেশী। ইউরোপীয়গণ আসিবার পর হইতে কোন কোন অঞ্চলে দুগ্ধ-প্রদায়ী গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ছাগল, শূকর ও মেষ পালিত হয়। জিরাফ ও জেব্রা এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য তৃণভোজী পশু। এখানকার তৃণভোজী পশুর মাংসের উপর নির্ভরশীল নেকড়ে বাঘ, বন্য শৃগাল, সিংহ, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু স্থানীয় বনে বাস করে। অনেকসময় ইহারা গরু ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু খাইয়া ফেলে।

(২) **দক্ষিণ আমেরিকার** ক্রান্তীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে প্রধানতঃ গরু পালিত হয়। এখানকার স্যাভানা ঘাস গরুর উৎকৃষ্ট খাদ্য। এই মহাদেশের পশুপালনক্ষেত্রসমূহ সমুদ্রের নিকটবর্তী বলিয়া পরিবহণের বিশেষ অসুবিধা হয় না। আফ্রিকার মতো বন্যপশুর ভয় এখানে নাই। কিন্তু

ইউরোপীয়গণ আসিবার পূর্বে এই অঞ্চলে গরু পালিত হইত না। এই অঞ্চলে কয়েকটি বিখ্যাত পশুচারণক্ষেত্র বিদ্যমান; তন্মধ্যে কলম্বিয়া 'বলিভার স্যাভানা', ভেনেজুয়েলার 'ল্লানোস্', ব্রেজিলের 'ক্যাম্পোস্', উত্তর আর্জেন্টিনা ও পশ্চিম প্যারাগুয়ের 'চাকো' তৃণভূমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার নদীসমূহে প্রায়ই বন্যা হয়; পশুখাদ্যের সঙ্গে মিশাইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ লবণ এখানে পাওয়া যায় না; বিভিন্ন ক্রান্তীয় রোগে বহু পশু ভোগে এবং মারা যায়; কোন কোন বৎসর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথেষ্ট হয় না। এই সকল কারণে এখানকার পশু উৎকৃষ্টশ্রেণীর হয় না এবং রপ্তানি-বাণিজ্যে এই অঞ্চলের গোমাংস নিকৃষ্টশ্রেণীর বলিয়া পরিচিত। ক্রান্তীয় অঞ্চলভুক্ত পেরুর দক্ষিণাংশে সমুদ্রবায়ুর জন্য মৃদু জলবায়ু থাকায় আণ্ডিজ পর্বতের পাদদেশে প্রচুর মেষ পালিত হয়। এখানকার মেষ বহুলাংশে স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

(৩) **অস্ট্রেলিয়ার** উত্তরাংশের ও উত্তর-পশ্চিমাংশের ক্রান্তীয় জলবায়ুতে প্রচুর গবাদি পশু পালিত হয়। ২৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত-রেখার পূর্বাংশে অধিকাংশ পশু পালিত হয়। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পূর্বাংশে ক্রমশঃ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে যতই পূর্বদিকে যাওয়া যায়, ততই পশুপালনের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। জল সরবরাহের উন্নতি সাধন করিয়া, উচ্চশ্রেণীর ষাঁড় আনিয়া প্রজননের ব্যবস্থা করিয়া, খরগোশের উৎপাত বন্ধ করিয়া এখানকার পশুপালন-শিল্পের উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রমিকের অভাব এই অঞ্চলের প্রধান সমস্যা। ইহার সমাধান না হইলে এখানকার পশুপালন-শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে কিনা সন্দেহ।

(৪) **ভারতের** ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রচুর গবাদি পশু ও মেষ পালিত হয়। গবাদি পশুর সংখ্যায় ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। নদী-উপত্যকায় এখানকার অধিকাংশ গবাদি পশু পালিত হয়। ভারতের হিন্দুগণ গো-মাংস ভক্ষণ না করায় মাংসের ব্যবসায়ে এই দেশ বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ক্রান্তীয় ব্যাধি, পশুখাদ্যের অভাব, গো-প্রজননের সুবন্দোবস্তের অভাব ও ব্যবসায়-ভিত্তিক পশুপালন না হওয়ায় এই দেশে গাভী-প্রতি দুগ্ধের পরিমাণ অত্যন্ত কম। নিউজিল্যাণ্ডে সমগ্র দুগ্ধদানকালে (কয়েক মাসে) গাভী-প্রতি প্রায় ৩ মেট্রিক টন দুগ্ধ পাওয়া

যায়; ভারতে পাওয়া যায় মাত্র '৮ মেট্রিক টন। জনসাধারণ গরীব বলিয়া ভারতে দুগ্ধের চাহিদা অত্যন্ত কম—বাৎসরিক জন-প্রতি '১৫ কিলোগ্রাম মাত্র। কৃষিকার্যে লাঙ্গল-টানা ও গাড়ী-চালানো, সেচের জন্য জল-তোলা, তেলের ঘানি-চালানো প্রভৃতি কার্যেও এখানকার গবাদি পশু ব্যবহৃত হয়। ধর্মের অনুশাসনের জন্য গোমাংস-রপ্তানিতে উন্নতি লাভ না করিলেও চর্ম-রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

পশু ও পশুজাত দ্রব্য
(Animal and Animal-Products)

গবাদি পশু (Cattle)

প্রাচীনকাল হইতেই গবাদি পশু পালিত হইয়া থাকে। আফ্রিকার দেশ-সমূহে গবাদি পশুর সাহায্যে বিনিময় প্রথা কার্যকরী করা হইত। চীন ও ভারতে প্রাচানকাল হইতে গরু ও মহিষ কৃষিকার্যে লাঙ্গল চালাইবার জন্য ও ভারবহনের জন্য নিযুক্ত হইত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ক্রমশঃ গবাদি পশুপালন উন্নতি লাভ করে। গবাদি পশু প্রধানতঃ তিনভাবে **ব্যবহার** করা হয়—ভারবহন ও ভূমিকর্ষণে, গো-মাংস ও চর্ম প্রস্তুতে এবং দুগ্ধ-উৎপাদনে। গবাদি পশুর গোময়ও মানুষের প্রয়োজনে আসে; উৎকৃষ্ট সার হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। এইজন্য ভারতের হিন্দুগণ গরুকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং গোমাংস ভক্ষণ করা পাপ বলিয়া মনে করে। ইহার ফলে ভারতে গো-মাংসের ব্যবসায় উন্নতি লাভ করে নাই। গো-দুগ্ধ হইতে ঘি, মাখন, পনীর প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। অনুন্নত দেশে এখনও গরু ও মহিষের গাড়ীতে মালপত্র প্রেরিত হয় এবং গ্রামাঞ্চলে গরুর গাড়ীতে মানুষ একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করে। গবাদি পশুর চর্ম অত্যন্ত মূল্যবান্; ইহা প্রধানতঃ জুতা ও অন্যান্য চর্মদ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। গরু ও মহিষের হাড় সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়; ইহাদের শিং ও খুর হইতে নানাবিধ কারুকার্যখচিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়।

মাংস-প্রদায়ী গবাদি পশু প্রধানতঃ বিস্তীর্ণ দীর্ঘকায় তৃণযুক্ত অঞ্চলে পালিত হয়। ইহাদের জন্য খুব বেশী যত্ন নেওয়া প্রয়োজন হয় না; বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে বা ভুট্টাক্ষেতে ছাড়িয়া দিলেই হয়। মাংসের প্রয়োজনের সময়

ইহাদের তৃণভূমি হইতে বধ্যভূমিতে লইয়া আসিতে হয়। কিন্তু দুগ্ধ-প্রদায়ী গবাদি পশুকে অত্যন্ত যত্নের সহিত পালন করিতে হয়। অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দিয়া দুগ্ধের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। প্রতিদিন দুইবার দুগ্ধ দোহন করিতে হয়। দুগ্ধ-প্রদায়ী গবাদি পশুপালনক্ষেত্রের নিকটেই সাধারণতঃ দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প উন্নতি লাভ করে।

গবাদি পশুপালন অঞ্চল (Cattle-rearing areas)—গবাদি পশু-পালনের জন্য বিস্তীর্ণ তৃণভূমি প্রয়োজন। দীর্ঘকায় তৃণ ইহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কোন কোন অঞ্চলে ভুট্টা, যব, রাই, যই প্রভৃতি গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খড়, ভুষি, খইল প্রভৃতি ইহাদের আনুষঙ্গিক খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চলেই অধিকাংশ গবাদি পশু পালিত হয়। অধিক তাপযুক্ত ক্রান্তীয় অঞ্চলে এবং শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গবাদি পশুপালন উন্নতি লাভ করিয়াছে। অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে গবাদি পশুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী।

পৃথিবীর গবাদি পশুর সংখ্যা (১৯৬৩-৬৪)

মোট সংখ্যা—৯৫ কোটি

ভারত	১৭ কোটি	৫৬ লক্ষ			চীন	৪ কোটি		৪৫ লক্ষ	
মঃ যুক্তরাষ্ট্র	৯	„	৯৫	„	আর্জেন্টিনা	৪	„	৪০	„
রাশিয়া	৮	„	২০	„	ফ্রান্স	২	„	০৫	„
ব্রেজিল	৭	„	৬২	„	পঃ জার্মানী	১	„	৩৩	„

ভারত—পৃথিবীতে গবাদি পশুপালনে প্রথম স্থান অধিকার করিলেও গো-মাংস উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পে এই দেশ বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। হিন্দুরা গো-মাংস ভক্ষণ করা এবং গো-মাংসের ব্যবসায় করা ধর্মবিগর্হিত কাজ বলিয়া মনে করে। এইজন্য মাংস-রপ্তানিতে এই দেশ বিশেষ কোন অংশগ্রহণ করে না। বহু গরু ভূমিকর্ষণে ও ভারবহনে নিযুক্ত হয় বলিয়া এবং গাভী-প্রতি দুগ্ধ-উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম বলিয়া উদ্বৃত্ত দুগ্ধ বেশী পরিমাণে না পাওয়ায় দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প উন্নতি লাভ করে নাই। ভারতে গো-পালনের জন্য উপযুক্ত জলবায়ু থাকায় গবাদি পশুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। অধিকাংশ গবাদি পশু গৃহপালিত পশু হিসাবে পালিত হয়; বৃহদাকার বাণিজ্যিক পশুচারণক্ষেত্রের সংখ্যা খুব কম। মধ্যপ্রদেশ,

মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যে অধিকাংশ গবাদি পশু পালিত হয়। অন্যান্য রাজ্যেও অল্পবিস্তর গবাদি পশু পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—গবাদি পশুপালনে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বিস্তীর্ণ প্রেইরী তৃণভূমি ও ভুট্টাক্ষেত প্রধানতঃ গোপালনের জন্য ব্যবহৃত হয় (১২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পূর্বাঞ্চলে ভুট্টাবলয়ে প্রধানতঃ দুগ্ধের জন্য এবং পশ্চিমাঞ্চলের তৃণভূমিতে প্রধানতঃ মাংসের জন্য গবাদি পশু পালিত হয়। স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত বেশী বলিয়া গো-মাংস রপ্তানি করা এই দেশের পক্ষে সম্ভব নহে। চিকাগো, সেণ্ট লুই, সেণ্ট পল্‌স্ প্রভৃতি এই দেশের মাংস ও দুগ্ধ-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। **কানাডার** বিস্তীর্ণ প্রেইরী তৃণভূমিতে গবাদি পশু পালিত হয়। এই দেশ দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পেও বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

রাশিয়া—বর্তমানে এই দেশ গো-পালনে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। স্টেপ্‌স্ অঞ্চলে অধিকাংশ গবাদি পশু পালিত হয়। রাষ্ট্রীয় ও যৌথ কৃষি-খামারেও পশুপালনের সুবন্দোবস্ত আছে। পঞ্চবার্ষিকী

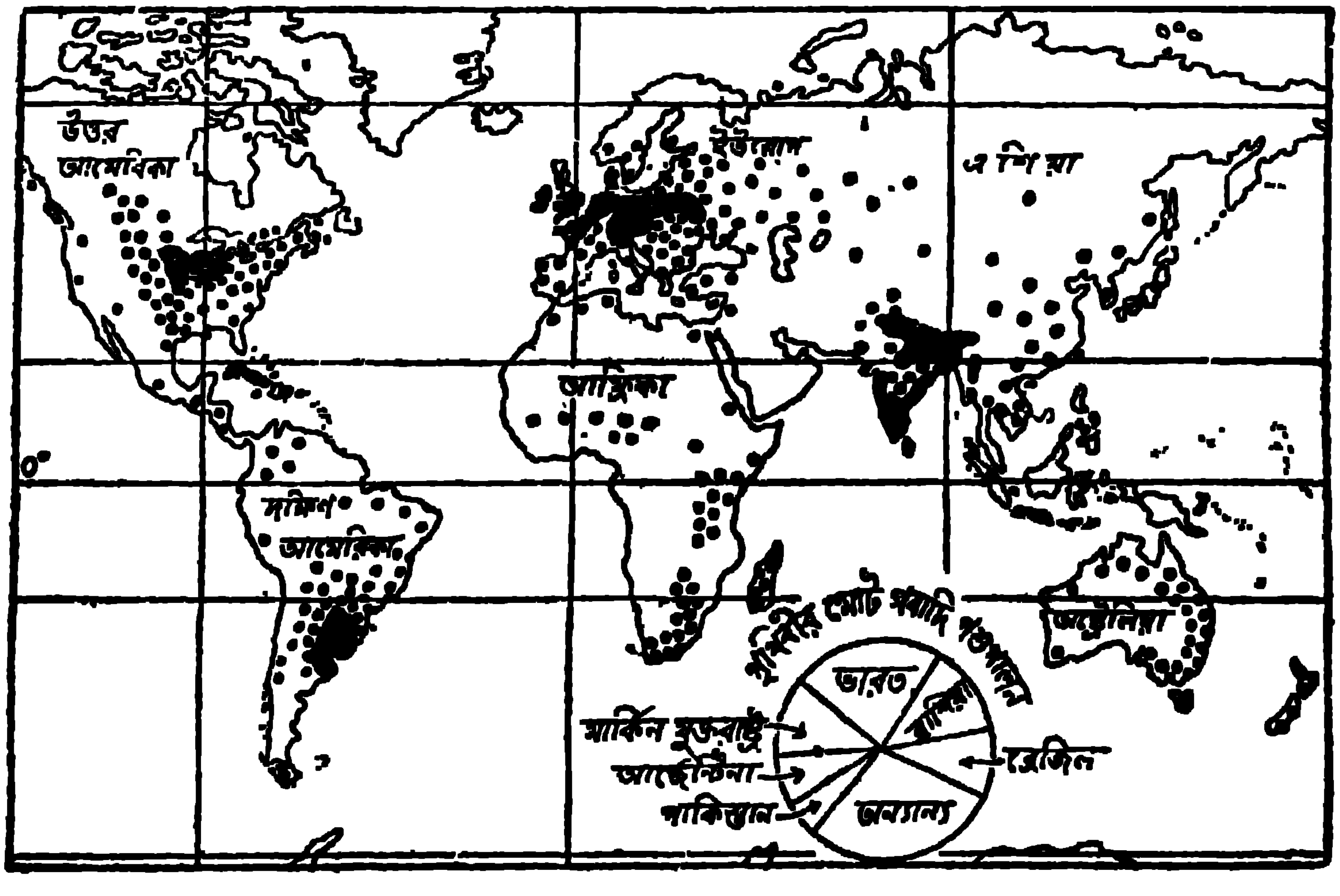

পরিকল্পনার মারফত পশুপালন-শিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। ভুট্টা ও অন্যান্য পশুখাদ্য এই দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বর্তমানে মোট পশুখাদ্য-উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৪·৮ কোটি মেঃ টন। এখানকার গবাদি পশু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর বলিয়া গাভী-প্রতি ২,৭০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুগ্ধ

পাওয়া যায়। মাংস ও চর্ম-উৎপাদন এবং দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পের উন্নতির জন্য এই দেশের গবাদি পশু ব্যবহৃত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা—এই মহাদেশের ব্রেজিল গবাদি পশুপালনে পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের পম্পাস্, উত্তর আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ের চাকো, ভেনেজুয়েলার ল্লানোস্, কলম্বিয়ার বলিভার স্যাভানা তৃণভূমি গবাদি পশুপালনের জন্য বিখ্যাত (১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অধিকাংশ পশু মাংসের জন্য ব্যবহৃত হয়; স্থানীয় চাহিদা অনেক কম। সেইজন্য আর্জেন্টিনা গো-মাংস (Beef)-রপ্তানিতে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

ইউরোপের দেশসমূহের মধ্যে ফ্রান্স, জার্মানী, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বৃটেন, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ গো-পালনে উন্নতি লাভ করিয়াছে। বিস্তৃত তৃণভূমি না থাকায় অল্প জায়গার মধ্যে এখানে পশুপালনের বন্দোবস্ত করিতে হয়। সেইজন্য এই সকল দেশে সাধারণতঃ দুগ্ধ-প্রদায়ী গবাদি পশু পালিত হয়। ডেনমার্ক দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির রপ্তানিতে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। অন্যান্য দেশেও দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপের মাংস-প্রদায়ী গবাদি পশুর সংখ্যা অল্প হইলেও, ইহা অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর বলিয়া পশু-প্রতি অধিক মাংস পাওয়া যায়।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের স্যাভানা অঞ্চলে অধিকাংশ গবাদি পশু পালিত হয় (১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশের ক্রান্তীয় অঞ্চলে এই দেশের প্রায় অর্ধেক গবাদি পশু পাওয়া গেলেও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর গবাদি পশু পাওয়া যায়। স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় গো-মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির রপ্তানিতে এই দেশ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। এই দেশের তিন-চতুর্থাংশ গবাদি পশু মাংসের জন্য এবং এক-চতুর্থাংশ দুগ্ধের জন্য পালিত হইয়া থাকে।

নিউজিল্যাণ্ডের তৃণভূমি অঞ্চলেও গবাদি পশু পালিত হয়। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গরু পালিত হয়। এই দেশে গাভী-প্রতি দুগ্ধের পরিমাণ বৎসরে প্রায় ৩,০০০ কিলোগ্রাম।

বাণিজ্য (Trade)—পূর্বে একদেশ হইতে অন্যদেশে মাংস রপ্তানি করা কষ্টকর ছিল; কারণ ইহা গরমে পচিয়া যাইত। হিমায়ন যন্ত্রের আবিষ্কারের পরে মাংস রপ্তানির উন্নতি হইয়াছে। গো-পালনে ভারত শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার

করিলেও ধর্মের নিষেধ থাকায় **গো-মাংস রপ্তানি** করিতে পারে না। গো-পালনে আর্জেন্টিনার স্থান অনেক নীচে হইলেও স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় এই দেশ গো-মাংস-রপ্তানিতে প্রথম স্থান অধিকার করে। রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় হিমশীতল প্রকোষ্ঠযুক্ত জাহাজ আমদানিকারক দেশসমূহ সরবরাহ করে। পশুপালন কেন্দ্র হইতে গবাদি পশু বিভিন্ন বন্দরে অবস্থিত বধ্যভূমিতে আনা হয়। সেখান হইতে সরাসরি জাহাজে গো-মাংস ভর্তি করা হয়। গো-মাংস আর্জেন্টিনার অন্যতম প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। গো-মাংস-রপ্তানিতে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ব্রেজিল, উরুগুয়ে, নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা প্রভৃতি দেশও প্রচুর পরিমাণে গো-মাংস রপ্তানি করে।

গো-মাংসের বাণিজ্য (শতকরা অংশ)

রপ্তানিকারক দেশ		আমদানিকারক দেশ	
আর্জেন্টিনা	৪৪%	বৃটেন	৬৬%
অস্ট্রেলিয়া	১২%	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৬.৫%
নিউজিল্যাণ্ড	১১%	বেলজিয়াম	৩%
উরুগুয়ে	১১%	ইটালি	৩%
কানাডা	৭.৫%	স্পেন	৩%
ব্রেজিল	২.৫%		

আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে বৃটেন প্রথম স্থান অধিকার করে। বৃটেনের মানুষ অত্যধিক মাংস খায় বলিয়া এবং স্থানীয় উৎপাদন কম হওয়ায় এই দেশকে প্রচুর **গো-মাংস আমদানি** করিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর গবাদি পশুপালন করিলেও স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় এই দেশ গো-মাংস-আমদানিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া ইটালি, স্পেন, বেলজিয়াম, জার্মানী গো-মাংস আমদানি করিয়া থাকে। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে উচ্চশ্রেণীর গবাদি পশু পাওয়া যায় বলিয়া এই সকল দেশ হইতে গবাদি পশু অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহে প্রজননের জন্য রপ্তানি হইয়া থাকে; দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির বাণিজ্য সম্বন্ধে (পরে ১৩৬ পৃঃ) আলোচনা করা হইয়াছে।

গবাদি পশুর **চর্ম (Hides)** মানুষের নানাবিধ (জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি) প্রয়োজনে আসে। এইজন্য চর্মের বহির্বাণিজ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

ভারত গো-মাংস-রপ্তানিতে অংশগ্রহণ না করিলেও মৃত গবাদি পশুর চর্ম-রপ্তানিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। সকল প্রকার (দুগ্ধ-প্রদায়ী' মাংস-প্রদায়ী, ভারবহনকারী) গবাদি পশু হইতেই চর্ম সংগ্রহ করা হয়। আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশও প্রচুর পরিমাণে চর্ম রপ্তানি করে। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী চর্মের প্রধান আমদানিকারক।

দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প (Dairy Industry)—গবাদি পশুর সংখ্যা বেশী থাকিলেই কোন দেশ দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কারণ গাভী হইতে যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ না পাওয়া গেলে এই শিল্পের উন্নতি-সাধন সম্ভব নহে। গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ প্রভৃতি পশু হইতে দুগ্ধ পাওয়া গেলেও পৃথিবীর অধিকাংশ দুগ্ধ গরু ও মহিষ হইতে পাওয়া যায়। দুগ্ধ হইতে ঘি, মাখন ও পনীর উৎপন্ন হয়। দুগ্ধ-প্রদায়ী গবাদি পশুপালনের জন্য এবং দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য নিম্নলিখিত **প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা** বিশেষ প্রয়োজন :—(১) গ্রীষ্মকালে পরিমিত বৃষ্টিপাত একান্ত প্রয়োজন। মাঝারি বৃষ্টিপাতে দীর্ঘ ও পুষ্টিকর তৃণ জন্মায়। (২) মৃদু শীতকাল থাকিলে গবাদি পশু সারাবৎসর বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে চরিয়া বেড়াইতে পারে। (৩) গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ অপেক্ষাকৃত শীতল হইলে গবাদি পশু হইতে দুগ্ধ উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়। (৪) তৃণভূমি ও অন্যান্য পশুখাদ্যের জন্য আর্দ্র দো-আঁশ মৃত্তিকা প্রয়োজন। (৫) দুগ্ধ দ্রুত চলিয়া যায় বলিয়া, ইহা দ্রুত প্রেরণের জন্য পরিবহণের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা থাকা দরকার। (৬) বন্ধুর ভূ-প্রকৃতিতে কৃষিকার্য সম্ভব নয় বলিয়া অন্যান্য পরিবেশ অনুকূল থাকিলে এই শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারে। (৭) জনবহুল দেশে শ্রমিকের অভাব না থাকায় এবং চাহিদা বেশী বলিয়া এই শিল্প সহজে উন্নতি লাভ করে।

এই সকল প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা স্বভাবতঃই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দেখা যায় বলিয়া এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। আধুনিক সভ্যতার যুগে শহরাঞ্চলে গবাদি পশুর দুগ্ধ, মাখন সরাসরি পাওয়া কষ্টকর। সেইজন্য বর্তমানে গুঁড়া দুগ্ধ, ঘনীভূত দুগ্ধ, ঘি, পনীর প্রভৃতির উপর মানুষ অধিক নির্ভর করে। এই সকল দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রধানতঃ পৃথিবীর চারিটি অঞ্চলে এই শিল্প সুশৃঙ্খলভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে :—উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ, উত্তর আমেরিকার হ্রদ

অঞ্চলের দক্ষিণ ও পূর্বদিকের স্থানসমূহ, রাশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের জার্মানী, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বৃটেন, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। গাভী-প্রতি দুগ্ধের পরিমাণ এই অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশী। দুগ্ধ-উৎপাদনে এই অঞ্চলের জার্মানী পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। মাখন-উৎপাদনে ডেনমার্ক পৃথিবীতে প্রথম স্থান এবং জার্মানী চতুর্থ স্থান অধিকার করে। পনীর-উৎপাদনে হল্যাণ্ড পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এখানকার এক একটি দেশ কোন একটি দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। ডেনমার্কের মাখন এবং হল্যাণ্ডের পনীর জগদ্বিখ্যাত। এই দুইটি দেশের জনসংখ্যা কম বলিয়া রপ্তানি-বাণিজ্যে ইহারা পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ডেনমার্কে প্রায় ৯,০০০ সমবায় প্রতিষ্ঠানের মারফত দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প চালিত হয়। এখানকার সমবায় প্রথা অত্যন্ত কার্যকরী। দেশের মোট দুগ্ধের শতকরা ৮০ ভাগ মাখন-উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। ডেনমার্কের মোট রপ্তানির তিন-চতুর্থাংশ দুগ্ধজাত দ্রব্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভুট্টাবলয়ের পূর্বদিকে দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দেশ পৃথিবীতে দুগ্ধ-উৎপাদনে দ্বিতীয়, পনীর-উৎপাদনে প্রথম এবং মাখন-উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। হ্রদ অঞ্চলের শহরগুলি দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পের কেন্দ্রস্থল। কানাডার প্রেইরী অঞ্চলেও এই শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। এখানকার গাভী-প্রতি দুগ্ধ-উৎপাদন অত্যন্ত বেশী। স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় অধিকাংশ ঘনীভূত ও গুঁড়া দুগ্ধ, মাখন ও পনীর বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এইজন্য সমুদ্রপ্রান্তের বন্দরসমূহের নিকটেই অধিকাংশ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় সরকার দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনে ও রপ্তানিতে যথেষ্ট সহায়তা করে।

রাশিয়ায় সম্প্রতি দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারে অত্যন্ত যত্নের সহিত গবাদি পশু পালিত হয়। এই দেশে গড়ে গাভী-প্রতি ১,৯১৩ কিলোগ্রাম দুগ্ধ পাওয়া যায়। রাষ্ট্রীয় খামারে গাভী-প্রতি ২,৭০০ কিলোগ্রাম দুগ্ধ পাওয়া যায়। বর্তমানে দুগ্ধ-উৎপাদনে এই দেশ

পৃথিবীতে প্রথম এবং মাখন-উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পনীর-উৎপাদনেও এই দেশ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে।

ইহা ছাড়া চীন, ইটালি, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশও দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদনে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন (১৯৬৩)
(লক্ষ মেঃ টন)

	দুগ্ধ	মাখন	পনীর		দুগ্ধ	মাখন	পনীর
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৭২৮	৭·০	৭·১	নিউজিল্যাণ্ড	৫৪	২·১	১·০
রাশিয়া	৬৪২	৯·৪	২·৫	বৃটেন	১২৬	·৬	১·১
অস্ট্রেলিয়া	৬৮	২·৩	·৬	আর্জেন্টিনা	৪৪	·৫	১·৪
কানাডা	৮৮	১·৭	·৬	ডেনমার্ক	৫৪	১·৭	১·১
পূর্ব জার্মানী	৫৯	১·৭	·১৮	হল্যাণ্ড	৭২	১·০	২·২
পশ্চিম জার্মানী	২০১	৪·৫	১·৬	ফ্রান্স	২৪২	২·৭	৪·৮

বাণিজ্য (Trade)—দুগ্ধ-রপ্তানিকারক দেশসমূহের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, কানাডা ও নিউজিল্যাণ্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃটেন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি প্রধান আমদানিকারক দেশ। বিভিন্নভাবে দুগ্ধ রপ্তানি হয়: গুঁড়া দুগ্ধ, ঘনীভূত দুগ্ধ হিসাবে প্রধানতঃ ইহা রপ্তানি হয়। নিকটবর্তী দেশে টাটকা দুগ্ধও রপ্তানি হইয়া থাকে। মাখন-রপ্তানিকারক দেশসমূহের মধ্যে নিউজিল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃটেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড অধিকাংশ মাখন আমদানি করে। পনীর-রপ্তানিকারক দেশসমূহের মধ্যে নিউজিল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও ডেনমার্ক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃটেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশ প্রধানতঃ পনীর আমদানি করে।

মেষ (Sheep)

পশুপালন-শিল্পে গবাদি পশুর পরেই মেষের স্থান। প্রধানতঃ মাংস (Mutton) ও পশমের (Wool) জন্য মেষ পালিত হয়। কোন কোন স্থানে মেষ হইতে অল্প পরিমাণে দুগ্ধও পাওয়া যায়। শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পশমী বস্ত্র প্রয়োজন। সেইজন্য শীতপ্রধান দেশে অধিকাংশ পশম এবং পশমী বস্ত্র উৎপন্ন হয়।

মেষপালনের ভৌগোলিক অবস্থা (Geographical Conditions for Sheep-grazing)—মেষ ক্ষুদ্রকায় তৃণ খাইয়া প্রধানতঃ জীবন ধারণ করে। সেইজন্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি মেষপালনের উপযোগী। কারণ এখানকার অল্প বৃষ্টিপাতে ক্ষুদ্রকায় তৃণভূমির সৃষ্টি হয়। মোটামুটি ১০° সেঃ হইতে ২৫° সেঃ উত্তাপ, ২৫ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত এবং পাহাড়ের উঁচু-নীচু জমি মেষপালনের পক্ষে উৎকৃষ্ট। শীতল ও শুষ্ক স্থানে মেষের গায়ে পশমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অত্যধিক শীতল আবহাওয়া মেষের পশম নষ্ট করিয়া ফেলে। সেইজন্য উত্তর গোলার্ধ অপেক্ষা দক্ষিণ গোলার্ধে পশম-প্রদায়ী মেষের সংখ্যা অনেক বেশী।

মেষপালন অঞ্চল (Sheep-rearing areas)—ব্যবহার অনুসারে মেষকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—মাংস-প্রদায়ী মেষ এবং পশম-প্রদায়ী মেষ।

পৃথিবীর মেষপালন অঞ্চল (১৯৬০)

মোট সংখ্যা—৯৯ কোটি

অস্ট্রেলিয়া	১৫ কোটি	২৭ লক্ষ	নিউজিল্যাণ্ড	৪ কোটি	৮৪ লক্ষ
রাশিয়া	১৩ „	৩০ „	ভারত	৪ „	৩ „
চীন	৬ „	৮ „	দক্ষিণ আফ্রিকা	৩ „	৭৮ „
আর্জেন্টিনা	৪ „	৯০ „	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩ „	৩০ „

মাংস-প্রদায়ী মেষপালনের জন্য তৃণবহুল বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রয়োজন।

অধিক তৃণ ভক্ষণ করিলে মেদ বেশী হয় বলিয়া তৃণবহুল স্থানের মেষ হইত

অধিক পরিমাণে মাংস পাওয়া যায়। মেষ-মাংস-উৎপাদনে রাশিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। চীন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা, ভারত, বৃটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও প্রচুর মেষ-মাংস উৎপন্ন হয়।

মেষ-মাংস ও মেষশাবক (মাংসের জন্য) রপ্তানিতে নিউজিল্যাণ্ড প্রথম (৬৩%), আর্জেন্টিনা দ্বিতীয় (২০%) এবং অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় (১২%) স্থান অধিকার করে। রাশিয়া ও চীন প্রচুর পরিমাণে মেষ-মাংস উৎপন্ন করিলেও স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া ইহাদের পক্ষে রপ্তানি-বাণিজ্যে অংশ-গ্রহণ করা সম্ভব নহে। আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে বৃটেন প্রথম স্থান (৯৫%) অধিকার করে।

পশম (Wool)—পশম-প্রদায়ী মেষ হইতে উৎপন্ন পশম **তিন প্রকার**। আফ্রিকার উদ্ভূত 'মেরিণো' মেষের পশম সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এইজাতীয় মেষ বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশেও পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মিশ্র-জাতির মেষ হইতে দীর্ঘ-আঁশযুক্ত পশম পাওয়া যায়। নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, পেরু প্রভৃতি দেশে এইজাতীয় পশম পাওয়া যায়। এশিয়া, রাশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় কর্কশ স্থূল পশমযুক্ত মেষ পালিত হয়। ইহাদের পশম নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

পশম-উৎপাদনকারী অঞ্চল (Wool-producing areas)—দক্ষিণ গোলার্ধের জলবায়ু পশম-প্রদায়ী মেষপালনের বিশেষ উপযোগী। এখানে অত্যধিক শীতল জলবায়ু না থাকায় মেষের পশম নষ্ট হইতে পারে না।

পৃথিবীর পশম-উৎপাদন (১৯৬৪)

মোট পশম-উৎপাদন—২৭ লক্ষ মেঃ টন

অস্ট্রেলিয়া	৮ লক্ষ ৯ হাজার মেঃ টন	আর্জেন্টিনা	২ লক্ষ ১ হাজার মেঃ টন
রাশিয়া	৩ „ ৫০ „ „	দঃ আফ্রিকা	১ „ ৪৪ „ „
নিউজিল্যাণ্ড	২ „ ১৬ „ „	মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	১ „ ২০ „ „

Source—F. A. O. Monthly Bulletin, March, 1965.

অস্ট্রেলিয়া মেষপালনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এখানকার অধিকাংশ মেষ পশমের জন্য প্রতিপালন করা হয় বলিয়া পশম-উৎপাদনে ও রপ্তানিতে এই দেশ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ২৫-৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে

অধিকাংশ মেষ পালিত হয় (১২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এখানকার অধিকাংশ পশম বৃটেনে প্রেরিত হয়। **নিউজিল্যাণ্ড** পশম-উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এখানকার মৃদু জলবায়ু ও বিস্তীর্ণ তৃণভূমি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মেষপালনের সহায়ক। দক্ষিণাংশের পার্বত্য অঞ্চলে 'মেরিণো' মেষ, উত্তরাংশে 'রোমনে' মেষ এবং ক্যাণ্টারবেরী সমভূমিতে মিশ্রজাতীয় মেষ পালিত হয়। পশমের রপ্তানি-বাণিজ্যেও এই দেশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

রাশিয়া ক্রমশঃই মেষপালনে উন্নতি লাভ করিতেছে। পূর্বে এই দেশে পশমের পরিমাণ অত্যন্ত কম ছিল; কিন্তু বর্তমানে এই দেশ পশম-উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই দেশের পশম অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইলেও অত্যধিক শীতের জন্য এখানে স্থানীয় পশমের প্রচুর চাহিদা বিদ্যমান। স্টেপ্‌স্ অঞ্চলে অধিকাংশ পশম-প্রদায়ী মেষ পালিত হয়। সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৬৫ সালে এই দেশের পশম-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৫'৪ লক্ষ মেঃ টনে দাঁড়াইবে।

আর্জেণ্টিনা ও উরুগুয়ের নীতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পম্পাস্ তৃণভূমিতে ৫০-১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে প্রচুর পশম-প্রদায়ী মেষ পালিত হয় (১২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এখানকার পশম খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর না হইলেও, অধিকাংশ পশম পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে সহজেই রপ্তানি হইয়া থাকে। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের** উত্তর-পশ্চিমাংশের পার্বত্য অঞ্চলে অধিকাংশ পশম-প্রদায়ী মেষ পালিত হয়। অত্যধিক শীতের জন্য এখানকার পশম খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হয় না। বর্তমানে মিশ্র-প্রজননের সাহায্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশম উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। স্থানীয় চাহিদা বেশী বলিয়া বিদেশ হইতে প্রচুর পশম আমদানি করা হয়। **দক্ষিণ আফ্রিকার** উচ্চ ভেল্ড্ তৃণভূমিতে ৫০-১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে পশম-প্রদায়ী মেষ পালিত হয়। উচ্চশ্রেণীর বৃটিশ ও মেরিণো মেষ দ্বারা প্রজননের ফলে এখানকার পশম অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়া থাকে। এই দেশের অধিকাংশ পশম বৃটেনে প্রেরিত হয়। ভারত ও চীনের পশম নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া ইহা প্রধানতঃ কার্পেট প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া বৃটেন, স্পেন, উরুগুয়ে, চিলি, পেরু, কানাডা প্রভৃতি দেশেও পশম উৎপন্ন হয়।

বাণিজ্য (Trade)—অধিকাংশ পশমবয়ন-শিল্প উত্তর গোলার্ধের শিল্প-প্রধান দেশসমূহে অবস্থিত। কিন্তু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অধিকাংশ পশম উৎপন্ন

হয় দক্ষিণ গোলার্ধের দেশসমূহে। দক্ষিণ গোলার্ধের পশম-উৎপাদনকারী দেশসমূহে লোকসংখ্যা কম এবং ইহারা এখনও পশমবয়ন-শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এইজন্য পশমের মোট রপ্তানির শতকরা ৯৮ ভাগ দক্ষিণ গোলার্ধের দেশসমূহ হইতে আসে। আমদানিকারক দেশসমূহ সম্পূর্ণতঃ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত।

বিশুদ্ধ পশমের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য (১৯৬৩-৬৪)
(০০০ মেঃ টন)

রপ্তানিকারক দেশসমূহ		আমদানিকারক দেশসমূহ	
অস্ট্রেলিয়া	৩৯০	বৃটেন	১৭৬
নিউজিল্যাণ্ড	১৮২	জাপান	১১৪
আর্জেন্টিনা	৮৯	ফ্রান্স	১০৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	৬৮	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১০৩
উরুগুয়ে	২৬	ইটালি	৮০

মেষ হইতে প্রধানতঃ পশম উৎপন্ন হইলেও, অন্যান্য জন্তুর লোম হইতেও পশম পাওয়া যায়। চীনদেশে ছাগল ও উটের লোম হইতে, রাশিয়ার তুর্কিস্তানে উটের লোম হইতে, দক্ষিণ আফ্রিকায় অ্যাঙ্গোরা ছাগলের লোম হইতে, কাশ্মীর ও তিব্বতে ছাগলের লোম হইতে পশম উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ আমেরিকার ভাইকুনা নামক একপ্রকার বন্যজন্তুর লোম হইতে সূক্ষ্ম পশম উৎপন্ন হয়, এই মহাদেশের আণ্ডিজ পর্বতের পাদদেশে আলপাকা, লামা প্রভৃতি জন্তুর লোম হইতে পশম উৎপন্ন হয়।

শূকর (Pig)

মাংস ও চর্বির জন্য প্রধানতঃ শূকর পালন করা হয়। নিকৃষ্ট জিনিস ও আবর্জনা খাইয়া শূকর বাঁচিতে পারে বলিয়া এবং প্রায় সকল প্রকার জলবায়ুতে শূকর বাস করিতে পারায়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে কমবেশী শূকর দেখা যায়। ভুট্টা খাইলে শূকরের চর্বি ও মাংস বৃদ্ধি পায় বলিয়া ভুট্টা অঞ্চলে শূকরপালন খুবই লাভজনক। শূকর একবারে অনেকগুলি বাচ্চা দেয় বলিয়া শূকর-মাংস উৎপাদনের খরচ অনেক কম।

শূকর-পালন অঞ্চল (Pig-rearing areas)—চীনদেশে সর্বাপেক্ষা বেশী (১৮ কোটি) শূকর পাওয়া যায়। শূকরের মাংস চীনাদের উৎকৃষ্ট খাদ্য

এই দেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই কমবেশী শূকর পালিত হয়। **রাশিয়া** শূকর-পালনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান (৭ কোটি) অধিকার করে। ইউরোপীয় রাশিয়ায় প্রায় সর্বত্রই শূকর পালিত হয়। আলজেরিয়া হইতে পাকিস্তান পর্যন্ত মুসলমানপ্রধান দেশে শূকরপালন হয় না। কারণ ইস্‌লাম ধর্ম অনুসারে মুসলমানগণ মনুষ্য-পুরীষ-খাদক শূকরের মাংস খাইতে পারে না। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের** ভুট্টাবলয়ে প্রচুর শূকর (৫'৭ কোটি) পাওয়া যায়। শূকরপালনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় স্থান অধিকার করে। শূকরের মাংস ও চর্বি টিনবন্দী করিয়া প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। আইওয়া ও মিসৌরী রাজ্য শূকরপালনের জন্য বিখ্যাত। চিকাগো বন্দর শূকর-মাংস ও চর্বি রপ্তানির শ্রেষ্ঠ বন্দর। বর্তমানে জাহাজের হিমপ্রকোষ্ঠে তাজা মাংস বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা সহজ। **পশ্চিম ইউরোপের** দেশসমূহের মধ্যে ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, জার্মানী, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ শূকরপালনে উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই সকল দেশের উৎপন্ন মাংস স্থানীয় চাহিদা মিটাইতে ব্যয় হয়। **দক্ষিণ আমেরিকার** ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনায় প্রচুর শূকর পাওয়া যায়; এখানকার মেষের তুলনায় শূকরের সংখ্যা অনেক কম।

শূকরের মাংস (Pork, Bacon, Ham) ও চর্বি (Lard) **রপ্তানিতে** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। কানাডা, ডেনমার্ক, আয়ারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশও শূকরের মাংস রপ্তানি করে। **আমদানিকারক** দেশসমূহের মধ্যে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপজাত দ্রব্য (By-products)—পশুচর্মের সাহায্যে চর্মশিল্প বিভিন্ন দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। গরু, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি বৃহদাকার জন্তুর চর্মকে **স্থূল** চর্ম (Hides) এবং ছাগল, মেষ প্রভৃতি **ক্ষুদ্রকায় জন্তুর** চর্মকে সূক্ষ্ম চর্ম (Skin) বলে। গরু ও মহিষের চর্মই পশুচর্মের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সম্বন্ধে পূর্বে (১৩৩ পৃষ্ঠা) আলোচনা করা হইয়াছে। ব্যবসায়িক চর্মের মধ্যে হাঙ্গর, খেঁকশিয়াল, বানর, সাপ প্রভৃতির চর্মও অন্তর্ভুক্ত। ভারত, চীন, ব্রেজিল ও মেক্সিকোতে ছাগ-চর্ম এবং অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে মেষের চর্ম পাওয়া যায়।

বিভিন্ন পশুর হাড় হইতে বোতাম, চিরুনী ও নানাবিধ কারুকার্য-খচিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন পশু হইতে সূক্ষ্ম

কোমল লোম (Fur) পাওয়া যায়। শীতপ্রধান দেশে ইহার আদর সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. Describe briefly the principal commercial grazing grounds of the world and indicate their future potentialities.

উঃ—'পৃথিবীর বাণিজ্যিক পশুচারণ-ক্ষেত্রসমূহ' (১২২ পৃঃ—১২৯ পৃঃ) সংক্ষেপে লিখ।

2. Describe the world distribution of cattle. What do you know about the beef-trade in the present-day world.

উঃ—'গবাদি পশুপালন অঞ্চল' ও 'গো-মাংসের বাণিজ্য' (১৩০ পৃঃ—১৩৪ পৃঃ) লিখ।

3. What are the geographical and economic conditions for the development of Dairy industry ? Mention the countries which have specialised in this industry. [P. U. B. Com. 1957]

উঃ—'দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প' (১৩৪ পৃঃ—১৩৬ পৃঃ) লিখ।

4. What are the conditions of success in the production of commercial wool ? Describe the principal wool-producing countries of the world and indicate the nature of world trade in wool.

উঃ—'মেষ' হইতে 'মেষপালনের ভৌগোলিক অবস্থা' (১৩৭ পৃঃ) লিখ এবং 'পশম-উৎপাদনকারী অঞ্চল' ও 'বাণিজ্য' (১৩৮ পৃঃ—১৪০ পৃঃ) লিখ।

5. What are the geographical conditions under which commercial sheep-grazing has developed ? Explain why the woollen industry has not developed in the three southern continents that are principal producers of wool.

[C. U, Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উঃ—'মেষপালনের ভৌগোলিক অবস্থা' (১৩৭ পৃঃ) এবং 'শ্রমশিল্প' অধ্যায়ের 'পশমবয়ন-শিল্প' হইতে লিখ।

6. Discuss the factors responsible for the concentration of wool and silk production in certain regions of the world. Explain why a few countries predominate in their exports.

[B. U. Three-Year Degree Course. B. Com,. 1963]

উঃ—'মেষপালনের ভৌগোলিক অবস্থা' (১৩৭ পৃঃ), 'পশম-উৎপাদনকারী অঞ্চল' (১৩৮ পৃঃ—১৩৯ পৃঃ), 'বাণিজ্য' (১৩৯পৃঃ—১৪০ পৃঃ) এবং 'কৃষিকার্য' অধ্যায়ের 'রেশম' হইতে 'চাষীর উপযোগী অবস্থা', ('আমদানি রপ্তানি-বাণিজ্য' লিখ। শুধুমাত্র ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চল ভিন্ন তুঁতগাছের চাষ সম্ভবপর নয় এবং প্রচুর সুলভ শ্রমিক রেশম উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন। সেইজন্যই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুলভ-শ্রমিক অঞ্চলে ইহার উৎপাদন বেশী এবং রপ্তানি-বাণিজ্যে এই সকল দেশ প্রভাব বিস্তার করে।

নবম অধ্যায়

খনিজ সম্পদ

(Minerals)

সাগর, মহাসাগর ও অরণ্যের ন্যায় খনিজ সম্পদও প্রকৃতির দান। বর্তমান পৃথিবীতে উৎপাদনকার্য পরিচালিত হয় প্রধানতঃ যন্ত্রের সাহায্যে এবং যন্ত্র চালিত হয় শক্তির দ্বারা। এই শক্তির বৃহদংশ পাওয়া যায় কয়লা, খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ন্যায় খনিজ পদার্থ হইতে। পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতিও খনিজ পদার্থ।

যে যন্ত্রের সাহায্যে কলকারখানা চলিতেছে তাহা লৌহ বা ঐরূপ কোন ধাতুর দ্বারা নির্মিত। কারখানার বাড়ী তৈয়ারীর জন্য এবং রেল-লাইন, রেল-ইঞ্জিন, রেলের কামরা ও মালগাড়ী, মোটর-গাড়ী, জাহাজ, স্টীমার, বিমানপোত প্রভৃতি বিভিন্ন যানবাহন-নির্মাণের জন্য লৌহ, তাম্র, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ অবশ্য প্রয়োজনীয়। এইগুলি চালনার জন্যও কয়লা ও খনিজ তৈল দরকার। এককথায় খনিজ পদার্থ ছাড়া কৃষি, শিল্প, যাতায়াত-ব্যবস্থা বা অন্য যে-কোন কার্যে শক্তি-চালিত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নয়। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা খনিজ সম্পদের উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং এই ভিত্তির প্রধান দুইটি স্তম্ভ হইল লৌহ ও কয়লা।

শিল্প-বিপ্লবের পর হইতে আজপর্যন্ত অভূতপূর্ব পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের খনিজ পদার্থ পৃথিবীতে উত্তোলিত হইয়াছে। খনিজ পদার্থ প্রধানতঃ প্রয়োজন শিল্পে ও যাতায়াত-ব্যবস্থায়। ফলে শিল্পের তেজা-মন্দার সঙ্গে সঙ্গে খনিজ পদার্থের উৎপাদনেও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যায় পৃথিবীতে খনিজ সম্পদের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে।

খনিজ পদার্থ **সঞ্চিত সম্পদ**; অর্থাৎ পৃথিবীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ খনিজ সম্পদ সঞ্চিত রহিয়াছে। মানুষ ইচ্ছামতো ঐ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে না। তাই যতই বিভিন্ন খনিজ পদার্থ উত্তোলন ও ব্যবহার করা হইতেছে ততই উহার পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। এইভাবে

এমন একদিন আসিবে যখন ব্যবহারোপযোগী খনিজ পদার্থ পৃথিবীতে আর পাওয়া যাইবে না।

স্বভাবতঃই প্রথমে সহজলভ্য ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খনিজ পদার্থ উৎপাদন করা হয়। ইহা নিঃশেষ হইলে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর ও আয়াসলভ্য খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে উৎপাদন-খরচও ক্রমে বৃদ্ধি পায়। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি (Law of Diminishing Returns) খনিজ পদার্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অবশ্য খনিজ পদার্থের নূতন সঞ্চয় আবিষ্কারের দ্বারা বা খনি হইতে উত্তোলনের নূতন পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়া **উৎপাদন-খরচ**-বৃদ্ধি সাময়িকভাবে ঠেকাইয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু শেষপর্যন্ত উহা দেখা দিবেই।

খনিজ পদার্থের **বণ্টন** পৃথিবীর সর্বত্র সমান নহে; কোন দেশে কোন খনিজ পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে। অন্য কতকগুলি দেশে ঐ পদার্থ হয়তো মোটেই নাই বা অল্প আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বৃটেন, জার্মানী ও ভারতে প্রচুর পরিমাণে কয়লা রহিয়াছে। কিন্তু ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড ও সুইডেনে কয়লা পাওয়া যায় না বলিলেই হয়।

কোন দেশে খনিজ পদার্থের উত্তোলন সেই দেশে উহার অস্তিত্বের উপরই শুধু নির্ভর করে না। খনিজ সম্পদের **আবিষ্কার** ও উৎপাদন মানুষের দ্বারা মানুষের প্রয়োজনে হইয়া থাকে। সুতরাং কোন দেশে খনিজ শিল্পের উন্নতি সেই দেশের অধিবাসিবৃন্দের শিক্ষা, কারিগরী জ্ঞানের উন্নতি, পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ও উদ্যোগের উপর নির্ভর করে। অনুমান করা হয়, আফ্রিকা মহাদেশে প্রচুর পরিমাণ খনিজ সম্পদ সঞ্চিত আছে। কিন্তু আজপর্যন্ত ইহার উৎপাদন খুব সামান্যই হইয়াছে। যেটুকু হইয়াছে তাহাও ইউরোপের অধিবাসিবৃন্দের উদ্যোগে। এইভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ খনিজ সম্পদের উৎপাদন অল্প কয়েকটি জাতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ১৯৩৯ সালে পৃথিবীতে মোট যত মূল্যের খনিজ পদার্থ উৎপাদিত হইয়াছিল তাহার শতকরা ২৯ ভাগ আসিয়াছিল বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে, শতকরা প্রায় ৩৪ ভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে, ১০ ভাগ রাশিয়া হইতে এবং ৭ ভাগেরও বেশী জার্মানী হইতে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে খনিজ পদার্থ প্রধানতঃ নিয়োজিত হয় শিল্প ও যাতায়াত-ব্যবস্থায়। সেইজন্য পৃথিবীর উৎপাদিত খনিজ সম্পদের অধিকাংশ

শিল্পোন্নত দেশগুলি ভোগ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী-কালের একটি হিসাবে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স, ইটালি ও বেলজিয়াম এই আটটি দেশ পৃথিবীর মোট উৎপাদিত খনিজ সম্পদের শতকরা ৮৫ ভাগ ভোগ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে রাশিয়া ব্যতীত আর সকলেই প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদের জন্য ক্রমেই অধিক পরিমাণে বিদেশের উপর নির্ভর করিতেছে।

পৃথিবীর কোন দেশই প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম খনিজ সম্পদে **স্বাবলম্বী নহে**। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধিশালী দেশও ক্রোমাইট, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, টিন, টাংস্টেন, পটাশ, অ্যান্টিমনি প্রভৃতি খনিজ পদার্থের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল। ৭০ হইতে ৮০ রকমের খনিজ পদার্থ আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে খনিজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও ইহা গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান, দেশরক্ষা ও সামরিক শক্তি বহুল পরিমাণে খনিজ সম্পদের উপর নির্ভর করে। তাই খনিজ সম্পদের উপর কর্তৃত্বের প্রতিযোগিতা ও খনিজ সম্পদ সরবরাহে নিশ্চয়তা বিধানের প্রচেষ্টা বহু আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংঘাত ও জটিলতার অন্যতম কারণ। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি ও বর্তমানে কঙ্গোর রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে।

খনিজ সম্পদের মোহ মানুষ কখনই ত্যাগ করিতে পারে না। ইউরোপের সভ্যমানুষ অস্ট্রেলিয়া যাইতে ঘৃণাবোধ করিত। কিন্তু যখনই সেখানে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইল, সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি হইতে দলে দলে মানুষ অস্ট্রেলিয়ায় ছুটিয়া চলিল। তাহারা স্থানীয় সরকার গঠন করিয়া স্বর্ণ আহরণ করিতে শুরু করিল এবং 'শ্বেত অস্ট্রেলিয়া নীতি' (White Australia Policy) অনুসারে ঐ দেশে এশিয়ার কৃষ্ণকায় লোকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিল। আলাস্কার তুষারাবৃত অঞ্চলে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইবার পরেই সেখানে দলে দলে লোক আসিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণখনি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি হইতে লোকজন যাইয়া সেখানে বসতি স্থাপন করিয়া সম্পদ আহরণ করিতে শুরু করে। মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনি-সমূহের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের কর্তৃত্ব সুবিদিত। সুতরাং দেখা

যাইতেছে যে, উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির উন্নতির মূলে রহিয়াছে তাহাদের নিজেদের এবং পরদেশের খনিজ সম্পদ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে প্রথমে বৃটেনে এবং ক্রমশঃ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে ও উত্তর আমেরিকায় কৃষি, শিল্প ও পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ক্রমবর্ধমান হারে প্রচুর পরিমাণে খনিজ সম্পদ ব্যবহৃত হইতেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ক্রমেই অধিক পরিমাণে খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহার করা হইতেছে। পৃথিবীতে খনিজ সম্পদের পরিমাণ নির্দিষ্ট। অথচ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য উহা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এইজন্য খনিজ সম্পদের উপযুক্ত উন্নয়ন ও সংরক্ষণে পৃথিবীর সকল দেশের সমবেতভাবে তৎপর হওয়া উচিত।

খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে শিলার গঠনের ও ব্যবহারের উপর। কোন কোন খনিজ দ্রব্য প্রাণী বা উদ্ভিজ্জ হইতে উদ্ভূত হয়। যেমন, গাছপালা বহুদিন মাটির নীচে থাকিলে কয়লায় পরিণত হয় এবং প্রাণীর হাড় ভূগর্ভে থাকিলে খড়িজাতীয় খনিজে পরিণত হয়। এইভাবে দেখা যাইবে যে, ভূগর্ভে বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। এইগুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়—**ধাতব খনিজ, অ-ধাতব খনিজ ও খনিজ জ্বালানি**। এই তিনপ্রকার খনিজ দ্রব্যকে আবার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১৪৭ পৃষ্ঠার বিভাগ দ্রষ্টব্য)।

প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবহারে নিযুক্ত খনিজ পদার্থসমূহ (Minerals of Direct Economic Use)—কয়েকটি খনিজ পদার্থ শিলা-দেহের অংশ হিসাবে ভূ-প্রকৃতি-নির্ধারণে, ভূমিক্ষয়-নিবারণে ও মৃত্তিকার গুণাগুণ-নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। আবার কোন কোন খনিজ পদার্থ শিলাদেহ ও ভূ-প্রকৃতি-গঠনে অংশগ্রহণ করিলেও মানুষের নিকট তাহাদের গুরুত্বের প্রধান কারণ হইল বিভিন্ন শিল্পকার্যে তাহাদের ব্যবহার। শেষোক্ত খনিজ পদার্থগুলি খনি হইতে উত্তোলন করিয়া বিশেষ কোন পরিবর্তন না করিয়াই শিল্পকার্যে ব্যবহার করা হয়। এই সকল খনিজ পদার্থের মধ্যে প্রধান হইল লবণ, গন্ধক, নাইট্রেট, ফস্ফেট ও পটাশ। ১৪৮ পৃষ্ঠায় ইহাদের সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইল :

খনিজ সম্পদ (Minerals)

- **ধাতব খনিজ (Metallic minerals)**
  - লৌহবর্গীয় ধাতব খনিজ (Ferrous Metals)
    লৌহ।
  - লৌহসঙ্কর-ধাতব খনিজ (Ferro-alloy Metals)
    ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, ক্রোমিয়াম, মলিবডেনাম, ভ্যানাডিয়াম, টাংস্টেন প্রভৃতি।
  - অ-লৌহবর্গীয় ধাতব খনিজ (Non-Ferrous Metals)
    তাম্র, টিন, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, সীসা প্রভৃতি এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম প্রভৃতি মূল্যবান্ খনিজ।
- **খনিজ জ্বালানি (Fuels)**
  কয়লা, খনিজ তৈল, গ্যাস, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি।
- **অ-ধাতব খনিজ (Non-Metallic minerals)**
  - গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত খনিজ (Structural Minerals)
    চুনাপাথর, মার্বেল প্রভৃতি।
  - রসায়ন-শিল্পে ব্যবহৃত খনিজ (Minerals used Chemically)
    লবণ, সাল্‌ফার, পটাশ, ডোলোমাইট প্রভৃতি।
  - অন্যান্য অ-ধাতব খনিজ (Other non-metallic Minerals)
    অভ্র, গ্রাফাইট প্রভৃতি।

লবণ (Salt)

অল্পমাত্রায় লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। কিন্তু অধিক পরিমাণে লবণ পাওয়া যায় সমুদ্রজল ও লবণহ্রদগুলি হইতে এবং ভূগর্ভে সঞ্চিত স্তরীভূত লবণ হইতে। খনিজ লবণ আমাদের দেশে সৈন্ধব (Rock salt) নামে পরিচিত। সমুদ্র ও লবণহ্রদের জল শুকাইয়া যথেষ্ট পরিমাণে লবণ উৎপাদন করা হইলেও সর্বাধিক পরিমাণে বাণিজ্যিক লবণ সংগ্রহ করা হয় খনি হইতে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic importance)—মানুষের জীবন-ধারণের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকায় বায়ু ও জলের পরেই লবণের স্থান। রাসায়নিক শিল্পে একটি অপরিহার্য কাঁচামাল হিসাবে প্রচুর পরিমাণ লবণ ব্যবহৃত হয়। ইদানীং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত লবণের শতকরা ৬০ হইতে ৬৫ ভাগই রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হইতেছে। কস্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ, ব্লিচিং পাউডার, তরল ক্লোরিণ, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি উৎপাদনে লবণ ব্যবহার করা হয়। এই সকল রাসায়নিক দ্রব্য বস্ত্র, রেয়ন, সেলুলোজ, কাগজ, সাবান, ঔষধ, রবার, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি শিল্পে ব্যবহার করা হয়। পশুর খাদ্য হিসাবেও লবণ ব্যবহৃত হয়। মৎস্য ও মাংস-সংরক্ষণে, চর্মশিল্পে, জল-পরিশোধনে ও আরও বহু কার্যে লবণ প্রয়োজন হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing areas)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা অধিক লবণ পাওয়া যায়। এই দেশের মিচিগান, নিউ ইয়র্ক, ওহিও, লুইসিয়ানা, টেক্সাস্ ও ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যে বেশীর ভাগ লবণ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া রাশিয়া, বৃটেন, ভারত, চীন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি, পোল্যাণ্ড, কানাডা, স্পেন ও জাপানে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপাদিত হয়।

পৃথিবীর গড় বাৎসরিক লবণের উৎপাদন প্রায় ৫ কোটি মেট্রিক টন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩২·৬%, রাশিয়া ১০·৮%, বৃটেন ৮·২%, চীন ৬·১%, ভারত ৫·৩%, পশ্চিম জার্মানী ৫·৩% ও ফ্রান্স ৪·৭% লবণ উৎপাদন করিয়া থাকে। অধিকাংশ দেশের লবণ স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় বলিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লবণের স্থান নগণ্য।

গন্ধক (Sulphur)

শিল্পের প্রয়োজনে যে গন্ধক ব্যবহার করা হয় তাহা হয় বিশুদ্ধ অবস্থায় (Native sulphur) পাওয়া যায়, অথবা লৌহের ন্যায় কোন ধাতুর সহিত যৌগিক অবস্থায় পাওয়া যায়। শেষোক্ত শ্রেণীর গন্ধককে সাধারণভাবে পাইরাইট (Pyrite) বলা হয়। বহুক্ষেত্রে প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় যে গন্ধক পাওয়া যায় তাহা পাইরাইট অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যোপযোগী। অবশ্য লৌহ, তাম্র, দস্তা প্রভৃতির ধাতুর সহিত যৌগিক অবস্থায় যে গন্ধক পাওয়া যায় তাহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ গন্ধক নিষ্কাশন করা হইয়া থাকে। বাণিজ্যিক হারে উৎপাদনের উপযোগী বিশুদ্ধ অবস্থায় গন্ধক পৃথিবীতে অল্প কয়েকটি অঞ্চলেই মাত্র পাওয়া যায়। যে সকল দেশে পাইরাইট হইতে তাম্র, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর নিষ্কাশন-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার অধিকাংশ দেশেই ইহার সহিত গন্ধক উৎপাদনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

শিল্পগত গুরুত্ব (Industrial importance)—গন্ধকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড-উৎপাদনে। সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল। শর্করা-শিল্পে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক ব্যবহার করা হয়। বিস্ফোরক-উৎপাদনেও ইহা ব্যবহৃত হয়। রবার-শিল্পে, দিয়াশলাই-শিল্পে, কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ-উৎপাদনে, ঔষধ ও কীটনাশক দ্রব্য-প্রস্তুতে, সার-উৎপাদনে এবং রং, তৈল ও বার্নিশ উৎপাদনে গন্ধক ব্যবহার করা হয়। ইহা ছাড়া নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনের জন্যও ইহার প্রয়োজন হয়। মোট কথা, প্রায় প্রত্যেক শিল্পেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে গন্ধকের ব্যবহার রহিয়াছে। লৌহ ও কয়লার ন্যায় গন্ধক আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার অন্যতম স্তম্ভ।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing areas)—বিশুদ্ধ গন্ধক (Native sulphur)-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান প্রথম। গড়ে প্রতিবৎসর ৫০ লক্ষ মেঃ টনের অধিক বিশুদ্ধ গন্ধক এই দেশে উৎপাদিত হয় এবং ইহার শতকরা ৯৮ ভাগ উৎপাদিত হয় টেক্সাস্ ও লুইসিয়ানা রাজ্যের মেক্সিকো উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে। ইটালি, জাপান, মেক্সিকো এবং চিলিও গুরুত্বপূর্ণ গন্ধক-উৎপাদনকারী দেশ। রাশিয়ায় বর্তমানে প্রচুর গন্ধক উৎপন্ন হয়।

গন্ধকের উৎপাদন (১৯৫৯-৬০)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩২ লক্ষ মেঃ টন	জাপান	২'২ লক্ষ মেঃ টন
ইটালি	৩৩ " "	মোট	৬৮ লক্ষ মেঃ টন

গন্ধকের উৎপাদন অল্প কয়েকটি দেশে সীমাবদ্ধ হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইহা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গন্ধকের শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারক। এই দেশের মোট উৎপন্ন গন্ধকের শতকরা ২৫ ভাগ কানাডা, বৃটেন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন খনিজ সার

(Commercial Mineral Fertilizers)

গত দুইশত বৎসরে পৃথিবীতে কৃষির অভাবনীয় উন্নতি ঘটিয়াছে ; বৃটেনে হেক্টর-প্রতি গমের ফলন তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে : ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, নরওয়ে ও সুইডেনের দক্ষিণাংশ এবং জার্মানী হেক্টর-প্রতি উৎপাদন-বৃদ্ধিতে বৃটেনকে অনুসরণ করিয়াছে। একদিন মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি ক্রমাগত হ্রাস পাইয়া সমগ্র পৃথিবী বন্ধ্যা হইয়া যাইবে বলিয়া মানুষের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। আজ মৃত্তিকার উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা, বরং উহা অভাবনীয় হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই উন্নতির বহু কারণ রহিয়াছে। উন্নত কর্ষণ-পদ্ধতি, নূতন ফসলের চাষ, উন্নত বীজ, শস্যাবর্তন, যন্ত্রপাতির প্রয়োগ প্রভৃতি বহু উপাদান কৃষির এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে। কিন্তু কৃষির উন্নতির জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্বের অধিকারী হইল খনিজ সারের ব্যবহার।

কৃষিক্ষেত্রের খনিজ সারের হেক্টর-প্রতি সর্বাধিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, জার্মানী, বৃটেনের পূর্বাংশ, নরওয়ে ও সুইডেনের দক্ষিণাংশ এবং ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বাংশে। "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সার-উৎপাদনশিল্প অন্যতম বৃহৎ শিল্প। সার-উৎপাদন ও ব্যবহার উত্তরে মেইন হইতে দক্ষিণে ফ্লোরিডা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বার্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইদানীং অবশ্য প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী রাজ্যসমূহে এবং মিসৌরী উপত্যকার প্রেইরী অঞ্চলেও খনিজ সারের প্রচলন বিস্তার লাভ করিতেছে। ভারতে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর হইতে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের

উৎপাদন-বৃদ্ধির তাগিদে খনিজ সারের প্রয়োগ শুরু হইয়াছে এবং দেশের বিভিন্ন অংশে সার উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপিত হইতেছে।

কৃষিকার্যে যে সকল খনিজ সার ব্যবহার করা হয় তাহাদের প্রধান তিনটি উপাদান হইল নাইট্রোজেন-ঘটিত লবণ বা নাইট্রেট্‌স্ (Nitrates), ফস্‌ফরাস-ঘটিত লবণ বা ফস্‌ফেটস (Phosphates) এবং পটাশ (Potash)।

নাইট্রোজেন-ঘটিত লবণ বা নাইট্রেট (Nitrate)—সার প্রস্তুতের জন্য যে সকল পদার্থের প্রয়োজন হয় নাইট্রোজেন তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্। অধিকাংশ নাইট্রোজেন সার প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইলেও, ইহা বিস্ফোরক দ্রব্য, রং ও ঔষধপত্র ইত্যাদি প্রস্তুতেও ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন উৎস হইতে নাইট্রোজেন পাওয়া সম্ভব হইলেও বাণিজ্যিক হারে সার উৎপাদনের জন্য যে নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয় তাহা হয় বায়ুমণ্ডল হইতে অথবা খনিজ নাইট্রেট হইতে সংগ্রহ করা হয়। ব্লাস্ট ফার্নেস্ ও কোক চুল্লীর উপজাত-দ্রব্য হইতেও নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা হয়। বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহের খরচ অধিক।

অল্প পরিমাণ নাইট্রেট ক্যালিফোর্ণিয়ার ডেথ্ ভ্যালি এবং অন্য কোন কোন মরুভূমিতে পাওয়া গেলেও বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে পৃথিবীতে চিলি নাইট্রেটের একমাত্র উৎস। আণ্ডিজ পর্বত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত উত্তর চিলির মরুভূমিতে ৭২০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৮০ কিলোমিটার প্রশস্ত অঞ্চল ব্যাপিয়া নাইট্রেট সঞ্চিত রহিয়াছে। ইহাই পৃথিবীর বৃহত্তম নাইট্রেট-খনি এবং এখানকার সঞ্চয়ের পরিমাণও সর্বাধিক। এই খনিজ নাইট্রেট উত্তর চিলির বৃষ্টিহীন মরু অঞ্চলকে শিল্পকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে। চিলি হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে নাইট্রেট রপ্তানি করা হয়। বর্তমানে শিল্পোন্নত দেশসমূহে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নাইট্রোজেনের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ায় চিলির নাইট্রেট-শিল্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

ফস্‌ফেট (Phosphate)—ফস্‌ফেট শিলা প্রধানতঃ চুনঘটিত ফস্‌ফেট (Phosphates of lime)। ইহার ফস্‌ফরাস ও চুন কৃষি-সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ফস্‌ফেট প্রধানতঃ সার হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে ইহা গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান ফস্‌ফেট-উৎপাদনকারী দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপাদনের শতকরা ৬৭ হইতে ৭৫ ভাগ ফ্লোরিডায় পাওয়া

যায়। ইহা ছাড়া টেনেসি, উটা, ইডাহো, মন্টানা এবং উইওমিং রাজ্যেও ফস্ফেট পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই উত্তর আফ্রিকার দেশগুলি, বিশেষ করিয়া মরক্কো ও টিউনিসিয়া প্রধান ফস্ফেট-উৎপাদনকারী অঞ্চল। মিশর ও আলজেরিয়াতেও ফস্ফেট পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত নরু (Nauru) ও সাগর দ্বীপ (Ocean island) এবং রাশিয়ায় ফস্ফেট পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর আফ্রিকার দেশগুলি এবং নরু ও সাগর দ্বীপ ফস্ফেট রপ্তানি করিয়া থাকে। আমদানি করে প্রধানতঃ পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ, জাপান ও কানাডা।

পটাশ (Potash)—লবণজাতীয় যে সকল পদার্থের মধ্যে পটাসিয়াম (Potassium) পাওয়া যায় তাহাদিগকে পটাশ বলে। কোথাও কোথাও পটাশ বিভিন্ন পাললিক শিলা হইতে সংগ্রহ করা হয়। আবার কোথাও কোথাও ইহা সমুদ্র বা হ্রদের জল হইতে সংগ্রহ করা হয়।

বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও ঔষধ প্রস্তুতে, রং, কাগজ প্রভৃতি উৎপাদনে পটাশ **ব্যবহার** করা হয়। অবশ্য ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয় কৃষি-সার হিসাবে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্মানীতে প্রথম সার হিসাবে পটাশের গুরুত্ব ও ব্যবহার আবিষ্কৃত হয়। ক্রমে ইহার ব্যবহার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কৃষিকার্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে জার্মানী দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় বর্তমানে **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** পটাশ-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যের সিয়ারলেস্ হ্রদ (Searles Lake) ও নিউ মেক্সিকো রাজ্যের কার্লস্‌ব্যাড্ খনি (Carlsbad field) প্রধান পটাশ-উৎপাদনকারী অঞ্চল। টেক্সাস, উইওমিং এবং উটা রাজ্যেও পটাশ পাওয়া যায়। **জার্মানীতে** হারজ (Harz) পর্বতের পার্শ্বদেশে পটাশের খনি রহিয়াছে। ইহা উত্তর-পশ্চিমে হ্যানোভারের নিম্নভূমি ও দক্ষিণ-পশ্চিমে থুরিঙ্গিনা পর্যন্ত ৬৫,০০০ বর্গ-কিলোমিটার স্থান জুড়িয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। **ফ্রান্সে** রাইন উপত্যকার উত্তরাংশে মুলহাউসের নিকটে ১৭৫ বর্গ-কিলোমিটার স্থান জুড়িয়া পটাশ পাওয়া যায়। জার্মানী ও ফ্রান্স হইতে পটাশ বৃটেন, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে রপ্তানি করা হয়। রাশিয়া এবং স্পেনেও প্রভূত পরিমাণ পটাশ রহিয়াছে।

লৌহ আকরিক
(Iron-ore)

শিল্পগত গুরুত্ব (Industrial importance)—লৌহ আকরিক হইতে লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। আধুনিক শিল্প-অর্থনীতি প্রধানতঃ স্থানগত বিশেষীকরণ ও আন্তর্জাতিক বিনিময় ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু স্থানগত বিশেষীকরণ ও বিনিময় উন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা ব্যতীত কখনই সম্ভব নহে। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন কোটি কোটি টন লৌহ ও ইস্পাত যাহার সাহায্যে রেল-লাইন, সেতু, রেলের ইঞ্জিন, চাকা ও কামরা, রেলস্টেশন, জাহাজ, মোটর-গাড়ী, মোটর-বাস্, মোটর-ট্রাক, টেলিগ্রাফের থাম ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়।

আধুনিক সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক। শহরের অসংখ্য বাসগৃহ, অফিসগৃহ ও কারখানার কাঠামো ইস্পাত-নির্মিত। কারখানায় ব্যবহৃত ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি ইস্পাত-নির্মিত, অফিস ও গৃহে ব্যবহৃত সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র, পাখা, হিমায়ন যন্ত্র প্রভৃতি বহুলাংশে ইস্পাতের তৈয়ারী।

কৃষিকার্যও ক্রমেই বেশী করিয়া লৌহ ও ইস্পাতের উপর নির্ভরশীল হইতেছে। জমি তৈয়ারা, বীজবপন, ফসল-কাটা, ঝাড়াই ও ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য ইস্পাতের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইতেছে। কৃষিজ দ্রব্য ক্ষেত হইতে বাজারে, একদেশ হইতে অন্যদেশে প্রেরণের জন্য লৌহ-নির্মিত যানবাহনই ব্যবহার করা হয়। কৌটাভর্তি খাদ্যের রেওয়াজ দিন দিনই বাড়িতেছে। রাং-এর প্রলেপ-লাগানো লৌহের পাতের দ্বারা এই সকল কৌটা নির্মিত হয়। সর্বত্রই আমরা কোন-না-কোন ভাবে লৌহ দেখিতে পাই। এত ব্যাপকভাবে আর কোন জিনিস মানুষ ব্যবহার করে না।

একথা অনস্বীকার্য যে, অসংখ্য জিনিসের সমবায়ে ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর আধুনিক জটিল যন্ত্রসভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। কার্বন্ ছাড়া লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন সম্ভব নয়। বিভিন্ন শ্রেণীর ইস্পাত উৎপাদনের জন্য নিকেল, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ধাতু ইস্পাতের সহিত মিশাইতে হইবে। কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও বিদ্যুতের ন্যায় শক্তি ব্যতীত ইস্পাতের কোন মূল্যই নাই। আবার লৌহ ব্যতীত কি করিয়া কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ সম্ভব? তবুও আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় অসংখ্য উপাদানের মধ্যে অন্ততঃ পরিমাণ ও ব্যবহারে ব্যাপকতার

দিক দিয়া লৌহ অনন্য। পৃথিবীতে লৌহ ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রকারের ধাতু মোট যে পরিমাণ ব্যবহৃত হয় এক কাঁচা লৌহের (Pig iron) ব্যবহার তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী—প্রায় ৭ গুণ।

লৌহের এই গুরুত্বের কারণ ইহার কয়েকটি **বিশেষ গুণ** যাহা আর কোন ধাতুতে সম-পরিমাণে নাই। অন্য যে-কোন ধাতুর তুলনায় ইস্পাতের **স্থিতিস্থাপকতা অধিক**। তাহার ফলে ইহা অনেক বেশী চাপ সহ্য করিতে পারে। যন্ত্রপাতি, বাড়ী, সেতু প্রভৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে এই গুণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লৌহের দ্বিতীয় গুণ ইহার **কাঠিন্য**। তৃতীয়তঃ, ইহা **নমনীয়**। চতুর্থতঃ, লৌহ অপেক্ষাকৃত সহজে অন্য ধাতুর সহিত মিশাইয়া বিভিন্ন গুণের **মিশ্রধাতু** প্রস্তুত করা যায়। ইহার ফলে অনেক বেশী কাজে ইস্পাতের প্রয়োগ সম্ভব হইয়াছে এবং নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু লৌহের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ অন্য ধাতুর তুলনায় ইহার **উৎপাদন-খরচ খুব সামান্য**।

লৌহ আকরিকের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Iron-ore) —পৃথিবীতে লৌহ আকরিক ব্যাপকভাবে সঞ্চিত রহিয়াছে। কিন্তু কোনস্থানে ইহা লাভজনকভাবে উত্তোলন করা সম্ভব কিনা তাহা নির্ভর করে কি পরিমাণ লৌহ আকরিক একস্থানে রহিয়াছে, ইহার রাসায়নিক গঠন কিরূপ, ইহাতে খাঁটি লৌহের অংশ কত এবং অন্যান্য অবস্থার উপর। হেমাটাইট, ম্যাগ্‌নেটাইট, লিমোনাইট ও সিডেরাইট এই চার প্রকারের লৌহ আকরিকই প্রধান। **হেমাটাইট** (Hematite, Fe_2O_3) আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ পুঁথিগতভাবে শতকরা ৭০ ভাগ; ইহার রং লাল। সকল প্রকার লৌহ আকরিকের মধ্যে হেমাটাইট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহা ব্যাপকভাবে পাওয়া যায় এবং ইহা হইতে ধাতব লৌহ নিষ্কাশন করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। **ম্যাগ্‌নেটাইটের** (Magnetite, Fe_3O_4) রং কালো এবং ইহাতে খাঁটি লৌহের পরিমাণ পুঁথিগতভাবে শতকরা ৭২'৪ ভাগ। বিশুদ্ধ **লিমোনাইট** (Limonite, $2Fe_2O_3 \, 3H_2O$) ও **সিডেরাইট** (Siderite, $FeCO_3$) আকরিকে ঐরূপ ধাতব লৌহের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৫৯'৮ ও ৪৮ ভাগ। লিমোনাইটের রং হলুদ অথবা বাদামী এবং সিডেরাইট ধূসরবর্ণের হয়। খনি হইতে যে লৌহ আকরিক উত্তোলন করা হয় তাহাতে যৌগিক লৌহ (Iron Compound) ছাড়াও অন্যান্য ধাতব ও অধাতব পদার্থ মিশিয়া থাকে। এই সকল বিজাতীয় পদার্থের (Impurities)

মধ্যে অ্যালুমিনা, ম্যাগ্‌নেসিয়া, সিলিকা, চুন, গন্ধক, তাম্র, টাইটেনিয়াম, আর্সেনিক এবং ফস্‌ফরাস থাকিতে পারে। সাধারণতঃ সিলিকার পরিমাণই সবচেয়ে বেশী থাকে। টাইটেনিয়াম, আর্সেনিক, তামা ও ফস্‌ফরাস লৌহকে দুর্বল করিয়া ফেলে। সেইজন্য ইহাদের অস্তিত্বের ফলে লৌহ আকরিকের গুণের হানি ঘটে। যে সকল লৌহ আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগেরও কম, বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া তাহা ব্যবহার করা হয় না। লৌহ আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগের কম থাকিলেই সাধারণতঃ ব্লাস্ট ফার্নেসে ব্যবহারের পূর্বে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাহাতে ধাতব লৌহের ভাগ বাড়াইয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing areas)—পৃথিবীর **সঞ্চিত লৌহ-ভাণ্ডারের** (Iron ore reserves) এ পর্যন্ত যে সকল হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য একটি হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর মোট সঞ্চিত লৌহভাণ্ডারের পরিমাণ ৬,৯৮১ কোটি টন।

পৃথিবীর সঞ্চিত লৌহভাণ্ডার (কোটি টন)

চীন	১,২০০	ভারত	৩২২
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১,০৪৫	কিউবা	৩১৫
ফ্রান্স	৮১৭	সুইডেন	২২০
ব্রেজিল	৭০০	রাশিয়া	২০৭*
বৃটেন	৫৯৭	জার্মানী	১৩২
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড	৪০০	লুক্সেমবার্গ	২৭

সঞ্চিত লৌহভাণ্ডারের পরিমাণের উপর প্রকৃত উত্তোলন সবসময় নির্ভর করে না। বহুদেশে সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ বেশী হইলেও উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নাও হইতে পারে ; যেমন, ব্রেজিল, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ইত্যাদি। বর্তমানে শিল্পোন্নত দেশসমূহে লৌহ আকরিক উৎপাদনের পরিমাণ বেশী।

* রাশিয়া দাবি করে যে, পৃথিবীর শতকরা ৪১ ভাগ সঞ্চিত লৌহভাণ্ডার সেই দেশে বিদ্যমান।

পৃথিবীর লৌহ আকরিক-উৎপাদন—৪৯'৭ কোটি মেঃ টন
(১৯৬৪)

রাশিয়া	১৪'৬০ কোটি মেঃ টন	সুইডেন	২'৬৯ কোটি মেঃ টন
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৮'২৬ „	বৃটেন	১'৬৫ „
ফ্রান্স	৬'০৯ „	ভারত	১'৪৯ „
চীন	৩'১০ „	ভেনেজুয়েলা	১'৫৭ „
কানাডা	৩'৬২ „	ব্রেজিল	১'০৭ „

Source—U. N. O. Monthly Bulletin, April, 1965 (চীন বাদে)।

রাশিয়া (U. S. S. R.)—বর্তমানে লৌহ আকরিক-উৎপাদনে রাশিয়া পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এদেশে সঞ্চিত লৌহভাণ্ডারের পরিমাণও যথেষ্ট। এই দেশের লৌহ আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ গড়ে শতকরা ৪৫ হইতে ৫৮ ভাগ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এই দেশের মোট লৌহ আকরিক উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ পাওয়া যাইত ইউরোপীয় রাশিয়ার দক্ষিণাংশে অবস্থিত **ক্রিভয় রগ** হইতে। কার্চ উপদ্বীপেও লৌহ পাওয়া যায়। ডোনেৎস্ পর্যঙ্কের কয়লাখনি ইহার নিকটেই অবস্থিত। এই কয়লা ও লৌহের সাহায্যে উভয় অঞ্চলেই লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইউরাল অঞ্চলের ম্যাগ্‌নেট পর্বত গুরুত্বপূর্ণ লৌহ আকরিক উৎপাদনকারী অঞ্চল। এখান হইতে ম্যাগ্‌নিটোগর্স্কের ইস্পাতশিল্পে লৌহ আকরিক সরবরাহ করা হয়। দক্ষিণ ইউরালের ওর্স্ক, মধ্য রাশিয়ার কুর্স্ক, উত্তর রাশিয়ার মুর্মান্স্ক ও সাইবেরিয়ার কুজবাজ অঞ্চলেও প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.)—কিছুদিন পূর্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লৌহ আকরিক-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিত; কিন্তু বর্তমানে এই দেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। যুক্তরাষ্ট্রের বহু অঞ্চলে লৌহ আকরিক উৎপাদিত হইলেও এই দেশের মোট বাৎসরিক উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী মাত্র দুইটি অঞ্চল হইতে পাওয়া যায়: (ক) হ্রদ অঞ্চল ও (খ) আলাবামা অঞ্চল।

(ক) হ্রদ অঞ্চল (The Lake Region)—সুপিরিয়র হ্রদের পশ্চিমে তিনটি (ভারমিলিয়ন, মেসাবি ও কুইনা) ও দক্ষিণে তিনটি (মারকোয়েট, গোজেবিক ও মেনোমিনি) মোট এই ছয়টি লৌহ পাহাড় (Iron range)

হইতে লৌহ আকরিক উত্তোলিত হয়। অবশ্য এই ছয়টি অঞ্চলের মধ্যে মেসাবি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র এই অঞ্চল হইতেই যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। ইহা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লৌহখনি অঞ্চল। এখানে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া ৬০ মিটারের কিছু কম পুরু লৌহস্তর রহিয়াছে এবং এই স্তর ভূমির উপরিভাগের খুব নিকটেই অবস্থিত। এখানকার লৌহ আকরিক উচ্চশ্রেণীর হেমাটাইট-জাতীয়, এবং খাঁটি লৌহের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ; ফস্‌ফরাসের অংশ শতকরা এক ভাগেরও কম এবং অন্যান্য বিজাতীয় পদার্থের পরিমাণও সামান্য। এখান হইতে বিশেষ ধরনের নির্মিত বজরায় করিয়া লক্ষ লক্ষ টন লৌহ আকরিক হ্রদের উপর দিয়া মিচিগান ও ইরি হ্রদের তীরে অবস্থিত এবং অভ্যন্তরভাগের লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলিতে পাঠানো হয়। মেসাবি অঞ্চলের সবচেয়ে বড় অসুবিধা এখানে শীতের সময় চার-পাঁচ মাস খনির কাজ বন্ধ থাকে। শীতের সময় তীব্র শীত পড়ে এবং খনির মধ্যে তুষারপাত হয়। ইহা ছাড়া হ্রদের জল জমিয়া বরফ হইয়া যায় বলিয়া জলপথে যাতায়াতও অসম্ভব। ফলে মেসাবি অঞ্চলের লৌহ-ব্যবহারকারী কারখানাগুলিকে শীতের কয়েক মাস কাজ অব্যাহত রাখিবার জন্য লৌহ আকরিক মজুত করিয়া রাখিতে হয়। মেসাবি ব্যতীত সুপিরিয়র হ্রদের তীরবর্তী অন্য পাঁচটি অঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তমানে সুড়ঙ্গ করিয়া মাটির গভীর তলদেশ হইতে লৌহ উত্তোলন করিতে হয়। ফলে উত্তোলন-খরচ অপেক্ষাকৃত বেশী। শীতের সময় খনির কাজ চালানো সম্ভব হইলেও হ্রদের জল জমিয়া থাকার ফলে খুব সামান্য পরিমাণ লৌহ আকরিক শিল্পাঞ্চলে পাঠানো সম্ভব। এই পাঁচটি অঞ্চলের লৌহ আকরিক কঠিন কিংবা নরম হেমাটাইট এবং ম্যাগ্‌নেটাইট-জাতীয়।

(খ) **আলাবামা অঞ্চল (The Alabama Region)**—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ১০ ভাগ লৌহ আকরিক এখান হইতে পাওয়া যায়। এখানে দুইটি অঞ্চলে লৌহ উত্তোলন করা হয়: **(১) রেড মাউণ্টেন** ও **(২) বার্মিংহাম উপত্যকা**। আলাবামার শতকরা ৮৫ ভাগ লৌহ আকরিক রেড মাউণ্টেন হইতে পাওয়া যায়। এখানে ৫ হইতে ৭ মিটার পুরু প্রায় ৪০০ কিলোমিটার লম্বা লৌহস্তর রহিয়াছে। এখানকার লৌহ আকরিক হেমাটাইট-জাতীয়; ধাতব লৌহের পরিমাণ শতকরা ৩০ হইতে

৪০ ভাগ এবং বিজাতীয় পদার্থ (Impurities) প্রায় নাই বলিলেই চলে। এখানকার এক-চতুর্থাংশেরও বেশী লৌহ আকরিকে যথেষ্ট চুন থাকায় লৌহ নিষ্কাশনের জন্য চুনাপাথরের খরচ কম। বার্মিংহাম উপত্যকায় কাদা, বালি ও নুড়ির সহিত মিশ্রিত অবস্থায় নিম্নশ্রেণীর লিমোনাইট-জাতীয় লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এখানকার লৌহ আকরিক ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইহাতে ধাতব লৌহের পরিমাণ বাড়াইয়া রেড মাউন্টেন অঞ্চলের আকরিকের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা হয়।

হ্রদ অঞ্চল ও আলাবামা অঞ্চল ব্যতীত নিউ ইয়র্ক রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অ্যাডিরনড্যাক্ জেলায়, পেন্‌সিলভ্যানিয়া রাজ্যের পূর্বাংশে অবস্থিত কর্ণওয়াল জেলায়, নিউজার্সি রাজ্যের উত্তরাংশে এবং রকি পর্বত্য অঞ্চলের কোন কোন স্থানে কিছু পরিমাণ লৌহ আকরিক উৎপাদিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যতম প্রধান লৌহ আকরিক-উৎপাদনকারী দেশ হইলেও এখানে প্রতিবৎসর চিলি, ব্রেজিল, ভেনেজুয়েলা, সুইডেন, কানাডা, উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ আকরিক আমদানি করা হইয়া থাকে।

ফ্রান্স (France)—ইউরোপে রাশিয়ার পরেই ফ্রান্স প্রধান লৌহ আকরিক-উৎপাদনকারী দেশ। এই দেশের **লোরেন** অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা অধিক লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এই লৌহ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, ধাতব লৌহের পরিমাণ শতকরা ৩৫ হইতে ৪০ ভাগ। ইহাতে স্বাভাবিকভাবে প্রচুর চুন মিশানো থাকে বলিয়া লৌহ নিষ্কাশনের জন্য চুনাপাথরের খরচ কম। তবে ফস্‌ফরাসের ভাগ বেশী থাকে বলিয়া কারখানায় এই লৌহ আকরিকের সহিত আমদানিকৃত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। বহু রেলপথ এই অঞ্চলের উপর দিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া খাল ও নদীপথে সুলভে পরিবহণের সুবিধা রহিয়াছে। ফ্রান্সের নর্মাণ্ডি এবং পীরেনীজ পর্বতেও লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

চীন (China)—বর্তমানে এই দেশ লৌহ আকরিক উৎপাদনে পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। চীনের অনেক স্থানে লৌহ আকরিক পাওয়া গেলেও দুইটি অঞ্চলই প্রধান: (ক) ইয়াংসি নদীর নিম্ন-অববাহিকায় তায়ে (Tayeh) হইতে নানকিং এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অনেকগুলি হেমাটাইট ও ম্যাগ্‌নেটাইট জাতীয় লৌহখনি রহিয়াছে। ধাতব লৌহের পরিমাণ

শতকরা ৪০ হইতে ৫২ ভাগ। ১৫০ কিলোমিটারের মধ্যে কয়লাখনি থাকায় লৌহ-উত্তোলনে সুবিধা হইয়াছে। (খ) শানটুং উপদ্বীপের লৌহ আকরিক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, ধাতব লৌহের পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ। নিকটেই পোশনের কয়লাখনি অঞ্চল। মাঞ্চুরিয়ায় মুকদেনের দক্ষিণে লৌহখনি রহিয়াছে। এই খনি হইতে আনশানের ইস্পাতশিল্পে লৌহ প্রেরিত হয়।

সুইডেন (Sweden)—সুইডেনের লৌহখনিগুলি দেশের উত্তর ও মধ্য অংশে অবস্থিত। উত্তর সুইডেনের **কিরুণা** খনি অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে লৌহ আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে। এখানকার লৌহ আকরিক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হেমাটাইট ও ম্যাগ্‌নেটাইট জাতীয়; ধাতব লৌহের পরিমাণ গড়ে শতকরা ৬০ ভাগ; তবে ফস্‌ফরাসের ভাগ কিছু বেশী। লৌহস্তর ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি অবস্থিত। এখান হইতে লৌহ আকরিক রেলযোগে সামান্য পথ অতিক্রম করিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে নার্ভিক বন্দরে অথবা বোথ্‌নিয়া উপসাগরের তীরে লুলিয়া বন্দরে লইয়া আসা হয় এবং সেখান হইতে জলপথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতে পাঠানো হয়। মধ্য সুইডেনে কোপারবার্গ অঞ্চলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হেমাটাইট-জাতীয় লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। সুইডেনের ইস্পাতশিল্পে প্রয়োজনীয় অধিকাংশ লৌহ আকরিক এখান হইতে সংগ্রহ করা হয়। ইহা ছাড়া এখানকার লৌহ আকরিক প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হয়।

ভেনেজুয়েলা (Venezuela)—লৌহ আকরিক উৎপাদনে এই দেশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এখানকার অধিকাংশ লৌহখনি গায়না উচ্চভূমিতে অবস্থিত। কোক প্রস্তুতের উপযোগী কয়লা না থাকায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এই দেশে গড়িয়া উঠে নাই; ফলে আভ্যন্তরীণ চাহিদার অভাব থাকায় এই দেশের অধিকাংশ লৌহ আকরিক বিদেশে, প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হইয়া থাকে।

কানাডা (Canada)—কানাডায় নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, নোভাস্কোশিয়া, বৃটিশ কলম্বিয়া এবং সুপিরিয়র হ্রদের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল হইতে লৌহ আকরিক সংগ্রহ করা হয়। অবশ্য কানাডার সর্ববৃহৎ লৌহভাণ্ডার কুইবেক-লাব্রাডার অঞ্চলে অবস্থিত। ইদানীং বহু অর্থব্যয়ে যাতায়াতের উত্তম ব্যবস্থা করিয়া এখান হইতে লৌহ আকরিক সংগ্রহ করা হইতেছে।

বৃটেন (U. K.)—যদিও বৃটেনে বহুদিন হইতে লৌহ আকরিক

উত্তোলন করা হইতেছে এবং অনেক খনি ইতিমধ্যে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তবুও এখন পর্যন্ত বৃটেন পৃথিবীর মোট লৌহ আকরিক উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৪ ভাগ উৎপাদন করিয়া থাকে। খনিগুলি ছোট হইলেও লৌহস্তর ভূপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত। কোন কোন ক্ষেত্রে লৌহখনি ও কয়লাখনি পাশাপাশি অবস্থিত ; অনেক ক্ষেত্রে খনিগুলি সমুদ্রতীরে অবস্থিত। ফলে সহজে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিবার এবং লৌহ আকরিক ও অন্যান্য কাঁচামাল আমদানি এবং লৌহ ও ইস্পাত এবং ইস্পাতজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির খুব সুবিধা হইয়াছে। এখানকার লৌহ আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ গড়ে শতকরা ৩০ ভাগের কম এবং ইহাতে গন্ধক ও ফস্‌ফরাসের পরিমাণ বেশী। ফলে বিদেশ হইতে ফস্‌ফরাসের ভাগ খুব কম এমন লৌহ আকরিক আমদানি করিয়া ইহার সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। বৃটেনে উৎপাদিত লৌহ আকরিকের শতকরা ৮৫ ভাগ **মিড্‌ল্যাণ্ড** ও **ক্লিভল্যাণ্ড অঞ্চল** হইতে উত্তোলন করা হয়। এই দেশে ব্যবহৃত লৌহ আকরিকের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়।

পশ্চিম জার্মানীর সিজারল্যাণ্ড ভোজেলস্‌বার্গ ও পীন অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। **স্পেনের** অনেক জায়গায় লৌহ আকরিক পাওয়া গেলেও অধিকাংশ লৌহ আকরিক উত্তর স্পেনে বিস্কে উপসাগরের তীরবর্তী সানটানডার ও বিলবাও-এ উৎপাদিত হয়। এখানকার লৌহ আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ গড়ে শতকরা ৪১ হইতে ৫৭ ভাগ এবং ফস্‌ফরাস, গন্ধক ও অন্যান্য বিজাতীয় পদার্থের (Impurities) পরিমাণ সামান্য। এখান হইতে খুব সস্তায় লৌহ আকরিক বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এদেশের উৎপাদিত লৌহ আকরিকের শতকরা ৯০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। লৌহখনিগুলিতে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মূলধন, বিশেষ করিয়া বৃটিশ ও জার্মান মূলধন নিয়োজিত আছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মধ্যে লুক্সেমবার্গ, পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় লৌহ আকরিক উৎপাদন করা হয়।

এশিয়া মহাদেশে প্রধানতঃ ভারত, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, চীন ও তুরস্কে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। **ভারতে** উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক পাওয়া যায় ; ধাতব লৌহের পরিমাণ গড়ে শতকরা ৬০ হইতে ৬২ ভাগ। ফস্‌ফরাসের পরিমাণও খুব সামান্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লৌহ-

খনির কাছাকাছি কয়লাখনি রহিয়াছে। ফলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিবার সুবিধা হইয়াছে। এখানে ইস্পাত উৎপাদনের খরচও অনেক দেশের তুলনায় কম। ভারতে অধিকাংশ লৌহ আকরিক বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের খনিগুলি হইতে উৎপাদিত হয়। অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর, গোয়া ও মহারাষ্ট্রেও প্রচুর পরিমাণে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। **জাপানে** হন্‌সু দ্বীপের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত সেনিন (Senin) এবং হোক্কাইডো দ্বীপের মুরোরানে (Muroran) লৌহ আকরিক উত্তোলিত হয়। জাপান, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া হইতে লৌহ আকরিক ও অন্যান্য দেশ হইতে ভাঙাচুরা টুকরা লৌহ (Scrap iron) আমদানি করিয়া থাকে। মালয়ে এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মিনডানাও-এ প্রচুর পরিমাণে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

উত্তর **আফ্রিকার** মরক্কো, টিউনিসিয়া ও আলজেরিয়ায় অনেকগুলি লৌহখনি রহিয়াছে। এখানকার লৌহ আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ গড়ে শতকরা ৫০ হইতে ৬০ ভাগ এবং ফস্‌ফরাসের পরিমাণ অতি সামান্য। লৌহস্তর সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠের নিকটে অবস্থিত। এখানকার লৌহখনিগুলি ইউরোপীয় মূলধনে ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয় এবং উৎপাদিত লৌহ আকরিক বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। **দক্ষিণ আফ্রিকার** ট্রান্সভালে এবং **পশ্চিম আফ্রিকার** লাইবেরিয়া ও সিয়েরা লিওনে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

লৌহ আকরিক-উৎপাদনে **দক্ষিণ আমেরিকার** ব্রেজিল, ভেনেজুয়েলা, পেরু ও চিলি উল্লেখযোগ্য। **ব্রেজিলে** মিনাস্‌ গেরায়েস্‌ (Minas Geraes) প্রদেশের মধ্যভাগে (ইটাবিরা, বেলো হরিজোনটি এবং আউরো প্রেটো) এবং ম্যাটো গ্রোসো (Mato Grosso) প্রদেশের কোরাম্বার নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে লৌহ আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে। মিনাস্‌ গেরায়েস্‌ প্রদেশের লৌহখনিগুলি হইতে স্থানীয় কারখানাগুলিতে এবং ভোল্টা রিডনডায় অবস্থিত আধুনিক বৃহদাকার ইস্পাত-কারখানায় লৌহ আকরিক সরবরাহ করা হয়। ইহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ টন লৌহ আকরিক ভিটোরিয়া বন্দর দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। **চিলির** লা সেরেনার নিকটে তিনটি বৃহৎ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহভাণ্ডার (Deposits) রহিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে দুইটি ভাণ্ডার হইতে বৎসরে গড়ে ১০ হইতে ২৫ লক্ষ টন লৌহ আকরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্প্যারোস্ পয়েণ্টে অবস্থিত ইস্পাত-কারখানায় রপ্তানি করা হয়। তৃতীয় ভাণ্ডার হইতে লৌহ আকরিক মধ্য চিলির হুয়াচিপাটোয় (Huachipato) অবস্থিত আধুনিক বৃহৎ ইস্পাত-কারখানায় সরবরাহ করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাংশে আয়রণ নব ও আয়রণ মনার্কে লৌহআকরিক উত্তোলিত হয়। নিউ সাউথ ওয়েল্‌স হইতেও সামান্য পরিমাণ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য (Trade)—লৌহ আকরিক-উৎপাদনকারী অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলিতে লৌহের চাহিদা অল্প থাকায় এই সকল দেশ লৌহ আকরিক রপ্তানি করিয়া থাকে এবং আমদানি করে শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলি। ভেনেজুয়েলা, চিলি, ব্রেজিল, পেরু, কানাডা, সুইডেন, স্পেন, লুক্সেমবার্গ, মরক্কো, আলজেরিয়া, টিউনিসিয়া, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া, ভারত, ফিলিপাইন, মালয় ও কোরিয়া প্রচুর পরিমাণে লৌহ আকরিক রপ্তানি করিয়া থাকে। আমদানিকারক দেশের মধ্যে বৃটেন, জাপান, জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লৌহ-সঙ্কর ধাতুসমূহ
(Ferro-alloy metals)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যে লৌহ ও ইস্পাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে লৌহ ও ইস্পাতের এই গুরুত্ব অন্য কতকগুলি ধাতু ব্যতীত কখনই সম্ভব হইত না। লৌহ ও ইস্পাতের সহিত এই সকল ধাতু মিশাইয়া বিভিন্ন গুণের ইস্পাত তৈয়ারী করা হয় এবং এই সকল ইস্পাতের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কার্যে প্রয়োজনীয় অসংখ্য সামগ্রী উৎপাদন করা হয়।

ম্যাঙ্গানিজ-ইস্পাতে শতকরা ১২ হইতে ১৪ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ থাকে। এই পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রণের ফলে ইস্পাত অত্যন্ত কঠিন এবং ঘর্ষণজনিত ক্ষয়রোধ করিতে সক্ষম হয়। যে সকল ক্ষেত্রে আঘাত ও ঘর্ষণ বেশী সেখানে ম্যাঙ্গানিজ-ইস্পাত ব্যবহার করা হয়। রেলগাড়ী ও মোটর-গাড়ীর অংশবিশেষ ইহার দ্বারা প্রস্তুত হয়। যে নিকেল-ইস্পাতে নিকেলের অংশ শতকরা ২ হইতে

৪ ভাগ থাকে, তাহার প্রসারণ-ক্ষমতা খুব বেশী এবং ইহা ঘর্ষণজনিত ক্ষয়-রোধ করিতে সক্ষম। নিকেল-ইস্পাতে মরিচা ধরে না। যে নিকেল-ইস্পাতে নিকেলের অংশ শতকরা ৩৬ ভাগ তাহা উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংকুচিত বা প্রসারিত হয় না। নিকেল-ইস্পাতে নিকেলের পরিমাণ শতকরা ৭৮ ভাগ হইলে তাহার চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হইবার ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী হয়। ইহা সামুদ্রিক কেব্‌ল্‌ তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়। ক্রোমিয়াম মিশ্রিত ইস্পাত খুব শক্ত হয়। যে ক্রোমিয়াম-ইস্পাতে শতকরা ১ ভাগ ক্রোমিয়াম থাকে তাহা হাতুড়ি, ফাইল, কর্তন-যন্ত্র প্রভৃতি নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইস্পাতে শতকরা ১২ হইতে ১৮ ভাগ ক্রোমিয়াম থাকিলে তাহার উত্তাপ সহ্য করিবার বা ক্ষয়রোধ করিবার ক্ষমতা খুব বেশী হয়। বাসনপত্র, ছুরি-কাঁচি, বিয়ারিং প্রভৃতি নির্মাণে ইহা ব্যবহৃত হয়। ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী প্রভৃতি ক্রোমিয়াম-ইস্পাতে নির্মিত। অনেকসময় ইস্পাতের সহিত একের অধিক ধাতু মিশাইয়া বিভিন্ন প্রকার সঙ্কর-ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। নিকেল-ক্রোমিয়াম-ইস্পাত ব্যাপকভাবে মোটর-গাড়ী শিল্প, দুগ্ধশিল্প, ধৌতাগারের যন্ত্রপাতি, কৌটা ভর্তি করিবার যন্ত্রপতি, বিমানপোত, স্টীম টার্বাইন প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের ইস্পাত জল, বাষ্প, আর্দ্র বায়ু ও অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিলেও ক্ষয় হয় না। ভ্যানাডিয়াম-ইস্পাত দৃঢ় ও নমনীয় হয়। ভ্যানা-ডিয়াম-ক্রোমিয়াম-ইস্পাত রেলের ইঞ্জিনের অংশবিশেষ, মোটর-গাড়ী, ভারী যন্ত্রপাতি ও কামান-বন্দুক নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। টাংস্টেন-ক্রোমিয়াম-ভ্যানাডিয়াম-ইস্পাত প্রচণ্ড উত্তাপেও শক্ত থাকে। ইহা দ্রুতগতি ইস্পাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অবশ্য একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সঙ্কর-ইস্পাত বিভিন্ন কার্যে গুরুত্বপূর্ণ হইলেও, সাধারণ ইস্পাত সঙ্কর-ইস্পাত অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্কর-ইস্পাত উৎপাদনের জন্য যে সকল ধাতু ব্যবহৃত হয় নিম্নে সেগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল :

ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)—সাধারণ ও উচ্চশ্রেণীর ইস্পাত-উৎপাদনে ম্যাঙ্গানিজ অবশ্য প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর মোট ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগই ইস্পাতশিল্পে ব্যবহৃত হইলেও অন্যান্য কার্যে বিশেষ করিয়া বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে, এনামেল-প্রস্তুতে, বৈদ্যুতিক ও কাচশিল্পে ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে রাশিয়া, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল ও ঘানা এই পাঁচটি দেশ হইতে গড়ে পৃথিবীর শতকরা ৭৫ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদিত হয়। এই দেশগুলিতে প্রভূত পরিমাণে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ম্যাঙ্গানিজ সঞ্চিত রহিয়াছে। **রাশিয়া** সর্বপ্রধান ম্যাঙ্গানিজ-উৎপাদনকারী দেশ। জর্জিয়ায় ককেশাস্ পর্বতের দক্ষিণে ২৬০ বর্গ-কিলোমিটারেরও অধিক অঞ্চল জুড়িয়া ম্যাঙ্গানিজ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া ইউক্রেনে ক্রিভয় রগের লৌহখনির নিকটে নিকোপোলে ২২০ বর্গ-কিলোমিটারব্যাপী অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ সঞ্চিত রহিয়াছে। **ভারত** দ্বিতীয় বৃহৎ ম্যাঙ্গানিজ-উৎপাদনকারী দেশ। ভারতের মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও রাজস্থানে ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদিত হয়। **ব্রেজিলে** প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ সঞ্চিত রহিয়াছে (১ কোটি মেট্রিক টনের উপর)। মিনাস্ গেরায়েস্থ (Minas Geraes) রাজ্যের আউরো প্রেটো (Ouro Preto) প্রধান উৎপাদনকেন্দ্র। পশ্চিম দিকে ম্যাটো গ্রোসো (Mato Grosso) রাজ্যেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ম্যাঙ্গানিজের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। **দক্ষিণ আফ্রিকায়** কিম্বার্লির উত্তর-পশ্চিমে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। ব্রেজিল, ঘানা বর্তমানে ম্যাঙ্গানিজ-উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। উল্লিখিত প্রধান পাঁচটি দেশ ব্যতীত কঙ্গো, মরক্কো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়।

পৃথিবীর ম্যাঙ্গানিজ আকরিক-উৎপাদন—৫১ লক্ষ মেঃ টন
(১৯৬৩)

রাশিয়া	২৫ লক্ষ মেঃ টন	দক্ষিণ আফ্রিকা	৩'৬০ লক্ষ মেঃ টন
ভারত	৫ ১৬ „	ঘানা	২'৫৭ „
ব্রেজিল	৪'২১ „		

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ইস্পাত-উৎপাদনকারী দেশসমূহ, ভারত, ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মরক্কো, মিশর, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ হইতে ম্যাঙ্গানিজ আমদানি করে।

ক্রোমিয়াম (Chromium)—বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রোমাইট আকরিক হইতে ক্রোমিয়াম উৎপাদন করা সম্ভব হইলেও বাণিজ্যিক গুরুত্বের দিক দিয়া একমাত্র ফেরাস ক্রোমাইট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্রোমিয়াম উজ্জ্বল ও কঠিন। কাঠিন্যের দিক দিয়া ইহার স্থান হীরকের পরেই। ইস্পাতশিল্প

ছাড়া ইহা বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে ও প্রচণ্ড উত্তাপ-সৃষ্টিকারী চুল্লীতে ব্যবহার করা হয়।

পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ ক্রোমাইট তুরস্ক, দক্ষিণ রোডেশিয়া, রাশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে পাওয়া যায়। রাশিয়ার ইউরাল পর্বতের মধ্য অঞ্চলে এবং ইহার কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে সারানভ্ অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে ক্রোমাইট সঞ্চিত রহিয়াছে। উল্লিখিত চারিটি দেশ ব্যতীত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কিউবা, পারস্য, যুগোশ্লাভিয়া, ভারত, নিউ ক্যালিডোনিয়া (প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত একটি দ্বীপ) প্রভৃতি দেশেও ক্রোমাইট উৎপাদিত হয়। রাশিয়া ব্যতীত অন্যান্য ইস্পাত-উৎপাদনকারী দেশসমূহ প্রয়োজনীয় ক্রোমিয়ামের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল।

নিকেল (Nickel)—নিকেল ইস্পাতের সহিত মিশাইয়া মরিচাবিহীন ও অন্যান্য গুণের সঙ্কর-ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। তাম্র, অ্যালুমিনিয়াম ও অন্যান্য ধাতুর সহিত নিকেল মিশাইয়া বিভিন্ন সঙ্কর-ধাতু উৎপাদন করা হয়। ইহা ছাড়া ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং-এর জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। জেট ইঞ্জিন-নির্মাণে নিকেলের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। নিকেলের সামরিক গুরুত্ব অসাধারণ।

গড়ে পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী নিকেল **কানাডা** ও রাশিয়ায় উৎপাদিত হয়। কানাডাই সর্বপ্রধান নিকেল-উৎপাদনকারী দেশ। কানাডার অণ্টারিও প্রদেশের স্যাডবেরি জেলায় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ নিকেলের ভাণ্ডার রহিয়াছে। **রাশিয়ার** পেটসামো (পূর্বে ফিন্‌ল্যাণ্ডের অন্তর্গত ছিল), কোলা উপদ্বীপ ও ইউরাল পর্বতে নিকেল পাওয়া যায়। এই দুইটি দেশ ছাড়া নিউ ক্যালিডোনিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে ও কিউবায় সামান্য পরিমাণে নিকেল পাওয়া যায়। পৃথিবীতে প্রধান প্রধান নিকেল-আমদানি-কারক দেশ হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, বৃটেন প্রভৃতি। ইহা সর্বাধিক পরিমাণে রপ্তানি হয় কানাডা ও নিউ ক্যালিডোনিয়া হইতে।

মলিব্‌ডেনাম (Molybdenum)—পৃথিবীর শতকরা ৭০ ভাগ মলিবৃডেনাম ইস্পাতশিল্পে ২০ ভাগ ঢালাই-লৌহে (Cast *iron*) ব্যবহৃত হয়। মলিবৃডেনাম-ইস্পাত প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করিতে সক্ষম। ইহার যথেষ্ট সামরিক গুরুত্ব রহিয়াছে। সামরিক অস্ত্রাদি, ট্যাঙ্ক, জেট ইঞ্জিন, গ্যাস টার্বাইন প্রভৃতি নির্মাণে মলিবৃডেনাম-ইস্পাত ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া

মলিবৃডেনাম বিভিন্নরূপে ইলেকট্রনিক শিল্পে, রং ও মৃৎশিল্পে ব্যবহার করা হয়।

পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী মলিবৃডেনাম একমাত্র **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে** উৎপাদিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো, উটা, আরিজোনা, নেভাডা, নিউ মেক্সিকো এবং ক্যালিফোর্ণিয়া এই ছয়টি রাজ্যে মলিবৃডেনাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কলোরাডো প্রধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত চিলি, যুগোশ্লাভিয়া, কানাডা, নরওয়ে ও জাপানে সামান্য পরিমাণ মলিবৃডেনাম পাওয়া যায়।

টাংস্টেন (Tungsten)—টাংস্টেন প্রধানতঃ উল্‌ফ্রাম (Wolfram) এবং শীলাইট (Scheelite) হইতে নিষ্কাশন করা হয়। টাংস্টেন-ইস্পাত বিশেষ করিয়া ধাতু-কর্তন যন্ত্র-নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া টাংস্টেন বৈদ্যুতিক বাতির সূক্ষ্ম তার (Filament)-নির্মাণে ও মৃৎশিল্পে এবং অন্যান্য কার্যে ব্যবহৃত হয়।

চীন পৃথিবীর সর্বপ্রধান আকরিক টাংস্টেন-উৎপাদনকারী দেশ। তাহার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া। এই দেশগুলি ছাড়া বলিভিয়া, পর্তুগাল, কোরিয়া, কঙ্গো ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে আকরিক টাংস্টেন উৎপাদিত হয়।

ভ্যানাডিয়াম (Vanadium)—ভ্যানাডিয়াম প্রধানতঃ ইস্পাতশিল্পে ব্যবহৃত হয়। ইহা ইস্পাতের বিজাতীয় পদার্থ দূরীকরণে ব্যবহৃত হয় এবং ইস্পাতের সহিত মিশাইয়া সঙ্কর-ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। ভ্যানাডিয়াম-ইস্পাত দ্রুতগতি-ইস্পাত (High speed steel) হিসাবে আদৃত হয়। সামরিক ব্যবস্থায় ইহার গুরুত্ব রহিয়াছে। ভ্যানাডিয়াম তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের সহিত মিশাইয়া সঙ্কর-তাম্র ও সঙ্কর-অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করা হয়। ইহা ছাড়া রাসায়নিক শিল্পে ও অন্যান্য কার্যে ভ্যানাডিয়াম ব্যবহৃত হয়।

সর্বপ্রধান ভ্যানাডিয়াম-উৎপাদক দেশ **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র**। ১৯৫৯ সালে পৃথিবীর মোট ভ্যানাডিয়াম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪,৯০০ মেট্রিক টন। উহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ছিল ৩,৩৭৪ মেঃ টন। ইহা ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, পেরু ও উত্তর রোডেশিয়ায় ভ্যানাডিয়াম পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা, বৃটেন, স্পেন, জার্মানী, রাশিয়া,

এবং ভারতে সামান্য পরিমাণ ভ্যানাডিয়াম রহিয়াছে। আকরিক ভ্যানাডিয়াম হইতে ধাতব ভ্যানাডিয়াম নিষ্কাশন অত্যন্ত কঠিন। ফলে ইহার মূল্য অধিক। তৎসত্ত্বেও ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া ইদানীং ইহার চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে।

লৌহেতর ধাতুসমূহ (Non-ferrous Metals)

লৌহেতর ধাতুসমূহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ হইল তাম্র, অ্যালুমিনিয়াম, সীসা, রাং, অভ্র ও দস্তা। নিম্নে ইহাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও বণ্টন সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল।

তাম্র (Copper)

বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে তাম্রই মানুষ সর্বপ্রথম ব্যবহার করিতে শিখে। প্রাচীনকালে কোথাও কোথাও তাম্র বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যাইত। তাম্র ঘাতসহ ও নমনীয় বলিয়া ইহাকে ইচ্ছামতো যে-কোন আকারে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। এই কারণে সাত আট হাজার বৎসর পূর্বে নব্য প্রস্তরযুগের মানুষ যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কারাদি নির্মাণের জন্য কাষ্ঠ, হাড় ও পাথর ত্যাগ করিয়া তাম্র ব্যবহার করিতে শুরু করে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে মানবসভ্যতায় নূতন যুগের সূচনা হয় যাহা সাধারণভাবে তাম্রযুগ নামে পরিচিত।

শিল্পগত গুরুত্ব (Industrial importance)—আধুনিক যুগে তাম্রের একাধিপত্য না থাকিলেও বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়া লৌহের পরেই তাম্রের স্থান। তাম্র ঘাতসহ ও নমনীয় একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহা টানিয়া সূক্ষ্ম সূতায় পরিণত করা যায়। ইহা সহজে ক্ষয় হয় না এবং ইহাতে মরিচাও ধরে না। ইহাকে সহজে অন্য অনেক ধাতুর সহিত মিশাইয়া সঙ্কর-ধাতু প্রস্তুত করা যায়। যেমন তাম্রের সহিত রাং মিশাইয়া ব্রোঞ্জ এবং দস্তা মিশাইয়া পিতল প্রস্তুত করা হয়। তাম্র, দস্তা ও রাং নির্দিষ্টমাত্রায় একত্রে মিশাইয়া কাঁসা প্রস্তুত করা হয়। তাম্রের সহিত নিকেল মিশাইয়া মনেল মেটাল, রাং ও অ্যান্টিমনি মিশাইয়া ব্যাবিট মেটাল (Babbit metal) এবং অ্যালুমিনিয়াম মিশাইয়া ডুরালুমিন (Duralumin) প্রস্তুত করা হয়। সোনার সহিত তাম্রের খাদ মিশাইয়া গিনি সোনা তৈয়ারি করা হয়। কিন্তু বর্তমান কালে তাম্রের সর্বাধিক ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার বিদ্যুৎশিল্পে।

কারণ রৌপ্য ব্যতীত তাম্রই সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যুৎ-পরিবাহী। প্রকৃতপক্ষে তাম্রের বর্তমান চাহিদা বিদ্যুৎ-আবিষ্কারের ফল। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে সমগ্র পৃথিবীতে যেখানে মাত্র ৫২,০০০ টন তাম্র উৎপাদিত হইয়াছিল ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১১ লক্ষ টন এবং ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে ৩৬ লক্ষ ৭০ হাজার টন। বিদ্যুৎ-উৎপাদন, পরিবহণ ও ব্যবহারে পৃথিবীর মোট তাম্র উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎশিল্প ছাড়া মোটর-গাড়ী, জাহাজ ও রেলের ইঞ্জিন-নির্মাণে তাম্র ব্যবহার করা হয়। একটি মাঝারি আকারের ট্যাঙ্ক নির্মাণ করিতে ½ টন এবং একটি দূরপাল্লার বোমারু বিমান-নির্মাণে অন্ততঃ ৩ টন তাম্রের প্রয়োজন হয়। ডাক্তারী ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং মুদ্রা-নির্মাণে, গুলিগোলা, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ ও হিমায়ন যন্ত্র-নির্মাণে, গুড়, সাবান প্রভৃতি তৈয়ারি করিবার উপযোগী বড় বড় পাত্র এবং পাইপ-নির্মাণে, রং, পতঙ্গবিধ্বংসী ঔষধ প্রভৃতি উৎপাদনে তাম্র ব্যবহার করা হয়।

বর্তমানে খনি হইতে বিশুদ্ধ তাম্র অল্পই পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খনিজ তাম্র অন্যান্য পদার্থের সহিত যৌগিক অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রায়ঃশই স্বর্ণ, রৌপ্য, নিকেল, রাং এবং সীসা খনিজ তাম্রের সহিত দেখিতে পাওয়া যায়। খনিজ তাম্রে গড়ে শতকরা ৩ ভাগেরও কম খাঁটি তাম্র পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে আকরিক তাম্র উত্তোলিত হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাতে বিশুদ্ধ তাম্রের পরিমাণ শতকরা ১·৫ ভাগের কম। আকরিক তাম্রে খাঁটি তাম্রের পরিমাণ এত কম থাকায় খনি অঞ্চলেই আকরিক তাম্র হইতে খাঁটি তাম্র নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিতে হয়। লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহৃত লৌহ আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ শতকরা ৪০, ৫০, এমনকি ৬০ ভাগ থাকে বলিয়া লৌহ আকরিক খনি অঞ্চল হইতে অনেক দূরে লইয়া গিয়া ধাতব লৌহ-নিষ্কাশন সম্ভব। কিন্তু তাম্রের ক্ষেত্রে ঐরূপ করিলে উৎপাদন-খরচ অনেক বেশী পড়িয়া যায়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing areas)—পৃথিবীতে তাম্র-উৎপাদনে **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** প্রথম স্থান অধিকার করে। বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ তাম্র আরিজোনা, উটা, নেভাডা, নিউ মেক্সিকো ও মন্‌টানা পশ্চিমদিকের এই পাঁচটি রাজ্য হইতে পাওয়া যায়। দেশের পশ্চিমাংশে রেলপথের বিস্তার এবং খনি হইতে আকরিক তাম্র-উৎপাদন ও

খাঁটি তাম্র-নিষ্কাশন পদ্ধতির উন্নতি ঘটায় এই রাজ্যগুলিতে তাম্র-উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। উটা রাজের বিংহ্যামে, আরিজোনা রাজ্যের বিস্‌বী, জেরোম মরেন্‌সি, মেট্‌কাফ ও গ্লোবমিয়ামি জিলায় এবং মন্‌টানা রাজের বুট্টীর নিকট আকরিক তাম্র উত্তোলিত হয়। উল্লিখিত পাঁচটি রাজ্য ব্যতীত মিচিগান, টেনেসি, ওয়াশিংটন ও ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যেও তাম্র পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সমস্ত তাম্র পশ্চিমদিকে সংগৃহীত হইলেও উহা ব্যবহার করা হয় প্রধানতঃ দেশের পূর্বাংশে, আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবলমাত্র সর্বপ্রধান তাম্র-উৎপাদনকারী দেশ নহে, ইহা সর্বপ্রধান তাম্র-ব্যবহারকারী দেশও বটে। মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ তাম্রখনি মার্কিন মূলধনের সাহায্যে পরিচালিত হয় এবং ঐ সকল দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে তাম্র এই দেশে আমদানি করা হইয়া থাকে।

চিলি তাম্র-উৎপাদনে বর্তমানে তৃতীয়স্থান অধিকার করে। চুকিকামাটা, পোট্রেরিলোস এবং স্যান্টিয়াগোর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ব্রাডেন বা সিওয়েল —এই তিনটি প্রধান আকরিক তাম্র-উৎপাদন-কেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলির সহিত সমুদ্রোপকূলের উত্তম যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকায় তাম্রখনি গড়িয়া উঠিবার সুবিধা হইয়াছে। তাম্র-রপ্তানিতে চিলি প্রথম স্থান অধিকার করে।

আফ্রিকা মহাদেশের **জাম্বিয়া** রাজ্যে প্রচুর তাম্র পাওয়া যায়। এই দেশ বর্তমানে খনিজ তাম্র-উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া এই মহাদেশের **কঙ্গোর** কাটাঙ্গা প্রদেশে ইদানীং তাম্র-উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। চিলির তাম্র-খনিগুলি সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত; কিন্তু আফ্রিকার তাম্রখনিগুলি সমুদ্রতীর হইতে বহুদূরে অবস্থিত; সেইজন্য ১৯৩১ সালে পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বেঙ্গুয়েলার সহিত রেলপথে সংযোগসাধনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আফ্রিকা তাম্র-উৎপাদনে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। চিলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশের তাম্রখনিগুলি মরুভূমি বা মরুপ্রায় অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে জল ও খাদ্য সরবরাহ ঐ সকল অঞ্চলে একটি সমস্যা। কিন্তু জাম্বিয়া, কাটাঙ্গা ও উত্তর রোডেশিয়ায় যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হওয়ায়, খাদ্য ও জলের কোন অভাব নাই। উপরন্তু এই দেশগুলির আকরিক তাম্রে ধাতব তাম্রের পরিমাণ গড়ে শতকরা প্রায় ৬ ভাগ অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

উৎপাদিত আকরিক তাম্রের তুলনায় ৫ গুণেরও বেশী। আফ্রিকার তাম্র-খনিগুলি বৃটিশ, মার্কিন ও বেলজিয়ান মূলধনে পরিচালিত হয়। উৎপাদিত তাম্র প্রায় সমস্তই বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

কানাডা অন্যতম প্রধান তাম্র-উৎপাদনকারী দেশ। এখানে উৎপাদিত তাম্রের একটি বড় অংশ অপেক্ষাকৃত মূল্যবান্ ধাতুর উপজাত-দ্রব্য হিসাবে পাওয়া যায়। কানাডার অণ্টারিও প্রদেশের স্যাডবেরি অঞ্চলে অধিকাংশ তাম্র পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কুইবেক, ম্যানিটোবা, বৃটিশ কলম্বিয়া ও ভ্যাঙ্কুভারেও তাম্র পাওয়া যায়। আভ্যন্তরীণ চাহিদা কম বলিয়া অধিকাংশ তাম্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। **জাপানে** হনসু দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে এবং শিকোকু ও হোক্কাইডো দ্বীপে তাম্র উৎপাদিত হয়। রাশিয়ার ইউরাল পর্বত, ককেশাস্ পর্বত এবং মধ্য এশিয়া অঞ্চলে তাম্রখনি রহিয়াছে। উপরোক্ত দেশগুলি ব্যতীত অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, পেরু, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও সাইপ্রাস্ তাম্র-উত্তোলনে গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। **ভারতের** তাম্র-উৎপাদন অতি সামান্য।

পৃথিবীর খনিজ তাম্র-উৎপাদন—৪০'৫ লক্ষ মেঃ টন

১৯৬৪ (লক্ষ মেঃ টন)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১১ লক্ষ ৩৫ হাঃ মেঃটন	কানাডা	৪ লক্ষ ৪৯ হাঃ মেঃটন
জাম্বিয়া ৬ „ ৩৫ „	কঙ্গো	২ „ ৯৫ „
চিলি ৬ „ ২২ „	পেরু	১ „ ১৮ „

Source—U.N.O. Monthly Bulletin of Statistics, April, 1965

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য (Trade)—পৃথিবীর অধিকাংশ তাম্র-খনিতে মার্কিন পুঁজি নিয়োজিত থাকায় রপ্তানি-বাণিজ্যে এই দেশ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। চিলি, কানাডা, রোডেশিয়া, কঙ্গো ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ তাম্র রপ্তানি করে। বৃটেন, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইটালি, ভারত ও জাপান অধিকাংশ তাম্র আমদানি করে।

অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)

তাম্র আবিষ্কার করিয়াছিল প্রাগৈতিহাসিক মানুষ এবং তাম্রের ব্যবহার শুরু হইয়াছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে। কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের আবিষ্কার ও

ব্যবহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম আকরিক অ্যালুমিনিয়াম হইতে ধাতব অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়। তাহার পর হইতে নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে একদিকে যেমন অ্যালুমিনিয়াম-নিষ্কাশন অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে ও অ্যালুমিনিয়ামের দাম হ্রাস পাইয়াছে অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন কার্যে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে যেখানে ১ কিলোগ্রাম অ্যালুমিনিয়ামের দাম ছিল ২৪৮ ডলার, বর্তমানে সেখানে ইহা গড়ে মাত্র ৯ সেন্টে পাওয়া যায়।

শিল্পগত গুরুত্ব (Industrial importance)—অ্যালুমিনিয়ামের সর্বপ্রধান গুণ হইল ইহা ওজনে হালকা। এক কিউবিক ফুট অ্যালুমিনিয়ামের ওজন মাত্র ৭৫ কিলোগ্রাম; অথচ সম-পরিমাণ তাম্রের ওজন ২৫২ কিলোগ্রাম এবং সাধারণ ইস্পাতের ওজন ২২১ কিলোগ্রাম। অ্যালুমিনিয়াম নমনীয় বলিয়া ইহাকে ইচ্ছামতো যে-কোন আকৃতি দেওয়া চলে এবং ইহা স্বচ্ছন্দে ঢালাই ও ঝালাই করা যায়। ইহা উত্তম তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী এবং সহজে তাম্র, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা ও লোহার সহিত মিশাইয়া বিভিন্ন প্রকারের সঙ্কর-অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করা যায়। অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষয়রোধ করিবার ক্ষমতা বেশী এবং ইহা দেখিতেও সুন্দর। অ্যালুমিনিয়াম হালকা বলিয়া বিমানপোত-নির্মাণে ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয়। আজকাল মোটর-গাড়ী, মোটর-বাস্, মোটর-ট্রাক, রেলের কামরা এবং জাহাজ-নির্মাণেও ক্রমেই অধিক পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হইতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে গৃহাদি-নির্মাণেও অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। গৃহের ছাদ, জানালা, দরজা, পর্দা, স্কাইলাইট প্রভৃতি নির্মাণে ইহা ব্যবহার করা হইতেছে। এমনকি আকাশচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণের জন্য ইস্পাতের কাঠামো ব্যবহার না করিয়া তৎপরিবর্তে অন্য ধাতু-মিশানো সঙ্কর-অ্যালুমিনিয়ামের হালকা অথচ শক্ত কাঠামো ব্যবহার করা হইতেছে। সেতু-নির্মাণেও ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক তার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি-নির্মাণে অ্যালুমিনিয়াম তাম্রের ঘনিষ্ঠ প্রতিযোগী। ইহা ছাড়া গৃহস্থালির বাসনপত্র, আসবাবপত্র, রং, বাষ্পীয় কোদাল (Steam shovel), মদের পিপা (Beer barrel) প্রভৃতি নির্মাণে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন যুদ্ধসামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য অ্যালুমিনিয়াম প্রয়োজন হয় বলিয়া ইহার সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী।

আকরিক অ্যালুমিনিয়াম (বক্সাইট)—পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র মৃত্তিকায় অ্যালুমিনিয়াম থাকিলেও এখন পর্যন্ত একমাত্র বক্সাইট হইতে বাণিজ্যিক হারে, সস্তামূল্যে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা সম্ভব। খনি হইতে যে বক্সাইট উত্তোলন করা হয় তাহার শতকরা ১৫ ভাগ রাসায়নিক ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহার করা হয়। অবশিষ্ট ৮৫ ভাগ অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ বক্সাইটে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। খনি হইতে বক্সাইট উত্তোলন করিয়া প্রথমে তাহা ভাঙ্গিয়া ধুইয়া শুকানো হয়। তারপর উহা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা অ্যালুমিনা নিষ্কাশন করা হয়। ইহার জন্য খুব বেশী শক্তির প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য বক্সাইট হইতে অ্যালুমিনা নিষ্কাশনের কারখানা সাধারণতঃ বক্সাইট খনির নিকটেই স্থাপন করা হয়; অবশ্য যেখানে যাতায়াত-ব্যবস্থা সুন্দর, সহজ ও সুলভে বক্সাইট-পরিবহণের সুবিধা আছে, সেখানে খনি হইতে দূরে নিষ্কাশন যন্ত্র স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু অ্যালুমিনা হইতে ধাতব অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদন অত্যন্ত ব্যয়বহুল পদ্ধতি এবং ইহার জন্য অত্যধিক পরিমাণে শক্তির প্রয়োজন। সাধারণতঃ অ্যালুমিনা হইতে ধাতব অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের জন্য সুলভ জলবিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহার করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, নরওয়ে, ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুব্যবস্থা হইয়াছে, সেখানেই কেবল অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে।

বক্সাইট-উৎপাদক অঞ্চল (Bauxite-producing areas)—পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ২৩% বক্সাইট **সুরিনামে** (ডাচ গায়না), ২১% **জ্যামাইকায়, ১৫% বৃটিশ গায়নায়,** ১০% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ৯% ফ্রান্সে, ৫% হাঙ্গেরীতে ও ৫% যুগোস্লোভিয়ায় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া গ্রীস, পশ্চিম আফ্রিকা, রাশিয়া এবং ভারতেও বক্সাইট পাওয়া যায়। এই সকল দেশের মধ্যে যেখানে জলবিদ্যুতের অভাব আছে, সেখানকার অধিকাংশ বক্সাইট বিদেশে রপ্তানি হয়। অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের জন্য কিছু পরিমাণ ক্র্যায়োলাইটের প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ ক্র্যায়োলাইট একমাত্র গ্রীনল্যাণ্ডে পাওয়া যায়। এখান হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্র্যায়োলাইট রপ্তানি করা হয়।

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য (Trade)—বক্সাইট-রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে জ্যামাইকা, সুরিনাম, বৃটিশ গায়না ও ফ্রান্স উল্লেখযোগ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, কানাডা, নরওয়ে, পশ্চিম জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশ বক্সাইট আমদানি করে।

অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদক অঞ্চল (Aluminium-producing areas)—পূর্বেই বলা হইয়াছে অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদন সুলভ জলবিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল বলিয়া জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনকারী দেশগুলিতে অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। আজকাল অবশ্য কোথাও কোথাও প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া অ্যালুমিনিয়াম-শিল্পে ব্যবহার করা হইতেছে।

পৃথিবীর মোট অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদন—৪৮ লক্ষ মেঃ টন
(১৯৬৪)

মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	২৮ লক্ষ	২ হাজার	মেঃ টন		জাপান	৩ লক্ষ	৬৯ হাজার	মেঃ টন	
কানাডা	৫ "	৫০ "	"		নরওয়ে	২ "	৪৮ "	"	
ফ্রান্স	৩ "	৬৬ "	"		বৃটেন	২ "	৪ "	"	
পঃ জার্মানী	৪ "	৩২ "	"		ইটালি		৯১ "	"	

Source—U. N. O. Monthly Bulletin of Statistics, April, 1965

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে সর্বপ্রধান অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদনকারী দেশ। এখানে পৃথিবীর শতকরা মাত্র ১০ ভাগ বক্সাইট উত্তোলিত হইলেও বিদেশ হইতে বক্সাইট আমদানি করিয়া অ্যালুমিনিয়াম-শিল্পের উন্নতি করা হইয়াছে। সুরিনাম, বৃটিশ গায়না ও জ্যামাইকা হইতে এখানে বক্সাইট আমদানি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন, অরিগান, টেক্সাস্, লুইসিয়ানা, আরকানসাস্, টেনেসি, আলাবামা ও নিউ ইয়র্ক রাজ্যে অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। টেক্সাস্, লুইসিয়ানা ও আরাকানসাস্ রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস ও লিগনাইটের সাহায্যে অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদন করা হয়। **কানাডার** কুইবেক প্রদেশের সেগুয়েনে এবং সেন্ট মরিস্ নদীদ্বয়ের তীরবর্তী অঞ্চল অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। পশ্চিমদিকে বৃটিশ কলম্বিয়া প্রদেশেও অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম প্রধান অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদনকারী দেশ।

রাশিয়ায় ইউরাল পার্বত্য অঞ্চলে, লেনিনগ্রাডের পূর্বে অবস্থিত ভলখোভে, নীপার নদীর তীরে অবস্থিত জাপোরোঝে, শ্বেতসাগরের তীরে অবস্থিত কাণ্ডালাক্শায় এবং আর্মেনিয়া রাজ্যের যেরেভানে অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপে **ফ্রান্স** অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদনে প্রধান স্থান অধিকার করে। আল্পস্ ও পীরেনীজ পর্বতের সানুদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রগুলির নিকটে অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প স্থাপিত হইয়াছে।

উল্লিখিত দেশগুলি ব্যতীত পশ্চিম জার্মানী, নরওয়ে, ইটালি, বৃটেন, জাপান, ভারত, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদিত হয়।

দস্তা (Zinc)

বিভিন্ন লৌহেতর ধাতুর মধ্যে দস্তা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। লৌহ ও অন্যান্য ধাতুর উপর অক্সিজেনের ক্রিয়াজনিত ক্ষয়রোধ করিতে পারে বলিয়া দস্তার সমাদর এত অধিক। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দস্তা আকরিক হইল স্ফ্যালেরাইট্ (Sphalerite)। খনি হইতে যে স্ফ্যালেরাইট্ উত্তোলন করা হয় তাহাতে খাঁটি দস্তার পরিমাণ সাধারণতঃ শতকরা ২ হইতে ১২ ভাগ। প্রায়শঃই দস্তা আকরিক সাসা ও রৌপ্য আকরিকের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। সেইজন্য অনেক দেশে একই সঙ্গে দস্তা ও সীসা উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic importance)—মরিচা-ধরা বন্ধ করার জন্য লৌহ ও ইস্পাতের উপর দস্তার পাতলা প্রলেপ লাগানো হয়। এই প্রক্রিয়া গ্যাল্‌ভানাইজিং (Galvanizing) নামে পরিচিত। দস্তা নমনীয় ও ঘাতসহ। ইহা সহজে অন্য ধাতুর সহিত মিশাইয়া সঙ্কর-ধাতু প্রস্তুত করা যায়। এইভাবে পিত্তল, কাঁসা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া নকল সোনা, জার্মান সিল্‌ভার, শুষ্ক তড়িৎকোষ (Dry electric battery), রং, ঔষধ ও রবারের টায়ার নির্মাণেও দস্তা ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing areas)—পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দস্তা উত্তোলিত হইলেও মোট উৎপাদনের শতকরা ৭৫ ভাগ দস্তা আকরিক উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে পাওয়া যায়। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ দস্তা-উৎপাদনকারী দেশ; অবশ্য খনিজ দস্তা-উৎপাদনে এই দেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই দেশের ওক্‌লাহামা, কানসাস্, মিসৌরী, নিউ

জার্সি, ইডাহো, উটা, মন্‌টানা ও আরিজোনা রাজ্যে দস্তা আকরিক উৎপাদিত হয়। **কানাডা** দস্তা আকরিক-উৎপাদনে বর্তমানে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে; বৃটিশ কলম্বিয়া এবং উইনিপেগ হ্রদের উত্তরে অবস্থিত ফ্লিন্ ফ্লন্ প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল। **মেক্সিকোয়** প্রধানতঃ সীসা ও রৌপ্য আকরিকের উপজাত-দ্রব্য হিসাবে দস্তা উৎপাদিত হয়।

ইউরোপে জার্মানী, পোল্যাণ্ড, ইটালি ও যুগোশ্লাভিয়ায় প্রচুর পরিমাণে দস্তা আকরিক উত্তোলিত হয়। জার্মানীর হার্জ পর্বত (Harz mountain) ও পোল্যাণ্ডের সাইলেশিয়া অঞ্চলে দস্তা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া রাশিয়া, স্পেন ও সুইডেনেও দস্তা পাওয়া যায়। **অস্ট্রেলিয়ার** নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান সীসা ও দস্তা আকরিকের ভাণ্ডার রহিয়াছে। জাপান এবং পেরুও দস্তা উৎপাদন করিয়া থাকে। **ভারতে** রাজস্থান ও কাশ্মীরে সামান্য পরিমাণ দস্তা আকরিক পাওয়া যায়।

পৃথিবীর মোট খনিজ দস্তা-উৎপাদন—৩০ লক্ষ মেঃ টন (১৯৬৪)

কানাডা	৬ লক্ষ ৭৬ হাঃ মেঃটন	জাপান	২ লক্ষ ১৬ হাঃ মেঃটন
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৫ „ ১৯ „	পঃ জার্মানী	২ „ ৩ „
অস্ট্রেলিয়া	৩ „ ৬৪ „	ফ্রান্স	১ „ ৯৪ „
মেক্সিকো	২ „ ৪৩ „	পোল্যাণ্ড	১ „ ৫১ „

Source—U. N. O.-Monthly Bulletin of Statistics, April, 1965.

দস্তা আকরিক হইতে খাঁটি দস্তা নিষ্কাশনের জন্য প্রচুর শক্তি ও উচ্চ শ্রেণীর কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রে দস্তাখনির নিকট নিষ্কাশন-যন্ত্র স্থাপন না করিয়া ভোগকেন্দ্রের নিকট করা হইয়াছে। বৃটেনে দস্তাখনি নাই। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর কারিগর ও শক্তির কোন অভাব না থাকায় অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে দস্তা আকরিক আমদানি করিয়া এখানে খাঁটি দস্তা উৎপাদন করা হয়। বেলজিয়ামে খুব সামান্য পরিমাণে দস্তা আকরিক উৎপাদিত হয়। কিন্তু মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে দস্তা আকরিক আমদানি করিয়া এই দেশ প্রচুর ধাতব দস্তা উৎপাদন করে। অন্যান্য প্রধান ধাতব দস্তা-উৎপাদনকারী দেশ হইল মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, পশ্চিম জার্মানী, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি।

সীসা (Lead)

যে খনিজ পদার্থ হইতে প্রধানতঃ সীসা পাওয়া যায় তাহার নাম গ্যালেনা (Galena)। সীসা সাধারণতঃ দস্তা ও রৌপ্যের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। সীসার সঙ্গে অল্প পরিমাণে স্বর্ণ, অ্যান্টিমনি, তাম্র প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। প্রয়োজনীয়তা হিসাবে ধাতব পদার্থের মধ্যে লৌহের পরেই সীসার স্থান। সীসা অল্প উত্তাপেই গলিয়া যায় এবং ইহাকে সহজেই বাঁকানো যায়; কিন্তু অ্যাসিডে সীসা নষ্ট হয় না। ইহা দামেও সস্তা। সেইজন্য বিভিন্ন কার্যে সীসা ব্যবহার করা হয়। তড়িৎকোষে সীসা ব্যবহৃত হয়। নর্দমা, গ্যাস, জল প্রভৃতির জন্য যে নল ব্যবহৃত হয়, তাহার অধিকাংশই সীসা দ্বারা প্রস্তুত হয়। মোটর ও বিমানপোত নির্মাণে সীসার প্রয়োজন হয়। মুদ্রণশিল্পে, বন্দুকের গুলি, কীটনাশক ঔষধ, কেব্‌ল ও রং-প্রস্তুতে ও বাদ্যযন্ত্রাদি-নির্মাণে সীসা ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Producing areas)—উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে অধিকাংশ সীসা পাওয়া যায়।

পৃথিবীর মোট খনিজ সীসা-উৎপাদন—২০ লক্ষ ১০ হাজার মেট্রিক টন (১৯৬৪)

মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	২ লক্ষ ৫৭ হাজার মেঃ টন	মেক্সিকো	১ লক্ষ ৭৬ হাঃ মেঃটন
অস্ট্রেলিয়া	৩ „ ৯১ „ „ „	যুগোস্লাভিয়া	১ „ ৮ „
কানাডা	১ „ ৮৬ „ „ „	বুলগেরিয়া	৮৮ „

Source—U. N. O.-Monthly Bulletin, March, 1965.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রধান সীসা-উৎপাদক দেশ। যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরী রাজ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী সীসা পাওয়া যায়। এখানে খনি হইতেই বিশুদ্ধ সীসা উত্তোলিত হয়। ইহা ছাড়া ওক্‌লাহামা, কানসাস্‌, ইডাহো, উটা, মন্‌টানা, কলোরাডো, আরিজোনা, নেভাডা ও নিউ মেক্সিকো রাজ্যে সীসা পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সীসা উৎপাদিত হইলেও আভ্যন্তরীণ চাহিদা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় প্রায়ই বিদেশ হইতে সীসা আমদানি করিতে হয়। **মেক্সিকোর** চিহুয়াহুয়া, জাকাটেকাস্‌ এবং সান লুই পোটসি অঞ্চলে খনিজ সীসা উত্তোলিত হয়। এখানকার খনিসমূহ

বহুলাংশে মার্কিন মূলধনের দ্বারা পরিচালিত হয়। **কানাডার** মোট সীসা উৎপাদনের শতকরা ৯৫ ভাগ বৃটিশ কলম্বিয়া প্রদেশে পাওয়া যায়। ইউরোপে **পশ্চিম জার্মানী** প্রধান সীসা-উৎপাদক দেশ। ইহা ছাড়া **স্পেনের** লেনারেস্-ক্যারলিনায়, **যুগোশ্লাভিয়ার** ট্রেপকা এবং স্ট্যানট্রাগে, **ইটালির** সার্ডিনিয়া দ্বীপে, **রাশিয়ার** ককেশাস্, কাজাকস্তান ও পূর্ব সাইবেরিয়ায়, **গ্রেট বৃটেন** ও **সুইডেনে** সীসা উত্তোলিত হয়। **অস্ট্রেলিয়ার** নিউ সাউথ ওয়েল্স ও কুইন্সল্যাণ্ডে, জাপান ও ব্রহ্মদেশেও সীসা পাওয়া যায়। ভারতে সীসার উৎপাদন নগণ্য।

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য (Trade)—অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, স্পেন প্রধানতঃ সীসা রপ্তানি করিয়া থাকে এবং বৃটেন, জার্মানী, জাপান, ভারত ও পাকিস্তান সীসার প্রধান আমদানিকারক দেশ।

রাং (Tin)

বিভিন্ন আকরিক হইতে রাং নিষ্কাশিত হয়; ইহাদের মধ্যে ক্যাসিটেরাইট (Cassiterite) প্রধান। রাং বায়ু-নিরোধক (Air-tight) এবং ইহাতে মরিচা ধরে না বলিয়া ইহা ইস্পাত ও লোহার পাতের উপর প্রলেপ লাগাইবার কাজে ব্যবহৃত হয়। রাং-এর প্রলেপ-লাগানো লৌহ ও ইস্পাত আমাদের দেশে 'ঢেউ-টিন' নামে গৃহ-নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। রাং-এর প্রলেপ-লাগানো কৌটা ও বাক্স (যাহা সাধারণ কথায় 'টিনের-কৌটা' ও 'টিনের-বাক্স' নামে পরিচিত) ফল, তরি-তরকারি, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি এবং ঔষধ ইত্যাদি সংরক্ষণ করিবার কাজে ব্যবহৃত হয়। রাং-এর সহিত তামা মিশাইয়া ব্রোঞ্জ, সীসা মিশাইয়া সোল্ডার (Solder), তামা ও অ্যান্টিমনি মিশাইয়া ব্যাবিট মেটাল (Babit metal), তামা ও দস্তা মিশাইয়া কাঁসা প্রস্তুত করা হয়। সীসার পাতলা পাতের উপর রাং-এর প্রলেপ দিয়া সিগারেট ও চকোলেট মুড়িবার জন্য একপ্রকার রূপালী কাগজ প্রস্তুত করা হয়।

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে তামা, নিকেল, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার যত দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে, রাং-এর ব্যবহার তত দ্রুত বৃদ্ধি পায় নাই; সেইরূপ ঘটিলে হয়তো পৃথিবীতে তীব্র রাং-দুর্ভিক্ষ দেখা দিত।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Producing areas)—যে সকল দেশে খনিজ রাং পাওয়া যায়, সেই সকল দেশে সাধারণতঃ রাং-জাত দ্রব্য প্রস্তুত

হয় না। কারণ এই দেশগুলিতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া ওঠে নাই। মোট উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ রাং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে পাওয়া যায়.

পৃথিবীর মোট রাং-উৎপাদন—১ লক্ষ ৪১ হাজার মেঃ টন

(১৯৬৪)

মালয়	৭০ হাঃ ৯ শত মেঃ টন	থাইল্যাণ্ড	১৫ হাঃ ৮ শত মেঃ টন
বলিভিয়া	২৪ „ ৩ „ „	কঙ্গো	১০ „ ১ „ „
ইন্দোনেশিয়া	১৬ „ ৫ „ „	নাইজিরিয়া	৮ „ ৭ „ „

Source—U. N. O. Monthly Bulletin of Statistics, March, 1965.

মালয়—পৃথিবীর রাং-এর মোট উৎপাদনের শতকরা ৩৮ ভাগ উৎপাদন করিয়া মালয় পৃথিবীতে **প্রথম** স্থান অধিকার করে। এই দেশের পেরাক, সেলাঙ্গর এবং নেগ্রি সেম্বিলান প্রভৃতি অঞ্চলে অধিকাংশ রাং পাওয়া যায়। এখানকার রাং-এর খনিসমূহ বৃটিশ-মালিকানায় রহিয়াছে। সেইজন্য ইংরেজগণ রাং-এর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। **ইন্দোনেশিয়া** রাং-উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই দেশের বাঁকা, বিলিটন ও সিঙ্‌কেপ দ্বীপে অধিকাংশ রাং পাওয়া যায়। রাং-উৎপাদনে দক্ষিণ আমেরিকার **বলিভিয়ার** স্থান দ্বিতীয়। আফ্রিকার **কঙ্গো** প্রজাতন্ত্রে প্রচুর রাং পাওয়া যায়। চীনের ইউনান ও কোয়াংসি অঞ্চলে, ব্রহ্মদেশের ট্যাভয় ও মৌচি অঞ্চলে এবং নাইজেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী, পর্তুগাল, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে রাং উৎপন্ন হয়। ভারতে রাং-এর উৎপাদন অতি নগণ্য।

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য (Trade)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাং-আমদানিতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া বৃটেন ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ রাং আমদানি করিয়া থাকে। মালয়, ব্রহ্মদেশ, কঙ্গো, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যাণ্ড প্রধানতঃ রাং রপ্তানি করিয়া থাকে।

অভ্র (Mica)

অ-ধাতব খনিজ পদার্থসমূহের মধ্যে অভ্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। খনির মধ্যে অভ্র স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। অভ্রের পাতলা পাত ছাড়াইয়া ব্যবহার

করা হয়। অভ্র তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী (non-conductor)। বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে, পদার্থবিদ্যার যন্ত্রপাতিতে, মোটর-গাড়ী ও বিমানপোতে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। অভ্র-ভস্ম ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অভ্রের গুঁড়া হইতে 'সামিকা' নামে কৃত্রিম অভ্রখণ্ড প্রস্তুত করা হয়। প্রতিমার সাজে, অলঙ্কারে, প্রচণ্ড তাপযুক্ত চুল্লীর জানালা-নির্মাণে, তাপ-রক্ষক প্রলেপ-প্রস্তুতে এবং রং-প্রস্তুতেও অভ্র ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Producing areas)—ভারত অভ্রের সর্বপ্রধান উৎপাদক। প্রকৃতপক্ষে অভ্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের একাধিপত্য বিরাজমান; পৃথিবীর মোট রপ্তানির শতকরা ৬০ ভাগ শুধু ভারত হইতে হয়। অভ্রের খনিগুলি প্রধানতঃ বিহার, অন্ধ্র, রাজস্থান ও মাদ্রাজ রাজ্যে অবস্থিত। ভারতের খনিজ সম্পদ অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। ব্রেজিল ও মাদাগাস্কার অভ্র-উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী, জাপান, রাশিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশেও অল্প পরিমাণে অভ্র পাওয়া যায়।

পৃথিবীর অভ্র-উৎপাদন (১৯৫৯-৬০)

ভারত	১১,৩৩০ মেঃ টন	মাদাগাস্কার	৮০০ মেঃ টন
ব্রেজিল	৮০০ „	কানাডা	৬১০ „

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য (Trade)—ভারত অধিকাংশ অভ্র **রপ্তানি** করে। **আমদানিকারক** দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও বৃটেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্নাবলী

1. "The discovery of minerals and precious metals has often given impetus to the development of a country." Discuss this statement with special reference to North America and Australia.

• উঃ—'খনিজ সম্পদ' (১৪৩ পৃঃ—১৪৬ পৃঃ) হইতে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের 'উত্তর আমেরিকা'র (১২৩ পৃঃ—১২৪ পৃঃ) ও অস্ট্রেলিয়ার খনিজ সম্পদ (২০১ পৃঃ—২০৩ পৃঃ) হইতে সাজাইয়া লিখ।

2. Discuss about the industrial importance of Iron-ore. Name the countries who are producing this mineral and the countries who are famous for its exports.

উঃ—'লৌহ আকরিক'-এর 'শিল্পগত গুরুত্ব' (১৫৩ পৃঃ—১৫৪ পৃঃ), 'উৎপাদক অঞ্চল' ও 'আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য' (১৫৫ পৃঃ—১৬১ পৃঃ) লিখ।

3. Write short notes on the uses of any four of the following minerals and also state the sources of their supply:—(a) Lead, (b) Tin, (c) Zinc, (d) Copper, (e) Manganese, and (f) Aluminium. [C. U. B. Com. 1955]

উঃ—এই সকল খনিজ পদার্থের শিল্পগত গুরুত্ব ও ব্যবহার এবং উৎপাদক অঞ্চল (১৬১ পৃঃ—১৭৯ পৃঃ) লিখ।

4. What are the commercial mineral fertilizers? What are the sources of their supply? Explain the importance of such fertilizers on the development of agriculture.

উঃ—'খনিজ সার' (১৫০ পৃঃ—১৫২ পৃঃ) লিখ।

5. What are the economic uses of Salt, Chromium, Nickel, Molybdenum, Tungsten, Vanadium and Sulphur? Which countries occupy important position in the production of these minerals?

উঃ—এই সকল খনিজ সম্পদ (১৪৮ পৃঃ, ১৪৯ পৃঃ এবং ১৬৪ পৃঃ—১৬৭ পৃঃ) হইতে লিখ।

6. State the importance of the following metals in the metallurgical industries.: Nickel, Vanadium, Copper and Tungsten. Where are these metals mainly found? Is any one of them found in India?

[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1963]

উঃ—'নিকেল' (১৬৫ পৃঃ), 'ভ্যানাডিয়াম' (১৬৫ পৃঃ), তাম্র (১৬৭ পৃঃ—১৭০ পৃঃ) এবং 'টাংস্টেন' (১৬৬ পৃঃ) লিখ। ভারতে তাম্র উৎপন্ন হয়।

দশম অধ্যায়

শক্তিসম্পদ

(Power Resources)

শক্তি-ব্যবহারের অর্থনৈতিক তাৎপর্য (Economic Significance of Power Utilization)—বিভিন্ন দেশে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মূলতঃ উহার পিছনে রহিয়াছে নূতন নূতন শক্তির উৎস-আবিষ্কার ও উৎপাদনকার্যে তাহার ব্যবহার। পৃথিবীতে তাহার অস্তিত্বের প্রথম পর্বে খাদ্যসংগ্রাহক মানুষ জীবনধারণের জন্য (খাদ্যসংগ্রহ, আত্মরক্ষা ও দূরত্ব অতিক্রমের জন্য) নির্ভর করিয়াছে নিছক নিজের **পেশীশক্তির** উপর। ফলে আশু প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। এই অবস্থায় জীবন ছিল অনিশ্চিত ও কষ্টকর।

দ্বিতীয় পর্বে মানুষ বিভিন্ন পশুকে বশ করিয়া উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করিতে আরম্ভ করে। পেশীশক্তির সহিত পশুশক্তি যুক্ত হয়। কৃষির প্রথম যুগে গাছের ডাল, পাথর কিংবা পশুর হাড় ছুঁচালো করিয়া তাহার দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া বীজ বপন করা হইত। ক্রমে পশুকে ব্যবহার করা হয় চাষের জমি তৈয়ারীর জন্য। দূরত্ব অতিক্রমের জন্য শুধু নিজের পায়ের পেশীর উপর নির্ভর করিবার স্থলে মানুষ ঘোড়া, গরু, গাধা, উট, কুকুর, হরিণ প্রভৃতি পশুর সাহায্য গ্রহণ করিতে থাকে। এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন অনগ্রসর অঞ্চলে পশুবাহিত যানবাহনের প্রাধান্য দেখা যায়। পেশীশক্তির সহিত পশুশক্তি যুক্ত হওয়ায় মানুষের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন-কার্য কম ক্লেশকর হয়। দূরত্ব অতিক্রম ও ভারবহনের কিছুটা সুবিধা হওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাব ও পণ্য বিনিময় আরম্ভ হয়। কিন্তু এই পর্যায়েও মানুষের উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত; ফলে জীবনযাত্রার মানও ছিল অত্যন্ত নিম্ন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথমে ইংল্যাণ্ডে ও ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ক্রমশঃ কয়লা, খনিজ তৈল ইত্যাদি জড়শক্তি ব্যবহারের সূচনা হয়। কয়লার সাহায্যে বাষ্প উৎপাদন করিয়া সেই বাষ্পশক্তি বিরাট

বি...ট যন্ত্রচালনায় নিয়োজিত হইতে থাকে। এই শক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহারের দ্বারা মানুষের জীবনে ও সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এত বড় পরিব...ন সভ্যমানুষের জীবনে ইতিপূর্বে আর হয় নাই। শিল্পবিপ্লবের পূর্বে শত শ... বৎসর ধরিয়া মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি; জমিই ছিল প্রধান সম্পদ। শিল্পোৎপাদন হস্তশিল্পেই সীমাবদ্ধ ছিল। খাদ্যোৎপাদন অঞ্চলের সন্নিকটে শিল্পীর নিজের কুটীরে বা ছোট কারখানায় শিল্পদ্রব্য উৎপাদিত হইত। একই স্থানে কৃষিকার্য ও শিল্পোৎপাদন পাশাপাশি গড়িয়া উঠিত। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য প্রধানতঃ বিলাসদ্রব্য ও ওজন বা আয়তনের তুলনায় অত্যধিক মূল্যের অল্প কয়েকটি পণ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত; ফলে অনুকূল জলবায়ু ও অবস্থানের সুবিধাযুক্ত দেশগুলিই ক্ষমতা ও প্রাচুর্যের অধিকারী ছিল।

উৎপাদনকার্যে শক্তি-ব্যবহারে বিপ্লবের ফলে কয়লা ও লৌহ সম্পদে ভাগ্যবান্ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের উদ্যোগী অঞ্চলগুলিতে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়। জল ও কয়লা হইতে উৎপাদিত কোটি কোটি অশ্বশক্তির নিকট পেশীশক্তি ও পশুশক্তি তুচ্ছ হইয়া যায়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থলে **শক্তিচালিত যন্ত্রসমন্বিত বৃহদায়তন কল-কারখানা** গড়িয়া উঠিতে থাকে। কৃষির স্থলে শিল্পই মানুষের প্রধান জীবিকায় পরিণত হয়। খাদ্যোৎপাদন অঞ্চলের পরিবর্তে শক্তি-উৎপাদন অঞ্চলেই (কয়লাখনি অঞ্চলে) কল-কারখানা গড়িয়া উঠিতে থাকে। বাষ্পীয় রেল-ইঞ্জিন ও বাষ্পীয় পোত আবিষ্কারের ফলে **যাতায়াত-ব্যবস্থায়** আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। দ্রুতগামী যানবাহনের সাহায্যে অতি সহজেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়া থাকে। কারখানাজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানির জন্য এবং বৃহদাকার শিল্প-কলকারখানার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও কারখানা-শহরের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য **বাণিজ্যের** পরিমাণও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। শিল্প-বিপ্লব ও যাতায়াত-ব্যবস্থায় বিপ্লবের সাথে সাথে **কৃষিব্যবস্থায়**ও আমূল পরিবর্তন ঘটে। কারখানা ও কারখানা-শহরের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এবং যাতায়াতের সুবিধার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চল, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় নূতন কৃষি-উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে, অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আনা হইয়াছে। গ্রেট বৃটেন,

জার্মানী প্রভৃতি পুরানো দেশে, যেখানে অনাবাদী জমি বিরল, যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন এবং উন্নত বীজ, সার প্রভৃতি প্রয়োগের দ্বারা উৎপাদন ব[illegible]গুণ বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে। ফসলের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন [illegible]লে আঞ্চলিক ভৌগোলিক পরিবেশের উপযোগী একটিমাত্র ফসল উৎ[illegible]দনের উপর ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে কিউবায় ইক্ষু, ব্রেজিলে কফি, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনায় গম এবং মালয়ে রবার-চাষের প্রচলন হইয়াছে। জড়শক্তি আবিষ্কৃত ও উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত [illegible]য়ায় বৃহদাকার উৎপাদন (Large-scale production), শ্রমবিভাগ (Division of labour), শ্রম-বিশেষীকরণ (Specialisation of labour) ও স্থানগত বিশেষীকরণের (Regional specialisation) দ্বারা উৎপাদনকার্যে আমূল পরিবর্তন ঘটানো হইয়াছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে, যেমন **রাজনৈতিক শক্তির উৎস** জমি হইতে কারখানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও তেমনি শিল্পসম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলির হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

কায়িক শ্রম অথবা পশুশক্তি হইতে জড়শক্তি (কয়লা, খনিজ তৈল ইত্যাদি) অনেক বেশী সুবিধাজনক ও সুলভ। পশু বা শ্রমিকের সাহায্যে, তাহা যত বেশী-সংখ্যকই হউক না কেন, শব্দের চেয়ে দ্রুতগতি বিমান বা পনের বিশ হাজার টনের দ্রুতগামী জাহাজ চালানো কোনদিনই সম্ভব নয়। কোন শ্রমিক বা পশু যন্ত্রের মতো না থামিয়া চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করিতে পারে না। উৎপাদনকার্যে **খরচই** প্রধান নিয়ামক। যন্ত্রের তুলনায় পশু ও কায়িক শ্রমের মূল্য অনেক বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে এক-অশ্বশক্তি পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় ১ হইতে ৪ সেণ্ট মূল্যে। কিন্তু এক ঘণ্টার জন্য একটি ঘোড়ার মূল্য দিতে হয় ১০০ সেণ্ট এবং একজন শ্রমিকের নিকট হইতে এক-অশ্বশক্তির পরিমাণ কাজ পাইতে হইলে তাহাকে দিতে হয় ১০০০ সেণ্ট। গড়পড়তা হিসাবে জড়শক্তির তুলনায় পশুশক্তির খরচ ৩০ হইতে ১০০ গুণ এবং কায়িক শ্রমের খরচ ৩০০ হইতে ১০০০ গুণ বেশী। এই কারণেই যন্ত্র অপ্রতিহত গতিতে শুধু কায়িক ও পশুশক্তির স্থানই গ্রহণ করিতেছে না, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে উহা ক্রমে ক্রমে মানুষের মানসিক শ্রমের ভারও লাঘব করিতেছে; কম্পটোমিটার, ডিক্টোফোন প্রভৃতি তাহার উদাহরণ।

জড়শক্তি ও যন্ত্র ব্যবহারের ফলে মানুষের মাথাপিছু উৎপাদন-ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়াছে এবং **উৎপাদন-খরচ** কমিয়াছে। কিন্তু জড়শক্তি ও যন্ত্রের সুবিধা নিছক অশ্বশক্তির বা টাকার অঙ্কে পরিমাপ করিলে চলিবে না। মানুষের অধিকাংশ শ্রমের ভার নিজের উপর লইয়া যন্ত্র মানুষের জীবনে যে অবসর ও চিন্তাশক্তি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে সভ্যতার অগ্রগতির পথে তাহাই সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ।

বিভিন্ন শিল্প-শক্তিসম্পদের তুলনা (Comparison of Different Sources of Industrial Power)—বর্তমান পৃথিবীতে প্রধান তিনটি **শক্তির-উৎস হইল** কয়লা, খনিজ তৈল ও জলপ্রবাহ। যুক্তরাষ্ট্রে মোট শক্তি-উৎপাদনের শতকরা ৮৭ ভাগ আসে কয়লা, খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস হইতে, ৭ ভাগ আসে জলপ্রবাহ হইতে এবং ৬ ভাগেরও কম আসে পশুশক্তি ও কায়িক শ্রম হইতে। ইতিহাসের দিক দিয়া মানুষ প্রথম ব্যবহার করিতে শুরু করে কয়লা, তাহার পর খনিজ তৈল এবং ইদানীং জলপ্রবাহ হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ। প্রাকৃতিক গ্যাস ও সুরাসারও ব্যবহৃত হইতেছে। পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারও শুরু হইয়াছে। অদূরভবিষ্যতে সমুদ্রস্রোত ও সূর্যশক্তিও ব্যবহৃত হইতে পারে।

অধিকাংশ শিল্পের ক্ষেত্রেই শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত **কয়লার** পরিমাণ ও ওজন প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পরিমাণ ও ওজনের তুলনায় বেশী। ফলে কয়লা কাঁচামালের নিকট লইয়া যাওয়া অপেক্ষা কাঁচামাল কয়লাখনির নিকট লইয়া আসা অপেক্ষাকৃত সুলভ। এই কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করিয়া বৃটেনে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে কয়লাখনি অঞ্চলেই শিল্প-কলকারখানা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ইহার ফলে অত্যন্ত ঘন লোকবসতিপূর্ণ শিল্প-শহরগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং অর্থসম্পদ নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কয়েকটি শিল্পে (যেমন ইস্পাত) কয়লা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

বর্তমানে অবশ্য বিভিন্ন দেশে শিল্পের বিকেন্দ্রীভবনের উপর ঝোঁক দেখা যায়। শিল্পক্ষেত্রে খনিজ তৈল ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলেই এই **বিকেন্দ্রীভবন** সহজসাধ্য হইয়াছে। **খনিজ তৈল** তরল পদার্থ বলিয়া পাম্প করিয়া বহুদূরবর্তী অঞ্চলে সহজে ও অল্পখরচে লইয়া যাওয়া যায়। এইজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৈলখনি অঞ্চল শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয় নাই। কয়লা বা জলপ্রবাহ

হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া ৪৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত অতি সহজেই ল[illegible] যাওয়া যায়। সুতরাং কয়লাখনি বা জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্রের [illegible]কট শিল্প-স্থাপনের কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

বর্তমান যুগে **জলবিদ্যুৎ** শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। ইহার উ[illegible]পাদন-খরচ অত্যন্ত কম। ইহার ব্যবহারের ফলে শিল্পের উৎপাদন-খরচ[illegible] কমিয়া যায়। তাই বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র হইতে বহুদূরে লইয়া যাওয়া [illegible]য়। অন্যান্য শক্তিসম্পদের তুলনায় ইহার পরিবহণ-খরচ সামান্য। যে স[illegible] দেশে কয়লা বা খনিজ তৈলের অভাব পরিলক্ষিত হয়, সেখানে জ[illegible]বিদ্যুতের সাহায্যে শিল্প গড়িয়া তোলা সম্ভব। যেমন, জাপান, ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ শিল্প জলবিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। এই বিদ্যুৎ-ব্যবহারের ফলে শিল্পকেন্দ্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে উৎপাদনকার্যে **পারমাণবিক শক্তি**-ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে। ইহা সফল হইলে শিল্পের বিকেন্দ্রীভবন দ্রুততর ও ব্যাপকতর হইবে। নূতন নূতন শক্তির উৎস আবিষ্কার ও ব্যবহারের ফলে মানুষের মোট ধন-উৎপাদনের ক্ষমতাই শুধু বৃদ্ধি পায় নাই, বিভিন্ন দেশের সমস্ত অংশের সমান উন্নতি ও ধনবণ্টনে অধিকতর সাম্য-প্রতিষ্ঠার সুযোগ হইয়াছে।

কয়লা (Coal)

আধুনিক শিল্পের প্রধান উপাদান (A Prime factor of modern Industry)—বর্তমান পৃথিবীতে শক্তির প্রধান প্রধান উৎস হইতেছে কয়লা, খনিজ তৈল, জলপ্রবাহ, প্রাকৃতিক গ্যাস, পারমাণবিক শক্তি ও কাষ্ঠ। ইদানীং খনিজ তৈল ও জলবিদ্যুতের গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এখনও পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে পৃথিবীতে কয়লাই তাপ ও **শক্তির সর্বপ্রধান উৎস**। কয়লা হইতে যে কোক প্রস্তুত হয় ইস্পাত-উৎপাদনে তাহা প্রয়োজন। লৌহ ও ইস্পাত ব্যতীত আধুনিক যন্ত্রপাতি বা রেলগাড়ী, জাহাজ ইত্যাদি নির্মাণ সম্ভব নয় এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থা ও রেলগাড়ী, জাহাজ ইত্যাদি ছাড়া আধুনিক যাতায়াত-ব্যবস্থার কথা চিন্তাই করা যায় না। লৌহ ও কয়লা আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার প্রধান দুই স্তম্ভ।

ট আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিটুমিনাস্-জাতীয় কয়লাকে কোক-চুল্লীতে (Coke Oven) রাখিয়া কোক প্রস্তুত করিবার সময় গ্যাস, আলকাতরা, পিচ, স্যাকারিন, অ্যামোনিয়াক্যাল লিকর, ন্যাপথালিন, ক্রিয়োসোট, গন্ধক প্রভৃতি **উপজাত-দ্রব্য** পাওয়া যায়। কয়লার গ্যাস শহর আলোকিত করে। ইহা জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। আলকাতরা গৃহনির্মাণে এবং পিচ রাস্তা নির্মাণে প্রয়োজন হয়। স্যাকারিন অত্যন্ত মিষ্ট এবং ইহা চিনির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। অ্যামোনিয়াক্যাল লিকর হইতে নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত হয়। ন্যাপথালিন কীট-নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়োসোট ঔষধ-প্রস্তুতে প্রয়োজন হয়। কয়লা হইতে রং এবং বিস্ফোরক সামগ্রীও পাওয়া যায়। কৃত্রিম তৈলও কয়লা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা খনিজ তৈলের পরিবর্ত-সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মোট কথা, শত শত রাসায়নিক দ্রব্য কয়লা হইতে প্রস্তুত করা যায়। এইজন্য কয়লা বর্তমানে রাসায়নিক শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল হিসাবে বিবেচিত হয়। জলবিদ্যুৎ, খনিজ তৈল, পারমাণবিক শক্তি প্রভৃতির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ও নূতন শক্তির উৎস আবিষ্কৃত হওয়ায় ভবিষ্যতে শক্তির উৎস হিসাবে কয়লার গুরুত্ব হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, রাসায়নিক শিল্পের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসাবে কয়লার গুরুত্ব প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইবে। অধিকাংশ শিল্পে প্রয়োজনীয় কয়লার পরিমাণ ও ওজন, প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পরিমাণ ও ওজনের তুলনায় অধিক। ফলে বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করিয়া অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে কয়লাখনি অঞ্চলেই **শিল্প-কারখানা কেন্দ্রীভূত** হইয়াছে। কিন্তু ইদানীং উৎপাদন-কার্যে খনিজ তৈল ও জলবিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কয়লা ব্যবহারের পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটায় শিল্পের একদেশীভবনে কয়লাখনির প্রভাব হ্রাস পাইতেছে। ফলে ক্রমেই শিল্প-কারখানা কয়লাখনি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত না হইয়া দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিভিন্ন দেশে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে শিল্পোন্নয়ন ও শিল্প-সংস্থাপনে এই বিকেন্দ্রীভবন একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

কয়লার শ্রেণীবিভাগ (Classification of Coal)—ভূগর্ভে চাপ ও তাপের ক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদ্‌দেহ কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে। এইভাবে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে জলাভূমি অঞ্চলের অরণ্য মাটি ও বালির নীচে চাপা পড়িয়া বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সঞ্চিত কয়লা-সম্পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু সমস্ত কয়লায় কার্বনের অংশ, জলীয় বাষ্প ও বিভিন্ন উদ্‌বায়ী পদার্থের (Volatile matters) পরিমাণ সমান নহে। সেইজন্য সকল কয়লা পোড়াইলে একই পরিমাণে উত্তাপ সৃষ্টি হয় না। কয়লার কাঠিন্য অনুযায়ী এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্বনের অংশ, জলীয় বাষ্প ও উদ্‌বায়ী পদার্থের পরিমাণ অনুযায়ী ইহাকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

(ক) **লিগ্‌নাইট** (Lignite) সর্বাপেক্ষা নরম ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা; ইহার রং বাদামী। এইজাতীয় কয়লায় জলীয় বাষ্প ও উদ্‌বায়ী পদার্থের পরিমাণ সর্বাধিক ও কার্বনের অংশ সর্বাপেক্ষা কম থাকে। ফলে এই কয়লার তাপসৃষ্টির ক্ষমতা সবচেয়ে কম। দাম কম ও সহজেই গুঁড়া হইয়া যায় বলিয়া এই কয়লা খনি হইতে বহুদূরে লইয়া ব্যবহার করা লাভজনক নহে। পৃথিবীর মোট লিগ্‌নাইট উৎপাদনের শতকরা [illegible] ভাগ জার্মানীতে পাওয়া যায়। অবশিষ্টাংশের বেশীর ভাগ রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরীতে উৎপাদিত হয়। জার্মানীতে লিগ্‌নাইট হইতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমাইয়া ফেলিয়া ও উহার তাপ-উৎপাদন-ক্ষমতা দ্বিগুণ করিয়া ব্রিকেট (Briquette) তৈয়ারী হয়। এই ব্রিকেট গৃহস্থালির কাজে ও কল-কারখানায় জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। লিগ্‌নাইট হইতে তৈল, আলকাতরা, গ্যাস এবং মোমও প্রস্তুত হইয়া থাকে। লিগ্‌নাইটের উপর ভিত্তি করিয়া জার্মানীতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

(খ) **অ্যানথ্রাসাইট** (Anthracite) কয়লা লিগ্‌নাইটের ঠিক বিপরীত। সমস্ত শ্রেণীর কয়লার মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা কঠিন; ইহার রং চক্‌চকে কালো; কার্বনের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ এবং জলীয় বাষ্প ও উদ্‌বায়ী পদার্থের পরিমাণ খুব সামান্য; এই কয়লায় আগুন ধরিতে দেরী হয়; কিন্তু একবার ধরিলে বহুক্ষণ ধরিয়া প্রচণ্ড তাপ **বিকিরণ** করে। ধোঁয়া, গ্যাস ও ছাই খুব সামান্য হয়। পৃথিবীর মোট অ্যানথ্রাসাইট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক রাশিয়া, এক-চতুর্থাংশেরও বেশী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অবশিষ্ট প্রায় সবটাই গ্রেট বৃটেন, বেলজিয়াম ও ইন্দোচীনে উৎপাদিত হয়।

(গ) **বিটুমিনাস্** (Bituminous)—লিগ্‌নাইট ও অ্যানথ্রাসাইটের মাঝামাঝি হইল বিটুমিনাস্ কয়লা। অবশ্য কার্বন, জলীয় বাষ্প ও উদ্‌বায়ী পদার্থের পরিমাণ অনুযায়ী নানাশ্রেণীর বিটুমিনাস্ দেখিতে পাওয়া যায়। যে বিটুমিনাসে জলীয় বাষ্প ও উদ্‌বায়ী পদার্থের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম ও

-প্রতি তাপ-উৎপাদনের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী, বাষ্পীয় পোতে জ্বালানি হিসাবে তাহার চাহিদা সর্বাপেক্ষা বেশী। অন্যদিকে যে বিটুমিনাসে উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ বেশী তাহার তাপ-উৎপাদন-ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম হইলেও, গ্যাস উৎপাদনের জন্য এবং রাসায়নিক শিল্পের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য-উৎপাদনে তাহা বিশেষভাবে উপযোগী। কোক-উৎপাদনেও বিটুমিনাস্ কয়লা ব্যবহৃত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন ও জার্মানী এই চারিটি দেশ সমবেতভাবে পৃথিবীর মোট বিটুমিনাস্ উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

পৃথিবীর অনেক স্থানে উদ্ভিদ্‌দেহের কয়লায় রূপান্তর এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এই ধরনের আংশিক গঠিত কয়লা **পীট** (Peat) নামে পরিচিত। ইহা নরম ও বাদামী রঙের হয়। ইহা হইতে সামান্য তাপ পাওয়া যায়। জার্মানী, পোল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে পীট গৃহস্থালির কাজে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে ব্যাপকভাবে শিল্পকার্যে পীটের ব্যবহার একমাত্র রাশিয়ায় হইয়া থাকে। ঐ দেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা ১৮·৫ ভাগ পীট হইতে উৎপাদিত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing areas)—পৃথিবীতে মোট কি পরিমাণ **সঞ্চিত** (Reserves) কয়লা রহিয়াছে তাহা এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। তবে এ পর্যন্ত যে সকল হিসাব করা হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে বলা যাইতেপারে যে, পৃথিবীতে অ্যান্‌থ্রাসাইট্ ও বিটুমিনাস্ শ্রেণীর প্রমাণিত ও সম্ভাব্য সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ যথাক্রমে ৬২,২৪০ ও ৫,৫৩,৫৩০ কোটি মেট্রিক টন এবং সঞ্চিত লিগ্‌নাইট এবং বাদামী কয়লার প্রমাণিত ও সম্ভাব্য পরিমাণ যথাক্রমে ৪৬,২২০ ও ১,৭২,৫৬০ কোটি মেট্রিক টন। ইহার মধ্যে পৃথিবীর অ্যানথ্রাসাইট্ ও বিটুমিনাস্ কয়লার প্রমাণিত ও সম্ভাব্য মোট সঞ্চয়ের শতকরা ৪০ ভাগ উত্তর আমেরিকায়, ৩৫ ভাগ ইউরোপে, ২০ ভাগ এশিয়ায় এবং বাকি ৫ ভাগ অন্যান্য অংশে সঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর কয়লা-সম্পদের মোট পরিমাণের দিক দিয়া বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ না থাকিলেও উপরের বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্ট যে, অন্যান্য খনিজ সম্পদের ন্যায় পৃথিবীতে কয়লার বণ্টনও অত্যন্ত অসম।

পৃথিবীর মোট কয়লা-উৎপাদন—২৩০ কোটি মেঃ টন
(১৯৬৪)

রাশিয়া	৫৫	কোটি	৪০	লক্ষ	মেঃ টন
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৪৪	”	৬৩	”	”
চীন	৩৪	”	৮০	”	”
বৃটেন	১৯	”	৬৮	”	”
পঃ জার্মানী	১৪	”	২২	”	”
পোল্যাণ্ড	১১	কোটি	৮২	লক্ষ	[illegible]ঃ টন
চেকোশ্লো-ভাকিয়া	৯	”	৭০	[illegible]	” ”
ভারত	৬	”	[illegible]	”	” ”
জাপান	৫	[illegible]	[illegible]৭	”	” ”
ফ্রান্স	৫	”	৩০	”	” ”

Source—U. N. O. Monthly Bulletin of Statistics, March, 1965 (excepting China).

পৃথিবীর কয়লা-উৎপাদক অঞ্চলসমূহ মহাদেশ অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত হইল

ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই কয়লা পাওয়া যায়; ইহার মধ্যে রাশিয়া, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কয়লা-উৎপাদনে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

রাশিয়া* (U. S. S. R.)—কয়লা-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই দেশে প্রচুর পরিমাণে অ্যানথ্রাসাইট্, বিটুমিনাস্, লিগ্‌নাইট ও পীট সঞ্চিত আছে। পৃথিবীর মধ্যে রাশিয়ায় সর্বাপেক্ষা বেশী নথ্রাসাইট্ সঞ্চিত আছে। এই দেশে মোট সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ আনুমানিক ৮,০০,০০০ কোটি মেট্রিক টন অর্থাৎ পৃথিবীর মোট সঞ্চয়ের শতকরা ২৪ ভাগ। রাশিয়ার কয়লাখনিগুলি পূর্বে সাখালিন দ্বীপ হইতে পশ্চিমে মস্কো এবং উত্তরে মেরুবৃত্ত হইতে দক্ষিণে আজব সাগর (Sea of Azov) পর্যন্ত দেশের সমগ্র অংশে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ফলে শিল্পের বিকেন্দ্রীভবনে ও দেশের সকল অংশের সুসমঞ্জস অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুবিধা হইয়াছে। এই দেশের কয়লাখনি অঞ্চলগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ :

(ক) ডোনেৎস্ উপত্যকা বা ডনবাস্—রাশিয়ায় ইহাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়লা অঞ্চল। আজব সাগরের উত্তরে ৩,৮৫০ বর্গ-কিলোমিটার স্থান জুড়িয়া এই কয়লা-অঞ্চল স্ট্যালিনো হইতে পূর্বদিকে ইউক্রেনের দক্ষিণ-পূর্ব

* ইউরোপীয় ও এশীয় রাশিয়ার আলোচনা এখানে একত্রে করা হইল।

শের মধ্যদিয়া ডন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে উচ্চশ্রেণীর বিটুমিনাস্ ও অ্যানথ্রাসাইট্ কয়লা পাওয়া যায়। ইহার নিকটে ক্রিভয় রগ ও কার্চ উপদ্বীপে লৌহ এবং নিকোপোলে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। এই কয়লা, লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজের সমবায়ে ডোনেৎস্ উপত্যকায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। (খ) **মস্কো পর্বত**—এই অঞ্চলের কয়লা নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইলেও ইউরোপীয় রাশিয়ার শিল্পোন্নত অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় ইহার গুরুত্ব অসাধারণ। বিদ্যুৎ-উৎপাদনে এবং মস্কো, টুলা, শোডলস্ক ও নোগিনস্ক-এর শিল্প-কারখানাগুলিতে এই কয়লা ব্যবহার করা হয়। **(গ) পেচোরা উপত্যকা**—রাশিয়ার উত্তর অংশে অবস্থিত এই অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া ভোরকুটা শহরের চতুর্দিকে ইদানীং কয়লা উত্তোলন করা হইতেছে। উত্তরের যাতায়াত-ব্যবস্থা, শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে এই কয়লাখনির গুরুত্ব খুব বেশী। (ঘ) **কুজ্‌নেৎস্ক অঞ্চল বা কুজ্‌বাস্**—মধ্য সাইবেরিয়ার দক্ষিণ অংশে টম্ নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এই অঞ্চল রাশিয়ার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কয়লা-উৎপাদনকারী অঞ্চল। এখানে আনুমানিক ৭৫,০০০ কোটি মেট্রিক টন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা সঞ্চিত আছে। এখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। স্ট্যালিনস্ক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র। (ঙ) **কারাগাণ্ডা অঞ্চল**—কাজাকস্তানে বালখাশ হ্রদের উত্তরে অবস্থিত এই অঞ্চল রাশিয়ার তৃতীয় শ্রেষ্ঠ কয়লা-উৎপাদনকারী অঞ্চল।

রাশিয়ার এশীয় অংশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে কুজ্‌নেৎস্ক ও কারাগাণ্ডার কয়লা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপীয় রাশিয়ার পশ্চিমাংশ জার্মানীর দ্বারা অধিকৃত হইলে কুজ্‌নেৎস্ক-কারাগাণ্ডার শক্তিসম্পদ এবং সেই শক্তিসম্পদের উপর গঠিত শিল্প-কলকারখানা দেশরক্ষায় এবং শত্রু-বিতাড়নে এক অনন্যসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

বৃটেন (U. K.)—কয়লা-উৎপাদনে বৃটেন বর্তমানে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। বৃটেনের কয়লা কোক প্রস্তুত, তাপ ও বাষ্প উৎপাদন এবং শিল্প-কার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বিটুমিনাস্ ও অ্যানথ্রাসাইট্-জাতীয়। মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৩ ভাগ অ্যানথ্রাসাইট্। কোথাও কোথাও কয়লা-খনি লৌহখনির নিকটে অবস্থিত ; ফলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিবার সুবিধা হইয়াছে। অধিকাংশ কয়লাখনিই বন্দরের নিকটে অবস্থিত। রেলপথ ও জলপথে অল্পখরচে কয়লা দেশের যে-কোন অংশে পাঠাইবার সুবিধা

রহিয়াছে। এই দেশে প্রতিবৎসর মোট যত মূল্যের খনিজ পদার্থ উত্তোলিত হয় তাহার শতকরা ৯০ ভাগই কয়লা। এখনও কয়লাই গ্রেট বৃটেনের শিল্প

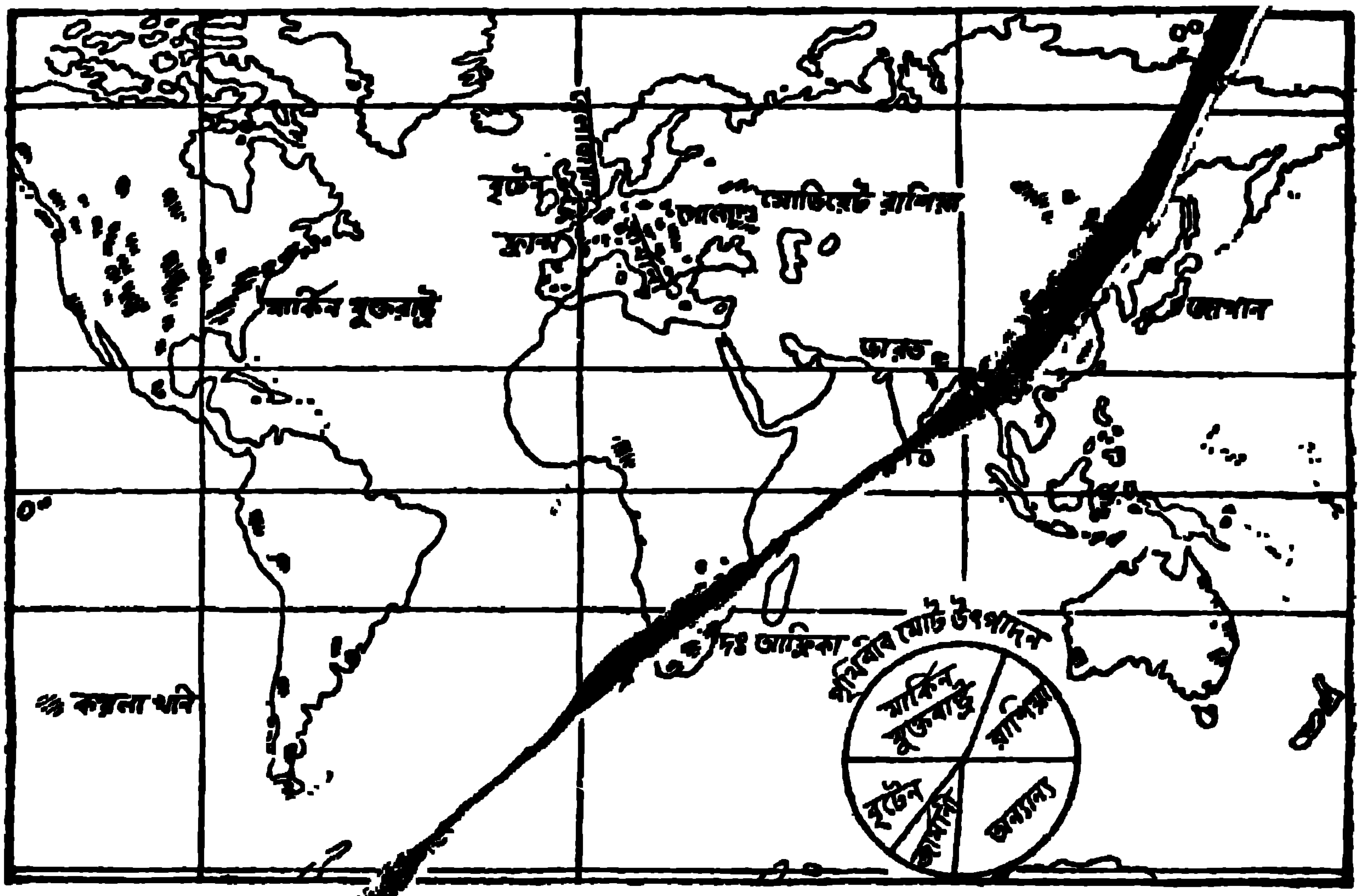

পৃথিবীর কয়লা-উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ

ও বাণিজ্যিক উন্নতির প্রধান ভিত্তি। বৃটেনের কয়লাখনিগুলিকে নিম্নলিখিত তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যাইতে পারে :

(ক) **স্কটল্যাণ্ডের** কয়লাখনিগুলি মিডল্যাণ্ড উপত্যকায় অবস্থিত। পূর্বদিকে মিডলোথিয়ান ও ফাইফ্‌শায়ারের খনি হইতে এডিনবার্গ অঞ্চলের শিল্প-কলকারখানায় কয়লা সরবরাহ করা হয়। পশ্চিমদিকে ল্যানার্ক্‌শায়ার ও আয়ারশায়ারের কয়লাখনিগুলি গ্লাস্‌গো ও ক্লাইড্‌ নদীর তীরে অবস্থিত লৌহ ও ইস্পাত, জাহাজ-নির্মাণ ও বিভিন্ন বয়নশিল্পে কয়লা সরবরাহ করে। (খ) **ইংল্যাণ্ডের** উত্তর ও মধ্য অংশে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পেনাইন পর্বতের দুইদিকে কয়লাখনি রহিয়াছে। পেনাইন পর্বতের পূর্বদিকে নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও ডারহামের কয়লাখনির উপর ভিত্তি করিয়া নিউ ক্যাসল, সাণ্ডারল্যাণ্ড ও টী নদীর মোহনায় শিল্প-কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে; ইয়র্কশায়ার, ডার্বিশায়ার ও নটিংহামশায়ারের কয়লাখনিগুলিকে ভিত্তি করিয়া ব্র্যাডফোর্ড, লীড্‌স, শেফিল্ড, ডার্বি, নটিংহাম প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। পেনাইন পর্বতের পশ্চিমদিকে ল্যাঙ্কাশায়ার ও স্টাফোর্ড-

রর কয়লাখনিগুলিকে ভিত্তি করিয়া প্রেস্টন, ব্ল্যাক্‌বার্ণ, বোল্টন, ম্যাঞ্চেস্টার, লিভারপুল প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। স্ট্যাফোর্ড ও ওয়ারউইকশায়ারের কয়লাখনিগুলি মিলিতভাবে বার্মিংহামের শিল্পসমূহে কয়লা সরবরাহ করে। (গ) **ওয়েল্‌সের** উত্তরে ও দক্ষিণে কয়লাখনি রহিয়াছে। দক্ষিণের খনিগুলিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এইখানেই বৃটেনের অধিকাংশ এ্যান্থ্রাসাইট কয়লা উৎপাদিত হয়। এই কয়লার উপর ভিত্তি করিয়া সোয়ানসীতে টিনপ্লেটিং শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৪৭ সালে গ্রেট বৃটেনের কয়লাশিল্প জাতীয়করণ করা হয়।

ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের কয়লাখনি—(ক) উত্তর ফ্রান্সে ডোভার প্রণালীর উপকূল হইতে শুরু করিয়া একটি দীর্ঘ সংকীর্ণ কয়লা-বলয় জার্মানীর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে; ইহাই ফ্রান্সের সর্বপ্রধান কয়লাখনি অঞ্চল। এখানকার কয়লার উপর ভিত্তি করিয়া লিলির (Lille) শিল্প-কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। বেলজিয়ামের শিল্পসমৃদ্ধিও এই অঞ্চলের কয়লার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। (খ) বেলজিয়ামের উপর ও হল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে আর একটি কয়লা অঞ্চল রহিয়াছে। ইহা ক্যাম্পাইন কয়লাখনি (Campine Coalfield) নামে পরিচিত। (গ) ফ্রান্সের মধ্যবর্তী মালভূমি অঞ্চলেও কতকগুলি কয়লাখনি রহিয়াছে।

জার্মানী—(ক) পশ্চিম জার্মানীর রূঢ় কয়লাখনি অঞ্চল শুধু জার্মানীতে নহে, সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপের মধ্যে এই অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা অধিক কয়লা সঞ্চিত আছে; পশ্চিম ইউরোপের প্রায় কেন্দ্রস্থলে এই অঞ্চল অবস্থিত; ইহার পশ্চিম দিয়া সুনাব্য রাইন নদী প্রবাহিত। এই অঞ্চল বহু খাল ও রেলপথের দ্বারা সমগ্র ইউরোপের সহিত যুক্ত। জার্মানীর সঞ্চিত বিটুমিনাস্ কয়লার শতকরা ৯০ ভাগ এখানে রহিয়াছে। এই কয়লা কোক তৈয়ারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই কয়লার উপর ভিত্তি করিয়া রূঢ় নদীর অববাহিকায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধাতুশিল্প ও রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (খ) ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর সীমান্ত প্রদেশে সার কয়লাখনি অঞ্চল। (গ) পূর্ব জার্মানীর স্যাক্সনীতে ইউরোপের অন্যতম প্রধান লিগ্‌নাইট খনি অবস্থিত। এই কয়লা নিকৃষ্টশ্রেণীর হইলেও এই অঞ্চলের বিরাট রাসায়নিক শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ইহাই ভিত্তি।

পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া—প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর আপার সাইলেশিয়া কয়লাখনি অঞ্চলে পোল্যাণ্ড, জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে বিভক্ত হয়। পোল্যাণ্ডের ভাগেই বৃহদংশ পড়ে। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে পোল্যাণ্ডের মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৭৫ ভাগ এই সাইলেশিয়া কয়লা অঞ্চল হইতে আসিতে থাকে। অবশিষ্ট অংশ ডমব্রোভা পর্যন্ত এবং ক্র্যাকো (Cracow) অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সাইলেশিয়া কয়লা অঞ্চলের যেটুকু জার্মানীর মধ্যে ছিল তাহাও কাড়িয়া লইয়া পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রূঢ় উপত্যকার পরেই আপার সাইলেশিয়া পশ্চিম ইউরোপের সর্ববৃহৎ কয়লাখনি অঞ্চল। চেকোশ্লোভাকিয়ায় কয়েকটি ছোট, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কয়লাখনি রহিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.)—উত্তর আমেরিকা সঞ্চিত কয়লার পরিমাণে সর্বাপেক্ষা বেশী সৌভাগ্যবান্। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একসময় পৃথিবীর মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ উৎপাদন করিত। ইদানীং এখানে খনিজ তৈলের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় কয়লার উৎপাদন কমিয়া যাইতেছে। এই দেশে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলিতে কয়লা উত্তোলন করা হয়:

(ক) **পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের পূর্বাঞ্চল**—এই অঞ্চলের খনিতে পৃথিবীর অন্য যে-কোন খনি অপেক্ষা বেশী অ্যান্থ্রাসাইট্ কয়লা উৎপাদিত হয়।

(খ) **অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চল**—উত্তরে পেনসিলভেনিয়া হইতে দক্ষিণে আলাবামা পর্যন্ত সমগ্র অ্যাপালাচিয়ান পার্বত্য অঞ্চলে বিটুমিনাস্ কয়লা উৎপাদিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের উত্তরাংশে ইস্পাত-নগরী পিট্‌স্‌বার্গের সন্নিহিত কয়লাখনি, পশ্চিম ভার্জিনিয়া রাজ্যের উত্তরাংশ এবং ওহিও কয়লাখনিসমূহ অবস্থিত। ইস্পাতশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কোক-কয়লার দিক দিয়া পশ্চিম জার্মানীর রূঢ় কয়লাখনি এবং উত্তর অ্যাপালাচিয়ানের কনেলসভিলি (Connellsville) কয়লাখনি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পশ্চিম ভার্জিনিয়া রাজ্যের দক্ষিণাংশ, কেণ্টাকির পূর্বাংশ ও ভার্জিনিয়া রাজ্যের খনিগুলি এই অঞ্চলের মধ্যাংশে অবস্থিত। অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলের দক্ষিণাংশে

আলাবামা ও টেনেসি রাজ্যের খনিগুলি অবস্থিত। ইহার মধ্যে শিল্পনগরী বার্মিংহামের চতুর্দিকের খনিগুলিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) **মধ্যভাগের সমতলভূমি**—এই অঞ্চলের পূর্বাংশে কেন্টাকি রাজ্যের পশ্চিমাংশ, ইলিনয় ও ইণ্ডিয়ানা রাজ্যের খনিগুলি এবং পশ্চিমাংশে আইওয়া, মিসৌরী, আরকান্‌সাস্‌, কান্‌সাস্‌ ও ওক্‌লাহামা রাজ্যের কয়লা-খনিগুলি অবস্থিত। চিকাগো-গ্যারির শিল্পসমূহ বর্তমানে এই অঞ্চল হইতেই অধিক কয়লা গ্রহণ করে।

(ঘ) **রকি পর্বত অঞ্চল**—উত্তরে কানাডার সীমান্ত হইতে দক্ষিণে মেক্সিকোর সীমান্ত পর্যন্ত বহু কয়লাখনি এই অঞ্চলে রহিয়াছে। এই অঞ্চলে কলোরাডো রাজ্যেই সর্বাধিক পরিমাণে কয়লা উত্তোলিত হয়।

(ঙ) প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে ও মেক্সিকো উপসাগরের তীরেও কয়লাখনি রহিয়াছে। অবশ্য এই খনিগুলির উৎপাদন সামান্য। ইহা ছাড়া টেক্সাস্‌, মিচিগান ও আলাস্কায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর কিছু কয়লা পাওয়া যায়।

পেনসিলভেনিয়া ও আলাবামা রাজ্যের শিল্পকেন্দ্রগুলি ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর কোথাও কয়লাখনি অঞ্চলে বিশেষ শিল্প-কলকারখানা গড়িয়া উঠে নাই। এই বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পকেন্দ্রগুলির সহিত গ্রেট বৃটেনের শিল্পকেন্দ্রগুলির একটি মূল পার্থক্য দেখা যায়। শেষোক্ত দেশে প্রধানতঃ কয়লাখনি অঞ্চলেই শিল্পের একদেশতা (Localisation) ঘটিয়াছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত নিউ ইংল্যাণ্ড রাজ্যসমূহের এবং ইরি ও মিচিগান হ্রদের তীরে অবস্থিত শিল্পকেন্দ্রগুলি কয়লাখনি হইতে বহুদূরে অবস্থিত। অবশ্য এই সকল কেন্দ্রে অন্যান্য অঞ্চল হইতে কয়লা আনিবার যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে।

কানাডা (Canada)—এই দেশের কয়লাখনিগুলিকে নিম্নলিখিত তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়:—**(ক) নোভাস্কোশিয়া ও নিউ ব্রান্সউইক অঞ্চল**—কানাডার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত এই অঞ্চলের বিটুমিনাস্‌ কয়লা ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের খনিজ লৌহ লইয়া সিডনীর ইস্পাতশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (খ) রকি পর্বত ও মধ্যবর্তী সমভূমির কয়লাখনি অঞ্চল—এই অঞ্চলে প্রধানতঃ লিগ্‌নাইট ও নিম্নশ্রেণীর বিটুমিনাস্‌ কয়লা উত্তোলিত হয়। ইহা রেলপথে ও স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। (গ) প্রশান্ত

মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল—ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপ ও বৃটিশ কলম্বিয়ার পশ্চিম অংশের কয়লাখনিগুলি লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। কানাডায় প্রচুর পরিমাণে কয়লা সঞ্চিত থাকিলেও উৎপাদনের দিক দিয়া এই দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে।

ল্যাটিন আমেরিকা—(মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা) —পৃথিবীর মোট সঞ্চিত কয়লার শতকরা মাত্র ১ ভাগ ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে রহিয়াছে এবং গড়ে পৃথিবীর মোট বাৎসরিক উৎপাদনের শতকরা মাত্র ·৩ ভাগ কয়লা এই দেশগুলিতে উত্তোলিত হয়। ল্যাটিন আমেরিকার ব্রেজিল, চিলি, মেক্সিকো, কলম্বিয়া ও পেরুতে কয়লা উৎপাদিত হয়।

এশিয়া মহাদেশের দেশগুলির মধ্যে চীন, জাপান ও ভারত প্রধান কয়লা-উৎপাদনকারী দেশ।

চীন—চীনে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বিটুমিনাস্ ও অ্যানথ্রাসাইট কয়লা সঞ্চিত রহিয়াছে। প্রায় সমস্ত প্রদেশেই কিছু-না-কিছু কয়লা সঞ্চিত থাকিলেও সঞ্চিত কয়লার প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ উত্তর চীনের শানসি, শেনসি, হোনান এবং কানসু প্রদেশে রহিয়াছে। উত্তরাংশের ফুসুনের কয়লাখনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কয়লাখনিগুলির অন্যতম। এখানে ৪০ হইতে ১২০ মিটার পুরু কয়লার স্তর রহিয়াছে। আনশানের লৌহশিল্পে এই কয়লা ব্যবহার করা হয়। চীনে গত ৮।১০ বৎসরে কয়লার উৎপাদন এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বর্তমানে এই দেশ কয়লা-উৎপাদনে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

ভারত—ভারতে উৎপাদিত কয়লার শতকরা ৯০ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কয়লাখনি হইতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে রাণীগঞ্জ ও বিহারে ঝরিয়ার কয়লাখনি বিখ্যাত। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রেও কয়লা পাওয়া যায়। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর হইতে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাহায্যে ভারতে কয়লা-উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'ভারত' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

জাপান—জাপানের মোট কয়লা উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ কিউসিউ দ্বীপের উত্তরাংশে উত্তোলন করা হয়। অবশিষ্ট কয়লা হোকাইডো ও হনসু হইতে পাওয়া যায়। এখানকার অধিকাংশ কয়লাই নিম্নশ্রেণীর বিটুমিনাস্। জাপান পৃথিবীর অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ হইলেও যথেষ্ট পরিমাণে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার অভাব দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দেশের ধাতুশিল্পের উন্নতির পক্ষে একটি

বাধা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে দেশের প্রয়োজনের এক-দশমাংশ কয়লা আ...রিয়া, ফরমোসা, উত্তর চীন, মাঞ্চুরিয়া, ইন্দোচীন ও কারাফুটো হইতে আমদানি করা হইত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে কয়লার ঘাটতি মিটাইবার জন্য জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে কয়লা আমদানি করিতেছে।

আফ্রিকা—আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে **দক্ষিণ আফ্রিকায়** সর্বাপেক্ষা বেশী কয়লা উত্তোলিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় নাটাল, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের ... বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বিটুমিনাস্ কয়লা ... গিয়াছে। নাটাল প্রদেশের নিউ ক্যাসলে প্রচুর কয়লা উৎপাদিত হয়। এখান হইতে কয়লা জাহাজে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের জন্য ও বিদেশে রপ্তানির জন্য ডারবান বন্দরে লইয়া আসা হয়। ট্রান্সভাল প্রদেশের মিড্‌লবার্গে কয়লা উত্তোলিত হয়। এই কয়লা জোহানেস্‌বার্গ ও র‍্যাণ্ড অঞ্চলের স্বর্ণখনি ও কল-কারখানায় ব্যবহার করা হয়। **রোডেশিয়ায়** প্রচুর কয়লা সঞ্চিত আছে। পশ্চিম আফ্রিকার **নাইজেরিয়া** ও আরও কয়েকটি অঞ্চলে ইদানীং কিছু কিছু কয়লা উত্তোলন করা হইতেছে।

অস্ট্রেলিয়া—অস্ট্রেলিয়ার ছয়টি প্রদেশেই কয়লা পাওয়া গেলেও শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ বিটুমিনাস্ একমাত্র নিউ সাউথ ওয়েল্‌স-এ উৎপাদিত হয়। ইহার মধ্যে আবার নিউ ক্যাসল্, সিডনী, কেমব্লা ও লিথ্‌গো নিকটবর্তী অঞ্চলে অধিকাংশ কয়লা পাওয়া যায়। সিডনীতে ইস্পাতশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ভিক্টোরিয়া প্রদেশের মরওয়েলে যথেষ্ট পরিমাণে লিগ্‌নাইট পাওয়া যায়। এই লিগ্‌নাইটের সাহায্যে মেলবোর্ণ শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে ওয়েস্টপোর্ট ও গ্রে মাউথে কয়লা উত্তোলিত হয়।

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য (Trade)—বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত কয়লার অধিকাংশ আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতেই ব্যয়িত হয়। যে সকল দেশ অধিকমাত্রায় কয়লা উৎপাদন করে কিংবা যে সকল দেশে শিল্পোন্নতি অপেক্ষাকৃত কম তাহারা কিছু পরিমাণ কয়লা বিদেশে রপ্তানি করিতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ও অনতিকাল পরে বৃটেনের কয়লা-রপ্তানি হ্রাস পাইলেও ইদানীং ইহার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে এবং বৃটেন বর্তমানে রপ্তানি-বাণিজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা,

চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়াও কয়লা রপ্তানি করিয়া থাকে। ফ্রান্স, ইটালি, সুইডেন, জাপান ও কানাডা প্রধান আমদানিকারক দেশ।

খনিজ তৈল
(Petroleum)

কয়লার ন্যায় খনিজ তৈল পাললিক শিলাস্তরে দেখিতে যায়, ভূগর্ভে কিরূপে এই তৈল সৃষ্টি হইল সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ ত নহেন। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে সমুদ্রতীরে, হ্রদ বা অঞ্চলে কাদা ও বালির নীচে চাপা পড়া উদ্ভিদ্‌দেহে চাপ, তাপ ও কয়েক শ্রেণীর

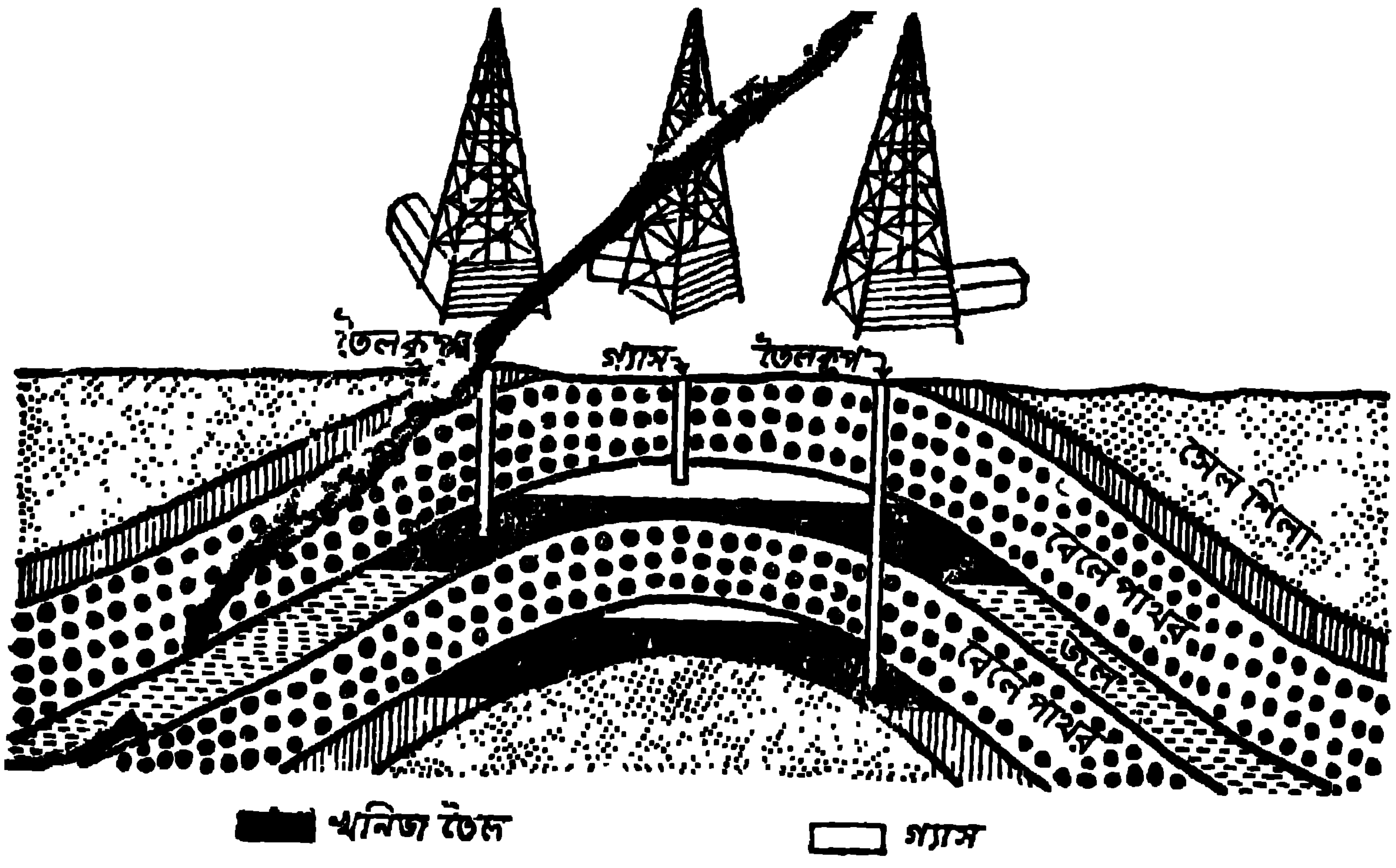

ব্যাক্টিরিয়ার ক্রিয়ার ফলে খনিজ তৈলের সৃষ্টি হইয়াছে। শিলামধ্যস্থ জলের সহিত মিশিয়া এই তৈল একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। ভঙ্গিল শিলাস্তরের ভাঁজে আসিয়া এই তৈল সঞ্চিত হয়। তৈল-সন্ধানকারিগণ নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই তৈলের সন্ধান পান এবং পরে নল বসাইয়া ইহা উত্তোলন করা হয়। শিলাস্তর হইতে সংগৃহীত হয় বলিয়া এই তৈলকে শিলাতৈলও (Rock oil) বলা হয়। খনি হইতে যে তৈল উত্তোলিত হয় তাহা দেখিতে তরল পাঁকের মতো। ইহার রং সাধারণতঃ কালো অথবা ঘোর বাদামী। খনিজ তৈল প্রধানতঃ হাইড্রোজেন ও কার্বনের যৌগিক সংমিশ্রণে গঠিত। ইহা ছাড়া বিজাতীয়

দার্থ (Impurities) হিসাবে হাইড্রোজেন-ঘটিত বিভিন্ন দ্রব্য ও নানাপ্রকার
রা গগন্ধক (Sulphur Compounds) খনিজ তৈলে দেখিতে পাওয়া যায়।
প্যা য়নিক গঠন অনুযায়ী খনিজ তৈলের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এইভাবে
ন্যাপ ফিন ক্ষারক (Paraffin base), অ্যাস্‌ফাল্ট ক্ষারক (Asphalt base),
তৈল দে ক্ষারক (Napthenic base) ও মিশ্র ক্ষারক (Mixed base)
খনি হইতে পাওয়া যায়।

রাসায়নিক প্রা তৈল উত্তোলন করিয়া পাতনযন্ত্রে চুঁয়াইয়া এবং বিভিন্ন
উহার মধ্যে পেট্রো য় শোধন করিয়া বহুসংখ্যক উপজাত-দ্রব্য পাওয়া যায়।
তৈল (Fuel oil), ন গ্যাসোলিন (Petrol or Gasoline), জ্বালানি
(Lubricating oil), অ্যাস্‌বসিন (Kerosene), পিচ্ছিলকারক তৈল
প্যারাফিন (Paraffin) এবং কঠিন বা পিচ (Asphalt), ন্যাপ্‌থা (Naptha),
অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও ব্যবহার (Solid carbon) উল্লেখযোগ্য।
uses)—খনিজ তৈলের অসাধারণ শিল্পগত ও **omic importance and**
শতাব্দীর অবদান হইলেও অতি প্রাচীনকাল হইতে জ্যিক গুরুত্ব বর্তমান
মানুষ খনিজ তৈল ব্যবহার করিতেছে। সুদূর প্রাচীনকা ন-না-কোন ভাবে
সভ্যতার যুগে পাথরের ফাটল দিয়া চুঁয়াইয়া পড়া খনিজ মেসোপটেমিয়ার
বা অ্যাস্‌ফাল্ট দিয়া বিখ্যাত ব্যাবেলের স্তম্ভ (Tower of Baর তলানি
হইয়াছিল। প্রাচীন মিশরে শবদেহে খনিজ তৈল মাখাইয়া সমাধিস্থ গাঁথা
হইত। প্রাচীনকালে ফিনিশীয়গণ সামুদ্রিক বাণিজ্যে উন্নতির চরম শিখরে
আরোহণ করিয়াছিল। অনেকের মতে এই উন্নতির অন্যতম কারণ জাহাজ-নির্মাণে খনিজ তৈলজাত অ্যাস্‌ফাল্ট বা পিচের ব্যবহার। ঔষধ হিসাবে খনিজ তৈলের ব্যবহার প্রাচীনকালে বহুস্থানে প্রচলিত ছিল। মেসোপটেমিয়ার অধিবাসিবৃন্দ এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানগণ দাঁতের ব্যথা, মাথার ব্যথা, বাত প্রভৃতি নিরাময়ের জন্য খনিজ তৈল ব্যবহার করিত। আজও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পা কিংবা হাত মচকাইয়া গেলে কেরোসিন বা পেট্রোল মালিশ করিতে দেখা যায়। মার্কো-পোলোর ভ্রমণকাহিনীতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ককেশাস্‌ পার্বত্য অঞ্চলে অগ্নি-প্রজ্বলনে খনিজ তৈল ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। ইহার কয়েক শতাব্দী পরে কোন কোন স্থানে আলোর প্রদীপে খনিজ তৈল ব্যবহার

করা হইতে থাকে। প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ তৈলের সরবরাহ অপ্রচুর হওয়ায় আলো জ্বালাইবার কাজে খনিজ তৈলের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য হস্তদ্বারা তৈলকূপ খনন করিবার চেষ্টা হয় এবং এইভাবে ব্রহ্মদেশে ও রুমানিয়ায় কিছু কিছু তৈল-কূপ খনন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক তৈলশিল্প গড়িয়া উঠিবার পূর্বেই খনিজ তৈল শোধন করিয়া কেরোসিন ও পিচ্ছিলকারক তৈল উৎপাদন শুরু হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আলো জ্বালাইবার উপযোগী তৈলের অভাব মিটাইবার তাগিদে খনিজ তৈলশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইহার পূর্বে হাজার হাজার বছর ধরিয়া প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল আলো জ্বালাইবার কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে। সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে জলপাই-এর তৈল ব্যবহার করা হইত মাটির প্রদীপে। ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশ ও অন্যান্য স্থানে একই প্রয়োজনে মৎস্যের তৈল, পশুর চর্বি, রেড়ির তৈল প্রভৃতি ব্যবহার করা হইত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিমির তৈলের চাহিদা এত বৃদ্ধি পায় যে, সমুদ্রের বুক হইতে তিমি মাছ নিঃশেষ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। তিমির তৈল এবং স্বাভাবিকভাবে চুয়াইয়া আসা অথবা হাতে খোঁড়া কূপ হইতে প্রাপ্ত খনিজ তৈলের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নততর উপায়ে অধিক পরিমাণে খনিজ তৈল উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করা হইতে থাকে। ইহারই ফলস্বরূপ ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেনসিলভেনিয়ার অন্তর্গত টিটুসভিলিতে কর্নেল ড্রেক সর্বপ্রথম যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ২১ মিটার গভীর তৈল-কূপ খনন করেন। ঐ দিন হইতে খনিজ তৈলশিল্পে নবযুগের সূচনা হয়।

আধুনিক পৃথিবীতে খনিজ তৈলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার **পরিবহণ-শিল্পে**। প্রকৃতপক্ষে মোটর-গাড়ীর আবিষ্কার ও প্রচলন এবং তৈলশিল্পের উন্নতি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মোটর-গাড়ী, মোটর-বাস্, মোটর-ট্রাক, মোটর-সাইকেল ও বিমানপোত পেট্রোলের সাহায্যে চলে। বিমানপোত চালাইবার জন্য অত্যুৎকৃষ্ট শ্রেণীর পেট্রোলের প্রয়োজন হয়। ইদানীং মোটর-বাস্ ও মোটর-ট্রাক-চালনায় ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় এবং বিমানপোত-চালনায় জেট ইঞ্জিন ও গ্যাস টার্বাইন আবিষ্কৃত হওয়ায় এই সকল ক্ষেত্রে পেট্রোলের ব্যবহার কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে।

ডিজেল ইঞ্জিন হালকা আলানি তৈলের সাহায্যে চলে। আলানি তৈলের দাম পেট্রোল অপেক্ষা অনেক কম এবং ইহার অন্যান্য সুবিধাও রহিয়াছে। এইজন্য আজকাল রেলগাড়ী চালানোর জন্যও কয়লার ইঞ্জিনের পরিবর্তে ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহার করা হইতেছে। সামরিক ও বাণিজ্যিক নৌবহর চালানোর জন্যও ক্রমেই কয়লার পরিবর্তে অধিক পরিমাণে খনিজ তৈল ব্যবহার করা হইতেছে। একটি তৈলচালিত জাহাজ পুনর্বার আলানি গ্রহণ না করিয়া সম-আয়তনের কয়লাচালিত জাহাজের তুলনায় তিনগুণ পথ বেশী অতিক্রম করিতে পারে। খনিজ তৈল কয়লার তুলনায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ইহা মজুত রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ। মোট কথা, আধুনিক গতিশীল জীবনে স্থল, জল ও আকাশে প্রচণ্ড গতির সৃষ্টি প্রধানতঃ খনিজ তৈলের সাহায্যে সম্ভব হইয়াছে। সম্ভবতঃ সমগ্র পৃথিবীতে উৎপাদিত খনিজ তৈলের অর্ধেক একমাত্র পরিবহণ-কার্যে ব্যবহৃত হয়।

আধুনিক যাতায়াত-ব্যবস্থার ন্যায় আধুনিক শিল্পও যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। এই **যন্ত্র সচল রাখিবার জন্য** প্রতিনিয়ত **পিচ্ছিলকারক পদার্থের (Lubricants)** প্রয়োজন। খনিজ তৈল পিচ্ছিলকারক পদার্থের সর্বপ্রধান উৎস। খনিজ তৈলজাত পিচ্ছিলকারক পদার্থ ব্যবহারের পূর্বে কল-কারখানায় গরু ও ভেড়ার চর্বি, তিমির তৈল, তিল তৈল, জলপাইয়ের তৈল, রেড়ির তৈল প্রভৃতি ব্যবহার করা হইত। কিন্তু এই সকল পিচ্ছিলকারক পদার্থের যোগান এত সীমাবদ্ধ যে, ব্যাপকহারে পিচ্ছিলকারক পদার্থের যোগান দিবার জন্য খনিজ তৈলের ন্যায় কোন উৎস আবিষ্কৃত না হইলে শিল্পোন্নতির গতি রুদ্ধ হইয়া যাইত। তাহা ছাড়া আধুনিক যন্ত্রের দ্রুতগতি ঘর্ষণে যে তাপ উৎপাদিত হয় উদ্ভিজ্জ বা প্রাণিজ তৈল তাহার পক্ষে উপযোগী নহে। অতি উচ্চে বিচরণকারী বিমানপোতও এইগুলি ব্যবহারের অনুপযোগী। কিন্তু খনিজ তৈলের উপজাত-দ্রব্য হিসাবে প্রাপ্ত পিচ্ছিলকারক তৈল এই সকল কাজের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। যন্ত্রবিজ্ঞান ও কারখানাশিল্পের উন্নতি এবং সভ্যতার অগ্রগতিতে পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবে খনিজ তৈলের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে অতি পরিচিত **কেরোসিন** রন্ধনকার্যে, আলো জ্বালাইবার জন্য ও গৃহে উত্তাপসৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়। ট্রাক্টর-ইঞ্জিনে আলানি হিসাবেও কেরোসিন ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইদানীং বিদ্যুতের ব্যাপক

প্রসারের ফলে আলো জ্বালাইবার কাজে কেরোসিনের ব্যবহার বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। তবে এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন অনগ্রসর অঞ্চলে অন্ধকার দূরীকরণে কেরোসিনই প্রধান অবলম্বন। খনিজ তৈলের রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী ইহা পরিশোধনের পর তলানি হিসাবে কখনও প্যারাফিন বা মোম আবার কখনও অ্যাস্‌ফাল্ট বা পিচ পাওয়া যায়। মোম হইতে মোমবাতি, মোমের কাগজ তৈয়ারী হয়। পিচ রাস্তা-তৈয়ারী ও অন্যান্য কার্যে ব্যবহৃত হয়।

খনিজ তৈল পরিশোধনের সময় যে গ্যাস বাহির হয় তাহা হইতে বুটাডিন (Butadiene), স্টাইরিন (Styrene), টলুল (Toluol), নাইলন সল্ট (Nylon salts) প্রভৃতি নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল রাসায়নিক পদার্থ কৃত্রিম রবার, প্লাস্টিক, বিস্ফোরক দ্রব্য প্রভৃতি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খনিজ তৈল কতখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে তাহা অনেকসময়ে আমরা অনুধাবন করিতে পারি না। খনিজ তৈলের অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। আরও কতকগুলি ব্যবহার রহিয়াছে যেগুলি খুব স্পষ্ট না হইলেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য, কেশতৈল, মলম, ভেসলিন, লিপ্‌স্টিক, কোল্ড ক্রিম প্রভৃতি তৈয়ারীর জন্য কোন-না-কোনরূপ খনিজ তৈল ব্যবহার করা হয়। ঘরের মেঝে, দেওয়ালে ও জানালা-দরজায় যে রং ও বার্নিশ লাগানো হয় তাহা প্রস্তুত করিতে খনিজ তৈলের প্রয়োজন হয়। লাইনোলিয়াম, কার্পেট ও সূতী বস্ত্র উৎপাদনের জন্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে খনিজ তৈল ব্যবহার করা হয়। কালি, ফিল্ম, কীটনাশক ঔষধপত্র প্রভৃতি তৈয়ারীর জন্য খনিজ তৈলের প্রয়োজন হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধ, যাতায়াত-ব্যবস্থা ও মানবজীবনের প্রয়োজনীয় আরও বহু সামগ্রী খনিজ তৈলের উপর সম্পূর্ণভাবে অথবা অংশতঃ নির্ভরশীল।

কয়লার ন্যায় খনিজ তৈলও সঞ্চিত সম্পদ। ইহা তরল পদার্থ বলিয়া একপাত্র হইতে অন্যপাত্রে স্থানান্তরের এবং নলের সাহায্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণের সুবিধা থাকায় কয়লা অপেক্ষা ইহার আমদানি-রপ্তানি-খরচ অনেক কম। কয়লা অপেক্ষা খনিজ তৈলের তাপ-উৎপাদন-ক্ষমতা অধিক। ইহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও বটে। কিন্তু ইহার কতকগুলি অসুবিধাও

। প্রথমতঃ, কি পরিমাণ খনিজ তৈল পৃথিবীতে সঞ্চিত আছে সে সম্বন্ধে কোন সঠিক হিসাব করা এ পর্যন্ত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভূগর্ভে খনিজ তৈলের অবস্থান নির্দেশ করাও কঠিন। বহুদিন পর্যন্ত আন্দাজে ও বিশৃঙ্খল-ভাবে খনিজ তৈলের অনুসন্ধান করা হইত। বর্তমানে অবশ্য বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি এই কার্যে ব্যবহার করা হইতেছে। তৎসত্ত্বেও ভূগর্ভে খনিজ তৈলের অবস্থান নির্দেশের কোন নির্ভুল সূত্র এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ফলে তৈল-অনুসন্ধান অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তৃতীয়তঃ, কোনস্থানে তৈলকূপ খননের পর সেই কূপ হইতে কতদিন পর্যন্ত এবং কি পরিমাণ তৈল পাওয়া যাইবে সে সম্বন্ধে অনেকসময় নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা সম্ভব হয় না। ফলে পৃথিবীর তৈলবাজারে কখনও দেখা দিয়াছে প্রয়োজনাতিরিক্ত বিপুল যোগান, আবার কখনও সৃষ্টি হইয়াছে তৈল-দুর্ভিক্ষের এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যমানেও প্রচণ্ড হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। চতুর্থতঃ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, তৈল উৎপাদন করিয়া শীঘ্র ধনী হইবার লোভে অনিয়ন্ত্রিতভাবে তৈলকূপ খনন করা হইয়াছে। ইহার ফলে বহু অর্থ, শ্রম ও তৈলের অপচয় ঘটিয়াছে। পঞ্চমতঃ, খনিজ তৈল সহজদাহ্য বলিয়া ইহা সঞ্চয় করিয়া রাখিবার ব্যয় অধিক। ষষ্ঠতঃ, অন্যান্য খনিজ পদার্থের ন্যায় ইহার বণ্টনও অত্যন্ত অসম। সর্বশেষে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পৃথিবীর কয়লা-সম্পদ নিঃশেষ হইবার বহুপূর্বেই খনিজ তৈল নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

পৃথিবীর অপরিস্রুত খনিজ তৈল-উৎপাদন—১৩৯ কোটি ৫০ লক্ষ মেঃ টন (১৯৬৪)

মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৩৭ কোটি	৫০ লক্ষ	মেঃ টন	ইরাণ	৬ কোটি	৭৩ লক্ষ	মেঃ টন
রাশিয়া	২২ ”	৪০ ”	”	ইরাক	৫ ”	১১ ”	”
ভেনেজুয়েলা	১৭ ”	৮০ ”	”	কানাডা	৩ ”	৯৭ ”	”
কুওয়েট	১০ ”	৫৯ ”	”	ইন্দোনেশিয়া	২ ”	৩০ ”	”
সৌদি আরব	৮ ”	৫৪ ”	”	মেক্সিকো	১ ”	৭০ ”	”

U. N. O.—Monthly Bulletin, April, 1965 হইতে সংগৃহীত।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing areas)—পৃথিবীতে তিনটি প্রধান তৈল-উৎপাদক অঞ্চল বিদ্যমান: (১) আমেরিকান বলয়, (২) ইউরোপের

রুমানিয়া ও ককেশাস্ পার্বত্য অঞ্চল সমেত মধ্যপ্রাচ্য বলয় এবং (৩) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বলয়। পৃথিবীর মোট খনিজ তৈল উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এবং শতকরা ৩৬ ভাগ রুমানিয়া ও ককেশাস্ পার্বত্য অঞ্চল সমেত মধ্যপ্রাচ্যে উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উৎপাদন অনেক কম।* প্রধান প্রধান তৈল-উৎপাদক অঞ্চল মহাদেশ অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত হইল :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—খনিজ তৈল-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান অধিকার করে। এখানে নিম্নলিখিত সাতটি অঞ্চলে তৈল পাওয়া যায় :—

(ক) অ্যাপালাচিয়ান পর্বতমালা—উত্তরে নিউ ইয়র্ক রাজ্য হইতে দক্ষিণে টেনেসি পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় তৈল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের পেনসিলভেনিয়ায় বহু পুরাতন খনি আছে। একসময়ে এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৯৫ ভাগ তৈল পাওয়া যাইত। বর্তমানে ইহার উৎপাদন অনেক কমিয়া গিয়াছে। (খ) ইলিনয় ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইণ্ডিয়ানা অঞ্চল—এখানে মোট উৎপাদনের শতকরা ৩ ভাগ তৈল উৎপন্ন হয়। (গ) লিমা-ইণ্ডিয়ানা অঞ্চল—বৃহৎ হ্রদসমূহের দক্ষিণে অবস্থিত ওহিও এবং ইণ্ডিয়ানা রাজ্যে প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে লিমা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তৈলকেন্দ্র। (ঘ) মধ্য-মহাদেশীয় অঞ্চল—এই অঞ্চলে কানসাস্, ওক্লাহামা ও উত্তর টেক্সাসে প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। বর্তমানে এই অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী তৈল পাওয়া যায়। (ঙ) উপসাগরীয় অঞ্চল—মেক্সিকো উপসাগরের নিকটবর্তী টেক্সাস্ ও লুইসিয়ানায় প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। (চ) রকি পর্বত অঞ্চল—এখানে সঞ্চিত তৈলের পরিমাণ অধিক হইলেও উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। এই অঞ্চলে উইয়োমিং ও কলোরাডো রাজ্যে অধিক তৈল পাওয়া যায়। (ছ) ক্যালিফোর্ণিয়া অঞ্চল—এই অঞ্চলের তৈলখনি লস্ এঞ্জেল্স্ হইতে সান্ জোয়াকিন উপত্যকার দক্ষিণাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে লস্ এঞ্জেল্স্ প্রধান তৈলকেন্দ্র।

একসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অধিকাংশ তৈল উৎপাদন করিত। কিন্তু রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের তৈলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় তৈলের আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া আধিপত্য ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। নিজেদের তৈলখনি ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে অনেক তৈলখনির মালিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিয়ঁ,

স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো ও নিউ ইয়র্ক বন্দর মারফত অধিকাংশ খনিজ তৈল বিদেশে রপ্তানি হয়।

মেক্সিকো—এখানে উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। ট্যামাপিকো ও টুস্ক্‌পান বন্দর মারফত তৈল রপ্তানি হইয়া থাকে। ১৯৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত তৈলখনিগুলি প্রধানতঃ মার্কিন ও বৃটিশ মূলধনের সাহায্যে পরিচালিত হইত। ঐ বৎসর তৈলসম্পদ জাতীয়করণ করা হয়। ফলে বৈদেশিক মূলধন ও কারিগরের অভাবে তৈল-উৎপাদন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইদানীং অবশ্য এই অঞ্চলের তৈল-উৎপাদন ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে।

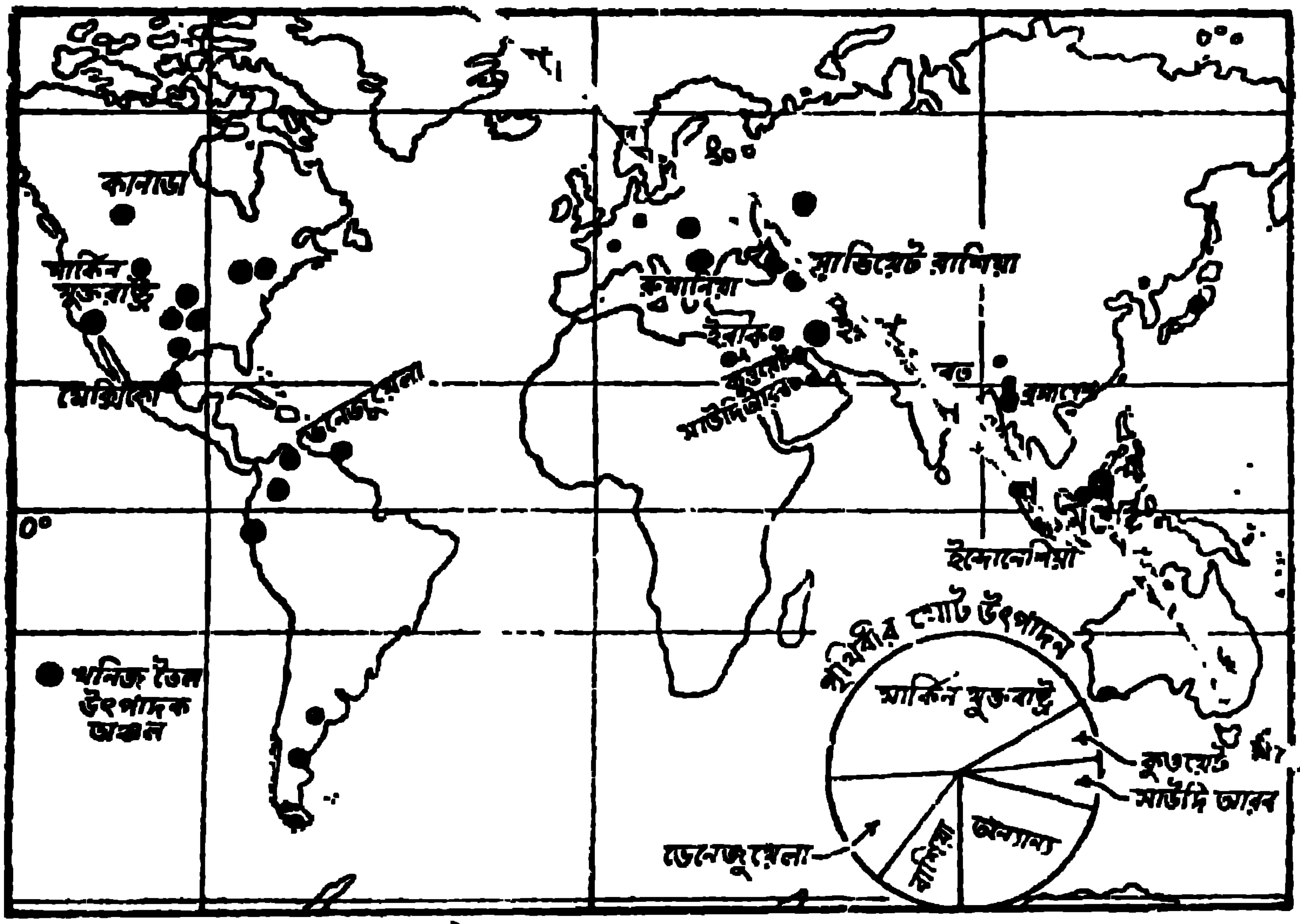

কানাডা—আলবার্টা প্রদেশের এডমনটনের নিকট লেডাক ও টার্ণার উপত্যকা হইতে প্রচুর তৈল উত্তোলিত হয়। ইহা ছাড়া অণ্টারিও প্রদেশেও তৈল পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আমেরিকা—দক্ষিণ আমেরিকার **ভেনেজুয়েলায়** সর্বাপেক্ষা অধিক তৈল উৎপাদিত হয়। সমগ্র পৃথিবীতে খনিজ তৈল-উৎপাদনে ভেনেজুয়েলা তৃতীয় স্থান এবং খনিজ তৈল-রপ্তানিতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এখানে ম্যারাকাইবো হ্রদের সন্নিকটে প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। তৈলখনিগুলি মার্কিন ও বৃটিশ মূলধনের দ্বারা পরিচালিত হয়। লা গুয়েরা

ও পোর্টো ক্যাবেলো বন্দর মারফত এখানকার তৈল রপ্তানি হয়। ভেনেজুয়েলা ব্যতীত দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া, ব্রেজিল, ইকুয়েডর, পেরু, আর্জেন্টিনা ত্রিনিদাদ, চিলি ও বলিভিয়ায় খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

মধ্যপ্রাচ্য—সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে সর্বাধিক পরিমাণ খনিজ তৈল সঞ্চিত আছে। মধ্যপ্রাচ্যে তৈলশিল্প সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক মূলধনের উপর নির্ভরশীল। মার্কিন, বৃটিশ, ডাচ ও ফরাসী মূলধনের দ্বারা এই অঞ্চলের তৈলখনি ও তৈল-শোধনাগারগুলি পরিচালিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে **কুওয়েট** (Kuwait) রাজ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক তৈল উৎপাদিত হয়। তৈল-উৎপাদনে সমগ্র পৃথিবীতে এই দেশের স্থান চতুর্থ। মার্কিন ও বৃটিশ মালিকানায় তৈলকূপগুলি পরিচালিত হয়। অনেকের মতে সমগ্র পৃথিবীতে কুওয়েট রাজ্যেই সর্বাধিক পরিমাণে খনিজ তৈল সঞ্চিত আছে। কুওয়েট ও সৌদি আরবের সীমানায় দুইটি তথাকথিত নিরপেক্ষ অঞ্চল (Neutral zone) রহিয়াছে। এখানে প্রচুর তৈল উত্তোলিত হয়।

সৌদি আরব খনিজ তৈল উৎপাদনে পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। এই দেশের হাসা প্রদেশে প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। তৈলখনিগুলি মার্কিন ব্যবসায়ীগণের দ্বারা পরিচালিত হয়। রাস টনুরায় (Ras Tanura) একটি তৈল-শোধনাগার স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ অপরিস্রুত তৈল নলযোগে বেহরিণ দ্বীপে অবস্থিত শোধনাগারে লইয়া যাওয়া হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তৈল রপ্তানির সুবিধার জন্য বহু অর্থব্যয়ে ১০৬৮ মাইল দীর্ঘ নল স্থাপন করিয়া সৌদি আরবের তৈলখনিগুলিকে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত লেবাননের সিডন বন্দরের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে।

খনিজ তৈল-উৎপাদনে **ইরাণ** পৃথিবীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। গুরুত্বপূর্ণ তৈলখনিগুলি বখতিয়ারি পর্বতের দক্ষিণদিকে একটি ক্ষুদ্র এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। মসৃজিদ-ই-সুলেমান, লালি, আখা-জারি, নাফ্‌ট-ই-সাফিদ, হাফ্‌ট্‌ কেল ও গাচ্‌-সরণ উল্লেখযোগ্য তৈল-উৎপাদন-কেন্দ্র। এই সকল কেন্দ্র হইতে অপরিস্রুত তৈল নলযোগে আবাদানের বিখ্যাত তৈল-শোধনাগারে লইয়া আসা হয়। ১৯৫১ সালে ইরাণের তৈল-উত্তোলন শিল্পের জাতীয়করণের ফলে উৎপাদন সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। **ইরাক** তৈল-উৎপাদনে সপ্তম স্থান অধিকার করে। কারকুক ও খানাকিন অঞ্চলে তৈলখনিগুলি অবস্থিত। কারকুক হইতে তৈল নলযোগে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী লেবাননের ত্রিপলি

বন্দরে এবং প্যালেস্টাইনের হাইফা বন্দরে নীত হয় এবং জাহাজযোগে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। সৌদি আরবের পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত **কাতার (Qutar)** উপদ্বীপ ও পারস্য উপসাগরে অবস্থিত সৌদি আরবের সন্নিহিত ক্ষুদ্র **বেহরিন দ্বীপেও** প্রচুর তৈল উত্তোলিত হয়।

উত্তর আফ্রিকার **মিশর** ও **আলজেরিয়ায়** তৈল পাওয়া যায়। আলজেরিয়ার তৈল-উৎপাদন দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে।

ইউরোপ—সমগ্রভাবে ইউরোপ খনিজ তৈলসম্পদে দরিদ্র। একমাত্র রাশিয়া ও রুমানিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে তৈল উৎপাদিত হয়। ইহা ছাড়া পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, ইটালি, হল্যাণ্ড ও যুগোশ্লাভিয়ায় কিছু পরিমাণ খনিজ তৈল উত্তোলিত হয়।

রাশিয়া—খনিজ তৈল-উৎপাদনে রাশিয়া বর্তমানে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এখানকার অধিকাংশ তৈল ট্রান্স-ককেশাস্ অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত বাকু, ককেশাস্ পর্বতের উত্তরে অবস্থিত **গ্রজনী** ও **মাইকপ** প্রধান তৈলকেন্দ্র। বাকু সর্বাপেক্ষা বেশী তৈল উৎপাদন করে। বাকু হইতে কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত বাটুম বন্দরে নলযোগে তৈল আনীত হয়। গ্রজনী ও মাইকপের তৈলখনি হইতে কৃষ্ণসাগরতীরস্থ তুয়াপ সে বন্দরে নলযোগে তৈল পাঠানো হয়। **ইউরাল** রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈল-উৎপাদক অঞ্চল। এই অঞ্চলের উৎপাদন ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে এবং শীঘ্রই ইহা ট্রান্স-ককেশাস্ অঞ্চলের সমকক্ষ হইবে বলিয়া অনুমান হয়, উফা ইউরাল অঞ্চলের প্রধান তৈলকেন্দ্র। এইজন্য উফাকে **'দ্বিতীয় বাকু'** (Second Baku) বলা হয়। ইহা ছাড়া উজবেক, কাজাকস্তান ও সাখালিন দ্বীপে তৈল পাওয়া যায়। বাটুম ও তুয়াপ্ সে বন্দর মারফত অধিকাংশ তৈল রপ্তানি করা হয়।

রুমানিয়া পৃথিবীর প্রাচীনতম তৈল-উৎপাদক দেশগুলির অন্যতম। এই দেশের তৈলখনিসমূহ কার্পাথিয়ান পর্বতমালার পূর্বদিকে অবস্থিত। প্লোস্টি প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—ইন্দোনেশিয়ার জাভা, বোর্ণিও ও সুমাত্রায় এবং মালয়েশিয়ার অন্তর্গত **সারাওয়াক** ও বৃটিশ-অধিকৃত **ব্রুনেই** অঞ্চলে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার **ইন্দোনেশিয়া** সর্বপ্রধান তৈল-উৎপাদনকারী অঞ্চল। **ব্রহ্মদেশের** ইরাবতী নদীর উপত্যকায় এবং

রামরীতে, পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তানে, জাপানের হনসু দ্বীপে এবং ভারতের আসাম ও গুজরাটে তৈল পাওয়া যায়। (ভারতের খনিজ তৈলসম্পদ 'ভারত' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে) চীন, ফরমোসা, জাপান ও সাখালিন দ্বীপেও অল্প পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

তৈলখনির **মালিকানার** ও **পরিচালনার** দিক দিয়া পৃথিবীর তৈল-উৎপাদক দেশগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউরোপের দেশগুলিতে প্রধানতঃ স্থানীয় উদ্যোগে ও মূলধনের সাহায্যে তৈলখনি আবিষ্কার ও তৈলখনি পরিচালিত হয়। (২) কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তৈলশিল্প প্রধানতঃ বৈদেশিক মূলধন ও ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বৈদেশিক মূলধনের প্রধান অংশীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের পুঁজি-পতিগণ। ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডেরও কিছু অংশ আছে। অবশ্য জাপান, মেক্সিকো, বলিভিয়া, ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনার তৈলখনিগুলি এই দিক দিয়া কিছুটা ব্যতিক্রম। দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশগুলিতে শুধু যে স্থানীয় মূলধন ও কারিগরের অভাব রহিয়াছে তাহা নহে, এই সকল দেশ অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত হওয়ায় খনিজ তৈলের স্থানীয় চাহিদাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তৈলসম্পদ আধুনিক জীবনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত তৈল-সম্পদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণাধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও রাশিয়া মাত্র এই পাঁচটি দেশের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। পৃথিবীর অধিকাংশ খনিজ তৈলের ব্যবহারও এই দেশগুলি করিয়া থাকে।

খনিজ তৈলশিল্প (Petroleum Industry)—কয়লার সহিত খনিজ তৈলের একটি মৌলিক পার্থক্য হইল অধিকাংশ কয়লা যে অবস্থায় খনি হইতে উত্তোলন করা হয় প্রায় সেই অবস্থায় বিক্রয় করা হয়; কিন্তু খনি হইতে তৈল উত্তোলন করিয়া প্রথমে **পরিশোধনাগারে (Refinery)** লইয়া যাওয়া যায়। সেখানে নানারূপ প্রক্রিয়ার সাহায্যে অপরিস্রুত তৈল হইতে পেট্রোল, কেরোসিন, গ্যাস তৈল, জ্বালানি তৈল, পিচ্ছিলকারক তৈল, মোম প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়। নিত্য নূতন আবিষ্কার ও প্রযুক্তিবিদ্যার (Technology) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খনিজ তৈলজাত বিভিন্ন সামগ্রীর চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। একসময়ে কেরোসিনের

চাহিদা ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু গ্যাস ও বিদ্যুতের আবিষ্কারের ফলে কেরোসিনের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে। অনুরূপভাবে মোটর-গাড়ী ও বিমান-পোতের ব্যাপক প্রচলনের ফলে পেট্রোলের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পোন্নতি ও কল-কারখানার প্রসারের ফলে পিচ্ছিলকারক তৈলের চাহিদাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইদানীং ডিজেল ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে মোটর-ট্রাক ও মোটর-বাস্ পেট্রোলের পরিবর্তে জ্বালানি তৈলের সাহায্যে চালানো হইতেছে। খনিজ তৈলজাত বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত তাল রাখিবার জন্য তৈল-পরিশোধনের নূতন ও উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইতেছে, নূতন নূতন উপজাত-দ্রব্য বাহির করা হইতেছে এবং উৎপাদন-খরচও হ্রাস পাইতেছে। বর্তমানে খনিজ তৈলের বিভিন্ন উপজাত-দ্রব্যের উপর ভিত্তি করিয়া ব্যাপক ও জটিল রাসায়নিক শিল্প (Petro-chemical Industry) গড়িয়া উঠিতেছে।

ক্ষুদ্রবৃহৎ নানা আকারের তৈল-পরিশোধনাগার দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকসময় কোন নির্দিষ্ট এলাকার তৈল শোধন করিবার জন্য সাময়িকভাবে ক্ষুদ্রাকৃতির শোধনাগার গড়িয়া তোলা হয় এবং সেই এলাকার তৈল নিঃশেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শোধনাগারটিও উঠিয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ তৈলের ইতিহাসে এইরূপ বহু সাময়িক তৈল-শোধনাগার গঠিত ও অবলুপ্ত হইতে দেখা যায়। আবার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থায়িভাবে বৃহদাকার তৈল-শোধনাগারও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত আবাদান, ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত আরুবা ও কুরাকাও দ্বীপে এইরূপ বৃহদাকার স্থায়ী শোধনাগার দেখিতে পাওয়া যায়।

তৈল-শোধনাগারের অবস্থান প্রধানতঃ নির্ভর করে (১) তৈলকূপের অবস্থান, (২) বাজার বা ভোগকেন্দ্রের অবস্থান এবং (৩) যাতায়াত-ব্যবস্থার উপর। এমন স্থানে শোধনাগার স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে বাজার পর্যন্ত খনিজ তৈলজাত বিভিন্ন দ্রব্য পৌঁছাইবার খরচ সর্বাপেক্ষা কম হয়। অবশ্য উল্লিখিত তিনটি বিষয় ব্যতীত সামরিক, রাজনৈতিক ও আইন-ঘটিত কারণের দ্বারাও অনেকসময় তৈল-শোধনাগারের অবস্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে। প্যালেস্টাইন, বেহরিণ ও সৌদি আরবে সামরিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তৈল-শোধনাগার স্থাপন করা হইয়াছে। অনেকসময় খনিজ তৈল-উত্তোলনকারী দেশের সরকার আইন করিয়া নিজদেশে

শোধনাগার-স্থাপন বাধ্যতামূলক করিয়া থাকেন। আবার অনেকসময় পরিশোধিত তৈল আমদানি নিষিদ্ধ করিয়া আমদানিকারক দেশে শোধনাগার-স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়।

আধুনিক তৈলশিল্প প্রচুর মূলধন লইয়া বৃহদাকারে গঠিত হয়। এই শিল্প সরকারী মালিকানায় অথবা বে-সরকারী মালিকানায় পরিচালিত হইতে পারে। সরকারী মালিকানায় তৈলশিল্প রাশিয়া ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশে এবং আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বে-সরকারী মালিকানায় তৈলশিল্প পরিচালিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে। ভারতের তৈলশিল্পে সরকারী ও বে-সরকারী মালিকানার সহাবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। বে-সরকারী মালিকানায় তৈলশিল্প ব্যক্তিগত মালিকানায় অথবা বৃহৎ যৌথ কোম্পানী বা কর্পোরেশনের মালিকানায় পরিচালিত হইতে পারে। বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত মালিকানায় তৈলশিল্প পরিচালিত হইতে দেখা যায়। তবুও কম্যুনিস্ট দেশসমূহের বাহিরে তৈলশিল্পের অধিকাংশই বৃহদাকৃতি যৌথ কোম্পানী বা কর্পোরেশনের দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রতিটি কোম্পানীর অধীনে তৈলশিল্পের সমস্ত বিভাগ অর্থাৎ খনি হইতে তৈল-উত্তোলন, তৈল-পরিশোধন, তৈল-পরিবহণ, বিক্রয় এবং গবেষণাকার্য পরিচালিত হইয়া থাকে। আজকাল কোন কোন কোম্পানী ইহার সহিত কৃত্রিম রবার প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক কারখানাও স্থাপন করিয়াছে। কোন কোন কোম্পানী তৈলশিল্পের সমস্ত বিভাগ পরিচালনা না করিয়া কোন একটি, দুইটি বা তিনটি বিভাগ পরিচালনা করিয়া থাকে।

বিশ্বের ঘটনাবলীতে খনিজ তৈলের স্থান (Petroleum in World Affairs)—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে খনিজ তৈল গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। বাণিজ্যের কাজ হইল কোন জিনিস যেখানে পাওয়া যায় সেখান হইতে যেখানে প্রয়োজন সেখানে লইয়া যাওয়া। ইতিপূর্বে খনিজ তৈল-উৎপাদক অঞ্চলের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীর মোট খনিজ তৈল উৎপাদনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি হইতে পাওয়া যায়। অথচ এই সকল দেশ অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত বলিয়া ইহাদের খনিজ তৈলের চাহিদা অতি সামান্য। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলি

শিল্পোন্নত বলিয়া এই সকল দেশে খনিজ তৈলের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। অথচ ইহাদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও রুমানিয়া ব্যতীত আর সমস্ত দেশে খনিজ তৈল মোটেই পাওয়া যায় না অথবা প্রয়োজনের তুলনায় খুব সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। এই কারণে খনিজ তৈলের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সকল দিক দিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, খনিজ তৈলের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দুইটি স্তর বা ধাপ রহিয়াছে: (১) একদেশে খনি হইতে অপরিস্রুত তৈল উত্তোলন করিয়া অন্যদেশে অবস্থিত শোধনাগারে প্রেরণ করা এবং (২) একদেশ হইতে পরিস্রুত তৈল অন্যদেশে রপ্তানি করা।

ইরাকের কারকুক ও মসুলের তৈলখনি হইতে অপরিস্রুত তৈল নলযোগে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে অবস্থিত তৈল-শোধনাগারে পাঠানো হয়। ভেনেজুয়েলার ম্যারাকাইবো হ্রদ ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে অপরিস্রুত তৈল জাহাজযোগে ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত আরুবা ও কুরাকাও দ্বীপ, কানাডা, ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। এইভাবে একদেশ হইতে অন্যদেশে অপরিস্রুত তৈল প্রেরণ করাকে আমরা ঠিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আখ্যা দিতে পারি না। কারণ সাধারণভাবে কোন পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মালিকানা একদেশের নাগরিকের নিকট হইতে অন্যদেশের নাগরিকের নিকট হস্তান্তরিত হয়। ভারত হইতে মিশরে ১,০০০ গাঁট বস্ত্র রপ্তানির অর্থ হইল ঐ ১,০০০ গাঁট বস্ত্রের মালিকানা ভারতের কোন নাগরিকের নিকট হইতে মিশরের কোন নাগরিকের নিকট হস্তান্তরিত হইবে। কিন্তু অপরিস্রুত তৈল একদেশ হইতে অন্যদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে এইরূপ কোন মালিকানার পরিবর্তন ঘটে না। ভেনেজুয়েলার যে তৈলখনি হইতে অপরিস্রুত তৈল প্রেরণ করা হইতেছে তাহার মালিক কোন মার্কিন কোম্পানী। এই তৈল আরুবা এবং কুরাকাও দ্বীপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত যে শোধনাগারে লইয়া আসা হইতেছে তাহার মালিকও কোন মার্কিন কোম্পানী এবং এই সকল কোম্পানী মালিকানা, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির দিক দিয়া পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে না। তৈলের মালিকানা একই থাকিতেছে, কেবল ইহা স্থানান্তরিত হইতেছে। অবশ্য উপরোক্ত উদাহরণ হইতে একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিস্রুত তৈলের ক্রয়-বিক্রয় কখনই হয় না। মেক্সিকোতে তৈলশিল্প সরকারী মালিকানায়

পরিচালিত। কোন বৎসরে অপরিস্রুত তৈল-উৎপাদন এই দেশের তৈল-শোধনাগারগুলির ক্ষমতার অতিরিক্ত হইলে, বাড়তি অপরিস্রুত তৈল স্বভাবতঃই অন্য দেশের নিকট বিক্রয় করা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে অন্যান্য খনিজ পদার্থের ন্যায় খনিজ তৈলের বণ্টনও অত্যন্ত অসম এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে সীমাবদ্ধ। সাহারার দক্ষিণে অবস্থিত আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, রুমানিয়া ও রাশিয়া ব্যতীত সমগ্র ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়া তৈলসম্পদে অত্যন্ত দরিদ্র, অথচ খনিজ তৈলের ব্যবহারের নির্ভর করে শিল্পোন্নতি ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির উপর। ফলে উত্তর আমেরিকায় ও ইউরোপে তৈলের চাহিদা সর্বাধিক ভারত ও চীনেও ইহার চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা ছাড়া অপরিস্রুত তৈল-উৎপাদনকারী দেশগুলি ক্রমেই নিজেদের দেশে পরিশোধনাগার স্থাপনের উপর জোর দিতেছে। এই সকল কারণে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ হইতে পরিস্রুত ও অপরিস্রুত উভয় প্রকার তৈল ইউরোপ, বিশেষ করিয়া উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনেই, মালয়েশিয়া (সারাওয়াক) ও ব্রহ্মদেশ হইতেও উভয় প্রকার তৈল রপ্তানি করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতেও বিভিন্ন তৈলজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে খনিজ তৈল—খনিজ তৈল আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ। অনেকে মন্তব্য করিয়াছেন যে, আধুনিক যুদ্ধ তৈলের জন্য, তৈলের সাহায্যে পরিচালিত হয়। তৈলের জন্য না হউক আধুনিক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে তৈলসম্পদের প্রয়োজন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আধুনিক যুদ্ধের অন্যতম প্রধান অবলম্বন বিমানপোত চালিত হয়,খনিজ তৈলের সাহায্যে। পদাতিক বাহিনীর ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী, মোটর-ট্রাক, মোটর-সাইকেল প্রভৃতির জন্য তৈলের প্রয়োজন। আধুনিক রণতরী তৈলের সাহায্যে চালিত হয়। আধুনিক মহাসমর পৃথিবীর কোন একটি অংশে সীমাবদ্ধ থাকে না; সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সমরাঙ্গনে সময়মতো সৈন্য ও রসদ পৌঁছাইয়া দিতে না পারিলে যুদ্ধজয় অসম্ভব। অথচ এই সরবরাহ-ব্যবস্থা বহুলাংশে খনিজ তৈলের উপর নির্ভর করে। যুদ্ধসামগ্রী যে সকল কল-কারখানায় প্রস্তুত হয় সেগুলি চালনার জন্য খনিজ তৈলজাত

বিভিন্ন দ্রব্যের প্রয়োজন। যুদ্ধজয়ের জন্য বে-সামরিক ব্যবস্থা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু বে-সামরিক উৎপাদন ও যাতায়াত-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার জন্য খনিজ তৈলের প্রয়োজন হয়। সমস্ত দিক দিয়াই **আধুনিক যুদ্ধে খনিজ তৈলের গুরুত্ব অসাধারণ।** এইজন্য বিভিন্ন দেশ বিশেষ করিয়া বৃহৎ শক্তিবর্গ নিজদেশে কি পরিমাণ খনিজ তৈল উৎপাদিত হইতেছে, দেশের মধ্যে অবস্থিত তৈল-শোধনাগারগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা কত, কি কি তৈলজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয়, প্রয়োজন হইলে এই উৎপাদন কত সময়ের মধ্যে কি পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব, অন্য কোন্ কোন্ দেশ হইতে কি পরিমাণ তৈল আমদানি করা যাইতে পারে, সেই দেশগুলি কোথায় ও কতদূরে অবস্থিত, তাহাদের তৈলশিল্পের উপর কতটা নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এই সকল বিষয় সম্পর্কে সদা-সতর্ক ও তৎপর।

খনিজ তৈলের ন্যায় যে সামগ্রী কোন দেশের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার পক্ষে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ এবং যাহার সরবরাহ সীমাবদ্ধ ও বণ্টন অসম তাহাকে লইয়া যে প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কয়লা-চালিত জাহাজ অপেক্ষা তৈল-চালিত জাহাজের দক্ষতা অনেক বেশী। এই কারণে ১৯০৭ খ্রীঃ হইতে বৃটিশ রণতরীগুলি কয়লার পরিবর্তে তৈলের সাহায্যে চালাইবার ব্যবস্থা হইতে থাকে। বৃটিশ নৌবাহিনীর দক্ষতা-বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া জার্মানী তৈলসম্পদের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতে থাকে। গ্রেট বৃটেন ও জার্মানী কোন দেশেই খনিজ তৈল বিশেষ উৎপাদিত হয় না। কিন্তু এই সময়ে গ্রেট বৃটেন মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদের উপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে জার্মানী মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদের উপর বৃটেনের একচেটিয়া প্রভুত্ব খর্ব করিবার জন্য ইরাকে তৈলখনি ইজারা লইবার ও বাগদাদ রেলপথ স্থাপনের চেষ্টা করিতে থাকে। গ্রেট বৃটেন জার্মানীর এই প্রচেষ্টা তাহার সাম্রাজ্য ও বাণিজ্যিক নিরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে করিল। এইভাবে তৈলসম্পদকে কেন্দ্র করিয়া জার্মানী ও বৃটেনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হইয়া উঠে। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যদিয়া এই দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি কিভাবে ঘটিয়াছিল, ইতিহাসপাঠক প্রত্যেকেরই সেকথা জানা আছে।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈল কোম্পানী-গুলি বৈদেশিক তৈলসম্পদের উপর প্রভুত্বের হস্ত সম্প্রসারণ করিতে উদ্যোগী

হয়। ইহার অন্যতম কারণ অবশ্য নিজেদের তৈলসম্পদ দ্রুত নিঃশেষ হইয়া যাইবার আশঙ্কা; কিন্তু বৃটেন সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত যে-কোন স্থানে তৈল অনুসন্ধান ও উৎপাদনের অধিকার একমাত্র বৃটেনেরই থাকিবে; শুধু তাহাই নহে, ইরাক ও প্যালেস্টাইনের ন্যায় জাতিপুঞ্জের অছি-শাসিত এলাকাগুলিতেও যাহাতে মার্কিন তৈল-ব্যবসায়িগণ অনুপ্রবেশ করিতে না পারে সে সম্বন্ধে বৃটেন সচেষ্ট হয় এবং ডাচ্-সরকারকে প্ররোচিত করিয়া মার্কিন কোম্পানীগুলিকে বাদ দিয়া রয়্যাল ডাচ এবং বার্মা-শেলের একার্থসংঘের জন্য (Royal Dutch-Shell Combination) জাভার জাম্বি তৈলখনির (Djambi field) ইজারা লাভ করে। ১৯২০ খ্রীঃ গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স **সান রেমো তৈল-চুক্তিতে** (San-Remo Oil Agreement) স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অনুযায়ী জাতিপুঞ্জের অছি-এলাকা ইরাকের তৈলসম্পদ এই দুইটি দেশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া মার্কিন সরকার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এবং যে সকল দেশের সরকার মার্কিন কোম্পানীগুলিকে বিদেশে তৈলসম্পদের বখরা দিতে আপত্তি করিবে সেই সকল দেশের নাগরিকদের মার্কিন এলাকায়ও কোন তৈল-ব্যবসায়ের সুবিধা দেওয়া হইবে না বলিয়া ঘোষণা করেন। এই প্রতিবাদের ফলস্বরূপ ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী গঠিত হয়। এই কোম্পানীর মালিকানা যৌথভাবে বৃটিশ, ফরাসী, ডাচ ও মার্কিন পুঁজিপতিগণের হস্তে [illegible]। কারকুক হইতে তৈল প্রেরণের জন্য তৎকালে ফরাসী-নিয়ন্ত্রিত সিরিয়ার ত্রিপলি বন্দর পর্যন্ত এবং বৃটিশ-নিয়ন্ত্রিত প্যালেস্টাইনের হাইফা বন্দর পর্যন্ত নল স্থাপন করা হয়। হাইফায় একটি তৈল-শোধনাগার স্থাপন করা হয় ও উহার শতকরা ৩০ ভাগ শেয়ারের মালিক হয় ইরাক কোম্পানীর মার্কিন অংশীদারগণ। [illegible] কোম্পানী গঠনের সঙ্গে সঙ্গে **রেড লাইন চুক্তি** (Red Line Agreement) নামে একটি চুক্তি ইরাক কোম্পানীর অংশীদার-গণের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। মানচিত্রের উপর একটি লাল রেখা টানিয়া কতক-গুলি অঞ্চল চিহ্নিত করিয়া বলা হয় যে, ঐ অঞ্চলগুলিতে তৈল অনুসন্ধানের কার্য ইরাক কোম্পানীর অংশীদারগণের দ্বারা যুক্তভাবে পরিচালিত হইবে। চিহ্নিত অঞ্চলগুলির মধ্যে আরব, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং কাতার উল্লেখ-যোগ্য। যৌথভাবে বিদেশী সম্পদলুণ্ঠনের এইরূপ চমৎকার ব্যবস্থা ইতিহাসে দুর্লভ। অনুরূপভাবে অ্যাঙ্গলো-ইরানিয়ান তৈল কোম্পানী এবং মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের গাল্‌ফ্‌ অয়েল কোম্পানী পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে যৌথভাবে কুওয়েট-এর তৈলসম্পদ অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী ও জাপান তাহাদের খনিজ তৈলের অভাব মিটাইবার জন্য কয়লা হইতে কৃত্রিম তৈল উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু ইহার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ও শ্রম ব্যয় করিতে হয় তাহাতে অক্ষশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। জার্মানীর ককেশাস্‌ ও মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনির উপর প্রভুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে তৈল সংগ্রহের প্রচেষ্টায় জাপানে সরবরাহ-ব্যবস্থার উপর অত্যধিক চাপ পড়ায় অক্ষশক্তির পরাজয়ের পথ প্রশস্ত হয়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পৃথিবীর অধিকাংশ তৈলসম্পদের উপর প্রভুত্ব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভের অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পরও মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদ লইয়া দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে নাই। বৃহৎ শক্তিগুলি এই তৈলসম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার স্থাপন করিবার ও বজায় রাখিবার প্রতিযোগিতায় বহু হীন কৌশল, অন্যায় হস্তক্ষেপ, ষড়যন্ত্র ও হানাহানির সৃষ্টি করিয়াছে। ইরাণের মোসাদেকের পতন, আলজেরিয়ার স্বাধীনতার শর্ত হিসাবে ফ্রান্স কর্তৃক সাহারার তৈল-সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বজায় রাখিবার চেষ্টা, সুয়েজ ও সিরিয়ার ঘটনা-বলীর মধ্যে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে

পৃথিবীতে শান্তি চিরস্থায়ী করিতে হইলে সকল দেশের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সার্বিক কল্যাণের ভিত্তির উপর একটি সুসঙ্গত আন্তর্জাতিক তৈলনীতি নির্ধারণ করা কর্তব্য।

প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)

কয়লা ও খনিজ তৈলের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও প্রাকৃতিক গ্যাস শক্তির অন্যতম উৎস। অধিকাংশ তৈলখনি হইতে খনিজ তৈলের সহিত প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। তৈলখনি ব্যতীত কোন কোন স্থানে ভূগর্ভে প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চিত হইয়া আছে। এই সকল স্থানে ভূগর্ভ খনন করিয়া এই গ্যাস সংগ্রহ করা যাইতে পারে। পূর্বে প্রাকৃতিক গ্যাস উপযুক্তরূপে ব্যবহারের কোন ব্যবস্থা ছিল না; অধিকাংশ অপচয় হইত। কিন্তু বর্তমানে ইহার চাহিদা ও ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইহার উপযুক্ত সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা হইতেছে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও ব্যবহার (Economic importance and uses)—প্রাকৃতিক গ্যাস গৃহাদি উষ্ণ রাখিবার কার্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা তৈল ও গ্যাস কূপ খনন করিবার জন্য, খনি হইতে তৈল ও গ্যাস পাম্প করিয়া উত্তোলন করিবার জন্য এবং তৈল পরিশোধনের কার্যে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস কার্বন ব্ল্যাক (Carbon Black) উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কার্বন ব্ল্যাক টায়ার, রং এবং কালি তৈয়ারির জন্য প্রয়োজন হয়। কাচ, সিমেণ্ট, লৌহ ও ইস্পাত, মৃৎশিল্প এবং আরও বহু শিল্পে প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভবিষ্যতে রাসায়নিক শিল্পে, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন কৃত্রিম পদার্থ-উৎপাদনে ইহা গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিবে। কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম তন্তু, কীটনাশক পদার্থ, রং, কৃত্রিম রেসিন, প্লাস্টিক, সুরাসার, কৃত্রিম অ্যামোনিয়া, ঔষধ, সার, নাইট্রেট, পেট্রোল ও আরও বহু সামগ্রী প্রাকৃতিক গ্যাস হইতে উৎপাদিত হইতে পারে। অসংখ্য কৃত্রিম পদার্থ প্রাকৃতিক গ্যাস হইতে উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক গ্যাস-উৎপাদন
৬০,০০০ কোটি ঘন মিটার (১৯৬৪)

মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৪২৯৮০	কোটি ঘন মিঃ	মেক্সিকো	১৪২১	কোটি ঘন মিঃ
রাশি[illegible]	১১০০০	„ „ „	ইটালি	৭৬৫	„ „ „
কা[illegible]	৩৬৬৩	„ „ „	ভেনেজুয়েলা	৬২০	„ „ „
রুমানিয়া	১৪৫২	„ „ „	ফ্রান্স	৫০৮	„ „ „

U. [illegible] O.—Monthly Bulletin, April, 1965 হইতে সংগৃহীত।

উৎপাদ[illegible] অঞ্চল (Producing areas)—প্রাকৃতিক গ্যাস-উৎপাদন অল্প কয়েকটি [illegible] সীমাবদ্ধ। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** প্রাকৃতিক গ্যাস-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকা[illegible]রে। ১৮২০ খ্রীঃ এই দেশে প্রথম বাণিজ্যিক হারে প্রাকৃতিক গ্যাস-উৎপাদ[illegible] আরম্ভ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেকের বেশী রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস উ[illegible]দিত হইলেও টেক্সাস্, লুইসিয়ানা, পশ্চিম ভার্জিনিয়া, কান্সাস্, ওক্লাহ[illegible] ও ক্যালিফোর্ণিয়া এই ছয়টি রাজ্যে অধিকাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদিত[illegible]। **রাশিয়া, কানাডা, রুমানিয়া মেক্সিকো, ইটালি, ভেনেজুয়েল[illegible] ফ্রান্স, ব্রুনেই, অস্ট্রিয়া ও আর্জেন্টিনায়** প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদিত।

পরিবহণ-সমস্যা (Transportation problem)—অন্যান্য খনিজ পদার্থের ন্যায় প্রাকৃতিক গ্যাস অনেকসময় যেখানে ব্যবহার করা হয় সেখানে পাওয়া যায় না। উৎপাদক অঞ্চল অনেকসময় ভোগকেন্দ্র বা বাজার হইতে বহুদূরে অবস্থিত হয়। ফলে উৎপাদক অঞ্চল হইতে ভোগকারীর নিকট প্রাকৃতিক গ্যাস-পরিবহণের সুব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। খনিজ তৈলের ন্যায় প্রাকৃতিক গ্যাসও নলযোগে একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণ করা হয়; কিন্তু বহুদূরে নলযোগে প্রাকৃতিক গ্যাস প্রেরণ করিতে হইলে কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ, নলযোগে গ্যাস প্রেরণের পৌনঃপুনিক খরচ অল্প হইলেও দীর্ঘ নলস্থাপনের প্রারম্ভিক খরচ খুব বেশী। তাহা ছাড়া বৈদ্যুতিক তার বা তৈলবাহী নলের ন্যায় গ্যাসবাহী নলের মধ্যদিয়া একটিমাত্র দ্রব্যই পরিবহণ করা যায়। অর্থাৎ প্রাকৃতিক গ্যাসবাহী নলের লাভজনক পরিচালনার জন্য একটিমাত্র পণ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। ফলে ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী। নলযোগে যথেষ্ট পরিমাণে গ্যাস পরিবাহিত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে নলের মালিক সকল খরচ মিটাইয়াও উপযুক্ত লাভ করিতে পারে। কিন্তু কি পরিমাণে গ্যাস পরিবাহিত হইবে তাহা নির্ভর করে বাজারে ইহার চাহিদার উপর। আবার ইহার চাহিদা নির্ভর করে অন্যান্য জ্বালানির তুলনায় কি মূল্যে ইহা ভোগকারীর নিকট সরবরাহ করা যাইবে তাহার উপর এবং ইহার বাজারদাম নলযোগে পরিবহণের জন্য কি মূল্য ধার্য করা হইবে তাহার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে।

যথেষ্ট পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাসের নিয়মিত সরবরাহে নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নলের মালিক অনেকসময় প্রাকৃতিক গ্যাস-উৎপাদনকারীর সহিত দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, আবার অনেকসময় নিজেই প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করে

বাজারে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা নির্ভর করে কি কাজে উহা ব্যবহার করা হইবে তাহার উপর। গৃহাদি উষ্ণ রাখিবার জন্য যে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয় আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চাহিদারও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কোনদিন হঠাৎ অধিক ঠাণ্ডা পড়িলে গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং আইনানুযায়ী গ্যাস-সরবরাহকারী এই চাহিদা মিটাইতে বাধ্য। অথচ কোন্‌দিন আবহাওয়া কিরূপ হইবে তাহা পূর্ব হইতে নির্ধারণ করা কঠিন। এইজন্য গ্যাস-সরবরাহকারীদের অনেকসময় বাড়তি প্রয়োজন মিটাইবার জন্য

প্রস্তুত থাকিতে হয়। ইহা ছাড়া গৃহে উষ্ণতা-সৃষ্টির জন্য গ্যাসের চাহিদায় ঋতুতে ঋতুতে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। শীতকালে যে পরিমাণ গ্যাসের প্রয়োজন হয় উত্তাপ-সৃষ্টির জন্য গ্রীষ্মকালে নিশ্চয়ই তাহা হয় না। ঋতুতে ঋতুতে চাহিদার এইরূপ পরিবর্তন হয় বলিয়া গৃহে উষ্ণতা-সৃষ্টির কাজে যে গ্যাস ব্যবহার করা হয় খরচ পোষাইবার জন্য তাহার মূল্য কিছুটা চড়াহারে নির্দিষ্ট করা হয়। তাহা ছাড়া এমন সমস্ত শিল্পে গ্যাস সরবরাহের চুক্তি করা হয় গ্রীষ্মকালে যাহাদের গ্যাসের চাহিদা সর্বাধিক ও শীতকালে সর্বাপেক্ষা অল্প। খুব অল্পমূল্যের লোভ দেখাইয়াও অনেকসময় সরবরাহকারীর ইচ্ছামতো গ্যাস-সরবরাহ হ্রাসবৃদ্ধি করা যাইবে এই শর্তে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস-সরবরাহকারী অনেকসময় বাজার অঞ্চলে কৃত্রিম গ্যাস উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করিয়া চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা করে। বাজার অঞ্চলে গ্যাস মজুত রাখিবার ব্যবস্থাও অনেকসময় করা হয়।

জলশক্তি (Water-Power)

কয়লা ও খনিজ তৈলের ন্যায় জলপ্রবাহও শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। জলাশয় হইতে সূর্যের কিরণে জল বাষ্পীভূত হইয়া আকাশে উঠে এবং সেখান হইতে আবার ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টি বা তুষার রূপে পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসে এবং ক্ষুদ্রবৃহৎ অসংখ্য নদী-নালার মধ্যদিয়া সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তিবিদ্যায় (Technology) সাহায্যে এই জলস্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির কাজে নিয়োগ করা হইতেছে। জলস্রোত হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জলবিদ্যুৎ (Hydro electricity) নামে পরিচিত।

শিল্পগত তাৎপর্য (Industrial significance)—জলবিদ্যুতের সাহায্যে গৃহে আলো জ্বলে, পাখা ঘোরে, রন্ধনকার্য হয়। রেডিও, টেলিভিসন, টেলিফোন প্রভৃতিতে জলবিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। গৃহস্থালির কাজে জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইলেও ইহার অধিকাংশ ব্যবহৃত হয় শিল্প-কলকারখানায় ও যাতায়াত-ব্যবস্থায়। উৎপাদনকেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎশক্তি ক্রমেই অধিকদূর পর্যন্ত লাভজনকভাবে পরিবহণ করা সম্ভব হইতেছে। বর্তমানে বৃহৎ উৎপাদনকেন্দ্র হইতে সহজেই ৪৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত

জলবিদ্যুৎ প্রেরণ করা যাইতে পারে। এতৎসত্ত্বেও যে সকল শিল্পে সুলভ শক্তির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী, সেগুলির জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের যতটা সম্ভব কাছাকাছি স্থাপিত হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর সঙ্কর-ধাতু উৎপাদন, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যাল্‌সিয়াম কার্বাইড, ম্যাগ্‌নেসিয়াম প্রভৃতি শিল্প ইহার অন্যতম উদাহরণ।

অনেকের ধারণা যেহেতু জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কোন জ্বালানি ক্রয় করিতে হয় না এবং আকাশ হইতে যে জল নামিয়া নদী-নালার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হয় তাহার জন্য মানুষকে কোন প্রচেষ্টা করিতে হয় না; সেইজন্য জলশক্তি প্রকৃতির মুক্ত দান ও অত্যন্ত সুলভ। জল প্রকৃতির দান সন্দেহ নাই। কিন্তু সেইভাবে দেখিলে কয়লা, খনিজ তৈল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসও প্রকৃতির দান। খনি হইতে কয়লা কিংবা খনিজ তৈল উত্তোলন করিতে ও বিভিন্ন কার্যে নিয়োগ করিতে যেমন প্রচুর অর্থ ও শ্রম ব্যয় করিতে হয়, তেমনি জলস্রোত হইতে বিদ্যুৎ-উৎপাদন এবং সেই বিদ্যুৎ বিভিন্ন কার্যে নিয়োগ করিবার জন্য প্রচুর অর্থ ও শ্রমের প্রয়োজন হয়। কয়লা, খনিজ তৈল অথবা প্রাকৃতিক গ্যাস হইতে বিদ্যুৎ অর্থাৎ তাপবিদ্যুৎ (Thermal electricity) উৎপাদন করিতে হইলে যে পরিমাণ স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন হয় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। অবশ্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের **আবর্তক ব্যয় (Recurring expenditure)** অপেক্ষাকৃত অল্প।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রায় সর্বক্ষেত্রেই জলাধার নির্মাণ করিতে হয়। কালক্রমে পলি জমিয়া এই সকল জলাধার ভরাট হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাদের জলধারণ-ক্ষমতা ও বিদ্যুৎ-উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পাইতে থাকে। সব নদীর জলে পলির পরিমাণ সমান থাকে না। ফলে পলি পড়ার হারও সকল জলাধারে সমান নহে। তবে কমবেশী পলি জমিবেই এবং শেষপর্যন্ত বিদ্যুৎ-উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে। অবশ্য নানারূপ ইঞ্জিনিয়ারিং কলাকৌশল অবলম্বন করিয়া জলাধারে পলিজমার হার কমানো যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জলবিদ্যুৎ স্বভাবতঃই একেবারে সুলভ নহে। এইজন্য বাঁধ বাঁধিয়া জলাধার নির্মাণ করিয়া শুধু বিদ্যুৎ-উৎপাদন নহে, উহার সহিত জলসেচ, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, ভূমিক্ষয়-নিবারণ, মৎস্যচাষ, প্রমোদকেন্দ্র-নির্মাণ প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করা হয় যাহাতে পড়তা খরচ কম পড়ে।

জলবিদ্যুতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল ইহার স্থায়িত্ব। পূর্বেই বলা হইয়াছে কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি শক্তির উৎসসমূহ সঞ্চিত সম্পদ (Fund resources), কিন্তু জলশক্তি **প্রবহমান সম্পদ** (Flow resources)। এমন দিন আসিবে যখন পৃথিবীর সমস্ত কয়লা, খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু জলশক্তি অক্ষয়। যতদিন আকাশ হইতে পৃথিবীর বুকে বৃষ্টি ও তুষারপাত হইবে, যতদিন বৃষ্টি ও তুষার-গলা জল পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইবে এবং আবার সূর্যকিরণে বাষ্পীভূত হইয়া আকাশে উঠিয়া বৃষ্টি ও তুষারের রূপে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে এবং নূতন করিয়া সমুদ্রের দিকে যাত্রা শুরু করিবে, ততদিন মানুষ জলপ্রবাহ হইতে শক্তি উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। স্থায়িত্বের দিক দিয়া এখনও পর্যন্ত আর কোন শক্তির উৎস জলশক্তির সমকক্ষ নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বর্তমানে বৃহৎ উৎপাদনকেন্দ্র হইতে সহজেই ৪৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত জলবিদ্যুৎ প্রেরণ করা যাইতে পারে। খনিজ তৈল তরল পদার্থ বলিয়া সহজে একপাত্র হইতে অন্যপাত্রে স্থানান্তর করা যায় এবং পাম্প করিয়া বহুদূরবর্তী অঞ্চলে সহজে ও অল্পখরচে লইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু কয়লা কঠিন পদার্থ এবং ওজন ও আয়তনের তুলনায় ইহার দাম কম বলিয়া ইহা স্থানান্তরে প্রেরণ অপেক্ষাকৃত শ্রমসাধ্য ও ব্যয়-বহু[illegible] এই কারণে কয়লাখনি অঞ্চলগুলিতে শিল্প কলকারখানা গড়িয়া উ[illegible]। সেই তুলনায় তৈলখনি ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের নিকট বিশেষ [illegible]কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। জলবিদ্যুৎ কয়লা ও তৈল [illegible] সুপ্ত উৎপাদিত [illegible]ক্তির তুলনায় সুলভ বলিয়া ইহা দ্বারা উৎপাদি[illegible] শিল্পোন্নতি অপেক্ষাকৃত [illegible]ল্যে জনসাধারণের [illegible] সুপ্ত সম্ভাবনার ইহা শিল্পোন্নতি[illegible] অন্যদিকে জ[illegible] [illegible]হাই নহে, স্বাভাবিকভাবে যে পরিমাণ পরিমাণে সাহায্য [illegible]রে, বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া তাহা পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর [illegible] উৎপাদন করিতেছে।

জলশক্তি উৎপা[illegible] [illegible]তে [illegible]বিদ্যুৎ-উৎপাদন নিম্নলিখিত **অর্থনৈতিক** [illegible]পরও নি[illegible] (১) কয়লা ও খনিজ তৈল প্রভৃতির able for the [illegible] বিদ্যুৎ যোগান ও [illegible]ল্য। সুইজারল্যাণ্ডে কয়লা ও খনিজ জলশক্তি উৎপাদ[illegible] [illegible]য় না বলিয়া জলবিদ্যুৎ [illegible]ৎপাদনের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া তাহার উপরই [illegible] (২) পূর্বেই বলা হইয়াছে [illegible]ৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা জলের পরিমাণ [illegible]

উপর এবং জলের গতিবেগ নির্ভর করে যে জমির উপর দিয়া উহা প্রবাহিত হইতেছে তাহার **ঢালের** উপর। জমি যত বেশী ঢালু হইবে জলস্রোত তত প্রখর হইবে। নিয়মিতভাবে সম-পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে হইলে সারাবৎসর জলের প্রবাহ সমান থাকা প্রয়োজন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে নদী বরফ-গলা জলে বা কোন বৃহৎ হ্রদের জলে পুষ্ট তাহাতে সারাবৎসর জল থাকে। এই কারণে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি হিমালয় হইতে উত্থিত উত্তর ভারতের নদীগুলিতে সারাবৎসর জল পাওয়া যায়। যেখানে নদী বৃষ্টির জলে পুষ্ট সেক্ষেত্রে **বৃষ্টির প্রকৃতির** উপর নদীতে নিয়মিত জলপ্রবাহ থাকিবে কিনা তাহা নির্ভর করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবৎসর প্রায় সমানভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া এই অঞ্চলের নদীগুলিতে সকলসময় প্রচুর জল পাওয়া যায়; ফলে এই সকল নদী হইতে নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের সম্ভাবনাও অধিক। নিরক্ষীয় বলয়ের অন্তর্গত মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো নদী হইতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু ক্রান্তীয় মণ্ডলে কিংবা ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বৎসরের একটা *নির্দিষ্ট ঋতুতে সীমাবদ্ধ বলিয়া এই সকল অঞ্চলের বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদীগুলিতে* সারাবৎসর জল থাকে না। ফলে স্বাভাবিকভাবে সারাবৎসর সম-পরিমাণ বিদ্যুৎ এই সকল নদী হইতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি এইজাতীয়। এই সকল নদী হইতে নিয়মিত বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে হইলে বহু অর্থব্যয় করিয়া বর্ষার বাড়তি জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য কালক্রমে জলাধার নির্মাণ করিতে হয়। গভীর অরণ্যভূমির মধ্যদিয়া কিংবা উহাদের ...গ্রয় মৃত্তিকার উপর দিয়া অথবা বৃহৎ জলাভূমির উপর দিয়া যে সব নদীর জলে পলির পরিমাণ সমান জল থাকে। কিন্তু ...ঠিন তৃণভূমি সকল জলাধারে সমান নহে। তবে কমবেশী প্রবাহিত নদীতে জলের প্রবাহ বিদ্যুৎ-উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে। অবশ্য নানাপরেও ...লের প্রবাহ নির্ভর অবলম্বন করিয়া জলাধারে পলিজমার হার কমবেশি অধিক হওয়ার ফলে তাহাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ...তল অঞ্চলের নদীগুলি যে, জলবিদ্যুৎ স্বভাবতঃই একেবারে ... নহে। এইজন্যে জলবিদ্যুৎ-জলাধার নির্মাণ করিয়া শুধু বিদ্যুৎ-উৎপাদন নহে, উহার উপাদানগুলির বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, ভূমিক্ষয়-নিবারণ, ...সেচাষ, প্রমোদকেন্দ্র-নি... অনুকূল থাকা ব্যবস্থা করা হয় যাহাতে প... খরচ কম পড়ে।

প্রয়োজন। প্রাকৃতিক উপাদানগুলির উপর কোন অঞ্চলের সুপ্ত বা সম্ভাব্য জলবিদ্যুতের পরিমাণ (Potential hydel energy) নির্ভর করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে তাহা নির্ভর করে **অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের** উপর। অন্য যে-কোন জিনিসের ন্যায় বিদ্যুৎ-উৎপাদনও মূলতঃ তাহার চাহিদার উপর নির্ভরশীল। বিদ্যুৎ বা শক্তির চাহিদা প্রধানতঃ **শিল্প** ও **যাতায়াত-ব্যবস্থার** এবং গৃহস্থালির কার্যে। গৃহস্থালির কার্যে বিদ্যুতের চাহিদা নির্ভর করে জনসাধারণের **জীবনযাত্রার মানের** উপর। জনসাধারণ দরিদ্র হইলে বিদ্যুতের কোন চাহিদা থাকিবে না। জনসাধারণ সঙ্গতিসম্পন্ন হইলে আলো, পাখা, রেডিও, টেলিভিসন, টেলিফোন, সিনেমা প্রভৃতির ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে ; ফলে বিদ্যুতের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। শিল্পে ও যাতায়াত-ব্যবস্থায় বিদ্যুতের চাহিদা সর্বাধিক। যে সকল দেশ শিল্পোন্নত, কল-কারখানার সংখ্যা অধিক, রেলপথের প্রসার ঘটিয়াছে, সেই সকল দেশে কল-কারখানা ও রেলগাড়ী চালাইবার জন্য অধিক বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু শিল্পোন্নতি না ঘটিলে বিদ্যুতের চাহিদা সামান্য হইবে। এই কারণে আফ্রিকার কঙ্গোয় পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকিলেও প্রকৃত উৎপাদন অতি সামান্য ; মোট সুপ্তশক্তির মাত্র শতকরা ০·২৭ ভাগ। বেলজিয়াম সাম্রাজ্যবাদের অধীনে থাকিবার জন্য কঙ্গোয় এবং অর্থনৈতিক উন্নতি হয় না [illegible] শিল্প-কলকারখানা গড়িয়া উঠে নাই এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায় নাই। অন্যদিকে ফ্রান্স, ইটালি, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডে সুপ্ত জলবিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ কম হইলেও এই সকল দেশে অভূতপূর্ব শিল্পোন্নতি ঘটায় শক্তির চাহিদা অত্যন্ত অধিক বলিয়া ইহাঁরা যে শুধু সুপ্ত সম্ভাবনার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছে তাহাই নহে, স্বাভাবিকভাবে যে পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতে পারে, বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিতেছে।

শিল্পোন্নতি ব্যতীত জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন নিম্নলিখিত **অর্থনৈতিক উপাদানগুলির** উপরও নির্ভর করে : (১) কয়লা ও খনিজ তৈল প্রভৃতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ **যোগান** ও **মূল্য**। সুইজারল্যাণ্ডে কয়লা ও খনিজ তৈল পাওয়া যায় না বলিয়া জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। (২) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা

করিতে হইলে প্রভূত পরিমাণে স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে এই পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করা কষ্টসাধ্য। এই কারণে ভারত ও চীনের মতো দেশগুলি বিদেশ হইতে ঋণ সংগ্রহ করিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছে। (৩) জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবার জন্য উচ্চশ্রেণীর কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োজন। অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে এইরূপ কারিগরী জ্ঞানের অভাব রহিয়াছে। এইজন্য ভারত ভাকরা-নাঙ্গাল, দামোদর উপত্যকা প্রভৃতি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নির্মাণকার্য পরিচালনার জন্য বিদেশ হইতে **বিশেষজ্ঞ কারিগরের** সাহায্য লইয়াছে।

জলবিদ্যুৎ-উৎপাদক অঞ্চল (Producing areas)—শিল্পসমৃদ্ধ দেশে বিদ্যুতের চাহিদা বেশী থাকায় উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে সর্বাপেক্ষা বেশী জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

সুপ্ত জলবিদ্যুৎ-শক্তি ও জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন

(হাজার অশ্বশক্তি)

	সুপ্ত জলবিদ্যুৎ-শক্তি	প্রকৃত জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৬,৫০০	৩৪,৭০০
কানাডা	৩৬,৬০০	১৬,৬৮৪
জাপান	১২,০০০	১০,০০[illegible]
ইটালি	৬,০০০	৯,০[illegible]
ফ্রান্স	৬,০০০	[illegible]৫০০
রাশিয়া	৭৮,০০০	৭,১২৫
সুইডেন	৪,০০০	৫,৮০০
সুইজারল্যাণ্ড	৩,০০০	৪,৫৫০
ব্রেজিল	২০,০০০	২,৫৮৫
ভারত	২৭,০০০	১,০০০
কঙ্গো	১,৩০,০০০	৩৫৫

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। নায়াগ্রা জলপ্রপাত এবং টেনেসি নদীর জলস্রোত হইতে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে, মধ্য

আটলান্টিক উপকূলের রাজ্যসমূহে, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী রাজ্যসমূহে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অধিকাংশ শিল্প জলবিদ্যুৎশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। পশ্চিমে কলম্বিয়া নদীর উপর গ্র্যাণ্ড কুলি জলাধার (Grand Coulee Dam) এবং কলোরাডো নদীর উপর হুভার জলাধার (Hoover Dam) গুরুত্বপূর্ণ জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র।

কানাডা—জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে কানাডা **দ্বিতীয়** স্থান অধিকার করিয়াছে। নায়াগ্রা জলপ্রপাত এবং সেণ্ট লরেন্স ও অটোয়া নদী হইতে কুইবেক ও অণ্টারিও প্রদেশে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। সুলভে জলবিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া এখানকার কাগজশিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধন করা হইয়াছে।

রাশিয়া—নীপার নদীর উপর পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। লীনা, ভল্গা, ডন, কামা, ইয়েনেসি প্রভৃতি নদীর জলস্রোত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ককেশাস্ পার্বত্য অঞ্চল জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

নরওয়ে—প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূলে থাকায় জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে নরওয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে। এখানকার মাথাপিছু জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বেশী।

আয়ারল্যাণ্ডের ক্ষুদ্রাকৃতি শিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে এখানকার সুলভ জলবিদ্যুৎ। **ফ্রান্স** ও **ইটালিতে** জলবিদ্যুৎ কয়লার অভাব মোচন করিয়াছে। ফ্রান্সের পীরেনীজ পর্বত অঞ্চলে এবং ইটালির পো নদীর উপত্যকায় প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। **সুইডেনের** ভেনার হ্রদ হইতে উৎপন্ন জলবিদ্যুৎ স্থানীয় শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

জাপানে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুকূলে থাকায় জলবিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া জাপানে বিদ্যুতের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। এখানে জলবিদ্যুতের সাহায্যে কুটীরশিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। হনস্যুর পার্বত্য অঞ্চলেই জাপানের অধিকাংশ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

পারমাণবিক শক্তি (Atomic energy)

পৃথিবীতে খনিজ ইন্ধনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। কয়লা, খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস যে হারে ব্যবহার করা হইতেছে তাহাতে আগামী কয়েক শত বৎসরের মধ্যে শক্তির এই সকল উৎস নিঃশেষিত হইয়া যাইবে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। অথচ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে শক্তির প্রয়োজন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কারণে বহুদিন হইতে শক্তির নূতন ও নির্ভরযোগ্য উৎস আবিষ্কারের চেষ্টা মানুষ করিতেছে এবং ইহারই ফলে পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে।

১৮৯৬ সালে বৈজ্ঞানিক বেকেরেল কর্তৃক তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার, ১৮৯৮ সালে বৈজ্ঞানিক কুরীর রেডিয়াম আবিষ্কার এবং পরবর্তী কালে আইনস্টাইনের পদার্থ ও শক্তি সম্বন্ধে বিখ্যাত তত্ত্বপ্রচারের ফলে পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে আধুনিক জ্ঞান ও আবিষ্কারের ভিত্তি রচিত হয়। ১৯৩৯ সালে নিউক্লিয়াস্‌কে মৌলিক কণিকায় বিশ্লিষ্ট করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় এবং তাহা হইতে পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের সূত্রপাত হয়। পদার্থের পরমাণুতে, তাহার নিউক্লিয়াসে সুপ্ত আছে পারমাণবিক শক্তি। নিউক্লিয়াস্‌কে বিশ্লিষ্ট করিয়া এই শক্তি মোচন করা সম্ভব। যে-কোন পদার্থের মাত্র এক গ্রামে আছে আড়াই কোটি কিলোওয়াট্-ঘণ্টা পরিমাণ পারমাণবিক শক্তি।

এপর্যন্ত যে সকল গবেষণা ও আবিষ্কার হইয়াছে তাহার ফলে মানুষ ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, হাইড্রোজেন ও লিথিয়াম এই চারিটি পদার্থের পারমাণবিক শক্তির মাত্র একটা অংশের মোচন ও ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। অবশ্য শান্তিপূর্ণ কাজে ইহাদের মধ্যে একমাত্র ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক শক্তি প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ কাজের জন্য কৃত্রিমভাবে আরও দুইটি পারমাণবিক ইন্ধন প্রস্তুত করা যায়—প্লুটোনিয়াম ২৩৯ (প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ২৩৮ হইতে প্রাপ্ত) এবং ইউরেনিয়াম ২৩৩ (থোরিয়াম ২৩২ হইতে প্রাপ্ত)। মোট কথা, এখন পর্যন্ত ইউরেনিয়াম ও **থোরিয়াম** এই দুইটি খনিজ পদার্থ হইতে শান্তিপূর্ণ কার্যের জন্য পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদন সম্ভব। হাইড্রোজেনের পরমাণুর সাহায্যে বোমা প্রস্তুত করিয়া ধ্বংসাত্মক কার্যে প্রয়োগ করা সম্ভব হইলেও

শান্তিপূর্ণ কার্যে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক শক্তি নিয়োগ করা এখনও সম্ভব হয় নাই পৃথিবীর সঞ্চিত কয়লা ও খনিজ তৈলের সম্মিলিত শক্তির দশগুণ শক্তি আছে পৃথিবীর মোট আবিষ্কৃত ইউরেনিয়াম স্তরে। এ-পর্যন্ত মানুষ ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের পারমাণবিক শক্তির মাত্র এক-সহস্রাংশ এবং হাইড্রোজেন ও লিথিয়ামের মাত্র এক-শতাংশ মোচন করিতে শিখিয়াছে। পদার্থকে সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করিবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইলে অকল্পনীয় শক্তি মানুষের করায়ত্ত হইবে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অতি উচ্চশ্রেণীর কারিগরী দক্ষতা ও প্রভূত পরিমাণে মূলধনের প্রয়োজন হয় বলিয়া এ-পর্যন্ত সামান্য দুই-একটি দেশে মাত্র এই প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বৃটেন ও ফ্রান্সে পরমাণু হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষেও আগামী ২।১ বৎসরের মধ্যে এইরূপ কারখানা স্থাপিত হইবে। পারমাণবিক বিজ্ঞানে ভারতের অগ্রগতি প্রশংসনীয়, তবে এখনও পর্যন্ত কয়লা হইতে কিংবা জলস্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ অপেক্ষা পরমাণু হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বেশী। আশা করা যায়, ভবিষ্যৎ গবেষণা ও আবিষ্কারের দ্বারা এই খরচ হ্রাস করা সম্ভব হইবে। উৎপাদন-কার্যে পারমাণবিক শক্তির সার্থক প্রয়োগের ফলে সমগ্র পৃথিবীর মানবজাতির জীবনযাত্রার মান ও পদ্ধতি এবং সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সংঘটিত [illegible] পরিবহণ-কার্যেও পারমাণবিক শক্তি সাফল্যজনকভাবে ব্যবহার করা চলে। [illegible]রমাণবিক শক্তিচালিত ১৬,০০০ টনের সোভিয়েট আইস-ব্রেকার, লেনিন ([illegible]৪,০০০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট) দিনে মাত্র ১৫০ গ্রাম জ্বালানি খরচ [illegible]ায় জ্বালানি না লইয়া একনাগাড়ে অন্ততঃ এক বৎসর চলিতে পারে। অথচ ১০,০০০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট একটি আইস-ব্রেকার দিনে ১২০ টন পর্যন্ত ক[illegible] ব্যবহার করে, এবং নূতন কয়লা না লইয়া এক মাসের বেশী চলিতে [illegible]র না। পারমাণবিক শক্তির সফল প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াত-ব্যবস্থা[illegible] এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

পরমাণু হইতে বিদ্যুৎ-উৎপাদন [illegible]ীত পারমাণবিক চুল্লীতে তৈয়ারী নানাপ্রকার তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যাপকভা[illegible] বিভিন্ন কার্যে ব্যবহার করা হইতেছে। শিল্পদ্রব্যের গুণপরীক্ষা, নূতন নূ[illegible] গাছগাছড়ার সৃষ্টি, কৃষির

উৎপাদনবৃদ্ধি, দুষ্ট স্ফোটক, গলগণ্ড, রক্তব্যাধি ও ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা প্রভৃতিতে ইহা সাহায্য করিতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে এখনও পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ কার্যে পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন কেবল ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম এই দুইটি খনিজ পদার্থ হইতে সম্ভব। নিম্নে ইহাদের উৎপাদক অঞ্চলগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইল।

ইউরেনিয়াম (Uranium)—দক্ষিণ আমেরিকা ব্যতীত পৃথিবীর আর সমস্ত মহাদেশেই কমবেশী ইউরেনিয়াম উৎপাদিত হয়। প্রধান প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল হইল—(১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো মালভূমি, উটা ও মন্টানা, (২) কানাডার গ্রেট বিয়ার হ্রদ অঞ্চল, আথাবাস্কা হ্রদের উত্তর উপকূলে অবস্থিত বিভারলজ খনি এবং ব্লাইণ্ড রিভার অঞ্চল, (৩) কঙ্গোর কাটাঙ্গা প্রদেশ (সিনকোলোবোয়ে খনি), (৪) বৃটেনের কর্ণওয়াল, (৫) জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়ার এরজ্‌জেবার্জ (Erzgebirge) অঞ্চল, (৬) পর্তুগালের আরজেইরিকা (Urgeirica) খনি ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল, (৭) ফ্রান্সের মধ্যমালভূমি অঞ্চল (Massif Central), (৮) সুইডেন, (৯) রাশিয়ার ফারগানা অঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিম সাইবেরিয়া এবং (১০) অস্ট্রেলিয়ার রেডিয়াম হিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি ইউরেনিয়াম আমদানি করিয়া থাকে। রপ্তানি করে কঙ্গো, কানাডা, পূর্ব জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়া।

থোরিয়াম (Thorium)—প্রধানতঃ মোনাজাইট আকরিক হইতে থোরিয়াম সংগ্রহ করা হয়। পৃথিবীতে সর্বাধিক পরিমাণে থোরিয়াম সঞ্চিত রহিয়াছে **ভারতের** মালাবার উপকূলে। এখানে সঞ্চিত মোনাজাইটের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টনেরও অধিক বলিয়া মনে করা হয়। ব্রেজিলের রায়ো-ডি-জেনিরো, এস্‌পিরিটো সাণ্টো এবং বাহিয়া প্রদেশের সমুদ্রোপকূলে মোনোজাইট পাওয়া যায়। ইহাই পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম থোরিয়াম অঞ্চল। সিংহলের পশ্চিম উপকূলে এবং মিশরের নীলনদের মোহনায় মোনাজাইট পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌-এ সামান্য পরিমাণে মোনাজাইটের অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়ে বাং-এর খনির উপজাত-দ্রব্য হিসাবে কিছু পরিমাণ থোরিয়াম উৎপাদিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা ও ইডাহো রাজ্যে কিছু পরিমাণ মোনাজাইট পাওয়া যায়।

বিদ্যুৎ-শক্তি (Electricity)

বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহারে অধুনাতম উৎকর্ষ (Electricity—A modern refinement of energy use)—মানুষ যুগে যুগে কাষ্ঠ, কয়লা, খনিজ তৈল, জলপ্রবাহ প্রভৃতি শক্তির নূতন নূতন উৎস আবিষ্কার করিয়াছে। **বিদ্যুৎ** এইরূপ কোন শক্তির **নূতন উৎস** নহে। পুরাতন উৎসসমূহ প্রয়োগ বা ব্যবহারের নূতন পদ্ধতি। পূর্বে কয়লা পোড়াইয়া উত্তাপ সৃষ্টি করিয়া সেই উত্তাপ দ্বারা বাষ্প উৎপাদন করা হইত এবং বাষ্পশক্তি বিভিন্ন কার্যে ব্যবহার করা হইত। কিন্তু বর্তমানে কয়লার তাপশক্তিকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরের ব্যবস্থা করা হয় এবং সেই বিদ্যুৎশক্তি বিভিন্ন উৎপাদন-মূলক কার্যে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু বিদ্যুৎশক্তির কোন নূতন উৎস না হইলেও বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর মোট শক্তি-সরবরাহে প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছে এবং সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থায় ও প্রকৃতির সহিত মানুষের সম্পর্কে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছে।

প্রথমতঃ, বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ফলে জলশক্তির কার্যকারিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে জলশক্তির উৎসের নিকটেই ঐ শক্তিকে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে হইত। কিন্তু জলপ্রপাতের গতিশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবার ফলে, **উৎস হইতে বহুদূরে** লইয়া গিয়া এই শক্তিকে ব্যবহার করা সম্ভব হইতেছে। যে সকল স্থানে সুলভে কয়লা ও খনিজ তৈল পাওয়া যায় না তাহার অনেক স্থানে জলবিদ্যুতের সাহায্যে কল-কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে এবং শক্তি সরবরাহের মোট পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বাষ্পশক্তি প্রভৃতি শক্তির অন্যান্য রূপের তুলনায় বিদ্যুৎ অনেক বেশী **নমনীয়** (flexible) এবং ইহাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়। ইহা নমনীয় বলিয়া বিচিত্র **প্রয়োজনের** সহিত ইহাকে খাপ খাওয়ানো যায়। একটি বিদ্যুতের কারখানা (Power house) একই সঙ্গে আলো-জ্বালানো, পাখা-চালানো, রেডিও-বাজানো, রেলগাড়ী-চালানো, তাপনিয়ন্ত্রণ ও রন্ধনকার্য প্রভৃতির জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই সকল কারণে অসংখ্য কার্যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায়, যাহা শক্তির অন্য কোন রূপের দ্বারা সম্ভব নহে। বিদ্যুৎ

আবিষ্কারের ফলে নূতনভাবে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে; কৃষি, শিল্প, যাতায়াত-ব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রে যান্ত্রিকীকরণের গতি ত্বরান্বিত হইয়াছে; টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, কেব্‌ল্‌, সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, রাডার, রেফ্রিজারেটর, ইলেকট্রনিক্‌স্‌ প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে, এবং নিত্য-নূতন আবিষ্কার হইতেছে যাহা শক্তি ব্যবহারের খরচ ক্রমাগত হ্রাস করিয়া ইহার ব্যবহার ব্যাপকতর করিতেছে। বৈদ্যুতিক আলো মানুষের কর্মক্ষমতা ও আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কারের পূর্বে পৃথিবীতে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমস্ত রকমের কর্মোদ্যোগের পরিসমাপ্তি ঘটিত। কিন্তু বর্তমানে বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে দিনরাত্রে সর্বক্ষণ সমস্ত রকমের কাজকর্ম করিতে কোনই বাধা নাই। বিদ্যুৎ আধুনিক সমরবিজ্ঞান ও যুদ্ধের কলাকৌশলেও কম পরিবর্তন ঘটায় নাই।

তৃতীয়তঃ, বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পূর্বে কারখানার এক অংশে শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইত। কিন্তু বিদ্যুৎ বহুদূরে **সস্তায় ও সহজে পরিবহণ** করা যায় বলিয়া বর্তমানে কল-কারখানা বিদ্যুৎ-উৎপাদক অঞ্চল হইতে বহুদূরে স্থাপন করা সম্ভব। অর্থাৎ শক্তি-উৎপাদন ও উহার ব্যবহার পরস্পর হইতে দূরে সংঘটিত হইতে পারে। কারখানার মধ্যে বা উহার অতি নিকটে শক্তি-উৎপাদনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয় না। এইভাবে একটি পৃথক্‌ বিদ্যুৎশিল্পের জন্ম হইয়াছে যাহা শক্তি-উৎপাদন ও শক্তি-ব্যবহারের ক্ষেত্রে উন্নততর গবেষণা ও কারিগরী উন্নতির পথ সুগম করিয়াছে।

চতুর্থতঃ, বিদ্যুৎ **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন** ও স্বাস্থ্যের অনুকূল।

উল্লিখিত সুবিধাসমূহ সত্ত্বেও বিদ্যুতের সর্বপ্রধান ত্রুটি হইল ইহার অতি দ্রুত-ক্ষয়িষ্ণুতা। অতি সামান্য পরিমাণে ব্যতীত ইহা সঞ্চয় করিয়া রাখা সম্ভব নহে। উৎপাদন করিবার মুহূর্তেই ইহা ভোগ করিতে হইবে, তাহা না হইলে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

বর্তমানে পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ কয়লা, তৈল প্রভৃতি অগ্নি হইতে এবং শতকরা ২৫ ভাগ জলপ্রবাহ হইতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে শিল্পোন্নতি, জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ব্যবহার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। মোট বিদ্যুৎ-ব্যবহারের দিক দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান

প্রথম হইলেও, মাথাপিছু বিদ্যুৎ-ব্যবহারে নরওয়ে প্রথম এবং সুইডেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার সংযোগ-সাধন (Inter-connection of Power plants and Power system)—বর্তমান জগতে বিদ্যুৎ মানুষের একান্ত প্রয়োজন। বাসগৃহে আলোর জন্য, শিল্পে শক্তি সরবরাহের জন্য, পরিবহণের জন্য ও অন্যান্য বহু কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। বর্তমান সমাজের দ্রুত উন্নতির মূলে রহিয়াছে বিদ্যুতের ব্যবহার। এই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে। যেমন—কয়লা, তৈল, গ্যাস, জল প্রভৃতি। এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদের নিকটে বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হইলে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের খরচ অত্যন্ত কম হয়। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র বা কোন দেশের সকল স্থানেই এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়া যায় না। কোনস্থানে প্রচুর কয়লা বা তৈল পাওয়া যায়; আবার কোথাও বা অপর্যাপ্ত জল-সম্পদ বিদ্যমান, যাহা দ্বারা প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারে; আবার কোথাওবা এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদের একান্ত অভাব; অথচ দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সকল স্থানেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা প্রয়োজন।

যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে কয়লা বা তৈল, পরিবহণ-ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্যত্র লইয়া যাইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, কিন্তু জল অন্যত্র লইয়া যাইয়া জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা অসম্ভব। যেখানে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা বিদ্যমান থাকিবে, সেখানেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। ইহা ছাড়া হয়তো কোনও বৎসর একটি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী হওয়ার ফলে জলের গতি বৃদ্ধি পাইল, আবার অন্য একটি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় জলের গতি কমিয়া গেল। ইহাতে একটি অঞ্চলে বিদ্যুৎ অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হইবে এবং অন্য একটি অঞ্চলে বিদ্যুতের অভাব পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু বিদ্যুতের সরবরাহ সারাবৎসর সমানভাবে থাকা প্রয়োজন।

এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য বর্তমান যুগে বিদ্যুৎকেন্দ্রের ও বিভিন্ন বিদ্যুৎ-উৎপাদন-ব্যবস্থার সংযোগ-সাধনের (Inter-connection of power plants and power systems) বন্দোবস্ত হইতেছে। এই সংযোগ-সাধনের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্রগুলি একটির সঙ্গে অপরটি যুক্ত হইবে। এক অঞ্চলে বিদ্যুতের অভাব হইলে অন্য অঞ্চল

হইতে এই অভাব-মোচনের বন্দোবস্ত করা যাইবে। যেমন, অন্ধ্রের একটি গ্রামে শিল্পোন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা আছে, কিন্তু শক্তিসম্পদের অভাবে শিল্পের উন্নতি হইতেছে না। এই গ্রামের নিকটেই হয়তো মাদ্রাজের একটি বিরাট বিদ্যুৎ-কেন্দ্র বিদ্যমান। যদি অন্ধ্র ও মাদ্রাজের বিদ্যুৎ-কেন্দ্রসমূহের মধ্যে সংযোগ-সাধনের বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে এই অসুবিধা দূর করা সম্ভব।

অনেকসময় বিদ্যুৎ-কেন্দ্রসমূহের সংযোগ-সাধনে কিছু কিছু সমস্যা দেখা যায়। যেমন, রাজনৈতিক সীমারেখা। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব হইলে বিদ্যুতের সংযোগ-সাধন অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তাহা ছাড়া বহু দেশে অর্থাভাবে বৈদ্যুতিক সংযোগ-সাধনের যন্ত্রপাতি যোগাড় করা সম্ভব হয় না। ভারতের উদাহরণ হইতে বিষয়টিকে আরও পরিষ্কারভাবে বুঝানো যায়। এই দেশে বৈদ্যুতিক সংযোগ-সাধনের বিভিন্ন অসুবিধার সমাধানের জন্য 'কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি কমিশন' যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, ভুপালে ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন হইতেছে এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্যুৎ-বোর্ডের মধ্যে সমন্বয়ের বন্দোবস্ত হইতেছে।

দক্ষিণ ভারতে কয়লা পাওয়া যায় না বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জল-বিদ্যুতের সাহায্যে কাজকর্ম চালানো হয়। জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থাও এখানে বিদ্যমান। এখানকার বাৎসরিক জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২,৩০,০০০ কিলোওয়াট্। মহীশূরের শিবসমুদ্রম, শিমসা ও যোগ অঞ্চলে, মহারাষ্ট্রের খোপলী, ভিবপুরী ও ভীরা অঞ্চলে, মাদ্রাজের পাইকারা, মেতুর, ময়ার ও পাপনাশমে এবং কেরালার পল্লীভাসাল ও সেঙ্গুলামে স্বাধীনতার পূর্বেই জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। স্বাধীনতার পরেও মহীশূরের মালপুরমে, অন্ধ্র রাজ্যের রামাপদসাগরে ও নাগার্জুন সাগরে এবং মাদ্রাজের কুণ্ডা অঞ্চলে নূতন নূতন জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলির প্রধান সমস্যা এই যে, কয়েকটি কেন্দ্র পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিমে এবং অন্যান্যগুলি পূর্বে অবস্থিত। ইহার ফলে যে সময় পশ্চিমাংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, সে সময় হয়তো পূর্বাংশের বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ কম। আবার শীতকালে যখন পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত হয়, তখন পশ্চিমাংশে বৃষ্টিপাত হয় না। ইহার ফলে পশ্চিমাংশের জলবিদ্যুৎ-

কেন্দ্রগুলিতে যখন বেশী পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব, তখন পূর্বাংশে বেশী বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায় না। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য সমগ্র বিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলির মধ্যে সংযোগ-সাধনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই শিবসমুদ্রমের সহিত মহারাষ্ট্রের ও মাদ্রাজের জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র-সমূহের সংযোগ-সাধন করা হইয়াছে এবং মেত্তুরের সহিত পাইকারা বিদ্যুৎ-কেন্দ্র সংযুক্ত হইয়াছে। এইভাবে বিভিন্ন বিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন করা হইলে সকল স্থানেই সমানভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হইবে।

প্রশ্নাবলী

1 Discuss the economic significance of power utilization.

উ: 'শক্তি-ব্যবহারের অর্থনৈতিক তাৎপর্য' (১৮১ পৃঃ—১৮৪ পৃঃ) লিখ।

2. Give an idea of the world distribution of coal. What are the by-products of coal? [B. U Three-Year Degree Course, B. Com. 1962, '63]

উ: কয়লার 'উপজাত-দ্রব্য' (১৮৬ পৃঃ) ও 'উৎপাদক অঞ্চল' (১৮৮ পৃঃ—১৯৬ পৃঃ) লিখ;

3. Give an idea of the world distribution of mineral oil and the countries controlling its production Discuss in particular the significance of the oil-field in the Middle East in the context of rivalry in oil trade.

[C U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1962]

উ: খনিজ তৈলের 'উৎপাদক অঞ্চল' (২০২ পৃঃ—২০৭ পৃঃ) এবং 'বিশ্বের ঘটনাবলীতে খনিজ তৈলের স্থান' (২০৯ পৃঃ—২১১ পৃঃ) লিখ।

4 Discuss in details the geographical factors which are essential for the development of hydro-electric power. Which countries of the world have developed their water-power resources and why? *[C. U. B. Com. 1956]

উ: 'জলশক্তি উৎপাদনের অনুকূল অবস্থাসমূহ' (২১৯ পৃঃ—২২২ পৃঃ) এবং 'উৎপাদক অঞ্চল' (২২২ পৃঃ—২২৩ পৃঃ) লিখ।

5. Discuss the uses and the problems of transportation of natural gas

উ: 'অর্থনৈতিক [illegible] ও ব্যবহার' (২১৫ পৃঃ) ও 'পরিবহণ-সমস্যা' (২১৬ পৃঃ—২১৭ পৃঃ) লিখ।

6. Compare and contrast coal, petroleum and hydro-electricity as sources of industrial power. Examine the natural and economic factors favouring the production of hydro-electricity.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উ: 'বিভিন্ন শক্তি-সম্পদের তুলনা' (১৮৪ পৃঃ—[illegible] পৃঃ), 'শিল্পগত তাৎপর্য' (২১৭ পৃঃ—২১৯ পৃঃ) এবং 'জলশক্তি-উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা[illegible]' (২১৯ পৃঃ—২২২ পৃঃ) লিখ।

7. Discuss the geo-economic factors essential for the development of hydro-electric power. In what respects is hydro-electricity superior to other sources of power? [B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উ: 'শিল্পগত তাৎপর্য' (২১৭ পৃ:—২১৯ পৃ:) ও 'জলশক্তি-উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা-সমূহ' (২১৯ পৃ:—২২২ পৃ:) লিখ।

8. Discuss the significance of electricity—a modern refinement of energy use.

উ: 'বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহারে অধুনাতম উৎকর্ষ' (২২৭ পৃ:—২২৯ পৃ:) লিখ।

9. "Petroleum is an outstanding source of fuel, lubricants and international friction." Examine this statement fully.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1963]

উ: 'অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও ব্যবহার' (১৯৮ পৃ:—২০২ পৃ:) এবং 'আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে খনিজ তৈল' (২১১ পৃ:—২১৪ পৃ:) লিখ।

10. Examine the benefits and the problems of inter-connection of power plants and power systems. Illustrate your answer with reference to South Indian conditions. [C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1963]

উ: 'বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার সংযোগসাধন' (২২৯ পৃ:—২৩১ পৃ:) লিখ।

11. What are the various uses and by-products of coal? Discuss how far is coal a localizing factor of industry.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1965]

উ: 'কয়লা' (১৮৫ পৃ:—১৯৭ পৃ:) হইতে লিখ।

একাদশ অধ্যায়

মৃত্তিকা

(Soil)

ভূত্বকের উপরিভাগের শিলা ক্ষয়ীভূত হইয়া মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। সূর্যকিরণ, বায়ু, বৃষ্টিপাত, হিমবাহ, জলপ্রবাহ, উদ্ভিদ্ ও প্রাণী প্রভৃতির দ্বারা প্রতিনিয়ত শিলার ক্ষয়ীভবন ও মৃত্তিকার সৃষ্টি হইতেছে।

মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ (Classification of soil)—দানার সূক্ষ্মতা, রাসায়নিক গঠন ও বর্ণ অনুযায়ী মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে। **দানার সূক্ষ্মতা** অনুযায়ী মাটিকে পাথুরে মাটি (Gravelly soil), বেলেমাটি (Sandy soil), কাদামাটি (Clayey soil), পলিমাটি (Silty soil) ও দো-আঁশ মাটি (Loamy soil) এই কয় শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(১) যে মাটি প্রধানত: পাথর, নুড়ি ও বালির সংমিশ্রণে গঠিত তাহা **পাথুরে মাটি** নামে পরিচিত। এই মাটি কৃষিকার্যের উপযোগী নহে; জমি কর্ষণ করা কঠিন। এই মাটিতে কোথাও কোথাও আলু, ভুট্টা ও মূলার চাষ করা হয়। দু'একস্থানে অন্যান্য অবস্থা-বিশেষ অনুকূল থাকিলে এইরূপ মাটিতে ধান ও গমের চাষ হইতে পারে।

(২) যে মাটি প্রধানত: বালির দ্বারা গঠিত তাহাকে **বেলেমাটি** বলা হয়। কোথাও কোথাও বেলেমাটিতে সামান্য পরিমাণে কাদা বা পলি মিশ্রিত থাকিতে পারে। বেলেমাটির জলধারণ-ক্ষমতা অত্যন্ত কম এবং মাটির উপরের স্তর অনুর্বর। এইজন্য এইপ্রকার মাটিতে সাধারণত: দীর্ঘ মূলবিশিষ্ট গাছ অথবা কাঁটাগাছ জন্মিতে দেখা যায়। আলু, মূলা, শালগম, গাজর, চিনি, বীট এই-প্রকার মাটিতে ভাল জন্মে। তবে ফসল ফলাইবাব পূর্বে মাটিতে উত্তমরূপে সার দেওয়া প্রয়োজন। এইপ্রকার মাটি নদীর ঊর্ধ্বগতিতে, মরুভূমি অঞ্চলে ও অত্যধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) মাটির সূক্ষ্মতম দানার দ্বারা **কাদামাটি** গঠিত। এই দানাগুলি পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ থাকে। এইজন্য কাদামাটি অপ্রবেশ্য অর্থাৎ জল সহজে মাটির মধ্যদিয়া চুঁয়াইয়া বহিতে পারে না, জমির উপর জমিয়া থাকে। এইপ্রকার মাটি ভারি ও গাছের রসে পরিপূর্ণ থাকে। এই

মাটিতে ধান, পাট ও নানাপ্রকার শাকসব্জি ভালো জন্মে। প্রধানতঃ নদীর মোহনা ও নিম্নভূমি অঞ্চল এইপ্রকার মাটির দ্বারা গঠিত হয়।

(৪) বেলেমাটির দানা অপেক্ষা সূক্ষ্ম কিন্তু কাদামাটির অপেক্ষা মোটা দানা লইয়া **পলিমাটি** গঠিত হয়। হিমবাহ ও নদীর দ্বারা বাহিত হইয়া পলিমাটি সমভূমি অঞ্চলে নীত হয়। এইজন্য নদীর মধ্য ও নিম্নগতিতে এই-প্রকার মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মাটি নানাপ্রকার জৈব সার ও খনিজ লবণে পরিপূর্ণ থাকে। এইজন্য ইহা কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ধান, পাট, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি ফসল এইপ্রকার মাটিতে ভালো জন্মে।

(৫) বেলেমাটি এবং কাদা অথবা পলির সংমিশ্রণে **দো-আঁশ মাটি** গঠিত হয়। এইপ্রকার মাটিতে বালি এবং কাদা অথবা পলির পরিমাণ প্রায় সমান সমান থাকে। দুইটি কারণে দো-আঁশ মাটি কৃষিকার্যের পক্ষে সুবিধা-জনক। ইহাতে কিছু পরিমাণ বালি থাকার জন্য জল আস্তে আস্তে চুঁয়াইয়া নীচের দিকে যায়, ফলে মাটির গভীর স্তর পর্যন্ত রসালো থাকে আবার ইহাতে কাদা বা বালি থাকে বলিয়া ইহা অধিক সময় জল ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। অনেকসময় এইপ্রকার মাটি আবহাওয়া হইতে জলকণা শোষণ করিয়া লয়। ধান, যব, যই, ইক্ষু প্রভৃতি ফসল দো-আঁশমাটিতে ভালো জন্মে। নদীর মধ্যগতিতে সাধারণতঃ এইপ্রকার মাটি দেখিতে পাওয়া যায়।

রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী মাটিকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের অরণ্যভূমি অঞ্চলে **পড্‌সল (Podzol)** নামে একপ্রকার মাটি দেখা যায়। এইপ্রকার মাটিতে জৈব অ্যাসিডের পরিমাণ অধিক থাকে। এইজন্য ইহা কৃষিকার্যের উপযোগী নহে। সয়াবীনের ন্যায় কয়েক প্রকার কঠিন শস্য এইপ্রকার মাটিতে উৎপাদিত হইতে পারে। অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলে মাটির দ্রাব্য খনিজ লবণসমূহ জলের সহিত মিশাইয়া দূরবর্তী অঞ্চলে কিংবা মাটির তলদেশে চলিয়া যায়। এই জল যেখানে গিয়া জমা হয় সেখানকার মাটিতে সাধারণতঃ অ্যালুমিনিয়াম ও লৌহঘটিত লবণ এবং অন্য অনেক প্রকার রাসায়নিক লবণ দেখিতে পাওয়া যায়। এইপ্রকার মাটি **পেডলফার (Pedalfar)** নামে পরিচিত। ইহা কৃষিকার্যের উপযোগী নহে। শুষ্ক অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে চুন অথবা চুন-ঘটিত লবণযুক্ত মাটিকে **পেডোক্যাল (Pedocal)** বলে। জলের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে এইপ্রকার মাটিতে উত্তম কৃষিকার্য হইতে পারে।

রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী উল্লিখিত কয়েক শ্রেণীর মৃত্তিকা ব্যতীত নানাকারণে সৃষ্ট নানাপ্রকারের মৃত্তিকা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। আগ্নেয়গিরির লাভা ক্ষয়ীভূত হইয়া একপ্রকার কালো রঙের মাটির সৃষ্টি হয়। ইহা **কৃষ্ণমৃত্তিকা (Black soil)** নামে পরিচিত। এইপ্রকার মাটি তুলা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। জৈব সার বা হিউমাস মিশ্রিত মাটিও কালো রঙের হইতে পারে। এইপ্রকার কৃষ্ণমৃত্তিকাকে **চারনোজেম (Chernozem)** বলে। জলাভূমি ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষিকার্যের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। তৃণভূমি অঞ্চলে ঘাসের পচাপাতা, শিকড় প্রভৃতি মিশ্রিত যে কঠিন কাদামাটি দেখা যায় তাহা **প্রেইরী মাটি (Prairie earth)** নামে পরিচিত। গম-উৎপাদনের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। চিনি-বীট প্রভৃতি ফসলও এই মাটিতে উৎপাদিত হয়। অনেক-সময় মাটির দ্রাব্য অংশ জলের সহিত মিশিয়া নীচের দিকে চলিয়া গেলে মাটির অবশিষ্টাংশ সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট কঠিন কাঁকরে পরিণত হয়। ইহাকে **মাকড়া মাটি বা ঘুটিং বা কঙ্করময় মৃত্তিকা (Laterite soil)** বলে। এইপ্রকার মাটি অনুর্বর ও কৃষিকার্যের অনুপযোগী।

আধুনিক কালে রং অনুযায়ী মাটির শ্রেণীবিভাগ করিবার পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। রং অনুযায়ী হালকা লাল, ধূসর, হালকা নীল, হলুদ, কালো, কমলা, বাদামী, সবুজ প্রভৃতি শ্রেণীর মাটি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকা-সংরক্ষণ (Soil-erosion and soil-conservation)—মৃত্তিকা মানুষের অন্যতম মৌলিক সম্পদ (Basal asset)। কৃষিকার্য, পশুপালন, অরণ্যসম্পদ প্রভৃতি মৃত্তিকার উপর নির্ভরশীল। অথচ মানুষের অদূরদর্শিতা ও অবহেলার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভয়াবহ ভূমিক্ষয়ের (soil-erosion) সৃষ্টি হইতেছে। বন্যা, অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ, অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য, অরণ্যসম্পদের ধ্বংসসাধন প্রভৃতি কারণে ভূমিক্ষয় হইয়া থাকে। ইদানীং অবশ্য **মৃত্তিকা-সংরক্ষণ (soil-conservation)** সম্বন্ধে মানুষ কিছুটা সচেতন হইতেছে এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলিতে সরকারী প্রচেষ্টায় মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। মৃত্তিকা-সংরক্ষণের সমস্যা দুইপ্রকার। প্রথমতঃ, জলের সহিত মিশিয়া কিংবা বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া মাটি যাহাতে স্থান-

পরিবর্তন না করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মাটির উর্বরা-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভূমিক্ষয়ের কারণ সর্বত্র সমান নহে এবং ভূমির উর্বরা-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্বত্র একই রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে চলিবে না। অবস্থা অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে ভূমিক্ষয় বহুলাংশে রোধ করা যায় :—

(১) কৃষি ভূমির চতুর্দিকে তৃণভূমি রচনা করিতে হইবে। (২) কৃষি-জমির চতুর্দিকে, পাহাড়-পর্বতের ঢালে, নদীর উৎপত্তিস্থল ও উর্ধ্বগতিতে, প্রবল বায়ুপ্রবাহের গতিপথে এবং সমুদ্রের তীরে অরণ্যবলয় রচনা করিতে হইবে। (৩) মরুভূমির প্রসার রোধ করিবার জন্য উহার চতুর্দিকে অরণ্য সৃষ্টি করিতে হইবে। (৪) যে হারে বৃক্ষছেদন করা হইবে অন্ততঃ সেই হারে নূতন বৃক্ষরোপণ করিতে হইবে, যাহাতে মোট বনভূমির পরিমাণ হ্রাস না পায়। একথা সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বায়ুপ্রবাহ ও জলপ্রবাহের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিক্ষয় নিবারণ করিবার পক্ষে অরণ্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। (৫) অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ রোধ করিতে হইবে। পশুচারণের জন্য তৃণভূমি ও বনভূমি নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে। (৬) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভূমিকর্ষণ করিতে হইবে। পাহাড়-পর্বতের ঢালে ধাপ কাটিয়া, জমির পাড় উঁচু করিয়া বাঁধিয়া চাষ (Terrace Cultivation) করিতে লইবে। এইরূপ না করিলে ঢালু জায়গায় বৃষ্টির জলের সহিত মাটি ধুইয়া মুছিয়া বাহির হইয়া যাইবে। (৭) কৃষিকার্যে শস্যাবর্তন-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। (৮) যেখানে যেরূপ প্রয়োজন সেইভাবে জমিতে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সার প্রয়োগ করিতে হইবে। (৯) ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকা-সংরক্ষণ সম্পর্কে উপযুক্ত গবেষণার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ভূমিক্ষয়ের সাংঘাতিক পরিণতি সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণকে এই সম্পর্কে শিক্ষিত ও সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the different types of soil found in the world. What steps do you suggest for the conservation of soil?

উঃ 'মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ' (২৩৩ পৃঃ—২৩৫ পৃঃ) এবং 'ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকা-সংরক্ষণ' (২৩৫ পৃঃ—২৩৬ পৃঃ) লিখ।

দ্বাদশ অধ্যায়

কৃষিকার্য

(Agriculture)

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে ৫ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ বৎসর পূর্বে। কিন্তু এই দশ লক্ষ বৎসরের অধিকাংশ সময়েই মানুষ ছিল খাদ্য-সংগ্রাহক (Food gatherer); কোনরূপ খাদ্য-উৎপাদন ছিল তার সাধ্যের অতীত। বন্য ফল-মূল-পাতা আহরণ করিয়া এবং বন্যপশু শিকার করিয়া মানুষ প্রাণধারণ করিত; অর্থাৎ প্রকৃতির মুক্তদানের উপর নির্ভর করিয়া মানুষকে বাঁচিতে হইত। এই অবস্থায় মানুষ ছিল যাযাবর; পশু ও ফলমূলের সন্ধানে এক অরণ্য হইতে অন্য অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত এবং জীবনধারণ ছিল অত্যন্ত অনিশ্চিত।

কৃষিকার্যের শ্রেণীবিভাগ (Types of Agriculture)—নানারূপ বিবর্তনের মধ্যদিয়া অগ্রসর হইয়া হঠাৎ মানুষ একদিন কৃষিকার্য আবিষ্কার করিল। এই আবিষ্কার মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিল। কৃষির প্রথম যুগে গাছের ডাল ছুঁচালো করিয়া অথবা ছুঁচালো পাথর দিয়া মাটি খোঁড়া হইত। কোনরূপ ধাতুর ব্যবহার তখন পর্যন্ত মানুষ শিখে নাই। এই পর্যায়ে পশুকে কৃষিকার্যে ব্যবহার করা শুরু হয় নাই। শুধু নিজের পেশীশক্তির সাহায্যে মানুষ জমি তৈয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া ফসল ঝাড়াই ও ব্যবহারোপযোগী করা পর্যন্ত কৃষির সমস্ত কাজ সমাধা করিত; ফলে কৃষির উৎপাদন ছিল সামান্য ও কষ্টসাধ্য। এই ধরনের **আদিম কৃষিকার্যের (Primitive agriculture)** উদাহরণ আজও উত্তর অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ব্রেজিলের অরণ্য অঞ্চলের কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমেই কাষ্ঠ ও পাথরের পরিবর্তে সামান্য ধাতুর ব্যবহার শুরু হয় কৃষিকার্যে। আদিম কৃষিকার্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ইহার স্থান-পরিবর্তন। কোনস্থানের জঙ্গল কাটিয়া বা পোড়াইয়া জমি বাহির করা হইত। সেই জমি চাষ করিয়া নানাপ্রকারের ফসলের বীজ তাহাতে ছড়ানো হইত। দুই তিন বৎসর বেশ ভালো ফসল পাওয়া যাইত। তাহার পর ভূমিক্ষয়ের জন্য উৎপা— কমিতে আরম্ভ করিত। তখন এই জমি পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গল পরিষ্

করিয়া আবার নূতন জমি বাহির করা হইত। এইভাবে কোন অঞ্চলের সমস্ত জমি নিঃশেষ হইয়া গেলে একটা অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসী বাড়ীঘর ছাড়িয়া আবার নূতন জমির সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িত। ভারতের আসাম অঞ্চলের জুমচাষ এবং মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার মিলপা-চাষ অনেকটা এই ধরনের। আদিম কৃষি-পদ্ধতিতে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল সামান্য; অনেকসময়ে উৎপাদকের নিজের ও পরিবারের ব্যবহারের পক্ষেও যথেষ্ট নয় বলিয়া কৃষিপণ্যের বাণিজ্যও এই পদ্ধতিতে বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই।

ক্রমে মানুষ কৃষিকার্যে পশুকে ব্যবহার করিতে শিখিল। পেশীশক্তির সহিত পশুশক্তি যুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্যে নবযুগের সূচনা হইল। পশুশক্তির সাহায্য পাওয়ায় আদিম কৃষির তুলনায় বৃহদাকারে কৃষিকার্য করা সম্ভব হইল। অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ জমিতে পশু ও মানুষের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অধিক ফসল উৎপাদন করা হইতে লাগিল। উৎপাদিত ফসল কৃষকের নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন মিটাইয়াও সামান্য কিছু কিছু উদ্‌বৃত্ত হইতে লাগিল যাহার দ্বারা বাণিজ্য চলিত। কৃষি-জমিকে কেন্দ্র করিয়া স্থায়ী গ্রাম গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই পর্যায়ের কৃষিকার্যকে **স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিকার্য (Subsistence farming)** আখ্যা দেওয়া হয়। এই পর্যায়ের কৃষি-ভিত্তিক গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। গ্রামের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রায় সমস্তই গ্রামে উৎপাদিত হইত। গ্রামের সন্নিহিত ক্ষেত্রে যে ফসল উৎপাদিত হইত তাহাতে গ্রামবাসীর প্রয়োজন মিটিত; সন্নিহিত অরণ্য হইতে গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হইত। গ্রামে তাঁতী কাপড় তৈয়ারী করিত, কুম্ভকার তৈজসপত্র নির্মাণ করিত। বিনিময় প্রধানতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রামবাসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। লবণ, লৌহ, কাচ, মসলা প্রভৃতি সামান্য দুই-একটি পণ্যদ্রব্য অন্যস্থান হইতে আমদানি করা হইত। শহরের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই ছিল মুষ্টিমেয় এবং যাতায়াত-ব্যবস্থা অনুন্নত। একটা দেশের বিভিন্ন অংশ এবং বিভিন্ন দেশ পরস্পর হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সামান্য দুই-একটি বিলাসোপকরণ এবং মূল্যের তুলনায় হালকা পণ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত; এই অবস্থায় জীবনযাত্রার উপকরণ ছিল সামান্য এবং সমাজের বৃহত্তর অংশের জীবন-যাত্রার মানও ছিল অত্যন্ত নিম্ন। এই ধরনের কৃষি-ভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ শিল্প-বিপ্লবের পূর্বপর্যন্ত বিভিন্ন দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্প-

বিপ্লবের ঢেউ পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে এখনও পৌঁছায় নাই সেখানে এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি এবং এই কৃষি-ব্যবস্থার ভিত্তির উপর গড়িয়া-উঠা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রান্তীয় মণ্ডলের বহু অঞ্চলে এখনও এইপ্রকার কৃষি-ব্যবস্থা দেখা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিল্প-বিপ্লবের ফলে শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে কৃষি-ব্যবস্থায়ও আমুল পরিবর্তন ঘটে। পুরনো কুটীরশিল্প ও ছোটখাটো কারখানার স্থলে বড় বড় কল কারখানা এবং এই সকল কারখানাকে কেন্দ্র করিয়া লণ্ডন, ম্যাঞ্চেস্টার, বার্মিংহাম, আমস্টারডামের ন্যায় বড় বড় শিল্প-শহর গড়িয়া উঠিতে থাকে। এক সকল কারখানায় জড়শক্তির সহায়তায় হাজার হাজার শ্রমিক একত্রে হাজার হাজার টন মাল উৎপাদন করিতে থাকে। ফলে কারখানার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য লক্ষ লক্ষ টন কৃষিজাত কাঁচামাল এবং কারখানা-শহরের অধিবাসী লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোগের জন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য প্রয়োজন হইতে লাগিল। কাঁচামাল ও খাদ্যের এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত ফসল-উৎপাদনের প্রয়োজন দেখা দিল। এই নূতন পরিস্থিতির চাপে কৃষি-ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হইল। স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি-ব্যবস্থায় কৃষিকার্য করা হইত প্রধানতঃ স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। ফলে একটা অঞ্চলের প্রয়োজনীয় সমস্ত রকমের কৃষিজাত দ্রব্য সেই অঞ্চলে উৎপাদন করা হইত। কিন্তু কোন একপ্রকার মাটি ও জলবায়ু সকল প্রকার ফসল উৎপাদনের উপযোগী নহে। ধান ও পাট উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন কাদামাটি ও পলিমাটি; কিন্তু গম উৎপাদনের পক্ষে দো-আঁশ মাটি উপযোগী। রবার ও কোকো উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন নিরক্ষীয় জলবায়ু, কিন্তু রাই ও বীট উৎপাদনের জন্য নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু প্রয়োজন। ধান উৎপাদনের জন্য অধিক বৃষ্টিপাত দরকার, কিন্তু গমের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। সুতরাং অধিক ফসলের চাহিদা মিটাইবার জন্য কোন অঞ্চলের জলবায়ু ও মাটি যে ফসল উৎপাদনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী সেখানে শুধু সেই ফসলই উৎপাদন করা হইতে লাগিল। এইরূপে মালয়ের রবার, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন-অববাহিকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে পাট, কিউবায় ইক্ষু, ব্রেজিলে কফি, ঘানা, নাইজেরিয়া ও পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলিতে কোকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপক্রান্তীয় অঞ্চলে তুলার চাষ কেন্দ্রীভূত হইল। শিল্প-বিপ্লবের সহিত রেল-ইঞ্জিন, বাষ্পীয় পোত প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ায় যাতায়াত-ব্যবস্থায়ও বিপ্লব

সংঘটিত হইল; ফলে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে মালপত্র আদান-প্রদান সহজসাধ্য হইল এবং কৃষিকার্যে স্থানগত বিশেষীকরণ দ্রুততর হইল। কৃষি-ব্যবস্থায় এই পরিবর্তনের ফল স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি-ব্যবস্থা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। স্থানীয় অঞ্চলের প্রয়োজন মিটাইবার স্থলে প্রধানতঃ ভিন্ন অঞ্চলে বা ভিন্ন দেশে রপ্তানির জন্য কৃষিকার্য করা হইতে লাগিল এবং এই রপ্তানির বিনিময়ে বিভিন্ন অঞ্চল বা বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় বিবিধ সামগ্রী আমদানি করা হইতে লাগিল। এই ধরনের কৃষিকার্যকে **বাণিজ্যিক কৃষি (Commercial Firming)** আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কৃষি-উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য শুধু স্থানগত বিশেষীকরণ নহে, ক্রমে ক্রমে যন্ত্রপাতি এবং কয়লা, তৈল ও বিদ্যুতের ন্যায় জড়শক্তির ব্যবহারও কৃষিকার্যে শুরু হইল। বাণিজ্যিক কৃষি-ব্যবস্থায় স্থানগত বিশেষীকরণ, জলশক্তির ব্যবহার, কৃত্রিম সার, সঙ্কর-বীজ প্রভৃতি প্রয়োগ করার ফলে কৃষির উৎপাদন স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি-ব্যবস্থার তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে যে সকল জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকিত সেগুলি কৃষির আওতায় আনা সম্ভব হইয়াছে এবং কৃষকের জীবন-যাত্রার মান পূর্বের তুলনায় বহুগুণ উন্নত হইয়াছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-ব্যবস্থা একটা জটিল আন্তর্জাতিক বিনিময়-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হইয়াছে। কিউবার সর্বপ্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ইক্ষু। এই ইক্ষুর উপর ভিত্তি করিয়া যে শর্করা-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই কিউবার প্রধান শিল্প এবং চিনিই কিউবার রপ্তানির সর্বপ্রধান অংশ; অর্থাৎ কিউবার অর্থনীতি একটি ফসলের উপর নির্ভর করিতেছে। কোন বৎসর কোন কারণে যদি আন্তর্জাতিক বাজারে কিউবার চিনির চাহিদা কমিয়া যায় অথবা যদি ইক্ষু-চিনির দাম পড়িয়া যায়, কিংবা যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি কারণে উপযুক্ত পরিমাণে চিনি রপ্তানি করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কিউবার বৈদেশিক বাণিজ্য ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিবে। চিনি বিক্রয় না হইলে বা কম বিক্রয় হইলে চিনিশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা বেকার হইবে এবং ইক্ষু-চাষ ও চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। উৎপাদন-কর, রপ্তানি-শুল্ক, আয়কর ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারের যে আয় হয় তাহাও হ্রাস পাইবে। মোট কথা কিউবার সমগ্র অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হইবে। **আধুনিক বাণিজ্যিক কৃষি-পদ্ধতির ইহাই সর্বপ্রধান ত্রুটি।** একটি বা দুইটি ফসলের উপর একটা সমগ্র দেশের অর্থনীতি বহুলাংশে নির্ভর করে; অথচ

সেই ফসল হইতে দেশের উপার্জন নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বাজারের উপর, যে বাজারের অবস্থা আরও বহু রপ্তানি ও আমদানিকারক দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্যান্য জটিল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এবং যাহা কোন একটি দেশের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার অতীত।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য আজকাল কোথাও কোথাও বিশেষ করিয়া নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের কয়েকটি উন্নত দেশে **মিশ্র কৃষি-পদ্ধতি (Mixed farming)** প্রচলিত হইয়াছে। মিশ্র কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য কৃষিক্ষেত্রে একই সঙ্গে শস্য-উৎপাদন ও পশুপালন করা। একজন কৃষকের মোট যে পরিমাণ জমি আছে, তাহার কিছু অংশ ব্যবহার করা হয় শস্য-উৎপাদনে এবং অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করা হয় পশুপালনে। জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী গবাদি পশু, মেষ, শূকর, অথবা হাঁসমুরগী পালন করা হইতে পারে। উৎপাদিত ফসল ও পশুজাত দ্রব্যাদির অধিকাংশ নিকটবর্তী শহরাঞ্চলে ব্যবহার করা হয় অথবা বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এক্ষেত্রে কৃষক শুধু শস্য উৎপাদনের উপর নির্ভর করিতেছে না; পশুজাত দ্রব্যাদিও তাঁহার উপার্জনের অন্যতম উৎস। ফলে কোন বৎসর উৎপাদিত ফসলের বিক্রয় ভালো না হইলেও তাহাব সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা নাই। তাহা ছাড়া ফসল-উৎপাদনে ব্যবহৃত জমি আবার কয়েক খণ্ডে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি খণ্ডে বিভিন্ন প্রকারের ফসলের চাষ হয়। অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষক কোন একটি ফসল উৎপাদন না করিয়া, তিনটি বা চারিটি ফসল উৎপাদন করে। কৃষক ও তাহার পরিবারের সদস্যগণ কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় অধিকাংশ শ্রম সরবরাহ করে। কাজের চাপ অনুযায়ী সাময়িকভাবে বাহির হইতে কিছু শ্রমিক ভাড়া করা হইতে পারে। প্রচুর সার, উন্নত বীজ, পশু, উন্নত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম, জড়শক্তি ও শস্যাবর্তন পদ্ধতির সাহায্যে **প্রগাঢ় পদ্ধতিতে চাষ (Intensive cultivation)** করা হয়। ফলে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বেশী হয়। কৃষিক্ষেত্র হইতে মানুষের ভোগের অনুপযোগী যে সকল পাতা, খড়, ছোবড়া ইত্যাদি পাওয়া যায় সেগুলি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং পশুর মল-মূত্রাদি আবার কৃষিক্ষেত্রে সার হিসাবে প্রয়োগ করিয়া ফসলের উৎপাদন বাড়ানো হয়; অর্থাৎ মিশ্র কৃষি-পদ্ধতিতে শস্য-উৎপাদন ও পশুপালন পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে গড়িয়া ওঠে। ইহাতে শস্য ও পশুজাত দ্রব্যের উৎপাদন-খরচ অপেক্ষাকৃত কম হয়। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কোন কোন অংশে, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, নরওয়ে, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডে মিশ্র কৃষি-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে।

কৃষিকার্যের পদ্ধতি (Nature of Agriculture)

কৃষিকার্যের সংজ্ঞা (The Meaning of Agriculture)—কৃষিকার্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। প্রয়োজনীয় উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য মানুষ জমিতে স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করিয়া উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজীবনের স্বাভাবিক জন্ম ও বৃদ্ধি-প্রক্রিয়ার ব্যবহার কিংবা ঐ সকল প্রক্রিয়ার উন্নতি ও গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য যে সকল কার্য করে তাহাদের সমষ্টিকে কৃষিকার্য বলে। এই সংজ্ঞায় দুইটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ, কৃষক কোন্ স্থানে স্থায়িভাবে বসবাস করিবে। যাযাবরের ন্যায় প্রতিনিয়ত একস্থান হইতে অন্যস্থানে ভ্রমণ করিলে চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষকের কাজ প্রকৃতির সহিত। প্রকৃতিকে দিয়া নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য কতটা উৎপাদন করিতে পারিবে তাহার উপর কৃষকের সাফল্য নির্ভর করে। সুতরাং কৃষিকার্যের জন্য মানুষকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়; অর্থাৎ কৃষিকার্যে প্রকৃতিই প্রধান অংশ গ্রহণ করে।

অবশ্য এই সংজ্ঞায় শুধু কৃষিকার্যের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে মানুষ কিভাবে প্রকৃতির সহিত কাজ করে অথবা আধুনিক যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতিতে কিভাবে মানুষ সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির সহায়তায় (যথা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, সংগঠন ইত্যাদি) কৃষিজ দ্রব্যের গুণ ও পরিমাণ-বৃদ্ধিতে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই।

প্রকৃতির উপর কৃষিকার্যের নির্ভরশীলতা (Dependance of Agriculture on Nature)—পূর্বেই বলা হইয়াছে কৃষিকার্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা। প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রাণশক্তির ব্যবহারই কৃষিকার্যের মূল কথা। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি অন্যান্য কার্যকলাপে মানুষের ভূমিকা মুখ্য, প্রকৃতি গৌণ। কিন্তু কৃষিকার্যে প্রকৃতি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, মানুষ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যকারী মাত্র। বীজের অঙ্কুরোদ্গম, গাছের বৃদ্ধি, ফল ধরা ও পাকা

প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া মানুষের সাহায্য ছাড়াই উদ্ভিদের আপন প্রাণশক্তির বলে ঘটিয়া থাকে। মানুষ কেবল জমি কর্ষণ করিয়া, আগাছা নিড়াইয়া, পোকা-মাকড়-রোগ-ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া, জলসেচ বা জলনিকাশের ব্যবস্থা করিয়া এই প্রক্রিয়ার উন্নতি ও গতিবেগ-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে।

কৃষিকার্য নির্ভর করে জলবায়ু, মৃত্তিকা, জৈবিক প্রক্রিয়া এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ্-জীবনের খেয়ালের উপর। কিন্তু ইহাদের কোনটির উপরই মানুষের বিশেষ কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নাই। কোন্ বৎসর বর্ষা কখন শুরু হইবে এবং বেশী হইবে, না কম হইবে, শীত বেশী পড়িবে, না কম পড়িবে সে সম্বন্ধে মানুষের কোন হাত নাই। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রং, রাসায়নিক উপাদান ও সূক্ষ্মতা-বিশিষ্ট মাটি দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সকল গুণ অনুযায়ী মাটির বিভিন্ন ফসল উৎপাদন-ক্ষমতা নির্দিষ্ট হয়। মাটি প্রকৃতির দান এবং ইহার রাসায়নিক গঠন ও উৎপাদন-ক্ষমতার সমস্ত রহস্য এখনও মানুষ উন্মোচন করিতে পারে নাই। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর প্রজনন-ক্ষমতা, গর্ভসঞ্চার এবং বৃক্ষের ফল ও প্রাণীর গর্ভস্থ সন্তানের পরিণতি-প্রাপ্তি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাকৃতিক ছন্দে ঘটিয়া থাকে। মানুষ কতটুকু ইহা নিজের খুশীমতো ঘটাইতে পারে? বৈচিত্র্যই প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুইটি গাছের ফল তো দূরের কথা, একই গাছের কোন দুইটি ফল কখনও সমান নয়। দুই পাত্র ধান বা কলাই একরকমের নয়। মেষের গায়ের কোন দুইটি লোমও সমান নয়; অর্থাৎ কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রাকৃতিক উপাদানই অনিশ্চিত এবং উহাদের উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নাই। এইজন্য জমিতে এবার কি পরিমাণ ও কি গুণের ধান হইবে তাহা কৃষকের পক্ষে বলা অসম্ভব। ঠিক কোন্ দিনে ফসল কাটিবার উপযুক্ত হইবে কৃষকের পক্ষে সে-সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা অসম্ভব; অথচ নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান ব্যবহার করিয়া কারখানায় নির্দিষ্ট গুণে ঠিক কয়খানা কাপড় কোন্ সময়ের মধ্যে পাওয়া যাইবে তাহা নির্ভুলভাবে বলিয়া দেওয়া যায়।

প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করিবার জন্য মানুষের প্রচেষ্টা (Man's efforts to lessen dependance on Nature)—পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রকৃতির শাসন মানুষ কখনও নতমস্তকে মানিয়া লয় নাই। তাই মানুষ সূর্যকিরণের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে না পারিলেও কলা বা ভুট্টা গাছ লাগাইয়া

কফি-চারার জন্য প্রয়োজনীয় ছায়ার সৃষ্টি করিতে পারে। মানুষ কি ধাতুর পরিবর্তন ঘটাইতে পারে? আকাশ হইতে প্রয়োজনমতো কম বা বেশী বৃষ্টি ঝরাইতে পারে? না, আজও তাহা পারে নাই। তবে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক বৃষ্টিপাত হইলে নালা কাটিয়া জলনিকাশের ব্যবস্থা করিতে পারে, অথবা প্রয়োজনের তুলনায় অল্প বৃষ্টি হইলে জলসেচের ব্যবস্থা বা শুষ্ক কৃষি-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে। প্রতিকূল জলবায়ু হইতে সরাইয়া লইয়া অনুকূল জলবায়ুতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে। এইভাবে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলেও মানুষ জলবায়ুর প্রভাব কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করিতে শিখিয়াছে।

মৃত্তিকার উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অবশ্য জলবায়ুর তুলনায় কিছু বেশী। বহুদিনের প্রচেষ্টার পর বর্তমানে মানুষ কোন্ মাটিতে কোন্ ফসল সর্বাপেক্ষা ভালো জন্মে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। শুধু তাহাই নহে প্রয়োজন-মতো মাটির উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার কৌশলও আয়ত্ত করি য়াছে এবং ভূমিক্ষয়-নিবারণের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর জৈবিক প্রক্রিয়ার উপরও মানুষের প্রভুত্বের হস্ত প্রসারিত হইতেছে। বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ্ মানুষ বশ করিতে শিখিয়াছে। প্রয়োজন ও ইচ্ছামতো উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলিকে রদবদল করা সম্ভব হইয়াছে। তবে একথা ভুলিলে চলিবে না যে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগতের একটা সামান্য অংশ মাত্র এ পর্যন্ত মানুষ বশ করিতে শিখিয়াছে। একটা গরু, মহিষ অথবা ঘোড়া বৎসরে একটিমাত্র সন্তান উৎপাদন করে; ইচ্ছামতো আমরা উহাদের দিয়া একটার অধিক সন্তান উৎপাদন করাইতে এখনও পর্যন্ত সক্ষম হই নাই।

প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টায় মানুষ যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে তাহার কতকগুলি হাঁ-ধর্মী (Positive) ও কতকগুলি না-ধর্মী (Negative)। হাঁ-ধর্মী ব্যবস্থাগুলি অনুকূল প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে সমর্থন ও শক্তিশালী করিবার জন্য এবং না-ধর্মী ব্যবস্থাগুলি প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তি-সমূহকে দমন করিবার জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থা শুধু কৃষিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নহে। যাতায়াত ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতিও কৃষিকার্যের উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিতেছে। যাতায়াত ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতির ফলেই কৃষিক্ষেত্রে স্থানগত বিশেষীকরণ সম্ভব হইয়াছে; অর্থাৎ যেখানে যে ফসলটি সর্বাপেক্ষা ভালো জন্মায় সেখানে শুধু সেই ফসল

উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া পৃথিবীর মোট কৃষিজাত ফসলের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। শিল্পের উন্নতি ও শহর-বন্দর গড়িয়া উঠিবার ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে; কৃষির প্রয়োজনীয় নানারূপ যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, সার প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। কৃষির উন্নতির জন্য নানারূপ গবেষণা চলিতেছে ও কৃষিজ দ্রব্য হইতে নূতন নূতন সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে।

কৃষিকার্যের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় মানুষের হস্তক্ষেপের ফল শুধু কল্যাণেই সীমাবদ্ধ নয়, বহুক্ষেত্রে ক্ষতিতেও পর্যবসিত হইয়াছে। মানুষের নির্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতার ফলে বহুস্থানে ভূমিক্ষয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, নদীর জল দূষিত হইয়া মৎসকুল ধ্বংস হইয়াছে, বহু নদী শুকাইয়া গিয়াছে, শান্ত নদী দুরন্ত কূলপ্লাবিনী স্রোতস্বিনীতে পরিণত হইয়াছে, বহু উদ্ভিদ্ ও প্রাণী চিরদিনের মতো পৃথিবীর বুক হইতে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় বর্তমান যন্ত্রযুগেই এই সকল ধ্বংস-সাধন সর্বাধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে। ইদানীং অবশ্য মানুষ এ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে এবং পূর্বক্ষতি-সংশোধন ও নূতন ক্ষতি-রোধ করিবার জন্য ভূমিক্ষয়-নিবারণ এবং মৃত্তিকা-সংরক্ষণ, অরণ্য ও বন্যপশু-সংরক্ষণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নদী-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পক্ষে পৃথিবীব্যাপী প্রচার শুরু হইয়াছে।

কৃষিকার্যে বৈচিত্র্য (The Diversity of Agriculture)—সকল প্রকারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে কৃষিকার্য সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে পৃথিবীতে প্রসার লাভ করিয়াছে। শিল্পদ্রব্য-উৎপাদন, খনিজ সম্পদ-আহরণ ইত্যাদি কার্যকলাপ পৃথিবীর নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে, সকল অঞ্চলে কোন-না-কোন প্রকারের কৃষিকার্য মানুষ গ্রহণ করিয়াছে। ফলে একদিকে যেমন আদিম সমাজের মানুষের মধ্যে কৃষিকার্য দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় অতি আধুনিক উন্নত সমাজে। কৃষিকার্যের উপর ভিত্তি না করিয়া কোনরূপ অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু পৃথিবার প্রায় সর্বত্র কৃষিকার্য হইলেও, কৃষি-পদ্ধতি, কৃষি-সংগঠন কিংবা কৃষিজ দ্রব্য সর্বত্র একরূপ নহে। কোথাও কৃষিক্ষেত্র হইতে একটিমাত্র ফসল উৎপাদন করা হয়, কোথাও হয় একের অধিক ফসল; কোথাও প্রধানতঃ কৃষক এবং তাহার পরিবারের ব্যবহারের জন্য কৃষিকার্য করা হয়; সামান্য উদ্বৃত্ত স্থানীয় অঞ্চলে বিক্রীত হয়। আবার কোথাও প্রধানতঃ বিদেশে রপ্তানির জন্য ব্যাপক আকারে কৃষিকার্য করা হয়। কোথাও শুধু শস্য উৎপাদন

করা হয়, আবার কোথাও শস্য উৎপাদনের সহিত পশুপালন হইয়া থাকে। কোথাও অল্প জমিতে বেশী মূলধন ও শ্রমিক নিয়োগ করিয়া, অধিক ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়; কোন কোন স্থানে আবার বেশী জমিতে অল্প শ্রমিক ও মূলধন ব্যবহার করা হয়। কোথায়ও প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভর করা হয় কৃষিকার্যের জন্য, আবার কোথাও কৃষিকার্যের জন্য সেচ-ব্যবস্থা, কীটনাশক ঔষধপত্র ও সার-প্রয়োগ, সঙ্কর-বীজ ও সঙ্কর-পশু উৎপাদন প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা অপেক্ষাকৃত কম। সংগঠনের ক্ষেত্রেও নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। কোথাও জমিদারী প্রথায়, কোথাও স্বাধীন ব্যক্তিগত মালিকানায়, কোথাও সমবায় প্রথায় বা সরকারী মালিকানায় কৃষিকার্য হইয়া থাকে।

উৎপাদিত পণ্যেও বা কত বৈচিত্র্য! কোথাও রবার, কোথাও চিনি-বীট, কোথাও চা, কফি বা কোকো উৎপাদিত হইতেছে। কোথাও মেষ, কোথাও গরু, মহিষ বা ছাগল পালিত হইতেছে। গরু কখনও পালিত হয় মাংসের জন্য, কখনও বা দুধের জন্য। মেষ পালিত হয় কোথাও পশমের জন্য, কোথাও প্রধানতঃ মাংসের জন্য। কৃষিকার্যে এই বৈচিত্র্যের কারণ দুইটি: (ক) প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও (খ) সামাজিক, রাজনৈতিক ও কারিগরী বৈচিত্র্য।

পূর্বেই বলা হইয়াছে কৃষিকার্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর সর্বত্র ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানগুলি সমান নহে। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই বিভিন্নতা অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের কৃষিজাত দ্রব্য ও কৃষি-পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে পৃথিবীতে নানাপ্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন দেখিতেপাওয়াযায়। ভারতের ন্যায় কোন কোন দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রহিয়াছে, আবার পর্তুগাল, স্পেন, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় দেশে ব্যক্তিগত মালিকানা ও উদ্যোগ এবং অবাধ প্রতিযোগিতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। আবার রাশিয়ায় সরকারী মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ভারতে ব্যক্তিগত ও সরকারী উভয় প্রকার উদ্যোগ ও মালিকানা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। সামাজিক প্রথা, আচার ও ঐতিহ্য সর্বত্র সমান নহে। কারিগরী বিদ্যায়ও সকল দেশ সমান উন্নত নয়। জার্মানী, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া

কারিগরী বিদ্যায় যথেষ্ট উন্নত। কিন্তু নেপাল, মঙ্গোলিয়া, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশ এই দিক দিয়া অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। এইপ্রকার কারিগরী বিদ্যার উন্নতি, রাজনৈতিক অবস্থা, সামাজিক সংগঠন, প্রথা, আচার, ঐতিহ্য প্রভৃতির বিভিন্নতা অনুযায়ী কৃষিজ দ্রব্য, কৃষি-সংগঠন, কৃষি-পদ্ধতি ও কৃষি-উৎপাদনে বিভিন্নতা দেখা যায়।

তবে যত বিভিন্নতাই থাকুক না কেন, সর্বত্রই কৃষিকার্য অল্পাধিক প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

শিল্পোন্নত জগতে কৃষির অবস্থা
(Agriculture in an Industrial World)

যন্ত্রবিপ্লব বলিতে মূলতঃ বোঝায় উৎপাদনকার্যে জৈব-শক্তির পরিবর্তে জড়শক্তির ব্যবহার। এই যন্ত্রবিপ্লব কৃষিকার্যের উপর দুইভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যে সকল শিল্পোন্নত দেশে লোকবসতি-ঘনত্ব অল্প, সেখানে কৃষিকার্যে ব্যাপকভাবে যন্ত্রপাতির প্রয়োগ ঘটিয়াছে; ফলে মাথাপিছু কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সকল শিল্পোন্নত দেশে লোকবসতি-ঘনত্ব বেশী, সেখানে কৃষির যান্ত্রিকীকরণ সম্ভব হয় নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করিয়া অর্থাৎ উন্নত বীজ ও সার প্রয়োগ করিয়া, উন্নত শ্রেণীর পশুপালন করিয়া, মৃত্তিকা-সংরক্ষণ ও জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া, হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কৃষিকার্যে অধিক জমি ও অধিক মূলধন ব্যবহার করিয়া মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইয়াছে; কিন্তু হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইয়াছে শুধু কৃষিক্ষেত্রে অধিক মূলধন প্রয়োগ করিয়া। নাতিনিবিড় লোকবসতিপূর্ণ যে সকল দেশে যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিয়া মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইয়াছে, ইহারা সকলেই রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনা ইহার উদাহরণ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করিয়া হেক্টর-প্রতি উৎপাদন যে সকল দেশে বৃদ্ধি করা হইয়াছে সেখানে এইরূপ রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত পণ্য-উৎপাদন সম্ভব হয় নাই। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি ইহার উদাহরণ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যন্ত্রবিপ্লবের ফলে স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি-ব্যবস্থা ভাঙিয়া যায় এবং ইহার পরিবর্তে বাণিজ্যিক কৃষি-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। এই ব্যবস্থায়

অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিশেষীকরণ (Specialisation)। প্রথমতঃ, এক অঞ্চলে বহুরকম ফসল উৎপাদনের স্থলে বিশেষ একটি বা দুইটি মাত্র ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা হইল। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বে কৃষক ও তাহার পরিবারের সদস্যগণ কৃষিকার্যের সহিত কাপড়-বোনা, বাড়ী-তৈয়ারী প্রভৃতি আরও নানাপ্রকারের কার্যে নিযুক্ত থাকিত। যন্ত্রবিপ্লবের ফলে বৃহদাকার উৎপাদন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় কুটীরশিল্প পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সময় ও শক্তি কৃষিকার্যে নিয়োগ করা কৃষকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক লাভজনক হইল। তৃতীয়তঃ, কৃষিকার্য ক্রমেই জটিল বিনিময়-ব্যবস্থা অর্থাৎ বাজারের উপর নির্ভরশীল হইল।

কৃষির যান্ত্রিকীকরণের ফলে যেরূপ বিবিধ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, সেইরূপ কতকগুলি সমস্যারও সৃষ্টি হইয়াছে। যান্ত্রিকীকরণের সুফলগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল :—

(ক) কৃষি-উৎপাদনের উপর যান্ত্রিকীকরণের প্রভাব—(১) কৃষকের মাথা-পিছু উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। (২) কৃষির উৎপাদন-খরচ হ্রাস পাইয়াছে। (৩) যন্ত্রের সাহায্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে জমি চাষ করা সম্ভব হইয়াছে ; ফলে অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমি চাষ করা সম্ভবপর হইতেছে এবং কৃষিকার্যের উপযোগী সময় বৃদ্ধি পাওয়ায় ফসল-উৎপাদনে নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব হইয়াছে। (৪) যন্ত্রের সাহায্যে বৃহদাকারে জলসেচ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা, মৃত্তিকা-সংরক্ষণ ও প্রাপ্ত-জলের সদ্ব্যবহার করা সহজসাধ্য হইয়াছে। (৫) যন্ত্রের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত নিখুঁতভাবে কাজ করা সম্ভব বলিয়া কৃষিজ দ্রব্যের মান নির্ণয় করা যায়। (৬) যন্ত্রের সাহায্যে অল্পখরচে কার্যকরীভাবে রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। (৭) নানারূপ উপজাত-দ্রব্য-উৎপাদন ও নষ্টশস্যের সদ্ব্যবহার সম্ভব হইয়াছে। (৮) মানুষের কঠোর কায়িক শ্রমের লাঘব হইয়াছে। (৯) কৃষিকার্যে ট্রাক্টরের ন্যায় যন্ত্র-ব্যবহারের ফলে পশুর প্রয়োজন কমিয়াছে ; ফলে পশুর খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে জমি প্রয়োজন হইত তাহা অন্য কাজে ব্যবহার করা যায়। (১০) পশু ও শস্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব হইয়াছে।

(খ) কৃষিজ দ্রব্য বিক্রয় ও কৃষির সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের উপর যান্ত্রিকী-করণের প্রভাব—সড়ক, রেলপথ, জলপথ ও আকাশপথের উন্নতি হওয়ায়

পরিবহণ-ব্যবস্থা দ্রুতগতি-সম্পন্ন ও সুলভ হইয়াছে। ফলে দূরবর্তী বাজারে কৃষিজাত পণ্য প্রেরণ করা সম্ভব হইতেছে, কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা এবং কৃষকের উপার্জন বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন কোন অঞ্চলে এমন দ্রব্য উৎপাদিত হয় যাহা দূরবর্তী বাজারে ছাড়া বিক্রয় করা সম্ভব নয়। দ্রুতগতি বিমানপথের সাহায্যে পচনশীল দ্রব্যাদি পরিবহণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। (২) দ্রুত জমানোর পদ্ধতি, হিমায়ন-যন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ায় কৃষিজাত দ্রব্যাদি বাজারে প্রেরণের আরও সুবিধা হইয়াছে। (৩) যাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কৃষিজ দ্রব্যাদি প্রেরণের ন্যায় কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আনয়ন অপেক্ষাকৃত সুলভ ও সুবিধাজনক হইয়াছে।

(গ) কৃষিকার্যের উপর বিজ্ঞাপনের প্রভাব—(১) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সারের প্রয়োগ করিয়া বর্তমানে মৃত্তিকার উর্বরা-শক্তি উদ্ধার, বৃদ্ধি ও অক্ষুণ্ণ রাখা যাইতে পারে। (২) নূতন ধরনের ফসল আবিষ্কার করিয়া ভূমির উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করা যায়, এবং অত্যধিক শীতল বা শুষ্ক জলবায়ুর জন্য যে সকল স্থানে কৃষিকার্য করা সম্ভব হইত না, সেই সকল স্থানে কৃষিকার্য প্রসারিত হইতে পারে। (৩) মৃত্তিকা লইয়া গবেষণা কৃষির উন্নতিসাধনে প্রভূত সহায়তা করিতেছে। (৪) প্রজনন-শাস্ত্রের উন্নতির ফলে উন্নত শ্রেণীর ফসল ও চাষ করিয়া কৃষির উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-খরচও হ্রাস পাইতেছে। অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল পরিবেশেও পশু ও ফসলের উৎপাদন সম্ভব হইতেছে। (৫) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শস্যাবর্তন ও ভূমিকর্ষণের ব্যবস্থা করিয়া এবং কৃষি-সংগঠনের উন্নতি সাধন করিয়া কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনে স্থায়ী উন্নতি-বিধান করা সম্ভব।

আধুনিক কৃষি-সমস্যা (Modern Farm Problems)—শিল্প-বিপ্লবের পর হইতে আজপর্যন্ত কৃষির সকল প্রকার উন্নতি সত্ত্বেও পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে কৃষি অর্থনীতি শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যে পতিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালেও এই দুরবস্থার সম্ভাবনা একেবারে লোপ পায় নাই। গত দুইশত বৎসর ধরিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নতির ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে কৃষির উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু এই সকল দেশে জনসংখ্যা ও কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদার হার সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইলেও বিংশ শতাব্দীতে উহা

ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইয়া কোন কোন দেশে একেবারে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে; ফলে উপযুক্ত মূল্যে যে পরিমাণ কৃষিজ দ্রব্য বিক্রয় হইতে পারে, বৎসরের পর বৎসর তাহা অপেক্ষা অধিক দ্রব্য উৎপাদন করা হইতেছে এবং কৃষিকার্যে দীর্ঘস্থায়ী উদ্‌বৃত্ত-সমস্যা ও লোকসানের সৃষ্টি হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্যে আধুনিক কৃষি-সমস্যার ইহাই মূল ঐতিহাসিক কারণ। ইহা ব্যতীত দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা, যুদ্ধভীতি ও তাহার ফলস্বরূপ জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মুদ্রা-ব্যবস্থায় ক্রমাগত বিশৃঙ্খলা কৃষির সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তোলে। কৃষির দুরবস্থার প্রধান দুইটি লক্ষণ হইল শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের তুলনায় কৃষিকার্যে নিযুক্ত কৃষকের উপার্জনে স্বল্পতা এবং উপার্জনের পরিমাণে অনিশ্চয়তা।

বর্তমান কৃষি-সমস্যার মূলে রহিয়াছে বিভিন্ন কারণ; ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি **কারণ (Causes)** বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

(ক) কৃষি ও শিল্পের মধ্যে অসামঞ্জস্য আধুনিক কৃষিকার্যের অন্যতম প্রধান সমস্যা। পূর্বেই বলা হইয়াছে কৃষিকার্য বহুলাংশে প্রকৃতি-নির্ভর বলিয়া কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন, গুণ এবং ফসল কাটার সময়ের উপর কৃষকের পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নাই। কৃষিজাত পণ্যের বাজারের উপর তাহার কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নাই। কৃষিজাত দ্রব্যের মোট উৎপাদনের তুলনায় কোন একটি খামারের উৎপাদন অতি নগণ্য। তাছাড়া কৃষকের সহিত ভোগকারীর কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। কৃষকের নিকট হইতে কৃষিজাত দ্রব্য প্রথমে ব্যবসায়ীর হাতে, সেখান হইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারখানায় এবং কারখানা হইতে ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছায়। কৃষির সাজ-সরঞ্জাম, যথা, ট্রাক্টর, পেট্রোল ইত্যাদির ক্রেতা হিসাবেও বাজারের উপর প্রভাব বিস্তারের কোন ক্ষমতা কৃষকের নাই।

কৃষিজ দ্রব্যের বাজার-দাম, উহার উৎপাদন-খরচ ও কৃষকের জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় প্রভৃতির উপর কৃষকের লাভ-লোকসান নির্ভর করে। কৃষক তাহার পণ্য বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাইবে তাহার দ্বারা তাহাকে (১) কৃষি-যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ও গোলাঘর ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ মিটাইতে হইবে, (২) কৃষিকার্যের জন্য ঋণ করিয়া থাকিলে তাহার সুদ দিতে হইবে, (৩) গৃহ-পালিত পশু থাকিলে তাহার ভরণ-পোষণের খরচ মিটাইতে হইবে, (৪) বীজ, সার, জ্বালানি প্রভৃতির মূল্য দিতে হইবে, (৫) নিজের ও

পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাইতে হইবে এবং (৬) জমির খাজনা ইত্যাদি দিতে হইবে।

কৃষিজ পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য নির্ভর করে পণ্যের পরিমাণ ও মূল্যের উপর। সাধারণতঃ পণ্যের পরিমাণ বেশী হইলে মূল্য কম হয়। কিন্তু কৃষিকার্যে মোট খরচের তুলনায় স্থায়ী খরচের অংশ অত্যধিক বলিয়া, কৃষির উৎপাদন-পদ্ধতি দীর্ঘস্থায়ী। প্রকৃতি-নির্ভর বলিয়া বাজার-দামের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উৎপাদনের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয় না। ইহার ফলে বাণিজ্য-চক্র (Trade cycle), তেজী-মন্দা প্রভৃতি শিল্প ও বাণিজ্যকে যেভাবে প্রভাবিত করে, কৃষকের উপর তাহা অপেক্ষা ভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শিল্পসংগঠনকারী যত দ্রুত বাণিজ্য-চক্রের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে, কৃষকের পক্ষে তাহা কখনই সম্ভব নহে।

(খ) কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও র‍্যাশান্যালাইজেসনের ফলে কৃষিকার্যে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। কৃষির যান্ত্রিকীকরণ এবং কৃষিকার্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করার ফলে কৃষির উৎপাদন যে হারে বৃদ্ধি পায়, অধিকাংশ সময়েই চাহিদা সেই হারে বৃদ্ধি পায় না; ফলে মূল্য কমিয়া যায়। অবশ্য যন্ত্র-প্রয়োগের ফলে খরচও কিছু কম হইতে পারে। কিন্তু উৎপাদন-খরচ যে হারে হ্রাস পায়, মূল্য যদি তহো অপেক্ষা অধিক হারে হ্রাস পায়, তাহা হইলে লোকসান দেখা দিবে। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কৃষিকার্যের চরিত্রই এমন যে লোকসান হইবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন হ্রাস করা সম্ভব হয় না। ফলে কৃষির উন্নয়নমূলক কার্য ও ভূমির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা ঘটিতে থাকে এবং ভূমিক্ষয় ও অন্যান্যভাবে স্থায়ী ক্ষতির সৃষ্টি হয়।

(গ) কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদার বিশেষ প্রকৃতির জন্য আধুনিক কৃষি-সমস্যা জটিলতর হইয়াছে। প্রথমতঃ, কৃষিজাত দ্রব্য বিশেষতঃ খাদ্যশস্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অত্যন্ত কম। ফলে কৃষিজ পণ্যের মূল্য হ্রাস পাইলে চাহিদা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। অনুরূপভাবে উপার্জন যে হারে বৃদ্ধি পায় কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদা সেই হারে বৃদ্ধি পায় না। জাতীয় আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই মোট আয়ের অপেক্ষাকৃত কম অংশ কৃষিজাত পণ্য-ক্রয়ে ব্যয়িত হইতে থাকে। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ক্রমেই অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক কৃষকের প্রয়োজন হয় এবং কৃষিকার্য জাতীয় অর্থনীতিতে ক্রমেই কম গুরুত্বপূর্ণ

অংশ গ্রহণ করিতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পোন্নতি ও শহরের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক পরিশ্রমের পরিমাণ কমিয়া যায়; ফলে খাদ্যের চাহিদা হ্রাস পায়। তাহা ছাড়া শিল্পোন্নতি একটা নির্দিষ্ট স্তরে আসিয়া পৌঁছিলে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির হারও হ্রাস পায়; ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা-বৃদ্ধির গতি শ্লথ হইয়া আসে। তাহা ছাড়া জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। এই সকল অবস্থার সহিত দ্রুত সামঞ্জস্যবিধান কৃষিকার্যের পক্ষে সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ. শিল্পের তেজী-মন্দার ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চতুর্থতঃ, কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদা অনেকসময় শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাসায়নিক নীলের সহিত প্রতিযোগিতায় কৃষিজ নীলের চাহিদা লোপ পাইয়াছে। কৃত্রিম রেশমের প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিক রেশমের চাহিদা হ্রাস পাইতেছে। এইরূপ আরও অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

সমাধান (Remedies)—আধুনিক কৃষি-সমস্যার সমাধানের প্রশ্ন বিবেচনা করিবার সময় একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কৃষিকার্য নিজেই এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। কারণ পূর্বের বিশ্লেষণ হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে, এই সকল সমস্যার মূল কৃষিক্ষেত্রের বাহিরে বহুদূর প্রসারিত রহিয়াছে। কৃষিকার্য যে বাজারের উপর নির্ভরশীল, তাহা নিয়ন্ত্রিত হয় শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সরকারী নীতি প্রভৃতির দ্বারা। কৃষক মূলধনের ব্যাপারেও ব্যাঙ্ক, জমিদার, সরকার প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রযুক্তিবিদ্যার দিক হইতে কৃষিকার্য শিল্পের উপর এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার জন্য সরকারের উপর নির্ভরশীল। স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি-ব্যবস্থার অবসানের দিন হইতে কৃষিকার্যের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও লোপ পাইয়াছে।

কৃষি-সমস্যার সমাধান দুই প্রকারে হইবে: (১) স্বল্পমেয়াদী সমাধান, (২) দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী সমাধান। স্বল্পমেয়াদী সমাধানের জন্য সরকারী অর্থসাহায্য, ঋণমকুব, উপযুক্ত মূল্যমান বজায় রাখিবার ব্যবস্থা, বিশেষ বিশেষ ফসলের জমির পরিমাণ, নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য সমস্যার মূলে হাত দিতে হইবে। কৃষির সহজাত প্রকৃতি-নির্ভরতা বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া যথাসম্ভব হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাণিজ্য-চক্রের সংঘটন ও উহার তীব্রতা হ্রাস করিতে হইবে। একচেটিয়া কারবার রোধ

করিতে হইবে এবং শিল্পাদি অকৃষি কার্যকলাপের প্রসার সাধন করিতে হইবে।

খাদ্যশস্য (Food Crops)

কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রধানত: দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে : (১) খাদ্যশস্য ও (২) অন্যান্য শস্য। মানুষের খাদ্য প্রয়োজন হয় দেহগঠনের জন্য ও কর্মশক্তি সৃষ্টির জন্য। দেহগঠনের জন্য যে খাদ্য প্রয়োজন হয় তাহাকে আমরা বলি আমিষজাতীয় খাদ্য (Protein)। এই খাদ্য পাওয়া যায় ডিম, মাছ, মাংস, ছানা, দুধ প্রভৃতি হইতে। আর কর্মশক্তি সৃষ্টির জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন হয় তাহাকে আমরা বলি শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য (Carbohydrate)। এইজাতীয় খাদ্যের শতকরা ৯৫ ভাগই আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি ধান, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য হইতে। এই দিক দিয়া মানব-জীবনের পক্ষে খাদ্যশস্যের গুরুত্ব অসাধারণ। পৃথিবীব্যাপী মানুষের অপ্রতিহত কর্মপ্রবাহ বহুলাংশে এই সকল খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য প্রকারের খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই সকল খাদ্যশস্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ হইল গম, ধান, ভুট্টা, যব, রাই, ঘই ও জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি। মোট উৎপাদন, ব্যবহার এবং উৎপাদনে নিযুক্ত জমির পরিমাণের দিক দিয়া গম ও ধান সকল প্রকারের খাদ্যশস্যের মধ্যে প্রধান এবং পরস্পরের সমকক্ষ। কিন্তু দুইটি কারণে গমের গুরুত্ব সর্বাধিক। প্রথমতঃ, পৃথিবীতে গমের চাষ ও ব্যবহার ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। পূর্বে যে সকল অঞ্চলে গমের চাষ হইত না কিংবা যে সকল অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ গম ব্যবহার করিত না, আজকাল সেই সকল অঞ্চলে গমের চাষ ও গমের ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে গমের চাষ ও ব্যবহার ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সমস্ত প্রকারের খাদ্যশস্যের মধ্যে গমের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রতিবৎসর পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ১৮ হইতে ২০ ভাগ গম যেখানে আন্তর্জাতিক বাজারে কেনাবেচা হয়, ধানের ক্ষেত্রে সেখানে হয় মাত্র শতকরা ৭।৮ ভাগ। তবে এখনও পর্যন্ত চাউলভোজী মানুষের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক।

গম (Wheat)

প্রস্তরযুগেও যে গমের চাষ হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গম মানুষের একটি প্রধান খাদ্য। গম হইতে আটা ও ময়দা তৈয়ারী করিয়া উহা হইতে রুটি প্রস্তুত করা হয়। গম হইতে শ্বেতসার (Starch)-জাতীয় জিনিসও প্রস্তুত হয়। এই শ্বেতসার হইতে গ্লুকোজ ও আঠা প্রস্তুত হয়। গমের খড় ও কুঁড়া পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই খড় হইতে পশুদের বিছানা ও নিকৃষ্ট ধরনের কাগজ প্রস্তুত হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—সাধারণতঃ গম নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে উৎপন্ন হয়। ক্রান্তীয় মণ্ডলেও বর্তমানে ব্যাপকভাবে গমের চাষ করা হইতেছে। উত্তর গোলার্ধে ২০° হইতে ৬০° উঃ এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ২০° হইতে ৪০° দঃ অক্ষাংশের দেশগুলি গমচাষের উপযুক্ত স্থান, কারণ এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, উত্তাপ ও আবহাওয়া গম উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গমগাছের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়। বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও চারার বৃদ্ধির প্রথম পর্যায়ে আর্দ্র ও শীতল আবহাওয়ার প্রয়োজন। উপযুক্ত আর্দ্রতার উপর গাছের গোছ অর্থাৎ একটা বীজ হইতে কতগুলি অঙ্কুর বাহির হইবে তাহা নির্ভর করে এবং যত বেশী অঙ্কুর বাহির হইবে হেক্টর-প্রতি উৎপাদনও তত বেশী হইবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে গাছের শীষ বাহির হইবার সময় উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়ার প্রয়োজন। তৃতীয় পর্যায়ে গমের দানার উপযুক্ত পুষ্টির জন্য সামান্য বৃষ্টিপাত হইলে ভালো হয়। চতুর্থ পর্যায়ে পাকিবার জন্য উষ্ণ ও রৌদ্রকরোজ্জ্বল আবহাওয়া একান্ত প্রয়োজন। গমগাছের বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থায় বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয় বলিয়া স্টেপ্‌ ও প্রেইরী অঞ্চলের ন্যায় যে সকল স্থানে বসন্তকালে বৃষ্টিপাত হয় সেখানে গমের চাষ সর্বাপেক্ষা ভালো হয়। গমের গুণও বহুলাংশে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। এই কারণে ভূমধ্যসাগরীয় অল্প-বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ও ক্রান্তীয় অধিক-উত্তাপযুক্ত অঞ্চলে শক্ত গম উৎপাদিত হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে গম উৎপাদিত হয় তাহা লাল এবং অস্ট্রেলিয়ার সাদা নরম গম উৎপাদিত হইয়া থাকে।

গম-চাষের জন্য কমপক্ষে ১৪° সেঃ (৫৭° ফাঃ) **উত্তাপ** এবং অন্ততঃ ৫০ সেঃ মিঃ (২০″) **বৃষ্টিপাত** প্রয়োজন; কিন্তু ১০০ সেঃ মিঃ-এর বৃষ্টিপাত গম-চাষের অনুপযোগী। শীতকালীন গমের পক্ষে অন্যান্য অবস্থা অনুকূল থাকিলে

গাছ জন্মাইবার সময় ২৫-৪০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হইলেও গমচাষ করা যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে জলসেচের বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন।

যে মাটিতে বালি ও কাদার পরিমাণ সমান থাকে, এইরূপ উর্বর ভারী **দো-আঁশ মাটি** গমচাষের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। ব্যাপক চাষ ও জল নিষ্কাশনের জন্য সমতলভূমি ও অল্প ঢালু জমি গমচাষের উপযোগী। গম জমির উৎপাদিকা-শক্তি সত্বর নষ্ট করে বলিয়া নিয়মিত সার-প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হয়। সাধারণতঃ নাইট্রোজেন-ঘটিত সার গমচাষের পক্ষে উপযোগী। জার্মানী, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে জমির উৎপাদিকা-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শস্যাবর্তন-পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

গাছ জন্মাইবার সময় অন্ততঃ তিন মাস সময় জমিতে বরফ পড়িলে ইহা চাষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। গম-চাষের জন্য অনুন্নত দেশে প্রচুর সুলভ **শ্রমিক** দরকার। কারণ চাষের সকল কাজই এখানে হাতে করিতে হয়। কিন্তু উন্নত দেশে ট্রাক্টর ও ফসল-কাটিবার যন্ত্র দ্বারা মানুষের শ্রম বহুলাংশে লাঘব করা হইয়াছে।

যে সকল দেশে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করা হয়, সেখানে **হেক্টর-প্রতি উৎপাদনের হার** বাড়িয়াছে। অনুন্নত দেশে এখনও প্রাচীন প্রথায় চাষ-আবাদ করায় হেক্টর-প্রতি উৎপাদনের হার অনেক কম। হল্যাণ্ডে হেক্টর-প্রতি উৎপাদনের হার ১৫০ বুশেল, ডেনমার্কে ১৩৮ বুশেল, বৃটেনে ১০৪ বুশেল, ফ্রান্সে ৬৫ বুশেল, ইটালিতে ৬০ বুশেল এবং ভারতে মাত্র ২৭ বুশেল। (১ বুশেল প্রায় ২৭ কিলোগ্রামের সমান)।

সাধারণতঃ দুইপ্রকার গমের চাষ হয়—**শীতকালীন গম** ও **বাসন্তিক গম**। শীতপ্রধান দেশে শীতকালে তুষারপাত হওয়ায় এখানে বসন্তকালে গমের চাষ হয়; যেমন, কানাডা, রাশিয়া ইত্যাদি। এইজন্য এখানকার গমকে বাসন্তিক গম বলা হয়। উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শীতকাল গমচাষের উপযোগী; সেইজন্য ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশে শীতকালে গমের চাষ হয়।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Growing areas)—ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সমস্ত দেশে, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে, এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান, তুরস্ক, চীন, জাপান, ইরাণ প্রভৃতি দেশে, আফ্রিকার মিশর, মরোক্কো, টিউনিশিয়া, আলজেরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায়, এবং দক্ষিণ আমেরিকায় প্রধানতঃ আর্জেন্টিনা ও চিলিতে গম উৎপাদিত হয়। উৎপাদনের

অঞ্চলগুলি দুইপ্রকার ; কয়েকটি দেশ শুধু স্থানীয় চাহিদা মিটাইবাব জন্য গম চাষ করে ; যেমন, ভাবত, বৃটেন ইত্যাদি। অনেক দেশ প্রধানতঃ বিদেশে বপ্তানি কবিবাব জন্যই গমেব চাষ কবে। যেমন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি।

পৃথিবীর মোট গম-উৎপাদন—২৬ কোটি ৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন
(১৯৬৪-৬৫)

বাশিয়া	৭	কোটি	৮	লক্ষ	মেঃ	টন	ভাবত	৯৭	লক্ষ	মেঃ	টন
মাঃযুক্তবাষ্ট্র	৩	”	৫০	”	”	”	তুবস্ক	৯১	”	”	”
চীন	৩	”	১৩	”	”	”	অস্ট্রেলিয়া	৯০	”	”	”
কানাডা	১	”	৬৩		”	”	ইটালি	৮৬	”	”	”
ফ্রান্স	১	”	৩৬	”	”	”	আর্জেন্টিনা	৭৩	”	,	”

১ মেট্রিক টন = ৯৮ বড় টন—মোটামুটি ২৭ ৮ মণ।

F A. O.—Monthly Bulletin, March, 1965 সংখ্যা হইতে সংগৃহীত।

রাশিয়া—গম-উৎপাদনে পৃথিবীতে বাশিয়াব স্থান প্রথম। বিপ্লবেব পূর্বে বাশিয়া (U. S. S. R.) পৃথিবীব মাত্র শতকবা ১০ ভাগ গম উৎপন্ন কবিত।

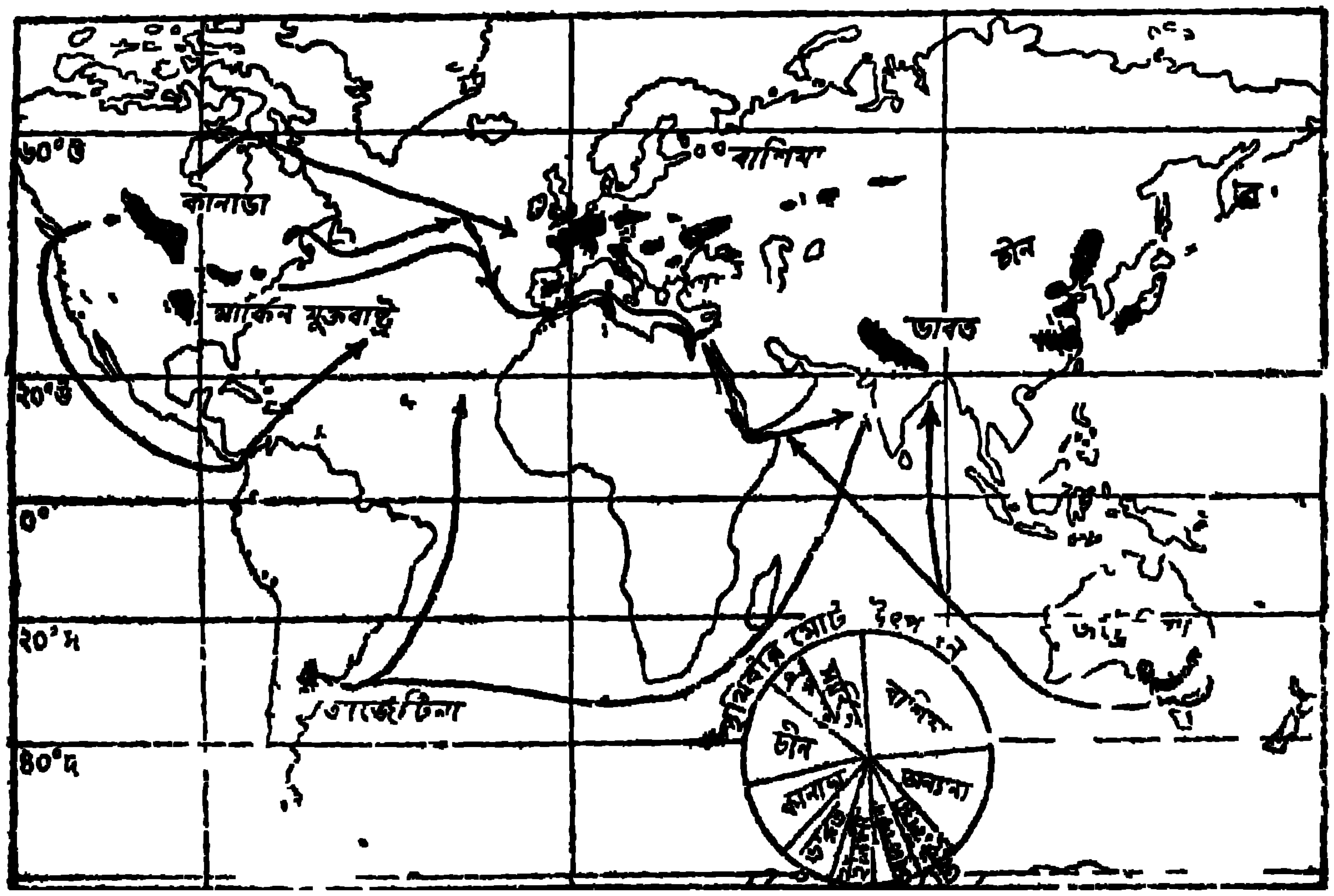

পৃথিবীব গম-উৎপাদক অঞ্চলসমূহ
(তীরচিহ্ন দ্বারা আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশসমূহ দেখানো হইয়াছে।)

কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ২৮ ভাগ উৎপন্ন করে। এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে সরকারের ঐকান্তিকতা, বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতি এবং পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন। প্রধানতঃ ইউক্রেনে শীত-কালীন গম এবং ডন নদীর পূর্বাঞ্চলে ও সাইবেরিয়ায় বসন্তকালীন গমের চাষ হয়। গমবলয় রুমানিয়া হইতে শুরু করিয়া ইউক্রেনের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল ও কাস্পিয়ান হ্রদের উত্তর তীরবর্তী শুষ্ক অঞ্চলের মধ্যদিয়া দক্ষিণ সাইবেরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত। অন্যান্য স্থানেও অল্প অল্প গমের-চাষ হয়। এই দেশের জনসংখ্যা বেশী; কিন্তু আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়াও রাশিয়া বর্তমানে অন্যান্য দেশে অল্প পরিমাণে গম রপ্তানি করিতেছে। কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত খারসন্ ও ওডেসা বন্দর মারফত এই গম রপ্তানি হইয়া থাকে। সাইবেরিয়া অঞ্চলে গমচাষ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—পৃথিবীতে গম-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.) দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কিছুদিন পূর্বেও ইহার স্থান প্রথম ছিল, কিন্তু বর্তমানে রাশিয়া সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। মন্‌টানা, মিনেসোটা, উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা, কানসাস্, নেব্রাস্কা, ওক্‌লাহোমা, মিসৌরী প্রভৃতি প্রদেশগুলি গমচাষের জন্য বিখ্যাত। মিনেসোটা ও উত্তর ডাকোটা অঞ্চলের লোহিত নদীর উপত্যকায় (Red River Valley) এত গম উৎপন্ন হয় যে, ইহাকে "পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি" (Bread basket of the Word) বলা হয়। আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অধিক হওয়ায় প্রচুর গম বিদেশে রপ্তানি হয়। নিউ ইয়র্ক বন্দর মারফত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ গম রপ্তানি হইয়া থাকে।

চীন—গম-উৎপাদনে চীন (China) তৃতীয় স্থানে অধিকার করিয়াছে। উত্তর চীনে হোয়াংহো নদীর উপত্যকায় প্রচুর গমের চাষ হইয়া থাকে। মধ্য চীনে ইয়াংসি-কিয়াং নদীর উপত্যকায় ধান ও গম উভয় প্রকার ফসলের চাষ হয়। মাঞ্চুরিয়ায় গমচাষ প্রসারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। লোকসংখ্যা অধিক হওয়ায় চীনের পক্ষে গম রপ্তানি করা সম্ভব হয় না।

কানাডা—গম-উৎপাদনে কানাডা (Canada) চতুর্থ স্থান অধিকার করিলেও, গম-রপ্তানিতে এই দেশ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে প্রধানতঃ বসন্তকালীন গমের চাষ হয়। ম্যানিটোবা, সাস্‌কাচুয়ান ও আল্‌বার্টা প্রদেশ কানাডার শতকরা ৯২ ভাগ গম উৎপন্ন করে। এখানে

যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাপক পদ্ধতিতে গম উৎপাদন করা হয়। গমের বিখ্যাত বাজার উইনিপেগ ; এখান হইতে মন্টি ল, হ্যালিফাক্স, ভ্যাঙ্কুভার প্রভৃতি বন্দর মারফত গম রপ্তানি করা হয়।

ফ্রান্স—ইউরোপ মহাদেশে রাশিয়া ব্যতীত ফ্রান্সেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমিতে গমের চাষ হয়। এই দেশের উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম অংশে এবং প্যারিস উপত্যকায় গম উৎপাদিত হয়। ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে জোট বাঁধায় ইদানীং ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি দেশে গমের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারত—গম-উৎপাদনে ভারত বর্তমানে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই দেশে গম-উৎপাদন-বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। বিশেষ করিয়া ভাকরা-নাঙ্গালের ন্যায় নদী-উপত্যকা পরিকল্পনাগুলির সাফল্যজনক রূপায়ণের ফলে এই দেশে গমের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ. রাজস্থান, বিহার, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। ইদানীং ক্রমেই দক্ষিণদিকে গমের চাষ প্রসার লাভ করিতেছে।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রধানতঃ দুইটি অঞ্চলে গমের চাষ হয়। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল মারে-ডার্লিং নদীর শুষ্কপ্রায় উপত্যকা অঞ্চল। মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলেও গমের চাষ হইয়া থাকে।

আর্জেন্টিনার পম্পা তৃণভূমি অঞ্চলে প্রায় ছয়শত মাইল বিস্তৃত গমের ক্ষেত রহিয়াছে। এখানকার উর্বর মৃত্তিকা, মৃদু শীতকাল, বসন্তকালীন বৃষ্টিপাত এবং গম পাকিবার সময়ে শুষ্ক ও সূর্যকরোজ্জ্বল আবহাওয়া, গম-চাষে বিশেষভাবে সহায়তা করে। অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনায় নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যাপক পদ্ধতিতে (extensive method) গমের চাষ হইয়া থাকে। এই দুই দেশে লোকসংখ্যা অল্প বলিয়া প্রচুর পরিমাণে গম বিদেশে রপ্তানি হয়। **পাকিস্তানের** পশ্চিম অংশে সিন্ধুনদের উপত্যকা গমচাষের জন্য বিখ্যাত। **ইটালিতে** পো উপত্যকা, **নিউজিল্যাণ্ডে** ক্যান্টারবেরীর সমভূমি, **পশ্চিম পাকিস্তান**, **তুরস্ক** ইত্যাদি গমচাষের জন্য বিখ্যাত।

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য (Trade)—প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে রাশিয়া গমের রপ্তানি-বাণিজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিত। কিন্তু বর্তমানে

রপ্তানি-বাণিজ্যে কানাডা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার মোট উৎপাদনের শতকরা ৭৪ ভাগ রপ্তানি হয় এবং মাত্র ২৬ ভাগ দেশে ব্যবহৃত হয়। এই দেশের জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। সেইজন্য গমের উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা অনেক কম। যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা এবং অস্ট্রেলিয়াও প্রচুর গম রপ্তানি করিয়া থাকে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে উৎপাদনের তুলনায় জনসংখ্যা অত্যধিক। সেইজন্য বৃটেন, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে প্রচুর গম আমদানি হয়। এশিয়ার ভারত ও জাপান গম আমদানি করিয়া থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশ প্রতিবৎসর মোট ১৬২ লক্ষ মেঃ টন গম রপ্তানি করে।

আন্তর্জাতিক গম-চুক্তি (International Wheat Agreement)—গম বহু দেশে মানুষের প্রধান খাদ্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও ইহা সকল প্রকার খাদ্যশস্যের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে বিভিন্ন দেশের সরকার গমের উৎপাদন, সরবরাহ ও বাণিজ্য সম্পর্কে বিশেষরূপে আগ্রহশীল। বহুদিন ধরিয়া পৃথিবীর অর্থনীতিবিদ্‌ ও রাজনীতিবিদ্‌গণ আন্তর্জাতিক বাজারে গমের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাবের সমাধান কি করিয়া করা যায় সে সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। ইহারই ফলস্বরূপ গমের ঘাটতি ও উদ্‌বৃত্ত দেশগুলিকে একটি সম্মেলনে আহ্বান করিয়া পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তির উপর একটি চুক্তি-সম্পাদনের চেষ্টা চলিতে থাকে। বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যদিয়া অবশেষে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালে এইরূপ একটি সম্মেলনে আন্তর্জাতিক গম-চুক্তি (International Wheat Agreement) স্বাক্ষরিত হয়। আর্জেন্টিনা এবং রাশিয়া ব্যতীত গম উৎপাদন ও ব্যবহারের সহিত সংশ্লিষ্ট আর সকল দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ১৯৪৯-খ্রীঃ হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য এই চুক্তি কার্যকরী হয়। এই চুক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক বাজারে গমের মূল্য এমন একটি যুক্তিসঙ্গত স্তরে রাখা যাহাতে গম-ব্যবসায়ী ও উৎপাদকগণ ক্ষতিগ্রস্ত না হন। চুক্তি অনুযায়ী আমদানিকারক দেশগুলির নিকট হইতে তাহাদের প্রয়োজনের একটি মোটামুটি হিসাব চাওয়া হয় এবং তাহার পরিবর্তে রপ্তানিকারকগণ বিভিন্ন আমদানিকারক দেশগুলিকে তাহাদের প্রয়োজনীয় গম-সরবরাহের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতির কথা স্মরণ রাখিয়া চুক্তিটি যথাসম্ভব স্থিতিস্থাপক করা হয়, যাহাতে প্রয়োজনমতো রদবদল করা যাইতে পারে।

অবশ্য গমের ক্ষেত্রে একটা সুবিধা এই যে, উৎপাদক অঞ্চলগুলি সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সুতরাং কোন একটি বা দুইটি দেশে প্রাকৃতিক কারণে গমের উৎপাদনে ক্ষতি হইলেও অন্যান্য দেশের গম-উৎপাদনে প্রাচুর্যের দ্বারা তাহা পোষাইয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া গম-রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর গোলার্ধে এবং অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনা দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল উত্তর গোলার্ধে তখন শীতকাল; ইহার ফলে দুই গোলার্ধে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গমের চাষ হয়। কাজেই কোন গোলার্ধে প্রাকৃতিক কারণে গমচাষের ক্ষতি হইলে অন্য গোলার্ধে অধিক উৎপাদন করিয়া সেই ক্ষতি পূরণ করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। যাহা হোক আন্তর্জাতিক গম-চুক্তি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার চমৎকার উদাহরণ।

ধান (Rice)

ধানের খোসা ছাড়াইয়া চাউল প্রস্তুত করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী অঞ্চলের অধিবাসী পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের প্রধান খাদ্য চাউল। ধান ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর ফসল। চাউল হইতে মদ প্রস্তুত করা হয়। ধানের খড় ও কুঁড়া উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। ধানের খড় হইতে জুতা, টুপি প্রভৃতি তৈয়ারী করা যায়; কাগজ প্রস্তুতেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। ধানের খোসা বা কুঁড়া দ্বারা গদী প্রস্তুত হয়। ধানের খোসা সিমেন্টের সহিত মিশাইয়া সিনেমাগৃহ প্রভৃতিতে শব্দরোধক দেওয়াল নির্মাণ করা হয়।

ধানের শ্রেণীবিভাগ—চাউলের দানার আকৃতি, রং, গন্ধ এবং হেক্টর-প্রতি উৎপাদন প্রভৃতি অনুযায়ী অসংখ্য শ্রেণীর ধান বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত হইয়া থাকে। অনেকসময় একই দেশে ৪০০।৫০০ শ্রেণীর ধান উৎপাদিত হইতে দেখা যায়। ইহার মধ্যে বহু নিকৃষ্ট শ্রেণীর ধানও রহিয়াছে; বিশেষ করিয়া কৃষকের অজ্ঞতা ও গোঁড়ামি এত প্রকার ধানের প্রচলন থাকিবার প্রধান কারণ। পৃথিবীতে যত প্রকার ধানের চাষ হইয়া থাকে তাহাদের প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (১) নিম্নভূমি বা জলাভূমির ধান (Lowland or Swamp rice) ও (২) উচ্চভূমির ধান বা পার্বত্য ধান (Upland or Hill rice)। পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ ধান উৎপাদিত হয়

তাহার শতকরা ২৫ ভাগই হইল নিম্নভূমি বা জলাভূমির ধান। পার্বত্য ধান পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটিয়া ছোট ছোট জমিতে চাষ করা হয়। বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য ও ভূমিক্ষয় রোধ করিবার জন্য জমির ধার বেশ উঁচু করিয়া দেওয়া হয়। ভারত ও পাকিস্তানের পার্বত্য অঞ্চল, সিংহল, ফিলিপাইন, জাভা ও দক্ষিণ চীনের কোথাও উচ্চভূমি বা পার্বত্য অঞ্চলে ধানের চাষ করা হয়।

প্রধানতঃ দুইটি পদ্ধতিতে ধান চাষ করা হইয়া থাকে: (১) রোপণ প্রথা (Plantation method) ও (২) বপন প্রথা (Broadcast method)। **রোপণ-পদ্ধতিতে** প্রথমে একটি ছোট জমি চাষ করিয়া ধানের বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এই জমিকে চারাক্ষেত (Nursery) বলে। কিছুদিন পরে বর্ষা শুরু হইলে বড় জমি তৈয়ারী করিয়া ধানের চারাগুলি চারাক্ষেত হইতে তুলিয়া লইয়া বড় জমিতে রোপণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে শ্রমিকের প্রয়োজন বেশী হইলেও উৎপাদন অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। **বপন-পদ্ধতিতে** একবারেই জমি তৈয়ারী করিয়া বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া ঐ জমিতেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও ফসল পাকে। পৃথিবীতে রোপণ-পদ্ধতিতে অধিক ধান উৎপাদিত হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—ধানচাষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। ১০০ হইতে ২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হইলে ধান ভালো জন্মে। জন্মাইবার প্রথম অবস্থায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়।

ধানচাষের জন্য প্রচুর **উত্তাপ** প্রয়োজন। ধানগাছের বৃদ্ধির সময় অন্ততঃ ২৫° সেঃ উত্তাপ দরকার। ধান পাকিবার জন্য শুষ্ক জলবায়ু প্রয়োজন। ধানগাছের বৃদ্ধির জন্য প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত একই সঙ্গে প্রয়োজন হয় বলিয়া গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাতযুক্ত ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু ধানচাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া ইহাই পৃথিবীর সর্বপ্রধান ধান-উৎপাদনকারী অঞ্চল।

নদী-উপত্যকার **পলিমাটিতে** ধান ভালো জন্মে। জল ধরিয়া রাখিবার উপযুক্ত কাদামাটি ধানচাষের বিশেষ উপযোগী। যে জমির উপরের স্তরে পলিমাটি এবং তাহার ঠিক নীচেই কাদামাটির স্তর রহিয়াছে তাহা ধানচাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এইজন্য বিভিন্ন ধান-উৎপাদক দেশে নদী-

উপত্যকা ও নদীর ব-দ্বীপসমূহ ধানচাষের প্রধান কেন্দ্র। উত্তর ভারতে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন-অববাহিকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চল, দক্ষিণ ভারতের মহানদী, কৃষ্ণা, কাবেরী ও গোদাবরীর ব-দ্বীপ, চীনের ইয়াংসি-কিয়াং ও সিকিয়াং নদীর অববাহিকা ও ব-দ্বীপে, ইন্দোচীনের মেকং নদী ও ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপ, ইটালির পো নদীর অববাহিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর ব-দ্বীপ ও স্যাক্রামেণ্টো নদীর উপত্যকায় পৃথিবীর অধিকাংশ ধান উৎপাদিত হয়।

ধানচাষের জন্য প্রচুর সুলভ শ্রমিক দরকার। জমি-তৈয়ারী, বীজবপন, চারাগাছগুলিকে তুলিয়া কৃষিক্ষেত্রে পুনরায় লাগানো, ফসল-কাটা প্রভৃতি কার্যে প্রচুর সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘন লোকবসতি এই অঞ্চলে ধানচাষের কেন্দ্রীভবনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এখনও পর্যন্ত প্রধানতঃ মৌসুমী-বাহিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিয়া ধানের চাষ করা হয়। কিন্তু মৌসুমী বায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল অনিশ্চয়তা। ফলে কোন বৎসর বর্ষা আগে শুরু হয়, কোন বৎসর বিলম্বে শুরু হয়। চাষের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত প্রত্যেক বৎসর হয় না। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি লাগিয়াই আছে। এই অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল ধানচাষের সাফল্যও স্বভাবতঃই অনিশ্চিত। যে বৎসর উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়, সেই বৎসর ফসল ভালো হয়। তাহা না হইলে ধান-উৎপাদন ভালো হয় না এবং কৃষকেরও দুর্দশার অন্ত থাকে না। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে একই সঙ্গে জলসেচ ও জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই অঞ্চলে ধানচাষ করা হয় মুখ্যতঃ কৃষকের নিজের ও পরিবারের ব্যবহারের জন্য, বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত খুব কম থাকে। কৃষক-জনসাধারণ অত্যন্ত দরিদ্র ও অশিক্ষিত। কৃষকের মাথাপিছু জমির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। কৃষি-যন্ত্রপাতি সেকেলে ও কৃষি-পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক। কৃষিকার্যে কয়লা ও খনিজ তৈলের ন্যায় জড়শক্তির ব্যবহার নাই বলিলেই চলে। ফলে হেক্টর-প্রতি ও কৃষকের মাথাপিছু উৎপাদন অত্যন্ত অল্প। কৃষিক্ষেত্র হইতে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা সরাইয়া লইয়া শিল্প ও অন্যান্য কার্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে এবং কৃষিকার্যে উন্নত যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি, জড়শক্তি, সার, বীজ প্রভৃতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারিলে তবেই ধানচাষের উন্নতি সম্ভব।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Growing areas)—পৃথিবীর মোট ধান উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ এশিয়া মহাদেশে উৎপন্ন হয়।

পৃথিবীর মোট ধান-উৎপাদন—২৫ কোটি ৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন
(১৯৬৪-৬৫)

চীন	৮ কোটি	৫০	লক্ষ	মেঃ	টন	থাইল্যাণ্ড	১ কোটি	২	লক্ষ	মেঃ	টন
ভারত	৫ ,,	৪৭	,,	,,	,,	ব্রহ্মদেশ		৭৫	,,	,,	,,
জাপান	১ ,,	৮১	,,	,,	,,	ভিয়েটনাম		৫৫	,,	,,	,,
পাকিস্তান	১ ,,	৭৭	,,	,,	,,	ব্রেজিল		৫৪	,,	,,	,,
ইন্দোনেশিয়া	১ ,,	২৫	,,	,,	,,	ফিলিপাইন		৪০	,,	,,	,,

F. A. O.—Monthly Bulletin, March, 1965 সংখ্যা হইতে গৃহীত।

চীন—ধান-উৎপাদনে চীনের স্থান **প্রথম**। বিপ্লবের পরে চাষের সুব্যবস্থার জন্য উৎপাদন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। লোকসংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় চাউল রপ্তানি করা সম্ভব হয় না। দক্ষিণ চীনে এবং মধ্যচীনে ইয়াংসি-কিয়াং নদীর উপত্যকায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। এখানে হেক্টর-প্রতি ধানের উৎপাদন গড়ে ২,৭০০ কিলোগ্রাম। পৃথিবীর মোট ধান উৎপাদনের শতকরা ৩৬ ভাগ চীনে উৎপন্ন হয়।

ভারত—ধান-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, কেরালা, মহীশূর রাজ্যে ধান উৎপন্ন হয়। সমগ্র দেশে প্রায় ৩ কোটি হেক্টর জমিতে ধানের চাষ হয়।

জাপান—জাপানে প্রচুর ধান উৎপন্ন হইলেও কোরিয়া হইতে এখানে চাউল আমদানি করিতে হয়। দক্ষিণ জাপান ধানচাষের প্রধান কেন্দ্র। এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে জাপানের কৃষিপদ্ধতি সর্বাপেক্ষা উন্নত এবং এখানে হেক্টর-প্রতি ধানের উৎপাদন অধিক।

পাকিস্তান—পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য চাউল এবং এখানে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। বরিশাল, ময়মনসিংহ, খুলনা, পূর্ব দিনাজপুর প্রভৃতি জেলা ধানচাষের প্রধান কেন্দ্র।

ইন্দোনেশিয়ার জাভা অঞ্চলে, **ব্রহ্মদেশের** ইরাবতী নদীর উপত্যকায়, **ইন্দোচীনের** মেকং নদীর অববাহিকা ও ব-দ্বীপে, **ইটালির** পো নদীর উপত্যকায়, **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে** মিসিসিপি-উপত্যকায় ও

ক্যালিফোর্ণিয়ায়, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, কোরিয়া, ফরমোসা, মালয়েশিয়া, নেপাল, সিংহল, ব্রেজিল, ইউ. এ. আর. (মিশর) ও ম্যাডাগাস্কারেও ধানচাষ হইয়া থাকে। পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায়, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা ও গায়নায়, অস্ট্রেলিয়ায়, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে ও স্পেনের ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে বিশেষ করিয়া এব্রো নদীর উপত্যকায় কিছু পরিমাণে ধানের চাষ হয়।

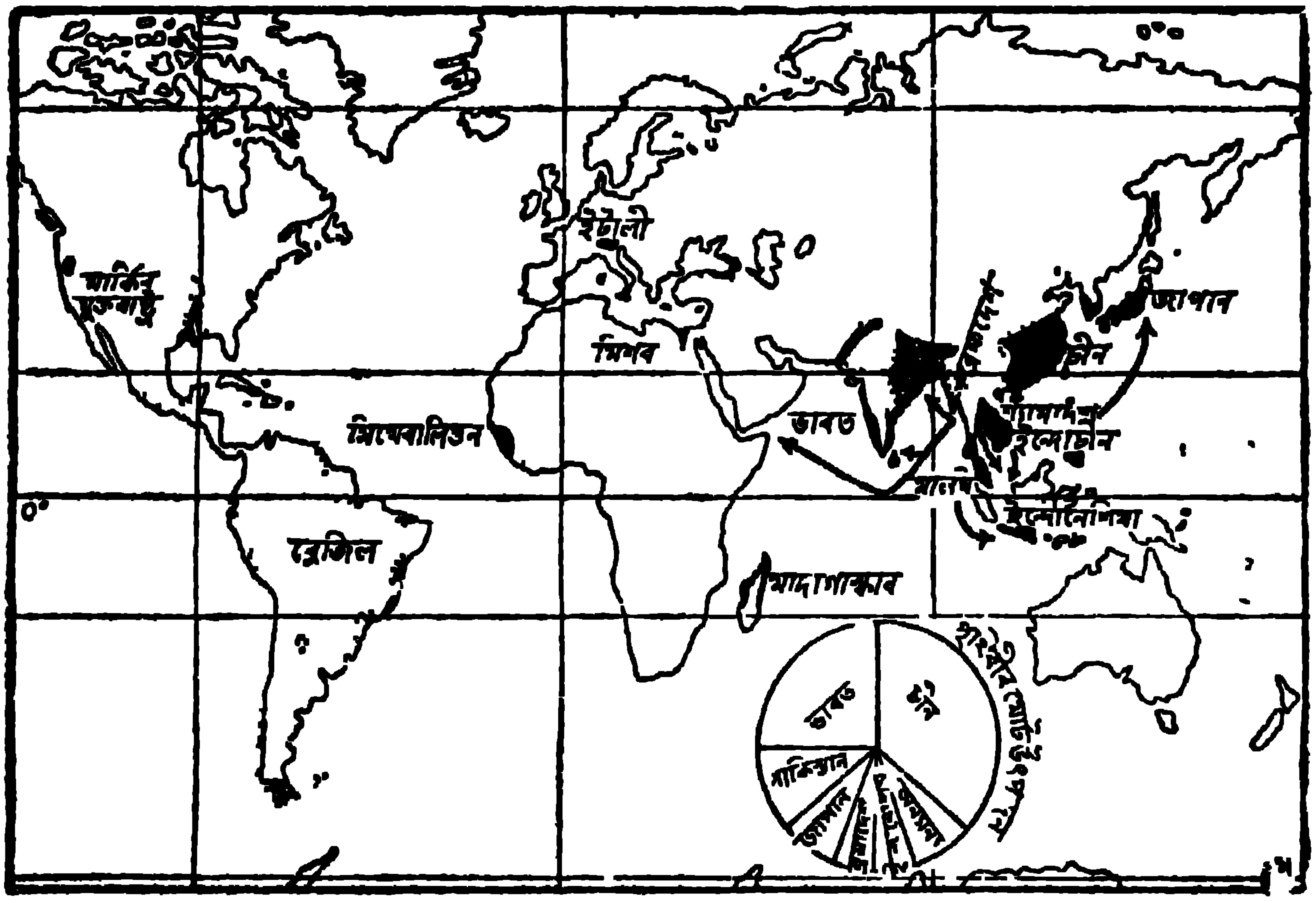

পৃথিবীর ধান-উৎপাদক অঞ্চলসমূহ
(তীরচিহ্ন দ্বারা আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশসমূহ দেখানো হইয়াছে।)

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য—প্রধান প্রধান ধান-উৎপাদক দেশগুলির জনসংখ্যা বেশী হওয়ায় তাহারা রপ্তানি-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য পৃথিবীর মোট চাউল উৎপাদনের শতকরা মাত্র ৭ ভাগ রপ্তানি-বাণিজ্যে আসে। সেইজন্য ছোট ছোট দেশগুলিকে রপ্তানির দায়িত্ব লইতে হয়। ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া, ভিয়েটনাম প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। আমদানিকারকদের মধ্যে ভারত, সিংহল, জাপান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, হংকং, ইন্দোনেশিয়া উল্লেখযোগ্য। ইটালি ও স্পেন ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশ অল্প অল্প চাউল আমদানি করে।

গম ও ধানের তুলনা

ধান	গম
১। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অশ্বেতকায় লোকদের প্রধান খাদ্য।	১। শীতপ্রধান দেশের শ্বেতকায় লোকদের প্রধান খাদ্য।
২। চাষের প্রথমাবস্থায় প্রচুর জল প্রয়োজন। এইজন্য বর্ষাকালে ইহার চাষ হয়।	২। চাষের প্রথমাবস্থায় অল্প জলের প্রয়োজন হয়।
৩। ধানচাষের জন্য উর্বর পলিমাটি ও কাদামাটি প্রয়োজন।	৩। গমচাষের জন্য ভারী দো-আঁশ বা হালকা কাদামাটি প্রয়োজন।
৪। ধানচাষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত (১০০ সেঃ মিঃ হইতে ২০০ সেঃ মিঃ) প্রয়োজন।	৪। অল্প বৃষ্টিপাতেও (২৫ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ) গমচাষ হইয়া থাকে।
৫। ধানের জন্য নীচু সমতলভূমি প্রয়োজন; যাহাতে জল বাহিরে যাইতে না পারে।	৫। গমের জন্য জল-নিকাশের সুবিধাযুক্ত ঢালু জমি প্রয়োজন।
৬। ধানের জন্য ১৬° হইতে ২৭° সেঃ উত্তাপ প্রয়োজন।	৬। গমের জন্য ১৪° সেঃ উত্তাপ হইলেও চলে।
৭। ধান ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর প্রধান খাদ্যশস্য।	৭। গম নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর প্রধান খাদ্যশস্য।
৮। ধানের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বেশী।	৮। গমের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন কম।
৯। আমদানি-রপ্তানিতে ধানের স্থান নগণ্য।	৯। আমদানি-রপ্তানিতে গমের স্থান উচ্চে।
১০। ধান-উৎপাদনে এশিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ (পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৯২%)।	১০। ইউরোপ ও আমেরিকা গম-উৎপাদনে সর্বশ্রেষ্ঠ (পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৬০%)।
১১। এক কিলোগ্রাম চাউল হইতে ৩,৬২৮ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্যশক্তি পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষাকৃত সহজপাচ্য।	১১। এক কিলোগ্রাম গমের ময়দা হইতে ৩,৪৩৮ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্যশক্তি পাওয়া যায়। ইহা চাউলের তুলনায় কঠিনপাচ্য।
১২। শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক ও আমিষ-জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প।	১২। আমিষজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক ও শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প।

ইক্ষু (Sugar-Cane) ও বীট (Sugar-Beet)

ইক্ষু ও বীটের রস হইতে চিনি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মোট চিনি উৎপাদনের শতকরা ৬৫ ভাগ ইক্ষু হইতে এবং ৩৫ ভাগ বীট হইতে প্রস্তুত হয়। ইক্ষু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফসল এবং বীট নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল।

ইক্ষু (Sugar-Cane)

খ্রী: পূ: ৫০০০ বৎসর পূর্বে রচিত অথর্ববেদে ইক্ষুর উল্লেখ আছে। ইহা হইতে মনে হয়, সেই সময় ভারতে ইক্ষুর চাষ হইত। ইক্ষুগাছ ২½ মিটার হইতে ৩ মিটার লম্বা হয়। এই গাছের রস হইতে চিনি প্রস্তুত করা হয়। ইক্ষুদণ্ড হইতে রস নিঙড়াইয়া লইবার পর যে ছিবড়া (Bagasse) থাকে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট শব্দরোধক কার্ডবোর্ড প্রস্তুত হয়; সিনেমা-গৃহে এই বোর্ড ব্যবহৃত হয়। এই ছিবড়া জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। ভবিষ্যতে কাগজ ও প্লাস্টিক-উৎপাদনে ইহা ব্যবহৃত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভারতে ইক্ষু হইতে চিনি ও গুড় উভয়ই প্রস্তুত হয়। মদ্য প্রস্তুত করিতেও এই গুড়ের প্রয়োজন হয়। ইক্ষুরস হইতে চিনি বাহির করিয়া লইবার পর যে ঝোলা-গুড় থাকে তাহা হইতে মূল্যবান্ সুরাসার (Alcohol) প্রস্তুত হয়। এই সুরাসার কৃত্রিম রবার-উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া ঝোলাগুড় উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। ইহা হইতে প্লাস্টিক শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় অ্যাকোনিটিক অ্যাসিড পাওয়া যাইতে পারে। চিনির গাদ-হইতে মোম তৈয়ারী হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—ইক্ষুচাষের জন্য প্রচুর উত্তাপের প্রয়োজন বলিয়া গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলেই ইহার উৎপাদন সীমাবদ্ধ। ইক্ষুচাষের জন্য কমপক্ষে ১০০ সে: মি: বৃষ্টিপাত ও ২৭° সে: উত্তাপ প্রয়োজন। অত্যধিক বৃষ্টি হইলে (১৭৫ সে: মি:-এর উপর) ইক্ষুর রসে চিনির অংশ কমিয়া যায়। ক্ষেতে জল দাঁড়াইলে শস্য নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া জল-নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন।

চুন ও লবণ জাতীয় পদার্থ-মিশ্রিত উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা ইক্ষুচাষের পক্ষে অনুকূল। ইক্ষুচাষের ফলে জমির উর্বরা-শক্তি নষ্ট হয়। এইজন্য সার দেওয়া প্রয়োজন। ইক্ষুচাষের জন্য এবং ফসল কাটিয়া কারখানা ও বাজারে পাঠাইবার জন্য প্রচুর সুলভ শ্রমিকের দরকার হয়।

বর্তমানে বৃহদাকার কারখানায় নানাবিধ জটিল পদ্ধতির মধ্যদিয়া ইক্ষু

হইতে চিনি উৎপাদন করা হয়। প্রথমে ইক্ষুদণ্ডগুলি পর পর কতকগুলি রোলারের মধ্যদিয়া নিঙড়াইয়া রস বাহির করা হয়। এই রস কিছু পরিমাণ চুনের সহিত মিশাইয়া বড় বড় পাত্রে গরম করা হয়। ইহাতে রসের ময়লা চুনের সহিত মিশিয়া পাত্রের তলায় পড়িয়া থাকে। এই গাদ (চুনমিশ্রিত ময়লা) জমিতে সার হিসাবে এবং মোম তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়। পাত্রের উপর হইতে পরিষ্কৃত রস লইয়া জ্বাল দিয়া ঘন করা হয়। ঘন রস বায়ুশূন্য পাত্রে রাখিয়া চিনির দানা বাঁধানো হয়। সর্বশেষে চিনির দানা হইতে ঝোলাগুড় যন্ত্রের সাহায্যে নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লইবার পর বাদামী চিনি পাওয়া যায়। বাদামী চিনি পরিশোধন করিয়া ব্যবহার্য সাদা চিনি প্রস্তুত করা হয়। এই পরিশোধন-কার্য অনেকসময়ে চিনি-উৎপাদক অঞ্চলে করা হয়। আবার অনেকসময় বাদামী চিনি আমদানি করিয়া আমদানিকারক দেশে উহা পরিশোধন করিয়া সাদা চিনি প্রস্তুত করা হয়।

আধুনিক চিনির কারখানা নির্মাণ ও পরিচালনা করিবার জন্য প্রভূত পরিমাণে মূলধন ও উচ্চশ্রেণীর কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন। বীটচিনির কারখানার মতো ইক্ষুচিনির কারখানাও বৃহৎ ইক্ষুক্ষেত্রের নিকট অবস্থিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, প্রথমতঃ ইক্ষুদণ্ডের ওজনের মাত্র শতকরা ১০ হইতে ১৫ ভাগ চিনি পাওয়া যায়। ফলে অধিকদূর ইক্ষু পরিবহণ করিতে হইলে চিনির উৎপাদন-খরচ বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইক্ষু কাটিবার পর ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মাড়াই না করিলে রস শুকাইয়া ও টক হইয়া যায়। অনেক স্থানে চিনির কারখানাগুলি বৎসরে সকলসময় চালু রাখিবার জন্য সারা-বৎসর ধরিয়া যাহাতে ইক্ষু পাওয়া যায় সেইভাবে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন জাতের ইক্ষুর চাষ করা হয়। বৎসরের কয়েক মাস কারখানাগুলি অলস বসিয়া থাকিলে চিনির উৎপাদন-খরচ বৃদ্ধি পায়। ইক্ষু সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য চিনির কারখানার মালিকগণ অনেকসময়ে নিজেদের মালিকানায় ও পরিচালনায় ইক্ষু উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন। আবার অনেক-সময় ইক্ষু-উৎপাদক কৃষকগণের সহিত চুক্তি করিয়া ইক্ষু সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। উপযুক্ত মূল্যে নিয়মিতভাবে ইক্ষু সংগ্রহ করা বহুস্থানে চিনিশিল্পের অন্যতম সমস্যা।

উৎপাদক অঞ্চল (Growing areas)—ইক্ষু প্রধানতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলের ফসল। গ্রীষ্মমণ্ডলের নিকটবর্তী নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ

অঞ্চলেও ইক্ষু জন্মে। সাধারণতঃ ৩২° উঃ ও ৩২° দঃ অক্ষরেখার মধ্যে ইক্ষু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পৃথিবীর মোট ইক্ষু-উৎপাদন—৪১·৩৬ কোটি মেঃ টন
(১৯৬১-৬২)

ভারত	৮ কোটি ৬৪ লক্ষ মেঃ টন	ফিলিপাইন	১ কোটি ২১ লক্ষ মেঃ টন
কিউবা	৪ „ ৭৫ „ „	অস্ট্রেলিয়া	১ „ ৫ „ „ „
ব্রেজিল	৫ „ ৭১ „ „	ইন্দোনেশিয়া	৭৫ „ „ „
পাকিস্তান	১ „ ৫৬ „ „ „		

ভারত—ভারতেই প্রথম ইক্ষুর চাষ হয়। এই চাষের উপযুক্ত জলবায়ু এই দেশে বিদ্যমান। সেইজন্য ভারত ইক্ষু-উৎপাদনে **প্রথম স্থান** অধিকার করিয়াছে; কিন্তু হেক্টর-প্রতি উৎপাদনে ভারত অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পিছাইয়া আছে। ইহার মূলে রহিয়াছে দেশের ভূমি-ব্যবস্থার কুফল, জলসেচ ও সারের অভাব, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ ইত্যাদি। ভারতের ইক্ষু হইতে বৎসরে ৪০ লক্ষ মেঃ টন গুড় ও ২২ লক্ষ মেঃ টন চিনি প্রস্তুত হয়।

ভারতে ইক্ষু-উৎপাদনে **উত্তরপ্রদেশ** প্রথম, **মহারাষ্ট্র** দ্বিতীয়, **বিহার** তৃতীয় এবং **অন্ধ্র** চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া, **পাঞ্জাব**, **মাদ্রাজ**, **মহীশূর** ও **উড়িষ্যায়** ইক্ষুর চাষ হয়। উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর, বালিয়া, আজমগড়, ফৈজাবাদ ও সাহাজাহানপুর জেলা ইক্ষুচাষের জন্য বিখ্যাত। ভারতের মোট ইক্ষুর শতকরা ৬০ ভাগ উত্তরপ্রদেশে উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাবে ভাকরা ও নাঙ্গালে বাঁধ দেওয়ার ফলে প্রায় ৫ লক্ষ মেঃ টন অধিক ইক্ষু উৎপন্ন হইবে। এখানে অমৃতসর, জলন্ধর ও রোহ্‌টক জেলায় ইক্ষুর চাষ হয়। **পশ্চিমবঙ্গে** নদীয়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় কিছু কিছু চাষ হয়। চিনির দাম বেশী হওয়ায় দেশে ইহার চাহিদা আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না। সেইজন্য প্রায় ১ লক্ষ মেঃ টন চিনি প্রতিবৎসর বিদেশে রপ্তানি হইতেছে।

কিউবা—ইক্ষুচাষের উপযোগী সকল প্রকার অবস্থা বিদ্যমান থাকায় কিউবার প্রধান কৃষিজ দ্রব্য ইক্ষু এবং প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য ইক্ষু-চিনি। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ চিনি এই দেশে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এখানে ইক্ষুর চাষ অনেক বাড়িয়া যায়। দেশের আভ্যন্তরীণ

চাহিদা কম থাকায় কিউবা চিনি-রপ্তানিতে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এখানকার উৎপাদিত অধিকাংশ চিনি বিদেশে রপ্তানি হয়।

নিম্নলিখিত **কারণে** কিউবা ইক্ষু-উৎপাদনে ও ইক্ষুচিনি-রপ্তানিতে উন্নতি লাভ করিয়াছে: (১) এই বৃহৎ দ্বীপটিতে লোকবসতি অপেক্ষাকৃত অল্প; ফলে অধিক জমি কৃষিকার্যে ব্যবহার করা যায়। লোকসংখ্যা অল্প বলিয়া খাদ্যশস্যের প্রয়োজন কম। এই কারণে কৃষিকার্যে নিযুক্ত জমির প্রায় অর্ধেক ইক্ষু-উৎপাদনে ব্যবহার করা সম্ভব হইয়াছে। লোকসংখ্যা অল্প হওয়ার জন্য উৎপাদিত চিনির খুব সামান্যই আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে প্রয়োজন হয়। অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে। (২) এখানে অল্প ঢালু

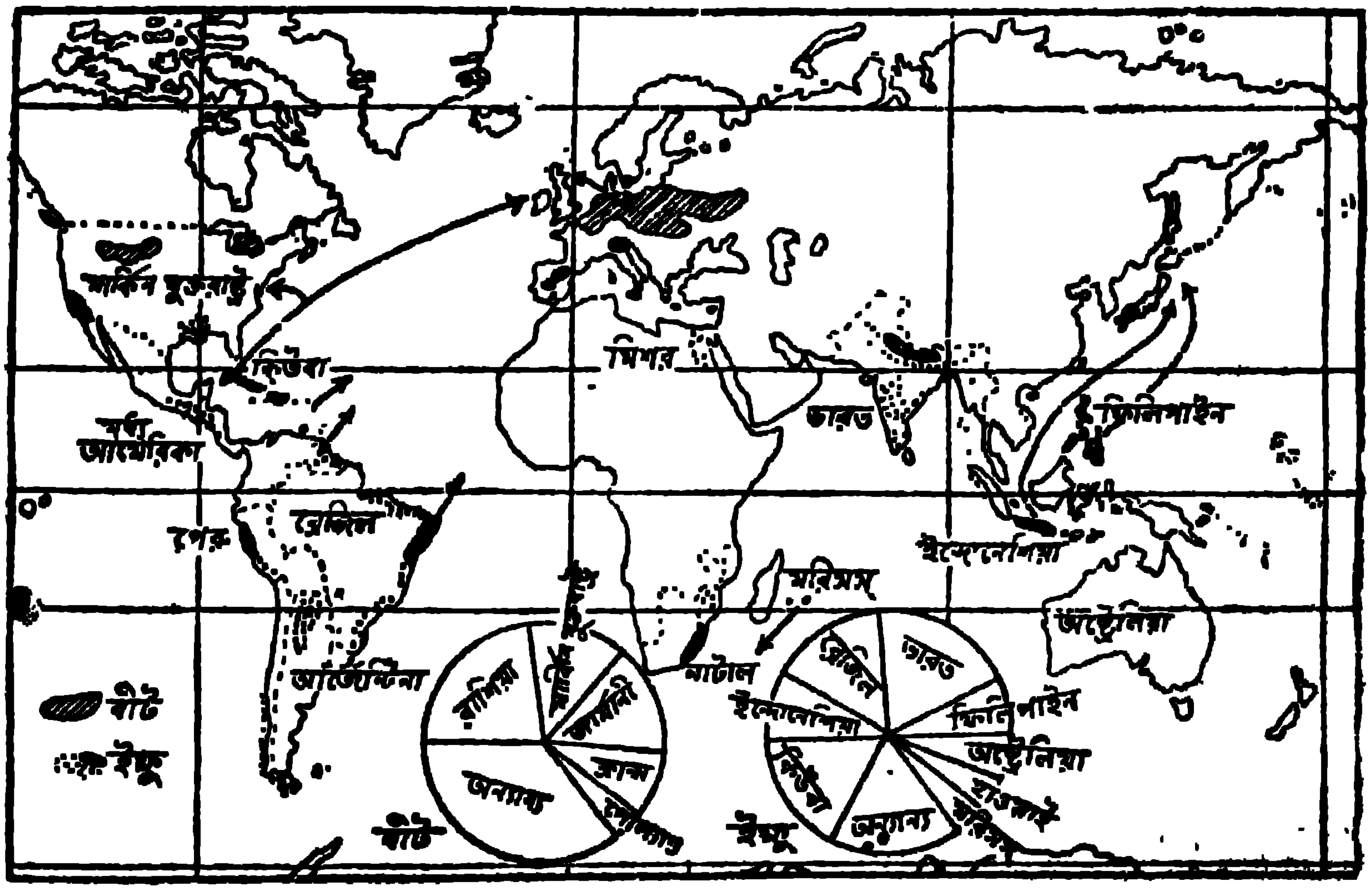

পৃথিবীর ইক্ষু ও বীট উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ

(তারকাচিহ্ন দ্বারা আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশসমূহ দেখানো হইয়াছে।)

এবং সমতলভূমিতে ইক্ষুর চাষ করা হয়। এই ভূমি উর্বর, জলনিকাশের সুবিধাযুক্ত এবং চুনামাটির দ্বারা গঠিত; ফলে ইক্ষুর ফলন এবং ইক্ষুর রসে চিনির পরিমাণ অধিক হয়। সমতল অথবা অল্প ঢালু ভূ-প্রকৃতি কৃষিকার্যে যন্ত্রপাতি-প্রয়োগ এবং রাস্তাঘাট ও রেলপথ-নির্মাণের পক্ষে সুবিধাজনক। (৩) বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১০০ সেঃ মিঃ হইতে ১৭৫ সেঃ মিঃ। এই বৃষ্টির অধিকাংশ এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ গ্রীষ্মকালে পতিত হয়। ইহার

ফলে ইক্ষুদণ্ডগুলি দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ হয়। আর্দ্র ও উষ্ণ গ্রীষ্মকালের পরেই ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত শুষ্ক ও শীতল ঋতু। এই সময়ে ইক্ষু পাকে এবং রসে চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক শীতল আবহাওয়ায় ইক্ষু অপেক্ষাকৃত বেশী সময় তাজা থাকে; ফলে ইক্ষু কাটিবার পর মাড়াই করিবার জন্য কারখানায় পাঠাইতে অধিক সময় পাওয়া যায়। শীতল আবহাওয়া ইক্ষু-কাটা, গাড়ীতে বোঝাই-করা প্রভৃতি কঠোর পরিশ্রমের অনুকূল। তাহা ছাড়া, ইক্ষু কাটিবার ঋতুতে আবহাওয়া শুষ্ক থাকে বলিয়া এই কাদামাটির দেশে রাস্তাঘাট যাতায়াতের উপযোগী থাকে। বর্ষার সময়ে গাড়ীর চাকা অনেকসময় রাস্তায় বসিয়া যায়। (৪) প্রচুর তাপ, যথেষ্ট বৃষ্টিপাত ও উর্বর মৃত্তিকার জন্য কিউবায় একবার ইক্ষুচারা রোপণ করিয়া ৪ হইতে ৮ বার ফসল পাওয়া যায়; ফলে এখানে ইক্ষুর উৎপাদন-খরচ অনেক কম। কারণ, ইক্ষু-উৎপাদনে মোট খরচের একটা বড় অংশ লাগে জমি তৈয়ারী করিতে এবং ইক্ষু উৎপাদনের শতকরা ১০ হইতে ১৫ ভাগ লাগে বীজের জন্য। (৫) কিউবার আকৃতি দীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ বলিয়া সমস্ত ইক্ষুক্ষেত সমুদ্রতীর হইতে অল্প কয়েক মাইলের মধ্যে অবস্থিত; ফলে ক্ষেত হইতে ইক্ষু অল্পখরচে বন্দর অঞ্চলে অবস্থিত চিনির কলে লইয়া আসা যায়। কিউবার অতি নিকটে রহিয়াছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ চিনির-ব্যবহারকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আটলাণ্টিকের অপর পারে রহিয়াছে অপর বৃহৎ চিনি-ব্যবহারকারী অঞ্চল উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ। কিউবার বন্দর হইতে অতি সহজেই সমুদ্রপথে এই সকল দেশে চিনি রপ্তানি করা যায়।

ব্রেজিল, পশ্চিম পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ও মেক্সিকোয়ও প্রচুর ইক্ষু উৎপাদিত হয়। ইন্দোনেশিয়ার **জাভায়** প্রচুর ইক্ষুর চাষ হয়। এখানে হেক্টর-প্রতি ইক্ষুর উৎপাদন খুব বেশী। ক্যারিবিয়ান সাগরের হাইতি, পোর্টোরিকো, ডোমিনিকা, ত্রিনিদাদ প্রভৃতি দ্বীপে, প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত হাওয়াই, ফিজি, ফরমোসা ও **ফিলিপাইনে**, পেরু এবং ভারত মহাসাগরের মরিসাসেও প্রচুর ইক্ষু উৎপাদিত হয়। চীনের দক্ষিণ অংশে ইক্ষুর চাষ হয়।

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য—ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া তাহা রপ্তানি করা হয়। রপ্তানিকারকদের মধ্যে কিউবা প্রথম এবং ব্রেজিল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। পোর্টোরিকো, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া,

ফিলিপাইন, হাওয়াই ও মরিশাস্ দ্বীপপুঞ্জ চিনি রপ্তানি করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্মানী, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশ চিনি আমদানি করে। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধারণতঃ কিউবার চিনি ব্যবহার করিত। বর্তমানে কিউবায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে এই দেশের চিনি অন্যান্য দেশে (প্রধানতঃ রাশিয়া ও চীনে) রপ্তানি হইতেছে।

বীট (Sugar-Beet)

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে চিনি ব্যবহার করা হইত তাহার প্রধান অংশ আসিত পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রেজিল হইতে এবং অবশিষ্ট অংশ আসিত এশিয়া হইতে। নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী সংঘর্ষের ফলে ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে চিনি সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়। কারণ চিনি-রপ্তানিকারক অধিকাংশ দেশ ছিল ইংল্যাণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং বাণিজ্যপথগুলিও ইংল্যাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করিত। ইউরোপের এই চিনি-দুর্ভিক্ষ রোধ করিবার জন্য নেপোলিয়নের আদেশে ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ চিনির একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প উৎস আবিষ্কারের জন্য শত শত গাছগাছড়া লইয়া গবেষণা শুরু করেন। অবশেষে ১৭৯৯ খ্রীঃ জার্মানগণ প্রথমে বাণিজ্যিক হারে বীট হইতে চিনি-উৎপাদনে সক্ষম হন। ১৮০৬ খ্রীঃ ফরাসী সরকার বীটচিনি-উৎপাদনে অর্থসাহায্য ঘোষণা করেন এবং ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন চিনি উৎপাদনের জন্য ৮০,০০০ একর জমিতে বীটের চাষ করিবার জন্য আদেশ দেন। এইভাবে রাজনৈতিক ঘটনার চাপে ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পৃথিবীতে চিনি-বীটের আবিষ্কার ও বীটচিনি উৎপাদন শুরু হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বীটের চাষ ও বীটচিনি উৎপাদনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অর্থসাহায্য, সংরক্ষণ প্রভৃতি কোন-না-কোন প্রকারের সরকারী সাহায্য ব্যতীত এই শিল্পের পক্ষে ইক্ষুচিনির সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকা সম্ভব হইত না। চিনি-বীট উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাজনীতি যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে সেরূপ খুব কম কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রেই করিয়াছে।

বীটগাছের মূল হইতে চিনি প্রস্তুত করা হয়। পাঁচ মাসে গাছগুলি পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—বীট নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ফসল। সাধারণতঃ বীটচাষের পক্ষে গ্রীষ্মকালীন **তাপের** পরিমাণ ২০° সেঃ হইতে ২৩° সেঃ হওয়া বাঞ্ছনীয়; গাছ জন্মিবার সময় ৫০° সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ **বৃষ্টিপাত** হওয়া প্রয়োজন। পরে প্রখর সূর্যকিরণ পাইলে বীটের মূলে চিনির অংশ বৃদ্ধি পায়। বীটচাষের জন্য অধিক বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয় না। চুনযুক্ত **উর্বর দো-আঁশ মাটি** চাষের পক্ষে উপযোগী। অত্যন্ত যত্ন সহকারে বীটের চাষ করিতে হয় বলিয়া প্রচুর সুনিপুণ **শ্রমিক** প্রয়োজন হয়।

ইক্ষু অপেক্ষা **বীটচাষ** অনেক বেশী পরিশ্রমসাধ্য কার্য এবং বীটচাষে শ্রমিকের প্রয়োজন হয় অনেক বেশী। প্রতিটি বীটের বীজ হইতে অনেকগুলি করিয়া চারা বাহির হয়। প্রথমে নিড়ানির সাহায্যে এবং তাহার পর হাত দিয়া বাড়তি চারা ও আগাছা তুলিয়া ফেলিয়া বীটের গাছগুলিকে ফাঁক করিয়া দিতে হয়। এই কাজ যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য এবং ইহাতে অধিকসংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ইহার পর গাছগুলি বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ বার দুই বীটের জমি নিড়াইয়া দিতে হয়। বীট পাকিবার সময় হইলে লাঙ্গল দিয়া মাটি আলগা করিয়া দেওয়া হয় এবং পাকিবার পর হাত দিয়া মাটি হইতে বীটগুলি টানিয়া তুলিয়া মাথার পাতা কাটিয়া ফেলিয়া কারখানায় পাঠানো হয়। বীটের পাতা উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। এক কিলো শুক্‌নো বীটের পাতা সম-পরিমাণ শুক্‌না আল্‌ফাল্‌ফার সমান। বীট হইতে রস নিঙড়াইয়া লইবার পর যে ছিবড়া থাকে তাহাও কাঁচা অথবা শুক্‌না অবস্থায় চমৎকার পশুখাদ্য। এক হেক্টর বীটের জমি হইতে যেপরিমাণে পাতা ও ছিবড়া পাওয়া যায় পশুর খাদ্য হিসাবে তাহা এক হেক্টর জমিতে উৎপাদিত ভুট্টার সমান। এই কারণে বীট-উৎপাদন উত্তর ইউরোপের প্রগাঢ় মিশ্র কৃষি-পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উত্তর ইউরোপের গোমহিষাদি পালন বহুলাংশে বীট উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। এই অঞ্চলের শস্যাবর্তন-পদ্ধতিতে বীট গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

বীট-কারখানায় লইয়া আসিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া পাতলা ফালি করিয়া কাটা হয়। তাহার পর ঐ টুকরা ফালিগুলি হইতে রস বাহির করিয়া লওয়া হয়। নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে এই রস পরিষ্কার করা হয় এবং উহা হইতে চিনির দানা বাহির করা হয়।

অবশেষে চিনির দানা হইতে ঝোলাগুড় নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লইলে বাদামী চিনি পাওয়া যায় এবং এই চিনি পরিশোধন করিয়া সাদা চিনি প্রস্তুত করা হয়। পরিশোধনের কাজটুকু অনেকসময় বীটচিনির কারখানায় না করিয়া পৃথক পরিশোধনাগারে করা হয়।

বীটচিনি কারখানার মালিকগণ প্রয়োজনীয় বীট-সরবরাহে নিশ্চয়তা বিধানের জন্য বীট-উৎপাদকগণের সহিত নানাবিধ চুক্তি করিয়া থাকেন। ইউরোপে অনেক বীটচিনির কারখানা বীট-উৎপাদকগণের সমবায় সমিতির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থায় বীটের উপর নির্ভরশীল কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সমন্বয়সাধন সহজ হইয়াছে।

উৎপাদক অঞ্চল (Growing areas)—ইউরোপীয় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই সাধারণতঃ বীটচাষ সীমাবদ্ধ। উত্তর আমেরিকায় কিছু কিছু বীট উৎপন্ন হয়।

পৃথিবীর মোট বীট-উৎপাদন—১৮ কোটি ৫১ লক্ষ মেট্রিক টন
(১৯৬৩-৬৪)

রাশিয়া	৫ কোটি ৭৭ লক্ষ মেঃ টন	পঃ জার্মানী	১ কোটি ২৯ লক্ষ মেঃ টন
ফ্রান্স	১ „ ৮০ „ „ „	পোল্যাণ্ড	১ „ ৩ „ „ „
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	১ „ ৪৯ „ „ „	চেকোশ্লোভাকিয়া	৭৯ „ „ „

F. A. O.—Monthly Bulletin, February, '65 হইতে সংগৃহীত।

রাশিয়া—বীট-উৎপাদনে রাশিয়ার স্থান প্রথম। পৃথিবীর মোট বীট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ এই দেশে উৎপাদিত হয়। ইউরোপীয় রাশিয়ার উত্তর ও মধ্য অংশে, ট্রান্স-ককেশীয়া ও পশ্চিম সাইবেরিয়ায় বীটের চাষ হয়। ইদানীং রাশিয়ার এশীয় অংশে ইহার চাষ ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—বীট-উৎপাদনে এই দেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। মিচিগানের পূর্বাংশ ও ওহিও রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রের আর সকল বীট-উৎপাদনকারী অঞ্চল জলসেচের সুবিধাযুক্ত। ইহাদের মধ্যে মনটানা হইতে দক্ষিণ কলোরাডো পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সমতলভূমিসমূহ, ইডাহো রাজ্যে সর্পনদী উপত্যকা (Snake River Valley), উটা রাজ্যের লবণ হ্রদ উপত্যকা, এবং ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের

উপকূলবর্তী সমভূমি ও নদী-উপত্যকাসমূহ উল্লেখযোগ্য। কলোরাডো ও ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যেই সাধারণতঃ সর্বাপেক্ষা অধিক বীট উৎপাদিত হয়।

ইউরোপ—ইউরোপের সকল দেশেই বীটের চাষ হইলেও গুরুত্বপূর্ণ বীট-উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ ফ্রান্সের উত্তর পূর্বাংশ হইতে শুরু করিয়া রাশিয়ার ইউক্রেন পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার মধ্যে উত্তর ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের লোয়েস্ মৃত্তিকায়, জার্মানীর ম্যাগডেবার্গ জেলায়, চেকোশ্লোভাকিয়ার মোরাভিয়া ও বোহেমিয়া প্রদেশে এবং ইউক্রেনের উর্বর কৃষ্ণ-মৃত্তিকায় অধিক বীট উৎপাদিত হয়। ইউরোপে রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন, চেকোশ্লোভাকিয়া বীটচিনি-উৎপাদনে অগ্রগণ্য।

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য—বীট-উৎপাদনকারী দেশগুলিতে চিনির আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে অধিকাংশ বীট ব্যয় হয়। সুতরাং রপ্তানি-বাণিজ্যে বীটচিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করে না। ইউরোপের ছোট ছোট দুই-তিনটি দেশ (চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী) ভিন্ন অন্য কোন দেশ বীটচিনি **রপ্তানি** করে না। **আমদানি**কারকদের মধ্যে বৃটেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বীট হইতে চিনি উৎপাদনের খরচ বেশী হইলেও ইউরোপীয় দেশগুলি সরকারী সাহায্যে বীট উৎপাদন ও বীটচিনি প্রস্তুত করিয়া থাকে। কারণ চিনির জন্য ইহারা ইক্ষু-উৎপাদনকারী দেশগুলির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা নিরাপদ মনে করে না।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-চুক্তিসমূহ (International Trade Agreements)—আন্তর্জাতিক বাজারে যে চিনি বেচাকেনা হয় তাহার বৃহদংশ আসে কিউবা ও অন্যান্য ক্যারিবিয়ান দেশসমূহ, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, ফরমোসা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া, মরিশাস্ ও রি-ইউনিয়ন এবং পেরু প্রভৃতি ইক্ষুচিনি-উৎপাদনকারী দেশগুলি হইতে এবং সামান্য কিছু অংশ আসে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের বীটচিনি-উৎপাদক দেশগুলি হইতে। বীটচিনির উৎপাদনের খরচ ইক্ষুচিনি অপেক্ষা অধিক। ইহার ফলে বীটচিনি-উৎপাদক দেশগুলি ইক্ষুচিনির প্রতিযোগিতা হইতে নিজেদের চিনিশিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য আমদানীকৃত চিনির উপর চড়াহারে সংরক্ষণ-শুল্ক ধার্য করে। পৃথিবীর চিনি-উৎপাদন ও চিনির বাণিজ্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, চিনি-উৎপাদক অঞ্চলগুলির বণ্টন এবং চিনির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বহুল পরিমাণে বীটচিনি-উৎপাদনকারী দেশগুলির ঐই

সংরক্ষণ নীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। অবশ্য ইক্ষুচিনি-শিল্পকেও ভারতের ন্যায় কোথাও কোথাও সংরক্ষণ দেওয়া হইয়াছে।

এইভাবে চিনির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কৃত্রিম অবস্থা বিদ্যমান থাকায় ইহার বাণিজ্যে বরাবরই নিশ্চয়তার অভাব দেখা যায়। এই অস্থায়িত্বের প্রতিবিধান করিবার জন্য ক্রমেই চিনির খোলা বাজার সংকুচিত করিয়া বাণিজ্যের গতি নির্দিষ্ট খাতে পরিচালনা করা হইয়াছে। এইভাবে বিভিন্ন আমদানিকারক দেশ প্রধানত: তাহাদের রাজনৈতিক প্রভাবাধীন অঞ্চল হইতে চিনি ক্রয় করিতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবা, পোর্টোরিকো, ডমিনিকা, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে চিনি আমদানি করে। ইদানীং অবশ্য কিউবায় রাজনৈতিক পরিবর্তন হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত এই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। গ্রেট বৃটেন পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মরিশাস্, বৃটিশ গায়না ও কিউবা হইতে চিনি আমদানি করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে বৃটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ-এর অন্তর্ভুক্ত চিনি-উৎপাদক দেশগুলিতে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই চিনির অধিকাংশ কমন্‌ওয়েল্‌থ শর্করা-চুক্তির (Commonwealth Sugar Agreement) মাধ্যমে কোটা, প্রেফারেন্স প্রভৃতি অনুযায়ী বণ্টিত হয়। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে জাপান তৎকালে তাহার অধিকৃত ফরমোসা হইতে সমস্ত উদ্বৃত্ত চিনি ক্রয় করিত। গ্রেট বৃটেন ছাড়া পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশ আভ্যন্তরীণ বীটচিনি উৎপাদন সত্ত্বেও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি হইতে বীটচিনি এবং নিজেদের প্রভাবিত উষ্ণমণ্ডলের দেশসমূহ হইতে ইক্ষুচিনি আমদানি করিত। চিনির উৎপাদন ও বাণিজ্যে এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির দাম অত্যধিক হ্রাস পাওয়ায় কিউবার চিনি-উৎপাদনকারিগণ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়া চিনির মূল্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে চিনি-উৎপাদক কয়েকটি দেশ চ্যাডবোর্ণ চুক্তি (Chadbourne Agreement) নামে একটি চুক্তিতে মিলিত হইয়া চিনির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়া মূল্যবৃদ্ধির প্রয়াস পায়। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যমন্দা চলিতে থাকায়, চুক্তির বহির্ভূত দেশগুলি তাহাদের চিনি-উৎপাদন বৃদ্ধি করায় এবং অন্যান্য কারণে চ্যাডবোর্ণ চুক্তি সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই।

অবশেষে ১৯৩৭ সালে ২২টি গুরুত্বপূর্ণ চিনি-উৎপাদক ও ব্যবহারকারী দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক শর্করা-চুক্তি (International Sugar Agreement) সম্পাদিত হয়। পৃথিবীর মোট চিনি-উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলিতে উৎপাদিত হইত এবং পৃথিবীর মোট চিনি ব্যবহারের শতকরা ৮৫ ভাগ হইত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে। চুক্তি অনুযায়ী ইহার অন্তর্ভুক্ত রপ্তানিকারক প্রত্যেকটি দেশের জন্য রপ্তানির নির্দিষ্ট কোটা নির্ধারিত হয় এবং রপ্তানিকারক দেশগুলি এই কোটা অনুযায়ী তাহাদের চিনি-উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে সম্মত হয়, চুক্তির অন্তর্ভুক্ত আমদানিকারক দেশগুলিও তাহাদের আভ্যন্তরীণ চিনি-উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় চিনির একটা অংশ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত রপ্তানিকারক দেশগুলি হইতে ক্রয় করিতে সম্মত হয়। অন্যান্য দেশের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কিছুদিনের জন্য এই চুক্তির প্রয়োগ বন্ধ থাকিলেও কাগজে কলমে ইহার অস্তিত্ব রক্ষা করা হয় এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে নূতন একটি আন্তর্জাতিক শর্করা-চুক্তি সম্পাদিত হয়। পূর্বের চুক্তির তুলনায় এই চুক্তিটি নমনীয়; ইহাতে চিনির দামের ওঠানামার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের উৎপাদন-ও কোটা পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই চুক্তির শর্তসমূহ কার্যে রূপ দিবার জন্য বিভিন্ন দেশে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শর্করা-আইনসমূহ (Sugar Acts) ইহার অন্যতম উদাহরণ।

চা (Tea)

ছোট ছোট একপ্রকার চিরহরিৎ গাছের শুষ্ক পত্রের নাম চা। ১৫০ বৎসর পূর্বে চা-উৎপাদনে চীনের একাধিপত্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহা ভারত ও অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত ইংরেজী ভাষাভাষী দেশে এবং হল্যাণ্ড ও জাপানে চা প্রধান পানীয় দ্রব্য। অন্যান্য দেশেও পানীয় দ্রব্য হিসাবে চা-এর প্রচলন রহিয়াছে।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—চা-গাছ সাধারণতঃ ১ মিটার উঁচু হয়। অবশ্য বাড়িতে দিলে ইহা ৬ মিটার পর্যন্ত উঁচু হইতে পারে। কিন্তু পাতা তুলিবার সুবিধার জন্য চা-গাছকে মাঝে

মাঝে ছাঁটিয়া ছোট করিয়া দিতে হয়। চা-গাছের চাষের জন্য প্রচুর **বৃষ্টিপাত** (১৫০ হইতে ২৫০ সেঃ মেঃ) প্রয়োজন। কিন্তু জমিতে জল দাঁড়াইয়া থাকা চা-চাষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। জল-নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলিয়া ঢালু জমিতে পার্বত্য অঞ্চলেই চা-চাষ প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকে। ভারতের আসাম এবং দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে এইজন্য চা-এর চাষ ভালো হয়। জল-নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা থাকিলে সমতলভূমিও চা-চাষের অনুপযোগী নহে।

প্রচুর **উত্তাপ** (২৭° সেঃ) চা-চাষের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। মৌসুমী অঞ্চলে এইরূপ উত্তাপ ও প্রচুর বৃষ্টিপাত থাকায় এখানে চা-চাষের খুবই উন্নতি হইয়াছে। ভারত এবং দক্ষিণ চীন মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়।

উর্বর লৌহমিশ্রিত **দো-আঁশ মাটি** চা-চাষের বিশেষ উপযোগী। কিন্তু চা-গাছ জমির উর্বরাশক্তি সহজেই কমাইয়া দেয়। এইজন্য জমিতে সারের প্রয়োজন হয়। গাছ হইতে চা-পাতা হাত দিয়া তুলিতে হয় বলিয়া প্রচুর সুলভ ও নিপুণ **শ্রমিক** দরকার। ছোট ও সরু অঙ্গুলি চয়নের পক্ষে সুবিধাজনক। এইজন্য ছোট ছেলেমেয়ে ও মহিলা শ্রমিক চা-চাষে অধিক-সংখ্যায় নিয়োগ করা হয়; ইহাদের পারিশ্রমিকও কম। সিংহল, চীন ও ভারত প্রভৃতি দেশে এইরূপ শ্রমিকের কোনপ্রকার অভাব না থাকায় এই সকল দেশে ইহার চাষ বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Growing areas)—প্রধানতঃ এশিয়ার দেশগুলিতেই চা উৎপন্ন হয়।

পৃথিবীর মোট চা-উৎপাদন—১০ লক্ষ ৪০ হাজার মেট্রিক টন
(১৯৬৩-৬৪)

ভারত	৩ লক্ষ ৪৫ হাজার মেঃ টন		জাপান	৮১ হাজার মেঃ টন	
সিংহল	২ „ ২০ „ „ „		ইন্দোনেশিয়া	৩৮ „ „ „	
চীন	১ „ ৫৯ „ „ „		পাকিস্তান	২৫ „ „ „	

Source—Indian Tea Board—Monthly Statistical Summary, March, 1965.

ভারত—চা-উৎপাদন ও রপ্তানিতে ভারতের স্থান প্রথম। চা-চাষের উপযোগী জলবায়ু ও অন্যান্য অবস্থা ভারতের উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে বিদ্যমান। সেইজন্য **আসাম, পশ্চিমবঙ্গের**

দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা, **মাদ্রাজ** ও **কেরালায়** প্রধানতঃ চা উৎপন্ন হয়। ভারতের মোট চা উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগের বেশী চা উৎপন্ন করিয়া আসাম প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। আসামের দরং, শিবসাগর, লক্ষীমপুর ও কাছাড় জেলা চা-এর জন্য বিখ্যাত। এর পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান; এখানে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় চা-এর চাষ হয়। ইহা ছাড়া, মাদ্রাজের নীলগিরি অঞ্চলে. কেরালার পার্বত্য অঞ্চলে, **পাঞ্জাবের** কাঙড়া-উপত্যকায়, **উত্তরপ্রদেশের** কুমায়ুন পাহাড়ে ও **বিহারের** রাঁচিতে চা উৎপন্ন হয়।

চা-রপ্তানি ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্য। আভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় মোট উৎপন্ন চা-এর শতকরা ৭৬ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। সিংহল ও চীন ভারতীয় চা-এর প্রধান প্রতিযোগী। ভারতে আভ্যন্তরীণ চাহিদা

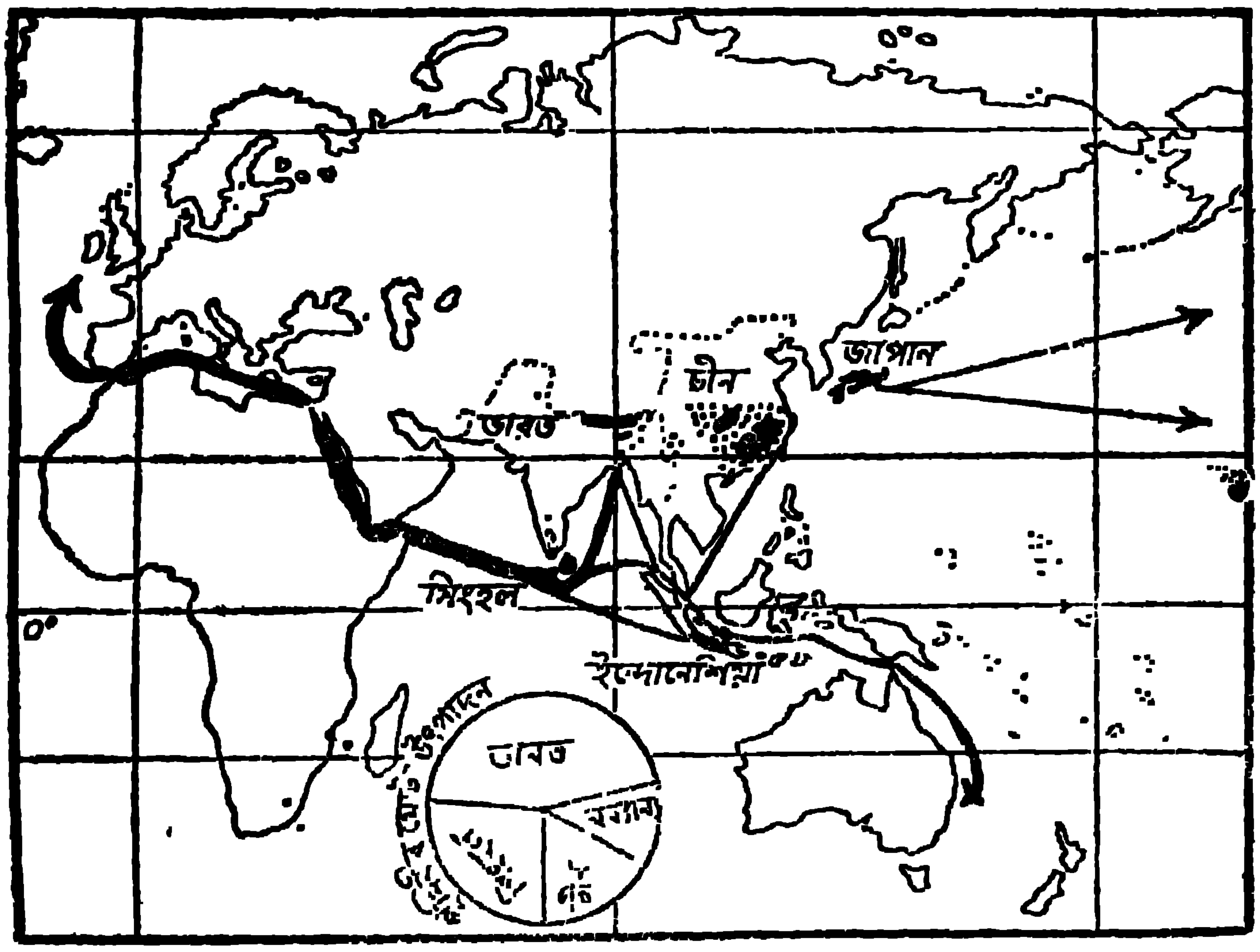

পৃথিবীর চা-উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ
(তীরচিহ্ন দ্বারা আমদানি-রপ্তানিকারক দেশসমূহ দেখানো হইয়াছে।)

বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে। এই দেশে লোকসংখ্যা অধিক। জনসাধারণের জীবনধারণের মানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে চা-এর চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়। ফলে ভারতের চা-শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে রপ্তানি-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে না।

সিংহল—কাণ্ডির দক্ষিণাঞ্চল চা-এর জন্য বিখ্যাত। সিংহল বর্তমানে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম চা-উৎপাদক ও রপ্তানিকারক।

চীন—মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত ইয়াং-সি-কিয়াং নদীর উপত্যকায় প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত একমাত্র চীনদেশ সমগ্র পৃথিবীর চা সরবরাহ করিত। বর্তমানে ইহার স্থান তৃতীয়। স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া চীনের পক্ষে চা রপ্তানি করা কষ্টকর। কিন্তু বৃটেন, রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে চীন বর্তমানে কিছু কিছু চা রপ্তানি করিয়া থাকে। **ইন্দোনেশিয়ার** জাভায়, **জাপানে, পূর্ব পাকিস্তানের** শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে, **ফরমোসায়,** পূর্ব আফ্রিকার **কেনিয়া, নিয়াসাল্যাণ্ড,** ট্যাঙ্গানাইকা, মোজাম্বিক ও মালয়েশিয়ায়, **রাশিয়ার** ককেশাস্ পার্বত্য অঞ্চলে, ইরাণ, ব্রেজিল, ফিজি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়া ও দক্ষিণ ক্যারোলিনায় চা উৎপন্ন হয়।

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য—চা-এর রপ্তানিকারকদের মধ্যে ভারত, সিংহল, চীন, জাপান ও ইন্দোনেশিয়া উল্লেখযোগ্য। ভারত ও সিংহলে উৎপন্ন চা-এর বেশীর ভাগই বিদেশে **রপ্তানি** হয়। ভারত চা-রপ্তানিতে বর্তমানে প্রথম স্থান অধিকার করিলেও, সিংহল ইহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী। হয়তো শীঘ্রই সিংহল ভারতকে অতিক্রম করিয়া চা-রপ্তানিতে প্রথম স্থান অধিকার করিবে। ইদানীং পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলি হইতে চা-এর রপ্তানি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে বৃটেন প্রথম স্থান অধিকার করে। ভারতের রপ্তানিকৃত চা-এর শতকরা ৬০ ভাগ বৃটেনে প্রেরিত হয়। হল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, মিশর প্রচুর চা **আমদানি** করে। ভারতের কলিকাতা, মাদ্রাজ ও কোচিন, সিংহলের কলম্বো, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা, পাকিস্তানের চট্টগ্রাম চা-রপ্তানির প্রধান বন্দর।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষদিকে এবং তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে চা-এর উৎপাদন অধিক হওয়ায় ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে ও বৃটিশ ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের যুক্ত উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক চা-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (International Tea Exports Regulation Scheme) চালু করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী চা-এর উৎপাদন ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং ইহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত কার্যকরী থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়

পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ জাপান কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় ওলন্দাজগণ এই পরিকল্পনা হইতে সরিয়া যায়। কিন্তু ইংরেজগণ যুদ্ধের সময়ও এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। যুদ্ধের পরেও ইংরেজগণ কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ চালু রাখে। ১৯৪৮ হইতে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রধান চা-রপ্তানিকারকগণ একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী চা-এর বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চা-এর ব্যবহার প্রসারকল্পে যৌথ প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং এই কার্যের জন্য চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ-সমূহের প্রতিনিধিগণকে লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চা-পর্ষৎ (Tea Council of U. S. A.) গঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় চা-এর ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইবার জন্য বর্তমানে আন্তর্জাতিক চা কমিটি (International Tea Committee) নানাভাবে চেষ্টা করিতেছে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক চা-এর বাজার-প্রসারক সংঘ (International Tea Market Expansion Board) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চা-এর চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

কফি (Coffee)

কফি একপ্রকার গাছের ফল। এই ফলের বীজ শুকাইয়া এবং অল্প সেঁকিয়া কফি প্রস্তুত করা হয়। আফ্রিকার কঙ্গো নদীর উপত্যকায় সর্ব-প্রথম এই গাছ দেখা যায়। পরে ব্রেজিল ও অন্যান্য দেশে ইহার চাষের প্রসার হয়। ৩।৪ বৎসর হইলেই কফিগাছে ফল হয় এবং প্রায় ৩০ বৎসর পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। চা-এর মতো কফিও মৃদু-উত্তেজক পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—কফি উষ্ণ-মণ্ডলের ফসল। কফিচাষের জন্য উর্বর **লাল মৃত্তিকা** বিশেষ উপযোগী। জমিতে জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এইজন্য পর্বতগাত্রে ও ঢালু জমিতে চাষ ভালো হয়। ১৫° সেঃ হইতে ৩০° সে **উত্তাপ** কফিচাষের পক্ষে উপযোগী। চাষের প্রথমাবস্থায় ছোট গাছগুলিকে সূর্যকিরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কফিচারার সারের মধ্যে কলা বা ভুট্টা জাতীয় বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট

গাছ লাগানো হয়। ১৫০ সেঃ মিঃ হইতে ৩০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত কফিচাষের উপযোগী। তুহিন ও ঝড় কফিচাষের পক্ষে ক্ষতিকর। গাছ হইতে ফল তুলিবার জন্য এবং তাহা শুকাইয়া ও সেঁকিয়া কফি প্রস্তুতের জন্য প্রচুর সুলভ **শ্রমিক** দরকার।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Growing areas)—কফি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের একচেটিয়া ফসল। ২৩½° উঃ ও ২৩½° দঃ অক্ষরেখার মধ্যে উৎপাদক অঞ্চলগুলি অবস্থিত।

পৃথিবীর মোট কফি-উৎপাদন—৩৯ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিক টন (১৯৬৩-৬৪)

ব্রেজিল	১৫ লক্ষ ৬০ হাজার মেঃ টন	উগাণ্ডা	১ লক্ষ ৩১ হাজার মেঃটন
কলম্বিয়া	৪ „ ৬৮ „ „	মেক্সিকো	১ „ ২৯ „ „
আইভরি কোস্ট	২ „ ৫৫ „ „	এল্‌সালভাডর	১ „ ১৩ „ „
অ্যাঙ্গোলা	১ „ ৬৮ „ „	গুয়াটেমালা	১ „ ৫ „ „

F. A. O.—Monthly Bulletin, April, 1965 সংখ্যা হইতে সংগৃহীত।

ব্রেজিল—কফি-উৎপাদনে ব্রেজিল পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট কফি উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ ব্রেজিলে উৎপন্ন হয়। সাওপলো প্রদেশেই অধিকাংশ চাষ হয়। ইহা ছাড়া, রায়ো-ডি-জেনিরো, এস্‌পিরিটো ও মিনাস্‌ গেরায়েস্‌ অঞ্চলে প্রচুর চাষ হয়। ব্রেজিলের অর্থ-নৈতিক অবস্থা অনেকাংশে এই একটি শস্যের উপর নির্ভরশীল। ব্রেজিল শুধু কফি-উৎপাদনেই প্রথম স্থান অধিকার করে না, কফির রপ্তানি-বাণিজ্যেও ইহার স্থান প্রথম; কারণ দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা খুবই কম।

নিম্নলিখিত **কারণগুলির** জন্য ব্রেজিল কফি-উৎপাদন ও রপ্তানিতে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে :

(ক) ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে ব্রেজিলে কফির চাষ আরম্ভ হইলেও, ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের পর হইতেই কফিচাষে প্রকৃত উন্নতি শুরু হয়। এই সময়ে ইউরোপের ইটালি ও অন্যান্য দেশ হইতে বহুলোক ব্রেজিলে আসিয়া বসবাস করিতে শুরু করে। ইউরোপ হইতে আগত এই সকল অধিবাসী এই দেশের কফিচাষের উন্নতিতে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে।

(খ) কফিচাষের কেন্দ্র পূর্ব ব্রেজিলের মালভূমি অধিকাংশ স্থানে ধীরে

ধীরে ঢালু হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ ভূ-প্রকৃতির ফলে জলনিকাশের ও অবাধ বায়ু-চলাচলের সুবিধা হইয়াছে, এবং কফিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি প্রয়োগ ও অপেক্ষাকৃত অল্পখরচে রাজপথ ও রেলপথ নির্মাণ করা সম্ভব হইয়াছে। এই অঞ্চলের এক বিরাট অংশ জুড়িয়া বিখ্যাত লালমাটি (Terra Roxa) দেখিতে পাওয়া যায়। এই মাটি গভীর ছিদ্রযুক্ত ও প্রবেশ্য। এইপ্রকার মাটিতে গাছের শিকড় মাটির ভিতর বহুদূর ছড়াইয়া পড়িয়া খাদ্য আহরণ করিতে পারে। ইহা ছিদ্রযুক্ত হওয়ায় জলনিকাশের সুবিধা হয় এবং বৃক্ষখাদ্য মাটির মধ্যে সমানভাবে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। এই মাটিতে কফির উৎপাদন অধিক হয় এবং কফি সুগন্ধযুক্ত হয়।

(গ) ব্রেজিলের কফি-উৎপাদক অঞ্চলে অক্টোবর মাস হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। এই সময়ে কফি-গাছ বৃদ্ধি পায় ও ফল ধরে; ফলে এই সময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের প্রয়োজন হয়। এই সময়ে এখানকার গড় তাপমাত্রা হয় ১৮° সেঃ হইতে ২৬° সেঃ। এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১১২ সেঃ মিঃ হইতে ১৫০ সেঃ মিঃ এবং এই বৃষ্টিপাতের অধিকাংশ হয় গ্রীষ্মকালে। গ্রীষ্মকালীন এইরূপ বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা এই স্থানের কফিচাষের উন্নতিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। এই স্থানের কফিগাছ-গুলির জন্য একেবারে চারা অবস্থায় ছাড়া ছায়ার প্রয়োজন হয় না। নিরক্ষ-রেখার নিকটবর্তী বলিয়া এখানে পরিচলন-বৃষ্টি দেখা যায়। ফলে বর্ষার মাসগুলিতেও প্রচুর সূর্যকিরণ পাওয়া যায়। এই কারণে কফিগাছে রোগ-ব্যাধির আক্রমণ কম। বৃষ্টিপাত সমস্ত দিন ধরিয়া হয়না বলিয়া প্রত্যেক দিনই কফির ক্ষেত্রে কাজ করা সম্ভব হয়। বর্ষার শুরুতে ও শেষে মৃদু বৃষ্টিপাত হয়। এই দুই সময়ে প্রবল বৃষ্টি হইলে কফির ফুল ও ফল ঝরিয়া যায়।

মে মাস হইতে আগস্ট মাস পর্যন্ত এখানে শীতকাল। এই সময়ে মাসে গড়ে ৫ সেঃ মিঃ-এর কম বৃষ্টিপাত হয়। তাপমাত্রা ১৪ সেঃ হইতে ১৮ সেঃ। এইরূপ শুষ্ক, শীতল ও সূর্যকরোজ্জ্বল আবহাওয়া কফির ফল-পাকা, ফল-তোলা, শুকানো এবং পরিবহণের বিশেষ সাহায্য করে। এই সময় ফল-তোলা এবং শুকানো ইত্যাদির জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। মৃদু ও রৌদ্রোজ্জ্বল শীতের আবহাওয়া কঠোর পরিশ্রমের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী।

(ঘ) কফিক্ষেত্রগুলি সমুদ্রের অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থিত। প্রতিটি

কফিক্ষেত্রে শাখা রেলপথ প্রসারিত রহিয়াছে। ক্ষেত হইতে কফি রেলযোগে লইয়া আসিয়া মধ্যে মধ্যে অবস্থিত গুদামঘরে মজুত করা হয় এবং সেখান হইতে রপ্তানির জন্য স্যাণ্টোস্ ও রায়ো-ডি-জেনিরো বন্দরে পাঠানো হয়। জাহাজে কফি বোঝাই করিবার জন্য বন্দরে নানাপ্রকার উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হইয়াছে।

কলম্বিয়া—কফি-উৎপাদনে কলম্বিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। রপ্তানি-বাণিজ্যেও ইহার স্থান দ্বিতীয়। করডিল্লেরা (আণ্ডিস্) অঞ্চল কফিচাষের জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ১০% কফি এখানে উৎপন্ন হয়।

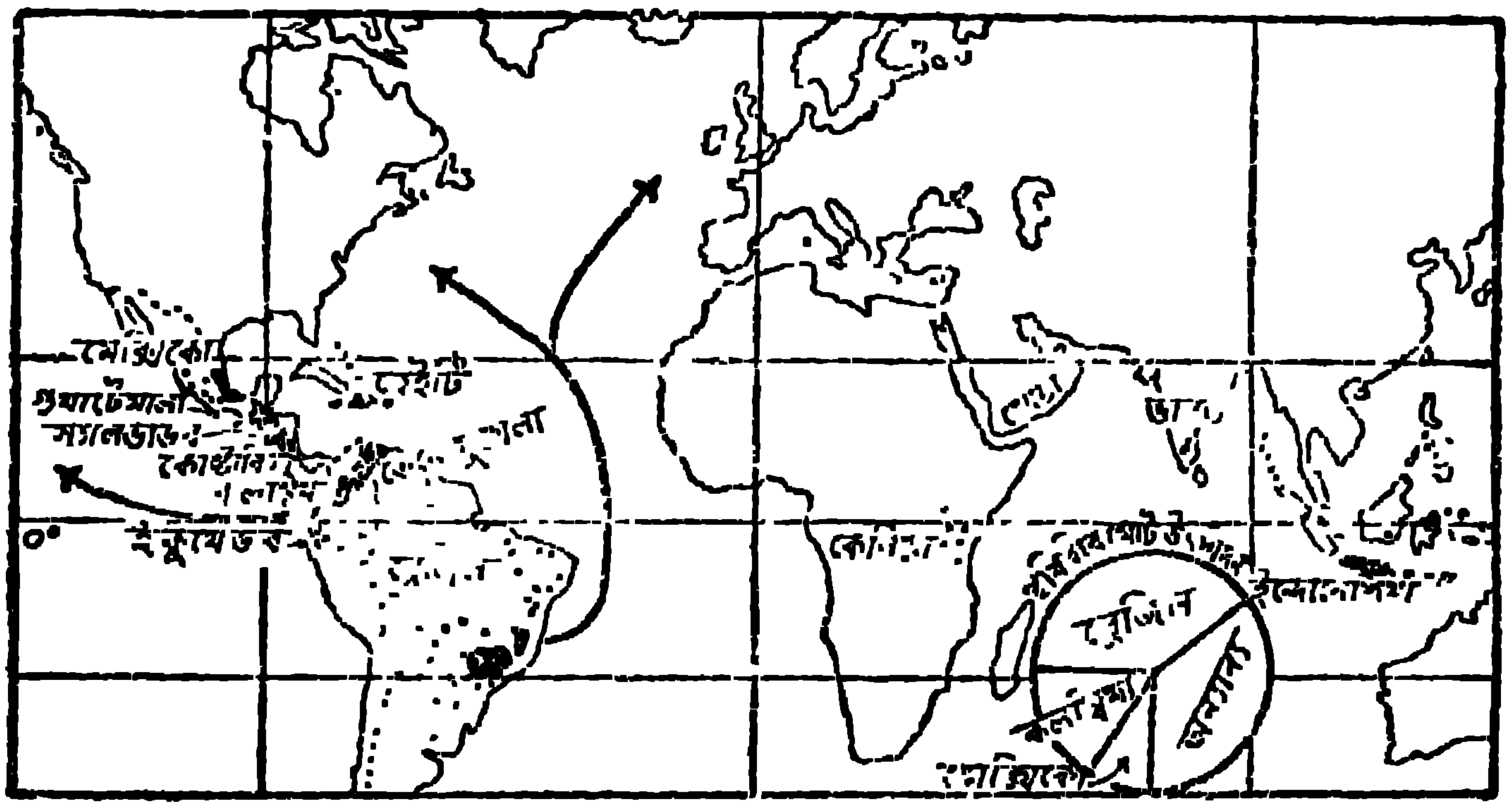

পৃথিবীর কফি-উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ

(তীরচিহ্ন দ্বারা আমদানি-রপ্তানিকারক দেশসমূহ দেখানো হইয়াছে।)

ব্রেজিল ও কলম্বিয়া ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার **ভেনেজুয়েলা** ও **ইকুয়েডর**, মধ্য আমেরিকার **গুয়াটেমালা, এল্ সালভাডর, নিকারাগুয়া** ও **কোস্টারিকায়**, উত্তর আমেরিকার **মেক্সিকোতে** প্রচুর কফির চাষ হয়। লোহিত সাগরের তীরের **ইয়েমেন** অঞ্চলে উৎকৃষ্ট ধরনের কফি উৎপন্ন হয়। এই কফি মোচা বন্দর হইতে রপ্তানি হয় বলিয়া ইহাকে 'মোচা কফি' বলা হয়। ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জে, আফ্রিকার **হস্তিদন্ত উপকূল, ইথিওপিয়া, উগাণ্ডা, অ্যাঙ্গোলা, ক্যামেরুন** ও **মাডাগাস্কারে** প্রচুর কফির চাষ হয়। এশিয়ার **ভারত, সিংহল** ও **ইন্দোনেশিয়ায়** কফি উৎপাদিত হয়।

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য (Trade)—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চা ও কোকো অপেক্ষা কফি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত কফির অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হয়। রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ব্রেজিল প্রধান। ১৯৬০-৬১ সালে পৃথিবীর মোট কফি-রপ্তানির শতকরা ৩৫ ভাগ এই দেশ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া, কলম্বিয়া, আইভরি কোস্ট, উগাণ্ডা, অ্যাঙ্গোলা, মেক্সিকো, গুয়াটেমালা, এল্‌সালভাডর, ইথিওপিয়া, কোস্টারিকা, মাডাগাস্কার ও ক্যামেরুন কফি রপ্তানি করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কফির সর্বপ্রধান আমদানিকারক দেশ। পৃথিবীর মোট রপ্তানির দুই-তৃতীয়াংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানি করিয়া থাকে। গ্রেট বৃটেন ও হল্যাণ্ড ব্যতীত ইউরোপের আর সকল দেশ প্রচুর পরিমাণে কফি আমদানি করিয়া থাকে। চা-পায়ী দেশগুলিতে কফির আমদানি সামান্য।

কফি ব্রেজিলের প্রধান কৃষিজাত ও রপ্তানি-দ্রব্য। এইজন্য ব্রেজিলের অর্থনীতি বহুলাংশে কফির উপর নির্ভরশীল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ব্রেজিলে কফির চাষ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার ফলে বর্তমান শতাব্দীর শুরু হইতেই অত্যধিক কফি উৎপাদনের জন্য উদ্‌বৃত্ত-সমস্যা দেখা দিতে থাকে এবং কফির রপ্তানি-মূল্য হ্রাস পাইতে থাকে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য সাওপলোর প্রাদেশিক সরকার ১৯০৬, ১৯১৭ ও ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে কফি ক্রয় করিয়া লইয়া ভবিষ্যতে সুবিধামতো উহা বাজারে বিক্রয় করে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে সকল সময়েই প্রচুর পরিমাণে উদ্‌বৃত্ত কফি মজুত থাকে। প্রধান বিক্রেতা হিসাবে ব্রেজিল পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াছে কফির উৎপাদন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করিতে, কিন্তু তাহার এই চেষ্টা কখনও সফল হয় নাই। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রেজিল সরকার কফি ক্রয়, মজুত ও বিক্রয়ের নীতি অনুসরণ করে, কিন্তু এই নীতি ব্যর্থ হওয়ায় ব্রেজিল কফিরক্ষার নীতি পুনর্গঠন করিয়া নূতন আবাদ বন্ধ করা, উদ্‌বৃত্ত ফসল পোড়াইয়া ফেলা, দেশের অভ্যন্তরভাগের গুদামঘরে ফসল মজুত করিয়া রাখা এবং কফির ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রচারকার্য চালানো প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে থাকে। সরকার কর্তৃক এইপ্রকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া কফির মূল্য বৃদ্ধি করা বা স্থায়ী রাখা **কফি ভেলোরাইজেশন (Coffee Valorization)** নামে অভিহিত হয়। এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার

ফলে ব্রেজিল আন্তর্জাতিক বাজারে কফির চড়া দাম বজায় রাখিতে সমর্থ হয়। কিন্তু অন্যদিকে ইহার ফলে পৃথিবীর মোট রপ্তানি-বাণিজ্যে তাহার অংশ হ্রাস পায়। কারণ বাজারে দাম বেশী থাকায় অন্যান্য দেশে কফির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার ফলে ইউরোপে কফির বাজার নষ্ট হইয়া যায়। ফলে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির কফি-রপ্তানি ভীষণভাবে হ্রাস পায় এবং মজুত কফির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপ পরিস্থিতিতে এই সকল দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে। কারণ কফি ল্যাটিন আমেরিকার অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মার্কিন স্বার্থ ল্যাটিন আমেরিকার রাজনীতি ও অর্থনীতির সহিত ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত বলিয়া উপরোক্ত সমস্যাসমূহ সমাধান করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৪টি ল্যাটিন আমেরিকান দেশের সহিত মিলিত হইয়া ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে **আন্তঃ-আমেরিকান কফি-চুক্তি (Inter-American Coffee Agreement)** সম্পাদন করে। এই চুক্তির মেয়াদ ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে শেষ হইয়া যায় এবং মজুত কফি নিঃশেষ হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও বহুদিন লাগিয়াছে। বর্তমানে ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ হইতে মোট যত মূল্যের পণ্যদ্রব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয় তাহার প্রায় অর্ধেক হইল কফি।

কোকো (Cocoa)

রবারের ন্যায় কোকোর আদি জন্মস্থান পশ্চিম গোলার্ধ হইলেও বর্তমানে পৃথিবীর মোট কোকো উৎপাদনের অধিকাংশ পাওয়া যায় পূর্ব গোলার্ধ হইতে। কোকো পুরাপুরিভাবে উষ্ণমণ্ডলের ফসল।

ব্যবহার (Uses)—ক্যাকাও (Cacao) নামক একপ্রকার চিরহরিৎ বৃক্ষের ফলের বিচি গুঁড়া করিয়া কোকো প্রস্তুত করা হয়। কোকো প্রধানতঃ পানীয় হিসাবে এবং চকোলেটের ন্যায় মিষ্টান্ন প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুতেও ইহা ব্যবহার করা হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—ক্যাকাও নিরক্ষীয় জলবায়ুর উদ্ভিদ। নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণে ২০° অক্ষরেখার মধ্যে নিম্ন অথবা সমতলভূমি অঞ্চলে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্যাকাও বৃক্ষের মূল দীর্ঘ হয় বলিয়া ইহার উৎপাদনের জন্য গভীর, আর্দ্র ও জলনিকাশের উত্তম সুবিধাযুক্ত মৃত্তিকা প্রয়োজন। অরণ্য পরিষ্কার করিয়া বাহির করা নূতন জমি ক্যাকাও-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ২৭ সেঃ বাৎসরিক গড় তাপমাত্রা এবং ২০০ সেঃ মিঃ বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ক্যাকাও-চাষের পক্ষে অনুকূল। তাপমাত্রা সারাবৎসর মোটামুটি সমান থাকা প্রয়োজন, এবং সারাবৎসর সমানভাবে বৃষ্টিপাত হইলে ভালো হয়। কোকো ফল পাকিবার সময় অল্প কিছুদিন বৃষ্টিপাত বন্ধ ও উজ্জ্বল সূর্যকিরণ থাকিলে ফল তুলিবার ও বিচি শুকাইবার সুবিধা হয়। কিন্তু দীর্ঘ শুষ্ক ঋতু ক্যাকাও-গাছের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। প্রবল বাত্যা ক্যাকাও-চাষের পক্ষে মারাত্মক; কারণ ইহাতে ফলগুলি অকালে ঝরিয়া পড়ে; অর্থাৎ, নিরক্ষীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলিই ক্যাকাও-চাষের পক্ষে সবদিক দিয়া অনুকূল। গাছগুলির ছোট অবস্থায় প্রত্যক্ষ সূর্যকিরণ হইতে উহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। এইজন্য মাঝে মাঝে দীর্ঘ-পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ রোপণ করা হয়। ক্যাকাও-চাষের উপযোগী উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু শ্বেতকায় শ্রমিকের কঠোর পরিশ্রমের অনুকূল নহে।

পৃথিবীর কোকো উৎপাদন ও ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২২ হইতে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে কোকোর বাৎসরিক উৎপাদন ও ব্যবহার প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯০৩ হইতে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের বাৎসরিক গড় উৎপাদন ও ব্যবহারের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও ১৯৪৭ হইতে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইহার উৎপাদন ও ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পায় এবং বর্তমানেও এই গতি অব্যাহত রহিয়াছে। অবশ্য কোকোর এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা পানীয় হিসাবে ইহার ব্যবহারের জন্য নহে। চকোলেটের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবার ফলেই উহা প্রস্তুত করিবার জন্য কোকোর ব্যবহার এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, জার্মানী ও বেলজিয়াম পৃথিবীর এই চারটি অন্যতম প্রধান কোকো-ব্যবহারকারী দেশে বাৎসরিক মাথাপিছু কোকোর ব্যবহার ১·৫ হইতে ৩ কিলোগ্রাম।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing areas)—বাণিজ্যিক কৃষি-পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ খামারে ক্যাকাও-এর আবাদ হইয়া থাকে। ইহার চাষ প্রধানতঃ তিনটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ—(ক) পশ্চিম আফ্রিকা, (খ) পূর্ব ব্রেজিল এবং (গ) ক্যারিবিয়ান দেশসমূহ ও দ্বীপসমূহ।

পৃথিবীর মোট কোকো-উৎপাদন—১৪ লক্ষ ১৮ হাজার মেঃ টন
(১৯৬৪-৬৫)

ঘানা	৫ লক্ষ ৭০ হাঃ মেঃটন		ব্রেজিল	১ লক্ষ ৩২ হাঃ মেঃ টন	
নাইজেরিয়া	২ „	৭০ „	ক্যামেরুন	৯০	„
আইভরি কোস্ট	১ „	৩৫ „	ডোমিনিকান রিপাবলিক	৪০	„

Source—Sutatistical Report, U. S. Dept. of Agriculture, April, 1965

পশ্চিম আফ্রিকা—পশ্চিম আফ্রিকার অন্ততঃ ১২টি দেশে প্রধানতঃ ইউরোপে রপ্তানির নিমিত্ত ক্যাকাও-এর চাষ করা হইয়া থাকে। এই সকল দেশের মধ্যে **ঘানা** অগ্রগণ্য। এই দেশে ৪ লক্ষ হেক্টরের অধিক জমিতে ক্যাকাও চাষ করা হয়। আরও অনেক জমি, যাহা বর্তমানে অনাবাদী পাড়িয়া আছে, ক্যাকাও-চাষের উপযোগী। এই অঞ্চলের নীচু, জলনিকাশের সুবিধাযুক্ত জমি এবং সংবৎসরব্যাপী উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া ক্যাকাও-চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। দার্ঘ গ্রীষ্মকাল ধরিয়া ২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত এবং তাহার পরেই হ্রস্ব কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অথবা শুষ্ক ঋতুর আগমনের ফলে এখানে উৎপাদন অধিক এবং ফসল-তোলা ও বিচি-শুকানোব অসুবিধা হইয়াছে। প্রচুর সূর্যকিরণ পাওয়া যায় বলিয়া ছায়ার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইলেও ক্যাকাও-গাছে রোগ-ব্যাধির আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম। এখানকার লৌহ ও পটাশ-মিশ্রিত গভীর ও উর্বর ভারী দো-আঁশ ও হালকা কাদামাটি ক্যাকাও-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এখানকার ক্যাকাও-চাষ প্রধানতঃ স্থানীয় অধিবাসিগণের মালিকানায় পরিচালিত হয়। একর-প্রতি উৎপাদন ৩২ কিলোগ্রাম হইতে ৭২৫ কিলোগ্রাম পর্যন্ত দেখা যায়। ফসল তোলা হয় বৎসরে দুইবার। সেপ্টেম্বর মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ফসল তোলা হয়। এই সময় বৃষ্টিপাত সর্বাপেক্ষা কম হয়। মে মাস হইতে জুলাই মাসের মধ্যে সামান্য পরিমাণে ফসল তোলা হইয়া থাকে। ফসল তোলার সময় স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে ফল পাড়া ও ফল কাটিয়া বিচি বাহির করিবার কার্যে নিযুক্ত হয়। এই সময়ে স্থানীয় শ্রমিকের অভাব পূরণ করিবার জন্য অনেকসময় বাহির হইতে শ্রমিক আমদানি করিতে হয়। সি সি মাছির (TseTse fly) উৎপাতে ভারবাহী পশুর অভাব থাকায় ক্ষেত হইতে কৃষকেরা মাথায় করিয়া কোকো বহন করিয়া গ্রামে লইয়া আসে।

তারপর মোটর-ট্রাকে চাপাইয়া ইহা রেল-স্টেশনে অথবা সমুদ্রতীরে লইয়া আসা হয়। কোকো-চাষ ও রপ্তানির পক্ষে যাতায়াত-ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্য রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে রাস্তাঘাট কার্যোপযোগী রাখাও ব্যয়বহুল।

পশ্চিম আফ্রিকার **নাইজেরিয়া** কোকো-উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা ছাড়া, **হস্তিদন্ত উপকূল** (Ivory Coast), **টোগোল্যাণ্ড, ক্যামেরুন, ফারুনান্‌ডো পু, সাও টমি** প্রভৃতি অঞ্চলেও কোকো উৎপাদন করা হয়। এই সকল দেশে কোকো-রপ্তানির উপর মোটেই শুল্ক ধার্য না করিয়া অথবা সামান্য শুল্ক ধার্য করিয়া ক্যাকাও-চাষে উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে।

পূর্ব ব্রেজিল ও ক্যারিবিয়ান দেশসমূহ—একসময়ে আমেরিকার দেশসমূহ হইতে পৃথিবীর প্রয়োজনীয় সমস্ত কোকো পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। **ব্রেজিলের** সমুদ্রতীরবর্তী বাহিয়া প্রদেশে কোকো উৎপাদিত হয়। এখানকার সংবৎসরব্যাপী উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া, ভারী দো-আঁশ মাটি, সূর্যকিরণ ও প্রবল বায়ুপ্রবাহ হইতে ক্যাকাও-গাছগুলিকে রক্ষার উপযোগী বৃক্ষ, সমুদ্রোপকূলের নিকটবর্তিতা ও যাতায়াতের সুব্যবস্থা ক্যাকাও-চাষের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ, ক্যাকাও-গাছের রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা, বিচি শুকানো ও সেঁকায় অযত্ন ও দক্ষতার অভাব প্রভৃতি কারণে এখানকার কোকো উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হয় না। উপরন্তু নানারূপ সরকারী করের জন্য কোকোর রপ্তানি-মূল্যও অধিক। **ইকুয়েডরে** কোকো উৎপাদিত হয়, কিন্তু নানারূপ রোগের আক্রমণে এখানকার ক্যাকাও-চাষ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দেশে ক্যাকাও চাষ করা হয়; এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থা ইহার অনুকূল। সমস্ত ক্যাকাও-ক্ষেত সমুদ্রতীরের নিকটে অবস্থিত। দক্ষ ও সুলভ শ্রমিকের অভাব এখানে নাই। কোথাও বৃহৎ আবার কোথাও ক্ষুদ্র আকারে ক্যাকাও চাষ করা হয়। **ডোমিনিকান রিপাবলিক** ও হাইতি দ্বীপে ছোট ছোট ক্ষেত দেখা যায়। আবার মধ্য আমেরিকার বড় বড় কর্পোরেশনের মালিকানায় সুবৃহৎ ক্যাকাও-ক্ষেত দেখা যায়। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে উৎপাদিত কোকো সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর।

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য (Trade)—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বপর্যন্ত

কোকোর বাণিজ্যে বিশেষ কোনরূপ সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কেবল ব্রেজিলে সীমাবদ্ধ আকারে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হইত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে প্রধান প্রধান আমদানিকারক দেশগুলি কোকো ক্রয় করিতে অসমর্থ হওয়ায়, ব্রেজিল ও পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলিতে কণ্ট্রোল বোর্ড বসাইয়া কোকোর ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যুদ্ধের সময় কোকোর দাম হ্রাস পাওয়ায়, শ্রমিক ও জাহাজের অভাব ঘটায়, গাছগুলির অযত্ন ও রোগব্যাধির প্রসার হওয়ায় কোকোর উৎপাদন ও রপ্তানি হ্রাস পায়। মহাযুদ্ধের পর উৎপাদনে ঘাটতি ও নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকায় কিছু সময়ের জন্য কোকোর মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে কোকোর মোট রপ্তানির পরিমাণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী। বহুদেশে কোকো উৎপাদিত হইলেও পৃথিবীর মোট রপ্তানি-বাণিজ্যের ৮০% পশ্চিম আফ্রিকা ও ব্রেজিল হইতে সরবরাহ করা হয়। পশ্চিম আফ্রিকার প্রাক্তন ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির রপ্তানি-বাণিজ্যের সর্বপ্রধান উপকরণ কোকো।

সর্বপ্রধান কোকো-আমদানিকারক দেশ হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইহা ছাড়া, বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং জার্মানীও প্রচুর পরিমাণে কোকো আমদানি করে। পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে আনীত কোকোর ৯০% ক্রয় হয়।

কোকো সাধারণতঃ বিচির আকারে আমদানি করা হয়। আমদানি বন্দরের কাছাকাছি অবস্থিত কারখানায় বিচিগুলি পরিষ্কার করিয়া, গুঁড়াইয়া ও সেঁকিয়া প্রথমে কিছু পরিমাণ তৈল বাহির করিয়া লওয়া হয়। এই সকল কার্যের জন্য যথেষ্ট দক্ষ শ্রমিক ও মূল্যবান্ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। গুঁড়া কোকো পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ওভালটিন, বোর্ণভিটা প্রভৃতি পুষ্টিকর পানীয় কোকো হইতে প্রস্তুত করা হয়। চকোলেট প্রভৃতি মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রস্তুতে গুঁড়া কোকো ও কোকোর তৈল বা মাখন ব্যবহার করা হয়।

রবার (Rubber)

নিরক্ষীয় অঞ্চলে **হেভিয়া (Hevea)** নামক একপ্রকার গাছের আঠা হইতে রবার প্রস্তুত হয়। প্রথমে শুধু পেন্সিলের দাগ মুছিবার (Rub) জন্য রবার ব্যবহৃত হইত বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। বর্তমানে রবার হইতে মোটর-গাড়ী, বিমানপোত ও সাইকেলের টায়ার, জুতা, ওয়াটার প্রুফ,

ডাক্তারি, বৈজ্ঞানিক, খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম এবং অন্যান্য বহু জিনিস প্রস্তুত হয়। বিদ্যুৎ-শিল্পে রবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধ ও দেশরক্ষায় রবার গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। সর্বোপরি একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রবার-চাষের ব্যাপক প্রসার ও মোটর-গাড়ীর আবিষ্কার ও প্রচলন পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—রবার নিরক্ষীয় অঞ্চলের একচেটিয়া ফসল। ইহা দুইপ্রকারের হয়—বন্য রবার ও আবাদী রবার।

নিরক্ষীয় অরণ্য অঞ্চলে **বন্য রবার (Wild Rubber)** গাছ স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হইয়া থাকে। শুধু গাছ হইতে আঠা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রবার প্রস্তুত করিতে হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে আফ্রিকার কঙ্গো নদী ও দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর উপত্যকা বন্য রবারের জন্য বিখ্যাত। চাষের জন্য কোন খরচ না হইলেও যানবাহনের অসুবিধা থাকায়, বাজার দূরে থাকায়, শ্রমিকের অভাব এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপিয়া গাছগুলি ছড়াইয়া থাকায় বন্য রবারের উৎপাদন ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে।

এইজন্য বর্তমানে **আবাদী রবার (Plantation Rubber)** হইতেই অধিকাংশ রবার উৎপন্ন হইতেছে। ইহার জন্য ২৭° সেঃ **উত্তাপ**, ২০০ সেঃ মিঃ বা তাহার অধিক **বৃষ্টিপাত** এবং **উর্বর দো-আঁশ মাটি** বিশেষ উপযোগী। দীর্ঘ শুষ্ক ঋতু রবারগাছের পক্ষে ক্ষতিকর। রবার-চাষের জন্য জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এইজন্য সাধারণতঃ পাহাড়ের ঢালে ইহার চাষ হইয়া থাকে। সমভূমিতেও জল-নিকাশের সুবিধা থাকিলে ইহার চাষ হয়। রবারগাছ হইতে আঠা সংগ্রহ করিতে এবং তাহা শোধন করিয়া রবার প্রস্তুত করিতে প্রচুর সুদক্ষ এবং সুলভ **শ্রমিকের** প্রয়োজন।

পৃথিবীর মোট স্বাভাবিক রবার উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া** হইতে পাওয়া যায়। নানাপ্রকার প্রাকৃতিক ও অন্যান্য কারণের একত্র সমাবেশের ফলেই এই অঞ্চল রবার-চাষে এত উন্নতি লাভ করিয়াছে।

(ক) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার **প্রাকৃতিক পরিবেশ** রবার উৎপাদনের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। এখানে উপকূলের সমভূমি অঞ্চলে অথবা ছোট ছোট পাহাড়ের ঢালে সস্তায় প্রচুর পরিমাণে জমি পাওয়া যায়; মাটি গভীর, ভারী দো-আঁশ ও জল-নিকাশের সুবিধাযুক্ত। সারাবৎসর সমানভাবে অধিক

উত্তাপ পাওয়া যায়। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১৭৫ হইতে ৩০০ সেঃ মিঃ এবং কোন মাসেই বৃষ্টিপাত ৮ সেঃ মিঃ-এর কম নয়। এইরূপ পরিবেশে রবারগাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং বৎসর পাঁচেকের মধ্যেই গাছের গুঁড়ি প্রায় ২০ সেঃ মিঃ ব্যাসযুক্ত হয়। সারাবৎসর সমানভাবে অধিক উত্তাপ এবং অধিক বৃষ্টিপাত পাওয়া যায় বলিয়া এখানে দুই-এক সপ্তাহ ব্যতীত সারাবৎসর নিয়মিতভাবে প্রচুর পরিমাণে আঠা সংগ্রহ করা যায়। এইভাবে এখানকার একটি গাছ হইতে সংগৃহীত মোট আঠার পরিমাণ ব্রেজিলের একটি বন্য রবারগাছ হইতে সংগৃহীত আঠার তুলনায় অনেক বেশী। প্রায় সারাবৎসর ধরিয়া আঠা-সংগ্রহের কাজ থাকে বলিয়া শ্রমশক্তির অপচয় হয় না।

(খ) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রবার উৎপাদিত হয় প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানির জন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১৬,০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হইলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অবস্থান আমাজন অববাহিকার তুলনায় নানাকারণে স্থবিধাজনক। প্রথমতঃ, অনেক রবারক্ষেত সমুদ্রতীর হইতে অল্প কয়েক মাইলের মধ্যে অবস্থিত। সমুদ্রতীর হইতে কিছুদূরে দেশের অভ্যন্তরভাগে যেসকল রবারক্ষেত রহিয়াছে, সেগুলিও কোন-না-কোন রেলপথের ধারে অবস্থিত এবং সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর পর্যন্ত রবার-পরিবহণের খরচ খুব অল্প। কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রবার-উৎপাদনকারী অধিকাংশ দেশ ও দ্বীপের আকৃতি মালয় ও জাভার ন্যায় সংকীর্ণ; দেশের কোন অংশই সমুদ্রতীর হইতে খুব বেশী দূরে নহে। অন্যদিকে আমাজন অববাহিকার অভ্যন্তরভাগ হইতে রবার সংগ্রহ করিয়া সমুদ্রতীর পর্যন্ত লইয়া আসিতে শত শত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করিতে হয়; ইহাতে খুব বেশী খরচ পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রাচ্যের দেশ-সমূহের সহিত উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের সংযোগ-সাধনকারী সমুদ্রপথগুলির উপর অবস্থিত। ফলে সকল সময়েই রবার প্রেরণের উপযোগী জাহাজ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, রবার সহজে নষ্ট হয় না বলিয়া সমুদ্রপথে যখন অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর ভিড় কম থাকে সেই সময়ে ইহা অপেক্ষাকৃত অল্প মাশুলে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা যায়। এই অঞ্চলে নিয়মিত জাহাজ-চলাচল করে বলিয়া এখানকার রবারবাগিচা-সংগঠনকারী ইউরোপীয়গণ নিজেদের মাতৃভূমি হইতে বহুদূরে অবস্থিত এই অঞ্চলে আসিয়া বসবাস করিতে অসুবিধা বোধ করে নাই।

(গ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি বড় সুবিধা হইল এই অঞ্চলের **ঘন লোকবসতি**। রবার-চাষের জন্য প্রচুর পরিমাণে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। রবারগাছ কাটিবার জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। কারণ কাটা বেশী গভীর হইলে গাছ মরিয়া যাইবে এবং অল্প হইলে উপযুক্ত পরিমাণে রস বাহির হইবে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্রমিকগণ ব্রেজিল ও মধ্য আফ্রিকার শ্রমিকগণের তুলনায় শুধু অধিক পরিশ্রমই করিতে পারে না, রবারগাছ কাটিবার ব্যাপারেও তাহারা অনেক বেশী দক্ষ।

(ঘ) এই অঞ্চলে রবার-বাগিচা গড়িয়া তুলিতে **সরকারী সাহায্য** ও **সহযোগিতাও** যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই অঞ্চলের **রাজনৈতিক স্থায়িত্ব** ও **শাসনব্যবস্থায় শৃঙ্খলার** জন্য বৈদেশিক পুঁজিপতিগণ স্বভাবতঃই বাগিচাশিল্পে মূলধন বিনিয়োগে উৎসাহিত হইয়াছে।

(ঙ) রবার-উৎপাদনের মোট খরচের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হয় শুধু রবারের আঠা সংগ্রহের জন্য। বাগিচা রবারের ক্ষেত্রে গাছগুলি সুশৃঙ্খলভাবে ঘনসন্নিবিষ্ট বলিয়া একজন শ্রমিকের পক্ষে ৬ ঘণ্টার মধ্যে ৪০০ গাছ হইতে আঠা সংগ্রহ করা সম্ভব। ফলে **উৎপাদন-খরচ** অপেক্ষাকৃত কম হয়। কিন্তু আমাজন অববাহিকায় বন্য রবারগাছগুলি বিশৃঙ্খলভাবে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত বলিয়া রবার-সংগ্রহের খরচ অপেক্ষাকৃত অধিক। এই কারণে বন্য রবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাগিচা রবারের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারে নাই।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Growing areas)—বন্য ও আবাদী রবার উভয়ই নিরক্ষীয় অঞ্চলে উৎপন্ন হয়।

পৃথিবীর মোট উদ্ভিজ্জ রবার-উৎপাদন—২২ লক্ষ ৪১ হাজার মেট্রিক টন (১৯৬৪)

মালয়শিয়া	৮ লক্ষ	৫১ হাজার	মে:টন			ভিয়েটনাম	৬৮	হাজার	মে:	টন
ইন্দোনেশিয়া	৬ „	৯৯	„	„	„	নাইজেরিয়া	৬৬	„	„	„
থাইল্যাণ্ড	২ „	১৬	„	„	„	সারাওয়াক	৪৫	„	„	„
সিংহল	১ „	১২	„	„	„	লাইবেরিয়া	৪০	„	„	„

U. N. O.—Monthly Bulletin, March, 1965 সংখ্যা হইতে সংগৃহীত।

মালয়শিয়া—মালয়শিয়া কিছুদিন পূর্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও

বর্তমানে রবার-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। এতদিন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগের জন্য উৎপাদন ব্যাহত হইতেছিল। বর্তমানে উৎপাদন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইন্দোনেশিয়া—রবার-উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। মালয়শিয়ার ন্যায় এখানেও আমাজন-উপত্যকা হইতে 'হেভিয়া ব্রেজিলিয়েনসিস্' নামক একপ্রকার গাছ আনিয়া রোপন করা হয়। এই গাছ হইতে রবার উৎপন্ন হয়।

মালয়শিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সুদক্ষ চীনা শ্রমিক রবার উৎপাদনের সহায়ক। বন্দর নিকটবর্তী থাকায় এবং আভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় রপ্তানি-বাণিজ্যে এই সকল দেশ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

উল্লিখত দেশগুলি ব্যতীত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় **সিংহল, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েটনাম, সারাওয়াক,** উত্তর বোর্ণিও ও ব্রুনেই, ক্যাম্বোডিয়া এবং দক্ষিণ ভারতে রবারের চাষ হয়। আফ্রিকার **নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া** ও কঙ্গোনদীর উপত্যকায় রবারের চাষ হয়। ব্রেজিলের আমাজন নদীর অববাহিকায় রবার উৎপন্ন হয়। ভারত ব্যতীত এই সকল দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় ইহারা রপ্তানি-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

উদ্ভিজ্জ রবার বনাম কৃত্রিম রবার (Natural rubber vis-a-vis Synthetic rubber)—উদ্ভিজ্জ রবার নিরক্ষীয় জলবায়ুর ফসল। অথচ রবার অধিক ব্যবহৃত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের দেশগুলিতে। আধুনিক শিল্প, যাতায়াত ও দেশরক্ষায় রবার অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই কারণে নাতিশীতোষ্ণ বলয়ের উন্নত দেশগুলি বহুদিন হইতে কৃত্রিম উপায়ে রবার উৎপাদনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ কৃত্রিম রবার উৎপাদন করিতেছে। ১৯৬৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮ লক্ষ টন, কানাডায় ২ লক্ষ টন, গ্রেট বৃটেনে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টন, পূর্ব জার্মানীতে ৯০ হাজার টন, পশ্চিম জার্মানিতে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার টন, জাপানে ১ লক্ষ ২০ হাজার টন এবং ভারতে ১ লক্ষ ২ হজার টন কৃত্রিম রবার উৎপাদিত হয়। এই সকল দেশে নানা উপায়ে কৃত্রিম রবার প্রস্তুত হয়। ইহার জন্য কয়লা ও খনিজ তৈলের বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য, বৃক্ষ, গুড় অথবা আলু হইতে প্রস্তুত রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদির ব্যবহার করা হইয়া

থাকে। কৃত্রিম রবার উৎপাদন-পদ্ধতি সরল ও সহজসাধ্য করিবার জন্য এবং উৎপাদিত রবারের উৎপাদন-খরচ হ্রাস করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে প্রতিনিয়ত নানারূপ গবেষণা চলিতেছে। এই সকল প্রচেষ্টা সফল হইলে উদ্ভিজ্জ রবারের পক্ষে কৃত্রিম রবারের সহিত প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকা কঠিন হইবে। তবে এখনও পর্যন্ত উদ্ভিজ্জ রবারের উৎপাদন-খরচ কৃত্রিম রবার অপেক্ষা কম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রবার-বাগিচাসমূহের মালিকগণ উদ্ভিজ্জ রবারের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া উদ্ভিজ্জ রবারের উৎপাদন-খরচ হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

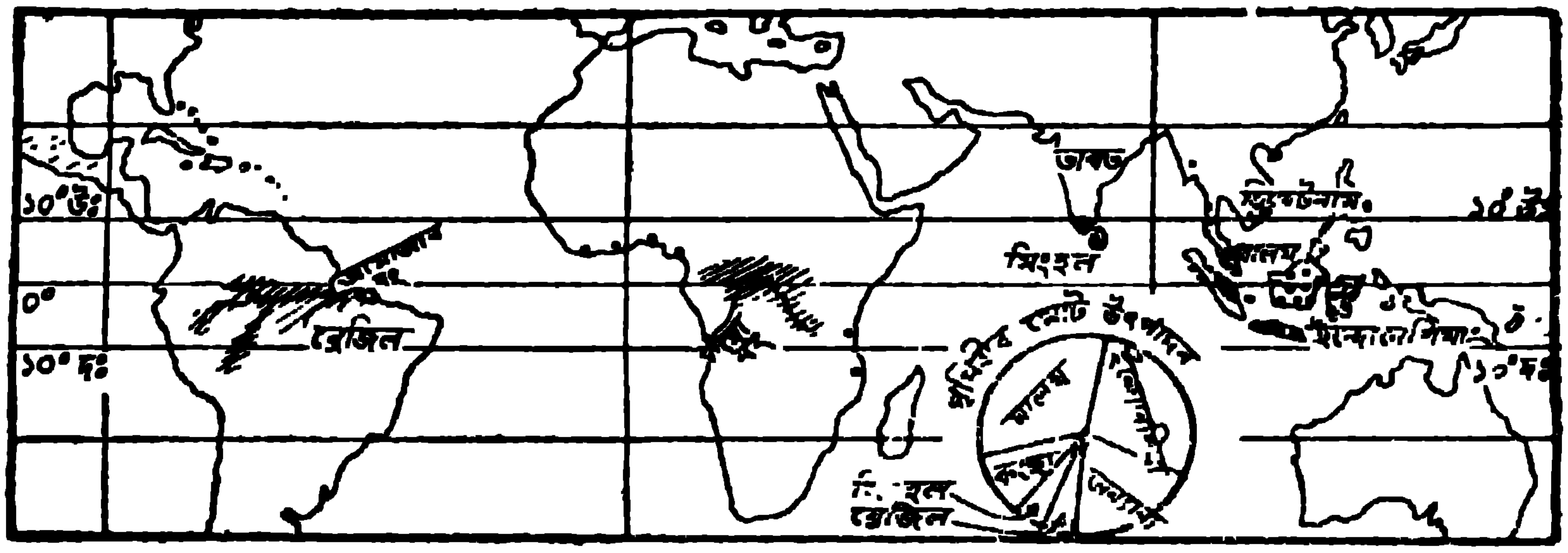

পৃথিবীর রবার-উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ

(মানচিত্রে দেখা যাইতেছে যে, উৎপাদনকারী দেশসমূহ নিরক্ষীয় অঞ্চলে ১০° উঃ ও ১০° দঃ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। কালো দাগ দেওয়া স্থানগুলিতে আবাদী রবার এবং সরলরেখা চিহ্নিত স্থানগুলিতে বন্য রবার উৎপন্ন হয়।)

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য—ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়া, থাইল্যাণ্ড, নাইজেরিয়া, সিংহল, সারাওয়াক, ব্রেজিল, কাম্বোডিয়া, লাইবেরিয়া ও ভিয়েটনাম প্রধান **রপ্তানিকারক** এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্মানী, রাশিয়া, ফ্রান্স ও জাপান প্রধান **আমদানিকারক** দেশ। সিঙ্গাপুরে পুনরায় রপ্তানির উদ্দেশ্যে কিছু রবার আমদানি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোট রপ্তানির শতকরা ৪০ ভাগ রবার আমদানি করে। ভারত কোচিন বন্দর মারফত রবার রপ্তানি করে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার জন্য উৎকৃষ্ট রবার আমদানিও করিয়া থাকে।

মোটর-গাড়ীর আবিষ্কার ও প্রচলন এবং বাগিচা রবারের প্রসারের সময় হইতেই আন্তর্জাতিক বাজারে রবারের চাহিদা ও যোগানে অসামঞ্জস্য দেখা

দিতে থাকে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রবারের দামও অত্যধিক ওঠানামা করিতে থাকে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ১৯২৪ খ্রীঃ **স্টিভেনসন্ পরিকল্পনা (Stevenson scheme)** নামে একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী চাহিদা অনুসারে রবারের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা হয়। এই পরিকল্পনার ফলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৃটিশ মূলধন পরিচালিত রবার-বাগিচাগুলিতে উৎপাদন সার্থক-ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং রবারের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি, ইহা শুধু বৃটিশ-অধিকৃত অঞ্চলেই প্রযোজ্য ছিল। ইহার ফলে রবারের অত্যধিক চড়া মূল্যে প্রলুব্ধ হইয়া বৃটিশ প্রভাবের বহির্ভূত অঞ্চলের রবার-বাগিচার মালিকগণ রবারের উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে থাকে। এইভাবে ডাচ মালিকানায় পরিচালিত রবার-বাগিচাগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া পৃথিবীর মোট রবার উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগে আসিয়া দাঁড়ায় এবং স্টিভেনসন্ পরিকল্পনা চালু থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর মোট রবার-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে দাম পড়িতে থাকে ও মজুত রবারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইংরেজগণ নিজেদের লোক-সান হইতেছে দেখিয়া ১৯২৮ খ্রীঃ স্টিভেনসন্ পরিকল্পনা বাতিল করিয়া দেয়। স্টিভেনসন্ পরিকল্পনা বাতিল হইবার ফলে এবং পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য-মন্দার জন্য রবারের মূল্য দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে। এই মূল্যহ্রাস রোধ করিবার জন্য ১৯৩৪ খ্রীঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত রবার-উৎপাদনকারী দেশ লইয়া **আন্তর্জাতিক রবার-নিয়ন্ত্রণ চুক্তি (International Rubber Regulation Agreement)** সম্পাদিত হয়। বিভিন্ন দেশের সরকারী প্রতিনিধি লইয়া গঠিত আন্তর্জাতিক রবার-নিয়ন্ত্রণ কমিটির হাতে এই চুক্তি কার্যকরী করার ভার দেওয়া হয়। রবারের উৎপাদন ও রপ্তানির পরিমাণ প্রতিটি দেশের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এইভাবে উৎপাদন ও রপ্তানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও মজুত রবারের পরিমাণ হ্রাস করিয়া রবারের মূল্য উৎপাদকগণের পক্ষে লাভজনক একটি ন্যায্য স্তরে রাখিবার চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি কমবেশী সাফল্যের সহিত কার্যকরী থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সব-কিছু ওলট-পালট হইয়া যায় এবং ১৯৪৪ খ্রীঃ চুক্তিটি পরিত্যক্ত হয়। এই মহাযুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম রবারশিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করে। যুদ্ধোত্তরকালে বিভিন্ন দেশে শিল্প ও পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি সত্ত্বেও স্বাভাবিক ও কৃত্রিম রবারের মোট

উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অধিক হওয়ায় রবারশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ রবারের উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন-না-কোন প্রকারের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত **হাভানা সম্মেলনে (Havana Conference)** এই সমস্যা লইয়া বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়।

তৈলবীজ (Oilseeds)

তৈলবীজ হইতে প্রধানতঃ তৈল প্রস্তুত হয়। কোন কোন তৈলবীজ সালাড এবং খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। রং, প্রসাধন সামগ্রী, মোমবাতি, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে উদ্ভিজ্জ তৈলের প্রয়োজন হয়। বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের পর যে খইল পাওয়া যায় তাহা পশুর উৎকৃষ্ট খাদ্য। এই খইল সার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে বনস্পতি ঘি প্রস্তুত হয়।

(১) **বাদাম ও বাদাম তৈল (Groundnut and Groundnut oil)**—ক্রান্তীয় মণ্ডলে ৬৫ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত ও শুষ্ক আবহাওয়ায় বাদাম উৎপন্ন হয়। বাদাম হইতে তৈল ও খইল পাওয়া যায়। ভারত, চীন, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, মালি, উগাণ্ডা প্রভৃতি দেশে বাদামের চাষ হয়। **ভারত** পৃথিবীর মোট উৎপাদনেব এক-তৃতীয়াংশ বাদাম উৎপাদন করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করে। ভারত প্রধান রপ্তানিকারক এবং ফ্রান্স, জার্মান, বৃটেন প্রধান আমদানিকারক দেশ।

পৃথিবীর বাদাম-উৎপাদন—১ কোটি ৫৩ লক্ষ মেঃ টন

(১৯৬৩-৬৪)

ভারত	৫২ লক্ষ ৯১ হাঃ মেঃ টন	মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৯ লক্ষ ১৭ হাঃ মেঃ টন
চীন	২৩ „ ৬০ „ „ „	সেনেগাল	৯ „ ৭ „ „ „
নাইজেরিয়া	১৩ „ ৬১ „ „ „	ব্রেজিল	৪ „ ১০ „ „ „

Source—F. A. O. Monthly Bulletin, March, 1965

(২) **জলপাই ও জলপাই তৈল (Olive and Olive oil)**—ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে জলপাই বৃক্ষ প্রচুর উৎপন্ন হয়। জলপাইয়ের তৈল

ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা সাবান ও বয়নশিল্পে দরকার হয়। স্পেন, ইটালি, উত্তর আফ্রিকা, তুরস্ক, পর্তুগাল, গ্রীস্ ও ফ্রান্স প্রধান উৎপাদনকারক ও রপ্তানিকারক দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, আর্জেন্টিনা প্রধান আমদানি-কারক দেশ।

পৃথিবীর জলপাই-উৎপাদন—৯০ লক্ষ ৯০ হাজার মেঃ টন
(১৯৬৩-৬৪)

স্পেন	২৯ লক্ষ ৩৭ হাঃ মেঃ টন	পর্তুগাল	৬ লক্ষ ২০ হাঃ মেঃ টন
ইটালি	২৭ „ ৭৭ „ „ „	তুরস্ক	৬ „ ১৯ „ „ „
গ্রীস	১০ „ ৮ „ „ „	টিউনিশিয়া	৪ „ ৫০ „ „ „

Source—F. A. O Monthly Bulletin, March, 1965

(৩) **নারিকেল ও নারিকেল তৈল (Cocoa-nut and Cocoa-nut oil)**—উষ্ণমণ্ডলেই নারিকেল বৃক্ষের চাষ হয়। নারিকেল হইতে জল ও শাঁস পাওয়া যায়। এই শাঁস খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে যে নারিকেল তৈল প্রস্তুত হয় তাহা খাদ্য ও কেশতৈল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের ছোবড়া হইতে দড়ি ও গদি প্রস্তুত হয়। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রধান উৎপাদনকারী দেশ। **ভারতের** প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে ও দক্ষিণ ভারতে নারিকেলের চাষ হয়। ফিলিপাইন, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রধান রপ্তানিকারক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও বৃটেন প্রধান আমদানিকারক দেশ।

(৪) **রেড়ি ও রেড়ির তৈল (Castor and Castor oil)**—রেড়ির তৈল কেশতৈল এবং প্রদীপের তৈল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ঔষধ ও সাবানের জন্যও ইহার প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি সচল রাখিবার জন্য কল-কারখানায় ও বিমানপোতে ইহা পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রেড়ি-উৎপাদনে **ভারতের** স্থান প্রথম। বিহার, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশে প্রচুর রেড়ির চাষ হয়। ইন্দোনেশিয়া, ব্রেজিল, ইন্দোচীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মাঞ্চুরিয়া অন্যান্য উৎপাদক দেশ। ভারত ও ব্রেজিল প্রধান রপ্তানিকারক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও জার্মানী প্রধান আমদানিকারক দেশ।

(৫) তিসি ও তিসির তৈল (Linseed and Linseed oil)—একপ্রকার শণ-গাছের বীজের নাম তিসি। রং, বার্নিশ, সাবান, গ্লিসারিন, লিথোগ্রাফ করিবার কালি ও অয়েলক্লথ প্রস্তুত করিতে তিসির তৈলের প্রয়োজন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টিনা, ভারত, রাশিয়া ও উরুগুয়ে তিসির প্রধান উৎপাদক ও রপ্তানিকারক। বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালি, হল্যাণ্ড ও নরওয়ে প্রভৃতি প্রধান আমদানিকারক দেশ। **ভারতের** মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র রাজ্যে তিসির চাষ হয়।

পৃথিবীর তিসি-উৎপাদন—৩৪ লক্ষ মেঃ টন

(১৯৬৩-৬৪)

মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৮ লক্ষ	১ হাঃ	মেঃ	টন		ভারত	৪ লক্ষ	১৭ হাজার	মেঃ	টন
আর্জেন্টিনা	৭ „	৭১ „	„	„		রাশিয়া	২ „	৮৩ „	„	„
কানাডা	৫ „	৬৮ „	„	„		উরুগুয়ে	„	৬২ „	„	

Source—F. A. O. Monthly Bulletin, March, 1965

(৬) কার্পাস বীজ ও তৈল (Cotton seed and oil)—কার্পাস-গাছের বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া ইহা দ্বারা ভেজিটেবল ঘি প্রস্তুত করা হয়। কার্পাস তৈল সাবান ও ঔষধ-প্রস্তুতে ব্যবহার হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, মিশর, ব্রেজিল ও মেক্সিকো এই তৈল উৎপন্ন করে। **ভারতে** মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, অন্ধ্র ও মাদ্রাজে এই তৈল প্রস্তুত হয়। জাপান, ডেনমার্ক, জার্মানী প্রভৃতি দেশ প্রধান আমদানিকারক।

পৃথিবীর কার্পাস-বীজ-উৎপাদন—২ কোটি ১২ লক্ষ মেঃ টন

(১৯৬৩-৬৪)

মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৫৬ লক্ষ	২২ হাঃ	মেঃ	টন	ভারত	১৮ লক্ষ	৯৯ হাঃ	মেঃ	টন
চীন	৩৮ „	১০ „	„	„	ব্রেজিল	১১ „	৬৫ „	„	„
রাশিয়া	৩২ „	৫২ „	„	„	মেক্সিকো	৭ „	৭৭ „	„	„

Source—F. A. O. Monthly Bulletin, March, 1965

(৭) তাল তৈল (Palm oil)—তাল হইতে প্রস্তুত তাল তৈল দ্বারা সাবান ও মোমবাতি প্রস্তুত করা হয়। ইহা নাইজেরিয়া, কঙ্গো, ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, সিয়েরা লিয়ন ও অ্যাঙ্গোলায় উৎপন্ন হয়। নাইজেরিয়া, কঙ্গো, ঘানা, সিয়েরা লিয়ন প্রধান রপ্তানিকারক দেশ।

(৮) **সয়াবীন ও সয়াবীনের তৈল (Soyabean and Soyabean oil)**—এই তৈল দ্বারা সাবান, গ্লিসারিন, রং ও বার্নিস, লাইনোলিয়াম ও কালি প্রস্তুত হয়। ইহা খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। কাঁচা বীন তরকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং শুক্‌না বীন হইতে পানীয় প্রস্তুত হয়। সয়াবীনের ছোবড়া হইতে যন্ত্রাদির হাতল প্রস্তুত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনে পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ সয়াবীন উৎপন্ন হয়। অন্যান্য উৎপাদনকারী দেশ হইল ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ব্রেজিল, কানাডা, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি। জাপান, জার্মানী ও কানাডা প্রধান আমদানিকারক দেশ।

পৃথিবীর সয়াবীন-উৎপাদন—১০৯ কোটি বুশেল
(১৯৬৪)

মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৬৯ কোটি	৯৯ লক্ষ	মেঃটন	ইন্দোনেশিয়া	১ কোটি	৪৭ লক্ষ	মেঃটন
চীন	৩১ „	৫০ „	„	জাপান		৮৮ „	„

Source—Statistical Report, March, 1965—U. S. Dept. of Agriculture.

(৯) **আফিম তৈল (Opium oil)**—আফিম বীজ হইতে এই তৈল প্রস্তুত হয়। চিত্রাঙ্কনের রং প্রস্তুতের জন্য এই তৈল ব্যবহৃত হয়। ভারত, চীন ও এশিয়া মাইনরে ইহা পাওয়া যায়।

তন্তুজাতীয় ফসল (Fibre Cros)

খাদ্য ও পানীয়ের পরেই সভ্য মানুষের সর্বপ্রধান প্রয়োজন বস্ত্র। উষ্ণমণ্ডলে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন খুব বেশী না থাকিলেও শীতপ্রধান অঞ্চলে ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু খাদ্যের ব্যবহার খুব বেশী বৃদ্ধি পাইলেও মাথাপিছু বস্ত্রের ব্যবহার প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুধু যে বস্ত্রের মোট ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাই নহে, বস্ত্র-ব্যবহারে বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণে বস্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার শতকরা ৯৯ ভাগই কোন-না-কোন প্রকারের তন্তু হইতে প্রস্তুত হয়। তিনপ্রকারের তন্তু বস্ত্র-নির্মাণে ব্যবহৃত হয় ; (ক) উদ্ভিজ্জ যথা, তুলা, পাট, শণ ইত্যাদি ; (খ) প্রাণিজ ; যথা, পশম, রেশম ইত্যাদি ; (গ) কৃত্রিম ; যথা, রেয়ন, নাইলন ইত্যাদি। প্রধান প্রধান উদ্ভিজ্জ তন্তু সম্বন্ধে পরবর্তী পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইল :

তুলা (Cotton)

পৃথিবীর মোট বস্ত্রের শতকরা ৭০ ভাগ তুলা হইতে প্রস্তুত হয়। কার্পাস (তুলা) গাছের ফল পাকিলে ফাটিয়া যায় এবং উহার বীজের চতুর্দিকের অসংখ্য সাদা আঁশ বাহির হইয়া পড়ে। বীজ হইতে এই আঁশ ছাড়াইয়া লইয়া তাহা হইতে সূতা ও কাপড় প্রস্তুত করা হয়।

তুলার বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। তুলার বীজের খইল দিয়া ভালো সার হয়। তুলা গাছ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় মণ্ডলের উদ্ভিদ। তুলা সাধারণতঃ তিনপ্রকার; যথা—ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত (Short Staple), মাঝারি আঁশযুক্ত (Medium Staple) এবং দীর্ঘ আঁশযুক্ত (Long Staple) তুলা। **ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত** তুলা ২.২ সেঃ মিঃ হইতেও ছোট হয়। ইহা দ্বারা কর্কশ ও মোটা কাপড় প্রস্তুত হয়। ভারত ও চীনে এই তুলা উৎপন্ন হয়। **মাঝারি আঁশযুক্ত** তুলা ২.২ সেঃ মিঃ হইতে ২.৯ সেঃ মিঃ পর্যন্ত লম্বা হয়। ইহাকে আমেরিকান আপল্যাণ্ড তুলা বলে; পৃথিবীর অধিকাংশ তুলা এই শ্রেণীভুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ব্রেজিলে এই তুলা উৎপন্ন হয়। ২.৯ সেঃ মিঃ হইতে দীর্ঘ তুলার নাম **দীর্ঘ আঁশযুক্ত** তুলা। ইহার অধিকাংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মিশরে উৎপন্ন হয়। এই শ্রেণীর তুলার মধ্যে ৪.৫ সেঃ মিঃ হইতে ৬.৩ সেঃ মিঃ দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা রেশমের মতো হয় এবং ইহাই পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট তুলা। ইহাকে **সাগরদ্বীপীয় (Sea Island)** তুলা বলে।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—উর্বর, হালকা ও জল-নিকাশের সুবিধাযুক্ত **মাটি** তুলা-চাষের বিশেষ উপযোগী; অবশ্য অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতেও তুলা-চাষ হইতে পারে। মাটির অবশ্যই জলকণা ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন এবং এই ক্ষমতা থাকার জন্যই দাক্ষিণাত্যের আঁঠাল কৃষ্ণমৃত্তিকা (Black Cotton soil) তুলা-চাষের পক্ষে এত উপযোগী। মাটিতে চুনজাতীয় উপাদান থাকিলে তুলার উৎপাদন ভালো হয়।

তুলা-গাছে ফুল ধরা পর্যন্ত উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং ৬৫ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ **বৃষ্টিপাত** প্রয়োজন। কিন্তু ফল পাকা, ফাটিয়া যাওয়া ও তোলার জন্য শুষ্ক, রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ার প্রয়োজন। ফল ফাটিয়া তুলা বাহির হওয়ার পর বৃষ্টিপাত হইলে তুলার আঁশ পচিয়া যায়। সময়মতো জলসেচের বন্দোবস্ত থাকিলে অপেক্ষাকৃত অল্প বৃষ্টিপাতেও ভালো তুলা হয়।

২৪° সেঃ **উত্তাপে** তুলাগাছ ভালো জন্মে। কিন্তু তুলা বাহির হইবার পর অত্যধিক গরম পড়িলে তুলা ঝরিয়া পড়ে।

তুহিন তুলাগাছের পক্ষে মারাত্মক। তুলার বীজ বপন হইতে শুরু করিয়া ফল তোলা পর্যন্ত সাত মাস বা ২০০ দিন সময়ের প্রয়োজন। এই সময়ের মধ্যে তুষারপাত হইলে চলিবে না। এই কারণে তুলা-চাষের জন্য অন্ততঃ ২০০টি তুহিনমুক্ত দিবস প্রয়োজন।

তুলাগাছ হইতে গুটি তোলা এবং গুটি হইতে তুলা ছাড়াইবার জন্য প্রচুর সুলভ **শ্রমিকের** প্রয়োজন। **বল্ উইভিল** নামক একপ্রকার কীট তুলা-চাষের অন্তরায়। এইজন্য কীট-বিনষ্টকারী ঔষধের ব্যবস্থা করা দরকার।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Growing areas)—পৃথিবীর তুলা-উৎপাদনকারী দেশসমূহ নিরক্ষীয় বলয় বাদ দিয়া ৩০° দঃ হইতে ৪০° উঃ অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত।

পৃথিবীর মোট তুলা-উৎপাদন—৫ কোটি ১৩ লক্ষ গাঁট
(১৯৬৪-৬৫)

মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	১ কোটি ৫৩ লক্ষ গাঁট	মেক্সিকো	২৩ লক্ষ গাঁট
রাশিয়া	৮০ „ „	মিশর	২৩ „ „
চীন	৫৫ „ „	ব্রেজিল	২০ „ „
ভারত	৫১ „ „	পাকিস্তান	১৯ „ „

International Cotton Advisory Committee-র Bulletin হইতে সংগৃহীত। (১ গাঁট=৪৭৮ পাউণ্ড=২১৭ কিলোগ্রাম)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—তুলা-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান **প্রথম**। এই দেশের তুলা-বলয় ক্যারোলিনা রাজদ্বয়, টেক্সাস, মিসিসিপি, আরকান্সাস্, আলাবামা, জর্জিয়া, টেনেসি, ওক্লাহামা, মিসৌরি এবং কেণ্টাকির অংশবিশেষ লইয়া গঠিত। ইহাই পৃথিবীর সর্বপ্রধান তুলা-উৎপাদনকারী অঞ্চল। এই তুলা-বলয়ের উত্তরাংশে যে পর্যন্ত বৎসরে অন্ততঃ ২০০ দিন তুষারমুক্ত থাকে সে পর্যন্ত তুলার চাষ হয়। অবশ্য ক্রমেই উত্তরদিকে তুলার চাষের প্রসারসাধনের চেষ্টা চলিতেছে। পশ্চিমদিকে যে পর্যন্ত বৎসরে গড়ে অন্ততঃ ৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয়, সেই পর্যন্ত তুলার চাষ হইয়া থাকে। তুলাবলয়ের দক্ষিণাংশে ২৫ সেঃ মিঃ শরৎকালীন বৃষ্টিপাত-রেখার দ্বারা তুলার চাষ

সীমবদ্ধ। দক্ষিণাংশের যে সকল স্থানে শরৎকালে বৃষ্টিপাত অধিক, সেই সকল স্থানে তূলার চাষ হয় না; কারণ শরৎকালে অধিক বৃষ্টিপাত হইলে তূলার আঁশ নষ্ট হইয়া যায় এবং ফসল তুলিতে অসুবিধা হয়। তূলা-বলয়ের মধ্যে **মিসিসিপি-উপত্যকায়** সর্বাধিক পরিমাণ তূলা উৎপন্ন হয়। এখানে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন অধিক হয় এবং তূলার আঁশও হয় খুব দীর্ঘ। মিসিসিপি-উপত্যকার পলিপ্রধান দো-আঁশ মৃত্তিকা এবং সমতল ভূ-প্রকৃতি তূলা-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অবশ্য এই অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে বন্যার ফলে ধনপ্রাণের যথেষ্ট ক্ষতি হয়; কিন্তু বন্যার জলের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে যে পলি আসিয়া জমা হয়, তাহা বিনা-খরচায় জমির উর্বরাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তূলা-বলয় ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে ক্যালিফোর্ণিয়া, আরিজোনা ও নিউ মেক্সিকো রাজ্যসমূহে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তূলা উৎপন্ন হয়।

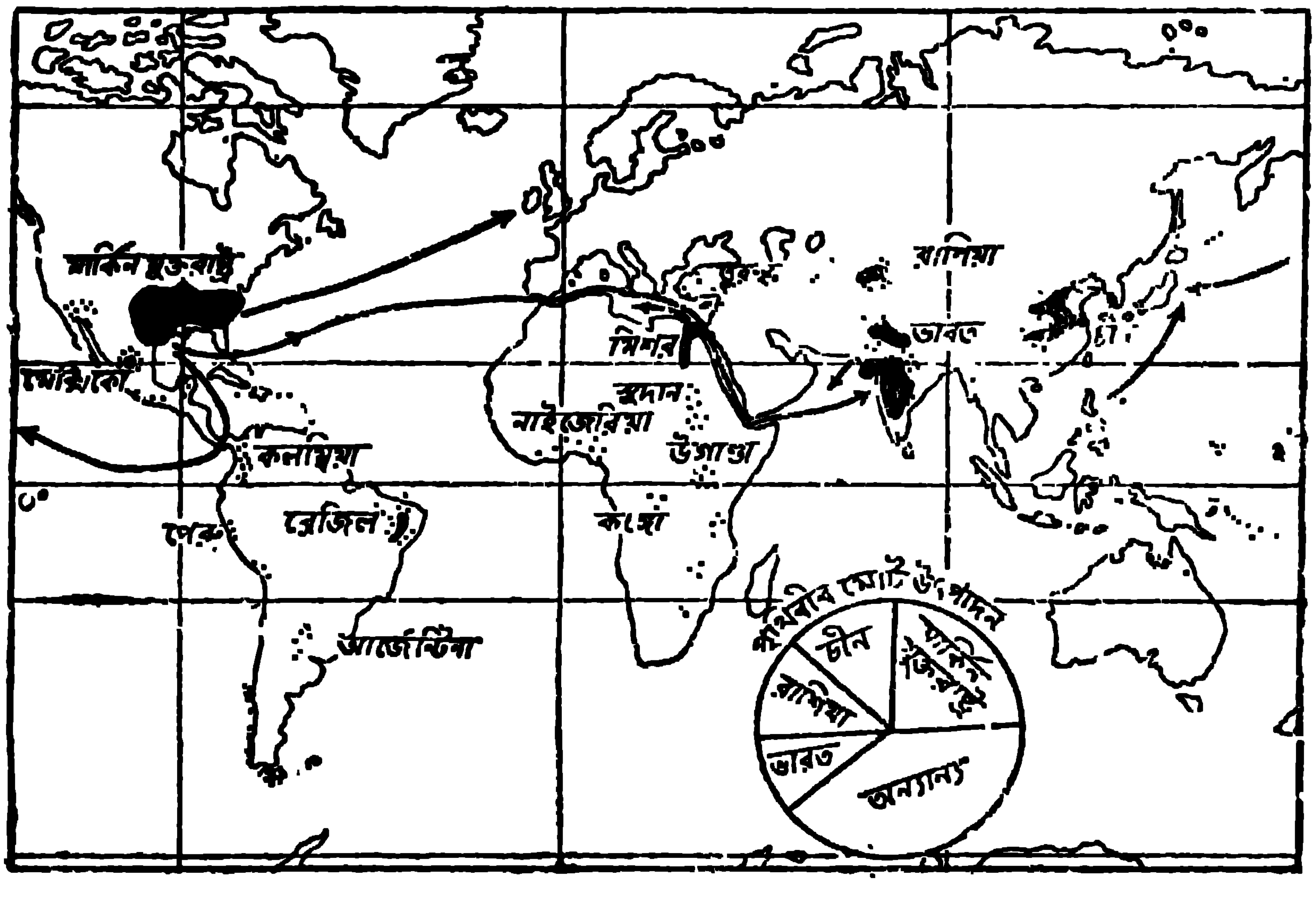

পৃথিবীর তূলা-উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ
(তীরচিহ্ন দ্বারা আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশসমূহ দেখানো হইয়াছে।)

রাশিয়া—তূলা-উৎপাদনে রাশিয়া **দ্বিতীয়** স্থান অধিকার করিয়াছে। ককেশাস্ পর্বতের উভয়দিকে সমভূমি ও উপত্যকাসমূহে এবং কাস্পিয়ান হ্রদের পূর্বদিকস্থ পূর্ব এশিয়ার কাজাকস্তান, উজবেকিস্তান প্রভৃতি রাজ্যসমূহে

জলসেচের সাহায্যে তূলার চাষ হয়। এই সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম (১২·৫ সেঃ মিঃ হইতে ৩৭·৫ সেঃ মিঃ) হইলেও, উর্বর পলি ও লোয়েস মৃত্তিকা, প্রচুর সূর্যকিরণ এবং শুষ্ক বায়ু তূলা-চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। ১৯২৮ সাল হইতে ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় রাশিয়ার দক্ষিণ অংশের অন্যান্য স্থানেও তূলা-উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে এবং এই চেষ্টা কিছু পরিমাণে সাফল্য লাভ করিয়াছে। বর্তমানে রাশিয়া নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া কিছু পরিমাণে তূলা পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করিয়া থাকে।

চীন—ইয়াং-সি-কিয়াং ও সিকিয়াং নদীর উপত্যকায় প্রচুর তূলার চাষ হয়। উত্তর চীনে হোয়াংহো ও উহার উপনদী উয়েই নদীর উপত্যকায়ও তূলার চাষ হয়। তূলা-উৎপাদনে চীনের স্থান বর্তমানে **তৃতীয়**। চীনদেশে উৎপাদিত তূলা প্রধানতঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি আঁশযুক্ত।

ভারত—একসময়ে অবিভক্ত ভারত তূলা-উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নের স্থান **চতুর্থ**। এখানে সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি আঁশযুক্ত তূলা উৎপন্ন হয়। দীর্ঘ আঁশের তূলা-উৎপাদনকারী অঞ্চল পাকিস্তানের অংশে পড়িয়াছে। ভারতে হেক্টর-প্রতি তূলার উৎপাদন খুবই কম। জলসেচ দ্বারা দীর্ঘ আঁশযুক্ত তূলার চাষ বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে। পাঞ্জাবের ভাকরা ও নাঙ্গাল বাঁধ অঞ্চলে অতিরিক্ত ৮ লক্ষ মেঃ টন লম্বা আঁশযুক্ত তূলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। গুজরাট রাজ্যের কাক্‌রাপাড়া বাঁধ এবং রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের চম্বল বাঁধ এইজাতায় তূলা উৎপাদনের সহায়ক হইবে। মোট উৎপাদিত তূলার অর্ধেক মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যে উৎপন্ন হয়। মহারাষ্ট্র রাজ্যের শোলাপুর অঞ্চলের কৃষ্ণমৃত্তিকা তূলা-চাষের জন্য বিখ্যাত। পাঞ্জাব তূলা-উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এখানকার তূলা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর; জলসেচের বন্দোবস্ত থাকায় এখানে কোন কোন স্থানে হেক্টর-প্রতি তূলার উৎপাদন বেশী। মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, রাজস্থান ও অন্ধ্রে তূলার চাষ হইয়া থাকে।

মিশরের নীলনদের উপত্যকায় প্রচুর তূলার চাষ হয়। এখানকার তূলা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। নীলনদের উপত্যকার পলি ও কাদামাটি-বিশিষ্ট দো-আঁশ মাটি তূলাচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। নীলনদের বাৎসরিক বন্যায় এই মাটির উর্বরাশক্তি স্বাভাবিকভাবেই পূরণ হয়। এখানে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অল্প; সেইজন্য জলসেচের সাহায্যে তূলার চাষ হইয়া থাকে। বৎসরের অধিকাংশ

দিন আকাশ মেঘমুক্ত থাকে বলিয়া প্রচুর সূর্যকিরণ পাওয়া যায়। উত্তাপও প্রচুর এবং বায়ু শুষ্ক; ইহার ফলে তূলাগাছে রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ কম। এই সকল অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা বিদ্যমান থাকায় এবং প্রগাঢ় কৃষিপদ্ধতি (Intensive Cultivation) অবলম্বন করা হয় বলিয়া নীলনদের উপত্যকায় হেক্টর-প্রতি তূলার উৎপাদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর উপত্যকার তুলনায় অধিক।

তূলাই **মিশরের সর্বপ্রধান ফসল**-উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে মিশরের অর্থনীতি তূলাচাষের উপর নির্ভরশীল। এই দেশে মোট কৃষি-জমির প্রায় এক-চতুর্থাংশে তূলার চাষ হয়; রপ্তানি-বাণিজ্যের মোট মূল্যের শতকরা ৭৫ ভাগ হইল তূলা। মিশর সরকারের মোট আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ আসে কৃষি হইতে এবং কৃষিকার্যে তূলাই সর্বপ্রধান। এইরূপে দেখা যায় মিশরের অর্থনীতিতে তূলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইদানীং এই দেশ এশিয়া-আফ্রিকার আরও বহু দেশের ন্যায় অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করিতেছে। ইহার জন্য ব্যাপক হারে যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম আমদানি করা প্রয়োজন, কিন্তু আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য মিটাইতে হইলে তূলা রপ্তানির উপর নির্ভর করিতে হইবে। কারণ এই দেশ খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ নহে, অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন অপ্রচুর এবং শিল্পোৎপাদন সামান্য।

এই সকল দেশ ছাড়াও ব্রেজিল, মেক্সিকো, পশ্চিম পাকিস্তান, তুরস্ক, ইরাণ, সুদান, পেরু, নাইজেরিয়া, উগাণ্ডা, ট্যাঙ্গানাইকা প্রভৃতি দেশে তূলার চাষ হইয়া থাকে।

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক তূলা বিদেশে **রপ্তানি** করিয়া রপ্তানি-বাণিজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। মেক্সিকো এবং মিশরও প্রচুর তূলা রপ্তানি করে। মিশর হইতে উৎকৃষ্ট ধরনের তূলা বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। ব্রেজিল, পেরু, সুদান, মধ্য আমেরিকা, তুরস্ক, উগাণ্ডা, ইরাণ, পাকিস্তান ও ভারত প্রভৃতি দেশও তূলা রপ্তানি করে। চীন ও রাশিয়া তাহাদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া রপ্তানি-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতেছে।

জাপান, জার্মানী, ইটালি, ফ্রান্স, বৃটেন, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম প্রচুর তূলা **আমদানি** করে। ভারত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তূলা আমদানি করে। আমদানিকারকদের মধ্যে জাপান প্রথম স্থান অধিকার করিয়া থাকে।

পাট (Jute)

পাট-গাছ সাধারণতঃ ১½ মিটার হইতে ৪ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এই গাছের ছালের ভিতরের অংশ (Bast) হইতে আঁশ বাহির করিয়া পাট প্রস্তুত করা হয়। পাটের আঁশ দৃঢ়, দীর্ঘ এবং নরম হয়। ইহা সহজে পরিষ্কার করা যায় এবং ইহাতে রং ধরানো সহজ। যত প্রকারের তন্তু বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় পাট তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুলভ। ইহার প্রধান কারণ পাটের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন অধিক। পাট প্রধানতঃ ব্যবহার করা হয় চট ও থলিয়া প্রস্তুত করিবার জন্য। ধান, গম, ডাল-কলাই, তুলা, পশম এমনকি ছোটখাটো যন্ত্রপাতি পর্যন্ত দেশের একস্থান হইতে অন্যস্থানে কিংবা একদেশ হইতে অন্যদেশে প্রেরণের জন্য পাটের চট ও থলিয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। আজকাল অবশ্য কাপড়ের থলিয়া প্রভৃতি পরিবর্ত-সামগ্রীর আবিষ্কার ও প্রচলন হইবার ফলে পাটের একাধিপত্য কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে; তবুও পাট সুলভ বলিয়া, টানা-হেঁচড়া ও রৌদ্রবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে বলিয়া এবং মেরামত করিয়া পাটের থলিয়া উপর্যুপরি ব্যবহার করা যায় বলিয়া পাটের স্থান গ্রহণ করিবার মতো কোন তন্তু বা পরিবর্ত-সামগ্রী এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। চট ও থলিয়া ব্যতীত পাট হইতে দড়ি, কাছি, কার্পেট, ত্রিপল, লাইনোলিয়াম প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। উপযুক্ত গবেষণার ব্যবস্থা করিয়া পাটের নূতন নূতন ব্যবহার আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে। পাটের কাঠি হইতে কাগজ উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টা সফল হইলে পাট-শিল্প, কাগজ-শিল্প এবং পাট-চাষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হইবে।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—পাট গ্রীষ্মপ্রধান দেশের একচেটিয়া ফসল। পাটচাষের জন্য প্রায় ২৫° সেঃ **উত্তাপ** এবং ১৫০ সেঃ মিঃ হইতে ২০০ সেঃ মিঃ **বৃষ্টিপাত** প্রয়োজন। **আধুনিক পললমাটি** বা **দো-আঁশ মাটি** পাটচাষের বিশেষ উপযোগী। পাটক্ষেতের নিকটবর্তী স্থানে জলাশয় থাকা প্রয়োজন; কারণ পাট কাটিয়া জলাশয়ে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরে গাছ হইতে আঁশ ছাড়াইয়া পাট বাহির করা হয়। পাটচাষে সুলভ **শ্রমিকের** দরকার হয়; কারণ জমি-তৈয়ারী, বীজবপন, চারাগাছগুলিকে নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর ফাঁক করিয়া দেওয়া, পাট-কাটা, পাট-ভিজানো, আঁশ-ছাড়ানো প্রভৃতি কাজে বহুলোকের দরকার হয়। পাটচাষীরা খুবই গরীব। কারণ, উৎপন্ন পাট হইতে যাহা

লাভ হয়, তাহার অধিকাংশই ব্যবসায়ী ও পাটকলের মালিক ভোগ করিয়া থাকে।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Growing areas)—পাট গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফসল হইলেও ইহার চাষ প্রধানতঃ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী-উপত্যকায় সীমাবদ্ধ।

পৃথিবীর মোট পাট-উৎপাদন—২৪ লক্ষ মেঃ টন

(১৯৬৪)

পাকিস্তান	১১ লক্ষ ৫০ হাজার মেঃ টন
ভারত (মেস্তা সমেত)	১০ " ৪০ " "
চীন	১ " ১৮ " "
ব্রেজিল	৪৫ " "

Source—Statistical Report, March, 1965—U. S. Dept. of Agriculture

ভারত ও পাকিস্তান সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ পাট উৎপাদন করিয়া থাকে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আবার পাটচাষ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন-অববাহিকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ফলে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন-অববাহিকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে পৃথিবীর অধিকাংশ পাট উৎপাদিত হয়। ইহার কারণ, প্রথমতঃ, অতি প্রাচীনকাল হইতে এই অঞ্চলে পাটচাষের প্রচলন আছে। পূর্বে অবশ্য উৎপাদনের পরিমাণ সামান্য ছিল। শিল্প-বিপ্লবের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে মালপত্র মোড়ক করিবার উপযোগী সামগ্রীর চাহিদা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই চাহিদা মিটাইবার জন্য এই অঞ্চলে পাটচাষের প্রসার ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীবাহিত পলিমাটির দ্বারা গঠিত এই নিম্ন-সমভূমি অঞ্চল পাটচাষের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। পাটের চাষ করিলে জমির উর্বরাশক্তি দ্রুত নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই অঞ্চলে প্রায় প্রতিবৎসর বন্যা হইবার ফলে জমিতে নূতন পলি পড়ে এবং এইভাবে জমির উর্বরাশক্তি স্বাভাবিকভাবে পূরণ হয়। জমির উর্বরাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শস্যাবর্তন-পদ্ধতি অবলম্বন করিবার কিংবা অর্থব্যয় করিয়া সার দিবার প্রয়োজন হয় না। তৃতীয়তঃ, এই অঞ্চলে বৎসরে গড়ে ১৬০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় এবং এই বৃষ্টির অধিকাংশ মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই

নহে, বর্ষার এই কয়েক মাসে গড় তাপমাত্রা ২৭° সেঃ গ্রিঃ-এর অধিক। এই-প্রকার জলবায়ু পাটচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। চতুর্থতঃ, প্রতিবৎসর বর্ষার সময় এই অঞ্চলের অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল নূতন বন্যার জলে ভরিয়া যায়। ইহাতে পাট পচাইবার ও ধুইবার খুব সুবিধা হয়। এই সকল নদী-নালা ও খালের মাধ্যমে সুলভে পাট গ্রামাঞ্চল হইতে কারখানা ও বন্দর অঞ্চলে প্রেরণ করা যায়। পঞ্চমতঃ, পাটচাষের জন্য জমি-তৈয়ারী করা হইতে শুরু করিয়া জমি-নিড়ানো, পাটের চারাগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া দেওয়া, পাট-কাটা, আঁটি বাঁধিয়া জলে-ভিজানো, আঁশ-ছাড়ানো ও রৌদ্রে-শুকানো পর্যন্ত সমস্ত কাজ হাতে করিতে হয়। এই কারণে সুলভ দক্ষ শ্রমিকের

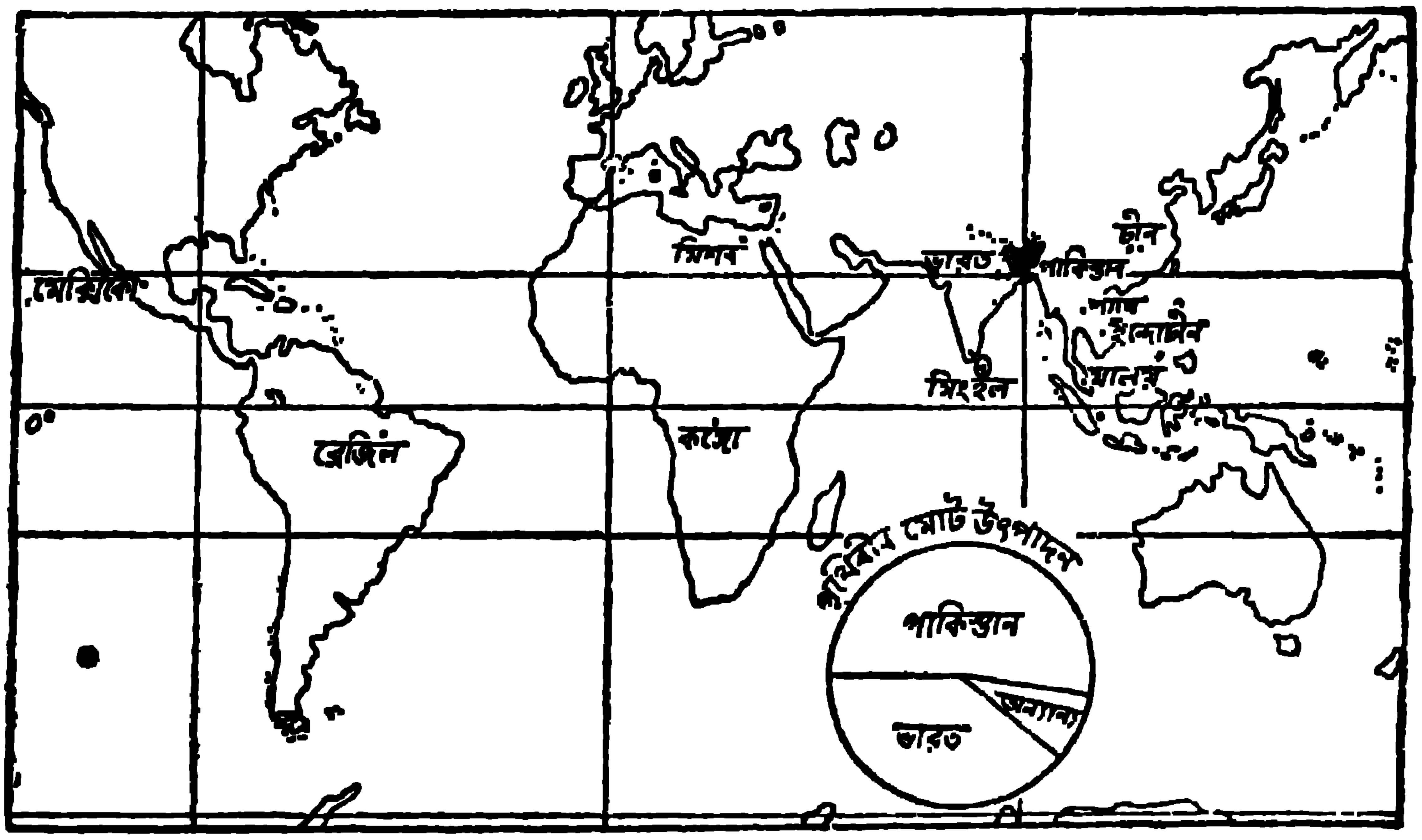

পৃথিবীর পাট-উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ
(মানচিত্রে দেখা যাইতেছে যে, পাটচাষ পূর্ব পাকিস্তান, ভারত ও চীনে সীমাবদ্ধ।)

প্রয়োজন খুব বেশী। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন-অববাহিকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে গড়ে ৩৮৫ জন লোক বাস করে। জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মানও নিম্ন; ফলে সুলভ শ্রমিকের অভাব নাই। সর্বশেষে, এই অঞ্চলের, বিশেষ-করিয়া ব-দ্বীপ অঞ্চলের কৃষিকার্যে নিযুক্ত জমির তিন-চতুর্থাংশে ধানের চাষ করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদিত ধান কৃষকের নিজের ও পরিবারের খাদ্যের প্রয়োজন মিটাইতে খরচ হইয়া যায়। বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ধান খুব সামান্যই থাকে। ফলে বাকি এক-চতুর্থাংশ জমিতে অর্থকরী ফসল

হিসাবে কৃষকেরা পাট উৎপাদন করিয়া থাকে। কারণ বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ, ঐতিহ্য ও তাহাদের দক্ষতার জন্য ইক্ষু, তুলা প্রভৃতি অন্যান্য অর্থকরী ফসলের তুলনায় পাট-উৎপাদনই সর্বাপেক্ষা লাভজনক।

চীন পাট-উৎপাদনে বর্তমানে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। দক্ষিণাংশের মৌসুমী অঞ্চলে অধিকাংশ পাট উৎপন্ন হয়। গত কয়েক বৎসর এই দেশে দ্রুত পাট-উৎপাদন-বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে।

পাকিস্তান, ভারত ও চীন ব্যতীত ব্রেজিল, ফরমোসা, কঙ্গো, মিশর, শ্যাম, ইন্দোচীন ও রাশিয়ায় সামান্য পাট উৎপন্ন হয়।

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য—পাকিস্তান ও ভারত পাট ও পাটজাত দ্রব্যের প্রধান **রপ্তানিকারক**। পাকিস্তানে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের মারফত এবং ভারতে কলিকাতা বন্দরের মারফত ইহা রপ্তানি হইয়া থাকে। ভারত তাহার মিলের চাহিদা মিটাইবার জন্য পাকিস্তান হইতে কাঁচা-পাট আমদানি করে। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, কানাডা, জাপান, ইটালি এবং আর্জেন্টিনা পাটজাত দ্রব্যের প্রধান **আমদানিকারক**।

অতসী (Flax)

অতসী-গাছ সরু ও '৫ হইতে ১ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ইহা তন্তু অথবা বাজ উৎপাদনের জন্য চাষ করা হইয়া থাকে। অতসী-বীজ আমাদের দেশে মসিনা নামে পরিচিত। এই মসিনা হইতে প্রস্তুত তৈল নানাবিধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। অতসী-গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত তন্তু অত্যন্ত শক্ত ও টেঁকসই। বস্ত্র-নির্মাণের ইহাই বোধহয় সর্বপ্রাচীন তন্তু। বিখ্যাত লিনেন কাপড় এই তন্তু হইতে প্রস্তুত হয়। অতসী তন্তু দড়ি, ক্যানভাস প্রভৃতি তৈয়ারীর জন্যও ব্যবহৃত হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—বীজ উৎপাদনের জন্য অতসী-চাষ প্রধানতঃ ভারতের ন্যায় ক্রান্তীয় মণ্ডলের দেশগুলিতে করা হইয়া থাকে। ক্রান্তীয় মণ্ডলে উৎপাদিত অতসী-গাছের আঁশ মোটা ও কর্কশ হয়। উহা হইতে কেবলমাত্র দড়ি প্রস্তুত করা চলে। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অতসী-চাষ প্রধানতঃ তন্তু উৎপাদনের জন্য করা হয়। ইহার জন্য জল-নিকাশের সুবিধাযুক্ত ভারী দো-আঁশ মাটি প্রয়োজন। বীজগুলি খুব ঘন ঘন করিয়া পোঁতা হয় যাহাতে গাছগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়া

জন্মাইতে পারে। কারণ গাছ যত ঘন হইয়া জন্মিবে কাণ্ড তত সরু এবং আঁশ তত মিহি হইবে। অতসী-গাছের প্রতিনিয়ত যত্ন লওয়া প্রয়োজন। এইজন্য ইহার চাষের জন্য যথেষ্ট শ্রামকের সরবরাহ থাকা দরকার। অতসী চাষ করিলে জমির উর্বরাশক্তি দ্রুত নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ইহা অন্যান্য ফসলের সহিত শস্যাবর্তন-পদ্ধতিতে চাষ করা হয়।

গাছগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে হাত দিয়া উপড়াইয়া তুলিয়া ফেলা হয়। তারপর গাছগুলিকে চিরুনীর ন্যায় যন্ত্রের মধ্য দিয়া চালাইয়া বীজগুলিকে আঁচড়াইয়া ফেলা হয়। ইহার পর গাছের চারিদিকে জড়ানো তন্তু আলগা করিবার জন্য গাছগুলিকে নরম জলের মধ্যে সপ্তাহ দু'য়েকের জন্য সোজা ডুবাইয়া রাখা হয়। অনেকসময় শিশিরে ভিজাইয়া অথবা বাষ্পের সাহায্যেও অতসী পচানো হয়। এইভাবে আঁশগুলি বেশ আলগা হইয়া গেলে গাছগুলিকে ভারী রোলারের মধ্য দিয়া চালানো হয়। ইহাতে ভিতরের কাঠি চূর্ণ হইয়া যায় এবং ঐগুলি ঝাড়িয়া বাহির করিয়া ফেলিলে যে তন্তু পাওয়া যায়, তাহা আঁচড়াইয়া গাঁটবন্দী করিয়া বিক্রয়ের উপযোগী করা হয়। অতসী তন্তু দীর্ঘ, মিহি এবং কোমল হয়। অতসীর হেক্টর-প্রতি উৎপাদন সকল দেশে সমান নয়। ইটালিতে এক হেক্টর জমিতে যে পরিমাণে অতসী উৎপাদিত হয় বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডে হয় তাহার দশগুণের অধিক।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing areas)—উত্তর ফ্রান্স ও বেলজিয়াম হইতে শুরু করিয়া জার্মানীর মধ্য দিয়া বাল্‌টিক উপকূল ও রাশিয়া পর্যন্ত প্রসারিত উত্তর ইউরোপের সমভূমি অঞ্চলের সর্বত্র অতসী তন্তু উৎপাদিত হয়। তাহা ছাড়া, ইটালির লম্বার্ডি সমভূমি অঞ্চলে অতসী উৎপাদিত হইয়া থাকে। আয়ারল্যাণ্ড ও বৃটেনেও কিছু পরিমাণে অতসীর চাষ হয়। জাপান, মিশর ও তুরস্কেও সামান্য পরিমাণে অতসীর চাষ হয়। অতসী-উৎপাদনে রাশিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

শণ (Hemp)

শণ-গাছ হইতে তন্তু ও বীজ পাওয়া যায়। ফল ধরিলে গাছ তুলিয়া ফেলিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। কিছুদিন পরে জল হইতে উঠাইয়া এই গাছকে শক্ত কাঠ দিয়া পিটাইয়া তন্তু বাহির করিতে হয়। এই তন্তুর দ্বারা মোটা দড়ি, ত্রিপল, চট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহা পাট অপেক্ষা মোটা।

শণ-গাছের বীজ হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত করা হয়। এই বীজ পশুখাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। ভারতে একপ্রকার শণ-গাছের পাতা হইতে গাঁজা ও অন্য একপ্রকার শণ-গাছ হইতে ভাঙ্গ তৈয়ার করা হয়। শণ-গাছের ডাঁটা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—২° সেঃ হইতে ১৩° সেঃ উত্তাপ এবং ৪০ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত এবং কাদাযুক্ত দো-আঁশ মাটি শণ-চাষের উপযোগী। ইহার চাষে প্রচুর শ্রমিকের দরকার।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Growing areas)—**সোভিয়েট রাশিয়া** শণ-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট উৎপাদন ৭ লক্ষ মেঃ টন। তন্মধ্যে রাশিয়া শতকরা ৫২ ভাগ, ইটালি ১২ ভাগ, যুগোস্লাভিয়া ৮ ভাগ এবং রুমানিয়া ৫ ভাগ শণ উৎপন্ন করে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ সর্বোৎকৃষ্ট শণ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত; এখানে বিখ্যাত ম্যানিলা শণ উৎপন্ন হয়। ইটালির শণও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। কেনিয়ার শিশল-শণ অত্যন্ত শক্ত হয়। ইহা ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও ভারতে শণের চাষ হয়। নিউজিল্যাণ্ডে 'ফরমিয়াম টেনাক্স' নামক শণ উৎপন্ন হয়। ভারতে মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশে ও উত্তরপ্রদেশে শণের চাষ হয়।

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য—ইটালি ও ভারত প্রধান **রপ্তানি-কারক** দেশ এবং বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স ও জাপান প্রধান **আমদানি-কারক** দেশ।

রেশম (Silk)

গুটিপোকার লালা হইতে রেশম প্রস্তুত হয়। গুটিপোকার প্রধান খাদ্য তুঁতগাছের (Mulberry) পাতা। পরিচ্ছদের জন্য রেশমের ব্যবহার ছাড়াও বিদ্যুৎরোধক হিসাবে, অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য এবং টাইপ-রাইটিং যন্ত্রের কার্বনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। প্যারাসুট, ফিতা প্রভৃতিও রেশম হইতে প্রস্তুত হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—রেশম প্রাণিজ বস্তু হইলেও ইহার উৎপাদন নির্ভর করে তুঁতগাছের উৎপাদনের উপর। এই গাছের পাতার উপর গুটিপোকা অন্নের গ্রহণ করে এবং এই

পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। ৫০০ গ্রাম কাঁচা রেশম উৎপাদনের জন্য ৫০ কিলোর অধিক তুঁতপাতার প্রয়োজন হয়। গুটিপোকা পালনের জন্য এবং তুঁত-চাষের জন্য ১৬° সেঃ উত্তাপ প্রয়োজন। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে এই চাষ খুব ভালো হয়। গুটিপোকা পূর্ণাঙ্গ হইলে সেগুলিকে যত্নের সহিত পরিষ্কার পাত্রে রাখিতে হয়। পরে খুব ধৈর্য সহকারে রেশমের গুটি হইতে রেশম বাহির করিতে হয়। এই সকল কাজের জন্য প্রচুর সুনিপুণ **শ্রমিকের** প্রয়োজন হয়।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Growing areas)—পূর্ব এশিয়ার দেশ-গুলিতে পৃথিবীর মোট রেশমের শতকরা ৮০ ভাগ উৎপাদিত হয়।

জাপান—পৃথিবীর রেশম-উৎপাদন ও রপ্তানিতে জাপানের স্থান প্রথম; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ইহার উৎপাদন অনেক কমিয়া গিয়াছে। নাগোয়া, বিওয়া হ্রদ-অঞ্চল, সিণ্ডয়া নদীর মোহনা অঞ্চল প্রভৃতি রেশম-চাষের জন্য বিখ্যাত।

চীন—খ্রীঃ পূঃ ২৭০০ সালে ছি-লিং-সি এখানে প্রথম রেশম আবিষ্কার করেন। ইয়াং-সি-কিয়াং উপত্যকা ও শানটুং-এ প্রচুর রেশমের চাষ হয়।

ভারত—রেশম-উৎপাদনে ভারত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এখানে বৎসরে প্রায় ১২,০০০ মেট্রিক টন রেশম উৎপন্ন হয়। ভারতে সাধারণতঃ চারি শ্রেণীর রেশম দেখা যায়। যথা, তসর, গরদ, এণ্ডি ও মুগা। **তসর**—শাল, কুসুম, মহুয়া ও কুলগাছের পাতা খাইয়া তসরকীট বাঁচিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা, ছোটনাগপুরে, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে প্রচুর তসর প্রস্তুত হয়। **গরদ**—তুঁতগাছে যে রেশমকীট থাকে তাহার গুটি হইতে গরদ প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজের কোয়েম্বাটুর জেলা, পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলা, বিহারের ভাগলপুর জেলা, মহীশূর ও কাশ্মীর অঞ্চলে প্রচুর গরদ প্রস্তুত হয়। নিকৃষ্ট শ্রেণীর রেশমকীট হইতে 'মটকা' নামক একপ্রকার রেশম প্রস্তুত হয়। **এণ্ডি**—এরণ্ড গাছের পাতা খাইয়া এণ্ডিপোকা বা হরিপোকা বাঁচিয়া থাকে। আসামের ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় প্রচুর এণ্ডি প্রস্তুত হয়। **মুগা**—জয়পত্র-জাতীয় গাছের পাতা খাইয়া মুগা-পোকা বাঁচিয়া থাকে। আসাম, কাশ্মীর ও নীলগিরি অঞ্চলে মুগা উৎপন্ন হয়।

ইটালির পো-উপত্যকা, **ফ্রান্সের** রোন নদীর উপত্যকা, কোরিয়া, ইন্দোচীন, তুরস্ক, ইরাণ, সিরিয়া, রাশিয়া ও স্পেনে রেশম উৎপন্ন হয়।

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য—জাপান, চীন ও ইটালি রপ্তানি-বাণিজ্যের ⅘ অংশ সরবরাহ করে। ইহা ছাড়া, তুরস্কও কিছু কিছু রেশম রপ্তানি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, বৃটেন, জার্মানী রেশমের প্রধান **আমদানিকারক**।

তামাক (Tobacco)

'নিকোটিয়ানা' নামক একজাতীয় উদ্ভিদের পাতা শুকাইয়া অথবা সেঁকিয়া তামাক প্রস্তুত করা হয়। এই তামাক হইতে ধূমপানের জন্য চুরুট, সিগারেট, বিড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। তামাক নস্য, খৈনি, জর্দা ইত্যাদিরূপেও ব্যবহার করা হয়। তামাক হইতে ধূমপানের উপযোগী অংশ গ্রহণ করিবার পর যে অতিরিক্ত অংশ থাকে তাহা কীটনাশক পদার্থ উৎপাদনে অথবা পটাশ-সমৃদ্ধ কৃষি-সার হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ধূমপানের অভ্যাস পৃথিবীব্যাপী প্রচলিত। এই কারণে তামাকের চাহিদা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—তামাক প্রধানতঃ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় মণ্ডলের ফসল। তবে তুষারপাত হইতে তামাক গাছগুলিকে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিলে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেও তামাক-চাষ করা যাইতে পারে। মৃত্তিকার গুণের উপর তামাকের গুণ নির্ভর করে। হালকা মাটিতে উৎপাদিত তামাকের গন্ধ মৃদু এবং ভারী মাটিতে উৎপাদিত তামাকের গন্ধ তীব্র হয়। তামাক উৎপাদনের জন্য শ্রমিকের প্রয়োজন হয় খুব বেশী। তামাকের গাছ ও পাতাকে নানাপ্রকার পোকামাকড়ের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্বক্ষণ তামাকগাছের যত্ন লওয়া প্রয়োজন হয়। তামাকের কুঁড়ি ও পাশ দিয়া গজাইয়া উঠা ডালগুলিকেও সময়মতো তুলিয়া ফেলিতে হয়। তাহা ছাড়া, তামাক-পাতা তোলা, শুকানো ও সেঁকা, শ্রেণীভাগ করা ও মোড়ক করার জন্য প্রচুর দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। তবে তামাক-চাষে প্রয়োজনীয় অধিকাংশ কাজের জন্যই দৈহিক শক্তি অপেক্ষা যত্ন, সতর্কতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয় অধিক। এই জন্য তামাক-চাষের জন্য পুরুষ শ্রমিক অপেক্ষা নারী ও বালক-বালিকা অধিক ব্যবহার করা হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাপক আকারে না করিয়া ছোট আকারে কৃষকের পরিবারের লোকজনের দ্বারা তামাকের চাষ করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing areas)—তামাক-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া, চীন, ভারত, রাশিয়া, ব্রেজিল, তুরস্ক, জাপান, পাকিস্তান, গ্রাস, কানাডা, ইটালি, দক্ষিণ রোডেশিয়া, ফ্রান্স, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশেও তামাক উৎপাদিত হয়।

পৃথিবীর মোট তামাক-উৎপাদন—৪৪ লক্ষ ৪১ হাজার মেঃ টন (১৯৬৪)

মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	১০	লক্ষ	৩	হাঃ	মেঃ টন	তুরস্ক	১	লক্ষ	৬০	হাজার	মেঃটন
চীন	৪	„	২২	„	„ „	রাশিয়া	১	„	৫৫	„	„ „
ভরত	৩	„	৪৭	„	„	ব্রেজিল	১	„	৪৫	„	„ „
জাপান	২	„	১১	„	„	রোডেশিয়া	১	„	৩৮	„	„ „

Source—Statistical Report, February, 1965, U. S. Dept. of Agriculture.

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য (Trade)—মোটামুটিভাবে পৃথিবীর মোট উৎপাদিত তামাকের এক-সপ্তমাংশ আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, গ্রীস, ভারত ও দক্ষিণ রোডেশিয়া প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গড়ে প্রতিবৎসর ২১ কোটি কিলোগ্রাম তামাক রপ্তানি করিয়া থাকে। বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান আমদানিকারক দেশ। বৃটেন প্রতিবৎসর গড়ে ১৪ কোটি কিলোগ্রাম তামাক আমদানি করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট পরিমাণে তামাক উৎপাদিত হইলেও, বিদেশ হইতে, বিশেষ করিয়া গ্রীস ও তুরস্ক হইতে, স্থানীয় তামাকের সহিত মিশাইয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সিগারেট প্রস্তুত করিবার জন্য তামাক আমদানি করা হয়।

সকল প্রকারের কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে তামাকের উপর **সরকারী নিয়ন্ত্রণ** বোধহয় সর্বাপেক্ষা অধিক। তামাক হইতে প্রচুর পরিমাণে কর আদায় করা সম্ভব বলিয়া বিভিন্ন দেশের সরকার নানাভাবে এই শিল্প নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। উদাহরণস্বরূপ, পেরুতে তামাক-উৎপাদনে সরকারের একচেটিয়া অধিকার রহিয়াছে, ব্রেজিলে তামাকরপ্তানির উপর এবং আর্জেন্টিনায়তামাক আমদানি ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের উপর শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে। অন্যান্য দেশেও তামাকের উপর কোন-না-কোনরূপ কর বসানো হইয়াছে এবং কোন-না-কোনভাবে সরকার তামাক-উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে।

প্রশ্নাবলী

1. Define agriculture. Discuss the main differences between the nature of agriculture and that of industry.

উ: 'কৃষিকার্যের সংজ্ঞা' (২৪২ পৃ:) এবং 'কৃষিকার্যের প্রকৃতি' (২৪২ পৃ:—২৪৫ পৃ:) লিখ।

2. What are the different types of farming? Examine the conditions under which and the areas where they are practised.

[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উ: 'কৃষিকার্যের শ্রেণীবিভাগ' (২৩০ পৃ:—২৩২ পৃ:) লিখ।

3. Discuss the modern farm problems. Suggest remedies.

উ: 'আধুনিক কৃষিসমস্যা' ও 'সমাধান' (২৪৯ পৃ:—২৫৩ পৃ:) লিখ।

4. Describe the impact of mechanical revolution on agriculture with special reference to the problems created by it and their remedies.

Or, Describe the position of agriculture in the industrial world with special reference to the modern farm problems and their remedies.

উ: 'শিল্পোন্নত জগতে কৃষির অবস্থা' (২৪৭ পৃ:—২৪৯ পৃ:) লিখ।

5. What are the most favourable conditions for the cultivation of rice and wheat? Name the countries of the world where both rice and wheat are produced. [C. U. B. Com. 1959]

উ: ধান ও গমের 'চাষের উপযোগী অবস্থা' (২৫৪ পৃ:—২৫৫ পৃ: এবং ২৬১ পৃ: ও ২৬২ পৃ:) এবং 'উৎপাদনকারী অঞ্চল' (২৫৫ পৃ:—২৫৮ পৃ: এবং ২৬৩ পৃ:—২৬৪ পৃ:) হইতে লিখ।

6. Why is there a geographical separation of the typical areas of wheat and rice? Describe the contrasting nature of farming methods of these two crops. [C. U. Three-Year Degree Course, B, Com., 1964]

উ: গম ও ধানের 'চাষের উপযোগী অবস্থা' (২৫৪ পৃ: এবং ২৬১ পৃ:), 'উৎপাদনকারী অঞ্চল' (২৫৫ পৃ: এবং ২৬৩ পৃ:) এবং 'গম ও ধানের তুলনা' (২৬৫ পৃ:) হইতে সংক্ষেপে লিখ।

7. Give a brief account of the international trade in wheat. What do you know about the International Wheat Agreement?

উ: 'আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য' (২৫৮ পৃ:) ও 'আন্তর্জাতিক গমচুক্তি' (২৫৯ পৃ:—২৬০ পৃ:) লিখ।

8. Describe the conditions of growth of Sugar-cane and Sugar-beet and indicate the principal regions of their production. What are the important exporters of cane and beet sugar?

[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1962]

Or, Explain why Sugar-cane and Sugar-beet are grown in regions which are mutually exclusive. Give the distribution of Sugar-cane-producing areas of the world. Which are the countries that export sugar?

[C. U. B. Com. 1962]

Or, Compare the geographical condition for the cultivation of Sugar-cane and Sugar-beet, and name the important producers of these. Give a short account of the international trade in cane-sugar and beet-sugar.

[C. U. B. Com. 1960]

What do you know about International Trade Agreements in sugar ?

উ : ইক্ষু ও বীটের 'চাষের উপযোগী অবস্থা' (২৬৬ পৃঃ—২৬৭ পৃঃ এবং ২৭২ পৃঃ—২৭৩ পৃঃ), 'উৎপাদক অঞ্চল' (২৬৭ পৃঃ ও ২৭৩ পৃঃ), 'আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য' (২৭০ পৃঃ) ও 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তিসমূহ' (২৭৪ পৃঃ—২৭৬ পৃঃ) হইতে লিখ।

9. What physical and climatic conditions make Cuba an important producer and exporter of cane-sugar ?

উ : 'কিউবা' (২৬৯ পৃঃ—২৭০ পৃঃ) হইতে লিখ।

10. Describe the conditions under which tea is grown in different countries of the world. Name the producing, exporting and importing countries. Discuss the international agreements in tea.

উ : 'চাষের উপযোগী অবস্থা' (২৭৬ পৃঃ—২৭৭ পৃঃ), 'উৎপাদনকারী অঞ্চল' (২৭৭ পৃঃ—২৭৯ পৃঃ) ও 'আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য' (২৭৯ পৃঃ—২৮০ পৃঃ) লিখ।

11. Describe the conditions neccessary for the cultivation of Coffee. Indicate the principal regions of coffee production in the world. Discuss the circumtances under which U. S. A. joined the Inter-American Coffee Agreement in 1940.

উ : 'চাষের উপযোগী অবস্থা' (২৮০ পৃঃ—২৮১ পৃঃ), 'উৎপাদনকারী অঞ্চল (২৮১ পৃঃ—২৮৩ পৃঃ) ও 'আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য' (২৮৩ পৃঃ—২৮৫ পৃঃ) হইতে লিখ।

12. Account for the supremacy of Brazil in Coffee plantation and in Coffee export.

উ : 'উৎপাদনকারী অঞ্চল'-এর 'ব্রেজিল' অংশ (২৮১ পৃঃ—২৮৩ পৃঃ) লিখ।

13. Describe the conditions of growth and the producing areas of Cocoa. What do you know about the international trade in Cocoa ?

উ : 'চাষের উপযোগী অবস্থা' (২৮৫ পৃঃ—২৮৬ পৃঃ), 'উৎপাদক অঞ্চল' (২৮৬ পৃঃ—২৮৮ পৃঃ) লিখ।

14. What are the geographical and economic conditions that have facilitated the cultivation of rubber in South-East Asia ? Discuss the prospects of natural rubber industry vis-a-vis synthetic rubber.

উ : 'চাষের উপযোগী অবস্থা' (২৯০ পৃঃ—২৯২ পৃঃ) ও 'উদ্ভিজ্জ রবার বনাম কৃত্রিম রবার' (২৯৩ পৃঃ—২৯৪ পৃঃ) হইতে লিখ।

15. Compare and contrast the soil and climatic conditions under which cotton is cultivated in Mississippi basin and in the Nile basin.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1962]

উ : তুলার 'উৎপাদক অঞ্চল' হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৩০১ পৃঃ—৩০২ পৃঃ) ও মিশরের তুলার চাষ (৩০৩ পৃঃ—৩০৪ পৃঃ) সম্বন্ধে লিখ।

16. Discuss the part played by cotton in the economic development of Egypt and discuss the factors leading to the production of this raw material,

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1963]

উঃ 'উৎপাদনকারী অঞ্চল' হইতে মিশরের তুলার চাষ (৩০৩ পৃঃ—৩০৪ পৃঃ) সম্বন্ধে লিখ।

17. Discuss the commercial importance of jute and explain its advantages over the competitng fibres. Describe the conditions necessary for the cultivation of jute and account for its localisation in the lower Ganges-Brahmaputra valley and delta.

উঃ 'পাট' (৩০৫ পৃঃ), 'চাষের উপযোগী অবস্থা' (৩০৫ পৃঃ—৩০৬ পৃঃ) ও 'উৎপাদনকারী অঞ্চল' (৩০৬ পৃঃ—৩০৮ পৃঃ) হইতে লিখ।

18. Discuss the uses, conditions of growth and the principal growing areas of the following :—(a) Oil-seeds, (b) Flax, (c) Hemp, (d) Tobacco, and (e) Silk.

উঃ 'তৈলবীজ' (২৯৬ পৃঃ—২৯৯ পৃঃ), 'অতসী' (৩০৮ পৃঃ—৩০৯ পৃঃ), 'শণ' (৩০৯ পৃঃ—৩১০ পৃঃ), 'তামাক' (৩১২ পৃঃ—৩১৩ পৃঃ) ও 'রেশম' (৩১০ পৃঃ—৩১২ পৃঃ) লিখ।

19. Describe the characteristics of tropical plantation farming with reference to rubber cultivation in the South-East Asia.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1965]

উঃ 'রবার' (২৯০ পৃঃ—২৯৩ পৃঃ) হইতে লিখ।

20. Select one of the important natural fibres from the point of view of the volume of production. Discuss the geographical conditions necessary for its production and point out the important arears of its cultivation.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1965]

উঃ 'তুলা-চাষের উপযোগী অবস্থা' (৩০০ পৃঃ—৩০১ পৃঃ) এবং 'উৎপাদনকারী অঞ্চল' (৩০১ পৃঃ—৩০৪ পৃঃ) লিখ।

21. Discuss the factors responsible for the concentration of cotton, wool, and silk production in certain regions of the world. Indicate the nature of world trade in these products.

[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1965]

উঃ 'তুলা-চাষের উপযোগী অবস্থা' (৩০০ পৃঃ—৩০১ পৃঃ), 'উৎপাদনকারী অঞ্চল' (৩০১ পৃঃ—৩০৪ পৃঃ) এবং 'আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য' (৩০৪ পৃঃ), রেশম 'চাষের উপযোগী অবস্থা' (৩১০ পৃঃ—৩১১ পৃঃ), 'রেশম-উৎপাদনকারী অঞ্চল' (৩১১ পৃঃ), 'আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য' (৩১২ পৃঃ), 'মেষ-পালনের ভৌগোলিক অবস্থা' (১৩৭ পৃঃ), 'পশম-উৎপাদনকারী-অঞ্চল' (১৩৮ পৃঃ—১৩৯ পৃঃ) এবং 'বাণিজ্য' (১৩৯ পৃঃ—১৪০ পৃঃ) লিখ।

দ্বাদশ অধ্যায়

. (The Manufacturing Industries)

বর্তমান যুগে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে শ্রমশিল্পের অভাবনীয় অগ্রগতি। মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানুষ আদিম যুগে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও পশুপক্ষীর সাহায্যে জীবন ধারণ করিত। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মানুষ এই চাহিদা মিটাইবার জন্য কৃষিকার্য, বিনিময়-প্রথা, খনিজ সম্পদ প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। তবুও ক্রমবর্ধমান চাহিদার তৃপ্তি হইল না। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচির পরিবর্তন হওয়ায় চাহিদার বৈচিত্র্য বাড়িয়া গেল। এইজন্য মানুষ বিভিন্ন কৃষিজ, বনজ ও খনিজ দ্রব্যের রূপ পরিবর্তন করিয়া নূতন নূতন দ্রব্যাদি সৃষ্টি করিয়া বৈচিত্র্যময় চাহিদার তৃপ্তিসাধনে ব্রতী হইল। তুলার রূপ পরিবর্তন করিয়া সৃষ্টি হইল বস্ত্র, ইক্ষুর রূপ পরিবর্তন করিয়া সৃষ্টি হইল চিনি। এইভাবে চর্ম হইতে জুতা, লৌহ আকরিক হইতে ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইল। যে সম্পদ পূর্বে মানুষের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পুরাপুরি মিটাইতে পারিত না, শিল্পের কর্মদক্ষতায় সেই সম্পদ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া মানুষের সেই অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিল। বিভিন্ন দ্রব্যের এই রূপ-পরিবর্তন করাকেই **শিল্পসৃষ্টি** বলা হয়।

যান্ত্রিক শক্তি ও ইহার তাৎপর্য (Mechanical Energy and its significance)—শিল্পসৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানুষ প্রথমে তাহার পেশীশক্তির সাহায্যে ছোটখাটো কুটীরশিল্প আরম্ভ করিয়াছিল। ক্রমশঃ পশুশক্তি, বায়ুশক্তি ও জলশক্তি ব্যবহারের দ্বারা মানুষ শিল্পের উৎপাদন-বৃদ্ধির চেষ্টা করে। এখনও বহু অনুন্নত দেশে পেশীশক্তি ও পশুশক্তি ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। এখনও তাঁতী নিজের পেশী-শক্তির সাহায্যে ঘরে বসিয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে; তৈলবীজ-নিষ্কাশনে এখনও গবাদি পশু ব্যবহৃত হয়। এইভাবে উৎপাদনের পরিমাণ কখনও বেশী হওয়া সম্ভব নহে।

আধুনিক শিল্পের অভাবনীয় উন্নতির মূলে রহিয়াছে যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার। ১৭৬৯ সালে জেমস্ ওয়াট্ (James Watt) প্রথম বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার করিবার পরেই শিল্প-বিপ্লবের শুরু হয়। প্রথমে কয়লার সাহায্যে বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কৃত হইলেও ক্রমে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে খনিজ তৈল, জলস্রোত, পীট ও প্রাকৃতিক গ্যাস হইতে যান্ত্রিক শক্তির সৃষ্টি হয়; বর্তমান যুগে পারমাণবিক শক্তিও ব্যবহৃত হইতেছে বিভিন্ন শিল্পে ও পরিবহণ-ব্যবস্থায়। এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, যান্ত্রিক শক্তির উৎপাদানসমূহ থাকিলেই শক্তি উৎপাদিত হইবে না। ঐ সঙ্গে চাই মূল্যবান্ যন্ত্রপাতি ও সুদক্ষ কর্মী।

যান্ত্রিক শক্তি আবিষ্কৃত হইবার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। উৎপাদনের পরিমাণ শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে যে কাজ শত শত মানুষের পেশীশক্তির সাহায্যে সম্পন্ন হইত, এখন তাহা একটি ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে সম্ভব হইতেছে। যান্ত্রিক শক্তি আবিষ্কারের ফলে সৃষ্টি হইয়াছে বৃহদাকার শিল্প; ইহার ফলেই শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ প্রভৃতির প্রবর্তন সম্ভব হইয়াছে। প্রথমে কয়লার সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তির আবিষ্কার হওয়ায় কয়লা-উৎপাদনকারী দেশসমূহ শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে। কয়লা-সম্পদে সমৃদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বৃটেন, জার্মানী প্রভৃতি দেশের শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে এই সকল দেশের কয়লা-সম্পদ।

যান্ত্রিক শক্তির উন্নতি শুধু যে শিল্পের উন্নতিতেই সাহায্য করিয়াছে তাহা নহে, ইহা দ্বারা স্টীমার, জাহাজ, রেলগাড়ী ও বিমানপোত চালাইবার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহার ফলে পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি সম্ভব হইয়াছে; মানুষ দ্রুতবেগে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করিতে পারিতেছে এবং শিল্পের কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে সহজেই পরিবাহিত হইতেছে। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণে সাহায্য করিয়াছে। বর্তমান যুগে যান্ত্রিক শক্তি শুধু শিল্পে বা পরিবহণ-ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয় না, মানুষের নানা প্রয়োজনে ইহা নিয়োজিত হয়। খনি হইতে খনিজ দ্রব্য-উত্তোলনে, কৃষিকার্যে, গৃহাদিতে বিদ্যুৎ-সরবরাহে, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে, ভারোত্তোলনে, হিসাব-নিকাশ-যন্ত্রে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে আজ বৈদ্যুতিক শক্তির একান্ত প্রয়োজন। একথা ঠিক যে, যান্ত্রিক

শক্তি শিল্পের উন্নতিতে যতটা সাহায্য করিয়াছে, অন্যান্য কার্যে ততটা করে নাই।

শিল্পায়নের ফল (Effect of Industrialization)—বর্তমান যুগ শিল্পের যুগ। শিল্প-বিপ্লবের পর হইতেই এই যুগের সৃষ্টি হইয়াছে। শিল্পায়নের ফলে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের চাহিদার বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে। নূতন নূতন সম্পদ সৃষ্টি হওয়ায় মানুষের জীবনমান ও লোকসংখ্যা অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্বে কৃষি অঞ্চলে **লোকবসতি** ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী; কিন্তু বর্তমানে শিল্পোন্নত দেশে শিল্পাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে অধিকাংশ লোক বাস কণিতেছে। কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে বহু কৃষককে কৃষিক্ষেত্র হইতে সরাইয়া শিল্পে নিযুক্ত করা হইয়াছে। শিল্প-শ্রমিকের মজুরি কৃষি-শ্রমিকের মজুরি অপেক্ষা বেশী বলিয়া বহুলোক স্বেচ্ছায় গ্রাম হইতে শিল্পাঞ্চলে আসিয়া শিল্পে নিযুক্ত হইয়াছে। শিল্পাঞ্চলের নিকটে গড়িয়া উঠিয়াছে শিল্পের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ছোটখাটো কারখানা, ডেয়ারী শিল্প প্রভৃতি। পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের **চেহারা** সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া গিয়াছে; পূর্বে যে অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্র, গ্রাম বা বিরল লোকবসতি বিদ্যমান ছিল, সেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে বিরাট শিল্পাঞ্চল; গড়িয়া উঠিয়াছে বড় বড় কারখানা, বিস্তীর্ণ রেলপথ, শ্রমিকের বস্তী, গুদামঘর প্রভৃতি; কালো ধোঁয়ায় সমগ্র অঞ্চল ছাইয়া গিয়াছে। ১০ বৎসর পূর্বেকার দুর্গাপুরের সঙ্গে আজকের দুর্গাপুরের তুলনা করিলেই ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

পরিবহণ-ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয় শিল্পায়নের ফলে। শিল্পের প্রয়োজনে নির্মিত হয় রেলপথ; কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদকে কারখানায় আনিতে এবং শিল্পজাত দ্রব্য বাজারে পাঠাইতে **পরিবহণ-ব্যবস্থা** একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পাঞ্চলে রেলপথ জালের ন্যায় বিস্তার লাভ করে, খালপথের সৃষ্টি হয় এবং নদীকে গভীরতর করিবার বন্দোবস্ত হয়। জার্মানীর নিম্ন-রাইন-উপত্যকায় প্রতি ১০০ বর্গ-কিলোমিটারে ২৫ কিলোমিটার রেলপথ আছে; কিন্তু এই দেশের শিল্পাঞ্চল রুঢ় জিলায় প্রায় ৫০০০ কিলোমিটার রেলপথ বিদ্যমান। শিল্পায়নের ফলে বহু কৃত্রিম বন্দর ও উৎকৃষ্ট রাস্তাঘাটও সৃষ্টি হইয়া থাকে।

পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মিটানো যায়

কৃষিকার্যের উন্নতির দ্বারা। বর্তমান যুগে কৃষিকার্যে যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ট্রাক্টর, হারভেস্টার, রাসায়নিক সার প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য। সুতরাং দেশের শিল্পায়নের উপর কৃষিজ দ্রব্যের উন্নতিও নির্ভরশীল।

শিল্পায়নের ফলে বিবিধ বৈজ্ঞানিক উন্নতিও সম্ভব হইয়াছে। শিল্প-কারখানায় কাজ করিবার মাধ্যমে বহু নূতন নূতন কলকব্জা ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে শিল্পোন্নয়নের আরও সুবিধা হইয়াছে।

শিল্পায়নের কিছু কিছু **কুফল**ও আমাদের চোখে যে ধরা না পড়ে তাহা নহে। বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশ তাহাদের চাহিদার অতিরিক্ত শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করায় ইহার বিক্রয়-সমস্যা দেখা দেয়। এইসব শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজারের অন্বেষণ করিতে যাইয়া বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে এই বাজার লইয়া মনোমালিন্য দেখা দেয়। পূর্বে এই মনোমালিন্য যুদ্ধের কিনারায় যাইয়া পৌঁছিত। এই বাজারের লোভে ইংরেজগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। বহু রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মূলে রহিয়াছে এই বাজারের উপর আধিপত্য করিবার প্রয়াস। শিল্পায়নের ফলে সৃষ্টি হইয়াছে দুইটি শ্রেণী—শিল্পপতি ও শ্রমিকশ্রেণী। ইহাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত লাগিয়াই আছে। সম্পদবন্টনও হইয়াছে অসমান—কেহ বাস করিতেছে জীর্ণ কুটীরে বা বস্তীতে, কেহ বা বাস করিতেছে প্রাসাদোপম অট্টালিকায়।

পৃথিবীর শ্রমশিল্পের অবস্থানের কারণ (Basis of World's Industrial Location)—পৃথিবীর বিস্তীর্ণ এলাকার অতি অল্প-অংশেই শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। শিল্পের সৃষ্টি ও উন্নতি—শিল্প-কারখানা স্থাপনের অনুকূল অবস্থার উপর নির্ভরশীল। যে সকল স্থানে এই অনুকূল পরিবেশের অভাব, সেখানে শিল্প-সৃষ্টি অসম্ভব। শিল্পজগতের মানচিত্রের দিকে তাকাইলেই দেখা যাইবে পৃথিবীর নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে শিল্প-কারখানা-সমূহ অবস্থিত। ইহার কারণ কি? শিল্প-কারখানা শুধু এই কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ কেন? ইহার প্রধান কারণ এই যে, শ্রমশিল্প-স্থাপনের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ শুধু পৃথিবীর অল্প কয়েকটি অঞ্চলেই বিদ্যমান।

শ্রমশিল্পের জন্য প্রয়োজন কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ, অনুকূল জলবায়ু, পরিবহণ-ব্যবস্থা, শ্রমিক, চাহিদা ও মূলধন। এই সকল উপাদান যেখানে সুলভে ও সহজে পাওয়া যাইবে সেখানেই শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠিবে। অনেক

সময় দেখা যায় কোন-একটি শিল্প একটি বিশিষ্ট অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। এইপ্রকার শিল্পের একদেশীভবনের (Localisation of Industries) মূল কারণ এই যে, ঐ শিল্পের উপযোগী সকল প্রকার অবস্থা ও উপকরণ সুলভে ও সহজে ঐ অঞ্চলে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের তুলা অঞ্চলের নিকট অবস্থিত বোম্বাই ও আমেদাবাদের কার্পাসবয়নশিল্প, পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্প প্রভৃতি শিল্পের একদেশীভবনের নিদর্শন।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পস্থাপনের কারণসমূহ বিস্তারিতভাবে নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(ক) **কাঁচামাল (Raw Material)**—কাঁচামালকে রূপ পরিবর্তন করিয়াই শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। সুতরাং যেখানে কাঁচামাল সুলভে পাওয়া যায়, সেখানেই শিল্পগঠন সম্ভব। বিভিন্ন কৃষিজ, বনজ, খনিজ ও প্রাণিজ দ্রব্য শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, পাট, কাষ্ঠ, লৌহ, পশম প্রভৃতি। কাঁচামাল শিল্পকেন্দ্রের নিকটে পাওয়া গেলে পরিবহণের খরচ কমিয়া যায়। ইহা ছাড়া, বহু কাঁচামাল অত্যন্ত ভারী বা পচনশীল বলিয়া ঐ কাঁচামালের সন্নিকটেই শিল্প স্থাপিত হয়। কলিকাতার পাটশিল্প, বোম্বাই অঞ্চলের কার্পাসবয়নশিল্প, দুর্গাপুর ও ইউক্রেন অঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কাঁচামালের নিকটেই অবস্থিত।

(খ) **শক্তিসম্পদ (Power Resources)**—যে-কোন শিল্পেই শক্তির প্রয়োজন। পৃথিবীর কোন কোন অনুন্নত অঞ্চলের কুটীরশিল্পে এখনও পশুশক্তি বা পেশীশক্তি ব্যবহৃত হইলেও, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে অধিকাংশ শিল্প চালিত হয় কয়লা, খনিজ তৈল অথবা জলবিদ্যুৎ হইতে উদ্ভূত শক্তির সাহায্যে। রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস হইতেও কোন কোন শিল্প চালিত হয়। এই সকল শক্তিসম্পদ বহুদূরে লইয়া যাওয়া অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। এইজন্য অধিকাংশ শিল্প শক্তিসম্পদের সন্নিকটে স্থাপিত হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কয়লাখনির নিকটেই অবস্থিত। রূঢ় অঞ্চলের ও দুর্গাপুরের ইস্পাত-কারখানা কয়লাখনি অঞ্চলে এবং বোম্বাই ও আমেদাবাদের কার্পাসশিল্প জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রের নিকট অবস্থিত।

(গ) **জলবায়ু (Climate)**—শিল্পের অবস্থানের উপর জলবায়ুর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান (৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। জল[illegible] তারতম্য অনুসারে

বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের শিল্প গড়িয়া ওঠে। আর্দ্র জলবায়ুতে কাপড়ের সূতা মিহি হওয়ায় বোম্বাই, ল্যাঙ্কাশায়ার প্রভৃতি আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত স্থানে কার্পাসবয়নশিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। শুষ্ক জলবায়ুতে ময়দা-শিল্প উন্নতি লাভ করে; সেইজন্য উইনিপেগ, বুদাপেস্ট, করাচী ও উত্তরপ্রদেশে এই শিল্প শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এমনকি, চলচ্চিত্রশিল্পও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। কারণ, সূর্যকিরণোজ্জ্বল স্থানে চলচ্চিত্রগ্রহণ সহজসাধ্য। সেইজন্য হলিউড, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে এই শিল্পের উন্নতি হইয়াছে।

এই সকল প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও জলবায়ু পরোক্ষভাবে শিল্পের উপব প্রভাব বিস্তার করে। শীতপ্রধান দেশের শ্রমিক অধিকসময় দক্ষতার সহিত কাজ করিতে পারে; কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কিছুক্ষণ কাজ করিবার পরেই শ্রমিকগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের দরুন কাঁচামাল-উৎপাদন এবং পরিবহণ-ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। জলবায়ুর উপর শ্রমিকের স্বাস্থ্যের উন্নতি নির্ভর করে। শিল্পের চাহিদাও কতকাংশে জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। শীতপ্রধান দেশে স্বভাবতঃই পশমী দ্রব্যের চাহিদা বেশী হইবে এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কার্পাস-দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে; এইজন্য বৃটেনে পশমশিল্প এবং ভারতে কার্পাসশিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেশিল্পকে এই সকল প্রাকৃতিক প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কোন কোন কারখানায় প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করিয়া বা তাপ নিয়ন্ত্রণ (Air-conditioning) করিয়া শিল্পজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ-সাধনের বা শ্রমিকের কর্মক্ষমতা-বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এইভাবে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অনেক খরচ হওয়ায় শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন-খরচ বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে অনুকূল জলবায়ুযুক্ত স্থানের শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো কষ্টকর হয়। এইজন্য এখনও শিল্প-কারখানা-স্থাপনে জলবায়ুর প্রভাব বহুলাংশে বিদ্যমান।

(ঘ) পরিবহণ-ব্যবস্থা (Transport)—শিল্প-কারখানায় কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি শক্তিসম্পদ, কাঁচামাল ও শ্রমিক আনিবার জন্য পরিবহণের সুবন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রে পাঠাইতে পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন। এইজন্য জলপথ, রেলপথ বা পাকা রাস্তা না থাকিলে শিল্প-কারখানা স্থাপন করা অসম্ভব। যে সকল দেশে পরিবহণ-ব্যবস্থার

সুবন্দোবস্ত আছে, সেই সকল দেশ শ্রমশিল্পে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। মস্কো অঞ্চলের শিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে ইহার চতুর্দিকের সুন্দর পরিবহণ-ব্যবস্থা। টাটানগর, নিউ ইয়র্ক, চিকাগো, ম্যাঞ্চেস্টার প্রভৃতি শহরে অবস্থিত শিল্পের উন্নতিতে পরিবহণ-ব্যবস্থার অবদান কম নহে। অন্যদিকে ব্রেজিল, কঙ্গো প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন কাঁচামাল থাকিলেও এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা থাকিলেও পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবে ঐ সকল দেশ শ্রমশিল্পে উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না।

(ঙ) **শ্রমিক (Labour)**—প্রগতিশীল অর্থনীতিবিদ্‌গণের মতে শ্রমিকই শিল্পগঠনের প্রধান উপকরণ। শ্রমিকের নিপুণতা এবং কর্মক্ষমতার উপর শিল্পের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। শ্রমিকের মজুরি অত্যধিক হইলে শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন-খরচ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য সুলভ ও সুনিপুণ শ্রমিকের সরবরাহের উপর শিল্পের উন্নতি নির্ভরশীল। জাপানের ও চীনের শ্রমিক সুনিপুণ ও সুলভ বলিয়া ঐ সকল দেশে শিল্পস্থাপন সহজসাধ্য হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ায় শ্রমিকের অভাবে শিল্পের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই।

(চ) **চাহিদা (Market)**—শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার উপর শিল্প-কারখানার অবস্থান কিছুটা নির্ভর করে। শিল্পের নিকটেই বাজার অবস্থিত হইলে শিল্পজাত-দ্রব্যের পরিবহণ-খরচ কমিয়া যায়। বৃটেন, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শীতের প্রকোপ অত্যধিক বলিয়া পশমী দ্রব্যের চাহিদা অত্যন্ত বেশী; সেইজন্য এই সকল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পশমবয়নশিল্প স্থাপিত হইয়াছে। জনসংখ্যা এবং ইহাদের ক্রয়ক্ষমতার উপর চাহিদা নির্ভরশীল। এইজন্য জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলে শিল্প-কারখানার আধিক্য দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী দেশসমূহের শিল্পোন্নতির ইহাও একটি প্রধান কারণ। বৈদেশিক বাজারে চাহিদা মিটাইবার জন্য বহু শিল্প-কারখানা বন্দরের নিকটে স্থাপিত হয়। কলিকাতার পাট-শিল্প ইহার নিদর্শন। এইভাবে দেখা যায়, চাহিদার উপর অথবা বিক্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তিতার উপরও শিল্প-কারখানার অবস্থান কিয়দংশে নির্ভরশীল।

বর্তমান যুগে পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় সবসময় দেশের চাহিদা অনুসারে শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয় না। আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুমান করিয়া শিল্প স্থাপিত হয়। জাপানের

কার্পাসবয়নশিল্প, কলিকাতার পাটশিল্প, বৃটেনের যন্ত্রপাতি শিল্প, স্থানীয় চাহিদার উপর মোটেই নির্ভরশীল নহে; এই সকল শিল্প আন্তর্জাতিক চাহিদার উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য বর্তমান যুগে স্থানীয় চাহিদা বা বাজারের নিকট-বর্তিতা শিল্প-কারখানার অবস্থান-নির্ণয়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে না।

(ছ) মূলধন (Capital)—যে-কোন শিল্প-স্থাপনের জন্য প্রয়োজন মূলধন। জমি ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে, কারখানা-নির্মাণে, কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদের যোগান দিতে শিল্প-স্থাপনের প্রাথমিক অবস্থায় প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। সমৃদ্ধিশালী দেশের মানুষ নিজেদের আয় হইতে সঞ্চয় করিয়া মূলধনের সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু অনুন্নত দেশের মানুষ গরীব বলিয়া অর্থ-সঞ্চয় করিতে পারে না; ইহার ফলে মূলধনের অভাব দেখা যায়। এইজন্যই সমৃদ্ধিশালী দেশসমূহে (উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি) মূলধনের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। পৃথিবীর অধিকাংশ শিল্প এই কারণে এই সকল সমৃদ্ধিশালী দেশে উপস্থিত হইয়াছে। সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার কর্তৃক শিল্প স্থাপিত হয় বলিয়া মূলধন প্রধানতঃ সরকারী তহবিল হইতে সরবরাহ করা হয়।

শিল্প-কারখানা স্থাপনের এই সকল উপাদান ছাড়াও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা, ভৌগোলিক স্থিতিপ্রবণতা (Inertia), স্থানীয় সরকারের শিল্পনীতি, করপ্রথা ও আইন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুবন্দোবস্ত, পেটেন্ট রক্ষা করিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি শিল্প-কারখানা-স্থাপনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

শ্রমশিল্পের অবস্থান সম্বন্ধে আধুনিক তত্ত্ব (Modern Theory on Industrial Location)—উপরিবর্ণিত উপাদানগুলি যদিও মোটামুটি শিল্পস্থাপনের কারণ নির্দেশ করে, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে এই সকল উপাদান শিল্পস্থাপনের প্রকৃত কারণ নির্দেশ করে না। যেমন, ল্যাঙ্কাশায়ারে ও ওসাকায় কাঁচামাল (তুলা) না পাওয়া গেলেও কার্পাসবয়নশিল্পের উন্নতি হইয়াছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোটেই রেশম পাওয়া না গেলেও, এই দেশের প্যাটারসন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রেশমবয়নশিল্পকেন্দ্র; জাপান ও বৃটেনে পর্যাপ্ত পশম পাওয়া না গেলেও এই সকল দেশ পশমবয়নশিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। রাশিয়ার ম্যাগনিটোগর্স্ক অঞ্চলে বা মস্কো অঞ্চলে কোক-কয়লা পাওয়া না গেলেও এই সকল অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিট্সবার্গে লৌহ আকরিক পাওয়া না গেলেও

ইহা এই দেশের শ্রেষ্ঠ ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্র। রাশিয়ার মস্কো অঞ্চলে এবং ভারতের কলিকাতা অঞ্চলে তুলা পাওয়া না গেলেও, এই সকল স্থান কার্পাসবয়নশিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

এইভাবে দেখা যায় যে, কাঁচামাল বা শক্তিসম্পদ না থাকিলেও পৃথিবীর বহুস্থানে সুন্দরভাবে বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ হইবার কারণ কি? উপরে বর্ণিত উপাদানসমূহ এই কারণনির্দেশে অক্ষম। সেইজন্য বর্তমান যুগের ভৌগোলিকগণ ও অর্থনীতিবিদ্‌গণ নূতনভাবে এই কারণ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অধ্যাপক **আলফ্রেড ওয়েবার (Alfred Weber)** নামক জার্মানীর একজন অর্থনীতিবিদের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন শিল্পের অবস্থান-নির্ণয়ের কারণসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ বহুলাংশে সঠিক।

ওয়েবারের মতে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালসমূহকে* প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(ক) **সর্বত্র প্রাপ্তব্য (Ubiquitous) কাঁচামাল**; যেমন, বায়ু, জল, বালি, সূর্যকিরণ ইত্যাদি এবং (খ) **স্থানীয়-করণের উপযোগী (Localized)** কাঁচামাল; যথা, কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ আকরিক, তুলা, পাট, পশম, রেশম, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি। প্রথমোক্ত ধরনের কাঁচামাল শিল্পের অবস্থানে কোনও প্রভাব বিস্তার করে না; কারণ ইহা সর্বত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর কাঁচামাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পের অবস্থান-নির্ণয়ে প্রভাব বিস্তার করে; কারণ এই সকল কাঁচামাল শিল্পের সন্নিকটে পাওয়া না গেলে পরিবহণের জন্য অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কাঁচামাল সকল সময় শিল্পের অবস্থান-নির্ণয়ে একই প্রকার প্রভাব বিস্তার করে না। ইহা বুঝিবার জন্য অধ্যাপক ওয়েবার এইজাতীয় কাঁচামালকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) **অপরিশুদ্ধ বা ওজন-হ্রাসপ্রাপ্ত (Impure or weight-losing) কাঁচামাল** এবং (২) **খাঁটি (Pure or non weight-losing) কাঁচামাল**।

যে সকল কাঁচামাল শিল্পজাত দ্রব্যে রূপান্তরিত হইবার পর ওজনে বিশেষ কমে না, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং এই সকল **খাঁটি কাঁচামাল** বহুদূরে অবস্থিত বাজারের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত শিল্পেও ব্যবহার করা

* এখানে কাঁচামাল বলিতে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদ উভয়কেই বুঝাইবে।

যায় ; যেমন, রেশম, পশম বা তুলা শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত হইবার পরেও ওজনে বিশেষ কমে না। সেইজন্য এই সকল কাঁচামালের সাহায্যে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত, কিন্তু বাজারের নিকটবর্তী স্থানে (Market-localized) শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর। বৃটেন ও জাপানের পশমবয়নশিল্প, প্যাটারসনের রেশমশিল্প, ল্যাঙ্কাশায়ার, কলিকাতা ও ওসাকার কার্পাসবয়নশিল্প প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। পশমের প্রধান উৎপাদক অঞ্চল অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে, কিন্তু পশমের প্রধান বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জাপান প্রভৃতি দেশে। যেহেতু পশম বস্ত্রে পরিণত হওয়ার পরেও ওজনে বিশেষ কমে না, সেইজন্য কাঁচা পশম রপ্তানি এবং পশম-বস্ত্র রপ্তানির পরিবহণ-খরচ প্রায় একই হইবে। যেহেতু অস্ট্রেলিয়াকে শেষপর্যন্ত পশম-বস্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন বা জাপানে রপ্তানি করিতে হইবেই, সুতরাং তাহার পক্ষে কাঁচা পশম রপ্তানি করিয়া কোনও ক্ষতি হইবে না। পরন্তু বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশে কয়েকটি অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায় ; যেমন, স্থানীয় চাহিদা, যন্ত্রপাতি, সুনিপুণ শ্রমিক, মূলধন প্রভৃতির সহজলভ্যতা। সুতরাং এই সকল দেশের পক্ষে শিল্পজাত দ্রব্য (কার্পাস-বস্ত্র, রেশম-বস্ত্র, পশম-বস্ত্র প্রভৃতি) আমদানি করা অপেক্ষা খাঁটি কাঁচামাল আমদানি করিয়া নিজেদের শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা কম ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক। এইভাবে খাঁটি কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল শিল্পসমূহ বহুদূরে বাজারের নিকটেও স্থাপিত হইতে পারে।

অন্যদিকে **ওজন-হ্রাসপ্রাপ্ত কাঁচামাল** শিল্পস্থাপনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এইজাতীয় কাঁচামাল শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত হওয়ার পর ওজনে বহুলাংশে কমিয়া যায় ; যথা, ইক্ষু, লৌহ আকরিক প্রভৃতি। ১০০ মেঃ টন ইক্ষু হইতে মাত্র ১০।১২ মেঃ টন চিনি পাওয়া যায়। বাকী অংশ ছোবড়ায় রূপান্তরিত হয়। এই ক্ষেত্রে ইক্ষুর পরিবহণ-খরচ চিনির পরিবহণ-খরচের তুলনায় অনেক বেশী। সুতরাং ইক্ষুকে দূরে নিয়া শিল্পস্থাপন করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইয়া দাঁড়ায় ; এক্ষেত্রে কাঁচামালের নিকটেই শিল্প স্থাপন করা শ্রেয়। উত্তরপ্রদেশের চিনিশিল্প, জামসেদপুর ও ভিলাই-এর লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এই নীতির জলন্ত উদাহরণ। সুতরাং ওজন-হ্রাসপ্রাপ্ত কাঁচামালের ক্ষেত্রে শিল্প সাধারণতঃ কাঁচামালের নিকটেই স্থাপিত হয়।

ওয়েবারের শিল্পস্থাপন-তত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এমন স্থানে শিল্প স্থাপিত হওয়া উচিত যাহাতে মোট পরিবহণ-খরচ

(কাঁচামাল আনয়ন ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রেরণের খরচ) সবচেয়ে কম হয়; অর্থাৎ মোট উৎপাদন ও বিক্রয়ের খরচ সবচেয়ে কম হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবহণ-খরচ অত্যধিক সুলভ হইলে কাঁচামাল কিছুটা দূর হইতেও আনা যায়। আবার যদি একটি কাঁচামাল দূর হইতে আনিতে হয় এবং অন্য একটি কাঁচামাল নিকটে পাওয়া যায়, সেখানে দেখিতে হইবে মোট পরিবহণ-খরচ কিভাবে কম হয়। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিট্‌স্‌বার্গের ইস্পাতশিল্প দূরবর্তী হ্রদ অঞ্চলের লৌহ আকরিকের উপর নির্ভর করিয়া স্থাপিত হইয়াছে; কারণ হ্রদের মাধ্যমে অত্যন্ত সুলভে লৌহ আকরিক কয়লাখনির নিকটস্থ পিট্‌স্‌বার্গে আনা যায়। শিল্প-স্থাপনের বিষয় আলোচনা করিবার সময় সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, এমনভাবে শিল্প স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে শিল্পের সকল উপাদান-সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া পণ্যদ্রব্য বাজারে পৌঁছানো পর্যন্ত মোট **পরিবহণ-খরচ সবচেয়ে কম (Minimum Transportation Cost)** হয়। ইহাই ওয়েবারের শিল্প-স্থাপন-নীতির প্রধান বক্তব্য বিষয়।

অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এই নীতির **ব্যতিক্রম (Deviation)** হইয়াছে। প্রথমতঃ, যে সকল শিল্পে কাঁচামাল ওজনে ভারী নহে এবং কাঁচামালের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় মানুষের কারিগরী শক্তিকে, সেই সকল শিল্প কাঁচামালের বহুদূরে শিল্পোন্নত ও কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী দেশে স্থাপিত হয়। জার্মানীর ঔষধ-শিল্প ইহার নিদর্শন। ঔষধ-শিল্পে কাঁচামালের চেয়ে অনেক বেশী খরচ হয় বৈজ্ঞানিকের জন্য, যন্ত্রপাতির জন্য এবং গবেষণার জন্য। এখানে কাঁচামাল খুব বড় ভূমিকা গ্রহণ করে না। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে শ্রমিকের মজুরি এত কম যে, দূরবর্তী স্থান হইতে কাঁচামাল আনিবার পরিবহণ-খরচও পোষাইয়া যায়, সেখানে সুলভ শ্রমিক-প্রাপ্তির অঞ্চলে শিল্প গড়িয়া ওঠে। জাপানে সুলভ শ্রমিকের জন্য, কাঁচামাল না থাকা সত্ত্বেও, কার্পাসবয়ন, পশমবয়ন, এমনকি লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। তৃতীয়তঃ, সরকারী প্রচেষ্টায় সামরিক ও শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য বহু শিল্প কাঁচামাল হইতে দূরেও স্থাপিত হয়; ভূপালের যন্ত্রশিল্প ইহার নিদর্শন।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে ওয়েবারের শিল্পস্থাপন-তত্ত্ব বিশেষভাবে বিচার করা দরকার। এই শিল্পে তিনটি বিষয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার লাভ করে—কয়লা, লৌহ আকরিক ও বাজার। অন্যান্য কাঁচামালের

(ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর প্রভৃতি) পরিমাণ কয়লা বা লৌহের তুলনায় অনেক কম বলিয়া এই সকল কাঁচামাল এই শিল্পের অবস্থানে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করে না।

মোটামুটিভাবে ১ টন ইস্পাতের জন্য প্রায় ৪ টন কয়লা ও ২ টন লৌহ আকরিক প্রয়োজন। সুতরাং প্রয়োজনীয় কয়লার ওজন অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া এই শিল্প কয়লাখনির নিকটে স্থাপিত হইলেই ভালো হয়; যেমন, ডোনেৎস অঞ্চল, রাণীগঞ্জ, দুর্গাপুর, পিট্‌স্‌বার্গ প্রভৃতি স্থানে কয়লাখনির নিকটে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দূরবর্তী স্থান হইতে কয়লা আনিয়া লৌহখনির নিকটেও এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কারণ, যখন কয়লাখনি অঞ্চলে দূরবর্তী স্থান হইতে লৌহ আনা হয়, তখন পরিবহণকারী রেলের বগী বা নৌকা খালি ফিরিয়া যায়। এই লোকসান বন্ধ করিবার জন্য ঐ খালি বগীতে বা নৌকায় কয়লা ভর্তি করিয়া লৌহখনি অঞ্চলে পাঠানো হয়। পরিবহণের এই 'দোলক-নীতি'র ফলে উভয় অঞ্চলেই এই শিল্প গড়িয়া ওঠে। রাশিয়ার ম্যাগনিটোগর্স্ক অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায় এবং কুজনেৎস্ক অঞ্চলে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। এইজন্য যে গাড়ী ম্যাগনিটোগর্স্ক হইতে লৌহ আকরিক লইয়া কুজনেৎস্ক অঞ্চলে যাইত, সেই গাড়ীতেই কুজনেৎস্ক অঞ্চল হইতে ম্যাগনিটোগর্স্কে কয়লা আনা হইত। ইহার ফলে উভয় অঞ্চলেই ইস্পাতশিল্প শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই পরিবহণ-ব্যবস্থার মধ্যপথেও শিল্প গড়িয়া ওঠে; যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লীভল্যাণ্ড, বাফেলো প্রভৃতি শহর পিট্‌স্‌বার্গ-মেসাবী পরিবহণ-ব্যবস্থার মধ্যপথে অবস্থিত বলিয়া এই সকল শহরে ইস্পাতশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সাধারণতঃ কয়লা বা লৌহ আকরিকের প্রাপ্তিস্থান অথবা ইহাদের মধ্যপথে গড়িয়া ওঠে; বাজারের নিকট এই শিল্প সাধারণতঃ গড়িয়া ওঠে না। কারণ কয়লা এবং লৌহ আকরিক উভয়েই ওজন-হ্রাসপ্রাপ্ত কাঁচামাল (Weight-losing material)।

শিল্পসমূহের শ্রেণীবিভাগ—ওয়েবারের শিল্পস্থাপন-তত্ত্ব অনুসারে বিচার করিলে, কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া পৃথিবীর শিল্পসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়:

(ক) ওজন-হ্রাসপ্রাপ্ত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল শিল্পসমূহ কাঁচামালের নিকটেই স্থাপিত হইয়াছে। এইক্ষেত্রে সর্বনিম্ন 'পরিবহণ-খরচ' কাঁচামালের

উপর প্রযোজ্য হইবে—বাজারের উপর নহে। যথা, ভিলাই-এর লৌহ ও ইস্পাতশিল্প।

(খ) খাঁটি কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল শিল্পসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পোন্নত বাজারের নিকটে প্রতিষ্ঠিত হয়। কার্পাসবয়ন, পশমবয়ন, চর্মশিল্প প্রভৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাজারের নিকট স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল শিল্প কাঁচামালের নিকটেও স্থাপিত হইয়াছে। যেমন, বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশের তূলাবলয়ে কার্পাসবয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

(গ) অল্প পরিমাণ কাঁচামালের সাহায্যে যে শিল্পে মূল্যবান্ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয়, সেই সকল শিল্প শিল্পোন্নত দেশে স্থানীয় উন্নত কারিগরীবিদ্যার সাহায্যে স্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে কাঁচামালের তুলনায় বৈজ্ঞানিক বা যন্ত্রের প্রভাব অনেক বেশী। জার্মানীর ঔষধ-শিল্প, সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি-শিল্প প্রভৃতি ইহার নিদর্শন।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চলসমূহ (Principal Industrial Region of the World)—বর্তমান যুগ শিল্পের যুগ। এই যুগে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠি শিল্পোন্নতি। এই শিল্পোন্নতি নির্ভর করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর। যে সকল দেশের উপরে বর্ণিত শিল্পের উপযোগী উপকরণসমূহ ও অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান, সেই সকল দেশ শিল্পে উন্নতিলাভ করিবে এবং যেখানে ইহার অভাব সেই সকল দেশ শিল্পে অনুন্নত থাকিয়া যাইবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের ইতিহাস ও গঠন-প্রণালী লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ, যেখানে শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ সুলভে পাওয়া যায় এবং যেখানে পরিবহণ-খরচ সবচেয়ে কম লাগে, সেখানে কোনও একটি বা দুইটি শিল্প গড়িয়া ওঠে। ক্রমশঃ ঐ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের পরিবারবর্গ ঐ স্থানে আসে। ইহার ফলে ঐ স্থানে বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়িয়া ওঠে। ইহা ছাড়া, প্রথমে স্থাপিত শিল্পজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য শিল্পও ঐ অঞ্চলে গড়িয়া ওঠে। ফলে অঞ্চলটি শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়।

শিল্পোন্নত পৃথিবীর মানচিত্র লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর অল্প কয়েকটি অঞ্চল শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান,

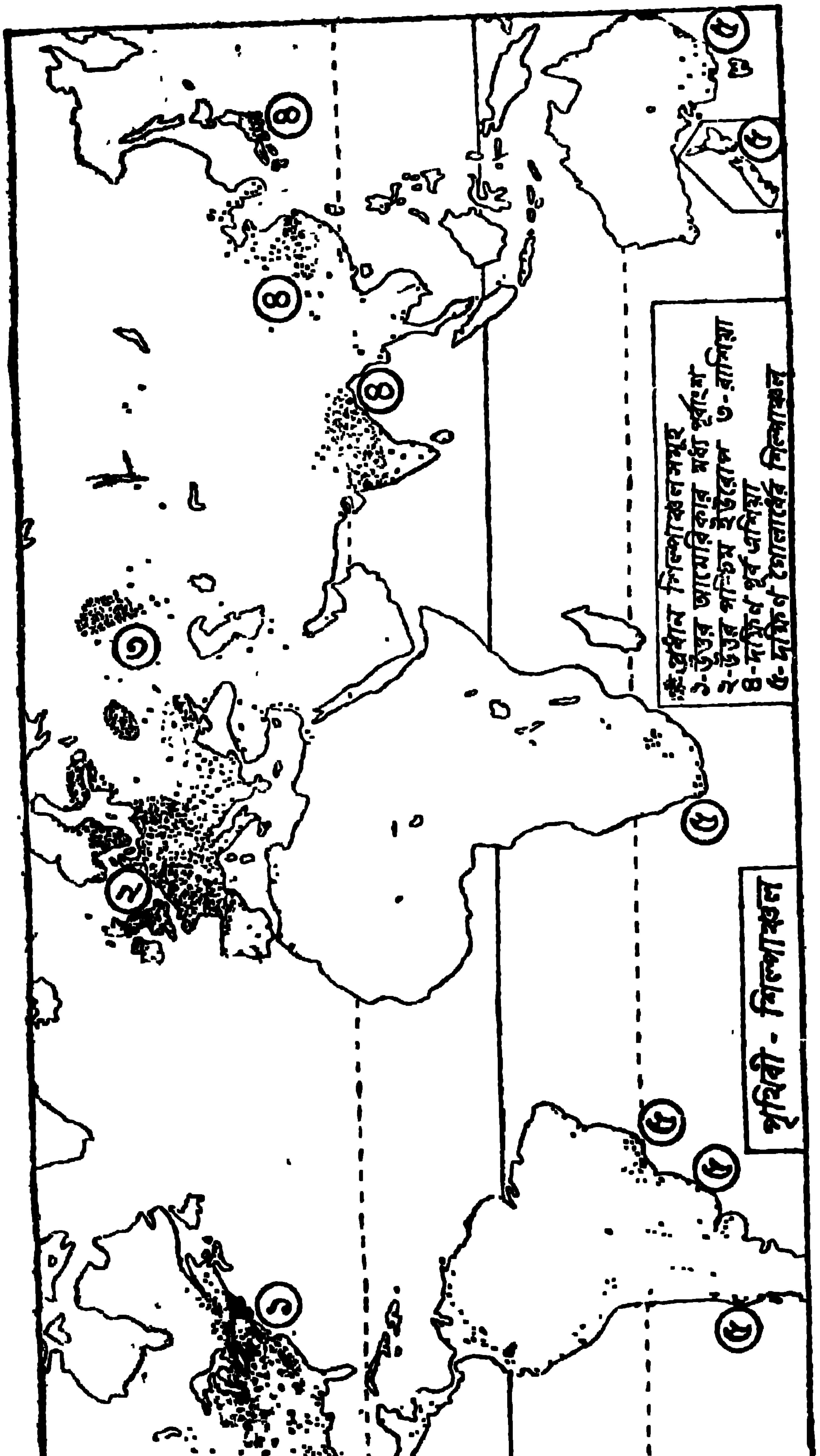

মানচিত্রে শিল্পাঞ্চলসমূহের মধ্যে যে সকল স্থানে কালো চিহ্ন দেওয়া আছে,
সেই সকল অঞ্চলে শিল্পের কেন্দ্রীভবন হইয়াছে।

বিশেষতঃ, দক্ষিণ গোলার্ধ শিল্পে অত্যন্ত অনুন্নত। নিম্নে পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চল সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :

(১) উত্তর আমেরিকার মধ্য-পূর্বাংশ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশ এবং কানাডার দক্ষিণ-পূর্বাংশ লইয়া এই শিল্পাঞ্চল গঠিত। **কানাডার** অধিকাংশ শিল্প এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই দেশের শিল্প সন্নিকটস্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়লা ও লোহের উপর নির্ভরশীল; অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন খনিজ সম্পদ ও কাষ্ঠ কানাডা হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজের শিল্পে নিয়োজিত করে। কানাডার বিভিন্ন শিল্প আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট চাহিদার উপর নির্ভরশীল। পঞ্চহ্রদ এই দুইটি দেশের শিল্পাঞ্চলের মধ্যভাগে অবস্থিত; ইহার ফলে উভয় দেশ সুলভ জলপথের সুবিধা ভোগ করে। কানাডার এই শিল্পাঞ্চলে এই দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই দেশের মণ্টিল ও টরণ্টো শহরেই অধিকাংশ শিল্প অবস্থিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ শিল্প দেশের পূর্বাংশে অবস্থিত। ইহার উত্তরাংশের নাম উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চল এবং দক্ষিণাংশের নাম দক্ষিণ-পূর্ব শিল্পাঞ্চল।

(ক) **উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চল** এই দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল। মেইন ও মেরীল্যাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে আইওয়া ও মিসৌরী পর্যন্ত এই শিল্পাঞ্চল বিস্তৃত। বাল্টিমোর, লুইস্‌ভিল ও সেণ্ট লুই ইহার দক্ষিণ সীমা। যদিও এই অঞ্চলের আয়তন সমগ্র দেশের আয়তনের এক-দশমাংশ, কিন্তু মূল্য হিসাবে মোট শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেকের বেশী লোক বাস করে। নিউ ইয়র্ক, পেনসিলভেনিয়া, ইলিনয় ও ওহিও রাজ্যে এই অঞ্চলের অধিকাংশ শিল্প অবস্থিত। শিল্পসমৃদ্ধ শহরের মধ্যে নিউ ইয়র্ক, চিকাগো, ডেট্রয়েট, ফিলাডেলফিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই অঞ্চলের শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে—হ্রদ অঞ্চলের লৌহ আকরিক, পেনসিলভেনিয়া ও মধ্য-সমভূমির কয়লা খনিজ তৈল ও গ্যাস, ভুট্টা-বলয়ের পশুসম্পদ (দুগ্ধজাত দ্রব্য, চর্ম, মাংস), ফল লাইনের জলবিদ্যুৎ, পঞ্চহ্রদের আভ্যন্তরীণ জলপথ, বিস্তীর্ণ রেলপথ, আটলান্টিক মহাসাগরের অপর তীরের ইউরোপ হইতে সুদক্ষ কর্মী ও মূলধন আমদানির সুযোগ, ঘন লোকবসতি, বনসম্পদের মূল্যবান্ কাষ্ঠ ও

উন্নত ধরনের বন্দর প্রভৃতি। এই অঞ্চলের আটলান্টিক উপকূল ভগ্ন হওয়ায় এবং উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাব থাকায় বন্দরনির্মাণ সহজসাধ্য হইয়াছে। হ্রদ অঞ্চলের ও নিউ ইয়র্ক অঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, নিউ ইংল্যাণ্ডের কার্পাসবয়নশিল্প, ফিলাডেলফিয়া ও ক্লীভল্যাণ্ডের পশমবয়নশিল্প, প্যাটারসনের রেশমবয়নশিল্প, ডেট্রয়েটের মোটর-গাড়ী-নির্মাণশিল্প, চিকাগোর মাংস-সংরক্ষণ ও রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণশিল্প জগদ্বিখ্যাত।

(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের **দক্ষিণ-পূর্ব শিল্পাঞ্চল** ভার্জিনিয়া হইতে আলাবামা রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত; উত্তর-পূর্ব-শিল্পাঞ্চলের পরেই ইহার স্থান।

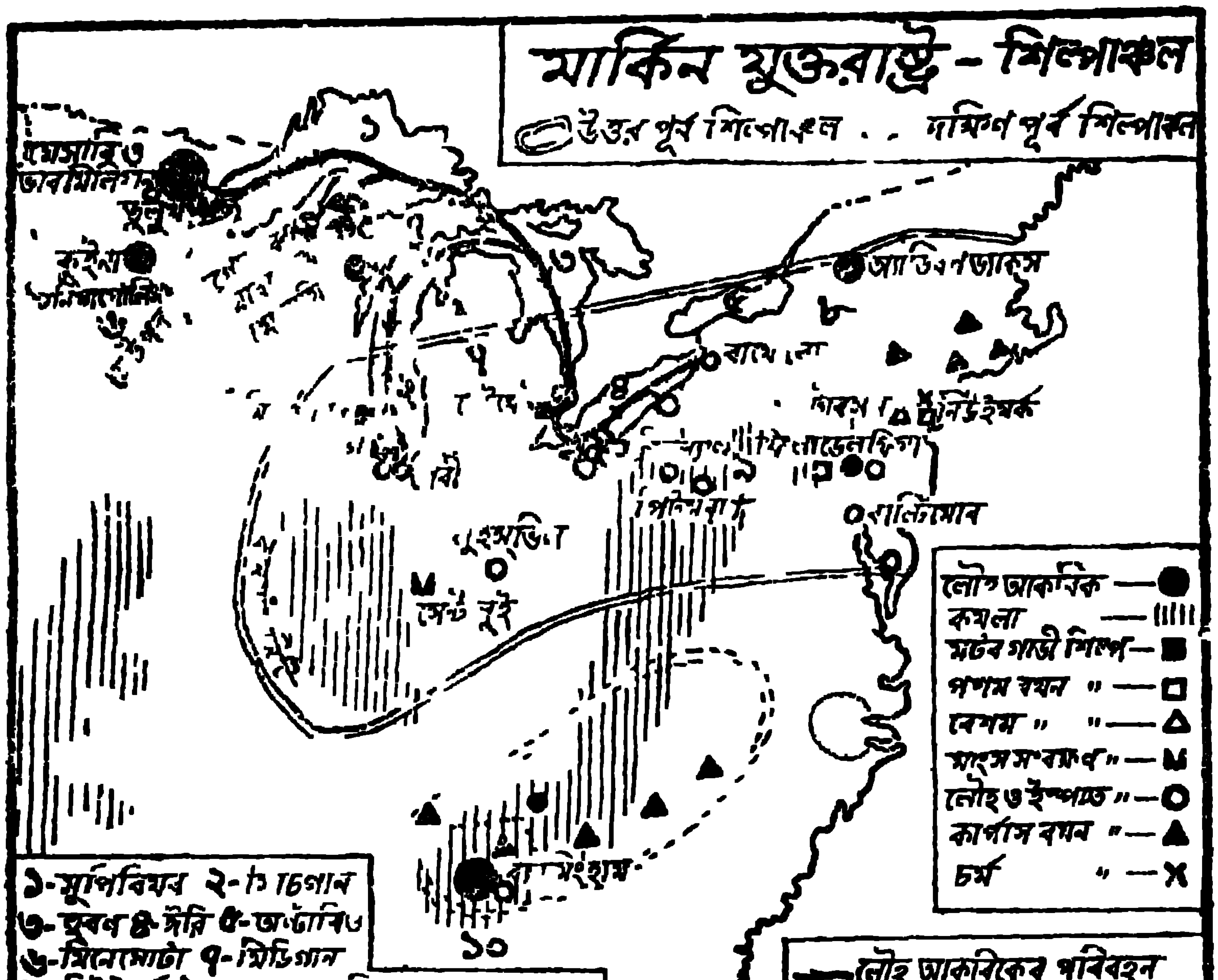

দক্ষিণ অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলের উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস্ কয়লা, খনিজ তৈল ও গ্যাস, টেনেসি উপত্যকার জলবিদ্যুৎ, আলাবামা রাজ্যের লৌহ আকরিক, তুলা-বলয়ের উৎকৃষ্ট তুলা, ভুট্টা-বলয়ের পশুসম্পদ এবং পাইন বনভূমির কাষ্ঠের অপর্যাপ্ত সম্ভার এই অঞ্চলের শিল্পোন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এই অঞ্চলের নিকটবর্তী আরকানসাসে এবং টেক্সাসে যথাক্রমে এই দেশের অধিকাংশ বক্সাইট ও সালফার পাওয়া যায়। পূর্বে ইউরোপীয়গণ এই

অঞ্চলের নিকটবর্তী ফ্লোরিডা রাজ্যে প্রথমে পদার্পণ করিয়া নিগ্রো ক্রীতদাস-গণের সাহায্যে এই অঞ্চলের উন্নতিসাধন করে। এখানকার নিগ্রো শ্রমিকগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। এই অঞ্চলের শিল্পোন্নতিতে ইহাদের যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। এই সকল অনুকূল অবস্থার জন্য এখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কার্পাসবয়নশিল্প, রেয়নশিল্প ও চিনিশিল্প প্রভৃতি উন্নতি লাভ করিয়াছে। বার্মিংহাম এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্র।

(২) উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ—বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে ও সুইডেনের দক্ষিণাংশ এবং চেকোশ্লোভাকিয়া লইয়া এই শিল্পাঞ্চল গঠিত। সর্বপ্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর এই অংশে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয়। সুতরাং এই অঞ্চল শিল্পে অত্যন্ত উন্নত হইবে ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। ইহা ছাড়া, এখানকার বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে কয়লা, লৌহ আকরিক ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ বিদ্যমান। শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী

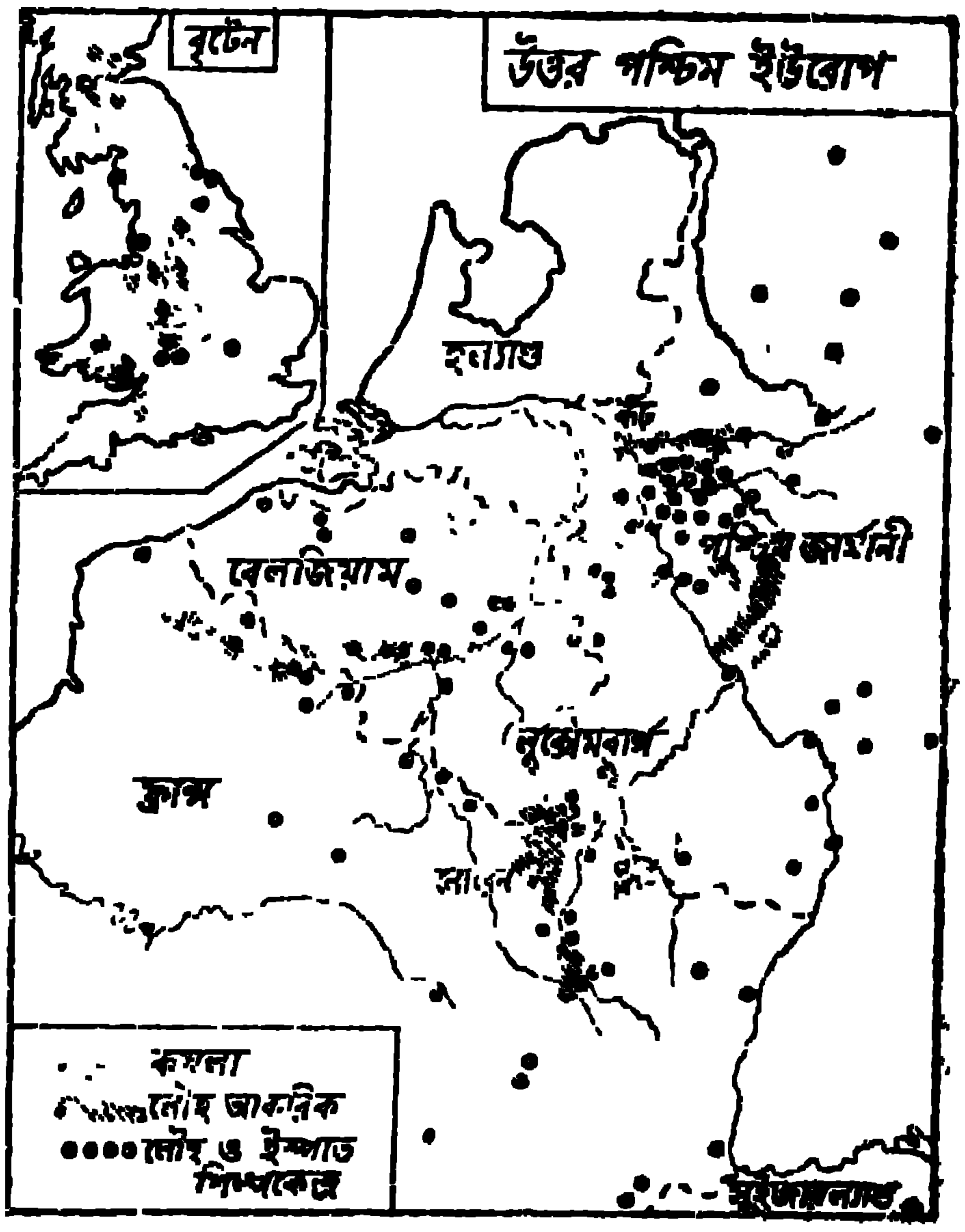

শিক্ষায় এই সকল দেশ খ্যাতিঅর্জন করিয়াছে। এই সকল দেশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত বলিয়া জলবায়ু শ্রমিকের কর্মদক্ষতা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। বৃটেন, জার্মানী, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার ফলে কাঁচামাল-সংগ্রহ ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের প্রচুর সুবিধা হইয়াছে। এই অঞ্চলের দেশসমূহ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া শিল্পজাত দ্রব্যের স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত বেশী। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির পক্ষে এই অঞ্চলের দেশসমূহে কোন অসুবিধা হয় না। ফ্রান্স ও জার্মানীতে

জলপথ উন্নতিলাভ করায় সুলভ পরিবহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানকার দেশসমূহে উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক বন্দর থাকিবার ফলে বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করা সহজসাধ্য হইয়াছে। এই অঞ্চলের অবস্থান পৃথিবীর মধ্যভাগে হওয়ায় পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা সহজ। এই সকল কারণে এই অঞ্চলের দেশসমূহ শিল্পে অত্যন্ত উন্নত। এই সকল দেশের সামগ্রিক উৎপাদন পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বেশী।

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহের অন্তর্গত **বৃটেনের** শিল্পাঞ্চলসমূহের মধ্যে উত্তর-পূর্ব ইংল্যাণ্ড, ক্লাইড উপত্যকা, বার্মিংহাম, ল্যাঙ্কাশায়ার, লণ্ডন ও দক্ষিণ ওয়েল্‌স বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দেশের এক একটি শিল্পাঞ্চল এক একটি শিল্পদ্রব্যের জন্য জগদ্বিখ্যাত। এখানকার শিল্প সাধারণতঃ কয়লার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত। রুঢ় **পশ্চিম জার্মানীর** প্রধান শিল্পাঞ্চল; স্থানীয় অপর্যাপ্ত কয়লা ও লোরেণ অঞ্চলের লৌহ আকরিক রুঢ়ের শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। **বেলজিয়ামের** অপর্যাপ্ত কয়লা ও **লুক্সেমবার্গের** লৌহ আকরিকের সাহায্যে উভয় দেশ শিল্পোন্নত হইয়াছে। **সুইজারল্যাণ্ড** সুলভ জলবিদ্যুতের সাহায্যে শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে। **ফ্রান্সের** লোরেণ অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লৌহভাণ্ডার। কয়লা অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া না গেলেও এই দেশ জলবিদ্যুতের সাহায্যে শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

(৩) রাশিয়া—রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই এই দেশের স্থান। বিপ্লবের ফলে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই দেশের শিল্পোন্নতি আরম্ভ হয়। পূর্বে ইউক্রেন অঞ্চলে এখানকার শিল্প সীমাবদ্ধ ছিল। কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদের নৈকট্য এবং আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি-অনুসারে এই দেশের শিল্প বিভিন্ন অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। (দ্বিতীয় খণ্ডে 'রাশিয়া'-র 'শক্তিসম্পদ ও কাঁচামাল এবং রাশিয়ার শিল্পপরিকল্পনা' এবং মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। রাশিয়ায় সাধারণতঃ ছয়টি প্রধান শিল্পাঞ্চল আছে:—

(ক) মস্কো-গোর্কি-টুলা অঞ্চল—কার্পাসবয়নশিল্প ও রসায়নশিল্পে এই অঞ্চল বিশেষ উন্নত। এই দেশের শতকরা ৯০ ভাগ কার্পাসবয়ন-শিল্প মস্কো অঞ্চলে অবস্থিত। আইভানোভ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কার্পাসবয়ন-কেন্দ্র। এই দেশের শতকরা ৬০ ভাগ রসায়নশিল্পও মস্কো অঞ্চলে অবস্থিত।

টুলা অঞ্চল লৌহশিল্পের জন্য বিখ্যাত। গোর্কি অঞ্চলে মোটর-শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। এই অঞ্চলের একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, এখানে কাঁচামাল ও কোক-কয়লার অভাব। বর্তমানে অন্যান্য অঞ্চল হইতে কাঁচামাল আনিয়া এবং স্থানীয় লিগ্‌নাইট কয়লা দ্বারা শিল্পের উন্নতিসাধন করা হইতেছে।

(খ) **লেনিনগ্রাড অঞ্চল**—কয়লাখনি অঞ্চল হইতে দূরে অবস্থিত হইলেও লেনিনগ্রাড একটি উৎকৃষ্ট বন্দর বলিয়া জলবিদ্যুতের সাহায্যে এখানে বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। মস্কো অঞ্চলের লিগ্‌নাইট কয়লাও এই অঞ্চলে আনা হয়। এখানে ধাতব শিল্প, ইলেক্‌ট্রিক যন্ত্রপাতি-শিল্প, কাগজ-শিল্প, জাহাজ-নির্মাণশিল্প, রসায়ন ও চর্ম শিল্প বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

(গ) **ইউক্রেন অঞ্চল**—ইহা রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল। এই দেশের শতকরা ৫৫ ভাগ ইস্পাত ও ৭০ ভাগ অ্যালুমিনিয়াম এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। এখানে প্রচুর চিনির কল, ময়দা ও চামড়ার কারখানাও আছে। এখানকার শিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে প্রচুর কয়লা ও লৌহের সরবরাহ; এই অঞ্চলের ডোনেৎস-উপত্যকায় এই দেশের শতকরা ৪০ ভাগ কয়লা এবং ক্রিভয় রগে সর্বাপেক্ষা বেশী লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্র-সমূহের মধ্যে নীপারপেট্রোভস্ক, ক্রিভয় ও স্টালিনগ্রাড (লৌহ ও ইস্পাত শিল্প), নীপারপেট্রোভস্ক (তাপবিদ্যুৎ ও যন্ত্রশিল্প), রস্টভ ও ওডেসা (কৃষি-যন্ত্রপাতি-শিল্প), কিয়েভ (চিনিশিল্প), ভরশিলভগ্রাড (রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণশিল্প) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) **ইউরাল অঞ্চল**—ইউক্রেন অঞ্চলের পরেই শিল্পোৎপাদনে এই অঞ্চলের স্থান। ক্রমশঃই এই অঞ্চল এত দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে যে, শীঘ্রই ইহা ইউক্রেন অঞ্চলকে ছাড়াইয়া যাইবে। ইউরাল অঞ্চলে রাশিয়ার শতকরা ২০ ভাগ লৌহ আকরিক এবং ৪৪ ভাগ খনিজ তৈল উৎপন্ন হয়। কুজনেৎস্ক অঞ্চলের সহায়তায় এই শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। কুজনেৎস্ক অঞ্চলে রাশিয়ার শতকরা ২২ ভাগ কয়লা পাওয়া যায়। ইউরাল অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায় না এবং কুজনেৎস্ক অঞ্চলে লৌহ আকরিক পাওয়া যায় না। পূর্বে ইউরাল অঞ্চল হইতে যে মালগাড়ীতে লৌহ আকরিক কুজনেৎস্ক অঞ্চলে যাইত, সেই গাড়ীতেই ঐ অঞ্চল হইতে ইউরাল অঞ্চলে কয়লা আনা হইত। পরিবহণের এই 'দোলক-নীতি'র (Pendulum principle)

ফলে উভয় অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই সকল শিল্পের পরিবহণ-খরচও কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে কারাগাণ্ডা অঞ্চলে কয়লাখনি এবং কুজনেৎস্ক অঞ্চলে লৌহখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় এই 'দোলক-নীতি'র প্রয়োজন বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ইউরাল অঞ্চলে রাশিয়ার শতকরা ২৫ ভাগ ইস্পাত উৎপন্ন হয়। ম্যাগ্‌নিটোগর্স্ক এখানকার শ্রেষ্ঠ ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্র। ইস্পাতশিল্প ছাড়াও ইউরাল অঞ্চলে রাসায়নিক শিল্প, রেল-ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি-শিল্প, অস্ত্রশিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান ও ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেলপথ এই শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানসমূহকে এবং এই শিল্পাঞ্চলের সহিত দেশের অন্যান্য স্থানকে সংযুক্ত করিয়াছে।

(২) **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া**—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে জাপান, চীন ও ভারত শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য দেশ এখনও শিল্পে অনুন্নত। **জাপান** বহুদিন পূর্বেই শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। স্থানীয় কয়লা, লৌহ আকরিক ও অন্যান্য কাঁচামালের উৎপাদন পর্যাপ্ত না হইলেও আমদানির উপর নির্ভর করিয়া এখানকার শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। এই দেশের শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে সুলভ জলবিদ্যুৎ, সুলভ ও নিপুণ শ্রমিক, উৎকৃষ্ট বন্দর ও পরিবহণ-ব্যবস্থা, বাণিজ্যের উপযোগী জাহাজের প্রাচুর্য, সুলভে শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা, পূর্বেকার জাপান সাম্রাজ্য ও অনুকূল জলবায়ু প্রভৃতি। এই দেশে প্রধানতঃ তিনটি শিল্পাঞ্চল বিদ্যমান; যথা, কোবে-ওসাকা, টোকিও-ইয়োকোহামা ও নাগাসাকি। ইহা ছাড়া, মুরোরাণ ও কামাইসি অঞ্চলেও কোন কোন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। জাপান প্রধানতঃ পর্বতসঙ্কুল দেশ বলিয়া যেখানে অল্প পরিমাণে সমতলভূমি পাওয়া গিয়াছে, সেখানেই কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে। এই তিনটি অঞ্চল সমতলভূমিতে অবস্থিত বলিয়া এবং ইহার সন্নিকটে উৎকৃষ্ট বন্দর থাকায় শিল্পোন্নতি সম্ভব হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশ শিল্পে অনুন্নত বলিয়া জাপান সহজেই এই সকল দেশে শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিতে পারে।

চীন কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও বিপ্লবের পর বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এই দেশ শিল্পে উন্নতি লাভ করিতেছে। স্থানীয় অপর্যাপ্ত কয়লা, লৌহ আকরিক ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ এবং তুলা, রেশম, পশম প্রভৃতি এখানকার শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। স্থানীয় ৬৭ কোটি লোকের অপর্যাপ্ত

চাহিদা শিল্পোৎপাদনে উৎসাহ সৃষ্টি করে। চীনা শ্রমিক অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও নিপুণ। রাশিয়ার কারিগরী সাহায্য ও যন্ত্রপাতি এখানকার বহু শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। এই সকল কারণে বিপ্লবের পর এখানে শিল্পের অভাবনীয় অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে। উত্তর চীন ও মধ্য চীনে অধিকাংশ বৃহদাকার শিল্প অবস্থিত। উত্তর চীনের পিকিং-তিয়েনসিং এবং লায়োনিং-এর আনশান অঞ্চলে অধিকাংশ শিল্প অবস্থিত। মধ্য চীনের সাংহাই ও হ্যাঞ্চাউ উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চল।

ভারত প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এখানকার কয়লা ও লৌহ আকরিক এবং কৃষিজ কাঁচামালের (তূলা, ইক্ষু প্রভৃতি) সাহায্যে শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। স্বাধীনতার পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। এই দেশের সুলভ শ্রমিক ও স্থানীয় ৪৪ কোটি লোকের চাহিদা শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। এই দেশের শিল্পাঞ্চল-সমূহের মধ্যে পূর্বাংশের শিল্পাঞ্চল, পশ্চিমাংশের শিল্পাঞ্চল উত্তরপ্রদেশ ও মাদ্রাজের শিল্পাঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বাংশের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে প্রচুর কয়লা ও লৌহ আকরিক পাওয়া যায় বলিয়া বৃহদাকার ধাতুশিল্প এই অঞ্চলে উন্নতি লাভ করিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের তূলার প্রাচুর্যের জন্য জলবিদ্যুতের সাহায্যে প্রধানতঃ কার্পাসবয়ন-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। মাদ্রাজের কোয়েম্বাটুরে কার্পাস-বয়নশিল্প এবং উত্তরপ্রদেশের কানপুর অঞ্চলে পশমবয়নশিল্প ও চর্মশিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে।

(৫) দক্ষিণ গোলার্ধের শিল্পাঞ্চল—কয়লার অভাবে দক্ষিণ গোলার্ধের অধিকাংশ দেশ শিল্পে অনুন্নত। রাজনৈতিক পরাধীনতা এখানকার শিল্পের অনুন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ; কারণ এখানকার পশম, তূলা প্রভৃতি কাঁচামাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি দেশের শিল্পে নিয়োজিত হয়। বর্তমানে দক্ষিণ গোলার্ধের কয়েকটি দেশে অল্পবিস্তর শিল্পোন্নতি লক্ষ্য করা যায়; যথা, দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বাংশের ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনা, মধ্য চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাংশ। এখানকার শিল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে স্থানীয় কাঁচামাল হইতে প্রধানতঃ ভোগ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়। ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের স্বার্থে এবং কয়লার অভাবে ভারী শিল্প এখানে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প
(The Iron and Steel Industry)

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পই সর্বপ্রধান শ্রমশিল্প। অন্যান্য শিল্পের উন্নতি ইহার উপর নির্ভরশীল; কারণ যন্ত্রপাতি ভিন্ন কোন শিল্প-কারখানা গড়িয়া ওঠে না। যন্ত্রপাতি-প্রস্তুতে এবং কারখানার গৃহাদি নির্মাণে লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজন। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি নির্ভর করে লৌহ ও ইস্পাতের সরবরাহের উপর; কারণ জাহাজ, রেলগাড়ী, রেল-লাইন প্রস্তুত করিতে লৌহ ও ইস্পাত প্রয়োজন। দেশরক্ষার জন্য যে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে হয় তাহাও ইস্পাতের উপর নির্ভরশীল। বাসগৃহ, আসবাবপত্র, এমনকি ইস্পাত প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিতেও লৌহ ও ইস্পাত প্রয়োজন। অন্যান্য ধাতব পদার্থ অপেক্ষা লৌহ ও ইস্পাত অনেক সুলভ বলিয়া অধিকাংশ শিল্পেই ইহা কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্তমান যুগে লৌহ ও ইস্পাত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এইজন্য বর্তমান যুগকে ইস্পাতের যুগ বলা যায় এবং লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনকে **শিল্পোন্নতির মাপকাঠি** বলিয়া ধরা হয়।

লৌহ আকরিক খনি হইতে তুলিয়া প্রাথমিক পরিশোধনের পর কোক-কয়লা (Coke), চুনাপাথর (Limestone) ও পুরাতন টুকরা লৌহখণ্ড (Scrap) প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া বাত-চুল্লীতে (Blast Furnace) গলাইলে চুনের সহিত গাদ ভাসিয়া ওঠে এবং লৌহের অংশ নীচে পড়িয়া থাকে। এই লৌহকে কাঁচা-লৌহ বলে। ইহাকে তপ্ত অবস্থায় ছাঁচে ঢালা হয়। পূর্বে এই ছাঁচের আকার শূকরের মতো ছিল বলিয়া এইপ্রকার লৌহকে পিগ্ আয়রণ বা **ঢালাই-লৌহ** (Pig Iron) বলে। এক মেঃ টন ঢালাই-লৌহ প্রস্তুত করিতে ১'৭ মেঃ টন লৌহ আকরিক, '৯ মেঃ টন কোক-কয়লা, ৪ মেঃ টন চুনাপাথর, '২ মেঃ টন পুরাতন লৌহ এবং ৪ মেঃ টন বায়ু (Air) প্রয়োজন। প্রতি মেঃ টন ঢালাই-লৌহের সঙ্গে ৬ মেঃ টন গ্যাস এবং '৫ মেঃ টন গাদ বাত-চুল্লী হইতে নির্গত হয়। উৎপন্ন ঢালাই-লৌহের অধিকাংশ ইস্পাত-উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং কিয়দংশ বাজারে বিক্রয় হয় এবং অন্যান্য শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ঢালাই-লৌহের সঙ্গে অল্প পরিমাণে

ম্যাঙ্গানিজ ও সিলিকন যোগ করিয়া বিভিন্ন পন্থায় সাধারণ **ইস্পাত** (Steel) প্রস্তুত হয়। বর্তমান যুগে ইস্পাত উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে: যথা, বেসিমার (Bessemer), প্রকাশ্য চুল্লী (Open Hearth), বৈদ্যুতিক চুল্লী (Electrical Furnace) ও মুষা পদ্ধতি (Crucible Proccss)। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে বর্তমান যুগে সাধারণ ইস্পাত অপেক্ষা সঙ্কর-ইস্পাতের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইস্পাত-প্রস্তুতের সময় ইহার সহিত অ্যালুমিনিয়াম, ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট, তাম্র, সীসা, মলিবডেনাম, নিকেল, রাং, ট্রাংস্টেন, ভ্যানাডিয়াম, দস্তা প্রভৃতি মিশাইয়া নানা প্রকারের **সঙ্কর-ইস্পাত** (Alloy Steel) প্রস্তুত হয়। এইজাতীয় ইস্পাত অত্যন্ত শক্ত হয় এবং উচ্চ তাপে ইহাকে ধারালো অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ইহাতে কখনও মরিচা ধরে না। বিভিন্ন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জন্য এইজাতীয় ইস্পাত একান্ত প্রয়োজন।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অবস্থান (Location of Iron & Steel Industry)—লৌহ ও ইস্পাত দেশের শিল্পোন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন। কারণ বহু শিল্পে ইহা কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং যন্ত্রপাতি-নির্মাণে ইহার প্রয়োজন হয়। এইজন্য পৃথিবীর সকল দেশ এই শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে; কিন্তু প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাবে অতি অল্পসংখ্যক দেশ এই শিল্পে উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। যে সকল দেশে এই শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ, শ্রমিক, চাহিদা, মূলধন ও পরিবহণ-ব্যবস্থা বিদ্যমান, সেই সকল দেশ প্রধানতঃ এই শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

লৌহ ইস্পাতশিল্পের জন্য প্রধানতঃ কয়লা, লৌহ আকরিক ও বাজার এই তিনটি উপাদান সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। কিন্তু এই তিনটির কোন্‌টির প্রাপ্তিস্থানের নিকট শিল্প স্থাপিত হইবে, তাহা বিশেষ বিচার্য বিষয়। শিল্পের অবস্থান সম্বন্ধে ৩২৫ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, যেখানে মোট পরিবহণ-খরচ সর্বাপেক্ষা কম হইবে, সেইখানেই এই শিল্প স্থাপিত হইবে। এই নীতি ইস্পাতশিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একটি উদহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। এক মেঃ টন ইস্পাত প্রস্তুত করিতে প্রায় ৪ মেঃ টন কয়লা ও ২ মেঃ টন লৌহ আকরিক প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক যে, **ক** নামক স্থানে কয়লা পাওয়া যায়, **খ** নামক স্থানে লৌহ আকরিক পাওয়া যায় এবং **গ** নামক স্থানে বাজার

অবস্থিত এবং তিনটি স্থানই সমান দূরে অবস্থিত। এক্ষেত্রে কোন্ স্থানে শিল্প স্থাপিত হওয়া উচিত? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যেখানে মোট পরিবহণ-খরচ সবচেয়ে কম হইবে, সেখানেই শিল্প স্থাপিত হইবে। এক্ষেত্রে

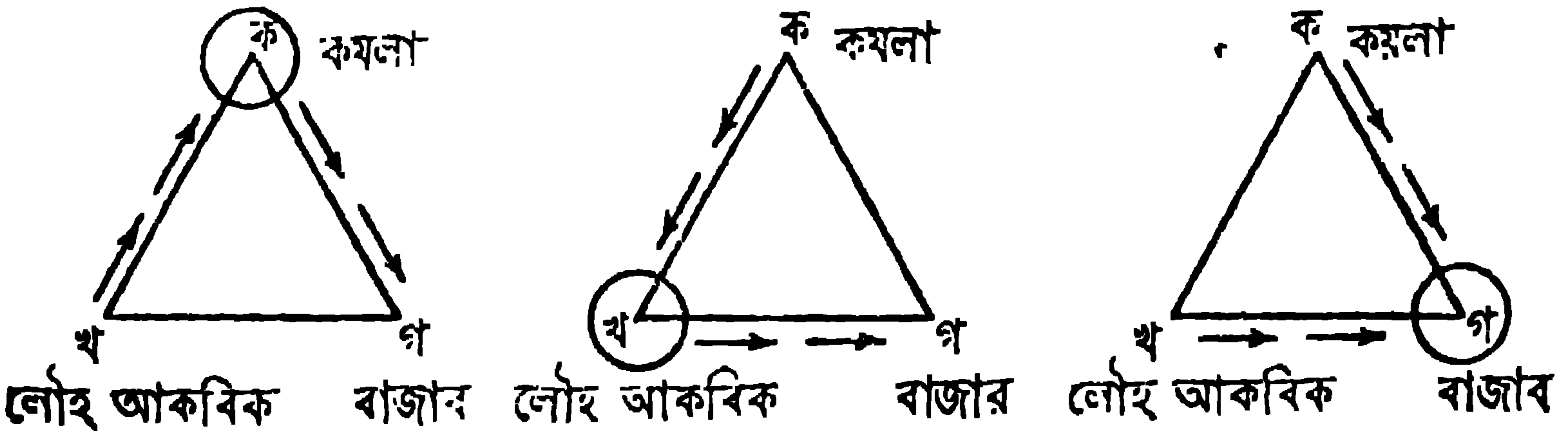

চিত্র ১ চিত্র ২ চিত্র ৩

যদি পরিবহণ-খরচ মেঃ টন-প্রতি দুই টাকা হয়, তাহা হইলে ১ মেঃ টন ইস্পাত-উৎপাদনের জন্য এইরূপ পরিবহণ-খরচ পড়িবে :

ক নামক স্থানে শিল্প স্থাপিত হইলে—২ × ২·০০ (লৌহ আকরিক শিল্প-কেন্দ্রে পাঠাইবার জন্য)
+ ১ × ২·০০ (ইস্পাত বাজারে পাঠাইবার জন্য)
= ৬·০০ টাকা। [চিত্র ১ দ্রষ্টব্য]।

খ " " —৪ × ২·০০ + ১ × ২·০০ = ১০·০০ টাকা [চিত্র ২ দ্রষ্টব্য]।

গ " " —৪ × ২·০০ + ২ × ২·০০ = ১২·০০ টাকা [চিত্র ৩ দ্রষ্টব্য]।

এখানে ক নামক স্থানে শিল্প স্থাপন করলেই পরিবহণ-খরচ সর্বাপেক্ষা কম হইবে এবং এইজন্য এখানেই শিল্প স্থাপিত হইবে।

এই কারণে পৃথিবীর বিখ্যাত ইস্পাতশিল্পকেন্দ্রসমূহ কয়লাখনির নিকটেই স্থাপিত হইয়াছে। পিটর্স্‌বার্গ, রুঢ়, বার্ণপুর, ভিলাই প্রভৃতি ইহার নিদর্শন।

কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এই শিল্প কয়লাখনি অঞ্চল ছাড়াও অন্যান্য স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। এই ব্যতিক্রমের কারণ সম্বন্ধে ৩২৭ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। ইস্পাতশিল্প সম্বন্ধে আরও একটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন; দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে বাজারের নিকটেও এই শিল্প স্থাপিত হয়। কারণ বর্তমান যুগে পুরানো লৌহ এই শিল্পের অন্যতম প্রধান কাঁচামাল। এই পুরানো লৌহ পাওয়া যায় বাজারের সন্নিকটে অর্থাৎ

যেখানে লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বাজারের নিকট শিল্প স্থাপিত হইলে একদিকে যেমন একটি কাঁচামাল পাওয়া যায়, অন্যদিকে শিল্পকেন্দ্র হইতে বাজারে মাল পাঠাইতে বিশেষ পরিবহণ-খরচ লাগে না। এই কারণে বর্তমানে বাজারের সন্নিকটেও এই শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। যেমন, জাপানের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। এইভাবে বর্তমান যুগে এই শিল্পের অবস্থান-নির্ণয়ে অনেক জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে।

পৃথিবীর ঢালাই-লৌহ ও ইস্পাত-উৎপাদন (১৯৬৪)

(লক্ষ মেঃ টন)

	ঢালাই-লৌহ	ইস্পাত		ঢালাই-লৌহ	ইস্পাত
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৭৮২	১১৫২	ফ্রান্স	১৬২	১৯৮
রাশিয়া	৬২৪	৮৫২	চেকোস্লোভাকিয়া	৫৩	৭৯
জাপান	২৪৩	৩৯৮	বেলজিয়াম	৮১	৭৬
পশ্চিম জার্মানী	২৭৩	৩৭৩	ভারত	৬৭	৬১
বৃটেন	১৭৬	২৬৭	অন্যান্য	২৬৯	৫১০
চীন	২০০	১৮৪	মোট	২৯৩০	৪১৫০

U. N. O.--Monthly Bulletin of Statistics, March. 1965 সংখ্যা হইতে সংগৃহীত (চীন বাদে)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.)—লৌহ আকরিক ও কয়লার অপর্যাপ্ত সম্ভার, হ্রদ অঞ্চলের সুলভ জলপথ ও রেলপথের সুবন্দোবস্ত এই দেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। হ্রদ অঞ্চলের লৌহ আকরিক হ্রদ ও খালের মাধ্যমে সুলভে পূর্বদিকের বিভিন্ন ইস্পাতশিল্পকেন্দ্রে আনীত হয় (৩৩২ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। বার্মিংহাম অঞ্চলে লৌহ ও কয়লাখনি-সমূহ প্রায় পাশাপাশি অবস্থিত। সমৃদ্ধিশালী, জনবহুল ও শিল্পপ্রধান দেশ বলিয়া এখানে লৌহ ও ইস্পাতের চাহিদার কোন অভাব নাই। বৈদেশিক বাজারেও এই দেশের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। এই দেশের কারিগরী শিক্ষার উন্নতি এবং নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু শ্রমিকের কর্মক্ষমতাবৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। এই সকল কারণে বর্তমানে এই শিল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। উত্তর আমেরিকার মোট ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা ৯৫ ভাগ এই দেশে উৎপন্ন হয়।

বিভিন্ন কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কয়লাখনি অঞ্চলে অবস্থিত। হ্রদসমূহের পূর্বাংশে বিখ্যাত অ্যাপালাচিয়ান কয়লাখনি এবং দক্ষিণাংশে মধ্যভাগের কয়লাখনিসমূহ অবস্থিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত লৌহখনিসমূহ হ্রদের পশ্চিমতীরে অবস্থিত। সেইজন্য সুলভ জলপথে লৌহ আকরিক হ্রদের মারফত অতি সহজেই কয়লাখনি অঞ্চলে আনা হয় (৩৩২ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। এই জলপথের পরিবহণ-খরচ রেলপথের খরচের $\frac{1}{10}$ ভাগ মাত্র। মূল্যের অনুপাতে কয়লাখনি অঞ্চল হইতে লৌহখনি অঞ্চলে কয়লা লইয়া যাওয়া অধিক ব্যয়সাধ্য; ইস্পাত-উৎপাদনে লৌহ অপেক্ষা কয়লা বেশী পরিমাণে প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া, ইস্পাতের চাহিদা দেশের পূর্বাংশেই অধিক বিদ্যমান। এই সকল কারণে কয়লাখনি অঞ্চলেই অধিকাংশ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাঞ্চল বার্মিংহামে কয়লা ও লৌহখনি পাশাপাশি থাকায় কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদের পরিবহণ-খরচ কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রধানতঃ চারিটি অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে (দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪৯ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য):

(ক) **পিট্স্‌বার্গ অঞ্চল**—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ লৌহ ও ইস্পাত এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লা ও হ্রদ অঞ্চলের লৌহ আকরিক এখানকার শিল্পে ব্যবহৃত হয়। পিটস্‌বার্গ ও ইয়ংস্‌টাউন এই অঞ্চলের বিখ্যাত ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্র। পিটস্‌বার্গ অঞ্চলে এই শিল্প প্রথম আরম্ভ করা হয় বলিয়া স্থানীয় একচেটিয়া শিল্পপতিগণ পিট্স্‌বার্গের মূল্যে ('Pittsburgh Plus') দেশের সকল ইস্পাত-ক্রয়কারিগণকে সকল অঞ্চলের ইস্পাত ক্রয় করিতে বাধ্য করে। ইহার ফলে অধিকাংশ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এখানে গড়িয়া ওঠে। এই অঞ্চলের শিল্পের উন্নতিতে কয়েকটি অসুবিধা বিদ্যমান; হ্রদ হইতে কিছুদূরে অবস্থিত হওয়ায় লৌহ আকরিক পুনরায় রেলপথে বা ছোট ছোট বার্জে করিয়া আনিতে হয়। ইহাতে পরিবহণ-খরচ বাড়িয়া যায়। প্রায় ১৬০ কিলোমিটার দূর হইতে রেলপথে চুনাপাথর আনিতে হয়। হ্রদসমূহ বৎসরে পাঁচ মাস বরফাচ্ছিত থাকায় এই পাঁচ মাসের প্রয়োজনীয় লৌহ আকরিক পূর্বে আনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখিতে হয়। এখানকার ইস্পাতশিল্পের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি অত্যন্ত পুরাতন বলিয়া প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না

পারায় কয়েকটি কারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই অঞ্চলের ইস্পাতশিল্পের ভবিষ্যৎ কি হইবে বলা কঠিন।

(খ) **হ্রদ অঞ্চল**—পৃথিবীর বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এই অঞ্চলে অবস্থিত। এখানকান শিল্প হ্রদ অঞ্চলের লৌহ আকরিক এবং অ্যাপালাচিয়ান ও মধ্যভাগের কয়লাখনির উপর নির্ভরশীল। মিচিগান হ্রদ-সন্নিহিত চিকাগো ও গেরী, ইরি হ্রদ-সন্নিহিত ডেট্রয়েট, বাফেলো, ক্লীভল্যাণ্ড, লোরেণ এবং সুপিরিয়ার হ্রদ-সন্নিহিত ডুলুথ প্রভৃতি স্থান লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানকার অধিকাংশ শিল্পকেন্দ্র হ্রদের তীরে অবস্থিত বলিয়া লৌহ আকরিক সোজা হ্রদ হইতে শিল্প-কারখানায় চালিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে পরিবহণ-খরচ অনেক কমিয়া যায়। বাফেলো অঞ্চলে নায়াগ্রা-জলবিদ্যুৎ সুলভে ব্যবহার করা যায়। ইরি হ্রদের অভ্যন্তরস্থ দ্বীপে এবং হুরণ হ্রদের পশ্চিমাংশে প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া যায়। ইহাও সুলভে জলপথে কারখানায় আনা হয়। হ্রদসমূহের অপর্যাপ্ত জল এখানকার শিল্পে ব্যবহৃত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানের সহিত এই অঞ্চল রেলপথে যুক্ত। চিকাগো এই দেশের বিভিন্ন রেলপথের সঙ্গমস্থল। সেণ্ট লরেন্স নদীর মারফত এই অঞ্চল হইতে জলপথে আটলান্টিক মহাসাগরে যাওয়া যায়। ইহার ফলে ইস্পাত-দ্রব্য রপ্তানি সহজসাধ্য হইয়াছে।

(গ) **পেনসিলভেনিয়া অঞ্চল**—আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে বাল্টিমোর, স্প্যারোজ পয়েণ্ট, মরিস্‌ভিল, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি স্থানে স্থানীয় কয়লা ও আমদানিকৃত লৌহ আকরিক ও টুকরা লৌহের সাহায্যে বড় বড় ইস্পাত-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। কানাডা, স্পেন, চিলি, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ হইতে লৌহ আনিয়া এই অঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়। পেনসিলভেনিয়া অঞ্চলের পূর্বাংশ হইতে চুনাপাথর এবং উত্তরাংশ ও মধ্যাংশ হইতে উৎকৃষ্ট কয়লা আনিয়া এখানকার শিল্পে নিয়োজিত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ শিল্পজাত দ্রব্য এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয় বলিয়া এখানকার বিভিন্ন শিল্পে প্রচুর ইস্পাত-দ্রব্য প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া, এখানকার জাহাজনির্মাণ-শিল্পের জন্যও প্রচুর ইস্পাত প্রয়োজন হয়।

(ঘ) **বার্মিংহাম অঞ্চল**—আলাবামা রাজ্যের এই অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক, কয়লা, চুনাপাথর ও ডোলোমাইট পাওয়া যায় বলিয়া

বার্মিংহাম বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় নিগ্রো শ্রমিক অধিক সময় কম মজুরিতে কাজ করে। পিট্‌সবার্গ ও হ্রদ অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রে শীতকালে হ্রদের মাধ্যমে লৌহ আনিতে না পারায় ৫ মাসের লৌহ মজুত করিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু বার্মিংহাম অঞ্চলের শিল্প-কেন্দ্রের নিকটেই লৌহখনি, চুনাপাথরের খনি ও কয়লাখনি অবস্থিত হওয়ায় এই সকল খনিজ দ্রব্য মজুত করিবার প্রয়োজন হয় না। বার্মিংহামের উত্তরাংশে ওয়ারিয়র কয়লাখনি এবং দক্ষিণাংশে লোহিত পর্বতের লৌহখনি এখানকার শিল্পের উন্নতিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। এই অঞ্চলের জল-পথ সারাবৎসর নাব্য হওয়ায় সর্বদা ইস্পাত-দ্রব্য নিকটবর্তী বন্দরে ও অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রে পাঠাইতে কোন অসুবিধা হয় না।

এই চারিটি অঞ্চল ছাড়াও কলোরাডো, ক্যালিফোর্ণিয়া, ইউটা প্রভৃতি রাজ্যে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

রাশিয়া (U. S. S. R.)—রাশিয়ায় অপর্যাপ্ত লৌহ ও কয়লা পাওয়া গেলেও বিপ্লবের পূর্বে এই দেশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। বিপ্লবের পর বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার ফলে এই দেশ অতি অল্পসময়ের মধ্যে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদকের স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমানে এই দেশ কয়লা, লৌহ আকরিক এবং ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে; সুতরাং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতিসাধনে কোন অসুবিধা হয় না। শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অবলম্বনের ফলে এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে; ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি অঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

(ক) **ইউক্রেন অঞ্চল**—ক্রিভয় রগ অঞ্চলের লৌহ আকরিক এবং ডোনেৎস অঞ্চলের কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজ এখানকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ইউক্রেন রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল বলিয়া এখানকার লৌহ ও ইস্পাতের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। এই দেশের মোট ইস্পাত উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। নীপারপেট্রোভস্ক, স্টালিনো ও খারকভ এখানকার উল্লেখযোগ্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র। (দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য।)

(খ) **ইউরাল অঞ্চল**—এখানকার ম্যাগনেট পর্বতে প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। পূর্বে কুজনেৎস্ক কয়লাখনি হইতে এখানে কয়লা আনা হইত;

যে গাড়ীতে কুজনেৎস্ক হইতে এখানে কয়লা আসিত, সেই গাড়ীতেই ইউরাল হইতে লৌহ কুজনেৎস্ক অঞ্চলে প্রেরিত হইত। পরিবহণের এই 'দোলক-নীতি'র (Pendulum principle) ফলে ইউরাল ও কুজনেৎস্ক এই উভয় অঞ্চলেই লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে কারাগাণ্ডা অঞ্চলে কয়লাখনি এবং কুজনেৎস্ক অঞ্চলের দক্ষিণে লৌহখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় এই 'দোলক-নীতি, অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ইউরাল অঞ্চলের অধিকাংশ কয়লা এখন আসে কারাগাণ্ডা হইতে। এই অঞ্চলের ম্যাগনেট পর্বতের নিকট অবস্থিত ম্যাগনিটোগস্ক' রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম-ইস্পাত উৎপাদনকেন্দ্র। এই অঞ্চলের নিজনি তাগিল, স্বার্দলোভস্ক, চোলিয়বিনস্ক, পার্ম প্রভৃতি স্থানেও ইস্পাতশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। রাশিয়ার প্রায় এক-চতুর্থাংশ ইস্পাত এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়।

(গ) **মস্কো অঞ্চল**—ইউক্রেনের লেহৈ ও কয়লার উপর নির্ভরশীল এই অঞ্চলেও লৌহ ও ইস্পাত শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। বর্তমানে স্থানীয় লিগ্‌নাইট হইতে কয়লার চাহিদা মিটানো হয়। মস্কো, টুলা, গোর্কি, ভরোনেজ প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য ইস্পাতশিল্পকেন্দ্র।

(ঘ) **দূরপ্রাচ্যের শিল্পাঞ্চল**—রাশিয়ায় শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের নীতির ফলে দূরপ্রাচ্যেও ইস্পাতশিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। স্থানীয় কয়লা ও লৌহ আকরিকের সাহায্যে বৈকাল হ্রদ অঞ্চলের ইরকুটস্ক ও পেট্রোভস্ক-জাবাইকালস্কি এবং আরও পূর্বে কমসোমোলস্কে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইহা ছাড়া, কুজনেৎস্ক অঞ্চলে স্থানীয় কয়লা এবং ইহার দক্ষিণে অবস্থিত গরনায়া শোরিয়া লৌহখনির সাহায্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ (North-West Europe)—অপর্যাপ্ত কয়লা ও লৌহ আকরিক থাকায় উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। শিল্প-বিপ্লব এই অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হওয়ায় কারিগরী বিদ্যায় সর্বপ্রথম উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে এবং ইহার ফলে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চল লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত। এখানকার অধিকাংশ স্থানে কয়লা ও লৌহ খনি

পাশাপাশি অবস্থিত থাকায় পরিবহণের খরচ অত্যন্ত কম হইলেও, শ্রমিকের মজুরি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে এখানে অপেক্ষাকৃত বেশী।

পশ্চিম জার্মানী উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লৌহ ও ইস্পাত-উৎপাদক দেশ। এখানকার রুঢ় অঞ্চল লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। বর্তমানে ইস্পাত-উৎপাদনে পশ্চিম জার্মানী পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। **ফ্রান্সের** লোরেণ লৌহখনি এবং রুঢ় অঞ্চলের কয়লাখনি প্রায় ১৫০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। উভয় দেশের কয়লা ও লৌহ উভয় দেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়। উত্তর ফ্রান্স হইতে আরম্ভ করিয়া **বেলজিয়াম** পর্যন্ত একটি বিস্তীর্ণ কয়লাখনি বিদ্যমান (৩৩৩ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। **লুক্সেমবার্গ** অঞ্চলের লৌহখনি এবং বেলজিয়ামের কয়লাখনির সাহায্যে বেলজিয়ামে বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম জার্মানী ও বেলজিয়ামকে অন্য দেশ হইতে প্রচুর লৌহ আমদানি করিতে হয়। এই সকল দেশে সুন্দর রেলপথ, জলপথ ও রাজপথ বিদ্যমান থাকায় পরিবহণের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। আটলান্টিক মহাসাগর নিকটবর্তী বলিয়া ইস্পাত-দ্রব্য রপ্তানি করা এবং লৌহ ও অন্যান্য কাঁচামাল আমদানি করা সহজ। এই অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল বলিয়া লৌহ ও ইস্পাতের স্থানীয় চাহিদাও অত্যধিক। বর্তমানে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, লুক্সেমবার্গ, হল্যাণ্ড ও ইটালি একটি **সাধারণ বাজারে** (European Common Market) পরিণত হওয়ায় একদেশ হইতে অন্যদেশে কয়লা ও বিভিন্ন কাঁচামাল বিনাশুল্কে আমদানি করা যায়। ইহার ফলে এই সকল দেশের শিল্পের আরও উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। এই সকল দেশের শিল্পপতিগণ একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া সমমূল্যে লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে।

বৃটেন ১৮৯০ সাল পর্যন্ত লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেও বর্তমানে এই দেশ চতুর্থ স্থানে নামিয়া আসিয়াছে। এই দেশের ইস্পাতশিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে লৌহ ও কয়লার পাশাপাশি অবস্থান, পেনাইন অঞ্চলের চুনাপাথর, শিল্পাঞ্চলের নিকটবর্তী উৎকৃষ্ট বন্দর এবং উপনিবেশের একচেটিয়া বাজার। সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল দেশ বলিয়া আভ্যন্তরীণ চাহিদাও অত্যন্ত বেশী। এই দেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

সমুদ্রতীরে ও দেশের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত। স্থানীয় লৌহ আকরিক, চুনাপাথর ও বনভূমির কাঠকয়লার উপর নির্ভর করিয়া প্রথমে অভ্যন্তরভাগেই এই শিল্প গড়িয়া ওঠে। পরবর্তী কালে কয়লার ব্যবহার প্রচলন হইবার ফলে অভ্যন্তরভাগের ইস্পাতশিল্প আরও উন্নতি লাভ করে; এখানকার বিভিন্ন স্থান এক একটি ইস্পাত-দ্রব্যের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে। শেফিল্ড সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির জন্য এখনও জগদ্বিখ্যাত। অভ্যন্তরভাগের ব্ল্যাক কান্ট্রি অঞ্চলের বার্মিংহাম, কভেন্ট্রি, ডাড্‌লি, রেড্‌ডিচ ও শেফিল্ড লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ক্রমশঃ ইস্পাত-উৎপাদনের তুলনায় লৌহ আকরিকের উৎপাদন কমিয়া যাওয়ায় সুইডেন, ফ্রান্স, স্পেন, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে সমুদ্রোপকূলের বন্দরের মাধ্যমে লৌহ আমদানি হইতে থাকে। এই সময় সমুদ্রোপকূলে বড় বড় কয়লাখনি আবিষ্কৃত হয়। এই সকল কারণে বন্দরের নিকটবর্তী স্থানের কয়লাখনি অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠে। বর্তমানে বৃটেনের শতকরা ৬০ ভাগ ঢালাই-লৌহ ও ইস্পাত সমুদ্রোপকূলের শিল্পকেন্দ্রে উৎপন্ন হয়; ইস্পাত-দ্রব্য-রপ্তানিতে ও জাহাজ-নির্মাণে এই সকল শিল্পকেন্দ্র উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। সমুদ্রোপকূলের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রের মধ্যে উত্তর-পূর্ব উপকূলের হার্টল্‌পুল ও মিডলস্‌বরো, স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো, ওয়েল্‌সের লান্‌লে, সোয়ান্‌সি ও কার্ডিফ, উত্তর-পশ্চিম উপকূলের ব্যারো বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

• **এশিয়া (Asia)**—পৃথিবীর অধিকাংশ লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত হয় ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশসমূহে। সুতরাং এশিয়ার দেশসমূহের ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অনেক কম—পৃথিবীর মোট উৎপাদনের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ। এই মহাদেশের জাপান, চীন ও ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। বৈদেশিক প্রভাবের অধীনে থাকিবার ফলে ভারত ও চীন এতদিন এই শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে না পারিলেও বর্তমানে স্বাধীন সরকার এই সকল দেশের ইস্পাতশিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি-সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছে।

জাপান লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই শিল্পের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ লৌহ ভারত, ফিলিপাইন, মালয় প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি হয়। কোক উৎপাদনের উপযোগী উৎকৃষ্টশ্রেণীর কয়লাও এই দেশকে আমদানি করিতে হয়। সুলভ ও নিপুণ শ্রমিক, উৎকৃষ্ট বন্দর,

জাহাজনির্মাণ-শিল্পের উন্নতি ও আভ্যন্তরীণ চাহিদার জন্য উৎকৃষ্টশ্রেণীর কয়লা ও লৌহ আকরিকের অভাব থাকিলেও, বর্তমানে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। উত্তর কিউসিউ অঞ্চলের ইয়াওয়াটা এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্র (দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪৯ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। ইহা ছাড়া, টোকিও-ইয়োকোহামা, কামাইসি, ওসাকা-কোবে, মুরোরাণ প্রভৃতি অঞ্চলেও এই শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমদানিকৃত লৌহের উপর নির্ভরশীল বলিয়া এই দেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সাধারণতঃ বন্দরের নিকটেই অবস্থিত।

চীন দেশে প্রচুর লৌহ আকরিক ও কয়লা সঞ্চিত থাকিলেও বিপ্লবের পূর্বে (১৯৪৯) এই দেশের ইস্পাত-উৎপাদন অত্যন্ত নগণ্য ছিল। বর্তমানে এই দেশ পৃথিবীতে ইস্পাত-উৎপাদনে সপ্তম স্থান অধিকার করে। চীনে উৎকৃষ্টশ্রেণীর কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই তুলনায় লৌহ আকরিকের পরিমাণ কম। সম্প্রতি শোনা যাইতেছে যে, বহু নূতন লৌহখনি চীনে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেইজন্য ১৯৫৩ সালের পর বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে চীন লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিতেছে। নূতন খনি আবিষ্কার করিয়া, নূতন শিল্প নির্মাণ করিয়া, পুরাতন শিল্পের উদ্ধারসাধন করিয়া, পরিবহণের সুবন্দোবস্ত করিয়া এই দেশ ইস্পাতশিল্পের দ্রুত উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৫২ সালে এই দেশে ১৩·৫ লক্ষ মেঃ টন ইস্পাত উৎপন্ন হইত, কিন্তু ১৯৬২ সালে এই ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হয় ১ কোটি ২০ লক্ষ মেঃ টন। আরও আশ্চর্যের বিষয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই লক্ষ্য ছড়াইয়া উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায়। একটি অনুন্নত দেশে এত দ্রুত শিল্পোন্নতির ইতিহাস পৃথিবীতে আর দেখা যায় নাই।

এই দেশের উত্তর ও মধ্য-পূর্বাঞ্চলে অধিকাংশ কয়লা ও লৌহ আকরিক পাওয়া যায় বলিয়া মাঞ্চুরিয়ায় আনশান অঞ্চলে এবং ইয়াংসি নদীর নিম্ন-উপত্যকায় অধিকাংশ ইস্পাতশিল্প স্থাপিত হইয়াছে (দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইহার মধ্যে আনশান সর্বাপেক্ষা বড় ইস্পাতশিল্পকেন্দ্র এবং এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাতশিল্পকেন্দ্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও পুনরায় ইহার সংস্কারসাধন করা হইয়াছে। ফুসান, পেনশিহ ও ফুসিন অঞ্চলের কয়লা, স্থানীয় লৌহ আকরিক ও চুনাপাথর

এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিতেছে। মাঞ্চুরিয়ার বিভিন্ন ইস্পাতশিল্পে চীনের শতকরা ৪০ ভাগ লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হয়। শান্‌সির ইয়াংচুয়ানে ইয়াংসি উপত্যকার হ্যাঙ্কাও ও সাংহাই শহরে বহুদিন পূর্বেই এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। তায়ে অঞ্চলের লৌহ আকরিক এবং হোনান অঞ্চলের কয়লার সাহায্যে হ্যাঙ্কাও-এর বিখ্যাত ইস্পাতশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া, জেচোয়ান-এর চুংকিং শহরে, সুইয়ানের পাওটোতে এবং শান্‌টুং-এ ইস্পাত-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। চীনের ইস্পাতশিল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লৌহখনির নিকট এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতে ১৯০৭ সালে প্রথম ইস্পাতশিল্প স্থাপিত হইলেও, এই শিল্পের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয় স্বাধীনতার পর। ভারতে লৌহ আকরিক, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই দেশ বর্তমানে শিল্পোন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়ায় লৌহ ও ইস্পাত-দ্রব্যের চাহিদাও প্রচুর। রাশিয়া, জার্মানী, বৃটেন প্রভৃতি দেশ হইতে কারিগরী সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত সরকার এই শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং এই দেশ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে শীঘ্রই আরও উন্নতি লাভ করিবে ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। ভারতের অধিকাংশ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কয়লা ও লৌহ খনির নিকট দেশের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। জামসেদপুর, দুর্গাপুর, বার্ণপুর, ভিলাই, রাউরকেলা প্রভৃতি এই দেশের উল্লেখযোগ্য ইস্পাতশিল্পকেন্দ্র।

দক্ষিণ গোলার্ধের অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল, চিলি প্রভৃতি দেশে এই শিল্প কিছুটা উন্নতিলাভ করিলেও ইহাদের উৎপাদনের পরিমাণ নগণ্য।

বাণিজ্য (Trade)—লৌহ ও ইস্পাত বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা লাভ করায় ঐ সকল দেশে ক্রমশঃই শিল্পোন্নতির চেষ্টা হইতেছে। ইহার ফলে যন্ত্রপাতির তথা লৌহ ও ইস্পাতের চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারত, চীন প্রভৃতি দেশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতি হইতেছে; এই সকল দেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্যও প্রচুর যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুন্নত দেশসমূহের শিল্পোন্নতির জন্য বর্তমানে বিভিন্ন লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য সরবরাহ করিতেছে। এই সকল দেশের শিল্পোন্নতির চরম বিকাশ হইবার পর ইউরোপ ও মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বাজার কিছুটা সংকুচিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

বর্তমানে বেলজিয়াম, বৃটেন, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি দেশ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে। ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ইরাণ, ইরাক, মিশর প্রভৃতি দেশ প্রচুর পরিমাণে লৌহ ও ইস্পাত-দ্রব্য আমদানি করে।

পূর্তশিল্প The (Engineering Industry)

শিল্পে কারিগরী প্রগতির প্রবেশদ্বার হইল যন্ত্রপাতি-নির্মাণ। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জেট বিমান, সেরা টার্বোড্রিল, পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র, আন্তঃ-মহাদেশীয় রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ এবং ইঞ্জিনীয়ারগণের অন্যান্য কীর্তিকলাপের ভিত্তি হইল বিকশিত পূর্তশিল্প। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প হইতে ঢালাই-লৌহ ও ইস্পাত পাওয়া যায়, তাহা বিভিন্ন পূর্তশিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কৃষি-যন্ত্রপাতি শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, মোটর-গাড়ী, বিমানপোত, জাহাজ ও রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণ পূর্তশিল্পের অন্তর্গত। পূর্তশিল্প লৌহ ও ইস্পাতের উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল বলিয়া লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে উন্নত দেশসমূহে পূর্তশিল্প প্রধানতঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিদ্যার উন্নতির উপরও এই শিল্পের উন্নতি নির্ভরশীল। এইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ, জাপান, চীন, ভারত প্রধানতঃ এই শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

কৃষি-যন্ত্রপাতি (Agricultural implements)

পৃথিবীতে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজ সম্পদের উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এইজন্য মানুষ কৃষিক্ষেত্র হইতে অধিক শস্য উৎপন্ন করিবার জন্য কৃষি-জমিতে কৃষি-যন্ত্রপাতি প্রয়োগের বন্দোবস্ত করিয়াছে। শিল্পোন্নত দেশে শিল্পে শ্রমিকের সরবরাহ বজায় রাখিবার জন্য কৃষিক্ষেত্র হইতে লোক সরাইয়া শিল্পে নিযুক্ত করিতে হয়। কৃষিক্ষেত্রে কম লোকের সাহায্যে কৃষিকার্য করিতে হইলে কৃষি-যন্ত্রপাতির একান্ত প্রয়োজন। হেক্টর-প্রতি উৎপাদন-বৃদ্ধিতেও যন্ত্রপাতি প্রভূত সাহায্য করে। এইজন্য শিল্পপ্রধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স

প্রভৃতি দেশে আধুনিক কৃষি-যন্ত্রপাতির উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল কৃষি-যন্ত্রপাতির মধ্যে ট্রাক্টর, হারভেস্টার বা ফসল-কাটার যন্ত্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য অনুন্নত দেশে এখনও সাধারণ লাঙ্গল ও কাস্তের সাহায্যেই কৃষিকার্য চালানো হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of Production)—কৃষি-যন্ত্রপাতি-উৎপাদনে **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ১৮৪৫ সালে এই দেশে প্রথম ফসল-কাটা যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। চিকাগো, নিউ ইয়র্ক, ওহিও প্রভৃতি অঞ্চলে প্রথম কৃষি-যন্ত্রপাতি শিল্প স্থাপিত হয়। কৃষিকার্যে এই দেশ অত্যন্ত উন্নত বলিয়া কৃষি-যন্ত্রপাতির চাহিদা অত্যন্ত বেশী। এখানকার কাঁকরবর্জিত সমতলভূমিতে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা অত্যন্ত সহজ। কৃষিকার্যে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন-খরচ কম হয় বলিয়া সুলভে কৃষিজ দ্রব্য বিক্রয় হয় এবং চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল বলিয়া এই দেশের কৃষি-যন্ত্রপাতি শিল্প প্রথমে আটলান্টিক উপকূলে আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ এই শিল্প লৌহ ও ইস্পাতের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এবং প্রেইরী অঞ্চলে কৃষিকার্যের উন্নতি হওয়ায়, বর্তমানে ইলিনয়, উইস্‌কনসিন, ইণ্ডিয়ানা, মিচিগান, আইওয়া, মিনেসোটা, মিসৌরী, কেণ্টুকী, ওহিও প্রভৃতি রাজ্যে এই শিল্পের একদেশীভবন (Localisation) হইয়াছে। এই সকল রাজ্যে এই দেশের শতকরা ৯০ ভাগ কৃষি-যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হয়। কয়লা, লৌহ আকরিক এবং ইস্পাতশিল্প এই সকল রাজ্যের নিকটেই অবস্থিত। এখানকার বিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চলে কৃষি-যন্ত্রপাতির চাহিদা অত্যন্ত বেশী।

রাশিয়া বর্তমান যুগে কৃষিকার্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত। এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে কৃষিকার্যে যন্ত্রপাতির অত্যধিক ব্যবহার। বিপ্লবের পর দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য স্থানীয় সমাজতান্ত্রিক সরকার কৃষি-যন্ত্রপাতি উৎপাদনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। ইহার ফলে কৃষি-যন্ত্রপাতির উৎপাদন ১৯৬১ সালে ১৯১৭ সালের তুলনায় ১০০ গুণ বৃদ্ধি পায়। অপর্যাপ্ত কয়লা, লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন, কৃষি-অঞ্চলের প্রচুর চাহিদা এবং সরকারী উদ্যোগ এই শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণ। কয়লা ও লৌহ খনির নিকটবর্তী খারকোভ, স্টালিনগ্রাড ও চেলিয়াবিনস্ক কৃষি অঞ্চলের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় ট্রাক্টর-নির্মাণশিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইউক্রেন-শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত জাপোরোজে, রস্টভ ও সারাক্টোভ এবং মস্কোর নিকটস্থ ল্যুবার্টসি কম্বাইন-

হারভেস্টার-নির্মাণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। ওমস্ক ও তাশখণ্ড অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কৃষি-যন্ত্রপাতি-শিল্পকেন্দ্র।

কানাডা কৃষিকার্যে উন্নতি লাভ করিয়াছে প্রধানতঃ কৃষি-যন্ত্রপাতির সাহায্যে। এই দেশের অন্টারিও উপদ্বীপ ও সেণ্ট লরেন্স অববাহিকায় প্রাধনতঃ কৃষি-যন্ত্রপাতি-নির্মাণশিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। স্থানীয় বনজ সম্পদের সাহায্যে পূর্বে এই শিল্প স্থাপিত হইলেও বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানিকৃত লৌহ ও কয়লার উপর এই শিল্প নির্ভরশীল। স্থানীয় চাহিদা এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশসমূহে এই শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। অল্প-পরিসর স্থানে অধিক শস্য উৎপন্ন করিতে হয় বলিয়া এই সকল দেশে কৃষি-যন্ত্রপাতি অত্যধিক হারে ব্যবহৃত হয়। ইহার মধ্যে **বৃটেনের** কৃষি-যন্ত্রপাতি শিল্প প্রথমে শুরু হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে বৃটেনের আধিপত্য, স্থানীয় ইস্পাতশিল্পের উন্নতি, কয়লার প্রাচুর্য এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু এই দেশের কৃষিকার্য অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া কৃষি-যন্ত্রপাতির স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় এই শিল্প বহুলাংশে রপ্তানির উপর নির্ভরশীল ছিল। সেইজন্য এই শিল্প প্রধানতঃ বন্দরের নিকটবর্তী স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে। ডরচেস্টার, গ্রান্থাম, ডিলমারনক, ডাগেনহাম, লীড্স্ প্রভৃতি এই শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে বৃটেনের কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য বহু কৃষি-যন্ত্রপাতি স্থানীয় চাহিদা মিটাইতে নিয়োজিত হইতেছে।

জার্মাণীর কৃষি-যন্ত্রপাতি-শিল্প প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে কাঁচামালের নিকটবর্তী স্থানে; ডুসেলডর্ফ, ম্যাগডেবার্গ, লিপজিগ প্রভৃতি এই শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানী প্রচুর কৃষি-যন্ত্রপাতি বিদেশে রপ্তানি করিত। কিন্তু যুদ্ধের সময় বহু কারখানা ধ্বংস হওয়ায় এই শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে এখানকার অধিকাংশ কৃষি-যন্ত্রপাতি এই দেশের চাহিদা মিটাইতে নিয়োজিত হয়।

ইহার পর জাপান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও কৃষি-যন্ত্রপাতি উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে।

বাণিজ্য (Trade)—কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি-যন্ত্রপাতির চাহিদা অত্যন্ত বেশী; সেইজন্য এই সকল দেশ ইহা আমদানি করে। রপ্তানিকারকদের

মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই দেশের যন্ত্রপাতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং ইহার ছোটখাটো কলকব্জা সহজেই পাওয়া যায় বলিয়া সকল দেশেই ইহা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। কিন্তু ইউরোপের কৃষি-যন্ত্রপাতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা সস্তা বলিয়া অনুন্নত দেশে ইউরোপের যন্ত্রপাতির চাহিদা বেশী। আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ প্রচুর কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানি করে। কৃষকের আর্থিক অবস্থা এবং কারিগরী জ্ঞানের উপর কৃষি-যন্ত্রপাতির চাহিদা নির্ভরশীল বলিয়া এখনও বহু অনুন্নত দেশে ইহার ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

শিল্প-যন্ত্রপাতি (The Industrial Machinery)

বর্তমান যুগে কোন দেশের শিল্পোন্নতি নির্ভর করে সেই দেশের শিল্প-যন্ত্রপাতি-নির্মাণশিল্পের উপর। এই শিল্পের উন্নতি আবার নির্ভর করে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের উপর। শিল্প-যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য প্রয়োজন লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কারিগরী শিক্ষার সুবন্দোবস্ত এবং চাহিদা। সাধারণতঃ শিল্পপ্রধান দেশসমূহে এই সকল উপকরণ থাকায় ইহারা শিল্প-যন্ত্রপাতি-নির্মাণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছে। লঘু যন্ত্রপাতি সাধারণতঃ কয়লা ও ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্রের নিকট স্থাপিত হইলেও ভারী যন্ত্রপাতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ সকল যন্ত্রপাতি-ব্যবহারকারী শিল্পের নিকটেই স্থাপিত হইয়াছে। সেইজন্য দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাসাচুসেট্‌স ও পূর্ব পেনসিলভেনিয়া কার্পাস ও পশমবয়ন যন্ত্রপাতি-নির্মাণশিল্পে এবং কলোরাডো ও পশ্চিম পেনসিলভেনিয়ার খনি অঞ্চল খনি-যন্ত্রপাতি-নির্মাণ-শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। মানুষের প্রয়োজনে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইবার দিন হইতে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির উৎপাদনও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমানে যে সকল শিল্প-যন্ত্রপাতি নির্মিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, কার্পাসবয়ন-যন্ত্রপাতি, পশমবয়ন-যন্ত্রপাতি, কাষ্ঠদ্রব্য নির্মাণের যন্ত্রপাতি, লেদ, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে কারিগরী উন্নতির ফলে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি উৎপাদনের বন্দোবস্ত হওয়ায় শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যাহ্রাস পাইয়াছে এবং উৎপাদন-খরচ বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of Production)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিল্প-যন্ত্রপাতি-উৎপাদনে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই দেশের

উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চলে এই দেশের শতকরা ৯০ ভাগ শিল্প-যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ওহিও, ইলিনয়, মিচিগান, নিউ ইয়র্ক ও পেনসিলভেনিয়া এই পাঁচটি রাজ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ ব্যবহারকারী শিল্পের নিকটেই বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি-নির্মাণশিল্প স্থাপিত হইয়াছে।

রাশিয়া শিল্প-যন্ত্রপাতি-উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বিপ্লবের পরে এই দেশের শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-যন্ত্রপাতি নির্মাণের সুব্যবস্থা হয়; ১৯১৭ সাল অপেক্ষা ১৯৬১ সালে ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি পায় প্রায় ২০০ গুণ। শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের ফলে যন্ত্রপাতি-নির্মাণ-শিল্প ছড়াইয়া পড়িয়াছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। মস্কো, পেট্রোগ্রাড, ইউক্রেন, ইউরাল, দূরপ্রাচ্য, ট্রান্স-ককেশাস্, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর শিল্প-যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হয়।

বৃটেনে শিল্প-যন্ত্রপাতি নির্মিত হয় বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে। বয়ন-যন্ত্রপাতি-নির্মাণে এই দেশ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলে অধিকাংশ কার্পাসবয়ন-যন্ত্রপাতি নির্মিত হয় এবং স্থানীয় বয়নশিল্পে নিয়োজিত হয়। ইয়র্কশায়ার অঞ্চলে পশমবয়ন-যন্ত্রপাতি নির্মিত হয়। ইহা ছাড়া, নটিংহাম, লিসেস্টার, ডাণ্ডি, বেলফাস্ট স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প-যন্ত্রপাতি-উৎপাদনে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

জার্মানী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে শিল্প-যন্ত্রপাতি-উৎপাদনে পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। যুদ্ধের সময় এই শিল্প কিছুটা বিধ্বস্ত হইলেও বর্তমানে জার্মানী পুনরায় যন্ত্রপাতি-নির্মাণশিল্পের উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। রুঢ় অঞ্চলেই অধিকাংশ শিল্প-যন্ত্রপাতি নির্মিত হয়। জাপান শিল্পোন্নত দেশ বলিয়া এশিয়ার শ্রেষ্ঠ যন্ত্রপাতি-উৎপাদক দেশ। ইটালি, ফ্রান্স, চেকোস্লোভাকিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, বেলজিয়াম, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশও শিল্প-যন্ত্রপাতি-উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

বাণিজ্য (Trade)—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কমবেশী শ্রমশিল্প বিদ্যমান। সুতরাং বহুদেশে শিল্প-যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়; কিন্তু ইহার উৎপাদন পৃথিবীর কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশে সীমাবদ্ধ। সেইজন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শিল্প-যন্ত্রপাতি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, রাশিয়া, বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া, জাপান, জার্মানী, ইটালি প্রভৃতি শিল্প-যন্ত্রপাতির উল্লেখযোগ্য রপ্তানিকারক। ভারত, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

দেশসমূহ, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ প্রধানতঃ শিল্প-যন্ত্রপাতি আমদানি করে।

রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণশিল্প (The Locomotive Industry)

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে রেল-ইঞ্জিন প্রয়োজন হইলেও ইহার উৎপাদন শিল্পপ্রধান কয়েকটি দেশে সীমাবদ্ধ। রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের জন্য প্রয়োজন প্রচুর লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কারিগরী শিক্ষার সুবন্দোবস্ত। রেল-ইঞ্জিন প্রস্তুতের পর ইহা নিজের চাকায় ভর করিয়া দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে যাইতে পারে বলিয়া সাধারণতঃ এই শিল্প কয়লা ও ইস্পাত শিল্পের নিকটেই গড়িয়া উঠে।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of Production)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রেলপথের দৈর্ঘ্যে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। সেইজন্য এই দেশ রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণেও পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই শিল্পের উন্নতির জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই দেশে পাওয়া যায়। বাষ্পীয় এবং বৈদ্যুতিক উভয় প্রকার ইঞ্জিন এখানে প্রস্তুত করা হয়। ইলিনয়, পেনসিলভেনিয়া, নিউ ইয়র্ক ও ওহিও রাজ্যে এই দেশের শতকরা ৮০ ভাগ রেল-ইঞ্জিন নির্মিত হয়। ফিলাডেলফিয়া, পিট্‌স্‌বার্গ, লিমা এই দেশের উল্লেখযোগ্য রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণকেন্দ্র।

রাশিয়া রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণে অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করিয়াছে। এই দেশের বিস্তীর্ণ ভূভাগে প্রচুর রেলপথ প্রয়োজন। বিপ্লবের পর এই দেশের রেলপথের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হইয়াছে। ইহার ফলে রেল-ইঞ্জিনের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহু রেলপথ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনে চালানো হয় বলিয়া বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দেশের অধিকাংশ রেল-ইঞ্জিন নির্মিত হয় বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে; তন্মধ্যে ইউক্রেন ও মস্কো অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী ইঞ্জিন নির্মিত হয়। উত্তর-পূর্ব ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশসমূহে, বিশেষতঃ জার্মানী, বৃটেন, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচুর রেল-ইঞ্জিন প্রস্তুত হয়। বর্তমানে চেকোস্লোভাকিয়া, জাপান, চীন ও ভারতেও রেল-ইঞ্জিন নির্মিত হইতেছে।

বাণিজ্য (Trade)—রেল-ইঞ্জিনের নির্মাণ প্রধানতঃ শিল্পোন্নত দেশে সীমাবদ্ধ থাকায় অনুন্নত দেশসমূহকে ইহা আমদানি করিতে হয়। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ রেল-ইঞ্জিনের প্রধান রপ্তানিকারক এবং আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলি প্রধান আমদানিকারক।

জাহাজ-নির্মাণশিল্প (The Ship-building Industry)

খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ সাল হইতে জাহাজ-চলাচল প্রচলিত আছে। প্রাচীন যুগে বাতাসের সাহায্যে কাষ্ঠনির্মিত জাহাজ চালানো হইত। শিল্প-বিপ্লবের পব বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হওয়ায় ক্রমশঃ জাহাজে বাষ্পীয় ইঞ্জিন ব্যবহৃত হইতে লাগিল এবং কাঠেব পবিবর্তে ইস্পাতের সাহায্যে জাহাজ নির্মিত হইতে লাগিল। এইজন্য বর্তমান যুগে অধিকাংশ জাহাজ-নির্মাণশিল্প লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের নিকটস্থ বন্দবে স্থাপিত হয়। এই শিল্পের উন্নতির জন্য ইস্পাত, কাঠ, যন্ত্রপাতি, প্রচুব মূলধন ও শ্রমিক ছাড়াও প্রয়োজন ভগ্ন সৈকত-রেখা, বন্দরের নিকটস্থ জলের গভীবতা, উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় প্রভৃতি। যে সকল দেশে এই সকল প্রয়োজনীয় উপাদান বিদ্যমান সেই সকল দেশ জাহাজ-নির্মাণে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতে হইলে নিজস্ব জাহাজের একান্ত প্রয়োজন। ভাবত রপ্তানির জন্য এখনও বৈদেশিক জাহাজের উপর নির্ভরশীল বলিয়া রপ্তানি-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণের উপর জাহাজ-নির্মাণের পরিমাণ নির্ভর করে; যুদ্ধের সময় জাহাজ-নির্মাণের পরিমাণ অস্বাভাবিক হাবে বৃদ্ধি পায় বলিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মালবাহী ও যুদ্ধ-জাহাজ-নির্মাণেব পরিমাণ শতকরা ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of Production)—প্রায় সকল দেশেই বৈদেশিক বাণিজ্য ও দেশরক্ষার জন্য জাহাজের প্রয়োজন হইলেও পৃথিবীর মাত্র ২১টি দেশে ইহার উৎপাদন সীমাবদ্ধ। যে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ এই শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজন তাহা সকল দেশে থাকা সম্ভব নহে। বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভর-শীলতার জন্য বহু দেশে সরকারী সাহায্যে এই শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। পূর্ব ভারতে জাহাজ নির্মিত হইত না; কিন্তু স্বাধীনতার পর সরকার এই শিল্পের উন্নতির জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ায় ক্রমশঃই এই দেশে জাহাজের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে।

পৃথিবীর জাহাজ-নির্মাণ—১০৪ লক্ষ GRT (১৯৬৪)

	(লক্ষ G. R. T.)		(লক্ষ G. R. T.)
জাপান	৪২	হল্যাণ্ড	৫.৭
বৃটেন	১০.৪	ফ্রান্স	৫.২
সুইডেন	১০	ইটালি	৩.৬
পশ্চিম জার্মানী	৯	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২.৮

Source—U. N. O. Monthly Bulletin, March, 1965

জাপান জাহাজ-নির্মাণশিল্পে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। স্থানীয় কাঠ, লৌহ ও ইস্পাত এবং কয়লার সাহায্যে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া এবং মৎস্য-শিকারের জন্য প্রচুর জাহাজের প্রয়োজন বলিয়া জাহাজ-নির্মাণের জন্য এখানকার সরকার সর্বদাই সচেষ্ট থাকে। স্থানীয় সুনিপুণ শ্রমিক এবং উৎকৃষ্ট বন্দর ও পোতাশ্রয় এবং ইহার নিকটস্থ ইস্পাতশিল্প এই শিল্পের উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে এই দেশ জাহাজ-নির্মাণে অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করে। যুদ্ধের শেষাংশে এই শিল্প বিধ্বস্ত হইলেও যুদ্ধের পরবর্তী অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান পুনরায় এই শিল্পে প্রাধান্য লাভ করে। টোকিও-ইয়োকোহামা, কোবে-ওসাকা এবং নাজিশিমোনোসেকি অঞ্চলেই অধিকাংশ জাহাজ নির্মিত হয়।

বৃটেন শিল্প-বিপ্লবের পর হইতেই বৈদেশিক বাণিজ্য ও জাহাজ-নির্মাণ-শিল্পে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। বনজ সম্পদের উপর প্রথম এই শিল্প নির্ভরশীল ছিল। বনভূমি হইতে কাঠের সরবরাহ কমিয়া যাওয়ায় কিছুদিনের জন্য এই শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হইলেও, এই শিল্পে লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহারের প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় জাহাজ-নির্মাণশিল্পের উন্নতি আরম্ভ হয়।

এই দেশের বিশাল সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য প্রচুর যুদ্ধ-জাহাজের প্রয়োজন হইত। বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া এই দেশের জাহাজের চাহিদা সর্বদাই অত্যন্ত বেশী। ইহা ছাড়া, ভগ্ন সৈকতরেখা, বন্দরের নিকটস্থ জলের গভীরতা, সুন্দর পোতাশ্রয়, উন্নত কারিগরী শিক্ষার বন্দোবস্ত এবং ইস্পাত, কয়লা ও কাঠের অপর্যাপ্ত সম্ভার এই দেশের জাহাজ-নির্মাণশিল্পের উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

স্থানীয় কাঠের উপর নির্ভর করিয়া টেম্‌স্‌ নদীর উপকূলে লণ্ডনে প্রথম জাহাজ-নির্মাণশিল্প স্থাপিত হইলেও বর্তমানে ইহা সরিয়া ইস্পাতশিল্পকেন্দ্রে চলিয়া গিয়াছে। বর্তমানে বৃটেনের পাঁচটি অঞ্চলে এই শিল্প প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে—ক্লাইড উপত্যকা, উত্তর-পূর্ব উপকূল, ব্যারো, বার্কেনহেড ও বেলফাস্ট অঞ্চল (দ্বিতীয় খণ্ডের ১৮ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। এই সকল অঞ্চলের মধ্যে ক্লাইড অঞ্চলে বৃটেনের মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ জাহাজ নির্মিত হয়।

জার্মানী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এই শিল্পে অত্যন্ত উন্নত ছিল। যুদ্ধের সময় ইহা বহুলাংশে বিধ্বস্ত হইলেও, বর্তমানে এই দেশ জাহাজ-নির্মাণে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। স্থানীয় ইস্পাত ও কয়লার অপর্যাপ্ত সরবরাহ, উৎকৃষ্ট বন্দর ও পোতাশ্রয়, বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি এই দেশের জাহাজ-নির্মাণশিল্পের উন্নতির প্রধান কারণ। রাশিয়া বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাহাজ-নির্মাণকারক। এই দেশে পারমাণবিক শক্তির সাহায্যেও জাহাজ চালানো হয় বলিয়া এই শিল্পের কারিগরী বিদ্যায় এই দেশ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ইস্পাত ও কয়লার প্রাচুর্য, সামরিক ও বাণিজ্যপোতের অপর্যাপ্ত চাহিদা, উৎকৃষ্ট বন্দর ও কারিগরী শিক্ষার সুবন্দোবস্তের ফলেই এই দেশ জাহাজ-নির্মাণশিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। কৃষ্ণসাগরের নিকট নিকলায়েভ ও সেবাস্তোপোলে এবং উত্তরাংশের লেনিনগ্রাড, মুরমানস্ক ও আরকাঞ্জেলস্কে, এবং দূরপ্রাচ্যে ভ্লাডিভস্টকে জাহাজ-নির্মাণশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইহা ছাড়া, হল্যাণ্ড, ইটালি, সুইডেন, নরওয়ে, স্পেন, ডেনমার্ক, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশেও এই শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে।

বাণিজ্য (Trade)—অনুন্নত দেশসমূহ জাহাজ আমদানি করে প্রধানতঃ শিল্পোন্নত জাহাজ-নির্মাণকারী দেশসমূহ হইতে। বৃটেন জাহাজ-রপ্তানিতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে; জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশও রপ্তানি-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে। আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে ভারত, চীন, ব্রহ্মদেশ এবং আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অনুন্নত দেশসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মোটর-গাড়ী-নির্মাণশিল্প (The Automobile Industry)

১৮৮৪ সালে জার্মানীর জেপ্‌লার প্রথম মোটর-গাড়ী নির্মাণের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন। এই শিল্প প্রধানতঃ লৌহ ও ইস্পাত, কাষ্ঠ, কয়লা, উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কারিগরী শিক্ষার বন্দোবস্তের উপর নির্ভরশীল। •চাহিদা এই শিল্পে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। মোটর-গাড়ী প্রচলনের জন্য প্রয়োজন স্থানীয় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা। মোটর-গাড়ী উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদান থাকিলেও ইউরোপীয় দেশসমূহে স্থানীয় চাহিদার অভাবে এই শিল্পের উৎপাদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা বেশী নহে। দেশের শুল্কনীতির উপরও এই শিল্পের উন্নতি নির্ভরশীল।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of Production)—মোটর-গাড়ী-নির্মাণে প্রধানতঃ সমৃদ্ধিশালী দেশসমূহ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। মোটর-গাড়ী প্রধানতঃ দুই প্রকারের—যাত্রিবাহী এবং মালবাহী গাড়ী।

পৃথিবীর মোটর-গাড়ী-নির্মাণ—২'২ কোটি (১৯৬৪)

(লক্ষ)

	যাত্রিবাহী	মালবাহী		যাত্রিবাহী	মালবাহী
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৭৭'৮	১৫'৪	জাপান	৫'৪	১২
পঃ জার্মানী	২৬'৫	২'৫	রাশিয়া	১'৮	৭'৫
বৃটেন	১৮'৭	৪'৬	কানাডা	৫'৬	'৭
ফ্রান্স	১৩'২	২'৬	অস্ট্রেলিয়া	২'২	'৩
ইটালি	১০'৬	'৭			

Source—U, N. O. Monthly Bulletin, March, 1965

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোটর-গাড়ী-নির্মাণে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৪৮ ভাগ মোটর-গাড়ী এই দেশে উৎপন্ন হয়। এই শিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে হেনরী ফোর্ডের উদ্যোগ এবং সুলভমূল্যে অল্পলাভে সাধারণ লোকের নিকট মোটর-গাড়ী-বিক্রয়। ইহার ফলে এই দেশে গড়ে প্রতি ৪ জন লোকে একখানা করিয়া মোটর-গাড়ী ব্যবহার করে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সাধারণ লোকের মধ্যে মোটর-গাড়ীর এত জনপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয় না। ইহা ছাড়া, মোটর-গাড়ী-নির্মাণের সকল প্রকার উপাদান এই দেশে বিদ্যমান। কারিগরী শিক্ষার বন্দোবস্ত, কয়লা

ও ইস্পাতের সরবরাহ, যন্ত্রপাতির উৎপাদন, বনভূমি হইতে উৎকৃষ্ট কাঠের সরবরাহ প্রভৃতি এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। হ্রদ অঞ্চলে এই শিল্পের একদেশীভবন হইয়াছে। ইরি হ্রদের তীরে অবস্থিত ডেট্রয়েট পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মোটর-গাড়ী-নির্মাণকেন্দ্র। হ্রদ-সন্নিহিত মিচিগান রাজ্যে এই দেশের শতকরা ৫৩ ভাগ, ওহিও রাজ্যে ১০ ভাগ, ইণ্ডিয়ানা রাজ্যে ১০ ভাগ, উইসকন্‌সিন রাজ্যে ৪ ভাগ এবং ইলিনয় রাজ্যে ৩ ভাগ মোটর-গাড়ী উৎপন্ন হয়। মধ্য-সমভূমির কয়লা, ওহিও-ইণ্ডিয়ানার খনিজ তৈল, হ্রদ অঞ্চল ও পিট্‌স্‌বার্গ অঞ্চলের ইস্পাত, স্থানীয় উন্নতধরনের যন্ত্রপাতি, স্থানীয় সুনিপুণ শ্রমিক হ্রদ অঞ্চলে এই শিল্পের একদেশীভবনে সাহায্য করিয়াছে। ডেট্রয়েট ছাড়াও হ্রদ অঞ্চলের মিলওয়াকি, চিকাগো, ক্লীভল্যাণ্ড, বাফেলো প্রভৃতি শহর এবং আটলান্টিক উপকূলের ফিলাডেলফিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য মোটর-নির্মাণ-শিল্পকেন্দ্র।

পশ্চিম ইউরোপের জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি, বৃটেন প্রভৃতি দেশে মোটর-গাড়ী নির্মাণশিল্পের উপযোগী সকলপ্রকার ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেও এবং জার্মানীতে প্রথম মোটর-গাড়ী আবিষ্কৃত হইলেও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে এই শিল্পের উন্নতি কয়েকটি কারণে ব্যাহত হইয়াছে। এখানকার সাধারণ লোকের গড় আয় কম বলিয়া গাড়ীর চাহিদা বেশী নহে। বিদেশে এই সকল দেশের আধিপত্য থাকিলেও, উপনিবেশের মানুষের গাড়ী ক্রয় করিবার ক্ষমতা অত্যন্ত কম; শিল্পোন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোটর-গাড়ীর আমদানির উপর উচ্চহারে শুল্ক বসাইবার জন্য ইউরোপের দেশসমূহের রপ্তানি-বাণিজ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এখানকার মোটর-গাড়ীর খরচ অত্যন্ত বেশী হওয়ায় উচ্চমূল্যে ইহা বিক্রয় হইত. ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ চাহিদা সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোটর-গাড়ী-নির্মাণশিল্পে নিযুক্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পশ্চিম জার্মানী, ইটালি, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে তাহাদের শাখা স্থাপন করায় এই চারিটি দেশ বর্তমানে পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ গাড়ী উৎপন্ন করে; ইহারা বর্তমানে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ২৭ ভাগ মোটর-গাড়ী উৎপন্ন করে।

রাশিয়া মোটর-গাড়ী-উৎপাদনে ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতেছে। এখানে যাত্রিবাহী গাড়া অপেক্ষা মালবাহী গাড়ী অধিক উৎপন্ন হয়।

ইস্পাত, কারিগরী শিক্ষার বন্দোবস্ত, কয়লা, কাঠ প্রভৃতি মোটর-গাড়ী নির্মাণের উপযোগী যাবতীয় উপাদান এই দেশে বিদ্যমান। এই দেশের গোর্কি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মোটর-গাড়ী-নির্মাণকেন্দ্র। ইহা ছাড়া, মস্কো, রস্টভ, নীপারপেট্রোভস্ক, গারোস্লেভ, ওমস্ক, মিয়াস প্রভৃতি শহরেও মোটর-গাড়ী নির্মিত হয়। •

জাপানের মোটর-গাড়ী-নির্মাণশিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে স্থানীয় কাষ্ঠ-সম্পদ, কয়লা, ইস্পাত এবং সুনিপুণ শ্রমিকের অপর্যাপ্ত সরবরাহ। এখানকার গাড়ী সাধারণতঃ কমমূল্যে বিক্রয় হয় বলিয়া স্থানীয় চাহিদা কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু জাপানে পার্বত্য অঞ্চলের আধিক্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার অভাব জাপানে এই শিল্পের উন্নতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

কানাডার হ্রদ অঞ্চলে অণ্টারিও উপদ্বীপে মোটর-গাড়ী-নির্মাণশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কাষ্ঠসম্পদ, কয়লা ও ইস্পাতের সরবরাহ থাকায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোটর-গাড়ী-নির্মাণশিল্পের নিকটবর্তী বলিয়া কানাডা এই শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে।

ইহা ছাড়া, অস্ট্রেলিয়া, চীন, ভারত, মালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় দেশসমূহের কারিগরী সাহায্য ও যন্ত্রপাতির দ্বারা মোটর-গাড়ী-নির্মাণশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

• **বাণিজ্য (Trade)**—মোটর-গাড়ীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নির্ভর করে প্রধানতঃ আমদানিকারক দেশসমূহের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এবং স্থানীয় শুল্ক-নীতির উপর। বর্তমানে ভারত ও অন্যান্য সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহ স্থানীয় শিল্পের উন্নতির জন্য সংরক্ষণ শুল্ক বসাইবার ফলে বিদেশ হইতে মোটর-গাড়ী আমদানি করা সম্ভব নহে। এই সকল কারণে মোটর-গাড়ীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অধিকাংশ মোটর-গাড়ী রপ্তানি করে। বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি দেশও রপ্তানি-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে। আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, আফ্রিকার দেশসমূহ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিমানপোত-নির্মাণশিল্প (The Aircraft Industry)

বিমানপোত আবিষ্কার হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে; কিন্তু অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে বিমানপোত-নির্মাণশিল্প দ্রুতগতিতে অগ্রসর

হয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও কারিগরী শিক্ষার উন্নতির ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। বিমানপোত নির্মাণের জন্য প্রয়োজন অ্যালুমিনিয়াম-পাত, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, কয়লা, খনিজ তৈল, সুনিপুণ শ্রমিক এবং চাহিদা। এই সকল উপাদানের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম অত্যন্ত হালকা বলিয়া এই শিল্প অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদক অঞ্চলের নিকটবর্তী না হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। বিমানপোত নির্মাণের পব অনায়াসে ইহা উড়িয়া গন্তব্যস্থলে যাইতে পারে বলিয়া চাহিদাব নিকটবর্তী স্থানে এই শিল্পস্থাপনের প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য বিমানপোত-নির্মাণশিল্পের উন্নতি সাধারণতঃ শক্তিসম্পদ, সুনিপুণ শ্রমিক ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীব যন্ত্রপাতির সববরাহেব উপব নির্ভরশীল।

বিমানপোত-নির্মাণশিল্পেব উন্নতিতে দুইটি মহাযুদ্ধ যথেষ্ট সাহায্য কবিয়াছে। যুদ্ধেব প্রয়োজনে ইহাব উৎপাদন যে কতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার হিসাব দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ১৯৩৯ সালে মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রে বিমানপোত নির্মিত হইয়াছিল মাত্র ৫,০০০; কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব সময় ১৯৪৪ সালে ইহাব উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ১ লক্ষে দাঁড়াইয়াছিল। যুদ্ধেব সময় এই শিল্পেব কাবিগবী বিদ্যাব প্রচুব উন্নতি হয় এবং যুদ্ধেব প্রয়োজনে নূতন ধবনেব বিমানপোত আবিষ্কৃত হয়। বর্তমান যুগে যুদ্ধেব প্রধান হাতিয়ার বিমানপোত। এইজন্য বিমানপোতেব উৎপাদন ও উৎকর্ষসাধন অনুসাবে দেশেব শক্তি পবিমাপ কবা হয়। এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশকে যুদ্ধেব জন্য তৈয়াবী বিমানপোত বিক্রয় কবিলেই পৃথিবীব বাজনীতিতে ঠাণ্ডা যুদ্ধেব সৃষ্টি হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of Production)—১৯০৩ সালে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে** প্রথম বিমানপোত আবিষ্কাব করে। ইহাব পর হইতে ক্রমশঃ এই দেশে বিমানপোত-নির্মাণশিল্প উন্নতি লাভ কবিতেছে। দুইটি মহাযুদ্ধে এই দেশ দূবে বসিয়া প্রচুর বিমানপোত নির্মাণ করিয়া ইউরোপীয় দেশসমূহকে বিক্রয় করিয়াছে। যুদ্ধের সময় ইউরোপীয় বিমান-পোত-নির্মাণশিল্প ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল; এইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শিল্পকে যুদ্ধের দরুন কোন ক্ষতি স্বীকার কবিতে হয় নাই। ইহা ছাড়া, বিমানপোত নির্মাণের যাবতীয় উপাদান এই দেশে বিদ্যমান। যন্ত্রপাতি-শিল্পের ও কারিগরী শিক্ষার উন্নতি এবং অ্যালুমিনিয়াম, শক্তিসম্পদ ও সুনিপুণ শ্রমিকের অপর্যাপ্ত সরবরাহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ বিমানপোত-

নির্মাণে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় চাহিদার জন্য এই দেশকে মোটেই চিন্তা করিতে হয় না। দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ায় এই শিল্পের উন্নতি হইয়াছে সর্বাপেক্ষা বেশী। সুন্দর জলবায়ু, সুনিপুণ শ্রমিক, সুলভ জমি, খনিজ তৈল, জলবিদ্যুৎ ও গ্যাসের অপর্যাপ্ত সরবরাহ, বিমানবাহিনীর শিক্ষা-শিবিরের নৈকট্যের জন্য দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ায় এই শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চলেও এই দেশের প্রচুর বিমানপোত নির্মিত হয়; যন্ত্রপাতি-শিল্পের নৈকট্য, অ্যালুমিনিয়ামের সরবরাহ, সুনিপুণ শ্রমিক, সুলভ জলবিদ্যুৎ এখানকার বিমানপোত-নির্মাণশিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চলের নিউ ইয়র্ক, মিচিগান, ওহিও, কনেকটিকাট ও নিউ জার্সিতে অধিকাংশ বিমানপোত নিমিত হয়।

রাশিয়া বিমানপোত-নির্মাণে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও অধিক শক্তিসম্পন্ন বিমানপোত-নির্মাণে এই দেশ বর্তমানে পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। স্পুটনিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়া আকাশপথে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। বিমানপোত-নির্মাণশিল্পের উপযোগী সকল প্রকার উপাদান এই দেশে বিদ্যমান। বিশাল আয়তনের দেশ বলিয়া এখানে বিমানপোতের ব্যবহার অত্যন্ত বেশী। ইস্পাতশিল্পের নিকটবর্তী অঞ্চলেই এই দেশের বিমানপোত-নির্মাণশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে; তন্মধ্যে ভল্গা-উপত্যকায় গোর্কি, কাজান, কুইবিশেভ ও সারাটোভ, মস্কো অঞ্চল, পশ্চিম সাইবেরিয়ার নোভোসাইবিরস্ক, টোমস্ক ও স্বার্দলোভস্ক এবং দূরপ্রাচ্যের কোমসোমলস্ক, এই দেশের উল্লেখযোগ্য বিমান-নির্মাণকেন্দ্র।

বৃটেন বিমানপোত-নির্মাণে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। বিভিন্ন ধরনের বিমানপোত এখানে নির্মিত হয়। মিডল্যাণ্ডের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলের যন্ত্রপাতি-নির্মাণশিল্প বিমানপোত-নির্মাণে যথেষ্ট সহায়তা করে। বার্মিংহাম ও কভেন্ট্রি এই দেশের শ্রেষ্ঠ বিমানপোত-নির্মাণকেন্দ্র। বৃস্টল, ডার্বি এবং লণ্ডন প্রধানতঃ বিমানপোত-যন্ত্রপাতির জন্য বিখ্যাত। লণ্ডন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিমানপোত-নির্মাণকেন্দ্র।

জার্মানী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বিমানপোত-নির্মাণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধে এই শিল্প বিধ্বস্ত হইয়া যায়। বর্তমানে এই দেশ

পুনরায় বিমানপোত-নির্মাণে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ইটালির মিলান, তুরান ও নেপল্‌সে, জাপানের টোকিও-ইয়োকোহামা, কোবে-ওসাকা-কিয়োটো এবং নাগোয়া অঞ্চলে, ফ্রান্সের প্যারিস অঞ্চলে বিমানপোত-নির্মাণশিল্পের উন্নতি হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ব্রেজিল, চীন, ভারত, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাণিজ্য (Trade)—যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং বাণিজ্যিকে ব্যবহারের জন্ত বহু দেশ বিমানপোত আমদানি করে। দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকার দেশসমূহ প্রধান বিমানপোত আমদানিকারক। রপ্তানিকারকদের মধ্যে রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গুরু রাসায়নিক শিল্প
(Heavy Chemical Industries)

শিল্পোন্নয়ন ও কৃষিকার্যের উন্নতির অন্যতম প্রধান উপকরণ গুরু রাসায়নিক দ্রব্য; সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ক্লোরিণ, কস্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ, রাসায়নিক সার, ক্যাল্‌সিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতিকে গুরু রাসায়নিক দ্রব্য বলা হয়। ইহা বিভিন্ন শিল্পে ও কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়। শিল্প-বিপ্লবের পর বৃটেনে রাসায়নিক শিল্পের সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ জার্মানী এই শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপ হইতে রাসায়নিক দ্রব্যের আমদানি বন্ধ হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হয়; বর্তমানে এই দেশ পৃথিবীতে রাসায়নিক শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। বিপ্লবের পর রাশিয়াও এই শিল্পে প্রভূত উন্নতি লাভ করে এবং বর্তমানে এই দেশ পৃথিবীতে গুরু রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এইভাবে দেখা যায় যে, পৃথিবীর শিল্পপ্রধান দেশসমূহ প্রধানতঃ এই শিল্পে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

গুরু রাসায়নিক শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সুলভ প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহার উৎপাদন-খরচ অত্যন্ত কম। ইহার প্রস্তুত-প্রণালীও অত্যন্ত সহজ। ইহার কাঁচামাল সাধারণতঃ পরিমাণে অত্যন্ত বেশী এবং ওজনে ভারী; সেইজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শিল্প কাঁচামালের নিকটে স্থাপিত হয়। গুরু রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে অন্যান্ত শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন-খরচ কমাইবার জন্ত এই শিল্প সর্বদা

সুলভ জলপথ ও সুলভ জমির সুবিধা পাইতে চেষ্টা করে। ইহা প্রধানতঃ শিল্পের জন্য নিয়োজিত হয় বলিয়া শিল্পপ্রধান দেশে ইহা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গুরু রাসায়নিক শিল্প-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :—

(ক) **সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড (Sulphuric Acid)**—গুরু রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে ইহা সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বহুবিধ শিল্পে ইহা ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার উৎপাদন ও ব্যবহার দেশের শিল্পোন্নতির সূচক। রাসায়নিক সার, লঘু রাসায়নিক দ্রব্য, ধাতব দ্রব্য, বিস্ফোরক সামগ্রী ও রবার-উৎপাদনে এবং খনিজ তৈল-পরিশোধনে সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োজন। গন্ধক ও পাইরাইট এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৪২ ভাগ এই দেশে উৎপন্ন হয়। লুইসিয়ানা ও টেক্সাস্ অঞ্চলের গন্ধক (Sulphur) হইতে এই দেশের অধিকাংশ সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। জাপান পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ১০·৭ ভাগ উৎপন্ন করিয়া দ্বিতীয় স্থান, রাশিয়া ৯ ভাগ উৎপন্ন করিয়া তৃতীয় স্থান, পশ্চিম জার্মানী ৭·৩ ভাগ উৎপন্ন করিয়া চতুর্থ স্থান এবং বৃটেন ৬·৬ ভাগ উৎপন্ন করিয়া পঞ্চম স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া, ইটালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, চীন, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, ভারত প্রভৃতি দেশেও সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

(খ) **সোডা অ্যাশ (Soda Ash)**—কাগজ, কাচ, সাবান ও খনিজ তৈল-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য ইহা প্রয়োজন। চুনাপাথর (ক্যাল্‌সিয়াম কারবোনেট), লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড), কোক-কয়লা প্রভৃতির সাহায্যে সোডা অ্যাশ প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ লবণ ও চুনাপাথরের নিকটবর্তী অঞ্চলেই এই শিল্প স্থাপিত হইয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোডা অ্যাশ-উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ইহার বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩৯ লক্ষ মেঃ টন। ডেট্রয়েট, সল্টভিল, বার্বারটোন চার্লস্ হ্রদ ও সাইরাকিউজ এই দেশের প্রধান সোডা অ্যাশ-উৎপাদনকেন্দ্র। আফ্রিকার কেনিয়া রাজ্যের গ্রেট রিফ্‌ট ভ্যালি এই দেশের উল্লেখযোগ্য সোডা অ্যাশ-উৎপাদনকেন্দ্র। ইহা ছাড়া, রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স, বৃটেন, পোল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশেও ইহা উৎপন্ন হয়।

(গ) **কস্টিক সোডা (Caustic Soda)** এবং (ঘ) **ক্লোরিণ (Chlorine)** প্রধানতঃ লবণ হইতে প্রস্তুত হয়। কাগজ, সাবান, রেয়ন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে কস্টিক সোডা প্রয়োজন। জল পরিষ্কার করিতে এবং জীবাণু-নাশক রঞ্জক ও বিস্ফারক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে ক্লোরিণ দরকার হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দুইটি রাসায়নিক দ্রব্য-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে ; লুইসিয়ানা রাজ্যে স্থানীয় লবণ ও সুলভ জলপথের সাহায্যে ইহা উৎপন্ন হয়। রাশিয়া, জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি, কানাডা, চীন ও ভারতে অধিকাংশ কস্টিক সোডা ও ক্লোরিণ উৎপন্ন হয়।

(ঙ) **রাসায়নিক সার (Chemical Fertilizer)**—কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য সার একান্ত প্রয়োজন। সারের উৎপাদনের উপর দেশের কৃষিজ সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভরশীল। নাইট্রোজেন এবং ইহার বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ, ফসফরাস ও পটাশ রাসায়নিক সার উৎপাদনের প্রধান উপাদান। গোবর, হাড়ের গুঁড়া পক্ষী-পুরীষ, মনুষ্য-পুরীষ স্বাভাবিক সার হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও, ইহাদের সরবরাহের অনিশ্চয়তার দরুন খনিজ নাইট্রোজেনের যৌগিক পদার্থের সাহায্যে প্রস্তুত রাসায়নিক সারের উপর বর্তমানে মানুষ অধিকতর নির্ভরশীল।

শোরা বা **সোডিয়াম নাইট্রেট** হইতে আহৃত নাইট্রোজেনের সাহায্যে প্রস্তুত সার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর খনিজ নাইট্রেটের অধিকাংশই দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে পাওয়া যায়। শোরার অভাবে বহুদেশ কয়লা ও বাতাস হইতে নাইট্রেট প্রস্তুত করিয়া ইহা দ্বারা অ্যামোনিয়াম সালফেট (Ammonium Sulphate) নামক রাসায়নিক সার উৎপন্ন করে। কয়লা উৎপাদনকারী দেশসমূহ কয়লার উপজাত-দ্রব্য হইতেও এইজাতীয় সার প্রস্তুত করে। নাইট্রোজেন-ঘটিত সার-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া, রাশিয়া, জার্মানী, নরওয়ে, ফ্রান্স, ইটালি, জাপান, বৃটেন, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশেও এইজাতীয় সার উৎপন্ন হয়।

মৃত প্রাণীর হাড় হইতে **ফস্‌ফেট** পাওয়া যায় ; কিন্তু ইহার সরবরাহের অনিশ্চয়তার দরুন খনিজ ফস্‌ফেট হইতে সুপার-ফস্‌ফেট (Super-phosphate) নামক উৎকৃষ্টশ্রেণীর সার প্রস্তুত হয়। এইজাতীয় সার-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই দেশের রকি

পর্বত অঞ্চলে, ফ্লোরিডা ও টেনেসি উপত্যকায় সর্বাধিক ফস্‌ফেট পাওয়া যায়। সুপার-ফসফেট উৎপাদনে রাশিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই দেশের কোলা, মস্কো ও কাজাকস্তান অঞ্চলে অধিকাংশ সুপার-ফস্‌ফেট উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, জাপান, ইটালি, হল্যাণ্ড, মরক্কো, স্পেন, ফ্রান্স, বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও এইজাতীয় সার উৎপন্ন হয়। **পটাশ** নামক লবণ দ্রব্য হইতেও সার উৎপন্ন করা যায়। জার্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া, স্পেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পোল্যাণ্ডে অধিকাংশ পটাশ-ঘটিত সার উৎপন্ন হয়।

বাণিজ্য (Trade)—পৃথিবীর অধিকাংশ অনুন্নত দেশকেই কোন কোন গুরু রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি করিতে হয়। ইহার মধ্যে ভারত, ব্রহ্মদেশ, চীন, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি প্রধান আমদানিকারক দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্মানী, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইটালি, চিলি, কেনিয়া প্রভৃতি প্রধান রপ্তানিকারক দেশ।

বয়নশিল্প (The Textile Industries)

আদিম যুগে মানুষ বল্কল ও পশুচর্ম বস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিত। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আবিষ্কার করিল তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত করিতে এবং বস্ত্র বয়ন করিতে। প্রথমাবস্থায় মানুষ হাতেই বস্ত্র প্রস্তুত করিত। এখনও ভারত ও অন্যান্য দেশে হস্তচালিত তাঁতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়; এইভাবেই প্রস্তুত হইত ঢাকার বিখ্যাত মস্‌লিন ও কেরালার কেলিকো। ক্রমশঃ পশম ও রেশম হইতেও বস্ত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। চীন ও ভারত প্রাচীনকালে রেশমবয়নশিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। যান্ত্রিক যুগে বয়নশিল্পে এক বিরাট পরিবর্তন আসিল; বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ, বৃটেনে নানা প্রকার বয়নযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে বৃহদাকার বয়নশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইল। জলবিদ্যুৎ ও কয়লার সাহায্যে বয়নযন্ত্রাদি চালিত হইল। বস্ত্রাদিতে রং দেওয়ার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হওয়ায় বস্ত্রের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইল।

আধুনিক যন্ত্রচালিত বয়নশিল্প প্রথম আরম্ভ হয় বৃটেনে। শিল্প-বিপ্লবের পর বিভিন্ন বয়ন-যন্ত্রপাতি এই দেশে আবিষ্কৃত হওয়ায় বয়নশিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৭৩৩ সালে 'ফ্লাই শাট্‌ল্‌' আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপর্যুপরি হারগ্রিভের কার্ডিং যন্ত্র, আর্করাইটের ও ক্রমটনের সূতা-কাটার যন্ত্র, কার্টরাইটের শক্তিচালিত তাঁত, হুইটনির কার্পাসবয়ন-যন্ত্র, বেলের বস্ত্র-ছাপার

যন্ত্র সবই বৃটেনে আবিষ্কৃত হয়। ইহার ফলে অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই দেশ পৃথিবীতে বয়নশিল্পে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই শিল্প যাহাতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে এইজন্য বৃটেন বহু বাধানিষেধ আরোপ করিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে এবং ফ্রান্স, জার্মানী, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশে আধুনিক বয়নশিল্প ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়ে।

বর্তমান শিল্পোন্নত পৃথিবীতে নিম্নলিখিত বয়নশিল্পসমূহ বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে: (১) কার্পাসবয়নশিল্প ; (২) পশমবয়নশিল্প ; (৩) রেশমবয়নশিল্প ; (৪) রেয়নশিল্প ও (৫) লিনেনশিল্প।

কার্পাসবয়ন শিল্প
(The Cotton Textile Industry)

প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ কার্পাস-বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে। সম্ভবতঃ ভারতেই এই শিল্পের পত্তন হইয়াছিল। তুলা এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। কিন্তু সুতা রং করিবার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যও এই শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া, শক্তিসম্পদ, সুলভ শ্রমিক প্রভৃতি এই শিল্পের উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন। আর্দ্র জলবায়ুতে তুলা হইতে সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করা যায় বলিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কার্পাসবয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে। তুলা এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল বলিয়া তুলা-উৎপাদনকারী অঞ্চলেই এই শিল্পের একদেশীভবন হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্তু তুলার ওজন হালকা বলিয়া বহু ক্ষেত্রে অন্য দেশ বা অঞ্চল হইতে তুলা আমদানি করিয়া বহু দেশ কার্পাসবয়নশিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। বৃটেন, জাপান, ফ্রান্স ও জার্মানীর কার্পাসবয়নশিল্প আমদানিকৃত তুলার উপর নির্ভরশীল ; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন ও রাশিয়ায় প্রধানতঃ তুলা-অঞ্চলেই এই শিল্পের অধিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Areas of Production)—সাধারণতঃ তুলা উৎপাদনের সঙ্গে এই শিল্পের উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং এই শিল্প সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে পৃথিবীর তুলা-উৎপাদন অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন (২১০ পৃষ্ঠায় মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। তুলা-উৎপাদনকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া ও ভারত এই শিল্পে বর্তমানে উচ্চস্থান

অধিকার করে। এই সকল দেশে চাহিদাও বিদ্যমান থাকায় কার্পাসবয়নশিল্প অন্যদেশে স্থানান্তরিত হয় নাই।

ইহা বলিলে ভুল হইবে যে, একমাত্র তুলা-উৎপাদনকারী অঞ্চলেই কার্পাসবয়নশিল্প গড়িয়া ওঠে। যেহেতু তুলা একটি খাঁটি কাঁচামাল (Pure Material), সেইজন্য ইহার উপর নির্ভরশীল শিল্প কাঁচামালের নিকট স্থাপিত না হইয়া বাজারের নিকটেও স্থাপিত হয় (৩২৫ পৃষ্ঠায় ওয়েবার-তত্ত্ব দ্রষ্টব্য)। এই কারণে জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স, বৃটেন, ইটালি প্রভৃতি দেশে তুলা উৎপন্ন না হইলেও এই শিল্প বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। জাপানে এক কিলোগ্রাম তুলা না পাওয়া গেলেও এই দেশ পৃথিবীতে কার্পাসবস্ত্র-উৎপাদনে পঞ্চম স্থান এবং রপ্তানিতে প্রথম স্থান অধিকার করে। শক্তিসম্পদ, চাহিদা, সুনিপুণ শ্রমিক, যন্ত্রপাতির সরবরাহ, অনুকূল জলবায়ু, মূলধন প্রভৃতি কারণে এই সকল দেশ কার্পাসবয়নশিল্পে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে।

পৃথিবীর মোট কার্পাস-বস্ত্র উৎপাদন—৫৯ লক্ষ ১৫ হাজার মেট্রিক টন (১৯৬৩-৬৪)

মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	১৩ লক্ষ	৬২ হাঃ	মেঃ টন		পঃ জার্মানী	২ লক্ষ	৫৮ হাজার	মেঃটন	
চীন	৯ ,,	১১ ,,	,,		ফ্রান্স	২ ,,	২৩ ,,	,,	
ভারত	৮ ,,	৪০ ,,	,,		বৃটেন	১ ,,	৫৩ ,,	,,	
রাশিয়া	৭ ,,	৪৮ ,,	,,		ইটালি	১ ,,	৩৬ ,,	,,	
জাপান	৪ ,,	৯ ,,	,,		পাকিস্তান		৮২ ,,	,,	

Source—International Cotton Advisory Committee—Monthly Bulletin, October, 1964

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এই দেশের কার্পাসবয়নশিল্প বৃটেন অপেক্ষা নূতন হইলেও বিভিন্ন অনুকূল পরিবেশের দরুন বর্তমানে এই দেশ পৃথিবীতে কার্পাস-বস্ত্র-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। উৎকৃষ্ট তুলা, শক্তিসম্পদের প্রাচুর্য, আর্দ্র জলবায়ু, বন্দরের নৈকট্য, জলপথে ও রেলপথে পরিবহণের সুব্যবস্থা, সুনিপুণ ও সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য এখানকার কার্পাসবয়নশিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল দেশ বলিয়া এখানে কার্পাস-বস্ত্রের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। বৈদেশিক বাজারেও এই দেশের কর্তৃত্ব বিরাজমান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শিল্প প্রথম গঠিত হয় ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে। সেইসময় সামুয়েল স্লটার নামক একজন ইংরেজ শ্রমিক বৃটেনের সকল প্রকার বাধানিষেধকে ফাঁকি দিয়া **নিউ ইংল্যাণ্ডে** আসে এবং নিজের স্মৃতিশক্তি হইতে কার্পাসবয়ন-যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করে। এখানকার জলবায়ু শ্রমিকের কর্মক্ষমতা-বৃদ্ধিতে এবং কার্পাসবয়নে সাহায্য করে। মেক্সিকো, ব্রেজিল ও এই দেশের দক্ষিণাংশের তূলা-বলয় হইতে এখানে তূলা আমদানি করা হয়। সুলভ কৃষি-জমি ক্রমশঃ কারখানায় রূপান্তরিত হয়। এই শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ, কানাডা, এমনকি বৃটেন হইতে বহু দক্ষ তাঁতী উচ্চহারের মজুরির লোভে এখানে চলিয়া আসে। স্থানীয় সুলভ জলবিদ্যুৎ প্রথমাবস্থায় এখানকার শিল্পের উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এইভাবে নিউ ইংল্যাণ্ডের কার্পসবয়নশিল্প উন্নতির চরম শিখরে ওঠে। ১৯২১ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ কার্পাস-বস্ত্র-উৎপাদক অঞ্চল বলিয়া পরিগণিত হইত। ইউরোপের দক্ষ তাঁতীগণের আসার ফলে এই অঞ্চল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাপড়ের জন্য জগদ্বিখ্যাত হইয়া ওঠে।

১৯২১ সালের পর হইতে এই দেশের দক্ষিণাংশের তূলা-বলয়ে উৎপন্ন প্রচুর তূলার সাহায্যে **দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে** (জর্জিয়া, আলাবামা, উত্তর ও

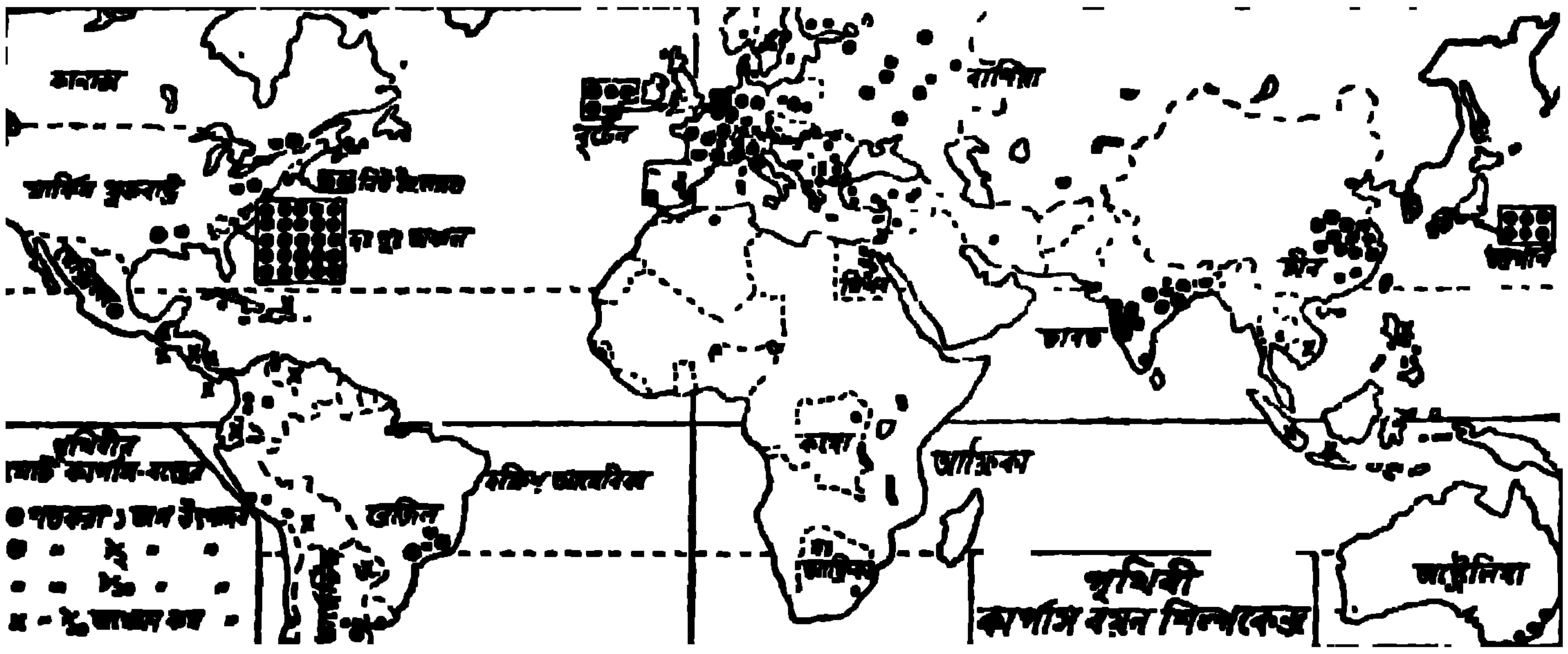

দক্ষিণ ক্যারোলিনা, টেনেসি ও ভার্জিনিয়া রাজ্য) ক্রমশঃ কার্পাসবয়নশিল্পের উন্নতি হয়। স্থানীয় নিগ্রো শ্রমিককে দিয়া অধিকতর সময় অল্প মজুরিতে কাজ করানো সম্ভব। কার্পাসবয়নে তূলা এবং শ্রমিকের মজুরি মোট উৎপাদন-খরচের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দখল করে; দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের এই দুইটিই অত্যন্ত সুলভ। দক্ষিণ অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লা এবং টেনেসি অঞ্চলের সুলভ

জলবিদ্যুৎ এখানকার শিল্পে নিয়োজিত হয়। অধিকতর মুনাফার লোভে মূলধনের কোন অভাব সেখানে দেখা যায় নাই। এখানকার শিল্পের উন্নতির জন্য স্থানীয় কর অত্যন্ত কম ছিল বা মোটেই ছিল না। সুলভ জমির কোন অভাব দেখা যায় নাই। ইহা ছাড়া, এই অঞ্চল উত্তরাংশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত গরম বলিয়া কার্পাস-বস্ত্রের স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত বেশী। দক্ষিণ আমেরিকায় এই অঞ্চল হইতে কার্পাস-বস্ত্র রপ্তানি করা সহজ (দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই সকল কারণে কার্পাসবয়নশিল্প বহুলাংশে নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চল হইতে এই অঞ্চলে সরিয়া আসিয়াছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৮০ ভাগ কার্পাস-বস্ত্র এই অঞ্চলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু একথা মনে করা ভুল হইবে যে, নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে এই শিল্পের অস্তিত্ব মোটেই থাকিবে না। নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে যে ধরনের দক্ষ তাঁতী আছে তাহা এই দেশের অন্য কোথাও নাই। ইহার ফলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্রাদি উৎপাদনে নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য চিরকাল বজায় থাকিবে।

চীন—প্রাচীন সভ্যতার যুগেও চীন বয়নশিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সেইসময় হস্তচালিত তাঁতে কার্পাস-বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও জার্মানীর শিল্পপতিগণ এই দেশের সাংহাই অঞ্চলে কার্পাসবয়নশিল্প স্থাপন করে। ইহার মধ্যে জাপানের অংশ ছিল প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। স্থানীয় অপর্যাপ্ত তূলা, সুনিপুণ শ্রমিক, প্রচুর চাহিদা, সুলভ জলপথ ও খালপথ এই দেশের কার্পাসবয়নশিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিবার ফলে এই শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। পূর্বের অপেক্ষা উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে এই দেশ কার্পাস-বস্ত্র-উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই দেশের উত্তরাংশে ও মধ্যাংশে অধিকাংশ তূলা উৎপন্ন হয় বলিয়া সাংহাই, নান্‌কিন, হ্যাঙ্কাও ও তিয়েনসান অঞ্চলে এই শিল্প সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ কার্পাসবয়নশিল্পকেন্দ্র সমুদ্রতীরে বন্দরের নিকটে অবস্থিত বলিয়া রপ্তানি-বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে। বর্তমানে কার্পাস-বস্ত্র-রপ্তানিতে এই দেশ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

ভারত—প্রাচীন যুগ হইতেই ভারত কার্পাসবয়নশিল্পে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। পূর্বে কুটীরশিল্প হিসাবে

হস্তচালিত তাঁতে অধিকাংশ বস্ত্র উৎপন্ন হইত। তাঁতে প্রস্তুত ঢাকার 'মস্‌লিন' ও কেরালার 'কেলিকো' জগদ্বিখ্যাত ছিল। এখনও ভারতে কার্পাস-বস্ত্র-উৎপাদনে তাঁতশিল্প উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। বৃটিশ রাজত্বে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় এই দেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইত। তদানীন্তন সরকার তাঁতশিল্পের ক্ষতিসাধনের জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করিলেও এই শিল্পের বিশেষ কোন ক্ষতিসাধন করিতে পারে নাই। ১৮১৮ সালে ভারতে প্রথম আধুনিক যন্ত্রচালিত কার্পাসবয়নশিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়; কিন্তু ১৮৫১ সালের পূর্বে এই শিল্পের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। বর্তমানে তূলা-উৎপাদক অঞ্চলেই (মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মাদ্রাজ) এই দেশের অধিকাংশ কার্পাসবয়নশিল্প অবস্থিত। ইহার মধ্যে বোম্বাই, আমেদাবাদ, কোয়েম্বাটুর এই শিল্পে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, দিল্লী, কেরালা, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যেও এই শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে দেশের চাহিদা মিটাইয়াও ভারত রপ্তানি-বাণিজ্যে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

রাশিয়া—তূলা-উৎপাদনে এবং কার্পাসবয়নশিল্পে এই দেশ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। এই দেশের কাজাকস্তান, ট্রান্স-ককেশাস্‌ ও মধ্য রাশিয়ায় অধিকাংশ তূলা পাওয়া গেলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাশিয়ার কার্পাসবয়নশিল্প প্রথমে গড়িয়া ওঠে তূলা-উৎপাদক অঞ্চল হইতে বহুদূরে মস্কো, আইভানভ, লেনিনগ্রাড ও কালিনিন অঞ্চলে; এই সকল স্থানের সুলভ ও নিপুণ শ্রমিক, শক্তিসম্পদ, উৎকৃষ্ট পরিবহণ-ব্যবস্থা এবং সরকারী উদ্যোগ কার্পাসবয়নশিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। পূর্বে এই সকল স্থানে দেশের শতকরা ৯০ ভাগ কার্পাস-বস্ত্র উৎপন্ন হইত; কিন্তু বর্তমানে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ফলে পশ্চিম সাইবেরিয়ার বার্ণাউলে, ককেশাস্‌ পর্বতের দক্ষিণে আজারবাইজান, লেনিনাকান ও কাইরভ-আবাদে এবং এশীয় রাশিয়ার দক্ষিণাংশের তাশখণ্ড ও ফারঘানা অঞ্চলে এই শিল্পের উন্নতি হইয়াছে (দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৬ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

জাপান—জাপানে প্রয়োজনীয় তূলা পাওয়া না গেলেও একসময় এই দেশ কার্পাসবয়নশিল্পে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি, সুলভ ও নিপুণ স্ত্রী-শ্রমিক, আর্দ্র জলবায়ু, উৎকৃষ্ট পরিবহণ-ব্যবস্থা, সুলভ

জলবিদ্যুৎ, নিকটবর্তী বন্দর ও সরকারের সহায়তার জন্য জাপান এই শিল্পে এখনও পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। এই দেশে ছোটখাটো কুটীর-শিল্পে বস্ত্রবয়নের সুবন্দোবস্ত আছে। বড় বড় কারখানায় সুতা প্রস্তুত হয় এবং এই সকল কুটীরশিল্পে সরবরাহ করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই শিল্প অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও পুনরায় জাপান এই শিল্পের উন্নতিসাধনে সক্ষম হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মিশর হইতে বর্তমানে প্রচুর তুলা এই দেশে আমদানি হইয়া থাকে। ওসাকা এই দেশের শ্রেষ্ঠ কার্পাসবয়নশিল্প-কেন্দ্র ; এইজন্য ওসাকা 'প্রাচ্যের ম্যাঞ্চেস্টার' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া, কোবে, নাগোয়া এবং টোকিও অঞ্চলেও এই শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে (দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪৯ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। চীন ও ভারত ভিন্ন পূর্ব এশিয়ার অন্য কোন দেশে এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় জাপান এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র রপ্তানি করে ; বস্ত্র-রপ্তানিতে জাপান পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

পশ্চিম জার্মানী—যন্ত্রশিল্পে এই দেশ উন্নতি লাভ করায় আমদানিকৃত তুলা ও স্থানীয় সুনিপুণ শ্রমিকের সাহায্যে এই দেশে কার্পাসবয়নশিল্পের উন্নতি হইয়াছে। বৃটেনে যখন এই শিল্প অধোগতির দিকে যাইতেছিল, সেই সময় ইউরোপের প্রধান ভূখণ্ডে এই শিল্পের ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয়। রুঢ় অঞ্চলের কয়লা এবং রাইন ও এল্‌ব্ নদীর জলপথ জার্মানীর কার্পাসবয়ন-শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। রুঢ় অঞ্চলের বার্মেন ও এল্‌বারফিল্ড এই দেশের প্রধান কার্পাস-শিল্পকেন্দ্র।

ফ্রান্স—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানিকৃত তুলার সাহায্যে এই দেশের কার্পাসবয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে সূক্ষ্ম সূতার কাজ বেশী হয় বলিয়া উৎকৃষ্ট বিলাস-বস্ত্রাদি উৎপাদনে ফ্রান্সের সুনাম আছে। আলসাস্ অঞ্চলের মুলহাউস ও ভোজ এবং উত্তরাঞ্চলের কয়লাখনি অঞ্চলে লালে ও রুবে এবং সীন নদীর তীরে অবস্থিত রুয়েঁ শহর এই দেশের প্রধান কার্পাস-শিল্পকেন্দ্র।

বৃটেন—সর্বপ্রথম বয়ন-যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয় বৃটেনে। ইহা ছাড়া, বৃটেনের বিশাল সাম্রাজ্য (ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি) হইতে প্রচুর তুলা পাওয়া যাইত। উপনিবেশসমূহে বস্ত্রাদির প্রচুর চাহিদা ছিল। স্থানীয় আর্দ্র জলবায়ু ও কয়লার অপর্যাপ্ত সরবরাহ এই শিল্পের উন্নতিতে প্রচুর সহায়তা করিয়াছে। এই সকল

কারণে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বৎসর এই দেশ কার্পাস-বয়নশিল্পে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বপর্যন্ত বৃটেন পৃথিবীর মোট বস্ত্র-রপ্তানির শতকরা ৬০ ভাগ সরবরাহ করিত। দুইটি যুদ্ধের আঘাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশের সহিত প্রতিযোগিতায়, শ্রমিকের মজুরিবৃদ্ধি এবং সর্বশেষে উপনিবেশসমূহ হারাইবার ফলে বৃটেন বর্তমানে কার্পাস-বস্ত্র-উৎপাদনে পৃথিবীতে অষ্টম স্থানে নামিয়া গিয়াছে। কিন্তু স্থানীয় সুনিপুণ শ্রমিকের সাহায্যে এখনও সূক্ষ্ম বস্ত্রাদির উৎপাদনে বৃটেনের খ্যাতি বিদ্যমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মিশর ও ব্রেজিল বর্তমানে এই দেশে তুলা সরবরাহ করে। ল্যাঙ্কাশায়ারের ম্যাঞ্চেস্টার অঞ্চলে কার্পাসবয়নের উপযোগী অবস্থা বিদ্যমান থাকায় এই দেশের কার্পাসশিল্পের প্রধানতঃ এই অঞ্চলেই একদেশীভবন হইয়াছে (দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৯ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

পোল্যাণ্ড, মিশর, পূর্ব জার্মানী, কানাডা, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশেও এই শিল্পের উন্নতি হইয়াছে।

বাণিজ্য (Trade)—কার্পাস-বস্ত্র-রপ্তানিতে জাপান বর্তমানে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইহার পরেই ভারতের স্থান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে। বর্তমানে চীন, রাশিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশও কার্পাস-বস্ত্র-রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, মালয় ও ব্রহ্মদেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কার্পাস-বস্ত্রের রপ্তানি-বাণিজ্য—৬'৯৭ লক্ষ মেঃ টন

(১৯৬৩)

(হাজার মেঃ টন)

জাপান	১৪৯	ফ্রান্স	৪১
ভারত	৬৫	হল্যাণ্ড	৩১
চীন	৫০	বৃটেন	২৯
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪৬	পশ্চিম জার্মানী	২৬
হংকং	৪৪	রাশিয়া	২৩

Source—I.C.A.C.—Monthly Bulletin. December, 1964

পশমবয়নশিল্প
(The Woollen Industry)

প্রাচীনকালে কুটীর-শিল্প হিসাবে পশমবয়নশিল্পের সৃষ্টি হইলেও শিল্প-বিপ্লবের পর যন্ত্রশিল্পের উন্নতি হওয়ায় এই শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। কার্পাসবয়নশিল্পে যন্ত্রপাতি প্রচলনের পরেও বহুদিন পর্যন্ত হস্তচালিত তাঁতে পশম-বস্ত্র প্রস্তুত হইত। বর্তমানে অধিকাংশ পশম-বস্ত্র আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ শীতপ্রধান দেশের লোক শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পশম-বস্ত্র ব্যবহার করে। সেইজন্য ইউরোপ, জাপান ও উত্তর আমেরিকায় ইহার চাহিদা অত্যন্ত বেশী।

পশমবয়নশিল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই শিল্প **পশম-উৎপাদনকারী দেশে** উন্নতি লাভ না করিয়া শিল্পপ্রধান চাহিদাযুক্ত অঞ্চলে উন্নতিলাভ করিয়াছে। দক্ষিণ গোলার্ধের দেশসমূহে (অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকা) পৃথিবীর অধিকাংশ পশম উৎপন্ন হয়। ইহারা পৃথিবীর মোট পশম-রপ্তানির শতকরা ৯৮ ভাগ সরবরাহ করে। শীতপ্রধান দেশ বলিয়া এই সকল দেশে পশমের চাহিদাও বেশী। ইহা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত **কারণে** এই সকল দেশে পশমবয়নশিল্প উন্নতিলাভ না করিয়া উত্তর গোলার্ধের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জাপান, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশে এই শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে :—

প্রথমতঃ, আয়তনের তুলনায় দক্ষিণ গোলার্ধের পশম-উৎপাদনকারী দেশসমূহে লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম এবং চাহিদাও বেশী নহে। ইহা ছাড়া, শ্রমিকের অভাবে এখানে শ্রমশিল্প চালানো কঠিন।

দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণ গোলার্ধের এই সকল দেশে শিল্প গঠিত না হইবার সর্বপ্রধান কারণ এই যে, পশম একটি "খাঁটি কাঁচামাল" (Pure Material); অর্থাৎ এই কাঁচামালটি শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত হইবার পরেও ইহার ওজন বিশেষ কমিয়া যায় না। সুতরাং যখন এই জিনিসটিকে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত করিয়া শেষপর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য উত্তর গোলার্ধের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে পাঠাইতেই হইবে, তখন কাঁচা পশমরূপে বা শিল্পজাত দ্রব্যরূপে পাঠানো প্রায় একই কথা। কিন্তু শিল্পগঠনের স্থানীয় অসুবিধা থাকায় শিল্পোন্নত দেশে কাঁচা পশম পাঠাইয়া শিল্পগঠন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তৃতীয়তঃ, বয়ন-যন্ত্রপাতি-উৎপাদনকারী দেশসমূহ এই সকল দেশ হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া ভারী যন্ত্রপাতি আমদানি করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। ইহার চেয়ে হালকা পশম রপ্তানি করা কম ব্যয়সাধ্য।

চতুর্থতঃ, পশম বহুদিন গুদামজাত করিয়া রাখিলেও নষ্ট হইবার ভয় নাই। সুতরাং ইহা প্রয়োজনমতো রপ্তানি করা যায় এবং জাহাজে বেশীদিন থাকিলেও ক্ষতি হয় না; সেইজন্য ইহা বহুদূরবর্তী দেশে পাঠানো যায়।

পঞ্চমতঃ, দক্ষিণ গোলার্ধের পশম-উৎপাদনকারী দেশগুলির উপর বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থাকার ফলে পশ্চিমী শক্তিবর্গের দেশসমূহের শিল্পোন্নতির জন্য ইহারা পশম রপ্তানি করিতে বাধ্য হয়।

এই সকল কারণে পশ্চিমী শক্তিবর্গের দেশসমূহে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি) এই শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। শীতপ্রধান দেশ বলিয়া এখানে পশম-বস্ত্রের অপর্যাপ্ত চাহিদা বিদ্যমান। স্থানীয় কর্মঠ ও সুনিপুণ শ্রমিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিদ্যার উন্নতি এই সকল দেশে এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে।

ইহা ছাড়া, রাশিয়াও এই শিল্পে খুবই উন্নতিলাভ করিয়াছে। রাশিয়ায় প্রচুর পশম উৎপন্ন হয় বলিয়া দক্ষিণ গোলার্ধের পশমের উপর এই দেশের পশমবয়নশিল্প নির্ভরশীল নহে।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of Production)—পশমবয়নশিল্পে সাধারণতঃ উত্তর গোলার্ধের শিল্পোন্নত দেশসমূহ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

পশম-বস্ত্র-উৎপাদন—১৬ লক্ষ মেঃ টন

১৯৬৪ (লক্ষ মিটার)

জাপান	৩৬১২	ফ্রান্স	৮১৪
বৃটেন	২৭৪৫	পশ্চিম জার্মানী	৬১৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৪৫৪	রাশিয়া	৪৭০

Source—U.N.O—Monthly Bulletin. March, 1965

জাপান—বয়নশিল্পে জাপান বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। পশমবয়নশিল্পে বর্তমানে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। জাপানের ওসাকা ও আইচিতে এই শিল্প বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছে। স্থানীয় সুলভ ও সুদক্ষ শ্রমিক এই শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণ।

বৃটেন—বৃটেনের পশমবয়ন একটি পুরাতন শিল্প। পূর্বে হস্তচালিত তাঁতে পশম-বস্ত্র প্রস্তুত হইলেও, বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। ইয়র্কশায়ার অঞ্চলে এই দেশের পশমবয়নশিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। নিকটবর্তী পেনাইন অঞ্চলের স্বচ্ছ জল, স্থানীয় কয়লা ও সুনিপুণ শ্রমিক, পেনাইন অঞ্চলের পশম এবং যানবাহনের সুবন্দোবস্তের জন্য ইয়র্কশায়ার অঞ্চলে এই শিল্পের একদেশীভবন হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার তথাকার ইংরেজগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া বৃটেনের পক্ষে ঐ সকল দেশ হইতে পশম সংগ্রহ করা খুবই সহজ। শীতপ্রধান সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত বেশী। ইয়র্কশায়ারের ব্র্যাডফোর্ড, হ্যালিফাক্স, লীড্‌স্, কেইলী, হাডারস্‌ফিল্ড, ডিউস্‌বেরী প্রভৃতি শহর পশমবয়নশিল্পের জন্য বিখ্যাত। ইহা ছাড়া, ল্যাঙ্কাশায়ার, ওয়েল্‌স্, আয়ারল্যাণ্ড ও লিস্টারশায়ার অঞ্চলেও এই শিল্প অল্পবিস্তর উন্নতি লাভ করিয়াছে।

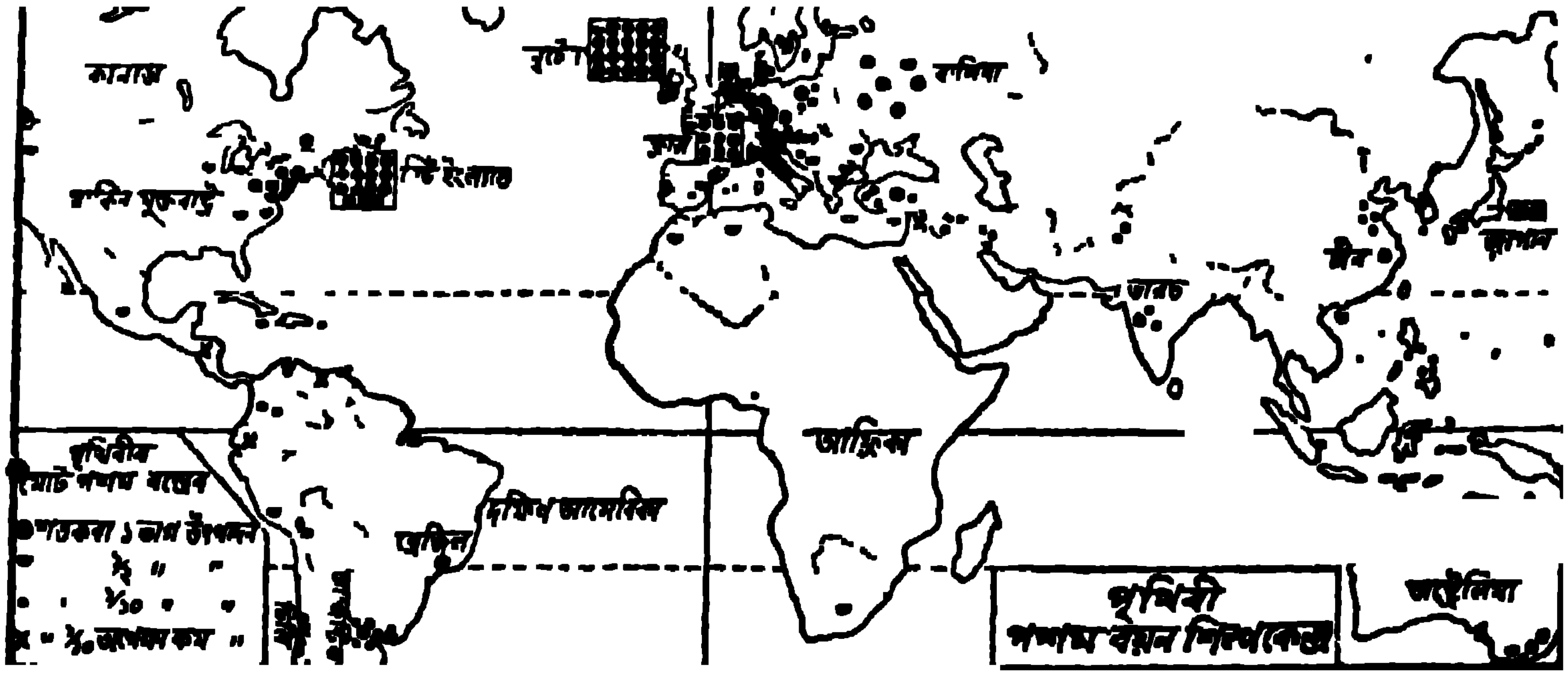

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—পশমবয়নশিল্পের উন্নতির উপযোগী অবস্থা এই দেশে বিদ্যমান থাকায় যথেষ্ট পরিমাণে পশম পাওয়া না গেলেও এই দেশ পশম-বস্ত্র-উৎপাদনে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই দেশের অধিকাংশ পশম উৎপন্ন হয় দেশের পশ্চিমাংশে। অবশ্য স্থানীয় পশম দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। সেইজন্য আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে এই দেশে প্রচুর পরিমাণে পশম আমদানি হয়। এইজন্য পূর্বাংশের দক্ষিণ পেনসিলভেনিয়া, নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, নিউ ইংল্যাণ্ড ও মেইন রাজ্যে বন্দরের নিকটে এই শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। এই দেশের শতকরা ৮০ ভাগ পশম-বস্ত্র এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়; ইহার মধ্যে প্রায় অর্ধেক

পশম-বস্ত্র উৎপাদিত হয় নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে। স্থানীয় আর্দ্র জলবায়ু, কয়লা ও জলবিদ্যুতের সরবরাহ, বন্দরের নৈকট্য, বয়ন-যন্ত্রপাতির সরবরাহ এখানকার শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে। ইহা ছাড়া, দক্ষ ইংরেজ তাঁতীগণ নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিবার ফলে সুনিপুণ শ্রমিকের কোন অভাব হয় নাই। শীতপ্রধান সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া এই দেশে পশম-বস্ত্রের প্রচুর চাহিদা বিদ্যমান। ফিলাডেলফিয়া ও ক্লীভল্যাণ্ড এই দেশের শ্রেষ্ঠ পশমবয়নশিল্পকেন্দ্র।

রাশিয়া—মেষপালনে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই দেশে যন্ত্রপাতি ও নিপুণ শ্রমিকের কোন অভাব নাই। কয়লা, জলবিদ্যুৎ ও খনিজ তৈল অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। শীতপ্রধান দেশ বলিয়া পশমী দ্রব্যের স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত বেশী। সুতরাং পশমবয়নশিল্পে এই দেশ উন্নতি লাভ করিবে ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। দক্ষিণ গোলার্ধের পশমের উপর রাশিয়া নির্ভরশীল নহে। এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই শিল্পের প্রসার হইয়াছে। তন্মধ্যে মস্কো, লেনিনগ্রাড, কাজাকস্তান, ইউক্রেন, ককেশাস্ প্রভৃতি অঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফ্রান্সের রুয়েঁ, রীম্‌স্ ও লীলে অঞ্চলে এই শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। জার্মানীও এই শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই দুইটি দেশ আমদানিকৃত পশমের উপর নির্ভরশীল। চীনের সাংহাই অঞ্চলে, ভারতের পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে এবং তুরস্কে এই শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ গোলার্ধের পশম-উৎপাদনকারী দেশেও (অস্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকা) এই শিল্প অল্পবিস্তর গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাণিজ্য (Trade)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া অল্প পরিমাণে পশম-বস্ত্র ইউরোপের দেশসমূহে রপ্তানি করিয়া থাকে। আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ইটালি প্রভৃতি দেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রেশমবয়নশিল্প
(The Silk Industry)

গুটিপোকার লালা হইতে রেশম প্রস্তুত হয়। ইহার প্রধান খাদ্য তুঁত গাছ (Mulberry)। সুতরাং রেশমের উৎপাদন প্রধানতঃ নির্ভর করে তুঁত

গাছের উৎপাদনের উপর। গুটিপোকার লালা হইতে রেশম প্রস্তুত করিতে প্রচুর সুনিপুণ শ্রমিকের প্রয়োজন। রেশম-প্রস্তুতের মোট খরচের শতকরা ৩০ ভাগ শুধু শ্রমিকের মজুরির জন্য ব্যয় হয়। রেশমবয়ন কার্পাস বা পশম-বয়নের অনেক পরে আরম্ভ হয়। রেশমবয়নের জন্য প্রয়োজন ধৈর্যশীল নিপুণ শ্রমিক। রেশম-বস্ত্র উৎপাদনের মোট খরচের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ ব্যয় হয় রেশমের মূল্য ও শ্রমিকের মজুরির জন্য। পূর্বে কুটীরশিল্প হিসাবে গড়িয়া উঠিলেও বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে রেশমবয়ন-শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। পূর্বে রেশম-বস্ত্র উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইত; কিন্তু রেয়নের আবিষ্কারের পর ইহার মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং ক্রমশঃ রেয়নের সঙ্গে রেশম-বস্ত্রকে অধিকতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of Production)—রেশম অত্যন্ত হালকা বলিয়া ইহার পরিবহণ-খরচ অত্যন্ত কম। সেইজন্য রেশম আমদানি করিয়া এই শিল্পের উন্নতিসাধন সহজসাধ্য। পৃথিবীর অধিকাংশ রেশম জাপান ও চীনে উৎপন্ন হয়। ইটালি, ফ্রান্স, তুরস্ক, সিরিয়া ও স্পেনেও রেশম উৎপন্ন হয়। জাপান ও চীনের অধিকাংশ রেশম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে রপ্তানি হইয়া থাকে। হালকা কাজ বলিয়া রেশম-বয়নশিল্পে সর্বত্রই সুলভ স্ত্রী-শ্রমিক নিযুক্ত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক কিলোগ্রাম রেশম উৎপন্ন না হইলেও এই দেশ রেশমবয়নশিল্পে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। জাপান হইতে এই দেশে নিউ ইয়র্ক বন্দর মারফত প্রচুর রেশম আমদানি হয়। এইজন্য নিউ ইয়র্কের নিকটবর্তী রাজ্যসমূহে এই শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। স্থানীয় শ্রমিক বয়নশিল্পে নিপুণতার পরিচয় দেয়। অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লা ও স্থানীয় জলবিদ্যুৎ এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করে। এই দেশে সমৃদ্ধিশালী লোকের অভাব না থাকায় রেশম-বস্ত্রের চাহিদা প্রচুর। পেনসিলভেনিয়া, নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক ও নিউ ইংল্যাণ্ড রাজ্যে এই শিল্প সর্বাধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। নিউ জার্সির প্যাটারসন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রেশমবয়ন-শিল্পকেন্দ্র।

পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ রেশমবয়নশিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে; এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে সুলভ ও সুনিপুণ স্ত্রী-শ্রমিক, শক্তি-সম্পদের সরবরাহ, সমৃদ্ধিশালী দেশ হওয়ায় অপর্যাপ্ত চাহিদা, সরকারের

শিল্প-সংরক্ষণ নীতি প্রভৃতি। ইটালি ও ফ্রান্সে প্রচুর রেশম উৎপন্ন হয়। চীন ও জাপান হইতেও এখানে প্রচুর রেশম আমদানি হইয়া থাকে। ইটালির মিলান এবং ফ্রান্সের লিয়ঁ এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশেও এই শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ড স্থানীয় সুলভ জলবিদ্যুৎ ও সুনিপুণ শ্রমিকের সাহায্যে এই শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে; জুরিখ এই দেশের শ্রেষ্ঠ রেশমবয়নশিল্পকেন্দ্র। জার্মানীর রাইন উপত্যকায় ও স্যাক্সনী অঞ্চলে এই শিল্প প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে; ক্রেফেল্ড এই দেশের শ্রেষ্ঠ এবং রেশমবয়নশিল্পকেন্দ্র। বৃটেনের পেনাইন অঞ্চলের নিকটস্থ কার্পাস ও পশমবয়নকেন্দ্রে এই শিল্প প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রাচ্যের দেশসমূহে প্রাচীনকাল হইতেই কুটীরশিল্পের মাধ্যমে প্রচুর রেশম-বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এই সকল দেশের মধ্যে জাপান, চীন ও কোরিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখনও এই সকল দেশে হস্তচালিত তাঁতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রেশম-বস্ত্র প্রস্তুত হয়। স্থানীয় রেশমের উৎপাদন প্রচুর; এই সকল দেশের শ্রমিক অত্যন্ত সুলভ ও নিপুণ। জাপানের মধ্যাংশে ও দক্ষিণাংশে, চীনের ইয়া-সি-কিয়াং ও সিকিয়াং উপত্যকার নিম্নাংশে এই শিল্পবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বর্তমানে রেয়ন-বস্ত্রের সঙ্গে রেশম-বস্ত্র প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না বলিয়া এই সকল দেশে বিশেষতঃ জাপানে রেশমবয়নশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জাপানে এখন রেশম-বস্ত্র সর্বাপেক্ষা বেশী জনপ্রিয়। ভারতে কুটীরশিল্প হিসাবে এই শিল্প কিছুটা উন্নতি লাভ করিয়াছে।

বাণিজ্য (Trade)—ফ্রান্স, ইটালি, জাপান ও চীন স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়াও প্রচুর রেশম-বস্ত্র রপ্তানি করিতে সক্ষম। ইউরোপের অন্যান্য দেশ-সমূহ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ রেশম-বস্ত্রের প্রধান আমদানিকারক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ইউরোপীয় দেশসমূহ হইতে রেশম-বস্ত্র আমদানি করে।

কৃত্রিম রেশমবয়নশিল্প

(The Rayon Industry)

গুটিপোকা হইতে রেশমের উৎপাদন নিরীক্ষণ করিয়া মানুষ কৃত্রিম উপায়ে রেশম প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে। স্প্রুস ও পাইন গাছের কাষ্ঠমণ্ড অথবা তুলার মণ্ড হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেলুলোজ প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে

কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন প্রস্তুত করা হয়। রেশম-দ্রব্য হইতে ইহা দামে অনেক সস্তা। অনেকসময় পশম অথবা রেশমের সহিত ইহা মিশাইয়া বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা হয়। যেখানে কাষ্ঠমণ্ড বা তূলা এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি সহজে পাওয়া যায়, সেইখানেই এই শিল্প গড়িয়া উঠা সম্ভব। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে রেয়ন প্রস্তুত হয় বলিয়া এই শিল্পের জন্য প্রচুর মূলধন ও নিপুণ শ্রমিক প্রয়োজন।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of Production)—১৮৯৫ সালে ফ্রান্সে প্রথম রেয়ন-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইলেও বর্তমানে এই শিল্প পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে ইহা উৎপন্ন হইলেও সর্বাপেক্ষা বেশী রেয়ন-বস্ত্র উৎপন্ন হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে।

পৃথিবীর মোট রেয়ন-বস্ত্র-উৎপাদন—১২ লক্ষ ২০ হাজার মেঃ টন

১৯৬৪ (সহস্র মেঃ টন)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৫২	রাশিয়া	১০৪
বৃটেন	১৭১	পশ্চিম জার্মানী	৭৮
জাপান	১৩৫	ভারত	৩৭

Source—U. N. O. Monthly Bulletin, March, 1965

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিল্পোন্নত দেশ বলিয়া এখানে রাসায়নিক দ্রব্যের কোন অভাব নাই। স্থানীয় তূলা ও কাষ্ঠসম্পদ প্রচুর। সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া রেয়ন-বস্ত্রের চাহিদার শেষ নাই। স্থানীয় শ্রমিক রেয়নশিল্পে অত্যন্ত নিপুণতার পরিচয় দেয়। এই দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে তূলা-বলয়ের নিকটেই এই শিল্প প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। টেনেসি, ভার্জিনিয়া, ক্যারোলিনা ও পেনসিলভেনিয়া রেয়ন-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানকার কার্পাসবয়নশিল্পের পরিত্যক্ত তূলা এই শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এইজন্য রেয়ন-বস্ত্র-উৎপাদনে এই দেশ **প্রথম** স্থান অধিকার করে।

জাপান রেয়ন-শিল্পে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এখানকার সুলভ ও নিপুণ স্ত্রী-শ্রমিক, বনভূমির সরলবর্গীয় কাঠ, কার্পাসবয়নশিল্পের পরিত্যক্ত তূলা এবং স্থানীয় রাসায়নিক দ্রব্য ও চাহিদা এই শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, নরওয়ে ও কানাডা হইতে কাঠ এবং ভারত ও চীন হইতে তূলা এই শিল্পের জন্য প্রচুর পরিমাণে আমদানি

হয়। হনসিউ দ্বীপের রেশমবয়নশিল্পের নিকটেই রেয়ন-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। রেয়ন-রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশসমূহে এখানকার রেয়ন-বস্ত্র রপ্তানি হইয়া থাকে। এশিয়ার রেয়ন-উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে **ভারত** উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

ইউরোপের দেশসমূহে রেয়ন-শিল্পের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। এখনও পৃথিবীর মোট রেয়নের শতকরা ৩৫ ভাগ এই মহাদেশে উৎপন্ন হয়। সমৃদ্ধিশালী বলিয়া এখানকাব দেশসমূহের রেয়ন-বস্ত্রের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। প্রথম আরম্ভ হওয়ায় রেয়ন প্রস্তুতের কাবিগরী জ্ঞানে এই সকল দেশ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ইউরোপেব বেয়ন-উৎপাদকারী দেশসমূহের মধ্যে বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইটালি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপর্যাপ্ত কাষ্ঠসম্পদ, রাসায়নিক দ্রব্য, সুলভ স্ত্রী-শ্রমিক, কয়লা ও জলবিদ্যুৎ এবং স্থানীয় চাহিদা এখানকার শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণ।

বাণিজ্য (Trade)—রেশম-বস্ত্র অপেক্ষা বেয়ন-বস্ত্র অনেক সস্তা বলিয়া সাধারণ লোক ইহা কিনিতে পারে। রেয়ন-বস্ত্র পোশাকের সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এইজন্য ইহার চাহিদা সর্বত্রই বৃদ্ধি পাইতেছে। জাপান তাহার মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক বিদেশে রপ্তানি কবিয়া বেয়ন-বস্ত্র-রপ্তানিতে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

রেয়ন-বস্ত্রের রপ্তানি (১৯৬৪)

(সহস্র মেঃ টন)

জাপান	৯০	ইটালি	২৪	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৮
পশ্চিম জার্মানী	১৯	ফ্রান্স	১৪	বৃটেন	

আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লিনেন-শিল্প
(The Linen Industry)

পূর্বে অতসী (Flax) গাছের তন্তু হইতে মানুষ জাল, দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিত। ক্রমশঃ এই তন্তুর সাহায্যে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইতিহাসে দেখা যায় যে, মিশরীয়গণ প্রথম এই তন্তু হইতে লিনেন-বস্ত্র প্রস্তুত

করে। ক্রমশঃ এই শিল্প ভূমধ্যসাগরের অপর তীরে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে বিস্তৃতিলাভ করে। কার্পাস-বস্ত্র অপেক্ষা লিনেন প্রস্তুত করিতে অধিকতর শ্রমিক প্রয়োজন হওয়ায় এবং লিনেনবয়ন অধিকতর কষ্টসাধ্য বলিয়া কার্পাস-বস্ত্র অপেক্ষা লিনেন-বস্ত্রের মূল্য অনেক বেশী।

উৎপাদক অঞ্চল (Areas of Production)—সাধারণতঃ অতসী-উৎপাদনকারী অঞ্চলেই লিনেন-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। আয়ারল্যাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া রাশিয়ার পশ্চিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে পৃথিবীর অধিকাংশ (৯৪%) অতসী উৎপন্ন হয়। সেইজন্য ইউরোপের দেশসমূহ লিনেন-শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে **রাশিয়া** এই শিল্পে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ অতসী রাশিয়ায় উৎপন্ন হয়। মস্কোর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ওরূস হইতে আরম্ভ করিয়া ইউরাল পর্বতের পশ্চিমে অবস্থিত গ্লাজোভ পর্যন্ত লিনেন-শিল্প বিস্তৃত। গ্লাজোভ, কস্ত্রোমা, ক্রাসাভাইনো, ওরূস, স্মোলেনস্ক, ভোলোগভা, ভাইজনিকি প্রভৃতি রাশিয়ার উল্লেখযোগ্য লিনেন-শিল্পকেন্দ্র। **আয়ারল্যাণ্ড** ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে এই শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়া আসিতেছে। বর্তমানে লিনেন-বস্ত্র-উৎপাদনে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বেলফাস্ট অঞ্চল পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। স্থানীয় অতসী ছাড়াও, রাশিয়া, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স হইতে অতসী আমদানি করিয়া এখানকার শিল্পে নিয়োজিত হয়। এখানে কার্পাস ও পশমবয়ন শিল্পের সঙ্গে এই শিল্পকে প্রতিযোগিতায় নামিতে হয় না। এখানকার শতকরা ৬০ জন শ্রমিক স্ত্রীলোক। অনুকূল জলবায়ু, সরকারী সাহায্য এবং স্থানীয় শিল্পের জগদ্‌ব্যাপী সুনাম এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। ইহা ছাড়া, ইংল্যাণ্ডের মধ্য-ভাগে ও স্কটল্যাণ্ডের পূর্বাংশেও এই শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। ফ্রান্সের নর্মাণ্ডি ও বৃটানি অঞ্চলে এবং বেলজিয়ামে এই শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানিকৃত অতসীর সাহায্যে মৎস্যশিকারের জাল, চর্মশিল্পের উপযোগী সূতা এবং লিনেন-বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানে সূক্ষ্ম লিনেন-বস্ত্রাদি উৎপন্ন হয় না, আয়ারল্যাণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি হয়। নিউ ইংল্যাণ্ড, নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সি রাজ্যে লিনেন-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাণিজ্য (Trade)—রাশিয়ার অধিকাংশ লিনেন-বস্ত্র স্থানীয় চাহিদা

মিটাইতে ব্যয় হয় ; কিন্তু আয়ারল্যাণ্ডের মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ লিনেন-বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশও রপ্তানি-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে। আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশও অল্পবিস্তর লিনেন-বস্ত্র আমদানি করে।

প্রশ্নাবলী

1. **What are the basis of World's industrial location ?**

উ: 'পৃথিবীর শ্রমশিল্পের অবস্থানের কারণ' (৩২০ পৃ:—৩২৪ পৃ:) লিখ।

2. **Discuss how far the industrialisation has affected the present-day activities of man.**

উ: 'শিল্পায়নের ফল' (৩১৯ পৃ:—৩২০ পৃ:) লিখ।

3. **Describe the significance of the use of the mechanical energy on the development of industries.**

উ: 'যান্ত্রিক শক্তি ও ইহার তাৎপর্য' (৩১৭ পৃ:—৩১৯ পৃ:) লিখ।

4. **Discuss briefly the comparative position of the leading industrial regions of the world with regard to their supply of raw materials and power-resources.**

উ: 'পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চলসমূহ' (৩২৯ পৃ:—৩৩৭ পৃ:) হইতে কাঁচামাল ও শক্তি-সম্পদের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শিল্পাঞ্চলের বর্ণনা কর।

5. **Give an idea of the manufacturing industries in the principal industrial regions of U. S. S. R.**
[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উ: 'রাশিয়া' (৩৩৪ পৃ:—৩৩৬ পৃ:) লিখ।

6. **What are the raw materials of the Iron & Steel industry ? How far have these raw materials, influenced the location of this industry in U. S. A., U. S. S. R. & China or West Germany, Japan and U. K. ?**

উ: 'লৌহ ও ইস্পাত শিল্প' হইতে কাঁচামাল সম্বন্ধে (৩৩৮ পৃ:—৩৩৯ পৃ:) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদের প্রাচুর্যের উপর গুরুত্ব দিয়া অথবা পশ্চিম জার্মানী, জাপান ও বৃটেনের কয়লাসম্পদ ও লৌহ আমদানির উপর গুরুত্ব দিয়া শিল্পের উন্নতি বর্ণনা কর (৩৪১ পৃ:—৩৪৯ পৃ:)।

7. **Account for the supremacy of Japan in Ship-building industry and of the U. S. A. in Automobile industry.**

উ: 'জাহাজ-নির্মাণশিল্প' হইতে জাপানের শিল্প (৩৫৭ পৃ:) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'মোটরগাড়ী-নির্মাণশিল্প' (৩৫৯ পৃ:—৩৬০ পৃ:) বর্ণনা কর।

8. "Heavy chemicals are essential for industrialization."—Show how far the producers of heavy chemicals are industrially developed.

উ: 'গুরু রাসায়নিক শিল্প' হইতে ইহার গুরুত্ব বর্ণনা কর (৩৬৪ পৃ:—৩৬৫ পৃ:) এবং ইহার 'উৎপাদক অঞ্চল' (৩৬৫ পৃ:—৩৬৭ পৃ:) হইতে লিখ।

9. Account for the supremacy of the U. S. A. in the Silk Industry even though this country does not produce any raw silk. What other countries have become prominent in this industry ?

উ: 'রেশমবয়নশিল্প, হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প (৩৭৯ পৃ:) এবং 'উৎপাদক অঞ্চল' হইতে অন্যান্য দেশের রেশমবয়নশিল্প (৩৭৯ পৃ:—৩৮০ পৃ:) লিখ।

10, "About four-fifths of the world's export of wool comes from the three southern continents, but the woollen industry has been localised in Western countries of the Northern continents."—Elucidate.

উ: 'পশমবয়নশিল্প' হইতে লিখ (৩৭৪ পৃ:—৩৭৮ পৃ:)।

11. What are the reasons for the development of the Cotton Textile industry of the U. S. A., China, U. K. and Japan ? Explain how the western European countries and Japan have become successful in this industry in spite of having practically no cotton of their own.

উ: 'কার্পাসবয়নশিল্প' হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, বৃটেন ও জাপানের শিল্প (৩৬৯ পৃ:—৩৭৪ পৃ:) সম্বন্ধে লিখ। ফ্রান্স ও জার্মানীর শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাও যে, তুলার ওজন কম হওয়ায় ইহা আমদানি করিয়া শিল্পের উন্নতিসাধন করা সম্ভব।

12. Account for the development of Rayon industry in the U. S. A. and Japan and Linen industry in Ireland and the U. S. S. R.

উ: জাপানের রেয়ন-শিল্প (৩৮১ পৃ:) এবং রাশিয়া ও আয়ারল্যাণ্ডের লিনেন-শিল্প (৩৮৩ পৃ:) লিখ।

13. Discuss the comparative advantange of the localisations of Iron and Steel industry in the Lake Region of U. S. A., and Donetz basin of U. S. S. R.
[B. U. B. Com. 1962]

উ: 'লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের' অন্তর্গত 'হ্রদ অঞ্চল' (৩৪৩ পৃ:) ও 'ইউক্রেন অঞ্চল' (৩৪৪ পৃ:) হইতে লিখ।

14. Give an idea of the industries in the principal industrial regions of the U. S. S. R. [C. U. B. Com. 1958]

উ: 'রাশিয়ার শিল্পাঞ্চল' (৩৩৪ পৃ:—৩৩৬ পৃ:) লিখ।

15. "The North-Eastern industrial zone of U. S. A produces more than 70% of the total industrial production of the country." Account for the concentration of industries in this area.

উ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চল' (৩৩১ পৃ:—৩৩২ পৃ:) লিখ।

16. Comment on the geographical distribution of industries in the U. S. S. R. with reference to the raw material position.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1962]

উ: 'শক্তিসম্পদ ও কাঁচামাল এবং রাশিয়ার শিল্প-পরিকল্পনা' (দ্বিতীয় খণ্ডের ৪০ পৃঃ—৪২ পৃঃ) হইতে কাঁচামাল সম্বন্ধে লিখ।

17. Some industries are tied to the sources of their raw materials while others are not. Select any two manufacturing industries having these contrasting features and explain the reasons for the concentration in one case and wide diffusion in the other.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com., 1963]

উ: 'শ্রমশিল্পের অবস্থান সম্বন্ধে আধুনিক তত্ত্ব' (৩২৪ পৃঃ—৩২৮ পৃঃ) লিখ।

18. "Minimum Transportation Cost' is the basis of worlds industrial location"—Explain. Also mention the circumstances under which industrial location may deviate from this basis.

উ: 'শ্রমশিল্পের অবস্থান সম্বন্ধে আধুনিক তত্ত্ব' (৩২৪ পৃঃ—৩২৮ পৃঃ) হইতে লিখ।

19. Analyse the bases of industrial location and give examples of concentration of industries near raw materials, power and market.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উ: 'কাঁচামাল' (৩২১ পৃঃ), 'শক্তিসম্পদ' (৩২১ পৃঃ) ও 'চাহিদা' (৩২৩ পৃঃ) এবং 'শ্রমশিল্পের অবস্থান সম্বন্ধে আধুনিক তত্ত্ব' (৩২৪ পৃঃ—৩২৮ পৃঃ) হইতে লিখ।

20. Discuss the factors for the location of manufacturing industries, with particular reference to the influence of raw materials in the location of industries. [B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উ: 'কাঁচামাল' (৩২১ পৃঃ) এবং 'শ্রমশিল্পের অবস্থান সম্বন্ধে আধুনিক তত্ত্ব' (পৃঃ ৩২৫—৩২৮ পৃঃ) লিখ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পরিবহণ-ব্যবস্থা

(Transportation System)

পরিবহণের ক্রমবিকাশ (Evolution of Transport)—আদিম যুগে মানুষ নিজে পশুপালন করিয়া বা কৃষিকার্য করিয়া জীবন ধারণ করিত। এই যুগে মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি অনুসারে চলিত। সাধারণতঃ মানুষ এক-স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইত না এবং মালপত্র পরিবহণের কোন প্রশ্নই সেই যুগে ছিল না। কারণ জিনিসপত্র বিক্রয় হইত না এবং একস্থান হইতে অন্যস্থানে মালপত্র প্রেরিত হইত না। কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদির বিক্রয় আরম্ভ হইল এবং ইহার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিল। একস্থান হইতে মালপত্র নিকটবর্তী গ্রামে বা হাটে-বাজারে প্রেরিত হইতে লাগিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ নিজেই মালপত্র বহন করিত। পৃথিবীর বহু অনুন্নত দেশে এখনও মানুষের মাথায় মালপত্র প্রেরিত হয়। বিশেষতঃ পার্বত্য অঞ্চলে উঁচু-নীচু, জমিতে মানুষ ভিন্ন অন্য কোন পরিবহণের বন্দোবস্ত করা কঠিন। হিমালয় পর্বতের আরোহিগণকে সর্বদা 'শেরপা'দের সাহায্যে মালপত্র পরিবহণ করিতে হয়। ভারত ও অন্যান্য দেশে কুলির মাথায় করিয়া মালপত্র লইবার দৃশ্য সর্বদাই চোখে পড়ে। আফ্রিকা মহাদেশের বহুস্থানে এখনও মানুষ পরিবহণের প্রধান অঙ্গ।

মানব-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় পশুর সাহায্যে মালপত্র ও মানুষ পরিবাহিত হইবার বন্দোবস্ত হইল। পশুকে বশ করিয়া এইভাবে মানুষের ব্যবহারে ইহাকে নিযুক্ত করা হইল। অশ্ব, গরু, মহিষ, গর্দভ, অশ্বতর প্রভৃতি পশু পরিবহণের প্রধান অঙ্গ হিসাবে পরিণত হইল। পশুর সাহায্যে এখনও পৃথিবীর বহুস্থানে মালপত্র ও মানুষ পরিবাহিত হয়। ইউরোপের বহুস্থানে এখনও অশ্বপৃষ্ঠে মালপত্র বহন করা হয়। বরফাচ্ছন্ন দেশে বল্গা হরিণ ও কুকুরের সাহায্যে মালপত্র ও মানুষ পরিবাহিত হইয়া থাকে। বালুকাময় মরুভূমিতে উষ্ট্রই পরিবহণের একমাত্র উপায়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে গরু, মহিষ, গর্দভ ও হাতীর সাহায্যে মালপত্র ও মানুষ পরিবাহিত হয়। গ্রামাঞ্চলে গরুর গাড়ীতে চড়িয়া এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে

মানুষের গমনাগমনের দৃশ্য সর্বদাই চোখে পড়ে। দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিজ পর্বত অঞ্চলে লামা ও ব্রহ্মদেশে হাতীর সাহায্যে এখন প্রচুর পরিমাণে মালপত্র প্রেরিত হয়।

শিল্পবিপ্লবের পর পরিবহণ-ব্যবস্থায়ও এক বিপ্লবের সৃষ্টি হইল। মানুষ জড়শক্তিকে মানুষের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিতে শিখিল। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার হওয়ায় বিভিন্ন **যান্ত্রিক যান** আবিষ্কৃত হইল; ইহার মধ্যে মোটর-গাড়ী, লরী, রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, জাহাজ, স্টীমার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জড়শক্তিকে ব্যবহার করিয়া মানুষ উন্নততর পরিবহণ-ব্যবস্থা আবিষ্কার করায় শুধু যে মানুষের ও পশুর শ্রমের লাঘব হইল তাহাই নহে, ইহার ফলে দ্রুতগামী পরিবহণ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় মানুষ ও মালপত্র এক-স্থান হইতে অন্যস্থানে সুলভে দ্রুত পরিবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার ফলে শুধু যে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহাই নহে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটর-গাড়ীর সাহায্যে মানুষ দ্রুত একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারে। ট্রামগাড়ীর সাহায্যে মানুষ নিকটবর্তী স্থানে সহজে চলাফেরা করিতে পারে, লরীর সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে দ্রুত মালপত্র প্রেরণ করা সম্ভব। রেলগাড়ীর সাহায্যে মানুষ ও মালপত্র উভয়ই দ্রুত দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে পরিবাহিত হইতে পারে। বর্তমানে রেলগাড়ী স্থলপথে শ্রেষ্ঠ পরিবহণ-ব্যবস্থা।

শিল্প-বিপ্লবের পূর্বে **জলপথে** পালের সাহায্যে কাষ্ঠনির্মিত জাহাজ চলাচল করিলেও ইহার সাহায্যে মালপত্র পরিবহণের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম। ইহা ছাড়া, একদেশ, হইতে অন্যদেশে ইচ্ছামতো দ্রুত যাতায়াত করাও সম্ভব ছিল না। ইস্পাত ও বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পরে জলপথেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইল। আভ্যন্তরীণ জলপথের জন্য স্টীমার এবং সমুদ্র-পথে চলাচলের জন্য আধুনিক ধরনের জাহাজ নির্মিত হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হইল।

মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবহণ-ব্যবস্থার আরও উন্নতি হইল। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যথাসম্ভব কম সময়ে সব কাজ করিতে চেষ্টা করিল। ইহার ফলে আবিষ্কার হইল **বিমানপোত**। ইহার সাহায্যে মানুষ অত্যন্ত দ্রুতবেগে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত

করিতে পারিল। বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিমানপথে পণ্যদ্রব্য পরিবহণের পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বর্তমান যুগে বিমানপথ খুবই জনপ্রিয়।

এইভাবে দেখা যায়, মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই গতিশীল জগতে পরিবহণ-ব্যবস্থাও ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

পৃথিবীর পরিবহণ-ব্যবস্থার ধরন (Transport Pattern of the World)—পূর্বের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল সম্পদ একস্থান হইতে অন্যস্থানে না পাঠাইলে মানুষের চাহিদা মিটানো যায় না। আধুনিক যুগে মানুষের চাহিদার শেষ নাই। পৃথিবীর কোন দেশই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। সেইজন্য কমবেশী বহু জিনিস প্রায় সকল দেশকেই অন্যদেশ হইতে আমদানি করিয়া আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে হয়।

বর্তমান যুগে পরিবহণ-ব্যবস্থার **প্রয়োজনীয়তা** বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি নির্ভর করে পরিবহণ-ব্যবস্থার উপর। পাট ভারত ও পাকিস্তানের একচেটিয়া সম্পদ। সকল দেশকেই পাটের জন্য এই দুই দেশের উপব নির্ভর করিতে হয়। পরিবহণ-ব্যবস্থা না থাকিলে ভারত ও পাকিস্তান এই পাট অন্য দেশে রপ্তানি করিতে পারিত না। সুতরাং পরিবহণ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত না থাকিলে পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করিয়া **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে** উন্নতি সাধন করা সম্ভব নহে। ইহা ছাড়া, আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে হইলে দেশের একস্থান হইতে অন্যস্থানে মালপত্র প্রেরণ করিতে হয়। এইজন্যও পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন। দেশের অভ্যন্তরে যানবাহনের সুবন্দোবস্ত না থাকিলে **আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য** শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না। বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড় কলিকাতা ও দিল্লীর বাজারে বিক্রয় করিতে হইলে এবং উত্তরপ্রদেশের চিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাঠাইতে হইলে যানবাহনের সুবন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া, **শিল্পের উন্নতি** বহুলাংশে পরিবহণ-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। কাঁচামাল শিল্পকেন্দ্রে আনিতে এবং শিল্পজাত দ্রব্য বাজারে পাঠাইতে যানবাহনের প্রয়োজন।

বর্তমান যুগে মানুষ সর্বদা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইয়া থাকে। পৃথিবীর কোনস্থানই এখন আর মানুষের কাছে দূর নহে। বিমানপথে

এখন কলিকাতা হইতে লণ্ডন বা মস্কো মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। পূর্বে একস্থানে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত থাকা সত্ত্বেও অন্যস্থানে **দুর্ভিক্ষ** হইয়া বহুলোক মারা যাইত। কিন্তু এখন পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় তাড়াতাড়ি খাদ্য প্রেরণ করিয়া দুর্ভিক্ষের কবল হইতে মানুষকে রক্ষা করা যায়। **দেশরক্ষার** জন্য পরিবহণ-ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। একস্থান হইতে অন্যস্থানে সৈন্য ও রসদ পাঠাইতে যানবাহনের প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহু **প্রাকৃতিক সম্পদ** বিদ্যমান। কখনও মরুভূমিতে, কখনও গহন অরণ্যে, কখনও বা পাহাড়-পর্বতে বহু খনিজ বা বনজ সম্পদ পাওয়া যায়। এই সম্পদ আহরণ করিতে হইলে সুষ্ঠু পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন। যানবাহন-ব্যবস্থার ফলে সুদূর অস্ট্রেলিয়া, আলাস্কা ও ট্রান্সভালের স্বর্ণ, কিম্বার্লির হীরক, রোডেশিয়া ও চিলির তাম্র আহরণে কোন অসুবিধা হইতেছে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মানুষের সকলপ্রকার **অর্থনৈতিক উন্নতি** পরিবহণ-ব্যবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থার পারস্পরিক সুবিধা ও অসুবিধা (Comparative Advantages and disadvantages of different forms of transports)—আধুনিক যান্ত্রিক যুগে বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিলেও জলপথে জাহাজে, স্থলপথে রেলগাড়ী ও মোটর-গাড়ী এবং আকাশপথে বিমানপোত শ্রেষ্ঠ পরিবহণ-ব্যবস্থা। বর্তমান যুগের মানুষ চায় কিভাবে সুলভে দ্রুতবেগে মালপত্র একস্থান হইতে অন্যস্থানে লওয়া যায়, কিভাবে মানুষ মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। বর্তমান স্পুটনিকের যুগে পরিবহণ-ব্যবস্থায় মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে। পরিবহণ-ব্যবস্থার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথমে স্থলপথে ইহার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ জলপথে নৌকায় বা পাল-চালিত জাহাজে মানুষ যাতায়াত করিতে আরম্ভ করে। শিল্প-বিপ্লবের পর যান্ত্রিক যানের প্রবর্তন হওয়ায় পরিবহণ-ব্যবস্থায় এক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়।

বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রধানতঃ জাহাজ ব্যবহৃত হইলেও *বিমানপথের* উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিমানপোতের সাহায্যে মালপত্র পরিবহণের পরিমাণও ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও

দ্রুত মালপত্র পরিবহণের জন্য ক্রমশঃই বিমানপোত ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে। যাত্রী-পরিবহণের ব্যাপারেও পূর্বাপেক্ষা বিমানপোতের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বিমানপোতের **দ্রুত বেগ**। স্পুটনিক যুগের মানুষ একদেশ হইতে অন্যদেশে যাইতে এক মাস বা দেড় মাস সময় দিতে চাহে না। তাহারা চায় কত বেশী দ্রুতবেগে মালপত্র বা মানুষকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবাহিত করা যায়। এইজন্য আজ বিমানপোত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। অন্যদিকে **খরচের প্রশ্ন**ও আছে। বিমানপোত জনপ্রিয় এবং দ্রুতগামী হইলেও ইহা সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল পরিবহণ-ব্যবস্থা। জাহাজ বা রেলপথ অপেক্ষা বিমানপথে যাইতে অনেক বেশী খরচ লাগে। ইহার প্রধান কারণ বিমানপোতের শক্তিসম্পদের (খনিজ তৈল) খরচ ও মূল্য অধিক। পৃথিবীর অধিকাংশ খনিজ তৈল কয়েকটি মার্কিন, বৃটিশ, ডাচ ও ফরাসী একচেটিয়া কোম্পানীর করতলভুক্ত। ইহারা একত্রিত হইয়া খনিজ তৈলের উচ্চমূল্য বজায় রাখে; কিন্তু বর্তমানে রাশিয়া ও রুমানিয়ার তৈল পৃথিবীর বাজারে বিক্রীত হইতে আরম্ভ করায় ইহাদের একচেটিয়া সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যদি খনিজ তৈলের মূল্য নামিয়া যায় এবং বিমানপোতের কারিগরী উন্নতি আরও সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহা হইলে হয়তো এমন দিন আসিবে যখন বিমানপথে মালপত্র ও মানুষ পরিবহণ মোটেই ব্যয়সাধ্য হইবে না। বিমানপোত-নির্মাণে মানুষ ক্রমশঃই অধিকতর দক্ষতা অর্জন করিতেছে। বর্তমানে একখানা বিমানপোতে কয়েক শত মানুষ ও কয়েক শত টন মালপত্র পরিবাহিত হইতে পারে। বিমানপোতের পরিবহণ-ক্ষমতা যে আরও বৃদ্ধি পাইবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে? আশা করা যায়, শীঘ্রই বিমানপথ আরও সুলভ হইবে এবং ইহাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিবহণ-ব্যবস্থায় পরিণত হইবে।

পরিবহণ-ব্যবস্থায় খরচের প্রশ্ন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রতিযোগিতার জগতে যে সুলভে পরিবহণ-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিতে পারিবে, তাহার পণ্যদ্রব্যের মূল্য সাধারণতঃ কম হইবে। **জলপথ** ধীরগামী হইলেও সর্বাপেক্ষা সুলভ। এইজন্য পৃথিবীর অধিকাংশ সামুদ্রিক বাণিজ্য জাহাজের মারফত সংঘটিত হয়। একখানা জাহাজে ৮০০০, ১০,০০০, এমনকি ২৫,০০০ টন পর্যন্ত মালপত্র প্রেরিত হইতে পারে। জলপথে রাস্তা-নির্মাণ বা অন্যান্য খরচ বিশেষ হয় না। সুলভ কয়লা ও ডিজেল তৈলের সাহায্যে ইহা চালিত

হয়। সুতরাং জলপথে সুলভে একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণ মালপত্র পরিবাহিত হইতে পারে। কিন্তু গতিবেগের দিক হইতে জলপথে মালপত্র প্রেরণ করার অসুবিধা আছে। আশার কথা, বর্তমানে রাশিয়াতে পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে জাহাজ চালিত হইতেছে। ইহাতে যে শুধু জাহাজের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাই নহে, পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন-খরচ কম হইলে, জাহাজ চালাইবার খরচ বহুলাংশে কমিয়া যাইবে। বর্তমানে রাশিয়াতে পারমাণবিক শক্তিচালিত লেনিন নামে যে বরফ-ভাঙা জাহাজ আছে, তাহাতে একবার পারমাণবিক ইন্ধন দিলে এক বৎসরের মধ্যে আর ইন্ধন যোগাইবার প্রয়োজন হয় না।

স্থলপথে **রেলপথ** বর্তমানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবহণ-ব্যবস্থা। রেলগাড়ী দ্রুতগামী এবং ইহার খরচও অত্যন্ত কম। দূরবর্তী স্থানে যাইবার জন্য ও গুরুভার পণ্যদ্রব্য প্রেরণের জন্য রেলপথ শ্রেষ্ঠ পরিবহণ-ব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমানে মোটর-গাড়ী ও লরীর সাহায্যেও বহু মানুষ ও প্রচুর মালপত্র পরিবাহিত হইতেছে। সকল স্থানে রেলপথ-নির্মাণ সম্ভব নহে। ভৌগোলিক অসুবিধা ছাড়াও, সবসময় গ্রামাঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ করিয়া খরচ পোষায় না। কারণ রেলপথে অধিক মালপত্র ও যাত্রী পরিবাহিত হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য গ্রামাঞ্চলে রেল-স্টেশন হইতে গন্তব্যস্থানে যাইতে মোটরপথ শ্রেষ্ঠ পরিবহণ-ব্যবস্থা। ইহা দ্রুতগামী কিন্তু রেলপথ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয়বহুল। কিন্তু অল্পদূরে দ্রুত পরিবহণে রেলপথ অপেক্ষা মোটরপথ অধিক কার্যকরী। মোটর-গাড়ী যদৃচ্ছ ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু রেলপথে নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট রাস্তায় চলিতে হয়। মোটরপথও বহুলাংশে খনিজ তৈলের মূল্যের উপর-নির্ভরশীল। বর্তমানে বহু দেশে সংগঠিতভাবে মোটরপথে প্রচুর মালপত্র পরিবাহিত হইতেছে। বাসে করিয়া যাত্রী-পরিবহণের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সকল দেশেই বিদ্যমান।

জলপথ অপেক্ষা স্থলপথের কয়েকটি **সুবিধা** আছে। স্থলপথের ন্যায় জলপথে পোতসমূহ যদৃচ্ছ চলাচল করিতে পারে না; কারণ, অনেকসময়েই নদীর বা সমুদ্রের গতি এবং পণ্যদ্রব্য পরিবহণের গতি এক নহে; অন্যদিকে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথে কয়েকটি সুবিধা বিদ্যমান। স্থলপথ অপেক্ষা জলপথে শুধু যে সুলভে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করা যায় তাহাই নহে, স্টীমার বা জাহাজ পরিচালনার ব্যয় অল্প; জলপথ নির্মাণের জন্য বা রক্ষণাবেক্ষণের

জন্য কোন ব্যয় হয় না। সমুদ্রপথে গুরুভার দ্রব্যাদি পরিবহণের জন্য জলপথ একমাত্র পরিবহণ-ব্যবস্থা।

বর্তমান যুগে **নলপথ (Pipe-line)** খনিজ তৈল ও গ্যাস পরিবহণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহার পরিবহণ-খরচ রেলপথের খরচের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এবং ইহার মাধ্যমে নিরাপদে তৈল ও গ্যাস বহুদূরে পাঠানো যায়।

পরিবহণ-ব্যবস্থার সমন্বয়-সাধন ও সংহতি-স্থাপন (Transport Co-ordination and Integration)—উপরের আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন পরিবহণ-ব্যবস্থায় সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই বিদ্যমান। সকল রকমের পরিবহণ-ব্যবস্থা সকল স্থানে প্রযোজ্য নহে। যেমন, গ্রামের অভ্যন্তর পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন করা সম্ভব নহে। জলপথের বিস্তার সীমাবদ্ধ। আকাশপথে সর্বত্র বিচরণ করা গেলেও সকল স্থানে বিমানবন্দর না থাকায় নীচে নামিবার সুবিধা নাই। মোটর-গাড়ী ও লরীর যাতায়াত নির্ভর করে রাস্তাঘাটের উন্নতির উপর। ইহা ছাড়া, সকল দ্রব্য সকল প্রকার পরিবহণ-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রেরণ করা সম্ভব নহে। গুরুভার দ্রব্যাদি আকাশপথে প্রেরণ করা প্রায় অসম্ভব। খরচের তারতম্যের জন্য সকল মানুষের পক্ষেও সকল প্রকার পরিবহণ-ব্যবস্থা উপযোগী হয় না।

এই সকল কারণে দেশের পরিবহণ-ব্যবস্থার সমন্বয়-সাধন একান্ত প্রয়োজন। পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিলেই এই সমন্বয়-সাধন সম্ভবপর। যে সকল পণ্যদ্রব্য গুরুভার তাহা রেলপথে বা জাহাজে পাঠানো উচিত। লঘুভার দ্রব্যাদি দ্রুত পৌঁছাইবার প্রয়োজন হইলে রেলপথে বা আকাশপথে প্রেরণ করা প্রয়োজন। পচনশীল দ্রব্যাদির জন্য দ্রুত পরিবহণ-ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। হাতে সময় রাখিয়া পণ্যদ্রব্য পাঠাইলে অপেক্ষাকৃত কম দ্রুতগামী স্টীমার বা জাহাজ ব্যবহার করা যায়। ইহা ছাড়া, পরিবহণ-ব্যবস্থার বিস্তার ও পরিকল্পনার মাধ্যমে করিলে ইহার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। যেমন, দূরত্বের সঙ্কোচনের জন্য রেলপথ বিশেষ উপযোগী। দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই রেলপথ হইতে গ্রামের অভ্যন্তরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য মোটরপথ থাকা একান্ত প্রয়োজন। যেখানে রেলপথ বিদ্যমান, সেখানে মোটরপথে মালপত্র প্রেরণ করিলে শুধু প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে, জাতির

উন্নতি হইবে না। কিন্তু ভারতের মতো যে সকল দেশে রেলপথ পরিবহণের চাহিদা মিটাইতে পারে না, সেখানে পাশাপাশি মোটরপথের উন্নতিসাধন না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু এক্ষেত্রেও মোটরপথ অল্প দূরত্বের স্থানের মধ্যে গণ্য পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

আভ্যন্তরীণ জলপথ, রেলপথ বা মোটরপথ অপেক্ষা সুলভ। সেইজন্য যেখানে **জলপথ** বিদ্যমান, সেখানে জলপথের উন্নতি সাধন করিয়া যতদূর সম্ভব পণ্যদ্রব্য জলপথের মাধ্যমে প্রেরণ করা উচিত। এইজন্য প্রয়োজন হইলে খাল খনন করিয়া জলপথের যোগাযোগ-ব্যবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন। জার্মানীর উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ ঐ দেশের আভ্যন্তরীণ জলপথের প্রভূত উন্নতি। রাইন নদীর জলপথে ঐ দেশের প্রচুর পণ্যদ্রব্য, কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য সুলভে পরিবাহিত হয়। ইহাতে শিল্পের উৎপাদন-খরচ কমিয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতিতে পঞ্চ-হ্রদের জলপথ প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। অনেকসময় আভ্যন্তরীণ জলপথে বাধা-বিঘ্ন দেখা দিলেও তাহা অতিক্রম করিয়া, খালপথের উন্নতিসাধন করিয়া সুলভ জলপথে যতদূর সম্ভব পণ্যদ্রব্য পরিবাহিত হওয়া উচিত। আভ্যন্তরীণ জলপথে নৌকা, স্টীমার প্রভৃতির সাহায্যে মানুষ ও পণ্যদ্রব্য পরিবাহিত হইতে পারে।

আকাশপথে শুধু সেই সমস্ত জিনিস পরিবাহিত হওয়া উচিত যাহার ওজন কম, পচনশীল এবং মূল্য বেশী। তাহা না হইলে পরিবহণ-খরচ পোষানো কঠিন। আকাশপথের বিস্তার সামরিক ও বাণিজ্যিক কারণে হইলেও যাত্রী-পরিবহণের জন্যই ইহার ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত। এইভাবে বিভিন্ন পরিবহণ-ব্যবস্থার পরিবহণ-ক্ষমতা ও খরচ অনুসারে পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের পরিবহণ-ব্যবস্থার সমন্বয়-সাধন ও সংহতি-স্থাপন করা প্রয়োজন।

উৎপাদন-অঞ্চলের বণ্টনের উপর পরিবহণ-ব্যয়ের প্রভাব (Impact of Transport-cost on World distribution of productive activities)—সম্পদ উৎপাদনের উপর পরিবহণ-ব্যবস্থা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বর্তমান যুগে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় সাধারণতঃ বাজারে বিক্রয় করিয়া বা রপ্তানি করিয়া অর্থাগমের জন্য। উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর পরিবহণ-ব্যবস্থা দুইভাবে প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমতঃ, কাঁচামাল ও শক্তি-

সম্পদ উৎপাদনকেন্দ্রে আনিবার জন্য পরিবহণ-ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। কলিকাতার পাটশিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের সুলভ জলপথ ও রেলপথ। জলপথে পূর্ব পাকিস্তান হইতে সহজেই কম-ভাড়ায় পাট কলিকাতায় আনা যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য স্থান হইতে পাট এবং রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া হইতে কয়লা রেলপথে কলিকাতার পাটকলে আনীত হয়। হ্রদ অঞ্চলের সুলভ পরিবহণ-ব্যবস্থার জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশে ইস্পাতশিল্প গড়িয়া উঠা সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য বাজারে পাঠাইতে বা রপ্তানি করিতে পরিবহণ-ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। কলিকাতার পাটশিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যাদি কলিকাতা বন্দর মারফত জাহাজে

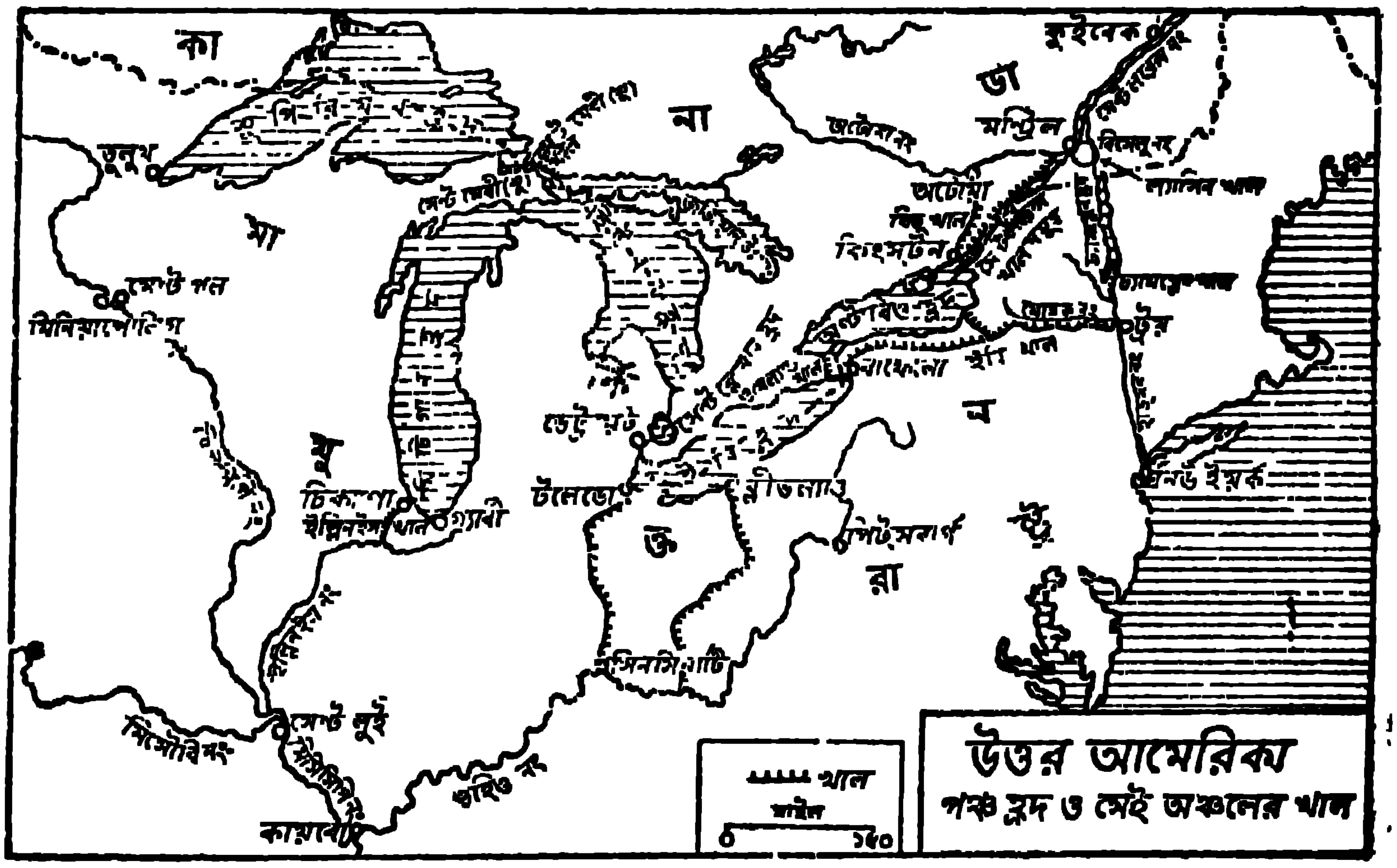

করিয়া বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। পরিবহণ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। অন্যদিকে পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবে বহু দেশ শিল্পে বা দ্রব্যাদির উৎপাদনে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। ব্রেজিলে প্রচুর সম্পদ থাকিলেও পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়। ভারতে প্রচুর কয়লা খনি হইতে উত্তোলনের পর পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবে খনির নিকটেই পড়িয়া থাকে। ইহাতে কয়লা ভোগকেন্দ্রে দ্রুত পাঠানো সম্ভব হয় না এবং খনির মালিকের মূলধন আটক থাকে। ইহার ফলে এই দেশে কয়লা-উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে।

উৎপাদনের বিভিন্ন খরচের মধ্যে পরিবহণ-খরচ অন্যতম। কাঁচামাল ও

শক্তিসম্পদ উৎপাদনকেন্দ্রে আনিতে এবং পণ্যদ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রে পৌঁছাইতে যে খরচ হয়, তাহা উৎপাদনের খরচের অন্তর্ভুক্ত। সুলভ পরিবহণ-ব্যবস্থা উৎপাদনে প্রভূত সাহায্য করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, **জলপথে** পণ্যদ্রব্য পরিবহণের খরচ সর্বাপেক্ষা কম। সেইজন্য যে সকল দেশ জলপথের ব্যবহার বেশী করিতে পারে, সেই সকল দেশের উৎপাদন-খরচ কম হয়। রাইন নদীর জলপথের সাহায্যে রুঢ় শিল্পাঞ্চল এবং পঞ্চহ্রদের জলপথের সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশের শিল্পাঞ্চল ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পঞ্চহ্রদে জলপথের পরিবহণ-খরচ রেলপথের খরচের $\frac{1}{10}$ ভাগ। সুতরাং যে সকল দেশ এইরূপ জলপথে সমৃদ্ধিশালী তাহারা কম-খরচে পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। জলপথের সুলভ পরিবহণ-ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন উৎপাদনকেন্দ্র, বিশেষতঃ শিল্পাঞ্চল জলপথের নিকটবর্তী অঞ্চলেই বাড়িয়া ওঠে। চিকাগো, প্যারী, নীপারপেট্রোভস্ক, রুঢ়, কলিকাতা প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্র সুলভ জলপথের সুযোগ গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জলপথ শ্রেষ্ঠ পরিবহণ-ব্যবস্থা বলিয়া রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির উৎপাদনকেন্দ্র অনেকসময় বন্দরের নিকটে গড়িয়া উঠে। ইহাতে পণ্যদ্রব্য সোজা কারখানা হইতে জাহাজে ভর্তি করা যায়। কলিকাতার পাটশিল্প গড়িয়া উঠার ইহাই প্রধান কারণ।

খরচের ব্যাপারে জলপথের পর রেলপথের স্থান। **রেলপথ** দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। জলপথ প্রধানতঃ প্রকৃতির দান। সেইজন্য সর্বত্র জলপথে পরিবহণ-ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে না। কিন্তু রেলপথ মানুষের সৃষ্টি। সুতরাং রেলপথ নির্মাণের ভৌগোলিক সুবিধা থাকিলেই মানুষ রেলপথ নির্মাণ করিতে পারে। পৃথিবীর বহু উৎপাদনকেন্দ্র রেলপথের সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। মস্কো অঞ্চলের প্রধান পরিবহণ-ব্যবস্থা রেলপথ। এই শিল্পাঞ্চল হইতে দেশের বিভিন্ন স্থানে রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। ডোনেৎস অঞ্চল হইতে রেলপথে কয়লা ও লৌহ আকরিক আনিয়া এখানে বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে।

কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদ আনিবার খরচ বেশী হইলেও পণ্যদ্রব্য ভোগকেন্দ্রে পাঠাইতে অপেক্ষাকৃত কম-খরচ হইলে ভোগকেন্দ্রের নিকট উৎপাদন অঞ্চল গড়িয়া ওঠে। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গে কার্পাসবয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই রাজ্যে তুলা আনিবার পরিবহণ-খরচ অপেক্ষাকৃত

বেশী হইলেও পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহারের ভোগকেন্দ্রে পণ্যদ্রব্য পাঠাইতে খরচ অনেক কম। সেইজন্য কাঁচামালের পরিবহণ-খরচ বেশী হইলেও উৎপাদিত দ্রব্যের পরিবহণ-খরচ কম হওয়ায় বহু শিল্প ভোগকেন্দ্রের নিকট স্থাপিত হয়। সাধারণতঃ যে সকল দ্রব্য **কাঁচামাল** থাকাকালীন **ওজনে ভারী** থাকে অথচ ভোগ্যদ্রব্য তৈয়ারী হইবার পর ওজনে কমিয়া যায়, সেই সকল দ্রব্যের উৎপাদক অঞ্চল কাঁচামালের প্রাপ্তিস্থানের নিকট সাধারণতঃ গড়িয়া ওঠে; কারণ ইহাতে পরিবহণ-খরচ বহুলাংশে কমিয়া যায়। কিন্তু যে সকল **কাঁচামাল অত্যন্ত হালকা** এবং ভোগ্যদ্রব্যে পরিণত হইবার পরেও ওজনে বিশেষ কমে না, সেই সকল দ্রব্যের উৎপাদক অঞ্চল সাধারণতঃ ভোগকেন্দ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলেই গড়িয়া ওঠে। পশমবয়নশিল্প ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পৃথিবীর অধিকাংশ পশম উৎপন্ন হয় দক্ষিণ গোলার্ধের অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে; কিন্তু পশমবয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে উত্তর গোলার্ধের শীতপ্রধান শিল্পাঞ্চলে (বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি), কারণ কাঁচা-পশম হইতে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশসমূহে পশম-বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া উত্তর গোলার্ধের ভোগকেন্দ্রে আনিতে যে পরিবহণ-খরচ হইত, কাঁচা-পশম আনিতে তাহা অপেক্ষা খুব বেশী খরচ হয় না। অন্যদিকে উত্তর গোলার্ধের শিল্পাঞ্চলে ভারী যন্ত্রপাতির সুলভ-সভ্যতা এবং নিপুণ শ্রমিক ও মূলধনের প্রাচুর্য শিল্পস্থাপনের সহায়ক।

পরিবহণ-ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক বিশেষীকরণ (Transportation and Regional Specialization)—পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বর্তমান জটিল উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীনকালে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির যুগে মানুষ নিজের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করিত। ক্রমশঃ বুদ্ধিমান্ মানুষ বুঝিতে পারিল যে, সকল জিনিস সকল স্থানে সুলভে উৎপাদন করা যায় না। কারণ বিভিন্ন জিনিসের উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন রকম কাঁচামাল ও অন্যান্য উপাদান প্রয়োজন। এই কাঁচামাল সকল দেশে সমান মূল্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং যে সকল দেশে সর্বাপেক্ষা কমমূল্যে কাঁচামাল ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান পাওয়া যায়, সেখানেই সেই জিনিসের উৎপাদনকেন্দ্র গড়িয়া তুলিলে উৎপাদন-খরচ বাঁচিয়া যায়। পাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণে পাট সুলভে উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই দেশে যত সুলভে পাটজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন করা যাইবে, অন্য দেশে ততটা সুলভে করা

যাইবে না। কারণ উৎপাদনকেন্দ্রে পাট আনিতে এখানে খরচ সবচেয়ে কম। আবার এই দেশে কয়লা ও লৌহের অভাবে যন্ত্রপাতি ও ইস্পাত-শিল্পের উন্নতি সাধন করা অনেক ব্যয়সাধ্য; কারণ ইহা করিতে হইলে ভারী লৌহ ও কয়লা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইবে এবং ইহার পরিবহণ-খরচ অনেক বেশী হইবে। অন্যদিকে বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়লা ও লৌহ আকরিকের অভাব না থাকায় ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি শিল্প গড়িয়া উঠা সহজ। ইহার ফলে এই সকল দেশে সুলভে যন্ত্রপাতি ও ইস্পাত পাওয়া যায়। সুতরাং পাকিস্তান এই সকল দেশ হইতে সুলভে যন্ত্রপাতি আমদানি করিয়া সস্তায় পাটজাত দ্রব্য এই সকল দেশে রপ্তানি করিলে এই তিনটি দেশই লাভবান্ হইবে। এইজন্য বর্তমান পৃথিবীতে সকল দেশ সকল জিনিস উৎপাদন না করিয়া যাহারা সুলভে যে সকল জিনিস উৎপাদন করিতে পারে, তাহাদের উপর ইহার উৎপাদনের দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাকেই বলা হয় আঞ্চলিক বিশেষীকরণ। উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, আঞ্চলিক বিশেষীকরণের মূলে রহিয়াছে পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি।

বাণিজ্যপথ ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ (Trade routes and Economic Activity)—মানব-সভ্যতার ইতিহাসে পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-সমস্যাও ক্রমশঃ জটিলতর আকার ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন যুগের সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি বহুদিন পূর্বেই অবলুপ্ত হইয়াছে। বর্তমানে লণ্ডনের লোক সকালে উঠিয়াই ভারতের চা, ব্রেজিলের কফি বা ঘানার কোকো পান করে। কোন দেশ প্রতিটি জিনিস নিজেই উৎপন্ন করে না, পরিবহণ-ব্যবস্থার সুবিধার জন্য যে দেশে সবচেয়ে সুলভে কোন জিনিস পাওয়া যায়, সেই দেশ হইতে আমদানি করে। বৃটেন কার্পাস-বয়নশিল্পে অত্যন্ত উন্নত হইলেও ভারত হইতে কার্পাস-বস্ত্র আমদানি করে।

পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজের সুবিধা অনুসারে নির্দিষ্ট কয়েকটি দ্রব্য-উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। বর্তমানে উন্নত পরিবহণ-ব্যবস্থার মাধ্যমে একদেশ হইতে অন্যদেশে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা যায়। সুতরাং কোন একটি দেশকে সব জিনিস উৎপন্ন করিতে হয় না; শুধু যে জিনিসটি সেই দেশ ভালোভাবে কম-খরচে বেশী পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারে, সেই জিনিসটিই ঐ দেশ

উৎপন্ন করে। ইহাকেই **আঞ্চলিক বিশেষীকরণ (Regional Specialisation)** বলে।

পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির উপর এই আঞ্চলিক বিশেষীকরণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এই পরিবহণ-ব্যবস্থার একটি প্রধান অঙ্গ **বাণিজ্যপথ (Trade route)**। একস্থান হইতে বাণিজ্যিক মালপত্র প্রেরণের জন্য যে পথ ব্যবহৃত হয়, তাহাকেই বাণিজ্যপথ বলে। উত্তর আটলান্টিক বাণিজ্যপথ, সুয়েজ খালপথ, পানামা খালপথ, উত্তর আমেরিকার পঞ্চহ্রদ বাণিজ্যপথ ইহার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এই সকল বাণিজ্যপথের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এই সকল বাণিজ্যপথ সৃষ্টি হইবার ফলে একস্থান হইতে অন্যস্থানে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ সহজসাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইয়াছে। অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য পরিবহণ-ব্যবস্থার ও বাণিজ্যপথের উন্নতিসাধন অপরিহার্য হইয়াছে। ইহার ফলে সৃষ্টি হইয়াছে নূতন নূতন বাণিজ্যপথের।

প্রথমে ধরা যাক যে, পরিবহণ-ব্যবস্থা ও বাণিজ্যপথের উন্নতির জন্য মানুষের **অর্থনৈতিক কার্যকলাপ (Economic activity)** (যথা, উৎপাদন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি) বৃদ্ধি পায়। ইহা ঠিক যে, **বাণিজ্যপথ** না থাকিলে পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান ইত্যাদি হওয়া সম্ভব নহে এবং ইহার ফলে আঞ্চলিক বিশেষীকরণও কার্যকরী হয় না। উত্তর আটলান্টিক বাণিজ্যপথের জন্য আজ উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে অত্যধিক বাণিজ্য সম্পন্ন হইতেছে এবং পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছে।

অন্যদিকে ইহাও সত্য যে, মানুষের **অর্থনৈতিক কার্যকলাপ** বৃদ্ধি পাইবার জন্য বাণিজ্যপথের সৃষ্টি হইয়াছে। এশিয়ার দেশগুলির অপর্যাপ্ত কাঁচামাল যখন পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হইল এবং যখন পশ্চিম ইউরোপের শিল্পজাত দ্রব্যাদি এশিয়ার দেশসমূহে আনিয়া বিক্রয়ের প্রয়োজন হইল, তখন প্রয়োজন হইল সোজাপথে ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যপথ নির্মাণের ; সৃষ্টি হইল সুয়েজ খাল ; ভূমধ্যসাগর-সুয়েজ-অস্ট্রেলিয়া জলপথ পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যপথ বলিয়া বিবেচিত হইল। এইভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ-বৃদ্ধির জন্যও

বাণিজ্যপথের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও বাণিজ্য-পথ উভয়েই উভয়ের উপর নির্ভরশীল এবং একে অন্যকে ছাড়া চলিতে পারে না।

নিম্নে দুইটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টিকে আরও সহজভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইল :

(ক) **উত্তর আটলাণ্টিক জলপথ** পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যপথ। ইহার শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রহিয়াছে ইহার দুই তীরের দুইটি মহাদেশের কর্মচঞ্চল শিল্পাঞ্চল। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল এবং বন্দরসমূহ, অন্যদিকে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিল্পাঞ্চলসমূহ। উভয় তটে অপর্যাপ্ত সম্পদ্—প্রাকৃতিক সম্পদ্, মনুষ্যসম্পদ্ ও সাংস্কৃতিক সম্পদ্ বিদ্যমান। উভয় তটের মানুষ অত্যন্ত উন্নত, শিক্ষিত ও কর্মপটু; ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ্—কয়লা, লৌহ আকরিক, কাঠ, স্বর্ণ, তাম্র প্রভৃতি। ইহার ফলে উভয় তটের দেশসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, যাহা বিদেশে রপ্তানি করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ফলে সৃষ্টি হইয়াছে বাণিজ্যিক প্রয়োজনের এবং বাণিজ্যপথের। উত্তর আটলাণ্টিক জলপথ সেই প্রয়োজন মিটাইয়াছে এবং শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যপথে পরিণত হইয়াছে।

(খ) **ভূমধ্যসাগর-সুয়েজ-অস্ট্রেলিয়া জলপথ** একদিকে শিল্পপ্রধান পশ্চিম ইউরোপ, অন্যদিকে ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াকে যুক্ত করিয়াছে। সুয়েজখাল এই জলপথের সংযোজক। এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের বাণিজ্যিক যোগাযোগ (বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ) বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যাওয়া অত্যন্ত ব্যয়বাহুল্য ও সময়সাপেক্ষ হওয়ায় এই জলপথের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যদিকে এই জলপথের বিভিন্ন স্থানে অপর্যাপ্ত সম্পদ্ (খনিজ তৈল, কয়লা, তুলা, লৌহ আকরিক, পশম, স্বর্ণ, টিন্ প্রভৃতি) পাওয়া যায় বলিয়া এই জলপথের গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে।

এইভাবে দেখা যায় যে, একদিকে যেমন মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হইতে বাণিজ্যপথের সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে তেমনি বাণিজ্যপথের জন্যও মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়।

বাণিজ্যকেন্দ্র (Trade Centres)

পূর্বের অধ্যায়ে মালপত্র একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণের জন্ত প্রয়োজনীয় পরিবহণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। মানুষের নানাবিধ চাহিদা মিটাইবার জন্ত বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য পরিবহণ-ব্যবস্থার মারফত বিক্রয়কেন্দ্রে আনীত হয়। যে সকল স্থানে এই সকল পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ সংগৃহীত হয় এবং পরে কিয়দংশ নানাস্থানে প্রেরিত হয়, সেই স্থানকে **বাণিজ্যকেন্দ্র** বলে।

পৃথিবীর বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক বা অর্থনৈতিক কারণে প্রথমে বিভিন্ন স্থানে মানুষের সমাগম হইল। এই সকল মানুষের চাহিদা মিটাইতে পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের জন্য বহু মিলনস্থানের সৃষ্টি হইল। ক্রমে শহর ও নগর গড়িয়া উঠিল এবং ক্রয়-বিক্রয়কেন্দ্রের সৃষ্টি হইল। ধীরে ধীরে এইভাবে বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সৃষ্টি হইল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বন্দরের গুরুত্ব বাড়িয়া গেল এবং ইহা বড় বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইল।

বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়:—(ক) বন্দর ও পোতাশ্রয় এবং (খ) শহর ও নগর।

(ক) বন্দর ও পোতাশ্রয় (Ports & Harbours)

বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রের মধ্যে **বন্দর** অন্যতম। বন্দর জলপথ ও স্থলপথের সংযোগস্থল। ইহা জলপথ হইতে স্থলভাগে প্রবেশ করিবার দ্বারস্বরূপ।

বন্দরের কার্য (Functions of a Port)—সাধারণতঃ বিদেশে জলপথে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করিতে হইলে বন্দরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। আবার বিদেশ হইতে নানাবিধ পণ্যদ্রব্য বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করিয়া দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়। এইভাবে পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানির সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াই বন্দরের প্রধান কার্য। অনেকসময় পুনরায় রপ্তানি করিবার উদ্দেশ্যে বিবিধ সামগ্রী আমদানি করা হয়; যে সকল বন্দরে এইপ্রকার বাণিজ্যের আধিক্য দেখা যায়, তাহাদিগকে **মাধ্যম-বন্দর (Entrepot)** বলা হয়।

ছোটবড় অনেক জাহাজ বন্দরে পণ্যদ্রব্য লইয়া আসে। জাহাজগুলি যাহাতে নিরাপদে বন্দরে থাকিতে পারে এবং মালপত্র উঠানামা করিতে পারে তাহার সুবন্দোবস্ত করা বন্দরের অন্যতম কাজ। সমুদ্রের ঢেউ ও ঝড় হইতে জাহাজকে রক্ষা করিতে না পারিলে বন্দরের উন্নতি হয় না। এইজন্য বন্দর-সংলগ্ন জলের গভীরতা ও আদর্শ পোতাশ্রয় প্রয়োজন। আফ্রিকার দেশগুলিতে সমুদ্রের উপকূল অগভীর থাকায় জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে না এবং বন্দরের অনতিদূরে সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকে। এইজন্য এই সকল দেশে বন্দর ভালোভাবে গড়িয়া ওঠে না। **জাহাজের নিরাপত্তা** ছাড়াও, জাহাজ হইতে মাল খালাস করিবার ও জাহাজে মালপত্র তুলিবার যান্ত্রিক বন্দোবস্ত, আরোহিগণের অবরোহণ ও আরোহণের সুবন্দোবস্ত, মালপত্র মজুত করিবার গুদামঘর ও পণ্যদ্রব্য-চলাচলের জন্য যানবাহনের সুবন্দোবস্ত করা বন্দরের অন্যতম কার্য।

পোতাশ্রয় (Harbours)—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বন্দরের উন্নতি-সাধনের জন্য আদর্শ পোতাশ্রয় প্রয়োজন। যেস্থানে জাহাজগুলিকে নিরাপদে রাখিয়া পণ্যদ্রব্য উঠানামা করিতে হয় বা অন্যান্য কারণে জাহাজগুলিকে থাকিতে দেওয়া হয়, সেই স্থানকে **পোতাশ্রয়** বলে। পোতাশ্রয় দুই-প্রকার—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। যে সকল পোতাশ্রয়ের নিকটবর্তী সমুদ্রতীর বা নদীতীর অত্যন্ত ভগ্ন এবং যাহার প্রায় চারিদিকে স্বাভাবিক স্থলভাগ বিদ্যমান এবং যেখানে জাহাজ নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, সেই সকল পোতাশ্রয়কে **স্বাভাবিক পোতাশ্রয়** বলে। লিভারপুল, বোম্বাই প্রভৃতি বন্দরে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় বিদ্যমান। যে সকল সমুদ্রোপকূলে এইপ্রকার স্বাভাবিক ভৌগোলিক অবস্থার অভাব এবং যেখানে কৃত্রিম উপায়ে জাহাজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহাকে **কৃত্রিম পোতাশ্রয়** বলে। প্রাচীর দ্বারা সমুদ্রের ঢেউ ভাঙ্গিয়া এবং ড্রেজার দ্বারা পোতাশ্রয়ের গভীরতা বজায় রাখিয়া কৃত্রিম পোতাশ্রয় সৃষ্টি করা হয়। মাদ্রাজ, লস্ এঞ্জেল্‌স্ প্রভৃতি বন্দরে এইপ্রকার কৃত্রিম পোতাশ্রয় আছে। **আদর্শ পোতাশ্রয়** হইতে হইলে উপকূল-সন্নিহিত অঞ্চলে সমুদ্রের যথোপযুক্ত গভীরতা থাকা প্রয়োজন এবং সমুদ্রস্রোত ও ঝড় হইতে জাহাজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার; শীতকালে পোতাশ্রয় বরফমুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পশ্চাদ্‌ভূমি (Hinterland)—যে অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য কোন বন্দরের মারফত বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং ঐ বন্দরের মাধ্যমে আমদানিকৃত মালপত্র যে সকল অঞ্চলে প্রেরিত হয়, সেই সকল অঞ্চলকে ঐ বন্দরের **পশ্চাদ্‌ভূমি** বলে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি

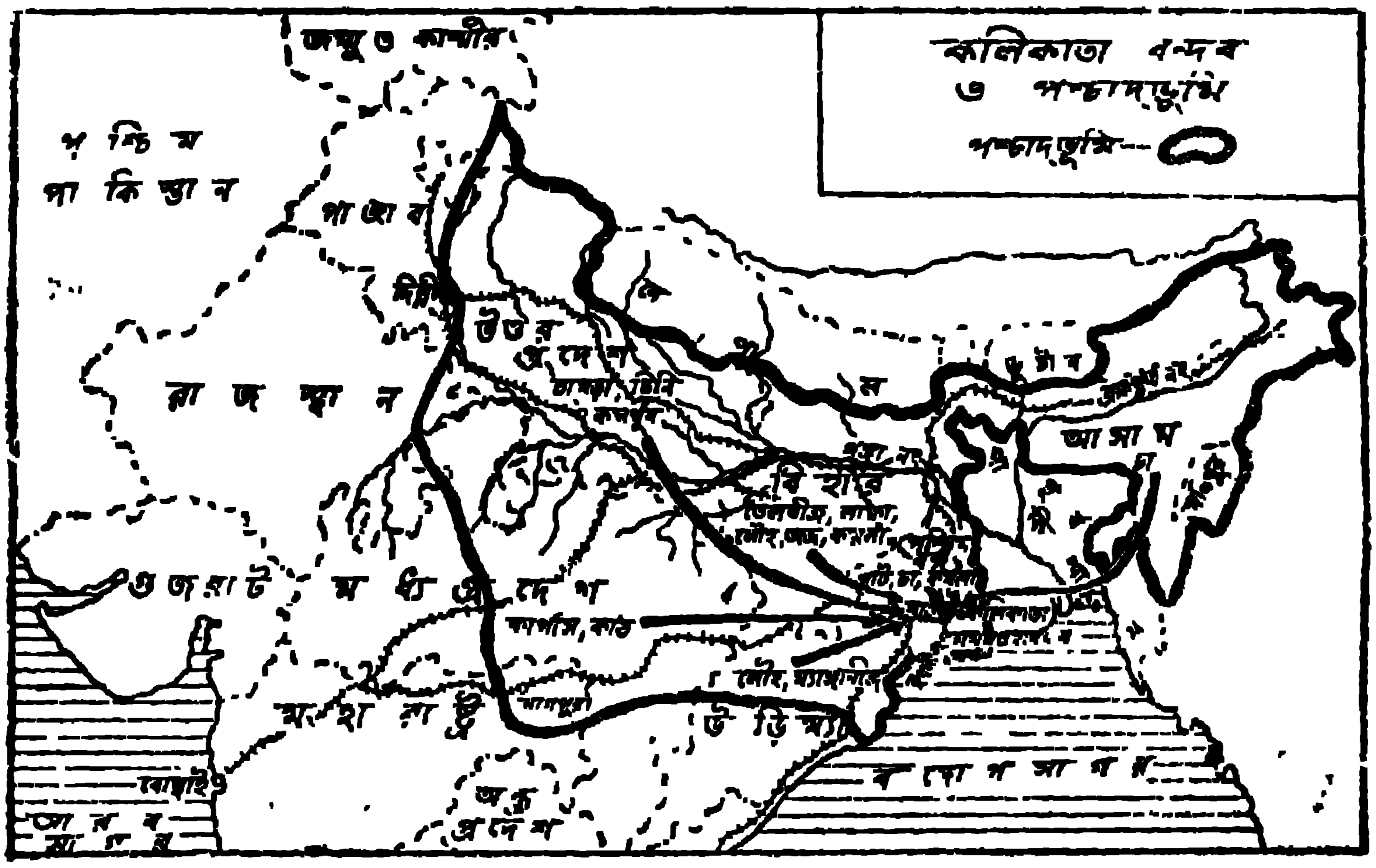

তীরচিহ্ন দ্বারা রপ্তানি-দ্রব্য ও পশ্চাদ্‌ভূমিতে ইহাদের উৎপাদক অঞ্চলসমূহ দেখানো হইয়াছে।

করা হয়। আসামের চা, উত্তরপ্রদেশের কৃষিজ দ্রব্য, পশ্চিমবঙ্গের পাট ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য, বিহারের খনিজ দ্রব্য কলিকাতা বন্দর মারফত বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং বিদেশ হইতে ঐ বন্দরের মাধ্যমে আমদানিকৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, খাদ্যশস্য, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি এই সকল অঞ্চলে প্রেরিত হয়। সুতরাং ঐ সকল অঞ্চলকে কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি বলা যায়।

পশ্চাদ্‌ভূমির বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির উপর বন্দরের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। পশ্চাদ্‌ভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির প্রাচুর্য না থাকিলে বন্দরের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি হইবে না। পশ্চাদ্‌ভূমিতে পণ্যদ্রব্যের চাহিদার অভাব থাকিলে বন্দরের মারফত আমদানির পরিমাণ কম হইবে। এইজন্য শিল্পপ্রধান, জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী দেশের বন্দরগুলি সহজেই উন্নতি লাভ করে। শিল্পপ্রধান দেশে প্রচুর কাঁচামাল আমদানি হয় এবং শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি হয়। লণ্ডন, লিভারপুল, নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি বন্দরে উন্নতির মূলে

রহিয়াছে ইহাদের পশ্চাদ্‌ভূমির সমৃদ্ধি। বন্দর ও পোতাশ্রয়ে স্বাভাবিক অবস্থা অনুকূলে না থাকিলেও অনেকসময় কৃত্রিম উপায়ে ইহার উন্নতিসাধন করা যায়। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে পশ্চাদ্‌ভূমির শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা কষ্টকর।

কোন কোন দেশে একই পশ্চাদ্‌ভূমিকে কেন্দ্র করিয়া একাধিক বন্দর গড়িয়া ওঠে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলের পশ্চাদ্‌ভূমির জন্য বোম্বাই, ওখা, কাণ্ডলা প্রভৃতি কয়েকটি বন্দর রহিয়াছে। বন্দরের সহিত পশ্চাদ্‌ভূমির যোগাযোগের জন্য যানবাহন-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক কারণে অনেকসময় পশ্চাদ্‌ভূমির পরিবর্তন হয়। পূর্ববঙ্গ পূর্বে কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি ছিল। রাজনৈতিক বিভাগের পর ইহা চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি হইয়াছে।

বন্দর-গঠনের উপযোগী অবস্থা (Conditions for development of Ports)—বন্দর গঠন করিতে হইলে পূবে বর্ণিত ইহার বিভিন্ন কার্যাবলীব কথা মনে রাখিতে হইবে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত **ভৌগোলিক** ও **অর্থনৈতিক** অবস্থায় বন্দর-গঠন সহজসাধ্য হইয়া থাকে:—

(১) সমুদ্রের উপকূলে বা নদীতীরে সাধারণতঃ বন্দর গড়িয়া ওঠে। এই সকল স্থানে জলের যথোপযুক্ত গভীরতা থাকা প্রয়োজন। নতুবা বড় বড জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে না। সমুদ্রোপকূল **ভগ্ন** না হইলে জাহাজের পক্ষে বন্দরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব নহে।

(২) বন্দরে আদর্শ **পোতাশ্রয়** থাকা একান্ত প্রয়োজন। সমুদ্রের ঢেউ ও ঝড়ের প্রকোপ হইতে জাহাজগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য, জাহাজ মেরামতের জন্য নিরাপদে জাহাজ হইতে মালপত্র খালাস ও জাহাজে মাল বোঝাই করিবার জন্য, পোতাশ্রয়ের প্রয়োজন। পোতাশ্রয় সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

(৩) বন্দরে জাহাজ রাখিবার স্থান **সুবিস্তৃত** হইলে অনেকগুলি জাহাজ একসঙ্গে থাকিতে পারে। ইহাতে মাল বোঝাই ও খালাসের কাজ শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া জাহাজগুলি অল্পসময়ে বন্দর ত্যাগ করিতে পারে।

(৪) বন্দরের **প্রবেশপথ বোতলের** মুখের মতো হইলে জাহাজগুলি সহজেই বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ ও ঝড় ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না এবং মুখে বালুচরের সৃষ্টি হয় না।

(৫) বন্দরের সন্নিকটে **পানীয় জল** ও **জ্বালানির** সরবরাহ থাকা

প্রয়োজন। কয়লা অথবা খনিজ তৈল জাহাজের চালকশক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দূরগামী জাহাজগুলিকে বন্দর হইতে মাঝে মাঝে কয়লা বা তৈল লইতে হয়। স্বাদুজল পানীয় ও জাহাজের ইঞ্জিনের জন্য প্রয়োজন হয়।

(৬) বন্দর-গঠনে **জলবায়ুর** প্রভাব বিদ্যমান। বন্দরে বরফ জমিলে ইহা অকেজো হইয়া যায়। বৃষ্টির আধিক্য হইলে আমদানি-রপ্তানিকার্যে বাধার সৃষ্টি হয়। বন্দরটি স্বাস্থ্যপ্রদ না হইলে লোকজনের থাকিবার অসুবিধা হয় এবং শ্রমিকের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

(৭) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বন্দর-গঠন ও ইহার উন্নতি বহুলাংশে **পশ্চাদ্‌ভূমির** বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। শিল্পপ্রধান, জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী পশ্চাদ্‌ভূমি বন্দর-গঠনের সহায়ক এবং ইহার উন্নতির উপর বন্দরের আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ নির্ভর করে। পশ্চাদ্‌ভূমি হইতে রপ্তানি-দ্রব্য বন্দরে আনিবার জন্য এবং আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্য বন্দর হইতে পশ্চাদ্‌ভূমিতে পাঠাইবার জন্য স্থলপথে বা জলপথে **যানবাহনের** সুবন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। পশ্চাদ্‌ভূমি সমতল হইলে যানবাহনের উন্নতি সহজসাধ্য হয়।

(৮) **শুল্ক** ও অন্যান্য করের হারের উপর বন্দরের উন্নতি নির্ভর করে। শুল্ক ও কর অনুসারে আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। সেইজন্য অত্যধিক শুল্ক বা কর বন্দরের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ কমাইয়া দেয়। বিভিন্ন দেশের সহিত আর্থিক **বিনিময় হার**ও বন্দরের আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করে।

সাধারণতঃ দুইপ্রকার বন্দর বিভিন্ন দেশে পরিলক্ষিত হয়—সামুদ্রিক বন্দর ও নদীতীরস্থ বন্দর। সমুদ্রোপকূলের নিকট অবস্থিত বন্দরকে সাধারণতঃ **সামুদ্রিক** বন্দর বলে এবং নদীর উপর অবস্থিত বন্দরকে **নদীতীরস্থ** বন্দর বলা হয়। হ্রদ, সমুদ্র-খাল, উপসাগর ও নদীর মোহনায় অবস্থিত বন্দরগুলি সামুদ্রিক বন্দরের অন্তর্গত।

(খ) শহর ও নগর (Cities & Towns)

শহর এবং নগরেও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া ওঠে। পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, মানুষের চাহিদা মিটাইবার জন্য পণ্য-বিনিময়কেন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে শহর ও নগরের উৎপত্তি হইয়াছে।

বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠার কারণ (Conditions favouring

growth of Trade Centres)—বিভিন্ন কারণে বাণিজ্যকেন্দ্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। নগর, শহর প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্রের সৃষ্টির কারণগুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) **ধর্ম** নগর-স্থাপনে সহায়তা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন **তীর্থস্থান** বড় বড় বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে এবং এই সকল স্থানে সুন্দর সুন্দর নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। যথা—কাশী, হরিদ্বার, গয়া, মক্কা প্রভৃতি। (২) **রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলি** শহরে ও বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। যথা—দিল্লী, টোকিও, ওয়াশিংটন ইত্যাদি। (৩) সমুদ্রতীরবর্তী কোন কোন অঞ্চলে এবং **স্বাস্থ্যকর** স্থানে বহুলোকের সমাগম হয় এবং ক্রমে ক্রমে এই সকল স্থান শহরে পরিণত হয়। যথা—মধুপুর, ওয়ালটেয়ার, বাথ ইত্যাদি। (৪) **খনিজ সম্পদের** আবিষ্কারের ফলে অথবা **বৈষয়িক সম্পদের** প্রাচুর্যের জন্য বহুস্থানে লোক-সমাগম হয় এবং বাণিজ্যকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। যথা—কালগুর্লি, ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, ডিগবয়, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি। (৫) পৃথিবীর বিখ্যাত **শিক্ষাকেন্দ্রগুলি** বড় বড় শহরে পরিণত হইয়াছে। যথা—অক্সফোর্ড, শান্তিনিকেতন, আলিগড় ইত্যাদি। (৬) বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্য-উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহের সংযোগ-স্থলে **বিনিময়ের সুবিধার** জন্য বাণিজ্যকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ পর্বত ও সমতলভূমির মিলনস্থলে এইরূপ বাণিজ্যকেন্দ্র পরিলক্ষিত হয়। যথা—মিলান, ইস্ফল ইত্যাদি। (৭) **শিল্পকেন্দ্রে** বড় বড় শহরের ও বাণিজ্য-কেন্দ্রের উৎপত্তি হয়। যথা—জামসেদপুর, বার্ণপুর, রাউরকেলা, ভিলাই, ম্যাঞ্চেস্টার ইত্যাদি। (৮) **সামরিক গুরুত্বের** জন্য অনেক শহরের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা—পেশোয়ার, পুনা ইত্যাদি। (৯) বিভিন্ন পরিবহণ-ব্যবস্থার সংযোগস্থলে এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া ওঠে। যথা—গোয়ালন্দ, খুলনা, কলম্বো, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি।

পৃথিবীর প্রসিদ্ধ বন্দর, শহর ও নগর
(Important Ports, Cities & Towns of the World)

বৃটেন (United Kingdom)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শহর ও নগরের সংখ্যা প্রচুর। তন্মধ্যে লক্ষাধিক লোকের বসতিপূর্ণ শহরের সংখ্যা ছয় শতের অধিক।

নিম্নে কয়েকটি বিখ্যাত শহর ও বন্দরের বর্ণনা দেওয়া হইল :

লণ্ডন (London)—টেম্‌স্‌ নদীর তীরে অবস্থিত লণ্ডন শহর বৃটেনের রাজধানী। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম শহর এবং শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক বন্দর। পুনরায় রপ্তানির উদ্দেশ্যে এখানে বহু পণ্যদ্রব্য আমদানি করা হয়। ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলে কাগজ, রেয়ন, রাসায়নিক ও বয়ন-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় সকল দেশের সঙ্গে লণ্ডনের বাণিজ্যিক যোগাযোগ রহিয়াছে। চা, কফি, তামাক, রবার, তুলা প্রভৃতি সামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানি করা হয় এবং কাগজ, বস্ত্রাদি, যন্ত্রপাতি, মোটর-গাড়ী ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। বৃটেনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বিস্তীর্ণ ঘনবসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি।

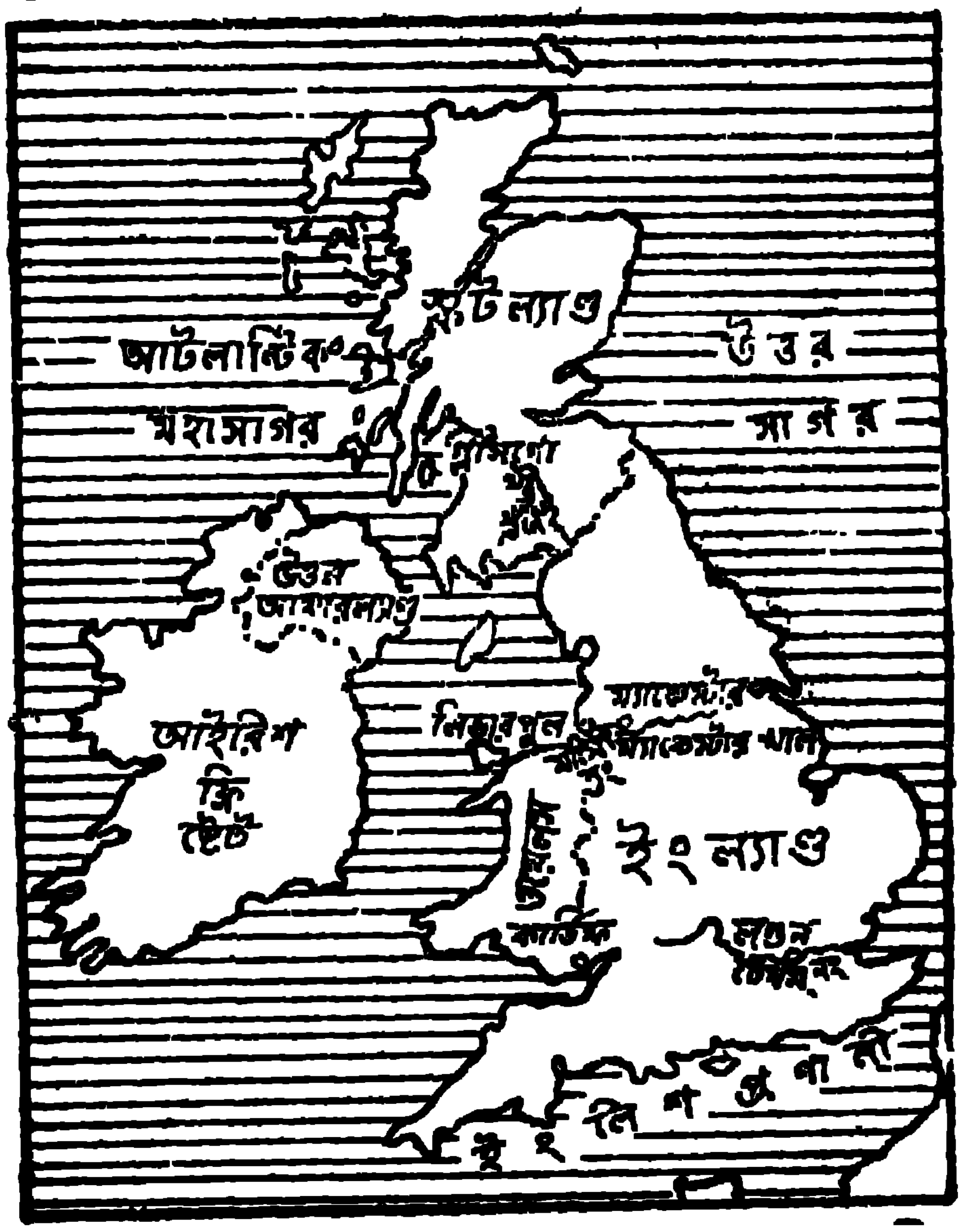

গ্লাসগো (Glasgow)—ক্লাইড নদীর মোহনায় অবস্থিত স্কটল্যাণ্ডের এই বন্দরটি পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ-নির্মাণ-কেন্দ্র। এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কয়লা ও লৌহ পাওয়া যায়; এইজন্য এখানে ইস্পাত-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে সুন্দর পোতাশ্রয় আছে। গ্লাসগোর সন্নিকটে নদীর গভীরতা অত্যন্ত বেশী। এই সকল সুবিধা থাকায় জন্য এখানে জাহাজ-নির্মাণ সহজসাধ্য হইয়াছে। ইহা ছাড়া, এখানে পশম, কার্পেট, কাগজ ও রাসায়নিক শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। স্কটল্যাণ্ডের ঘনবসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি।

লিভারপুল (Liverpool)—ল্যাঙ্কাশায়ার প্রদেশের পশ্চিম উপকূলে মার্সে নদীর মোহনায় অবস্থিত লিভারপুল বন্দরের মারফত বিভিন্ন শিল্পজাত

দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং কাঁচামাল বৃটেনে আমদানি করা হয়। ইহার পশ্চাদ্‌ভূমিতে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিখ্যাত কার্পাস ও রাসায়নিক শিল্প-কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। লিভারপুল হইতে ম্যাঞ্চেস্টার পর্যন্ত একটি খাল কাটিয়া ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্রাদি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য এই বন্দরে আনীত হয়। এই খালের নাম ম্যাঞ্চেস্টার খাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এই বন্দর নিকটবর্তী বলিয়া এই বন্দরের মারফত বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা অধিক পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে।

ম্যাঞ্চেস্টার (Manchester)—মার্সে নদীর শাখা ইরওয়েল নদীর তীরে অবস্থিত এই বন্দরের নিকটবর্তী স্থানে বিখ্যাত কার্পাস-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রগামী জাহাজ লিভারপুল বন্দর হইতে ম্যাঞ্চেস্টার খাল মারফত এই বন্দরে প্রবেশ করে। বয়ন-শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করা এবং বিদেশ হইতে তুলা আমদানি করা এই বন্দরের প্রধান কাজ।

কার্ডিফ (Cardiff)—দক্ষিণ ওয়েল্‌সের টাফ নদীর মোহনার নিকট অবস্থিত এই বন্দর কয়লা-রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। বর্তমান যুগে কয়লার ব্যবহার কিছুটা কমিয়া যাওয়ায় এই বন্দরের গুরুত্ব সামান্য কমিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া, কাষ্ঠ, খাদ্যশস্য ও লৌহ আকরিক এই বন্দরের অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য। ইহার নিকট ইস্পাত-শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে।

রাশিয়া (U. S. S. R.)

মস্কো (Moscow)—রাশিয়ার রাজধানী। ইহার নিকট বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে ইস্পাত, চর্ম, কাগজ ও বয়ন-শিল্পই প্রধান। প্রায় ৪০ লক্ষ লোক এই শহরে বাস করে। রাশিয়ার রেলপথগুলি এই শহর হইতে বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

লেনিনগ্রাড (Leningrad)—নীভা নদীর মোহনায় বালটিক সাগরের তীরে অবস্থিত এই বন্দরে রাশিয়ার জাহাজ-নির্মাণশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বৎসরে প্রায় সাড়ে ৪ মাস এই বন্দর বরফাবৃত থাকে। এই বন্দরের নিকটবর্তী স্থানে কাগজ, অ্যালুমিনিয়াম ও কাষ্ঠশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ।

মুরমানস্ক (Murmansk)—কোলা উপসাগরের তীরে অবস্থিত এই বন্দর তুন্দ্রাঞ্চলে অবস্থিত হইলেও উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের জন্য ইহা সারাবৎসর

বরফমুক্ত থাকে। এই বন্দর মারফত কাঠ, মৎস, চামড়া প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানি করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.)

নিউ ইয়র্ক (New York)—আটলান্টিক উপকূলে হাডসন নদীর মোহনায় অবস্থিত এই বন্দরের মারফত সারাবৎসর আমদানি-রপ্তানিকার্য চলিয়া থাকে। শীতকালে এই বন্দরটি বরফাচ্ছন্ন হয় না। এইজন্য ইহার গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বন্দর ও পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তর শহর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক বৈদেশিক বাণিজ্য-দ্রব্য এই বন্দরের মারফত আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে। পাকা রাস্তা, রেলপথ ও জলপথে এই বন্দরের সহিত দেশের অন্যান্য স্থান যুক্ত। উত্তরে ভার্জিনিয়া হইতে দক্ষিণে আলাবামা পর্যন্ত সকল রাজ্য এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। এই পশ্চাদ্‌ভূমিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্রগুলি অবস্থিত। কার্পাস, গম, মাংস, ভুট্টা, দুগ্ধজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য এই বন্দরের মারফত রপ্তানি করা হয় এবং রবার, চা, চিনি, ম্যাঙ্গানিজ, পাটজাত দ্রব্য, নিকেল, টিন প্রভৃতি ইহার মাধ্যমে আমদানি করা হয়।

চিকাগো (Chicago)—মিচিগান হ্রদের তীরে অবস্থিত এই শহর ও বন্দর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রেলপথগুলির সঙ্গমস্থল। ইহার নিকটবর্তী ভুট্টা অঞ্চলে প্রচুর পশু পালিত হয়। এইজন্য এই স্থান মাংস-রপ্তানির জন্য বিখ্যাত চিকাগো বন্দরের মারফত প্রচুর গম বিদেশে রপ্তানি হয়। এখানে ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

স্যানফ্রান্সিস্কো (San Francisco)—ক্যালিফোর্ণিয়া উপত্যকায় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত এই বন্দর মারফত প্রধানতঃ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। পানামা খাল কাটিবার পর এই বন্দরের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বন্দর মারফত গম, ফল, খনিজ তৈল, স্বর্ণ প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং চা, রেশম, চিনি প্রভৃতি আমদানি করা হইয়া থাকে।

বোস্টন (Boston)—যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত এই বন্দর পশম-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। নিউ ইংল্যাণ্ডের শিল্পাঞ্চল ইহার প্রধান পশ্চাদ্‌ভূমি। এই বন্দরের মারফত তুলা, পশম, চামড়া প্রভৃতি আমদানি

করা হয়; মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য, বস্ত্রাদি প্রধানতঃ ইহার মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়। ইউরোপীয় বন্দরগুলি হইতে ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকটতম বন্দর।

নিউ অরলিন্স (New Orleans)—মিসিসিপি নদীর মোহনায় মেক্সিকো উপসাগরের নিকট অবস্থিত এই বন্দর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রধান বন্দর। ইহা তুলা-ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। মিসিসিপি-মিসৌরী উপত্যকা ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। এই বন্দর মারফত তুলা, খনিজ তৈল, কাষ্ঠ, গবাদি পশু, গম প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং কফি, চিনি, ফল ও পাটজাত দ্রব্য প্রধানতঃ আমদানি করা হয়।

কানাডা (Canada)

ভ্যাঙ্কুভার (Vancouver)—প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপের পিছনে ফ্রেজার নদীর তীরে অবস্থিত এই বন্দর বিভিন্ন মহাদেশীয় রেলপথ দ্বারা ইহার পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত যুক্ত। পশ্চিম প্রেইরী অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। এই বন্দর মৎস্যের জন্য বিখ্যাত। ইহার মারফত মৎস্য, তাম্র, রৌপ্য, গম, কাগজ, কাষ্ঠ প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং যন্ত্রপাতি, চিনি প্রভৃতি আমদানি করা হয়।

মন্ট্রিল (Montreal)—অটোয়া ও সেন্ট লরেন্স নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত মন্ট্রিল কানাডার সর্বপ্রধান বন্দর। মহাদেশীয় রেলপথ দ্বারা ইহা দেশের অভ্যন্তরস্থ স্থানসমূহের ও নিউ ইয়র্কের সহিত যুক্ত। শীতকালে এই বন্দর বরফাচ্ছন্ন থাকে। কানাডার পূর্বাঞ্চলের কৃষিপ্রধান অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। এই বন্দরের মারফত গম, নিকেল, রৌপ্য, তাম্র, কাষ্ঠ ও কাগজ রপ্তানি করা হয় এবং যন্ত্রপাতি, পশম-বস্ত্র ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়। ইহা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গম ও ময়দা রপ্তানির বন্দর।

দক্ষিণ আমেরিকা (South America)

রায়ো-ডি-জেনিরো (Rio-de-Janeiro)—আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত এই বন্দর ব্রেজিলের রাজধানী। উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় থাকায় এই বন্দর ভালোভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। সাও পলো, মিনাস্ গেরায়েস্, পারানা প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। এই বন্দরের মারফত

রবার, কফি, কোকো, তামাক, চামড়া, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ আকরিক প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং কয়লা, যন্ত্রপাতি, বস্ত্রাদি, খাদ্যশস্য প্রভৃতি আমদানি করা হয়।

বুয়েনস্ আয়ার্স (Buenos Aires)—প্লাটা নদীর মোহনায় আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত এই বন্দর ও শহর আর্জেন্টিনার রাজধানী। আর্জেন্টিনার কৃষি-প্রধান অঞ্চল এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। এই বন্দরের সহিত প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত ভ্যাল্‌প্যারাইজো বন্দর রেলপথে যুক্ত। বুয়েনস্ আয়ার্সের মারফত গম, যব, ভুট্টা, পশম, মাংস, চামড়া, তিসি প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং কয়লা, কার্পাস-বস্ত্র, যন্ত্রপাতি খনিজ তৈল প্রভৃতি আমদানি করা হয়।

ভ্যাল্‌প্যারাইজো (Valparaiso)—প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে চিলির এই বন্দরটি অবস্থিত। চিলির সমগ্র খনিজ অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমির অন্তর্গত। এই বন্দর মারফত নাইট্রেট, তাম্র, রৌপ্য, পশম, গম প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানি করা হয়।

আফ্রিকা (Africa)

ডারবান (Durban)—দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লাখনি অঞ্চলে অবস্থিত এই বন্দরের সহিত দেশের কৃষিজ খনিজসমৃদ্ধ পশ্চাদ্‌ভূমি রেলপথ দ্বারা যুক্ত। এই বন্দর মারফত কয়লা, স্বর্ণ, তাম্র, গম, ভুট্টা, চাউল প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল, কার্পাস-বস্ত্র ও বিলাসদ্রব্য আমদানি করা হয়।

সৈয়দ বন্দর (Port Said)—সুয়েজ খালের উত্তরে অবস্থিত মিশরের এই বন্দর মারফত সুয়েজ খালে প্রবেশ করিতে হয়। ইহা একটি বিখ্যাত মাধ্যম-বন্দর। এখানে জাহাজে কয়লা ভর্তি করা হয়।

কায়রো (Cairo)—সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের রাজধানী কায়রো আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম শহর। নীলনদের তীরে ইহা অবস্থিত। এখানে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে।

আলেকজান্দ্রিয়া (Alexandria)—মিশরের সর্বপ্রধান বন্দর ভূমধ্যসাগরের তীরে সুয়েজ খালের পথে নীলনদের মোহনায় ইহা অবস্থিত। নীলনদের উপত্যকা এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। ইহার মারফত তুলা, চিনি

চাউল ও নানাবিধ ফল রপ্তানি করা হয় এবং কয়লা, গম, কাঠ ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়।

অন্যান্য দেশ

হামবুর্গ (Hamburg)—সমুদ্র হইতে প্রায় ৭০ মাইল দূরে এল্‌ব নদীর উপর অবস্থিত এই বন্দর **পশ্চিম জার্মানীর** সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার মারফত জার্মানী, নরওয়ে, সুইডেন এবং বালটিক রাজ্যসমূহের পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা হয়। ইহা একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম (entrepot)-বন্দর। বিখ্যাত রুঢ় অঞ্চলের সহিত ইহা জলপথে যুক্ত। ইহার মারফত কফি, কোকো, চিনি, কয়লা, পশম, কার্পাস-বস্ত্র প্রভৃতি আমদানি কবা হয় এবং নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য, লবণ, চিনি ও দুগ্ধজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। এখানকার জাহাজ-নির্মাণশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রটারডাম (Rotterdam)—রাইন নদীর শাখা নিউ-মাস নদীর উপর অবস্থিত এই বন্দর খাল দ্বারা সমুদ্রের সহিত যুক্ত। **হল্যাণ্ডের** বিখ্যাত জাহাজ-নির্মাণকেন্দ্র এই স্থানে অবস্থিত। রাইন নদীর উপত্যকা ইহার পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্দর মাবফত দুগ্ধজাত দ্রব্য, গবাদি পশু প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং তামাক, রবার, তুলা ও খনিজ তৈল আমদানি করা হয়।

আন্টোয়ার্প (Antwerp)—সেল্ড নদীর মোহনায় **বেলজিয়ামের** এই বন্দর অবস্থিত। ইহা একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম-বন্দর। বেলজিয়াম, পূর্ব ফ্রান্স ও রুঢ় অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্দর হীরকের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। এই বন্দর মারফত কফি, তুলা, পশম, চামড়া, খাদ্যশস্য, লৌহ আকরিক, খনিজ তৈল প্রভৃতি আমদানি করা হয় এবং লৌহ ও ইস্পাত-দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কাচ, কার্পাস-বস্ত্র প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়।

মার্সেল্স (Marseilles)—রোণ নদীর মোহনার পূর্বপ্রান্তে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত **ফ্রান্সের** সর্বপ্রধান বন্দর। রোণ নদীর সহিত ইহা খাল দ্বারা যুক্ত। ফ্রান্সের উত্তরাংশে অবস্থিত ক্যালে বন্দরের সহিত ইহা রেলপথ দ্বারা যুক্ত। রোণ নদীর সমৃদ্ধিশালী অববাহিকা এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্দরের মারফত রেশমজাত দ্রব্যাদি, সাবান, গন্ধদ্রব্য, বিলাসদ্রব্য, মদ্য প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং কয়লা, চিনি, গম, পশম, চামড়া, তুলা, রবার, কফি প্রভৃতি আমদানি করা হয়।

ডানজিগ (Danzig)—ভিশ্‌চুলা নদীর মোহনায় বালটিক সাগরের তীরে **পোল্যাণ্ডের** এই বন্দর অবস্থিত। শীতকালে এই বন্দর বরফাবৃত থাকে। এখানকার জাহাজ-নির্মাণশিল্প বিখ্যাত। কাঠ এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য এবং তুলা, যন্ত্রপাতি, পশম ও ময়দা প্রধান আমদানি-দ্রব্য।

জিব্রাল্টার (Gibraltar) ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম প্রান্তে আটলান্টিক মহাসাগরের প্রবেশপথে **স্পেন** দেশে অবস্থিত বৃটিশ-অধিকারভুক্ত এই বন্দরটি পার্বত্য দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। এই বন্দরটিকে 'ভূমধ্যসাগরের চাবি' বলা হয়। এখানে জাহাজে কয়লা ভর্তি করা হয়।

করাচী (Karachi)—আরব সাগরের তীরে অবস্থিত করাচী **পাকিস্তানের** সর্বপ্রধান বন্দর। পশ্চিম পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বালুচিস্তান ও ইরাণের কিয়দংশ ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। গম, তৈলবীজ, তুলা, পশম, চামড়া প্রভৃতি ইহার প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য এবং কার্পাস-বস্ত্র, চিনি, যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল, কয়লা প্রভৃতি ইহার প্রধান আমদানি-দ্রব্য।

রেঙ্গুন (Rangoon)—ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপের উপর অবস্থিত রেঙ্গুন **ব্রহ্মদেশের** রাজধানী ও প্রধান বন্দর। ইরাবতী নদীর উপত্যকায় অবস্থিত পশ্চাদ্‌ভূমি জলপথে ও রেলপথে ইহার সহিত যুক্ত। ইহার মারফত চাউল, কাষ্ঠ, খনিজ তৈল প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং রাসায়নিক দ্রব্য, বিলাসদ্রব্য ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়।

• **সিঙ্গাপুর (Singapur)**—মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তের একটি দ্বীপে এই বন্দর অবস্থিত। ইহা প্রাচ্যের বৃহত্তম মাধ্যম (Entrepot)-বন্দর। এখানে উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। অধিকাংশ জাহাজে এই স্থানে কয়লা ভর্তি করা হয়। ইন্দোনেশিয়া ও **মালয়ের** মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া এই বন্দর মারফত উভয় দেশের পণ্য আমদানি-রপ্তানি করা হয়। এই বন্দর মারফত চাউল, কাষ্ঠ, রবার, নারিকেল, ফল, টিন, টাংস্টেন ইত্যাদি রপ্তানি করা হয় এবং খনিজ তৈল, চিনি, তামাক, বস্ত্রাদি ও নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়।

হংকং (Hongkong)—চীনের দক্ষিণ-পূর্বদিকে সি-কিয়াং নদীর মোহনায় একটি দ্বীপে এই বন্দর অবস্থিত। ইহা বৃটেনের অধীন। **চীনের** সহিত এই বন্দর রেলপথে ও নদীপথে যুক্ত। রেলপথে ও জলপথে পণ্যদ্রব্য এই বন্দরে আনীত হয়। ইহা একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম-বন্দর। চাউল ইহার

প্রধান বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য। ইহা ছাড়া, চিনি, তুলা, চা, কয়লা, গম, তৈল, আফিম প্রভৃতি এই বন্দর মারফত আমদানি-রপ্তানি করা হয়। এই স্থান জাহাজ নির্মাণের জন্য বিখ্যাত। সমগ্র দক্ষিণ চীন ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি।

কলম্বো (Colombo)—সিংহলের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই বন্দরে অস্ট্রেলিয়া ও পূর্ব এশিয়াগামী সকল জাহাজ নোঙর করে এবং কয়লা লয়। কলম্বো **সিংহলের** রাজধানী ও বিখ্যাত মাধ্যম-বন্দর। নারিকেল দড়ি ও তৈল, রবার, চা প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য এবং তৈল, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র, চিনি, চাউল, কাগজ ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ইহার প্রধান আমদানি-দ্রব্য।

এডেন (Aden)—আরব দেশের এই বন্দর ভারত মহাসাগর হইতে লোহিত সাগরের প্রবেশপথে অবস্থিত। ইহা বৃটেনের অধীন। এখানে জাহাজে কয়লা ভর্তি করা হয়। ইয়েমেনের বিখ্যাত কফি এই বন্দর মারফত রপ্তানি করা হয়।

ইয়োকোহামা (Yokohama)—জাপানের টোকিও উপসাগরের তীরে অবস্থিত এই বন্দর সুরক্ষিত। ইহার মাধ্যমে রেশম, পশম, চা, যন্ত্রপাতি ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয় এবং খাদ্যদ্রব্য, লৌহ আকরিক, তুলা, ময়দা, চিনি প্রভৃতি আমদানি করা হয়।

ওসাকা (Osaka)—জাপানের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র। এখানকার কার্পাসবয়নশিল্প জগদ্বিখ্যাত। সেইজন্য ইহাকে 'জাপানের ম্যাঞ্চেস্টার' বলা হয়। জাহাজ-নির্মাণশিল্প, কাগজশিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এখানে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

সিডনী (Sydney)—অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের নিউ সাউথ ওয়েলস্ প্রদেশের রাজধানী ও সর্বপ্রধান বন্দর। রেলপথ দ্বারা পশ্চাদভূমির সহিত ইহা যুক্ত। এই বন্দরের মারফত অস্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে। ইহার মারফত গম, পশম, মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং যন্ত্রপাতি ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the transport pattern of the modern world. Discuss the relative advantages and disadantages of land, water and air transport.

উঃ 'পৃথিবীর পরিবহণ-ব্যবস্থার ধরন' (৩৮৯ পৃঃ—৩৯০ পৃঃ) লিখ।

2. Discuss how a proper co-ordination and integration of the different transport systems of a country can be made.

উঃ 'পরিবহণ-ব্যবস্থার সমন্বয়-সাধন ও সংহতি-স্থাপন' (৩৯৩ পৃঃ—৩৯৪ পৃঃ) লিখ।

3. Discuss the influence of transport of the localisation industries.

উঃ 'উৎপাদন অঞ্চলের বণ্টনের উপর পরিবহণ-ব্যয়ের প্রভাব' (৩৯৪ পৃঃ—৩৯৭ পৃঃ) লিখ।

4. Write short notes on the commercial importance of tho following: (a) Calcutta, (b) London, (d) New York, (d) Moscow, (e) Hamburg, (f) Honkong, (g) Singapur, (h) Karachi, (i) Manchester.

উঃ সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি (৪০১ পৃঃ—৪১৪ পৃঃ) লিখ।

5. Describe the condition for the development of ports and trade centres.

উঃ 'বন্দর-গঠনের উপযোগী অবস্থা' এবং 'বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া ওঠার কারণ' (৪০৪ পৃঃ—৪০৬ পৃঃ) লিখ।

6. Do trade-routes arise from economic activity, or does economic activity arise from trade routes? Take concrete examples and discuss.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উঃ 'বাণিজ্যপথ ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ' (৩৯৮ পৃঃ—৪০০ পৃঃ) লিখ।

7. Discuss with specific examples of the influence of transport on the economic development of a region. What are the relative advantages and disadvantages of water, overland and aerial transport?

[C. U. Three-Year Degree Course B. Com. 1965]

উঃ 'উৎপাদন-অঞ্চলের বণ্টনের উপর পরিবহণ-ব্যয়ের প্রভাব' (৩৯৪ পৃঃ—৩৯৭ পৃঃ) এবং 'বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থার পারস্পরিক সুবিধা ও অসুবিধা' (৩৯০ পৃঃ—৩৯৩ পৃঃ) লিখ।

চতুর্দশ অধ্যায়

বাণিজ্য

(Trade)

বাণিজ্য দুইপ্রকার—আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক। একই দেশের দুইটি অঞ্চলের মধ্যে পণ্য বিনিময় হইলে তাহাকে বলে **আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (Internal Trade)**। পাঞ্জাব হইতে পশ্চিমবঙ্গ গম ক্রয় করিলে, পশ্চিমবঙ্গ হইতে মাদ্রাজে পাটজাত দ্রব্যাদি সরবরাহ হইলে এবং মহারাষ্ট্র হইতে বিহার বস্ত্র আনয়ন করিলে, তাহাকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। কিন্তু ভারত পাটজাত দ্রব্য বৃটেনে রপ্তানি করিলে কিংবা জাপান হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চা রপ্তানি হইলে, তাহা **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের (International Trade)** অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিয়া আসিতেছে। প্রথমে একই স্থানে বসবাসকারী প্রতিবেশী মানুষের পরস্পরের মধ্যে সামান্য দুই চারিটি সামগ্রীর বিনিময় দিয়া এই বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। তারপর যুগে যুগে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই নূতন নূতন দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদিত হইয়াছে, নানাপ্রকার যাতায়াত-ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়াছে, ততই সমস্ত দ্বেষ-হিংসা, ব্যক্তিগত ও জাতিগত উচ্চাশা এবং স্বার্থপরতা সত্ত্বেও যন্ত্রবিজ্ঞানের অমোঘ নিয়মে বিভিন্ন দেশ পরস্পরের নিকটে আসিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটিয়াছে। এককথায় বলা যায় সভ্যতার যতই অগ্রগতি হইয়াছে, পৃথিবীতে বাণিজ্যের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অর্থনৈতিক উন্নতির পরিমাপক বহির্বাণিজ্য (International Trade as an Economic Barometer)—গোড়াতেই একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সকল সময় কোন দেশের মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ দিয়া সেই দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের পরিমাপ করা যায় না। চীনের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ সুইডেনের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু সুইডেনের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান চীনের

তুলনায় অনেক বেশী উন্নত। চীনের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ অধিক হইবার কারণ এই দেশের বৃহদাকৃতি। চীনের মোট আয়তনের পরিমাণ ১০৪ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ৬৭ কোটি। কিন্তু সুইডেনের আয়তন মাত্র ৪ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ। তবুও কোন দেশের বহির্বাণিজ্যের মোট পরিমাণ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

কোন দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিমাপ করিবার পক্ষে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ অপেক্ষা মাথাপিছু বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। উদাহরণস্বরূপ, চীনের মাথাপিছু বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ যেখানে মাত্র ২ ডলার, সুইডেনের সেখানে ৩০০ ডলারেরও অধিক। অবশ্য মাথাপিছু বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও এই সম্পর্ক যে সকল দেশের ক্ষেত্রে সমান ঘনিষ্ঠ হইবে তাহা নহে। এমনকি কোন কোন দেশের ক্ষেত্রে এই দুইটির মধ্যে কোন সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। রাশিয়ার মাথাপিছু বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ৪ ডলার এবং মালয়ের ২৫০ ডলারের অধিক। কিন্তু মালয়ের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান রাশিয়ার অপেক্ষা উন্নত একথা কেহ বলিবে না। রাশিয়ার জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অপেক্ষাকৃত অনেক উন্নত। অতি অল্প (৫০ ডলারের কম) মাথাপিছু বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ দেখা যায় হংকং, ইসরাইল, জাপান, মালয় ও সিংহল ব্যতীত এশিয়ার অন্যান্য দেশে, আলজেরিয়া, মরক্কো, মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ রোডেশিয়া ব্যতীত আফ্রিকার অন্যান্য দেশে, দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে এবং সামান্য দুই একটি দেশ ব্যতীত সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকায়। নিঃসন্দেহে ইহাদের অধিকাংশ দেশই অর্থনৈতিক অবস্থার দিক দিয়া অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত। এই সকল দেশের মাথাপিছু বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ কম হইবার অনেক কারণ থাকিতে পারে; বৃহৎ ও ঘন লোকবসতি যাহার ফলে বিনিময়যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ সামান্য, অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা ও সম্পদের অভাব ইত্যাদি। পৃথিবীতে মাথাপিছু সর্বাধিক পরিমাণ (৪০০ হইতে ৫৫৯ ডলার) বৈদেশিক বাণিজ্য যে সকল দেশে দেখা যায় তাহাদের মধ্যে নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা ও লুক্সেমবার্গের নাম উল্লেখযোগ্য। তাহার পরেই (মাথাপিছু বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ২৫০ হইতে ৪০০ ডলার) ভেনেজুয়েলা, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড,

বৃটেন, ইসরাইল, সিঙ্গাপুর ও মালয়। এই সকল দেশের অধিকাংশই শিল্পোন্নত এবং কয়েকটি দেশ শিল্পোন্নত না হইলেও, নির্দিষ্ট একটি বা কয়েকটি কাঁচামাল-উৎপাদন ও রপ্তানিতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। এই সকল দেশের জনসাধারণের সমৃদ্ধি বহুল পরিমাণে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হইল অধিকাংশ বৃহদাকৃতি দেশগুলির মাথাপিছু স্বল্প বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ ক্ষুদ্রাকৃতি দেশের তুলনায় বৃহদাকৃতি দেশে বহু রকমের পণ্য-সামগ্রী উৎপাদিত হয়; অর্থাৎ বৃহদাকৃতি দেশগুলি অপেক্ষাকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মৌলিক কারণসমূহ (Basic factors of International Trade)—বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয় বলিয়া বাণিজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মালয়ে রবার উৎপাদিত হয় কিন্তু যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয় না এবং গ্রেট বৃটেনে যন্ত্রপাতি উৎপাদিত হয়, রবার হয় না। তাই মালয় হইতে গ্রেট বৃটেনে রবার প্রেরণ করা হয় এবং গ্রেট বৃটেন হইতে মালয়ে প্রেরণ করা হয় যন্ত্রপাতি। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদিত হইবার মূল কারণ হইল: (ক) পরিবেশগত বিভিন্নতা, (খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্নতা, (গ) জনসংখ্যাগত বিভিন্নতা এবং (ঘ) যাতায়াত-ব্যবস্থার সুবিধায় তারতম্য।

(ক) পরিবেশগত বিভিন্নতা—বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ (জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, ভূমির গঠন ইত্যাদি) বিভিন্ন রকমের এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের এই বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে কৃষিজ, খনিজ, বনজ ও প্রাণিজ সম্পদ উৎপাদনে বিভিন্নতা দেখা যায়। ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলে পলি অথবা কাদামাটিযুক্ত সমভূমি অঞ্চলে ধান-উৎপাদন সবচেয়ে ভালো হয়; কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের দো-আঁশ মাটিযুক্ত সমভূমি বীট-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলের অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত বিরল লোক-বসতিপূর্ণ তৃণভূমি অঞ্চল মেষপালনের উপযোগী; কিন্তু ছাগ-পালনের জন্য প্রয়োজন অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত পার্বত্য-ভূমি। মেহগনি ও সেগুনের ন্যায় শক্তকাষ্ঠের বৃক্ষ জন্মায় উষ্ণমণ্ডলের অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত সমভূমি অঞ্চলে। জলপাই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু এবং কফি উৎপাদনের জন্য ক্রান্তীয় মণ্ডলের জল-নিকাশের সুবিধাযুক্ত ঢালু জমি। আধুনিক জীবনের পক্ষে কয়লা, লৌহ, খনিজ তৈল ও তাম্রের ন্যায় খনিজ

পদার্থ অবশ্য প্রয়োজন; অথচ খনিজ পদার্থের বণ্টন অত্যন্ত অসম। সেইজন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিমাণ ও ওজনের দিক দিয়া খনিজ পদার্থ সর্বপ্রধান। পরিবেশগত বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠা বাণিজ্যিক আদান-প্রদান স্থায়ী হইয়া থাকে।

(খ) **অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্নতা**—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে রহিয়াছে। গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানী, বেলজিয়াম, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ সর্বাপেক্ষা উন্নত। কঙ্গো, কেনিয়া, উগাণ্ডা, অ্যাঙ্গোলা, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, আফগানিস্তান, সৌদি আরব, সোমালিয়া প্রভৃতি দেশ অনুন্নত। ভারত, চীন, মেক্সিকো, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ স্বল্পোন্নত বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বিভিন্নতার জন্য পণ্য-বিনিময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। শিল্পোন্নত গ্রেট ব্রিটেন, ঘানা, রোডেশিয়া, আর্জেন্টিনা, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহ হইতে কাঁচামাল আমদানি করে এবং উহার বিনিময়ে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। অবশ্য বিভিন্ন অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশ যতই শিল্পোন্নয়নের দিকে অগ্রসর হয় ততই উহাদের বহির্বাণিজ্যের গঠনে পরিবর্তন ঘটে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্বপর্যন্ত ভারত প্রধানতঃ কাঁচামাল রপ্তানি করিত এবং শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করিত। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর হইতে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের ফলে ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের অনুপাত ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

(গ) **জনসংখ্যাগত বিভিন্নতা**—কতকগুলি দেশে আয়তনের তুলনায় লোকবসতি কম; এই ধরনের অনেক দেশে আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের উৎপাদন অধিক। ফলে এই উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানি করা হয়। কানাডা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। পৃথিবীতে আবার কয়েকটি দেশ আছে যাহাদের আয়তনের তুলনায় লোকবসতি অধিক। এই সকল ঘন লোকবসতিপূর্ণ দেশে আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য ও কাঁচামালের উৎপাদন কম; কিন্তু শ্রমিকের সরবরাহ প্রচুর। এই ধরনের কোন কোন দেশ (যথা, জাপান, গ্রেট ব্রিটেন, বেলজিয়াম ইত্যাদি) শ্রমশক্তির সাহায্যে কল-কারখানায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করিয়া বিদেশে বিক্রয় করে ও তাহার বিনিময়ে বিদেশ হইতে খাদ্য ও কাঁচামাল

আমদানি করে ; ফলে এই সকল দেশের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ অধিক। অবশ্য ঘন লোকবসতিপূর্ণ হইলেই যে বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ অধিক হইবে এমন নহে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে লোক-বসতি অধিক হইলেও বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ অধিক নহে। সেইরূপ বিরল লোকবসতিযুক্ত হইলেই সকল ক্ষেত্রে উদ্‌বৃত্ত খাদ্য ও কাঁচামাল উৎপাদিত হয় না। মঙ্গোলিয়া, আফগানিস্তান, গ্রীনল্যাণ্ড, কানাডার উত্তরাংশ ইহার উদাহরণ। শ্রমশক্তি ও যাতায়াত-ব্যবস্থার অভাবে কানাডার ম্যাকেঞ্জি নদীর উপত্যকা-অঞ্চলের তৈলসম্পদ উপযুক্তভাবে সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই।

(ঘ) **যাতায়াত-ব্যবস্থার সুবিধায় পার্থক্য**—যাতায়াত-ব্যবস্থার উপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও গঠন নির্ভর করে। বাষ্পীয় রেল-ইঞ্জিন ও বাষ্পীয় পোত আবিষ্কারের পূর্বপর্যন্ত পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল সামান্য এবং আয়তন ও ওজনের তুলনায় অধিক মূল্যবান্ কয়েকটি সামগ্রীতে সীমাবদ্ধ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লব ও বাষ্পীয় রেল-ইঞ্জিন, বাষ্পীয় পোত, নূতন ধরনের রাস্তা-নির্মাণ ও খাল-খনন পদ্ধতি প্রভৃতি আবিষ্কারের দ্বারা যাতায়াত-ব্যবস্থায় বিপ্লবের ফলেই বর্তমান পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিমানপোত ও হিমায়ন-যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে পচনশীল দ্রব্যের বিনিময় সম্ভব হইয়াছে। আলজেরিয়ার সাহারা অঞ্চলে যাতায়াতের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এখানকার তৈলসম্পদ উত্তোলন ও রপ্তানির কোন ব্যবস্থা হয় নাই। বিভিন্ন দেশের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণের উপর সুয়েজ ও পানামা খালের প্রভাব অর্থনৈতিক ভূগোলের কোন পাঠকেরই অজ্ঞাত নহে। বহির্বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি ও পরিমাণ-নিয়ন্ত্রণে যাতায়াত-ব্যবস্থা অন্যতম মৌলিক উপাদান।

উল্লিখিত চারিটি **মৌলিক উপাদান** ব্যতীত কতকগুলি অপেক্ষাকৃত **গৌণ উপাদানও (Secondary Factors)** বহির্বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যথা,

(ক) কোন দেশের জনসাধারণের **জীবনযাত্রার মান ও মূলধনের প্রাচুর্যের** উপর বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে। জীবন-যাত্রার মান যত উন্নত হইবে চাহিদার পরিমাণ ও বৈচিত্র্য তত বৃদ্ধি পাইবে এবং এই চাহিদা মিটাইবার জন্য বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য প্রভূত পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়। বন্দর, জেটি, গুদামঘর, জাহাজ, রেলগাড়ী প্রভৃতি বাণিজ্যের বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম নির্মাণের জন্যও প্রচুর পরিমাণে মূলধনের প্রয়োজন। ফলে কোন দেশে মূলধনের প্রাচুর্য থাকিলে সেখানে বহির্বাণিজ্যের উন্নতির সম্ভাবনা থাকে।

দেশের মুদ্রাব্যবস্থাও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। স্থায়ী মুদ্রাব্যবস্থা (Stable Currency) এবং **সহজ শর্তে ঋণ (Credit)** সরবরাহের ব্যবস্থা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। কোন দেশের মুদ্রা-মূল্যের ঘন ঘন পরিবর্তন হইলে সেই দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে কেহ উৎসাহিত হইবে না।

(খ) কোন দেশে **বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ** হইতে থাকিলে উহার সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির অধিক বাণিজ্যের অন্যতম কারণ শেষোক্ত দেশগুলিতে প্রভূত পরিমাণে মার্কিন পুঁজি-বিনিয়োগ।

(গ) সরকারী **শুল্কনীতি** দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অবাধ বাণিজ্যের পরিবর্তে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর শুল্ক বসানো হইলে বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। সরকারী আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যেখানে আমদানি-রপ্তানির উপর শুল্ক বসানো হয়, স্বভাবতঃই সেক্ষেত্রে শুল্কের পরিমাণ কম হইবে এবং ইহাতে বাণিজ্যের পরিমাণ খুব বেশী হ্রাস পাইবে না। অনেকসময় বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যে শুল্কের হারে তারতম্য করা হইয়া থাকে। 'ইউরোপের সাধারণ বাজারের' অন্তর্গত দেশগুলি নিজেদের মধ্যে পণ্য-বিনিময়ে কোনরূপ শুল্ক ধার্য করে না; কিন্তু সাধারণ বাজারের বাহির হইতে আগত পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হয়। কমন্‌ওয়েল্‌থ-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি গ্রেট বৃটেনে পণ্য-রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্কের দিক দিয়া কমন্‌ওয়েল্‌থ-এর বহির্ভূত দেশগুলির তুলনায় সুবিধা পাইয়া থাকে। অনেকসময় দেশীয় কোন শিল্প বা কৃষিজ দ্রব্যকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কিংবা অন্য উদ্দেশ্যে কোন আমদানি-দ্রব্যের উপর চড়াহারে শুল্ক ধার্য করিয়া উহার আমদানি একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

(ঘ) **রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও রাজনৈতিক জোট**ও বাণিজ্যের

গতি-প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রণে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ভিন্ন রাজনৈতিক ভাবাদর্শ অনুসরণকারী দেশের মধ্যে অনেকসময়েই সদ্ভাব থাকে না বলিয়া উহাদের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণও খুব সীমাবদ্ধ থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহা দেখা যায়। রাজনৈতিক জোটও বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। কিন্তু উত্তর আটলান্টিক জোটের দেশগুলির সহিত ওয়ারশ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত কম্যুনিস্ট দেশগুলির বাণিজ্যের পরিমাণ অত্যন্ত কম।

(ঙ) **যুদ্ধ ও শান্তি** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবিত করিয়া থাকে। শান্তির সময় বিভিন্ন দেশে কৃষি, শিল্প ও যাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে এবং সাধারণের ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের সহিত বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যায়। মিত্রপক্ষের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণও হ্রাস পায় এবং নিরপেক্ষ দেশের বাণিজ্যও ব্যাহত হয়। শত্রুপক্ষের আক্রমণে বাণিজ্যিক নৌবহরের ক্ষতির আশঙ্কা সকল সময়েই থাকে। ইনসিওরেন্স-এর হার চড়িয়া যায়, ঋণ ও অগ্রিম টাকা পাওয়া কষ্টকর হয় এবং জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ শেষ হইবার পরেও নানারূপ আর্থিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাহত হইতে থাকে। যুদ্ধের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয় তাহার ছায়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপরেও পড়ে। যুদ্ধ বাধিলে আমদানি বন্ধ হইয়া অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে এই আশঙ্কায় বহু দেশ জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি গ্রহণ করে; অর্থাৎ একান্ত প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্য দেশের মধ্যেই উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। ইহার ফলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়।

(চ) বহির্বাণিজ্যের উপর **জাতীয় চরিত্র, অভ্যাস, প্রথা** ইত্যাদির প্রভাবও কম নহে। কোন দেশের অধিবাসিবৃন্দের সততা, পরিশ্রমশীলতা, সংগঠন-ক্ষমতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার উপর সেই দেশের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বহুলাংশে নির্ভর করে। গ্রেট বৃটেন, হল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও কানাডায় চা প্রধান পানীয়; অথচ এই সকল দেশে চা উৎপাদিত হয় না। ফলে এই সকল দেশ প্রচুর

পরিমাণে চা আমদানি করে। বহির্বাণিজ্যের উপর জাতীয় অভ্যাসের প্রভাবের ইহা একটি চমৎকার উদাহরণ। অনেকসময় জনমতের দ্বারাও বহির্বাণিজ্য প্রভাবিত হইতে দেখা যায়। দুইটি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণের জন্য জাপানী পণ্যদ্রব্য বয়কট করিবার পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনমত প্রবল হইয়া উঠে। ফলে শেষোক্ত দেশে জাপানী পণ্যের আমদানি হ্রাস পায়।

(ছ) আভ্যন্তরীণ বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রের মতো বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও **বিজ্ঞাপনের** যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। এই কারণে বিভিন্ন দেশের সরকার বিদেশে অবস্থিত বাণিজ্য দূতাবাসগুলির মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের পণ্যসামগ্রী প্রচারের দ্বারা বাণিজ্যের পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে। এই সকল প্রচারকার্যের জন্য প্রদর্শনী, রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছে।

(জ) পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলি সুসংবদ্ধ যান্ত্রিকীকরণ (Rationalisation), ব্যাপক উৎপাদন (Mass production) প্রভৃতি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উৎপাদন-খরচ বহুল পরিমাণে হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ইহার ফলে এই সকল দেশের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণও প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ—অনুকূল ও প্রতিকূল উপাদান-গুলির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ গতি নির্ধারিত হইবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী কালে বিভিন্ন দেশের বিস্ময়কর বৈষয়িক উন্নতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৮ সালে পৃথিবীতে মোট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৪৪৮০ কোটি ডলার। ১৯৫৫ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১৭২৩০ কোটি ডলার এবং ১৯৫৯ সালে ২০৫৭০ কোটি ডলার। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদিত হইলে ন্যায্য শর্তে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৬৪ সালে পরলোকগত মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতিসঙ্ঘের (U. N. O.) তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলি কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে (Devoloping Countries) বিশেষ সুযোগ-সুবিধাদানের যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে, সেইগুলি কার্যকরী

হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। যুদ্ধের আশঙ্কা, বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ, সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জোট, জঙ্গী জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতি ব্যাহত করিতে চাহিলেও, বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরিবেশগত বিভিন্নতা, জনসংখ্যাগত বিভিন্নতা, অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্নতা, যাতায়াত ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির ফলে শেষপর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেই থাকিবে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the various factors of International Trade.

উ: 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মৌলিক কারণসমূহ' (৪১৮ পৃ:—৪২৩ পৃ:) লিখ

2. "International Trade is the barometer of the economic development of a country." -- Discuss.

উ: 'অর্থনৈতিক উন্নতির পরিমাপক বহির্বাণিজ্য' (৪১৬ পৃ:—৪১৮ পৃ:) লিখ

দ্বিতীয় খণ্ড

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ভূগোল

অর্থনৈতিক ভূগোল

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ইউরোপ Europe)

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইউরোপ পৃথিবীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু আয়তনে এই মহাদেশ অত্যন্ত ছোট—মাত্র ৯৭,৪৬,৩০০ বর্গ-কিলোমিটার—এশিয়া মহাদেশের এক-পঞ্চমাংশ। অস্ট্রেলিয়া ভিন্ন অন্যান্য সকল মহাদেশই ইউরোপ হইতে আয়তনে বড়। ৩৫° উঃ হইতে ৭১° উঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত এই মহাদেশ বিস্তৃত বলিয়া ইহার অধিকাংশ স্থান উত্তর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত।

ভূ-প্রকৃতি (Physical Features)—এই মহাদেশের বিভিন্ন অংশের উচ্চতা সমান নহে। কোথাও ভঙ্গিল পর্বত দ্বারা বিভিন্ন স্থান আচ্ছাদিত, কোথাও বিস্তীর্ণ সমতলভূমি ও নদী-উপত্যকা বিদ্যমান, কোথাও বা মালভূমি অঞ্চল বিস্তীর্ণ স্থান জুড়িয়া আছে। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এই মহাদেশকে মোটামুটি চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়—উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, মধ্যভাগের সমতলভূমি, দক্ষিণাংশের পর্বতশ্রেণী ও দক্ষিণাংশের মালভূমি।

(ক) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল—ইউরোপ মহাদেশের উত্তরাংশে বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাংশে বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চল দেখা যায়। প্রধানতঃ চারিটি ক্ষয়ীভূত পর্বত লইয়া এই অঞ্চল গঠিত; স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, আইসল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের পর্বতশ্রেণী ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চল প্রাচীন কঠিন কেলাসিত শিলাস্তরে গঠিত। শিলাস্তরের নীচে ভূগর্ভে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ বিদ্যমান; তন্মধ্যে কয়লা ও লৌহ আকরিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(খ) ভূমধ্যভাগের সমতলভূমি—ইউরোপের মধ্যভাগে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি বিদ্যমান। এই সমতলভূমি ইংল্যাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া

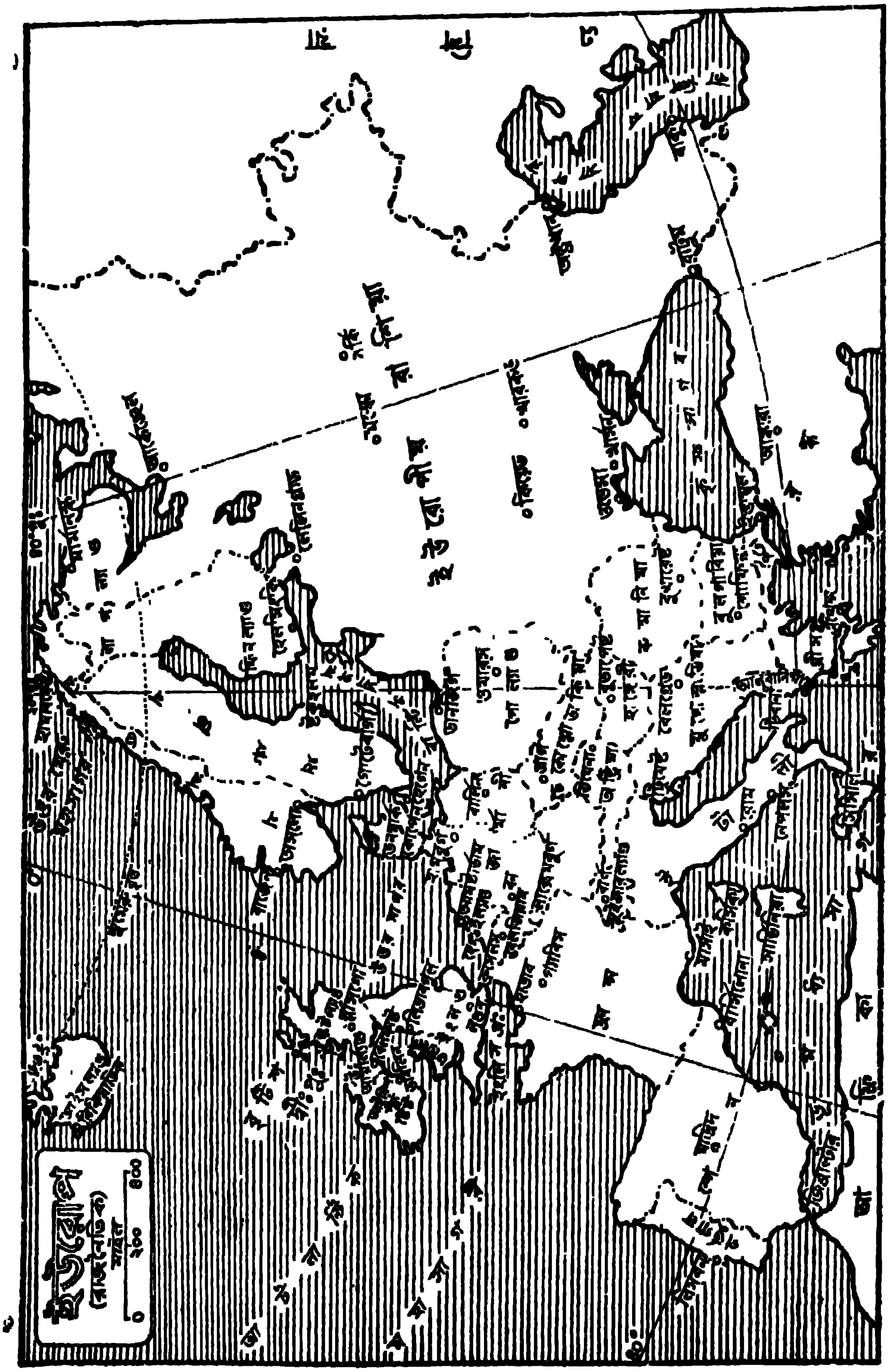

উত্তর ফ্রান্স, জার্মানী, দক্ষিণ সুইডেন হইয়া রাশিয়ার ইউরাল পর্বত পর্যন্ত

বিস্তৃত। ইহার কোন অংশই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০ মিটারের বেশী উচ্চ নহে। এই সমতলভূমির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয়। পূর্বদিকে রাশিয়ার* মৃত্তিকার তলদেশ কানাডিয়ান শীল্ডের মতো কঠিন শিলাদ্বারা গঠিত; কিন্তু ফিনল্যাণ্ড ও উত্তর ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহের উপরিভাগেই শিলা বিদ্যমান। এই অঞ্চলে ইউরোপের বিভিন্ন বড় বড় নদী প্রবাহিত বলিয়া এখানকার নদী-উপত্যকার উর্বর মৃত্তিকায় গম, যব, ভুট্টা, যই, বীট, রাই, আলু, শণ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পূর্বে এই অঞ্চলে পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি ছিল। বর্তমানে অধিকাংশ স্থানে এই বনভূমি পরিষ্কার করিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ বিদ্যমান; তন্মধ্যে কয়লা ও লৌহ আকরিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইউরোপের অধিকাংশ শিল্পকেন্দ্র এই অঞ্চলে অবস্থিত।

(গ) দক্ষিণাংশের পর্বতশ্রেণী—আল্পস্ পর্বতকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণ ইউরোপের পর্বতশ্রেণী স্পেন, পর্তুগাল ও উত্তর আফ্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া রাশিয়ার ককেশাস্ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বতশ্রেণীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত। আল্পস্ পর্বত হইতে একটি শাখা স্পেনের উত্তরাংশে গিয়াছে; ইহা ক্যান্টাব্রিয়ান ও পীরেনীজ পর্বত নামে পরিচিত। অন্য একটি শাখা ইটালির মধ্য দিয়া অ্যাপিনাইন্স্ নামে অগ্রসর হইয়া পশ্চিমদিকে বাঁকিয়া সিসিলি দ্বীপ হইয়া উত্তর আফ্রিকায় প্রবেশ করিয়া অ্যাটলাস্ পর্বত নাম ধারণ করিয়াছে। অ্যাটল্যাস্ পর্বতের একটি প্রশাখা উত্তরদিকে বাঁকিয়া স্পেনের দক্ষিণাংশে প্রবেশ করিয়া সিয়েরা নেভাডা পর্বত নামে পরিচিত হইয়াছে।

আল্পস্ পর্বত হইতে একটি শাখা পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া হাঙ্গেরীয় সমতলভূমির উত্তরে কার্পেথিয়ান পর্বত নামে এবং দক্ষিণে ডিনারিক আল্পস্ নামে পরিচিত হইয়াছে। কার্পেথিয়ান পর্বতমালা দক্ষিণে বাঁকিয়া বলকান পর্বত নাম ধারণ করিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণসাগর অতিক্রম করিয়া ককেশাস্ পর্বত নামে অভিহিত হইয়াছে। আল্পস্ পর্বতের উত্তরাংশ হইতে নির্গত একটি পাহাড় বহেমিয়া মালভূমিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। আল্পস্ পর্বতের উত্তরে ইহার সমান্তরাল একটি পর্বত জুরা নামে চলিয়া গিয়াছে; ইহা হইতে ব্ল্যাক্ ফরেস্ট ও ভোজ্ নামে দুইটি শাখা উত্তরদিকে গিয়াছে।

*এখানে 'রাশিয়া' বলিতে শুধু ইউরোপীয় রাশিয়াকেই বুঝাইবে।

এই সকল পার্বত্য অঞ্চলে পর্ণমোচী ও সরলবর্গায় বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। ইউরোপের নদীসমূহ এই পর্বতশ্রেণী হইতে নির্গত হইয়াছে। এই সকল নদী জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।

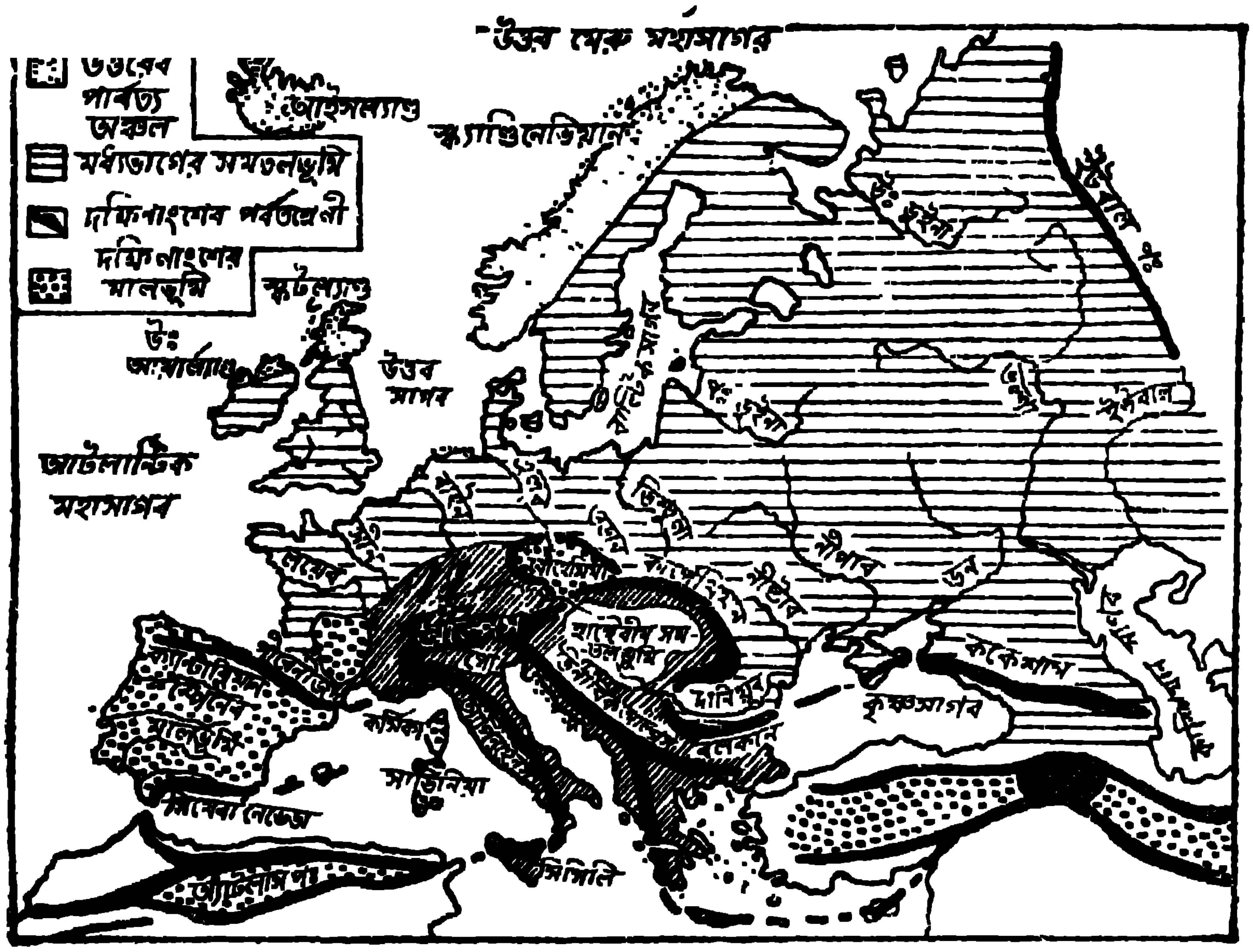

ইউরোপের প্রাকৃতিক অঞ্চল

(ঘ) দক্ষিণাংশের মালভূমি—আল্পস্ পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন পর্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত বহুস্থানে **মালভূমির** সৃষ্টি হইয়াছে। স্পেনের উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি পর্বত বিদ্যমান থাকায় মধ্যবর্তী এলাকা একটি মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে; ইহা 'স্পেনীয় মেসেটা' নামে পরিচিত। আল্পস্ পর্বতের পশ্চিমে দক্ষিণ ফ্রান্সের স্থানসমূহ মধ্য মালভূমি নামে পরিচিত। আল্পসের উত্তরে কয়েকটি মালভূমি লইয়া দক্ষিণ জার্মানী গঠিত। বহেমিয়া মালভূমি একটি পর্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত। ভূমধ্যসাগর-সৃষ্টির প্রধান কারণ ইহার চতুষ্পার্শ্বের পর্বতশ্রেণী; কর্সিকা ও সার্ডিনিয়া দ্বীপকে পর্বতের শৃঙ্গ বলিয়াই মনে হয়।

দক্ষিণ ইউরোপের এই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি **সমতলভূমি** বিদ্যমান, উত্তর ইটালির পো-উপত্যকা বা লম্বার্ডি সমতলভূমি এবং দানিয়ুব-উপত্যকায় হাঙ্গেরী ও ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমতলভূমি।

এই সকল সমতলভূমিতে নদী-উপত্যকার উর্বর পলিমাটি থাকায় বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নদী (Rivers)—ইউরোপে অসংখ্য নদী বিদ্যমান। অধিকাংশ নদী ছোট হইলেও শিল্পাঞ্চলের পক্ষে এইগুলি খুব উপকারী। ইউরোপের নদীসমূহ সুনাব্য ও খালপথে যুক্ত। এখানকার নদীগুলিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—উত্তরাভিমুখী নদীসমূহ, আল্পস্ পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ ভাগের নদীসমূহ এবং রাশিয়ার নদীসমূহ।

(ক) উত্তরাভিমুখী নদীসমূহ আল্পস্ পর্বতশ্রেণী হইতে নির্গত হইয়া উত্তর সাগর, বাল্‌টিক সাগর অথবা আটলান্টিক মহাসাগরে আসিয়া পড়িতেছে। এই সকল নদীর মধ্যে ফ্রান্সের লয়ের (৯১৮ কিলোমিটার) ও সীন (৭৭৩ কিলোমিটার), জার্মানীর রাইন (১,২২৪ কিলোমিটার), এল্‌ব্ (১,১১০ কিলোমিটার) ও ওডার (৯৩৪ কিলোমিটার) এবং পোল্যাণ্ডের ভিশ্চুলা (১,০১৪ কিলোমিটার) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(খ) দক্ষিণাংশের নদীসমূহ আল্পস্ পর্বতশ্রেণী হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া আটলান্টিক মহাসাগরে অথবা ভূমধ্যসাগরে পড়িয়াছে। এই সকল নদীর মধ্যে আইবেরিয়ান উপদ্বীপের (স্পেন ও পর্তুগাল) ডুরো (৭৪০ কিলোমিটার), টেগাস্ (৮২১ কিলোমিটার), গুয়াডিয়ানা, গুয়াদালকুইভার নদী আটলান্টিক মহাসাগরে এবং এব্রো নদী (৬৭৬ কিলোমিটার) ভূমধ্যসাগরে পড়িয়াছে। ফ্রান্সের রোন (৭৮৯ কিলোমিটার) নদী ভূমধ্যসাগরে এবং ইটালির পো (৬৬৮ কিলোমিটার) নদী আদ্রিয়াটিক সাগরে পড়িতেছে। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নদী দানিয়ুব (২,৭৭৭ কিলোমিটার) আল্পস্ পর্বতের উত্তরদিকে ব্ল্যাক ফরেস্ট পর্বত হইতে নির্গত হইলেও ইহা শেষপর্যন্ত কৃষ্ণসাগরে পড়িয়াছে। মধ্য ইউরোপের নীস্টার নদীও (১,১২৭ কিলোমিটার) কৃষ্ণসাগরে আসিয়া পতিত হইয়াছে।

(গ) রাশিয়ার নদীসমূহের অন্যতম ইউরোপের দীর্ঘতম নদী ভল্গা (৩,৫৪২ কিলোমিটার) পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ কাস্পিয়ান সাগরে আসিয়া পড়িয়াছে; ইউরোপীয় রাশিয়ার অর্ধেকের বেশী স্থান ভল্গা-উপত্যকায় অবস্থিত। দক্ষিণ রাশিয়ার নীপার (১,৯৩২ কিলোমিটার), ডন নদী (১,৯৩২ কিলোমিটার) কৃষ্ণসাগরে আসিয়া পড়িয়াছে। উত্তর রাশিয়ার পশ্চিম ডুইনা বাল্‌টিক সাগরে এবং উত্তর ডুইনা উত্তর মেরুসাগরে পড়িয়াছে।

এই সকল নদী ছাড়াও বৃটেনের টিজ্, টাইন, হাম্বার, টেমস্, ক্লাইড, মার্সি, সেভার্ণ, ডি, টে ও ফোর্থ নদী এবং আয়ারল্যাণ্ডের শ্যানন নদী ছোট হইলেও অত্যন্ত উপকারী।

জলবায়ু (Climate)—ইউরোপের অধিকাংশ স্থান উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত; শুধু উত্তর ইউরোপের অধিকাংশ স্থান হিমমণ্ডলে অবস্থিত। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত হওয়ায় এই মহাদেশের কোনও স্থানেই অত্যধিক গরম পরিলক্ষিত হয় না। মহাদেশের পশ্চিমাংশে উষ্ণ উত্তর আটলান্টিক স্রোতের প্রভাবে অত্যধিক শীতের প্রকোপ সাধারণতঃ দেখা যায় না; এই অংশে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই মৃদু। উত্তরাংশের তুন্দ্রা অঞ্চল ভিন্ন অন্য কোথাও সর্বদা বরফ পড়ে না। জলবায়ু সাধারণতঃ মৃদু হওয়ায় ইহা মানুষের কর্মশক্তির প্রেরণাদায়ক। এই মহাদেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়; জলবায়ু অনুসারে এই মহাদেশকে নিম্নলিখিত ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়:

(ক) পশ্চিম ইউরোপের উপকূলভূমি—বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং নরওয়ের পশ্চিম উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া স্পেনের উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম ইউরোপের উপকূলভাগ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। শীতকালে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে উষ্ণ স্রোত এই অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া এখানে শীতের প্রকোপ কিছুটা কম। সেইজন্য গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে সর্বদাই এখানে মৃদু জলবায়ু দেখা যায়। লোকবসতির পক্ষে এই অঞ্চল খুবই উৎকৃষ্ট। এই জলবায়ুর প্রভাবে এখানকার লোক খুব কর্মক্ষম হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ প্রায় ২০° সেঃ এবং শীতকালীন উত্তাপ প্রায় ৫° সেঃ। পশ্চিমা-বায়ুর প্রভাবে এখানে সারাবৎসর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে; বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ; বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমাংশে প্রায় ১৫০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চলে গম, যব, বীট, আলু প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হয়। জলবায়ুর প্রভাবে ও খনিজ সম্পদ থাকায় এই অঞ্চল শিল্পোৎপাদনে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। সমতলভূমি থাকায় এখানে পরিবহণ-ব্যবস্থারও উন্নতি হইয়াছে। এই অঞ্চল ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত অঞ্চল।

(খ) পূর্ব ইউরোপের মহাদেশীয় জলবায়ু অঞ্চল—ইউরোপের পূর্বাংশে মহাদেশীয় জলবায়ু থাকা স্বাভাবিক। সমুদ্র হইতে এই অঞ্চলের

অধিকাংশ স্থান দূরে অবস্থিত হওয়ায় গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন তাপমাত্রার পার্থক্য অনেক বেশী। এখানে শীতের প্রকোপ ও গরমের আধিক্য বেশী পরিলক্ষিত হয়। শীতকালীন তাপমাত্রা হিমাঙ্ক পর্যন্ত নামিয়া আসে এবং গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা প্রায় ২০° সেঃ পর্যন্ত উঠে। এখানকার গড় বৃষ্টিপাত

৩৫ সেঃ মিঃ। জলীয় বাষ্পপূর্ণ পশ্চিমা-বায়ু এই অঞ্চলে আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় অধিকাংশ জলকণা পড়িয়া যায় বলিয়া এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী হওয়া সম্ভব নহে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালেই বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এখানকার শস্যাদির মধ্যে গম, যব, রাই, শণ, তূলা, তামাক, বীট ও আলু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পোল্যাণ্ড এবং ইউরোপীয় রাশিয়ার মধ্যাংশ ও দক্ষিণাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

(গ) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল—ইউরোপের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত এই অঞ্চলে শীতকালে প্রায় ২৫ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে এখানে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বলিলেই হয়। দক্ষিণ ফ্রান্স, আইবেরিয়ান উপদ্বীপ, ইটালি, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, আলবানিয়া

ও তুরস্কের পশ্চিমাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ ২১° হইতে ২৭° সেঃ এবং শীতকালীন উত্তাপ ৫° হইতে ১০° সেঃ পর্যন্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এখানে শীতের ও গ্রীষ্মের প্রকোপ খুব কম। এখানকার ফল জগদ্বিখ্যাত। আঙুর, জলপাই, ডুমুর, আপেল, কমলালেবু প্রভৃতি প্রচুব পরিমাণে এখানে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে পর্ণমোচী ও চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। কয়লা ও খনিজ তৈলের অভাবে এই অঞ্চলে বহুদিন শিল্পের কোনও উন্নতি হয় নাই। বর্তমানে জলবিদ্যুতের সাহায্যে বহু শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

(ঘ) মধ্য ইউরোপীয় অঞ্চল—হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও জার্মানীর সমতলভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া আল্পস্ পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। ইহার **দক্ষিণাংশে** পর্বতশ্রেণী থাকায় জলীয় বাষ্পপূর্ণ সমুদ্রবায়ু আসিয়া প্রতিহত হয় এবং সেইজন্য পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রায় ১০০ সেঃ মিঃ হইতে ২০০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত হইয়া থাকে। উচ্চতার জন্য এই সকল পার্বত্য অঞ্চলে শীতের প্রকোপ বেশী এবং পর্বতশৃঙ্গে অনেকসময় বরফ জমিয়া থাকে। এই অংশে গ্রীষ্মকালে প্রায় ২৫° সেঃ উত্তাপ পরিলক্ষিত হয়। এখানকার পর্বতশ্রেণী হইতে বিভিন্ন নদী নির্গত হইয়াছে। ইহা কৃষিকার্যে ও জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে সাহায্য করে।

এই অঞ্চলের **উত্তরাংশে** মালভূমি ও সমতলভূমি থাকায় এখানকার গ্রীষ্ম মৃদু হইলেও শীতের প্রকোপ অত্যধিক। এখানে গ্রীষ্মকালে ৩৫° সেঃ এবং শীতকালে ৫° সেঃ উত্তাপ পরিলক্ষিত হয়; বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭৫ সেঃ মিঃ। এখানকার জলবায়ু কৃষিকার্যের উপযোগী; সেইজন্য পর্ণমোচী বৃক্ষ কাটিয়া এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

(ঙ) উত্তর-পূর্ব ইউরোপীয় অঞ্চল—উত্তর রাশিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও সুইডেনের উত্তরাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। হিমমণ্ডলের নিকটবর্তী বলিয়া এই অঞ্চলে তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী শীত পরিলক্ষিত হয়। এখানে শীতকালে বরফ পড়ে; গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ প্রায় ১০° সেঃ। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২৫ সেঃ মিঃ। গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের কোন কোন স্থানে কৃষিকার্য হয়। এখানকার সরলবর্গীয় বৃক্ষ এই অঞ্চলের প্রধান সম্পদ।

(চ) তুন্দ্রা অঞ্চল—উত্তর ইউরোপের উত্তরাংশ হিমমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বা ইহার নিকটবর্তী বলিয়া এই অঞ্চল অধিকাংশ সময় বরফে ঢাকা

থাকে: নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড ও রাশিয়ার উত্তরাংশ লইয়া তুন্দ্রা অঞ্চল গঠিত। এখানকার গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ৪° সেঃ-এর বেশী হয় না এবং শীতকালীন তাপমাত্রা –১২° সেঃ পর্যন্ত নামিয়া আসে। এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৎসরে ১০ হইতে ২৫ সেঃ মিঃ পর্যন্ত। এই অঞ্চল সাধারণতঃ মানুষের বাসের অযোগ্য। ল্যাপ! ও সামোয়েড জাতীয় লোকেরা এই অঞ্চলে শ্বেতকুকুর ও বন্য হরিণের সাহায্যে বাস করে।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ (Natural Vegetation)—ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার বনভূমি দেখা যায়। জলবায়ু ও মৃত্তিকার বিভিন্নতা অনুসারে এই বনভূমির বিভাগ হইয়াছে। সাধারণতঃ ইউরোপের বনভূমিকে নিম্নলিখিত পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়:

(ক) তুন্দ্রা অঞ্চল—অত্যধিক শীতের প্রকোপে প্রায় সারাবৎসর এই অঞ্চলেব অধিকাংশ স্থান বরফাবৃত থাকে। সেইজন্য এখানে লতা, গুল্ম প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কোন শস্য ব' গাছপালা জন্মায় না।

(খ) সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি—তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণে নরওয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া রাশিয়ার ইউরাল পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। এই অঞ্চল **তৈগা** নামে অভিহিত। আল্পস্ পর্বতশ্রেণীর কোন কোন অংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষ দেখা যায়। এইজাতীয় বৃক্ষ দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হয়। সেইজন্য নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড ও রাশিয়া কাগজশিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে বাক্স, দিয়াশলাই, কৃত্রিম রেশম, এমনকি সুরাসার পর্যন্ত প্রস্তুত হয়। বরফের উপর দিয়া শীতকালে সহজে এই কাঠ গন্তব্যস্থলে নেওয়া যায়।

(গ) পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি—পূর্বে মধ্য ইউরোপের সমতলভূমির প্রায় সকল স্থানই পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমিতে আবৃত ছিল। পরে এই বনভূমির অধিকাংশ স্থান পরিষ্কার করিয়া কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা হয়। মধ্য ইউরোপের সমতলভূমির কোন কোন অংশে এবং দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য অঞ্চলে এখনও পর্ণমোচী বৃক্ষ দেখা যায়। কৃষির উন্নতি হওয়ায় এবং খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যে শিল্পের উন্নতি হওয়ায় বর্তমানে এই অঞ্চলে ঘনবসতি পরিলক্ষিত হয়। বৃটেন হইতে ভল্গা নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকা পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত।

(ঘ) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বনভূমি—ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের আইবেরিয়ান উপদ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া তুরস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে পুরু বাকলযুক্ত পর্ণমোচী বৃক্ষ দেখা যায়; পুরু বাকল হইতে কর্ক প্রস্তুত হয়। এখানকার অলিভ গাছ খুব বিখ্যাত। এই অঞ্চলে বহু ফলের গাছ স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ হিসাবে জন্মিয়া থাকে।

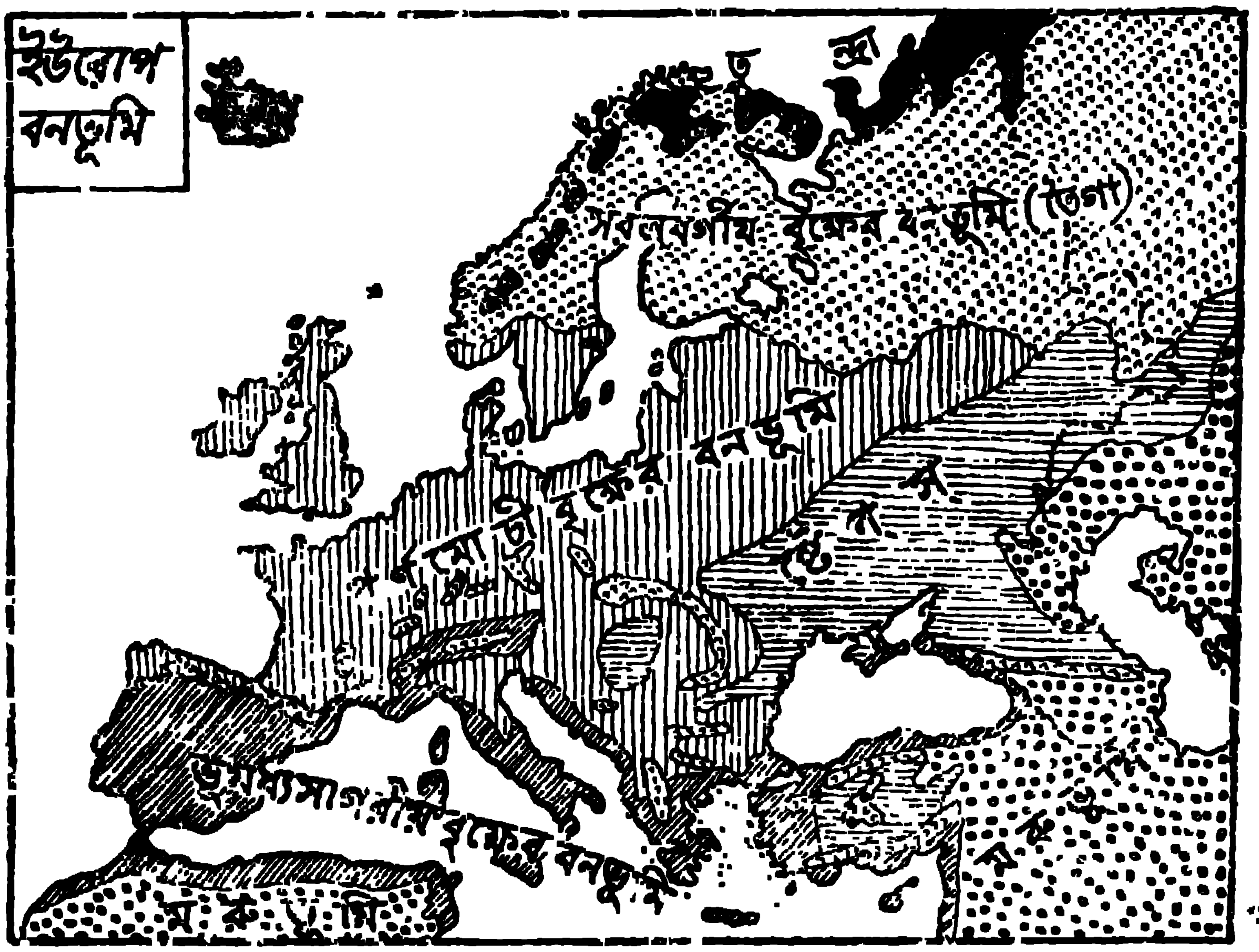

(ঙ) স্টেপ্‌স্—ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে, রাশিয়ার ইউক্রেন অঞ্চলে এবং ভল্গা নদীর দক্ষিণ অববাহিকায় স্টেপ্‌স্ তৃণভূমি বিদ্যমান। এই তৃণভূমির পশ্চিমাংশে কিছু কিছু ছোট গাছও দেখা যায়।

কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরাংশে ও উত্তর-পশ্চিমাংশে কাঁটাগাছ দেখা যায়। মরুভূমি বা আধা-মরুভূমি অঞ্চল বলিয়া এখানে কাঁটাগাছের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

অর্থনৈতিক উন্নতির কারণসমূহ (Causes for Economic Development)—ইউরোপ মহাদেশ শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নতির উচ্চতম সোপানে উঠিয়াছে। সভ্যতার শিখরে উঠিয়াছে বলিয়াও এই মহাদেশের লোকেরা গর্ব করে। বিভিন্ন কারণে এই মহাদেশের পক্ষে উন্নতি লাভ করা সম্ভব হইয়াছে।

এই মহাদেশের **অবস্থান** পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় অন্যান্য মহাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের উন্নতিসাধন সহজসাধ্য হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশকে ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণ সর্বদাই তাহাদের পণ্যদ্রব্যের বাজার হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। আটলান্টিক মহাসাগরের অপর তীরে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য-স্থাপনও ইউরোপের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকা হইতে বহু কাঁচামাল আনিয়া পশ্চিম ইউরোপের শিল্পে ব্যবহার করা হইত। এই মহাদেশের তিনদিকে সমুদ্র থাকায় বন্দর-স্থাপন এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে এবং নৌবহরের আধিপত্যে এই মহাদেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া সমুদ্র হইতে আগত উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে এখানকার জলবায়ুতে শীতের আধিক্য কিছুটা কমিয়াছে। এই মহাদেশের **সৈকতরেখা** অধিকাংশ স্থানেই ভগ্ন থাকায় বন্দর-স্থাপন সহজসাধ্য হইয়াছে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এই মহাদেশের মৃদু **জলবায়ু** মানুষের কর্মশক্তির প্রেরণা দিয়াছে এবং শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। এখানকার জলবায়ু মানুষের বসবাসের পক্ষে উপযোগী বলিয়া এই মহাদেশের অধিকাংশ স্থানে ঘন লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়।

ইউরোপ মহাদেশের উত্তরাংশে অবস্থিত সরলবগায় বৃক্ষের **বনভূমি** হইতে মূল্যবান্ কাঠ পাওয়া যায়। ইহা কাগজশিল্পের উন্নতিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। রাশিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও সুইডেন কাষ্ঠসম্পদ হইতে কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত করিয়া কাগজশিল্পের উন্নতি সাধন করিয়াছে। এই কাষ্ঠমণ্ড বিদেশেও রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া জার্মানী হইতে যুগোশ্লাভিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলেও মূল্যবান্ কাষ্ঠ পাওয়া যায়। এই মহাদেশের কাষ্ঠসম্পদ বাণিজ্যিক নৌবহর গড়িয়া তুলিতে প্রভূত সাহায্য করিতেছে।

ইউরোপ মহাদেশ **মৎস্য-শিল্পে** বিশেষ উন্নত কারণ এই মহাদেশের তিনদিকেই জলরাশি বিরাজমান। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের উত্তর সাগর মৎস্য-শিকারের প্রধান কেন্দ্র। এখানে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু থাকায় অগভীর সমুদ্রে বৃটেন, নরওয়ে ও ফ্রান্স প্রচুর পরিমাণে মৎস্য সংগ্রহ করে। বর্তমানে রাশিয়া বাল্টিক সাগর ও কৃষ্ণ সাগরে প্রচুর মৎস্য শিকার করে।

ইউরোপ **কৃষিজ সম্পদেও** সমৃদ্ধ। বিশেষতঃ, রাশিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

এখানে কৃষি-জমির স্বল্পতার জন্য অতি-উৎপাদন (Intensive) কৃষিব্যবস্থা প্রচলিত এবং এই মহাদেশের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন অত্যন্ত বেশী। ইউরোপের শতকরা ৫৬ জন লোক কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল। চাহিদার তুলনায় এখানকার উৎপাদন কম বলিয়া এই মহাদেশকে এখনও খাদ্যশস্য ও শিল্প-শস্য আমদানি করিতে হয়।

পৃথিবীর কৃষিজ দ্রব্য-উৎপাদনে ইউরোপের স্থান *

১৯৬৩-৬৪ (কোটি মেঃ টন)

	মোট উৎপাদন	ইউরোপের উৎপাদন	ইউরোপের অংশ (শতকরা)	পৃথিবীতে ইউরোপের স্থান
গম	২৫·১	১২·৫	৫০%	প্রথম
রাই	৩·৪	৩·১	৯৫%	প্রথম
যব	১০	৫·২	৫২%	প্রথম
শণ (Hemp)	·০৩৮	·০২৬	৭০%	প্রথম
অতসী (Flax)	·০৫৪	·০৫১	৯৪%	প্রথম
বীট	১৪·৩৪	১২·৭১	৮৯%	প্রথম
ভুট্টা	২৩·৩	৪·৬	২১%	দ্বিতীয়
তুলা	১·১৭	০·১৭	১৫%	তৃতীয়
আলু	২৬·২৩	২০·৪৩	৮০%	প্রথম

পৃথিবীর মোট **খনিজ সম্পদের** প্রায় অর্ধেক এই মহাদেশে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে কয়লা-উৎপাদনে রাশিয়া প্রথম স্থান, বৃটেন চতুর্থ স্থান, জার্মানী পঞ্চম স্থান, পোল্যাণ্ড ষষ্ঠ স্থান এবং ফ্রান্স সপ্তম স্থান অধিকার করে; লৌহ আকরিক-উৎপাদনে রাশিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান, ফ্রান্স তৃতীয় স্থান, সুইডেন পঞ্চম স্থান, বৃটেন সপ্তম স্থান এবং জার্মানী অষ্টম স্থান অধিকার করে; রাশিয়া খনিজ তৈল-উৎপাদনে তৃতীয় স্থান, এবং ম্যাঙ্গানিজ ও প্লাটিনাম উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই সকল খনিজ দ্রব্য ছাড়াও নিকেল, দস্তা, সীসা, টিন, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি খনিজ সম্পদ এই মহাদেশে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

* ইউরোপের পরিসংখ্যানে সমগ্র রাশিয়াকে ইউরোপের মধ্যে ধরা হইয়াছে।
Source—U. N. O. & F. A. O. Bulletins.

পৃথিবীর খনিজ দ্রব্য-উৎপাদনে ইউরোপের স্থান

১৯৬৩-৬৪ (কোটি মেঃ টন)

	পৃথিবীর মোট উৎপাদন	ইউরোপের উৎপাদন	ইউরোপের অংশ (শতকরা)	পৃথিবীতে ইউরোপের স্থান
কয়লা	২২৩	৯৮	৪৪%	প্রথম
খনিজ তৈল	১২১	২৩'৮১	১৯%	তৃতীয়
লৌহ আকরিক	৪৮'৩	২৭'৪	৫৭%	প্রথম
ম্যাঙ্গানিজ	০'৫০	'২৪১	৪৯%	প্রথম

শিল্পের উন্নতিতে এই মহাদেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। স্থানীয় নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু শ্রমিকের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। উৎকৃষ্ট পরিবহণ-ব্যবস্থার জন্য শিল্পের উন্নতি সহজসাধ্য হইয়াছে। এই মহাদেশের অধিবাসীদের উন্নত জীবনযাপনের জন্য এখানে শিল্পদ্রব্যের চাহিদা অত্যন্ত বেশী; নিকটবর্তী এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশেও শিল্পদ্রব্য রপ্তানি করা সহজ। কারিগরী শিক্ষার উন্নতি হওয়ায় বিভিন্ন যন্ত্রের আবিষ্কার এবং শিল্পবিপ্লব এখানেই প্রথম সংঘটিত হয়। এই মহাদেশের রাশিয়া, জার্মানী, বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড শিল্পে অত্যন্ত উন্নত এবং শিল্পোৎপাদনে পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

পৃথিবীর শিল্পদ্রব্য-উৎপাদনে ইউরোপের স্থান

১৯৬৩-৬৪ (লক্ষ মেঃ টন)

	পৃথিবীর মোট উৎপাদন	ইউরোপের উৎপাদন	ইউরোপের অংশ (শতকরা)	পৃথিবীতে ইউরোপের স্থান
ইস্পাত	৩৬০০	১৮০০	৫০%	প্রথম
কার্পাস-বস্ত্র	৬৩	১৫'২	২৪%	তৃতীয়
চিনি	৫৬০	২১৮	৩৯%	প্রথম
পশম-বস্ত্র (সুতা)	১৬	১০'৫	৬৬%	প্রথম

পরিবহণ-ব্যবস্থায় ইউরোপ মহাদেশ খুবই উন্নত। পৃথিবীর মোট জাহাজের শতকরা ৭০ ভাগ এই মহাদেশের অধীন। রাশিয়া, বৃটেন, নরওয়ে, সুইডেন ও ফ্রান্স জাহাজ-নির্মাণশিল্পে বিশেষ উন্নত; রেলপথেও এই মহাদেশ খুবই উন্নত। এই মহাদেশে প্রায় ৩,৭১,০০০ কিলোমিটার রেলপথ আছে। এখানে প্রতি দশ হাজার লোকে ৭'৭৩ কিলোমিটার

রেলপথ আছে ; প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় '০৪ কিলো-মিটার। রেলপথের দৈর্ঘ্যে উত্তর আমেরিকার পরেই ইউরোপের স্থান। আকাশপথেও উত্তর আমেরিকার পরেই ইউরোপের স্থান। ইউরোপের বিভিন্ন শহর হইতে পৃথিবীর সকল দেশ আকাশপথে যুক্ত।

এই মহাদেশের মানুষের চরিত্রবল অত্যন্ত দৃঢ়। জলবায়ুর প্রভাবে ইহারা অত্যন্ত দক্ষতার সহিত অধিক সময় পরিশ্রম করিতে পারে। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ৫৩ কোটি—ইহা পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ। এই মহাদেশের **লোকবসতির** ঘনত্ব মোটামুটি নিবিড় হইলেও কোন কোন অঞ্চলে বিরল লোকবসতিও পরিলক্ষিত হয়। শিল্পপ্রধান দেশসমূহে লোকবসতির ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী—প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ১০০ জন ; ইংল্যাণ্ড, রাশিয়ার ইউক্রেন ও মস্কো অঞ্চল, জার্মানীর স্যাক্সনী ও সাইলেশিয়া, দক্ষিণ হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও উত্তর ফ্রান্সে এইরূপ লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আইসল্যাণ্ড, গ্রেট বৃটেনের উত্তর স্কটল্যাণ্ড, নরওয়ে ও সুইডেনের পার্বত্য অঞ্চল, ফিনল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্বাংশ ও তুন্দ্রা অঞ্চলের লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৭ জনের কম। এই মহাদেশের অন্যান্য দেশের লোকবসতির ঘনত্ব মোটামুটি প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ২৫ হইতে ১০০ জন।

রাশিয়া (U. S. S. R.)

বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ রাশিয়া বা সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সমষ্টি (Union of Soviet Socialist Republic) আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ। ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশ দুইটিকে রাশিয়া সংযুক্ত করিয়াছে। Kipling-এর বাণী, 'East is East and West is West and never the twain shall meet' রাশিয়া মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছে। বিখ্যাত ভৌগোলিক R. M. Fleming সুন্দরভাবে এই কথাটি বুঝাইয়া বলিয়াছেন, "খ্রীস্ট-সংস্কৃতিসমৃদ্ধ জর্জিয়া ও আর্মেনিয়ার প্রাচীন রাজ্য, প্রাচীনযুগের সভ্যতাসমৃদ্ধ ঐস্লামিক কেন্দ্রীয় এশিয়া প্রজাতন্ত্র, সমরখন্দ, খিভা ও বুখারা নগরীর চাকচিক্য এবং দূরপ্রাচ্যের কামচাট্কার নীচ জাতির বসতিযুক্ত অঞ্চল মিলিয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে।"

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানে ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে পৃথিবীর সকল দেশকে হার মানাইয়া দুর্বার গতিতে রাশিয়া উন্নতির চরম শিখরের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। মেজর ইউরি গাগারিণকে মহাশূন্যে প্রেরণ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণকে স্তম্ভিত করিতে শুধু রাশিয়াই প্রথমে সক্ষম হইয়াছে।

রাশিয়ার **আয়তন** ২২৪ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার—সমগ্র পৃথিবীর আয়তনের ছয়ভাগের একভাগ; এই দেশ আয়তনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনগুণ, ভারতের সাতগুণ এবং জাপানের ষাটগুণ। এই দেশের দৈর্ঘ্য উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রায় ৫,০০০ কিলোমিটার এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার। দেশের আয়তন এত বড় যে, ভ্লাডিভস্টকে যখন সকাল পাঁচটা, মস্কোয় তখন পূর্বদিনের সন্ধ্যা সাতটা। পৃথিবীর ১২টি দেশ রাশিয়ার সীমান্তকে স্পর্শ করিয়াছে—নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, তুরস্ক, ইরাণ, আফগানিস্তান, চীন, মঙ্গোলিয়া ও কোরিয়া।

বিশাল আয়তনের এই দেশে ১৫টি **প্রজাতন্ত্র**, ৪,০৫৩টি জিলা, ১,৬৪১টি শহর, ৯,৭৭৫টি নগর এবং ৪৯,৭৫৬টি গ্রাম আছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পূর্বে এই দেশ স্বৈরতন্ত্রী জারের অধীনে ছিল। বিপ্লবের পর এই দেশ প্রথমতঃ ১১টি প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত হয়—রাশিয়ান ফেডারেশন, ইউক্রেন, শ্বেত রাশিয়া, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকস্তান ও কিরঘিজিয়া। বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালে বিভিন্ন দেশের সীমারেখা পুনর্নির্ধারণের ফলে মালভেডিয়ান, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া প্রজাতন্ত্র সংযোজিত হওয়ায় বর্তমানে এই দেশ ১৫টি প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত। প্রতিটি প্রজাতন্ত্র ইহাদের নিজস্ব সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। সামরিক, পররাষ্ট্র-বিষয়ক, পরিবহণ-ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা-সংক্রান্ত বিষয়ে ইউনিয়ন (কেন্দ্রীয় সরকার) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

ভূ-প্রকৃতি (Physical Features)—ভূ-প্রকৃতি অনুসারে রাশিয়াকে প্রধানতঃ সমান দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। ইনেসি নদী এই দুইটি বিভাগের সীমা নির্দেশ করে। পশ্চিমাংশের অধিকাংশই সমভূমি ও নিম্নভূমি এবং পূর্বাংশের অধিকাংশই পাহাড়-পর্বতে ঢাকা। সেইজন্য পশ্চিমাংশ কৃষি, শিল্প ও পরিবহণ-ব্যবস্থায় উন্নত এবং পূর্বাংশ অনুন্নত। এই দেশের সর্বোচ্চ স্থান ৭,৪৯৫ মিটার উচ্চ এবং সর্বনিম্ন সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩২ মিটার নিম্নে অবস্থিত।

এই দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পর্বতশ্রেণী ও মালভূমি বিদ্যমান। **পার্বত্যভূমির** মধ্যে ইউরাল ও দক্ষিণ রাশিয়ার পর্বতসমূহ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ওব নদীর অববাহিকার নিকটবর্তী অঞ্চলে **ইউরাল পর্বত** অবস্থিত। এই পার্বত্য অঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। লৌহ, খনিজ তৈল, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি মূল্যবান্ খনিজ সম্পদ এখানে পাওয়া যায়। দক্ষিণ রাশিয়ায় অবস্থিত এক সু-উচ্চ পর্বতমালা দেশের স্বাভাবিক সীমারেখা হিসাবে কাজ করে। বৈদেশিক আক্রমণের হাত হইতে এই পর্বতমালা দেশকে রক্ষা করে। এই পর্বতমালার মধ্যে **ককেশাস্, হিন্দুকোশ, আলটাই, ইয়াব্লনয় ও স্তানোভাই** পর্বতসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পর্বতসমূহেও প্রচুর খনিজ সম্পদ বিদ্যমান। খনিজ তৈল, লৌহ, কয়লা প্রভৃতি খনিজ সম্পদ এই অঞ্চলে বিদ্যমান। এই সকল পর্বত হইতে নির্গত বিভিন্ন নদী জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত হইয়াছে।

বিভিন্ন **মালভূমির** মধ্যে এই দেশের উত্তর-পশ্চিমের **ফেনো-স্কাণ্ডিয়া** (Fenno-Scandia) নামক মালভূমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার উচ্চতা প্রায় ৯০০ মিটার। এই অঞ্চল প্রাচীন কঠিন শিলাদ্বারা গঠিত। এখানকার মৃত্তিকা পডসল্-জাতীয়। এই মালভূমির দক্ষিণে **ভোরোনেজ** (Voronezh) নামক মালভূমিটি কঠিন শিলাদ্বারা গঠিত। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এই মালভূমিটির উচ্চতা গড়ে প্রায় ১,৮০০ মিটার। এই অঞ্চলের জমি অত্যন্ত উর্বর এবং গম, বার্লি, তুলা ও বীট-চাষের উপযোগী। এই মালভূমির দক্ষিণে এবং কৃষ্ণসাগরের উত্তরে **আজভ-পডলিয়ান** (Azov-Podolian) মালভূমি অবস্থিত। ইহার গড় উচ্চতা প্রায় ২,৮০০ মিটার। এই মালভূমির মৃত্তিকা উর্বর ও কৃষির উপযোগী। এখানে গম, বার্লি, তুলা, বীট প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। সাইবেরিয়া অঞ্চলের মালভূমির মধ্যে **অ্যালডেন** মালভূমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লেনা নদীর উৎসে এবং লেনা ও ইনেসি নদীর মধ্যকার ভূভাগে এই মালভূমিটি অবস্থিত। প্রাচীনতম শিলাদ্বারা এখানকার মৃত্তিকা গঠিত। এই মালভূমিতে গম ও যব উৎপন্ন হয়।

এই দেশের উত্তরাঞ্চল বরফাচ্ছন্ন থাকে। ইহা তুন্দ্রা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চল মনুষ্যবাসের অযোগ্য। রাশিয়ার পূর্বাংশে বিভিন্ন নদী-উপত্যকায় নিম্নভূমি ও সমভূমি দেখা যায়। ইউরাল পর্বতের পূর্বে ওব নদীর অববাহিকায়

বহু সামুদ্রিক বস্তুর অস্তিত্বের লক্ষণ পাওয়া যায়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, একসময় এই স্থান সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। ইউরাল পর্বতের পশ্চিমে পেচোরা নদীর উপত্যকায় নিম্নভূমি বিদ্যমান।

জলবায়ু (Climate)—আয়তনে রাশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ। সুতরাং এই দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু থাকা স্বাভাবিক। এই দেশ কর্কটক্রান্তির উত্তরে অবস্থিত এবং হিমমণ্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত। সূর্য এখানে সর্বদাই তির্যকভাবে কিরণ দেয়; সুতরাং তাপের প্রখরতা সর্বদাই কম। উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ায় **তাপমাত্রা** সর্বাপেক্ষা কম (−৭০° সেঃ) এবং দক্ষিণাংশের তেরমেজ অঞ্চলে তাপমাত্রা সর্বাপেক্ষা বেশী(৫০° সেঃ)। প্রথমোক্ত স্থান শীতের প্রকোপে বরফাচ্ছন্ন থাকে এবং শেষোক্ত স্থানে প্রচণ্ড গরমে মানুষ ছটফট করে। তাপমাত্রার এই বৈচিত্র্য বর্তমান থাকিলেও ইউরোপীয় রাশিয়ার অধিকাংশ স্থানের আবহাওয়া মোটেই উগ্র নহে; এখানকার জলবায়ুকে মহাদেশীয় জলবায়ু বলা যায় (৯ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। দেশের এই অংশের কৃষক ও শ্রমিকগণ সেইজন্য অত্যন্ত কর্মঠ হয়। রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু এবং উত্তরাংশে তুন্দ্রাঞ্চলের জলবায়ু দেখা যায়।

বৃষ্টিপাত সবচেয়ে বেশী হয় ককেশাস্ অঞ্চলে কৃষ্ণসাগরের তটভূমিতে এবং সবচেয়ে কম মধ্য এশিয়ায়। পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়া আসে। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ককেশীয় পর্বতমালায় প্রায় ৪০০ সেঃ মিঃ এবং মধ্য এশিয়ায় প্রায় ১০ সেঃ মিঃ। মধ্য এশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে এবং ট্রান্স-ককেশীয়ায় কদাচিৎ বরফ পড়ে; কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব কামচাট্কার সমুদ্র-উপকূলে এত বরফ পড়ে যে, ঘরবাড়ী প্রায় বরফে ঢাকা পড়িয়া যায়। জলবায়ুর এই বৈসাদৃশ্যের জন্য অর্থনৈতিক সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই বিদ্যমান। উত্তরের সরলবর্গীয় বৃক্ষসমূহ বরফের ভয়ে সোজা হয় বলিয়া এই বৃক্ষের কাষ্ঠের আদর সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। তীব্র ঠাণ্ডার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিভিন্ন পশুর গায়ে পুরু পশমের সৃষ্টি হয়। সেইজন্য সাইবেরিয়ার পশম জগদ্বিখ্যাত। দক্ষিণাংশের শুষ্ক ও গরম গ্রীষ্মকাল শ্রেষ্ঠ রসালো আঙ্গুর ফল-উৎপাদনের অনুকূল।

মৃত্তিকা (Soil)—বিশাল আয়তনের দেশ বলিয়া রাশিয়ায় বিভিন্নপ্রকার মৃত্তিকা থাকা স্বাভাবিক। মৃত্তিকার বিভিন্নতা অনুসারে এই দেশকে মোটামুটি পাঁচটি মণ্ডলে ভাগ করা যায়—তুন্দ্রা, বনমণ্ডল, স্টেপ্‌স্, মরুভূমি ও মরুপ্রায়

সমতলভূমি। উত্তরে তুন্দ্রা অঞ্চলে পীট-জলাভূমির মৃত্তিকা এবং বনমণ্ডলে সাধারণতঃ পডসল্-জাতীয় মৃত্তিকা দেখা যায়। অনাবৃষ্টির আধিক্য না থাকায় বনমণ্ডলে শস্যের নিয়মিত উৎপাদন সম্ভব হয়। এখানকার শস্যের পরিমাণ কৃষ্ণমৃত্তিকার স্টেপ্‌স্‌কেও ছাড়াইয়া যাইতে পারে। স্টেপ্‌স্‌ অঞ্চলে কৃষ্ণমৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা শস্যোৎপাদনের বিশেষ সহায়ক। মরুভূমি ও মরুপ্রায় সমতলভূমি অঞ্চলে ধূসর মৃত্তিকা দেখা যায়। কৃত্রিম সেচের সাহায্যে এই মৃত্তিকাকে কৃষির উপযোগী করা হয়।

রাশিয়ার মোট সেচ-জমির পরিমাণ ৬৫ লক্ষ হেক্টর। পৃথিবীর মোট উদ্ভিদের অর্ধেকের বেশী পাওয়া যায় এই দেশে। সমাজতান্ত্রিক শাসনে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের উন্নতির ফলে তুন্দ্রা অঞ্চলেও কৃষিকার্য সম্প্রসারিত হইয়াছে।

বনভূমি ও প্রাকৃতিক অঞ্চল (Vegetation Belts and Natural Regions)—১০ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার জুড়িয়া রাশিয়ার বনভূমি বিস্তৃত। এই দেশের শুধু বনভূমির আয়তন প্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান। পৃথিবীর মোট বনভূমির এক-তৃতীয়াংশ এই দেশে অবস্থিত। মূল্যবান্ কাঠের সরবরাহে রাশিয়া পৃথিবীর সমৃদ্ধতম দেশ। প্রায় ১২০০ রকমের গাছপালা এই দেশের বনভূমিতে জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে লার্চ, পাইন, বার্চ, স্প্রুস্, দেবদারু, ফার, ওক্ ও বীচ গাছ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আখরোট, পেস্তা, বাদাম, চেস্টনাট, পিয়র, আপেল, এলাচ প্রভৃতি গাছও অধিক সংখ্যায় জন্মিয়া থাকে। বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক শাসনে লক্ষ লক্ষ হেক্টর নূতন বনভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। বনভূমি অঞ্চলের তৃণভূমিতে পুষ্টিকর ঘাস জন্মায়। ইহা পশুপালনের সহায়ক। বনসম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশকে নিম্নলিখিত সাতটি বনভূমি ও প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়।

(ক) তুন্দ্রা অঞ্চল—রাশিয়ার উত্তরাংশের বৃক্ষহীন এই অঞ্চলে গুল্ম, ঘাস প্রভৃতি দেখা যায়। অত্যধিক শীতের প্রকোপে এই স্থান বরফাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া এখানে কৃষিকার্য করা প্রায় অসম্ভব। ল্যাপস্ ও সামোয়েডগণ শ্বেতকুকুর ও বল্গা হরিণের সাহায্যে এখানে বাস করে। উত্তর আটলান্টিক উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে এই অঞ্চলের মুরমানস্ক বন্দর বৎসরের সবসময় বরফমুক্ত থাকে। রেলপথে এই বন্দর লেনিনগ্রাডের সহিত যুক্ত।

(খ) সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি অঞ্চল—তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া এই বনভূমি সাধারণতঃ তৈগা নামে পরিচিত। এই

বনভূমিতে প্রধানতঃ স্কট্‌স্ পাইন ও স্প্রুস্ গাছ বেশী দেখা যায়। ইহা ছাড়া হেমলক, সীডার, বার্চ প্রভৃতি গাছও এখানে জন্মে। এখানকার কাষ্ঠসম্পদ হইতে কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। তৈগার উত্তরাংশে পূর্বে কোন কৃষিকার্য হইত না; দক্ষিণাংশে শণ, যই প্রভৃতি শস্যের চাষ হইত। বর্তমানে রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে এই অঞ্চলের বনভূমি পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্যের প্রসার হইয়াছে। উত্তরাংশে এখনও পশুশিকার, মৎস্য-চাষ ও বনজ সম্পদের সাহায্যে বহু লোক জীবিকা নির্বাহ করে। এই অঞ্চলে লেনিনগ্রাড একটি বিখ্যাত বন্দর; ইহা বৎসরে প্রায় এক মাস বরফে ঢাকা থাকে।

(গ) পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি অঞ্চল—সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির দক্ষিণে পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি বিদ্যমান। এই বনভূমিতে ওক্, বীচ, এল্‌ম্, চেস্টনাট প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। ইহা ছাড়া আঙ্গুর, আখরোট, চেরি প্রভৃতি ফলও এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় অংশে এই বনভূমি পরিষ্কার করিয়া গম, বার্লি, যই, আলু প্রভৃতি শস্যের চাষ হয়; পূর্বে এই অঞ্চলে মানুষের কার্যাবলী অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল; কারণ অধিকাংশ মানুষ বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল থাকিত। কিন্তু বর্তমানে কৃষিকার্যের উন্নতি হওয়ায় এখানকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বহু শহর স্থাপিত হইয়াছে; মস্কো, টুলা, কালিনিন, আইভানোভো প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। সাইবেরিয়ার পূর্বদিকে এই বনভূমি অঞ্চলে এখনও কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় এখানকার লোকবসতি এখনও বিরল।

(ঘ) স্টেপ্‌স্ অঞ্চল—ইউরোপীয় রাশিয়ার পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমির এবং সাইবেরিয়ার সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির দক্ষিণে অবস্থিত স্টেপ্‌স্ বা তৃণভূমি অঞ্চলে কৃষ্ণমৃত্তিকা থাকায় ইহা কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গম-উৎপাদক স্থান। ইহা ছাড়া যব, যই, ভুট্টা, বীট, তুলা প্রভৃতি এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের ডন-অববাহিকায় প্রচুর কয়লা, লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। এইজন্য এখানে ঘন লোকবসতি দেখা যায়।

(ঙ) মরুভূমি অঞ্চল—স্টেপ্‌স্ অঞ্চলের দক্ষিণাংশ এবং কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর ও পূর্বাংশের মৃত্তিকায় অত্যধিক লবণ থাকায় এবং তাপমাত্রা বেশী হওয়ায় মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে কাঁটাগাছ জন্মে।

(চ) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল—ইউরোপীয় রাশিয়ার দক্ষিণাংশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বিদ্যমান থাকায় এখানে আঙ্গুরের চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ছ) পার্বত্য অঞ্চল—কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশান্তমহাসাগরীয় উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত দেশের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পর্বতশ্রেণীতে মূল্যবান্ খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। ইউরোপীয় রাশিয়ার পূর্বদিকে অবস্থিত ইউরাল পর্বতেও খনিজ তৈল ও লৌহ আকরিক প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইউরাল অঞ্চলের খনিজ সম্পদ দ্বারা এখানকার বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র ম্যাগনিটোগর্স্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম রাশিয়ার আজারবাইজানের রাজধানী বাকু রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ তৈলকেন্দ্র।

লোকবসতি (Population)—রাশিয়ায় প্রায় ১০০ **জাতির** লোক বাস করে। তন্মধ্যে রুশগণ জনসংখ্যায় প্রায় অর্ধেকের বেশী। জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ ইউক্রেনীয়। বাইলোরুশীয় জনগণ তৃতীয় স্থান এবং উজবেক ও তাতারগণ যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অধিকার করে।

রুশগণ শ্বেতজাতির বংশোদ্ভব। ইহারা ইউরোপীয় রাশিয়ার উত্তরাংশে ও মধ্যাংশে বাস করে। শ্বেতজাতি ও পীতজাতির সংমিশ্রণে ইউক্রেনীয়গণের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা ইউরোপীয় রাশিয়ার দক্ষিণাংশে, আমুর নদী ও বৈকাল হ্রদের নিকটবর্তী অঞ্চলে সাধারণতঃ বাস করে। মধ্য এশিয়ায় (কিরঘিজস্তান, তুর্কিস্তান ও উজবেকিস্তান) উজবেক ও তাতারগণ বাস করে। ইহারা সাধারণতঃ ইরাণ ও তুরস্ক জাতির বংশোদ্ভব। বর্তমানে রাশিয়ায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ-সম্পর্কে কোনও বাধানিষেধ না থাকায় বিভিন্ন মিশ্রজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিবাসীদের ল্যাপস্ ও সামোয়েড বলা হয়। ইহারা শ্বেতকুকুর ও বল্গা হরিণে চড়িয়া ও বল্গা হরিণের মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে।

জনসংখ্যায় রাশিয়া পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে (চীন ও ভারতের পর); ১৯৬৪ সালে এই দেশের **লোকসংখ্যা** ছিল ২২ কোটি ৪৮ লক্ষ। বিপ্লবের পূর্বে লোকসংখ্যা ছিল ১৫ কোটি ৯২ লক্ষ। সমাজ-তান্ত্রিক শাসনে লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এই দেশের জনসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। মৃত্যুহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। শিশু-মৃত্যুর হার প্রায় নগণ্য। বাৎসরিক জন্মহার প্রায় ৩৫ লক্ষ। দেশের শিল্পোন্নয়নের ফলে শহরবাসীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে—বর্তমানে

প্রায় ১০ কোটি। সমাজতান্ত্রিক আমলে শত শত নূতন শহর গড়িয়া উঠিয়াছে; ইহার সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার হাজার। পাঁচ লক্ষের বেশী বাসিন্দা আছে, এইরূপ শহরের সংখ্যা প্রায় ২৫টি; তন্মধ্যে মস্কো, লেনিনগ্রাড, কিয়েভ, বাকু, গোর্কী, খরকভ, তাশখন্দ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আয়তনের তুলনায় এই দেশের লোকসংখ্যা অনেক কম। সামগ্রিকভাবে রাশিয়ায় **লোকবসতি** প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ১০ জন। কিন্তু ইউরোপীয় রাশিয়ায় প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ১৬ জন লোক বাস করে। শতকরা ৪৮ জন লোক শতকরা ৬ ভাগ জমিতে বাস করে এবং শতকরা ৬৫ ভাগ জমিতে মাত্র শতকরা ৬ ভাগ লোক বাস করে। প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর এই দেশের লোকবসতির ঘনত্ব নির্ভর করে। ইউরোপীয় অংশে লেনিনগ্রাড হইতে কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সমতলভূমি থাকায় এবং বিভিন্ন সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী লোক এই অঞ্চলে বাস করে। কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। শিল্পোৎপাদনেও ইহা দেশের শ্রেষ্ঠ অঞ্চল বলিয়া পরিগণিত। বরফাচ্ছাদিত তুন্দ্রা অঞ্চলের লোকসংখ্যা স্বভাবতঃই অত্যন্ত কম। দূরপ্রাচ্যের ভ্লাডিভস্টক অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প স্থাপিত হওয়ায় এখানে নাতিনিবিড় লোকবসতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মধ্য এশিয়া অঞ্চলে শিল্পের উন্নতি না হওয়ায় এবং বনভূমি থাকায় এখনও বিরল লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়।

• **অর্থনৈতিক উন্নতির কারণ (Causes for Economic Development)**—বিভিন্ন কারণে রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। প্রথমতঃ, দেশের অপর্যাপ্ত **খনিজ সম্পদ** দেশের শিল্পগঠনে সাহায্য করিয়াছে। কয়লা, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ ও প্লাটিনাম উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান এবং খনিজ তৈল-উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

দ্বিতীয়তঃ, এই দেশের সমগ্র **কৃষি-ব্যবস্থায়** যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে জমির উৎপাদনের হার বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনের উপযোগী জলবায়ু, মৃত্তিকা ও অন্যান্য সুবন্দোবস্ত বিদ্যমান থাকায় বর্তমানে এই দেশ গম, রাই, যব, বীট, অতসী ও শণ উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

তৃতীয়তঃ, এই দেশের উন্নতির মূলে রহিয়াছে দেশের **সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা**। পূর্বে যদিও এই দেশের উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল,

কিন্তু জারের আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার দরুন ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পূর্বে এই দেশে কোনরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। বিপ্লবের পর বিভিন্ন **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার** মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক পন্থায় এই দেশের উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, এই দেশের প্রাকৃতিক সীমারেখা ও **জলবায়ু** বহিঃশত্রুর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করে। দক্ষিণের বিশাল পর্বতমালা এবং উত্তরের শীতের প্রকোপে কোনও শত্রুই এই দেশকে আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিতে পারে নাই। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নেপোলিয়ান এবং হিটলারকেও রাশিয়ার কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই দেশের মধ্যভাগ ও দক্ষিণাংশ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এখানকার মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী।

পঞ্চমতঃ, দেশের সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ফলে **শিক্ষার** উন্নতিসাধন সম্ভব হওয়ায় বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষায় এই দেশ উন্নত হইয়াছে। ইহার ফলে নূতন নূতন যন্ত্রাদির আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

ষষ্ঠতঃ, **আয়তনে** এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। সুতরাং স্থানাভাবে এই দেশের উন্নতি কখনও ব্যাহত হয় না। মস্কো হইতে ভ্লাডিভস্টকপর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ইহারা সর্বতোভাবে ব্যবহার করিতে পারে।

সপ্তমতঃ, এই দেশের "সহ-অবস্থান ও শান্তি" নীতির ফলে পৃথিবীর অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক ও নিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার মিত্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে দেশের **বহির্বাণিজ্যের** উন্নতি সম্ভব হইতেছে।

অর্থনৈতিক উন্নতির ইতিহাস (History of Economic Development)—দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলেই সাধারণ লোক উপকৃত হইবে না—যদি সেই দেশের সরকার ঠিকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে না লাগায়। রাশিয়ার দৃষ্টান্ত হইতে এই কথাটি পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়। এই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদ পূর্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। কিন্তু ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এই দেশ জারের স্বৈরতন্ত্রের অধীনে ছিল বলিয়া প্রাকৃতিক সম্পদকে বিশেষভাবে কাজে লাগানো হয় নাই। ইহার ফলে সাধারণ লোককে অত্যন্ত দুঃখকষ্টে জীবন ধারণ করিতে হইত। উৎপন্ন দ্রব্যাদির অধিকাংশ ভোগ করিত রাজবংশ, জমিদার ও গীর্জার পাত্রীগণ। ইহারাই অধিকাংশ জমির মালিক ছিল। ইহা ছাড়া মুষ্টিমেয়

দেশী ও বিদেশী শিল্প-মালিক ও ব্যবসায়িগণ দেশের খনিজ সম্পদ, বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য শিল্পের মালিক ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতাও বহুলাংশে ইহারাই নিয়ন্ত্রণ করিত। এইভাবে ধনতান্ত্রিক রাশিয়ায় উৎপাদনের উপায় ছিল মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের হাতে।

ইহাদের দিন ফুরাইয়া গেল ১৯১৭ সালে। বিপ্লবের ফলে কম্‌রেড লেনিনের নেতৃত্বে গঠিত হইল সমাজতান্ত্রিক সরকার ; সঙ্গে সঙ্গে জমির মালিক হইল সরকার এবং কৃষকগণ, যাহারা জমিতে প্রকৃতপক্ষে চাষ করিবে। উৎপাদনের উপাদানসমূহ, ব্যাঙ্ক, কলকারখানা, রেলপথ প্রভৃতি রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আসিল ; জনগণ দেশের সকল সম্পত্তির অধিকারী হইল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ইহাই সূত্রপাত।

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় রাষ্ট্র উৎপাদনের উপাদানের মালিক। ব্যক্তিগত-ভাবে কোন লোক ইহার মালিক হইতে পারে না এবং অন্যের শ্রম শোষণ করিতে পারে না। বিভিন্ন শিল্পে ও খামারে মানুষ একসঙ্গে কাজ করিয়া ইহার উৎপাদন অনুসারে তাহার প্রাপ্য অংশ পাইয়া থাকে। উৎপাদন যতই বাড়িবে, সামাজিক সম্পদ যতই বাড়িবে, শ্রমিকের প্রাপ্য অংশ ততই বাড়িয়া যাইবে। রাশিয়াতে স্বকীয় সম্পত্তিরও স্থান আছে। যেমন, শ্রমের ফলে অর্জিত অর্থ, বাসভবন, নিজস্ব ও ঘরোয়া ব্যবহারের ও ভোগের দ্রব্যাদি; কিন্তু এই স্বকীয় সম্পত্তি শোষণের উপায় হিসাবে ব্যবহার করা যায় না।

রাশিয়ায় অর্থনৈতিক জীবন নিরূপিত ও পরিচালিত হয় জাতীয় **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning)** দ্বারা। দেশের সকল প্রকার সম্পদ, শ্রমের যোগান, চাহিদা প্রভৃতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। এই দেশের পরিকল্পনার একটি মূল লক্ষ্য ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণতা (Self-sufficiency); কারণ প্রতিবেশী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ রাজনৈতিক কারণে এই দেশকে কোনপ্রকার সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল না। **‘গোয়েলরো’ পরিকল্পনা** এই দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রথম বিজ্ঞানসম্মত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। ১৯২০ সালে ইহা গৃহীত হয়। ইহার ফলে বৈদ্যুতিক শক্তি ও শিল্পোৎপাদন প্রাক্‌-বিপ্লব-উৎপাদনের তুলনায় প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পায়।

ইহার পর আরম্ভ হয় ‘পিয়াতিলেৎকা’ (পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা)। **প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা** (১৯২৯-৩৩) আরম্ভ হয় ১৯২৯ সালের মে মাসে,

কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের নয় মাস পূর্বে ১৯৩২ সালে ইহার কার্য শেষ হয়। ইহার ফলে কৃষির উৎপাদনের সঙ্গে শিল্পের উৎপাদনের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই সময়ে গঠিত নূতন শিল্পগুলির মধ্যে দ্নেপ্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ম্যাগনিটোগর্স্ক ইস্পাত-কারখানা ও স্টালিনগ্রাড ট্র্যাক্টর-কারখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৩৩-৩৭) কার্যকরী করিবার সময় জাতীয় অর্থনীতি পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয় এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ-গঠন মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়। এই সময় শিল্পের উৎপাদন ১৯২৯ সালের তুলনায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে এই দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। এই সময় কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদের নিকটবর্তী স্থানে এবং ঘনবসতি অঞ্চলে অধিক সংখ্যায় শিল্প স্থাপিত হইল; যাহাতে শিল্পকে সুসংঘটিতভাবে চালানো যায়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৩৮-৪২) প্রস্তুতের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা (বিশেষতঃ, খাদ্যদ্রব্য, সার, শিল্প ও গৃহনির্মাণ দ্রব্যাদি সম্পর্কে) এবং দেশের পূর্বাঞ্চলে শিল্প-স্থাপন। এই সময় জার্মানী এই দেশ আক্রমণ করে; ফলে সমস্ত জাতীয় অর্থনীতিকে দেশরক্ষার চাহিদা মিটাইতে নিয়োগ করা হয়। সেইজন্য এই পরিকল্পনাটি সফল হয় নাই।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৪৬-৫০) যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক বিকাশের প্রথম পর্যায় হিসাবে গৃহীত হয়। শত্রুবিধ্বস্ত অঞ্চলের পুনর্গঠন এবং শিল্প ও কৃষির উৎপাদন যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থায় ফিরাইয়া আনা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন আরও বাড়ানোই ছিল এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। যুদ্ধে রাশিয়া কয়লা ও ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতার অর্ধেক এবং লৌহ আকরিক উৎপাদনের ক্ষমতার দুই-তৃতীয়াংশ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। যুদ্ধের ফলে আড়াই কোটি লোক গৃহহারা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই পরিকল্পনার ফলে এই দেশ যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিল এবং এমনকি কোন কোন শিল্পের উৎপাদন যুদ্ধ-পূর্ব উৎপাদনকে ছাড়াইয়া গেল।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৫) কার্যকরী করিবার ফলে জাতীয় অর্থনীতির সকল বিভাগের ও জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আরও উন্নতির ব্যবস্থা হয়। এই সময় শিল্পের উৎপাদন যুদ্ধ-পূর্ব উৎপাদনের ৩'২ গুণ বাড়িয়া যায়। এই পরিকল্পনায় কৃষিজ দ্রব্য ও পশুজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। এই সময় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ হেক্টর অনাবাদী ও পতিত জমিতে চাষ শুরু হয়।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬০) অনুসারে প্রায় ২০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচনের বন্দোবস্ত করা হয় এবং ৩০ লক্ষ হেক্টর পতিত জমিতে চাষ শুরু হয়। ইহা ছাড়া বন-সংরক্ষণ, যৌথ খামারের উন্নতি, গম, বীট, তুলা প্রভৃতি শস্যের আঞ্চলিক উৎপাদন ও বণ্টনের দিকেও নজর দেওয়া হয়।

এই পরিকল্পনা শেষ হইবার পূর্বেই নূতন ভিত্তিতে ১৯৫৯ সালে একটি **সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনা** (১৯৫৯-৬৫) গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হইল "কমিউনিজমের বৈষয়িক ও কারিগরী ভিত্তি রচনার উদ্দেশ্যে জাতীয় অর্থনীতির ত্বরান্বিত বিকাশ ও পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা"। এই পরিকল্পনায় ভারী শিল্প ও কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। এই সময়ে পুঁজি-লগ্নী বিগত সাত বৎসরের তুলনায় ১'৮ গুণ বেশী হইবে। এই পরিকল্পনার শেষে ১৯৬৫ সালে, মোট শিল্পোৎপাদন ১৯৫৮ সালের তুলনায় শতকরা ৮০ ভাগ বেশী হইবে। বিনামূল্যে বসত-বাড়ী ও খাদ্যশস্য বণ্টনের বন্দোবস্ত এই পরিকল্পনা অনুসারে শীঘ্রই কার্যকরী হইবে।

কৃষিজ সম্পদ (Agriculture)

বর্তমানে রাশিয়া পৃথিবীতে কৃষিজ দ্রব্য-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট গম উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ, যই উৎপাদনের ২৫ ভাগ, বীট উৎপাদনের ৩০ ভাগ, যব উৎপাদনের ১১ ভাগ, রাই উৎপাদনের ৪৪ ভাগ, তূলা উৎপাদনের ১৪ ভাগ, আলু উৎপাদনের ৩০ ভাগ রাশিয়ায় উৎপন্ন হয়। কৃষিকার্যের উন্নতিতে কৃষক ও সরকার বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। কৃষকের উন্নতির জন্য সমাজতান্ত্রিক পন্থা অনুসারে বিনামূল্যে কৃষি-জমি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। ইহার ফলে কৃষকগণ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইয়া থাকে। এই দেশে প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ হেক্টর অনাবাদী ও পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনা হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই দেশে ৯০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার ফলে মরুপ্রায় মধ্য এশিয়া অঞ্চলেও বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্য, বিশেষতঃ তূলা-উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে রাশিয়ায় জনপ্রতি কৃষি-জমির পরিমাণ প্রায় ১ হেক্টর। এই দেশের মোট ২২৮ কোটি ২৩ লক্ষ হেক্টর জমির মধ্যে ৮৩ কোটি ২০ লক্ষ হেক্টর

বনভূমি এবং ৬১ কোটি ১০ লক্ষ হেক্টর জমি চাষোপযোগী। ইহার মধ্যে বর্তমানে প্রায় ২১ কোটি হেক্টর জমিতে চাষ হইয়া থাকে।

রাশিয়ায় কৃষি-জমি বণ্টন (১৯৬৪)

(কোটি হেক্টর)

গম	৬'৪৬	আলু	'৯৫
রাই	১'৮০	শিল্প-শস্য	১'২৮
যই	১'৭৫	ভুট্টা	১'৪৫
যব	১'১০	তুলা	'২৫

রাশিয়ায় কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয় সাধারণতঃ দুইভাবে—রাষ্ট্রীয় খামার (Sovkhoze বা State Farm) ও যৌথ খামার (Kolkhoze বা Collective Farm) মারফত। **রাষ্ট্রীয় খামার** সরকারী জমিতে সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। অনাবাদী ও পতিত জমি উদ্ধার করিতে এই প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সহায়তা করে; কারণ সাধারণ কৃষক এই সকল জমিতে চাষ করিতে প্রথমেই সাহসী হয় না। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, উন্নত ধরনের বীজ, সার প্রভৃতির মারফত এই সকল খামারে বর্তমানে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। দেশের মোট কৃষি-জমির শতকরা ১৭ ভাগ রাষ্ট্রীয় খামারের হাতে; ইহার সংখ্যা প্রায় ৬০০০। রাষ্ট্রীয় খামারের মোট জমির পরিমাণ প্রায় ১৩ কোটি ৮৯ লক্ষ হেক্টর; তন্মধ্যে ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষ হয়। বহু রাষ্ট্রীয় খামারে পশুপালনের বন্দোবস্ত আছে।

যৌথ খামার কৃষকদের স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান। এই সকল খামারের জমি কৃষকগণ রাষ্ট্র হইতে বিনামূল্যে ও বিনা খাজনায় পাইয়া থাকে। এই সকল জমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক যৌথ খামারের কৃষক-সদস্যগণ। উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি (ট্র্যাক্টর, ফসল-কাটার যন্ত্র প্রভৃতি), সার, উৎকৃষ্ট বীজ প্রভৃতি রাষ্ট্র যৌথ খামারকে যোগান দেয়। বর্তমানে যৌথ খামারের সংখ্যা প্রায় ৭৮,০০০। যৌথ খামারের অন্তর্গত মোট জমির পরিমাণ ৮৩ কোটি ৮৪ লক্ষ হেক্টর; তন্মধ্যে ১৭ কোটি ৯০ লক্ষ হেক্টর কৃষি-জমি। যৌথ খামারের আর্থিক বুনিয়াদ অত্যন্ত শক্ত। উৎপাদিত শস্য রাষ্ট্রের নিকট ও বাজারে বিক্রয় হয়। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও শস্য সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হয়। অর্থ ও শস্যের কিয়দংশ বীমা তহবিল, সাংস্কৃতিক তহবিল, বাজভাণ্ডার ও সাধারণ

সংরক্ষিত তহবিলের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। যৌথ খামারের সদস্যগণকে বৎসরে প্রায় ১৫০ দিন কাজ করিতে হয়। বাকী সময় তাহারা সংসারের কাজে বা আমোদপ্রমোদে ও সাংস্কৃতিক মান-উন্নয়নে ব্যয় করে।

এই দুইপ্রকারের খামার-গঠনের ফলেই কৃষিকার্যে এই দেশে ব্যাপক হারে যন্ত্রপাতি-প্রয়োগ সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে একদিকে যেমন কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্যদিকে কৃষিকার্য হইতে শ্রমিক সরাইয়া শিল্পে নিয়োগ করা সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে শিল্পে শ্রমিকের অভাব মোচন হইয়াছে। কৃষিকার্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ফলে এই দেশের হেক্টর-প্রতি উৎপাদনও অনেক বেশী। যথা,

রাশিয়ার হেক্টর-প্রতি উৎপাদন (কিলোগ্রাম)

শীতকালীন গম	১২০০	যই	১৩৪০
বাসন্তিক গম	৮০০	ভুট্টা	১৪০০
যব	১০৩০	তূলা	৭০০
রাই	৯৭০	বীট	১৪০০০

কৃষিজ অঞ্চল (Agricultural Regions)—বর্তমানে রাশিয়া পৃথিবীতে কৃষিজ জমির উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই দেশের কৃষির উন্নতির প্রধান কারণ অনুকূল জলবায়ু ও মৃত্তিকা এবং সরকার ও কৃষকের ঐকান্তিক আগ্রহ।

রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে, গম, রাই, যই, আলু, তূলা, ভুট্টা, শণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জলবায়ু ও মৃত্তিকা অনুসারে এই দেশের কৃষি অঞ্চলসমূহকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায়:

(ক) তুন্দ্রা অঞ্চল—অত্যধিক শীতের প্রকোপে এই অঞ্চল বরফাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া কৃষিকার্য করা প্রায় অসম্ভব। এখানকার অম্লযুক্ত মৃত্তিকা চাষের অনুপযোগী। বিশেষ প্রথা দ্বারা আলু, বার্লি ও বিশেষ রকমের গম উৎপন্ন হয়। এখানকার কৃষিকার্যের সময় অত্যন্ত অল্প।

(খ) সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি অঞ্চল—তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া এই বনভূমিতে হালকা বৃষ্টি হওয়ায় এবং অম্লযুক্ত ধূসরবর্ণের মৃত্তিকা থাকায় ফসল-উৎপাদনের বিশেষ সহায়ক নহে। কোন কোন অংশে যব, আলু, অতসী, রাই ও বিশেষ রকমের গম উৎপন্ন হয়।

(গ) **মিশ্র বনাঞ্চল**—সরলবগায় বনভূমির দক্ষিণে অবস্থিত এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ৫০ সেঃ মিঃ-এর উর্ধ্বে। এখানকার বাদামী মৃত্তিকায় রাই, আলু, যব, বাট, অতসী ও শণ উৎপন্ন হয়। এখানকার বনভূমি পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন করা হইয়াছে।

(ঘ) **স্টেপ্‌স্ অঞ্চল**—রাশিয়ার মধ্যবর্তী অংশে ইউরোপীয় ও এশীয় অংশ লইয়া অবস্থিত বিস্তীর্ণ তৃণভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। পশ্চিমাংশে ধূসরবর্ণের উর্বর মৃত্তিকা রক্তাভ বাদামী মৃত্তিকা থাকায় কৃষিকার্যের উন্নতি হইয়াছে। এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অল্প হইলেও জলসেচের সাহায্যে বিস্তীর্ণ জমিতে গম, ভুট্টা, তামাক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ ভাগের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে প্রচুর তূলা উৎপন্ন হয়। ইহাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গম-উৎপাদক অঞ্চল।

(ঙ) **ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল**—এই অঞ্চলে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু ও ও পার্বত্য মৃত্তিকা বিদ্যমান থাকায় প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর উৎপন্ন হয়। এখানে গ্রীষ্মকাল শুষ্ক এবং শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। চা ও তুঁত গাছের চাষও এখানে পরিলক্ষিত হয়।

(চ) **উপক্রান্তীয় অঞ্চল**—এখানকার জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণ। এই অঞ্চলে লবণমিশ্রিত মৃত্তিকা দেখা যায়। ধান, চা, ইক্ষু ও ফল এখানকার প্রধান ফসল।

এইভাবে রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ু ও মৃত্তিকা অনুসারে বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন—এই দেশে প্রচুর পরিমাণে কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হইলেও স্থানীয় চাহিদা অত্যধিক হওয়ায় খুব বেশী পরিমাণ কৃষিজ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বর্তমানে উৎপাদনের পরিমাণ অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় কিছু খাদ্যশস্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হইতেছে।

রাশিয়ায় কৃষিজ দ্রব্য-উৎপাদন (১৯৬৩-৬৪)

(মেট্রিক টন)

গম	৭ কোটি ৭ লক্ষ	তূলা	৭৫ লক্ষ গাঁট
যব	১ কোটি ৯৬ লক্ষ	যই	৫৬ লক্ষ
রাই	১ কোটি ৬৯ লক্ষ	ভুট্টা	২ কোটি ৩৪ লক্ষ
বীট	৪ কোটি ৩০ লক্ষ	আলু	৮ কোটি ৫০ লক্ষ

গম-উৎপাদনে রাশিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এখানকার বাৎসরিক উৎপাদন ৭ কোটি ৭ লক্ষ মেঃ টন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের প্রায় দ্বিগুণ। বিপ্লবের পূর্বে এই দেশ পৃথিবীর শতকরা ১০ ভাগ গম উৎপন্ন করিত; কিন্তু বর্তমানে উৎপন্ন করে শতকরা ২৫ ভাগ। উত্তরাঞ্চলে বসন্তকালীন এবং দক্ষিণাঞ্চলে শীতকালীন গমের চাষ হয়। এই দেশের অধিকাংশ গম-উৎপাদক অঞ্চল কৃষ্ণচারণোজেম মৃত্তিকা-বলয়ে অবস্থিত। ইহার মধ্যে ইউক্রেন ও মালডেভিয়ান প্রজাতন্ত্রের শীতকালীন গমবলয়, উত্তর ককেশাস্ অঞ্চলের শীতকালীন ও বাসন্তিক গমবলয়, ভল্গা অঞ্চলের বাসন্তিক গমবলয় এবং ইউরাল, পশ্চিম সাইবেরিয়া ও উত্তর কাজাকস্তানের বাসন্তিক গমবলয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দেশের গমবলয়সমূহে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম (৩০ সেঃ মিঃ হইতে ৪০ সেঃ মিঃ)। এই দেশের গম-উৎপাদনে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়াও খারসন ও ওডেসা বন্দর মারফতে বিদেশে গম প্রেরিত হইতেছে। (প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত 'গম' দ্রষ্টব্য।)

রাই-উৎপাদনে এই দেশ প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর

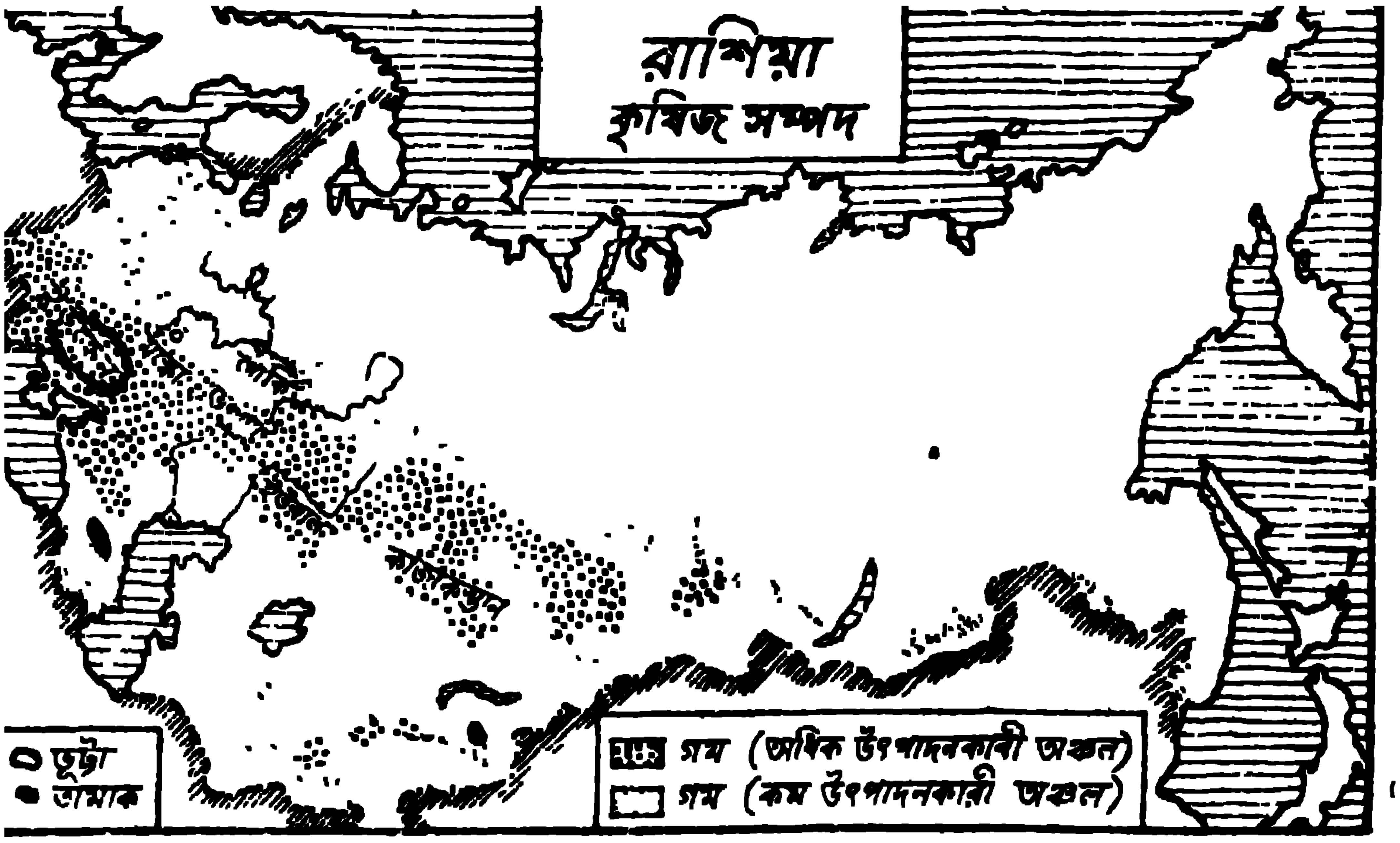

মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক রাই উৎপন্ন হয় রাশিয়াতে। মস্কো, ইউক্রেন, বাইলোরাশিয়া, ককেশীয় ও কাজাক অঞ্চলে অধিকাংশ রাই উৎপন্ন হয়। **যব**-উৎপাদনে রাশিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ইউক্রেন,

স্টেপ্‌স্‌ অঞ্চল ও সাইবেরিয়ায় প্রধানতঃ যবের চাষ হইয়া থাকে। **রাই**-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ইউরোপীয় রাশিয়ার উত্তরাংশে এবং আমুর উপত্যকায় ইহার চাষ হয়। **ভুট্টা**-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে; ইউক্রেন অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক ভুট্টা উৎপন্ন হয়। **বীট**-উৎপাদনে রাশিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ বীট এই দেশে উৎপন্ন হয়; কিয়েভ, কুরস্ক, বাইলোরাশিয়া, সাইবেরিয়া, দূরপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া ও কাজাকস্তানে অধিকাংশ বীট চাষ হইয়া থাকে।

শিল্প-শস্যের উৎপাদনেও রাশিয়া পিছনে পড়িয়া নাই। **তুলা**-উৎপাদন ও ইহার চাহিদা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। তুলা-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। দেশের শিল্পের চাহিদা মিটাইয়া এই দেশ বর্তমানে তুলা রপ্তানি করিতে সক্ষম। উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকস্তান প্রভৃতি অঞ্চলের উর্বর লোয়েস্‌ মৃত্তিকায় সর্বাপেক্ষা বেশী তুলার

চাষ হয়। এখানকার তুলা আমেরিকান্‌ আপল্যাণ্ড-জাতীয়। ইহা ছাড়া ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া অঞ্চলেও অল্পবিস্তর তুলা উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ **অতসী** এবং ৫২ ভাগ **শণ** উৎপাদন করে এই দেশ। বাইলোরাশিয়া, লেনিনগ্রাড, ইউক্রেন ও সাইবেরিয়ায় অধিকাংশ অতসী ও শণ উৎপন্ন হয়। রাশিয়ায় **আলুর** উৎপাদন বর্তমানে প্রায়

৮'৫ কোটি টন। এই দেশে বর্তমানে প্রায় ১৫ রকমের তৈলবীজের চাষ হয়। এখানে অল্প পরিমাণে চা, তামাক ও ধানের চাষও হয়।

রাশিয়ায় কৃষিজ সম্পদ-উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য

(লক্ষ মেঃ টন)

	১৯১৩ (প্রাক্-বিপ্লব)	১৯৬০	১৯৬৫ (লক্ষ্য)	১৯৮০ (লক্ষ্য)
খাদ্যশস্য	২৪	১৩৬০	১৭৬০	৩১০০
তুলা	৭'৪	১৫	৬১	১১০
বীট (চিনি)	১৩	৬৯'৫	৮৪০	১০৮০
আলু	৬১	৮৪০	১৪৭০	১৫৬০
তৈলবীজ		৪৩	৮০	১০০

পশুপালন (Animal Husbandry)—বর্তমানে রাশিয়া পশুপালনে খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছে; এই দেশ গবাদি পশুপালনে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান ও মেষপালনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারে পশুপালনের সুবন্দোবস্ত আছে। ভুট্টা ও অন্যান্য পশু-খাদ্য এই দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পশু-খাদ্য উৎপাদনের বন্দোবস্ত বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত হইয়াছে। বর্তমানে এই দেশের উৎপন্ন পশু-খাদ্যের পরিমাণ প্রায় ১৪'৮ কোটি মেঃ টন। গড়ে গরু-প্রতি বৎসরে ১৯১৩ কিলো-গ্রাম দুগ্ধ পাওয়া যায়; রাষ্ট্রীয় খামারে গরু-প্রতি বৎসরে পাওয়া যায় ২,৭০০ কিলোগ্রাম।

রাশিয়ার পশুপালনের প্রগতি (লক্ষ)

	১৯১৩ (প্রাক্-বিপ্লব)	১৯৫৩	১৯৬০
গবাদি পশু	৫৮৪	৫৫৮	৭৪০
গরু	২৮৮	২৫২	৩৩৯
শূকর	২৩০	৩৩৩	৫৩০
মেষ	৯০০	৯৯৮	১৩৬১

রাশিয়ার পশুজাত দ্রব্যের উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য

	১৯৬০	১৯৬৫ (লক্ষ্য)	১৯৮০ (লক্ষ্য)
মাংস	৮৭ লক্ষ মেঃ টন	১.৬ কোটি মেঃ টন	৬.২ কোটি মেঃ টন
দুগ্ধ	৬.২ কোটি "	১০.৫ "	১৮ " "
পশম	৩.৫ লক্ষ "	৫.৪ লক্ষ "	১১.৫৫ লক্ষ "
ডিম	২৫৫০ কোটি "	৬৮০০ কোটি "	১১৬০০ কোটি "

রাশিয়ার নদী, হ্রদ ও সমুদ্রে **মৎস্যের** প্রাচুর্য দেখা যায়। প্রায় ১০৫ প্রকারের মৎস্য এই দেশে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে স্যামন, স্টার্জন, কড, স্প্রাট প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাস্পিয়ান সাগব ও দূবপ্রাচ্যের সমুদ্রে সর্বাপেক্ষা বেশী মৎস্য পাওয়া যায়। মৎস্য-শিকাবে এই দেশ বর্তমানে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

খনিজ সম্পদ (Minerals)

শক্তিসম্পদ—গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ উৎপাদনে বাশিয়া বর্তমানে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। বিপ্লবেব পরে এই দেশে নিখুঁতভাবে খনিজেব সন্ধান চলে এবং ইহার ফলে বহু নূতন খনি আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে এই দেশ প্রায় সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

রাশিয়ার সঞ্চিত (Reserves) **কয়লার** পরিমাণ পৃথিবীতে সর্বাধিক—প্রায় ৮,০০,০০০ কোটি মেঃ টন, পৃথিবীর মোট সঞ্চিত কয়লার শতকরা ৫৭ ভাগ। এই সঞ্চিত কয়লা হইতে জারের আমলে উত্তোলিত হইত পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ২.৫ ভাগ মাত্র; কিন্তু বর্তমানে উত্তোলিত হয় শতকরা ২৬ ভাগ—৫৩ কোটি মেঃ টন। উৎপাদন-বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা ও খনিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার। বর্তমানে ওপেন-কাস্ট-মাইনিং, হাইড্রলিক মাইনিং ও ভূগর্ভে গ্যাসীকরণ পদ্ধতিতে এদেশে কয়লা উত্তোলিত হয়। এই দেশ বর্তমানে কয়লা-উৎপাদনে পৃথিবীতে **প্রথম** স্থান অধিকার করে। ডোনেৎস অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী (২৫%) কয়লা পাওয়া যায়। কুজনেৎস্ক অঞ্চল এই দেশের কয়লা-উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান (২২%) এবং কারাগাণ্ডা অঞ্চল তৃতীয় স্থান অধিকার করে। বর্তমানে

সঞ্চিত কয়লার পরিমাণে ডোনেৎস অঞ্চল প্রথম স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া ইনেসি, পেচোরা ও লেনা নদীর উপত্যকা, মস্কো, ইউরালস্, দূরপ্রাচ্য প্রভৃতি অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায়। মস্কো অঞ্চলের উৎপাদন প্রাক্-বিপ্লব উৎপাদনের ১২ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়লার উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে এই দেশের দ্রুত শিল্পোন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

রাশিয়ার কয়লা-উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য

(লক্ষ মেঃ টন)

১৯১৩ (প্রাক্-বিপ্লব)	২৯১	১৯৬৫	(লক্ষ্য)	৬,১২০
১৯৪০	১,৬৫৯	১৯৭০	(„)	৭,০০০
১৯৬৩	৫,১৭৪	১৯৮০	(„)	১২,০০০

খনিজ তৈল-উৎপাদনে রাশিয়া বর্তমানে তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেও শীঘ্রই এই দেশ দ্বিতীয় স্থানে উন্নীত হইবে। এই দেশের সঞ্চিত তৈলের পরিমাণ প্রায় ৬৩৮ কোটি মেঃ টন। নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে টার্বোড্রিল যন্ত্রে বর্তমানে এই দেশের তৈল উত্তোলিত হয়। ইহাতে ভূগর্ভের তৈলসম্পদের শতকরা ৭০ ভাগ তৈল নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়। তোড়-পদ্ধতিতেও (Gusher method) এখানে সুলভে তৈল নিষ্কাশিত হয়। রাশিয়ার অধিকাংশ তৈল পাওয়া যায় ট্রান্স-ককেশাস্ অঞ্চলে (৫০%)। কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত বাকু, ককেশাস্ পর্বতের উত্তরে অবস্থিত গ্রজনী ও মাইকপ এই অঞ্চলের প্রধান তৈলকেন্দ্র। ইহার মধ্যে বাকু সর্বাপেক্ষা বেশী তৈল উৎপন্ন করে। ইউরাল রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈল-উৎপাদক অঞ্চল (৪৪%)। এখানকার উৎপাদন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং শীঘ্রই এই অঞ্চল তৈল-উৎপাদনে ট্রান্স-ককেশাস্ অঞ্চলকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। উফা ইউরাল অঞ্চলের প্রধান তৈলকেন্দ্র ; এইজন্য ইহাকে 'দ্বিতীয় বাকু' (Second Baku) বলিয়া অভিহিত করা হয়। উজবেক, কাজাকস্তান (৪.৯%) এবং সাখালিন দ্বীপেও (১.১%) তৈল উৎপন্ন হয়। এই দেশে বর্তমানে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার তৈলবাহী পাইপ-লাইন আছে। ইহার মারফত দেশের বিভিন্ন স্থানে তৈল প্রেরিত হয়। পাইপ-লাইনের সাহায্যে বাকু হইতে কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত বাটুম বন্দরে এবং গ্রজনী ও মাইকপ হইতে কৃষ্ণসাগরতীরস্থ টুয়াপ্‌সে বন্দরে তৈল আনীত হয় এবং এই দুইটি

বন্দর মারফত বিদেশে তৈল রপ্তানি হয়। সম্প্রতি বাশকিরিয়ার তুইমাঝি

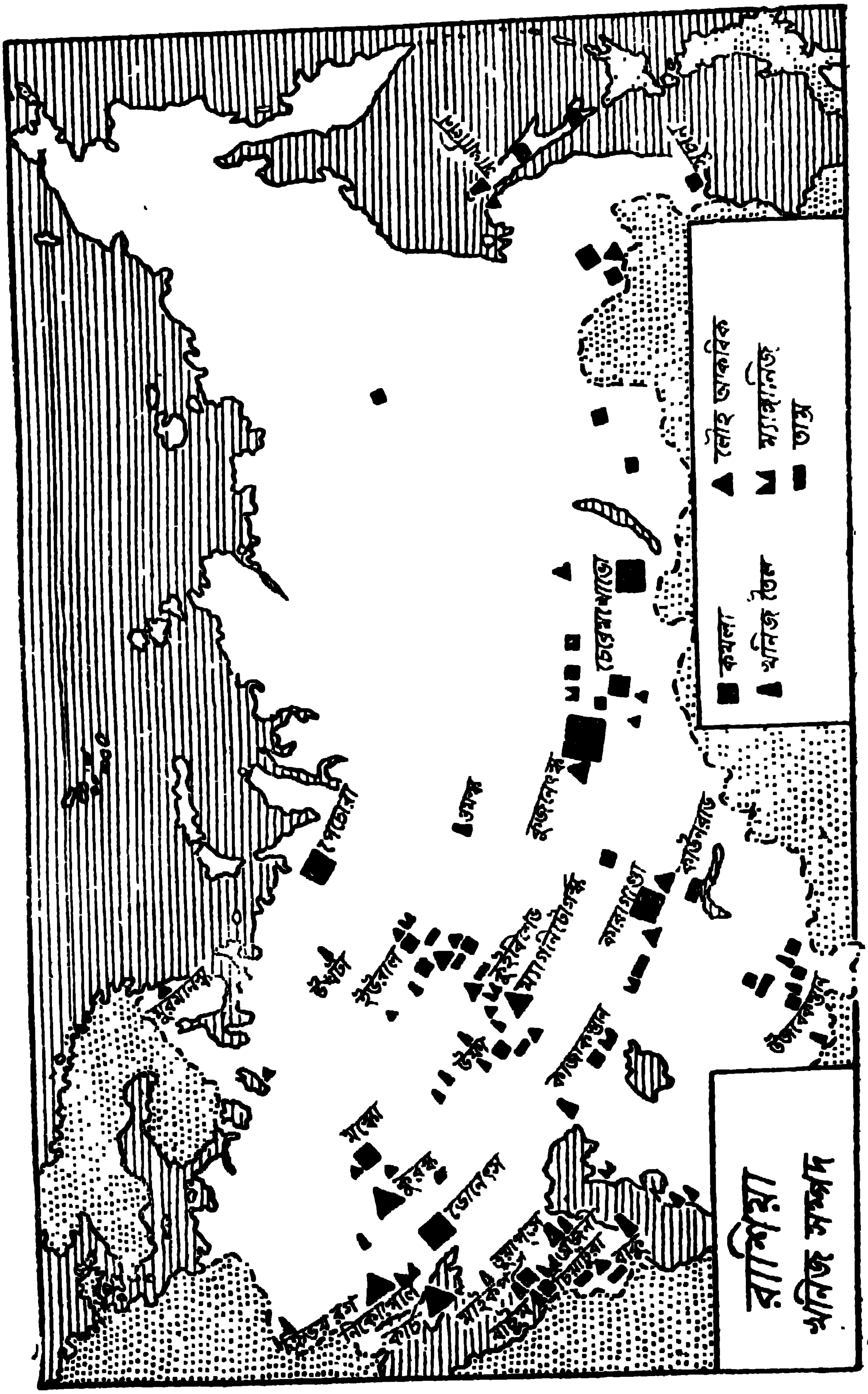

হইতে ওমস্ক পর্যন্ত রাশিয়ার বৃহত্তম পাইপ-লাইন তৈয়ার হইয়াছে।

রাশিয়ায় খনিজ তৈল-উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য

(লক্ষ মেঃ টন)

১৯১৩ (প্রাক্-বিপ্লব)	৯২	১৯৬৫	(লক্ষ্য)	২৪০০
১৯৪০	৩১১	১৯৭০	(„)	৩৯০০
১৯৬৩	২০৬০	১৯৮০	(„)	৭১০০

প্রাকৃতিক গ্যাস-উৎপাদনে রাশিয়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সাইবেরিয়ার তৈগা অঞ্চলে, মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে, ইউক্রেন ও উত্তর ককেশাসে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিরাট সম্ভার লুক্কাইত আছে। বিপ্লবের পরে এই গ্যাস ব্যবহারে লাগানো হইতেছে। বলখাস্‌ হ্রদের উত্তরে কাউনরাডে এবং আরল সাগরের দক্ষিণে ইতগা অঞ্চলে প্রচুর গ্যাস পাওয়া যায়। গ্যাস-উৎপাদনে কয়লার তুলনায় আটগুণ খরচ কম। সুতরাং এই গ্যাস উৎপাদনের জন্য এই দেশের ইন্ধনের খরচ অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং কয়লার ব্যবহার কিয়দংশে হ্রাস পাইয়াছে।

রাশিয়ায় গ্যাস-উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য

(কোটি ঘন মিটার)

১৯১৩ (প্রাক্-বিপ্লব)	১'৭	১৯৬৫	(লক্ষ্য)	১৫০০০
১৯৬৩	৮৯৮২	১৯৮০	(„)	৭২০০০

কয়লা, খনিজ তৈল ও গ্যাস ছাড়াও রাশিয়ায় **জলবিদ্যুৎ** একটি প্রধান শক্তিসম্পদ। বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই এই দেশের বৈদ্যুতিক শক্তির উন্নতির জন্য বিখ্যাত 'গোয়েলরো' পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বর্তমানে এই দেশ বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

রাশিয়ায় বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য

(কোটি কিলোওয়াট্-ঘণ্টা)

১৯১৩ (প্রাক্-বিপ্লব)	১৯০	১৯৬৩	৪১,১৬০
১৯৪০	৪,৮৩০	১৯৬৫ (লক্ষ্য)	৫২,০০০
১৯৫০	৯,১২০	১৯৮০ (লক্ষ্য)	৩,০০,০০০

এই দেশে পৃথিবীর কয়েকটি বিখ্যাত জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র অবস্থিত। দ্নেপ্র জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র ১৯৩০ সালে নির্মিত হয়। ইহা বহুদিন ইউরোপের সর্ববৃহৎ

জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র ছিল। ১৯৫৭ সালে ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট্ শক্তিসম্পন্ন লেনিন জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ইহা বর্তমানে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র। স্টালিনগ্রাড জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রের পূর্ণোৎপাদন-ক্ষমতা হইবে ২৩'১ লক্ষ কিলোওয়াট্; ইহার কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ব্রাৎস্ক জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রের কাজ সম্পূর্ণ হইলে ইহার পূর্ণোৎপাদন-ক্ষমতা হইবে ৪৫ লক্ষ কিলোওয়াট্। ইহাই পরে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হইবে। রাশিয়ায় মোট বৈদ্যুতিক শক্তির শতকরা ৭০ ভাগের বেশী শিল্পে নিয়োজিত হয়।

এই সকল শক্তিসম্পদ ছাড়াও রাশিয়া **পারমাণবিক শক্তির (Nuclear power)** শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৫৭ সাল হইতে বিভিন্ন কেন্দ্রে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রের নির্মাণ-কার্য

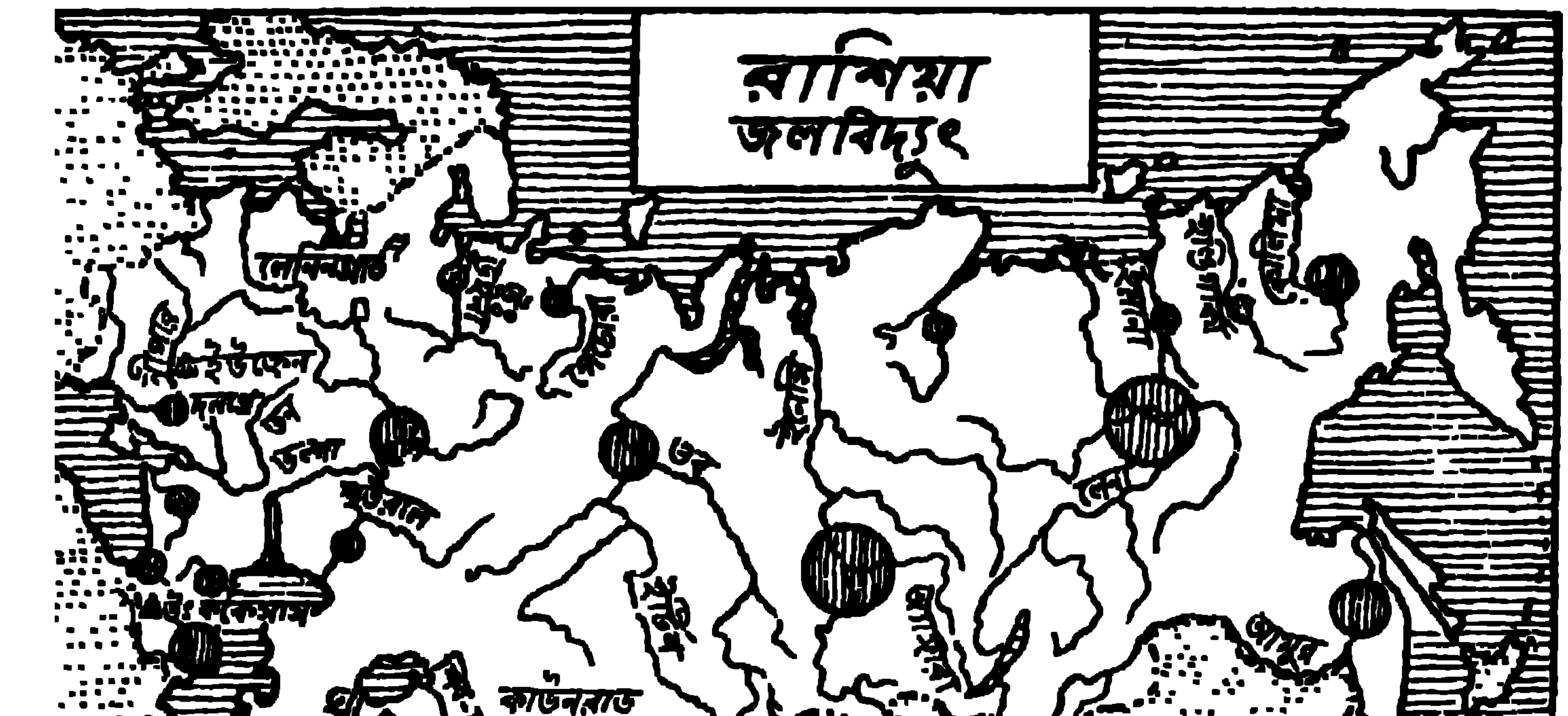

চলিতেছে। বিভিন্ন শিল্পে ইহা ব্যবহৃত হইবে। জাহাজেও ইহার ব্যবহার চলিতেছে। ১৬,০০০ টনের বরফ-ভাঙা জাহাজ, 'লেনিন' পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে চলে। পুনরায় জ্বালানি না দিয়া এই জাহাজ একবারে অন্ততঃ এক বৎসর চলিতে পারে। এই শক্তি-উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন ইউরেনিয়াম; ইহা পাওয়া যায় তাশখন্দের টাবোসারে, আদিরহানে, বৈকাল হ্রদ অঞ্চলে এবং দক্ষিণ আর্মেনিয়ায়। আলতাই পর্বতের নিকট ভস্টকামেনোগর্স্ক আণবিক শক্তি-উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। বর্তমানে এই দেশের আণবিক শক্তির উৎপাদন-ক্ষমতা প্রায় ২৫ লক্ষ কিলোওয়াট্।

ধাতু—বর্তমান জগতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল **লৌহ আকরিক**। পৃথিবীর মোট সঞ্চিত লৌহ-ভাণ্ডারের শতকরা ৪১ ভাগ এই দেশে বিদ্যমান। বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়া পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৬ ভাগ লৌহ আকরিক উৎপন্ন করিত; বর্তমানে এই দেশ শতকরা ২৬ ভাগ লৌহ আকরিক উৎপন্ন করিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৬৩ সালে এই দেশে ১৩°৭ কোটি মেঃ টন লৌহ আকরিক উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ইউক্রেনের ক্রিভগ রগ অঞ্চলেই অধিকাংশ লৌহ আকরিক পাওয়া যাইত; কিন্তু বর্তমানে অন্যান্য অঞ্চলেও বহু লৌহখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইউরাল অঞ্চলে ম্যাগনেট পর্বতের নিকট ম্যাগনিটোগর্স্ক রাশিয়ায় দ্বিতীয় বৃহত্তম লৌহখনি অঞ্চল। ইহা ছাড়া কুর্স্ক, কারাগাণ্ডা, কুজনেৎস্ক, মুরমানস্ক প্রভৃতি অঞ্চলেও লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। কাজাকস্তান, পূর্ব-সাইবেরিয়া, কারেলা ও দূরপ্রাচ্যে নূতন নূতন লৌহখনি আবিষ্কৃত হইতেছে। কাজাকস্তানের কুস্তনাই অঞ্চলে প্রতিবৎসর প্রায় এক কোটি টন লৌহ আকরিক উত্তোলিত হইবে।

ম্যাঙ্গানিজ-উৎপাদনে রাশিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। জর্জিয়ার চিয়াটুরা অঞ্চলে এবং দক্ষিণ ইউক্রেনের নিকোপোল অঞ্চলে অধিকাংশ ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। কুইবিশেভ, বাশকিরিয়া, কাজাকস্তান ও সাইবেরিয়ার মুজুল নদীর উপত্যকা অঞ্চলেও ইহা পাওয়া যায়। কাজাকস্তান এবং বৈকাল হ্রদের তীরে কাউনরাডে **তাম্র** পাওয়া যায়; এই দেশের বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় ১°৮ লক্ষ মেঃ টন। বৈকাল হ্রদের তীরে দক্ষিণ-পূর্ব তাশখন্দে এবং দক্ষিণ আর্মেনিয়া ও আদিরহানে **ইউরেনিয়াম** পাওয়া যায়। **প্লাটিনাম**-উৎপাদনে এই দেশ প্রথম স্থান অধিকার করে। ইউরাল পর্বতের অন্তর্গত নাজনী তাগিদে অধিকাংশ প্লাটিনাম পাওয়া যায়। ইউরাল পর্বতে, লেনা ও ইনেসি নদীর উপত্যকায় এবং বৈকাল হ্রদ অঞ্চলে **স্বর্ণ** পাওয়া যায়; এই দেশের বাৎসরিক স্বর্ণের উৎপাদন প্রায় ১°২ কোটি আউন্স। ইউরাল, কুইবিশেভ, বাশকিরিয়া ও কাসাকস্থিতে **ক্রোমিয়াম** পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া এই দেশে বক্সাইট, নিকেল, টিন, দস্তা ও সীসা পাওয়া যায়।

শ্রমশিল্প (Industries)

বর্তমানে রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প-প্রধান দেশ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই রাশিয়ার স্থান। ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে এই দেশ শিল্পে সর্বাপেক্ষা উন্নত। অপর্যাপ্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও জারের রাজত্বে এই দেশ শিল্পে অত্যন্ত অনুন্নত ছিল। বিপ্লবের পরে সমাজতান্ত্রিক কর্মপন্থা অনুসরণের জন্য এই দেশ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়াছে। ১৯২৯ সালের উৎপাদনের তুলনায় এই দেশে ১৯৫৫ সালে শিল্পের উৎপাদন প্রায় বিশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে এই দেশের উৎপাদন-পদ্ধতি অত্যন্ত উন্নত ধরনের; সকল কারখানা আধুনিক যন্ত্রে সজ্জিত। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ করা হইয়াছে। পরিকল্পনার মারফত প্রথমেই বিভিন্ন ভারী শিল্পের উন্নতি সাধন করা হইয়াছে; কারণ ভারী শিল্পের উপর দেশের সর্বাঙ্গীণ শিল্পোন্নতি নির্ভরশীল। এইজন্য রাশিয়ায় ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি শিল্প অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে লঘু ও ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পেরও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই দেশের শ্রমশিল্পের মধ্যে বর্তমানে লৌহ ও ইস্পাত, কৃষি-যন্ত্রপাতি, রসায়ন, চিনি, কার্পাস-বস্ত্র, মোটর-গাড়ী প্রভৃতি শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাশিয়া বর্তমানে পৃথিবীতে চিনিশিল্পে প্রথম, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে দ্বিতীয় এবং কার্পাস-বয়নশিল্পে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ঃ

রাশিয়ার বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন (১৯৬৩)

ইস্পাত	৮০২ লক্ষ মেঃ টন	রেশম-বস্ত্র	৬৬ কোটি	৩০ লক্ষ বঃ মিটার
ঢালাই-লৌহ	৫৮৭ "	পশম-বস্ত্র	৪৭ "	১৬ " "
চিনি	৬৫.২০ "			
কার্পাস-বস্ত্র	৭.৪৮ "	জুতা	৪১	৯০ লক্ষ জোড়া
কাগজ	৫.৪ "	সিমেণ্ট		৫৫ লক্ষ মেঃ টন

কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদের নৈকট্য এবং আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অনুসারে এই দেশের শিল্প বিভিন্ন অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। রাশিয়ার শিল্পাঞ্চল সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের "শ্রমশিল্প" অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

শক্তিসম্পদ ও কাঁচামাল এবং রাশিয়ার শিল্প-পরিকল্পনা (Fuel, Power network & Raw Materials and the Soviet

planning for Industries)—রাশিয়ার শিল্পোন্নতিতে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে—শক্তিসম্পদ, কাঁচামাল ও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা। রাশিয়ায় অপর্যাপ্ত শক্তিসম্পদ (কয়লা, খনিজ তৈল, গ্যাস, জলবিদ্যুৎ প্রভৃতি) ও কাঁচামাল (লৌহ আকরিক, কাষ্ঠ, তুলা, ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র, বীট প্রভৃতি) বিদ্যমান। এই সকল সম্পদ-উৎপাদনের ক্ষমতা এই দেশে বহুদিন পূর্ব হইতে থাকিলেও ইহাদের উৎপাদন সুপরিকল্পিতভাবে শুরু হয় রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে এবং সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার ফলে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

এই সকল সম্পদের মধ্যে সঞ্চিত কয়লার শতকরা ৯০ ভাগ এবং তুলা, জলবিদ্যুৎ ও কাষ্ঠের অধিকাংশ পাওয়া যায় এই দেশের এশিয়া অংশে। কিন্তু শিল্প-গঠনের প্রাথমিক স্তর হইতেই এই দেশে শিল্প গঠিত হয় প্রায়-সম্পদহীন ইউরোপীয় রাশিয়ার মস্কো, গোর্কী, আইভানভ, ও লেনিনগ্রাড অঞ্চলে। এখানে কোক-কয়লা, লৌহ আকরিক, তুলা, রাসায়নিক পদার্থ না পাওয়া গেলেও এই অঞ্চলই রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। রাশিয়ার প্রায় অর্ধেক শিল্প-কারখানা এই অঞ্চলে অবস্থিত, যদিও প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদ প্রায় ২০০০ কিলোমিটার দূর হইতে আনিতে হয়। রাশিয়ার **প্রথম** ও **দ্বিতীয় সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায়**ও এই সকল অঞ্চলে শিল্পগঠনের নীতি অব্যাহত থাকে। কারণ, তখন সর্বাপেক্ষা জোর দেওয়া হইয়াছিল প্রতিষ্ঠিত বৃহদাকার শিল্পের উন্নতিসাধনে, যাহাতে অভিজ্ঞতা ও শিল্পের বৃহদাকৃতির ফলে উৎপাদন-খরচ কম হয়। এইজন্য বহুদূর হইতেও কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদ এই সকল শিল্পাঞ্চলে আনা হইত। অবশ্য ইউরোপীয় রাশিয়ায় ইউক্রেন অঞ্চলে শক্তিসম্পদ ও কাঁচামাল উভয়ই পাওয়া যায় বলিয়া এখানে শিল্প গড়িয়া ওঠে প্রধানতঃ স্থানীয় সম্পদের সাহায্যে।

মস্কো, লেনিনগ্রাড, গোর্কী, আইভানভ প্রভৃতি অঞ্চলে শিল্প গড়িবার জন্য শক্তিসম্পদ ও কাঁচামাল আনয়নের জন্য প্রচুর মাসুল দিতে হয়। ইহার ফলে পরিবহণ-ব্যবস্থার উপরও বেশী চাপ পড়ে। এইজন্য **তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়** এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, শক্তিসম্পদ ও কাঁচামালের নিকটেই অধিকাংশ শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে। নিম্নলিখিত কারণে শিল্পনীতিতে এই **আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি (Regional**

Decentralisation) সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে: (ক) শক্তিসম্পদ ও কাঁচামালের পূর্ণ ব্যবহার; (খ) কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদের নিকট শিল্প স্থাপন করিয়া পরিবহণ-খরচ হ্রাস করা; (গ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতির জন্য বিভিন্ন অংশে শিল্প-স্থাপন এবং (ঘ) দেশরক্ষার সুবিধার জন্য বিভিন্ন শিল্পকে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া দেওয়া ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিকল্পনায় এই শিল্পনীতি গৃহীত হইবার পর কোথাও শক্তি-সম্পদের নিকটে, কোথাও কাঁচামালের নিকটে, কোথাও পরিবহণ-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে বিভিন্ন শিল্প-স্থাপিত হইতে থাকে। বিশেষতঃ, **অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে শিল্পস্থাপন**-এর ঝোঁক **তৃতীয় এবং পরবর্তী পরিকল্পনায়** লক্ষ্য করা যায়। সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া, ককেশাস্ ও দূরপ্রাচ্যে বহু শিল্প স্থাপিত হয়। কুজনেৎস্ক, ইরকুটস্ক, কমসোমোলস্ক অঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কারাগাণ্ডা, কুজনেৎস্ক ও ইরকুটস্ক অঞ্চলের বীট-চীনিশিল্প, ককেশাস্ অঞ্চলের কার্পাস-বয়নশিল্প রাশিয়ার বর্তমান বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনার নিদর্শন। অবশ্য একথা মনে রাখিতে হইবে যে শিল্পের এই বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন শিল্পকেন্দ্রগুলিতেও (মস্কো, গোর্কী, লেনিনগ্রাড ইত্যাদি) শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। রাশিয়ার শিল্পের ইতিহাসে এই সকল পুরাতন শিল্পকেন্দ্রগুলি এখনও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে এবং ভবিষ্যতেও করিবে এবং পুরাতন শিল্পের ক্ষেত্রে দূরবর্তী স্থান হইতে শক্তিসম্পদ ও কাঁচামাল আনয়ন এই দেশের শিল্পনীতিতে চিরকালই বজায় থাকিবে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

দেশের শিল্পোন্নতির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ইস্পাত। সেইজন্য রাশিয়া সর্বপ্রথম এই শিল্পের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়। এই ইস্পাত হইতে অন্যান্য শিল্পেরও ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়। যথা, কৃষি-যন্ত্রপাতি (ট্র্যাক্টর, হারভেস্টার ইত্যাদি), শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, জাহাজ, রেল-ইঞ্জিন, বিমান, তৈলের পাইপ-লাইন ইত্যাদি।

ইস্পাত-উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (লক্ষ মেঃ টন)

১৯১৩ (প্রাক্-বিপ্লব)	৪২	১৯৬৩	৮০২
১৯৪০	১৮৩	১৯৬৫ (লক্ষ্য)	৯১০

১৯৮০ (লক্ষ্য) ২৫০০

বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন নগণ্য ছিল। বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই দেশ অতি অল্পসময়ে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমানে এই দেশ কয়লা, লৌহ আকরিক ও ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। সুতরাং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে এই দেশ স্বভাবতঃই উন্নতি লাভ করিবে। বর্তমানে রাশিয়া স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া বিদেশে ইস্পাত সামগ্রী রপ্তানি করিতেছে। সকল শিল্পাঞ্চলেই ইস্পাতশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত অঞ্চলেই অধিকাংশ লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হয়:

(ক) **ইউক্রেন অঞ্চল**—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এই অঞ্চলে রাশিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ কাঁচা লৌহ ও অর্ধেক ইস্পাত উৎপন্ন হইত। এখনও এই অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা বেশী লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন কারণে ইউক্রেন অঞ্চলে এই শিল্প সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। যেমন, (১) নিকটস্থ ডোনেৎস অঞ্চল হইতে উৎকৃষ্ট কোক-কয়লা পাওয়া যায়; (২) প্রায় ৩০০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত ক্রিভয় রগ হইতে উৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক এখানে আনা হয়। ইহা ছাড়া অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক পাওয়া যায় প্রায় সমদূরবর্তী কার্চ (ক্রিমিয়া) হইতে; (৩) এই অঞ্চলেই অবস্থিত নিকোপোল হইতে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়; (৪) নীপার, ডোনেৎস ও ডন নদ এবং আজভ সাগরের জলপথ এবং বিস্তীর্ণ রেলপথ এখানকার কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ ও শিল্পজাত দ্রব্য পরিবহণে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে; (৫) স্থানীয় পূর্ত-শিল্প ও ঘন লোকবসতি এই শিল্পের উৎকৃষ্ট বাজার এখানে সৃষ্টি করিয়াছে।

ইউক্রেন অঞ্চলের ইস্পাতশিল্পের মধ্যে কয়েকটি কয়লাখনির সন্নিকটে, কয়েকটি লৌহখনির সন্নিকটে এবং কয়েকটি মধ্যবর্তী অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছে। স্টালিনো, মাকিভকা, ভরোশিলভস্ক, ভরোশিলভগ্রাড প্রভৃতি স্থান ডোনেৎস অববাহিকার কয়লাখনির নিকটে অবস্থিত বলিয়া ক্রিভয় রগ হইতে লৌহ আকরিক আনিয়া বৃহদাকার ইস্পাতশিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। এই স্থানসমূহ নিয়া গঠিত অঞ্চলকে 'রাশিয়ার রুঢ়' বলা হয়। ক্রিভয় রগ ও কার্চের লৌহ-খনির সন্নিকটেও স্থানীয় লৌহ আকরিক ও ডোনেৎস অঞ্চলের কয়লার সাহায্যে ইস্পাতশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া কয়লাখনি ও লৌহখনির

মধ্যস্থলে অবস্থিত কয়েকটি অঞ্চলে ইস্পাতশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন, ক্রিভয় রগ ও ডোনেৎস অঞ্চলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে নীপারপেট্রোভস্ক,

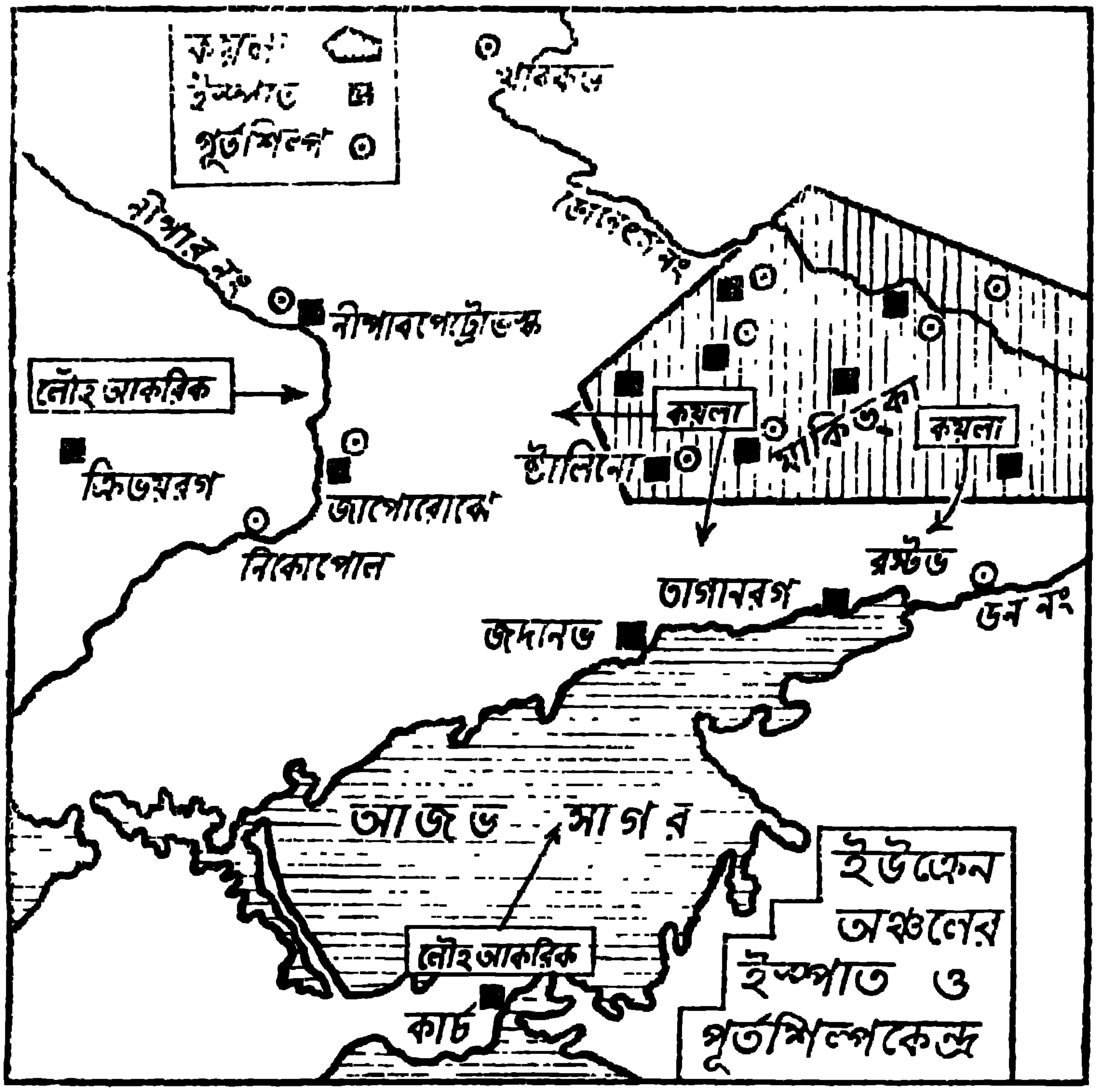

জাপোরোঝে নামক স্থানে এবং কার্চ ও ডোনেৎস অঞ্চলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে জ্‌দানভ ও তাগানরগ নামক স্থানে ইস্পাতশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইউক্রেন অঞ্চলের ইস্পাতশিল্পের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিট্‌স্‌বার্গ ও হ্রদ অঞ্চলের ইস্পাতশিল্পের তুলনা করিলে অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ডোনেৎস অঞ্চলের কয়লাখনির সঙ্গে পিট্‌স্‌বার্গ অঞ্চলের কয়লাখনির তুলনা করা যায়। কার্চ ও ক্রিভয় রগের লৌহখনির নিকটস্থ ইস্পাতকেন্দ্রগুলির সঙ্গে হ্রদ অঞ্চলের লৌহখনির নিকটস্থ ডুলুথ শহরের ইস্পাতশিল্পের তুলনা করা যায়। কয়লাখনি ও লৌহখনির মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত জ্‌দানভ, নীপারপেট্রোভস্ক ও তাগানরগের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো, গ্যারী, ডেট্রয়েট প্রভৃতি শহরের ইস্পাতশিল্পকেন্দ্রের তুলনা করা যায়। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিট্‌স্‌বার্গ ও হ্রদ অঞ্চলের ইস্পাত-

শিল্পকেন্দ্রগুলির সঙ্গে রাশিয়ার ইউক্রেন অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রগুলির অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু একটি পার্থক্যও ইহাদের মধ্যে দেখা যায়। ইউক্রেন অঞ্চল কয়লাখনি ও লৌহখনির যে দূরত্ব দেখা যায়, তদপেক্ষা পিট্স্‌বার্গ ও হ্রদ অঞ্চলের কয়লাখনি ও লৌহখনির দূরত্ব অনেক বেশী। অবশ্য পঞ্চহ্রদের সুলভ জলপথ এই দূরত্বকে বহুলাংশে লাঘব করিয়া দিয়াছে।

(খ) **ইউরাল ও কুজনেৎস্ক অঞ্চল**—ইউরাল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্টশ্রেণীর লৌহ আকরিক ও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। কিন্তু এই অঞ্চলে কোক-কয়লার একান্ত অভাব। এই অঞ্চল হইতে প্রায় ১৯০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কুজনেৎস্ক অঞ্চলে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে লৌহ আকরিক পাওয়া যায় না। সেইজন্য এই দুইটি অঞ্চলেই ইস্পাতশিল্পের উন্নতি করার উদ্দেশ্যে পরিবহণের এক 'দোলক'-নীতি অবলম্বন করা হয়। অর্থাৎ কুজনেৎস্ক হইতে কয়লা যে রেলগাড়ীতে আনা হইত, সেই রেলগাড়ীতেই লৌহ আকরিক ইউরাল অঞ্চল হইতে কুজনেৎস্ক অঞ্চলে প্রেরিত হইত। ইহার ফলে উভয় অঞ্চলেই সুন্দরভাবে ইস্পাতশিল্পের শ্রীবৃদ্ধিসাধন হয়। ইউরাল অঞ্চলের ম্যাগনিটোগর্স্ক রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ ও পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাতশিল্পকেন্দ্র। ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত এই শহরের নিকটস্থ ম্যাগনেট পর্বতে প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। নিকটস্থ ইউরাল নদী হইতে জল পাওয়া যায়। এই শহরে ৬টি বড় বাতচুল্লী ও ২৪টি প্রকাশ্য চুল্লী বিদ্যমান। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমেই এই শিল্প-নগর গড়িয়া ওঠে। এই শহরের নিকটেই নিজনী তাগিল, চেলিয়াবিন্স্ক প্রভৃতি শহরেও ইস্পাতশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কুজনেৎস্ক অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বড় ইস্পাতশিল্পকেন্দ্রের নাম স্টালিনস্ক। টম ও কণ্ডোমা নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকায় অবস্থিত এই শহরে জলের কোনও অভাব হয় না। স্থানীয় কয়লাখনি হইতে উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায়। নিকটস্থ নোভোসিবিরস্ক শহরে এখানকার লৌহ ও ইস্পাতের সাহায্যে যন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

বর্তমানে ইউরাল অঞ্চল হইতে ৯৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কারাগাণ্ডা অঞ্চলে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায় বলিয়া কুজনেৎস্ক হইতে ইউরাল অঞ্চলে কয়লা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কমিয়া গিয়াছে। অন্যদিকে কুজনেৎস্ক অঞ্চলের গরনায়া শোরিয়া নামক স্থানে নূতন লৌহখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় ইউরাল হইতে লৌহ আনয়নের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া গিয়াছে।

(গ) **মস্কো ও লেনিনগ্রাড অঞ্চল**—ইউক্রেন ও ইউরাল অঞ্চলের লৌহ আকরিক ও ইউক্রেন অঞ্চলের কোক-কয়লার সাহায্যে মস্কো ও নিকটবর্তী অঞ্চলে ইস্পাতশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়লা ও লৌহ আকরিক

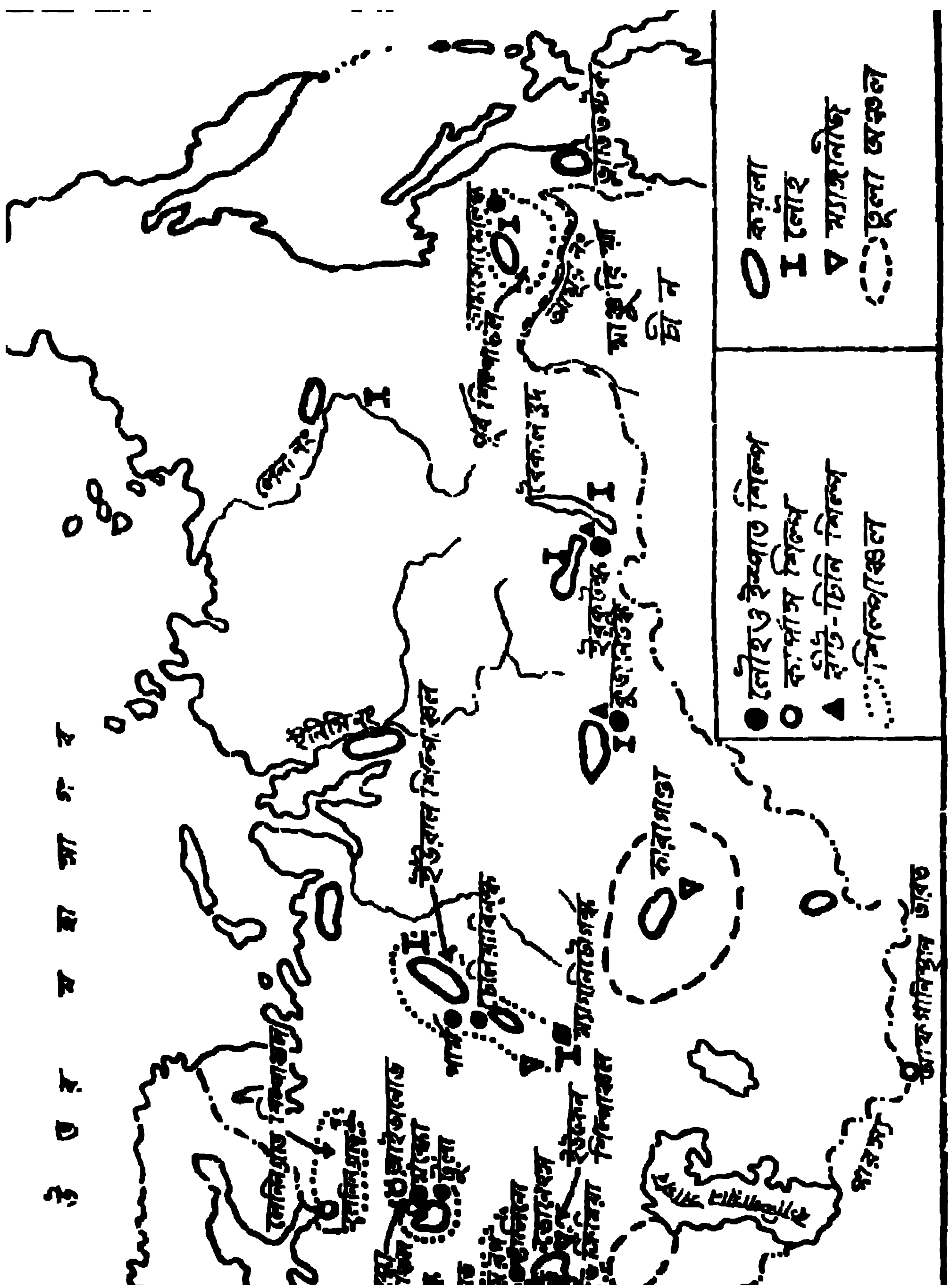

রাশিয়া—শিল্পের অবস্থান

দূর হইতে আনিতে হইলেও স্থানীয় বাজারের প্রচুর চাহিদা, ইউরোপের শিল্পাঞ্চলসমূহের নৈকট্য এবং স্থানীয় বাজার হইতে ফেরৎ প্রচুর টুকরা

লৌহ এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। ডন ও ভল্গা নদীর সুলভ জলপথের সাহায্যে কয়লা ও লৌহ আকরিক আনিবার সুবন্দোবস্ত আছে। এই অঞ্চলে অবস্থিত মস্কো-টুলা, গোর্কী, আইভানভ, লেনিনগ্রাডপ্রভৃতি শহর ইস্পাতশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

রাশিয়ার উপরে বর্ণিত তিনটি শিল্পাঞ্চল হইতে এই দেশের মোট ইস্পাত-উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, **অন্যান্য অঞ্চলেও** স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কিছু পরিমাণে ইস্পাত উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে নিম্ন আমুর-উপত্যকায় কোমসোমোলস্ক, উজবেকিস্তানের তাশখন্দ ও বেগোভাট, কাজাকস্তানের তামির-তান এবং জর্জিয়ার তিবিলিসি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাশিয়ার ভবিষ্যৎ শিল্প-**পরিকল্পনায়** লেনিনগ্রাড ও উত্তর-পশ্চিমাংশের ইস্পাতশিল্পের আরও উন্নতির আশা আছে; পেচোরা উপত্যকা হইতে কয়লা এবং কোলা উপদ্বীপ হইতে লৌহ আকরিক আনিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া এই স্থানে ইস্পাতশিল্পের আরও উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে ভলোগ্‌ডার নিকটবর্তী চেরেপোভেট নামক স্থানে একটি ইস্পাত-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় পেচোরা কয়লাখনির সহিত উত্তর ইউরাল অঞ্চলের ইস্পাতশিল্পকেন্দ্রসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় চেরেমখোভো অঞ্চলের কয়লা ও আঙ্গুরা-ইলিম অঞ্চলের লৌহ আকরিকের উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব সাইবেরিয়া অঞ্চলে একটি ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

কার্পাস-বয়নশিল্প

তুলা-উৎপাদনে ও কার্পাস-বয়নশিল্পে রাশিয়া পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। বিপ্লবের পরে এই শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। স্থানীয় তুলা, কয়লা ও জলবিদ্যুতের সরবরাহ এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে।

কার্পাস-বস্ত্র-উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (কোটি মিটার)

১৯১৩ (প্রাক্-বিপ্লব)	২৫৮	১৯৫৮	৫৮০
১৯৪০	৩৯৬	১৯৬৫ (লক্ষ্য)	৮০০

কাজকাস্তান, ট্রান্স-ককেশাস্ ও মধ্য এশিয়ায় সর্বাপেক্ষা বেশী তুলা উৎপন্ন হইলেও এই সকল স্থান হইতে তুলা আনিয়া মস্কো অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ কার্পাস-বয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানকার সুলভ ও নিপুণ শ্রমিক, জলবিদ্যুৎ, উৎকৃষ্ট পরিবহণ-ব্যবস্থা এবং সরকারী উদ্যোগ এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। এখানকার মস্কো, আইভানভ ও লেনিনগ্রাড কার্পাস-বয়নশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। পূর্বে মস্কো অঞ্চলে এই দেশের শতকরা ৯০ ভাগ কার্পাস-বস্ত্র উৎপন্ন হইত। কিন্তু বিপ্লবের পর বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ফলে মধ্য ও উত্তর ককেশীয় তুলা অঞ্চলেও কার্পাস-বয়নশিল্প সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

পশম-বয়নশিল্প—মেষপালনে রাশিয়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই দেশে যন্ত্রপাতি ও নিপুণ শ্রমিকের কোন অভাব নাই। কয়লা, জলবিদ্যুৎ ও খনিজ তৈল এখানে অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। শীতপ্রধান দেশ বলিয়া পশমী দ্রব্যের স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত বেশী। সুতরাং পশম-বয়নশিল্পে এই দেশ উন্নতি লাভ করিবে ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে; তন্মধ্যে মস্কো, লেনিনগ্রাড, কাজাকস্তান, ইউক্রেন, ককেশাস্ প্রভৃতি স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পশম-বস্ত্র-উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (কোটি মিটার)

১৯১৩ (প্রাক্-বিপ্লব)	১০	১৯৬৩	৪৭
১৯৬৫ (লক্ষ্য)	১৫০		

কাগজশিল্প—পৃথিবীর মোট বনভূমির এক-তৃতীয়াংশ রাশিয়ায় অবস্থিত। ইহার অধিকাংশই সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি। এই বনভূমির কাঠ দ্বারা কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত করিয়া এই দেশের কাগজশিল্পের উন্নতি হইয়াছে। সুলভ জলবিদ্যুৎ ও রাসায়নিক দ্রব্যের সরবরাহ, সুনিপুণ ও কর্মঠ শ্রমিক এবং সরকারী প্রচেষ্টা এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। বর্তমানে কাগজ-উৎপাদনে রাশিয়া ইউরোপে প্রথম স্থান অধিকার করে। লেনিনগ্রাড অঞ্চলেই কাগজশিল্পের একদেশীভবন হইয়াছে।

চিনিশিল্প—বীট-উৎপাদনে রাশিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি করায়

এবং সরকারী সাহায্যে এই শিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে। বর্তমানে চিনি-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। কিয়েভ, নীপারপেট্রোভস্ক, কুরস্ক, ট্রান্স-ককেশীয় অঞ্চল, পশ্চিম সাইবেরিয়ার কুজনেৎস্ক এবং বৈকাল হ্রদ-সন্নিহিত ইরকুটস্ক বীট-চিনি-উৎপাদনে উন্নতি লাভ করিয়াছে। (৪৬ পৃষ্ঠায় মানচিত্র দ্রষ্টব্য।)

চিনি-উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (লক্ষ মেঃ টন)

১৯১৩ (প্রাক্-বিপ্লব)	১৩'৪৭	১৯৬২	৬৬'৫০
১৯৪০	২১'৬৫	১৯৬৫ (লক্ষ্য)	১০০'০০

রাসায়নিক শিল্প—রাশিয়া পৃথিবীতে সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড-উৎপাদনে তৃতীয় স্থান (৯%), সোডা অ্যাশ, কস্টিক সোডা ও সার উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া সাবান, প্লাস্টিক, ঔষধপত্র প্রভৃতি শিল্পে এই দেশ বিশেষ উন্নত। ইউরোপীয় রাশিয়ার প্রায় সকল শিল্পাঞ্চলেই বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্প ছড়াইয়া আছে; তন্মধ্যে লেনিনগ্রাড ও মস্কো অঞ্চলে এই শিল্পের সর্বাপেক্ষা বেশী উন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

রাসায়নিক শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল এই দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজাকস্তানে ফস্‌ফরাস্, কোলা উপদ্বীপে অ্যাপাটাইট, বলখাস হ্রদের সন্নিকটে লবণ, সলিকামস্কে পটাসিয়াম সল্ট, মধ্য এশিয়ায় সাল্‌ফার এবং ইউরালে পাইরাইট ও ক্রোম আকরিক পাওয়া যায়।

পরিবহণ-ব্যবস্থা (Communications)

বর্তমানে রাশিয়া আণবিক শক্তি-উৎপাদনে পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে।

পরিবহণ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত না থাকিলে বর্তমান জগতে কোন দেশই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। দেশের বিশাল আয়তন, প্রাকৃতিক সম্পদের অসাম্য বিভাগ, লোকবসতির অসামঞ্জস্য, কৃষি ও শিল্পের একদেশীভবন প্রভৃতি কারণে রাশিয়ার উন্নতির পক্ষে পরিবহণ-ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য এই দেশ পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির দিকে বিশেষ সচেষ্ট ছিল।

এই দেশের সকল প্রকার উন্নতি পরিকল্পনার মাধ্যমে চালিত হয় বলিয়া বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। তন্মধ্যে **রেলপথ** সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে; মোট মালপত্রের

শতকরা ৮৩ ভাগ এবং মোট যাত্রীর শতকরা ৮১ ভাগ রেলপথে পরিবাহিত হয়। দেশের সকল বড় শহর, শিল্পকেন্দ্র ও কৃষি অঞ্চল রেলপথে সংযুক্ত; জারের

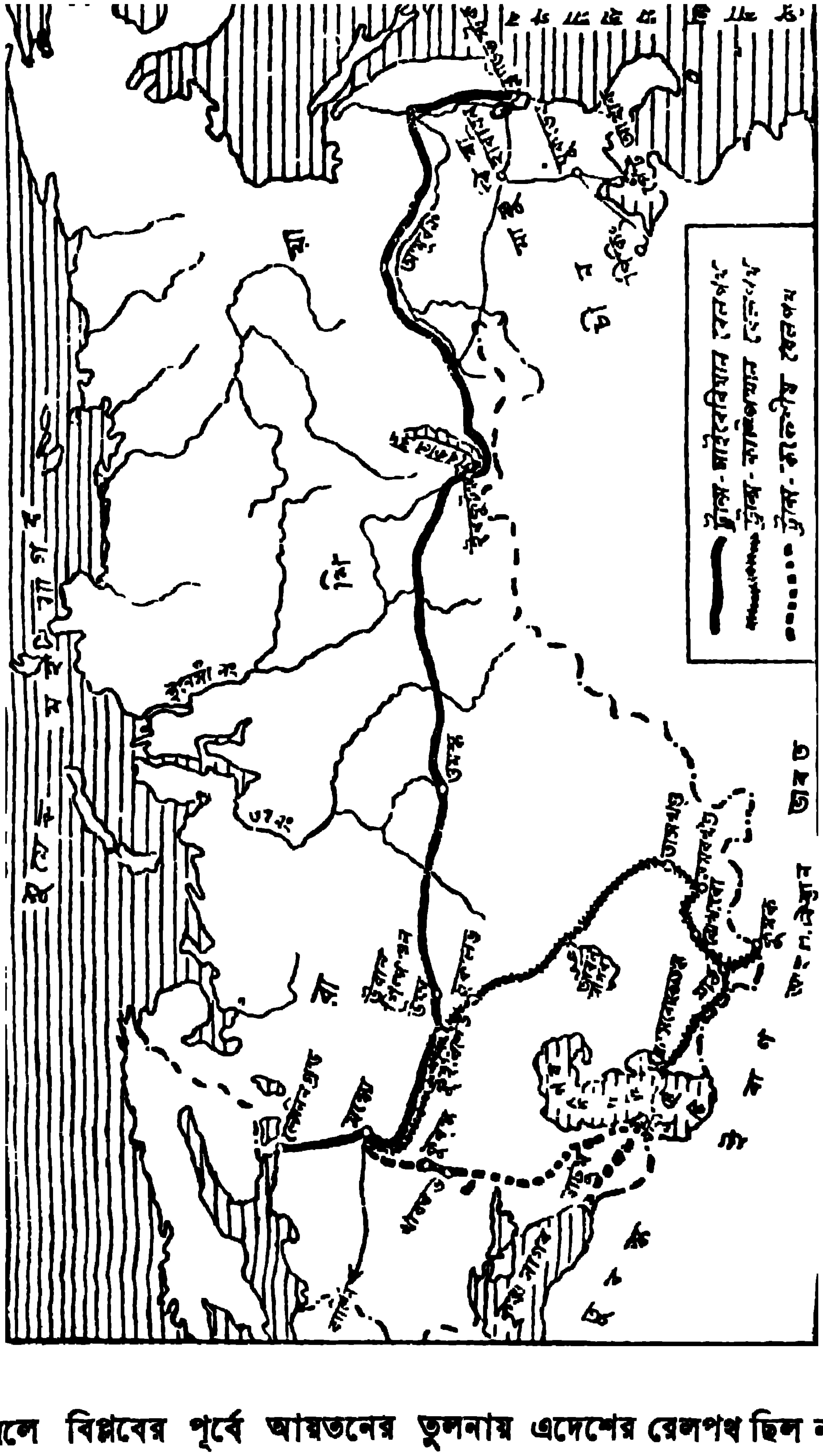

রাশিয়ার মহাদেশীয় রেলপথসমূহ

আমলে বিপ্লবের পূর্বে আয়তনের তুলনায় এদেশের রেলপথ ছিল নগণ্য—মাত্র ৬০,০০০ কিলোমিটার। সমাজতান্ত্রিক শাসনে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে

১,২২,২০০ কিলোমিটার। এই দেশে তিনটি মহাদেশীয় রেলপথ বিদ্যমান—ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ, ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেলপথ এবং ট্রান্স-ককেশীয় রেলপথ।

ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮,৮০০ কিলোমিটার; ইহাই পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ। মস্কো হইতে এই রেলপথ সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়া ভ্লাডিভস্টক বন্দরে পৌঁছিয়াছে। এই বন্দর হইতে একটি শাখা-লাইন চীনের রাজধানী পিকিং পর্যন্ত গিয়াছে। বর্তমানে চীনের সহিত রাশিয়ার বাণিজ্য সবচেয়ে বেশী। এই রেলপথের মাধ্যমে এই দুই দেশের মধ্যে অধিকাংশ পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি হয়। **ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেলপথ** রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম রেলপথ। কাস্পিয়ান হ্রদের তীরে অবস্থিত ক্রাস্নোভোডস্ক হইতে এই রেলপথ মস্কো পর্যন্ত গিয়াছে।

ট্রান্স-ককেশীয় রেলপথ মস্কো হইতে কুরস্ক ও খারকভ শহর হইয়া কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত বিখ্যাত তৈলকেন্দ্র বাকু শহরে পৌঁছিয়াছে। বাকু হইতে একটি লাইন কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত বাটুম শহর পর্যন্ত গিয়াছে:

ইহা ছাড়া অন্তর্দেশীয় বহু রেলপথ এই দেশে নির্মিত হইয়াছে। কাজান হইতে আগ্রিজ ও স্বার্দল্ভস্ক হইয়া একটি রেলপথ কুর্গান পর্যন্ত গিয়াছে। ইউরালের শিল্পাঞ্চল হইতে রাজধানী পর্যন্ত ইহাই সোজা রাস্তার রেলপথ। গুরিয়েভ, নভকুজনেৎস্ক ও আবাকান পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করিয়া কুজবাসের বিকাশ শুরু হয়। তুর্কিস্তান-সাইবেরিয়া রেলপথ মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সাইবেরিয়ার সংযোগ-সাধন করিয়াছে। ১৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পেচোরা রেলপথ চিরতুষারাবৃত জমি, গহন অরণ্য ও জলার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। পশ্চিম রাশিয়া ও ইউরাল অঞ্চলের রেলপথ সর্বাপেক্ষা ঘন। মস্কোর সহিত দেশের সকল রেলপথ আসিয়া যুক্ত হইয়াছে।

রেলপথে মালপত্র চলাচলের বিষয়ে রাশিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে; সপ্তমবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৬৫ সালে রেলপথে পরিবাহিত মালপত্রের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১,৮৫,০০০ কোটি টন-কিলোমিটার। বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে বৎসরে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ মেঃ টন কয়লা বাঁচে।

বিশাল আয়তনের দেশ বলিয়া এখনও এই দেশের সর্বত্র রেলপথ স্থাপিত হয় নাই। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে **মোটর-গাড়ীর** উপর নির্ভর করিতে হয়। বর্তমানে প্রায় ৬,২০০ কোটি টন-কিলোমিটার মালপত্র লরী

মারফত পরিবাহিত হয়। এই দেশে এখন প্রায় ২,২৫,৭০০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা আছে।

জলপথে নদী ও আভ্যন্তরীণ জলাশয় মারফত এই দেশের প্রচুর পণ্য-দ্রব্য ও যাত্রী পরিবাহিত হয়। আভ্যন্তরীণ জলপথে প্রায় ১,৩২,০০০ কিলো-মিটার জলপথ সুনাব্য। এই দেশের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ মালপত্র জলপথে পরিবাহিত হয়। পরিবহণ-ব্যবস্থায়, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে ও জলসেচনে **নদী** এই দেশকে প্রভূত সাহায্য করে। এই দেশে প্রায় ৫ লক্ষ কিলোমিটার নদীপথে জাহাজ চালানো যায় এবং কাঠ ভাসিয়ে নেওয়া যায়। এই নদীসমূহ হইতে ২৮ কোটি কিলোওয়াট্ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। রাশিয়ার নদীসমূহের প্রাকৃতিক অসুবিধা এই যে, এই সকল নদী হয় স্থল-বেষ্টিত সাগরে অথবা বরফাবৃত উত্তরদিকের সমুদ্রে পতিত হওয়ায় অধিকাংশ নদী শীতকালে বরফে পরিণত হয় এবং গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়। বর্তমানে বরফ-কাটা জাহাজ দ্বারা বরফযুক্ত নদীতেও পরিবহণ-ব্যবস্থা চালু রাখা যায়। রাশিয়ার নদীসমূহের মধ্যে আমুর (৪.৩৪৭ কিলোমিটার), লেনা (৪,২৮৯ কিলো-মিটার), ওবি (৪,০৩৮ কিলোমিটার), ইনেসি (৩,৮০০ কিলোমিটার) ও ভল্গা (৩,৫৮২ কিলোমিটার) নদীই প্রধান। ইহা ছাড়া ইউরোপীয় রাশিয়াতে উত্তর ডুইনা ও পশ্চিম ডুইনা, নীপার, ডন প্রভৃতি নদী আছে। ভারতের গঙ্গানদীর মতো রাশিয়ার ভল্গা নদীর অবদান সর্বাপেক্ষা বেশী। ইহা মস্কোর উত্তরে একটি মালভূমি হইতে নির্গত হইয়া গোর্কী, কাজান, কুইবিশেভ, সারাটোভ ও স্টালিনগ্রাড হইয়া কাস্পিয়ান সাগরে পড়িয়াছে। খনিজ তৈল ও খাদ্যদ্রব্য এই নদীপথে দেশের দক্ষিণাংশ হইতে উত্তরাংশে যায় এবং কাঠ ও শিল্পজাত দ্রব্য বিপরীত দিকে যাতায়াত করে। ১৯৫২ সালে ভল্গা-ডন-লেনিন খাল কাটিয়া ভল্গা ও ডন নদীর সংযোগ সাধন করা হয়। কালাচ হইতে রস্টভ পর্যন্ত এই খালপথে জাহাজ চলাচল করিতে পারে।

সাইবেরিয়ার নদীসমূহ (ওবি, ইনেসি, লেনা ও আমুর) পরিবহণের পক্ষে ততটা কার্যকরী নহে। এই সকল নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করিয়া জলসেচন ও বিদ্যুৎ-উৎপাদনের উপযোগী করা হইয়াছে। মধ্য এশিয়ায় আমু-দরিয়া ও সির-দরিয়া নদী দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রথায় বরফ-ভাঙা জাহাজের সাহায্যে লেনিনগ্রাড হইতে মুরমানস্ক

হইয়া উত্তর মহাসাগরের মধ্য দিয়া ভ্লাডিভস্টক পর্যন্ত যাওয়া যায়; পূর্ব ও পশ্চিম রাশিয়া এইভাবে জলপথে যুক্ত হইয়াছে। এই দেশের হ্রদসমূহ জলপথে পরিবহণের সহায়ক; কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান সাগর, আরল সাগর, লাডোগা, ওনেগা ও বৈকাল হ্রদ মারফত বহুল পরিমাণে মালপত্র পরিবাহিত হয়। জলপথের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে জলযানের যান্ত্রিক উন্নতির উপর। জারের আমলে এই দেশে কয়েকটি বাষ্পীয় জলযান ও গাধাবোট ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু বর্তমানে মোটর-জাহাজ, স্বয়ংচালিত মালবাহী ও যাত্রিবাহী জাহাজ, পারমাণবিক শক্তি-চালিত বরফ-ভাঙা জাহাজ প্রভৃতি তৈয়ার হওয়ায় এই দেশের জলপথের অনেক উন্নতি হইয়াছে। পারমাণবিক শক্তিচালিত 'লেনিন' (১৬,০০০ টন) জাহাজ পুনরায় জ্বালানি না নিয়া একনাগাড়ে অন্ততঃ এক বৎসর চলিতে পারে।

এই দেশের আমদানি-রপ্তানির অধিকাংশই পরিবাহিত হয় **সমুদ্রপথে**। এই দেশের উত্তরের বিশাল মহাসাগর এবং দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগর মারফত বৈদেশিক বাণিজ্যের মালপত্র পরিবাহিত হয়। শান্তির সশস্ত্র প্রহরী এই দেশের সঙ্গে বিভিন্ন শান্তিকামী দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে! বর্তমানে সমুদ্রপথে বৎসরে প্রায় ৬ কোটি ৫৭ লক্ষ মেঃ টন মালপত্র পরিবাহিত হয়। বর্তমানে বৈদ্যুতিক ও আণবিক শক্তির মাধ্যমে বরফ-ভাঙা জাহাজের সাহায্যে বহু নদী ও সাগরে সারাবৎসর জাহাজ চলাচল করে।

বিপ্লবের পরে জারের আমল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তমান সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মাত্র ৩০০টি পুরানো বিমান এবং অল্প কয়েকটি যন্ত্রপাতি জোড়া লাগাইবার কারখানা পায়। আজ ৪৫ বৎসর পরে এই দেশ **আকাশপথে** পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। দেশের বিভিন্ন ছোটবড় শহর আকাশপথে সংযুক্ত। বহুদূর হইতেও মানুষ আকাশপথে আসিয়া কাজকর্ম করিতে পারে। এই দেশে তিনটি প্রধান আকাশপথ বিদ্যমান। মস্কো হইতে একটি লাইন কাজান, স্বার্দল্ভস্ক, ওমস্ক, ইরকুটস্ক, চিতা ও খাবারোভস্ক হইয়া ভ্লাডিভস্টক পর্যন্ত গিয়াছে; অন্য একটি লাইন রিগা হইয়া স্টকহল্‌ম্ পর্যন্ত গিয়াছে। রিগা শহরে জার্মানীর আকাশপথ আসিয়া মিশিয়াছে। তৃতীয় লাইনটি মস্কো হইতে চ্কালোভ ও তাশখন্দ হইয়া কাবুল পর্যন্ত গিয়াছে। মস্কো ও ভারতের মধ্যে সরাসরি বিমানপোত

তাশখন্দ হইয়া যাতায়াত করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গেও রাশিয়ার সরাসরি বিমানপোত যাতায়াতের বন্দোবস্ত আছে; বিশেষতঃ চীন, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আকাশপথে বহু যাত্রী ও মালপত্র যাতায়াত করে।

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)—বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়া কৃষিজ দ্রব্য ও কাঁচামাল রপ্তানি করিয়া পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ হইতে শিল্পদ্রব্য আমদানি করিত। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত এই দেশ গম, যব, রাই, ভুট্টা, কাঠ ও শণ রপ্তানিতে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিত। বিপ্লবের পর এই দেশের সমাজতান্ত্রিক সরকার দেশের শিল্পোন্নতির জন্য সচেষ্ট হয় এবং ফলে কাঁচামালের রপ্তানি প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধ ও বিপ্লবের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে রাশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। রাজনৈতিক কারণে ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহ এই দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেয়। রাশিয়াও নিজেকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের দিকে নজর দেয় নাই। স্বাবলম্বী হইবার পর ১৯৫২ সাল হইতে রাশিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য সংঘটিত করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। বর্তমানে এই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রকর্তৃক পরিচালিত হয় এবং পরিকল্পনা অনুসারে সংঘটিত হয়। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তির মারফত আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে। এই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতেছে।

রাশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য (কোটি রুবল)

	১৯১৮	১৯৪৬	১৯৫৭
মোট বাণিজ্য	৩৯	৫৬৯	৩৩২৭
রপ্তানি	৩	২৬১	১৭৫২
আমদানি	৩৬	৩০৮	১৫৭৫
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত বাণিজ্য		৩৮০	২৪৫০
বাণিজ্যকারী দেশের সংখ্যা	৯	৪০	৭০

এই পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্যের পরিমাণ মোট বাণিজ্যের অনুপাতে বহুল-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৬ সালে এই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা ৬৭ ভাগ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইত; ১৯৫৭ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া

শতকরা ৭৪ ভাগে দাঁড়ায়। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য রাশিয়াকে বহু যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে পাঠাইতে হয়। বর্তমানে অন্যান্য দেশের সঙ্গেও রাশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে; ১৯৪৬ সালে এই সকল দেশের সঙ্গে মোট ১৮৯ কোটি রুবলের বাণিজ্য হইয়াছিল; কিন্তু ১৯৫৭ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৭৭ কোটি রুবল। ভারত, ঘানা, গিণি, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মিশর প্রভৃতি নিরপেক্ষ দেশের সঙ্গে রাশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পুঁজিবাদী দেশসমূহের মধ্যে ফিনল্যাণ্ড, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী ও ফ্রান্সের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক বাণিজ্য হইয়া থাকে। রাশিয়ার সঙ্গে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের (পূর্ব জার্মানী) সর্বাপেক্ষা বেশী বাণিজ্য হয় (মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের ১৯.৫%)। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে চীন (মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের ১৫.৪%)। রাশিয়া হইতে পূর্ব জার্মানীতে প্রধানতঃ কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ আকরিক, ইস্পাত ও খাদ্যশস্য প্রেরিত হয় এবং চীনে প্রেরিত হয় যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল ও রসায়ন দ্রব্য। চীন হইতে রাশিয়া আমদানি করে টিন, চাউল, মাংস, ফল, চা, তৈলবীজ, পশম, রেশম, পাট ও যন্ত্রাদি। পোল্যাণ্ড হইতে কয়লা, সিমেণ্ট, দস্তা ও জাহাজ; হাঙ্গেরী হইতে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রেলগাড়ী ও ইঞ্জিন; রুমানিয়া হইতে খনিজ তৈল, সিমেণ্ট ও কৃষিজ দ্রব্য; আলবানিয়া, বুলগেরিয়া, ভিয়েটনাম ও কোরিয়া হইতে বিভিন্ন ভোগ্যবস্তু, খনিজ ও কৃষিজ দ্রব্য রাশিয়ায় আমদানি হয়। রাশিয়া বিভিন্ন দেশকে অত্যন্ত কম সুদে (২০%) অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে; সোনা বা বৈদেশিক মুদ্রায় এই সকল দেশকে ইহা শোধ করিতে হয় না। ঋণভোগী দেশসমূহ সাধারণতঃ যে সকল জিনিস রপ্তানি করে, তাহা দ্বারাই এই ঋণ পরিশোধ করা যায়। এই সকল কারণে রাশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমশঃই দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে।

অসমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে রাশিয়ার রপ্তানি দ্রব্যসমূহের মধ্যে খনিজ তৈল, কাঠ, পশম দ্রব্য, শণ, যন্ত্রপাতি, গম, যই, মাখন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; আমদানি-দ্রব্যসমূহের মধ্যে কাঁচামাল (তাম্র, রবার, পশম প্রভৃতি) উল্লেখযোগ্য। ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৯ সালে ভারত এই দেশ হইতে ১৭ কোটি টাকা মূল্যের জিনিসপত্র আমদানি করে এবং ৩০ কোটি টাকা মূল্যের জিনিসপত্র রপ্তানি করে।

শহর ও বন্দর (Cities & Ports)—মোস্কভা নদীর তীরে অবস্থিত **মস্কো** রাশিয়ার রাজধানী ও বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র। ইহা এই দেশের বিভিন্ন পরিবহণ-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল। মস্কো হইতে এই দেশের বিভিন্নদিকে রেলপথ ও বিমানপথ নির্গত হইয়াছে। এখানকার শিল্পসমূহের মধ্যে কার্পাসবয়ন, ইস্পাত, চর্ম, কাগজ প্রভৃতি শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শহরের লোক-সংখ্যা ৫০ লক্ষ। নীভানদীর মুখে বাল্‌টিক সাগরতীরে অবস্থিত **লেনিনগ্রাড** বন্দর রাশিয়া কর্তৃক পশ্চিম ইউরোপে যাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বৎসরে ৪½ মাস এই বন্দরটি বরফে আচ্ছাদিত থাকে। জাহাজ-নির্মাণশিল্প বিশেষতঃ বরফ-ভাঙা জাহাজ-নির্মাণশিল্পের জন্য এই বন্দর বিখ্যাত। সেলুলোজ, কাগজ ও অ্যালুমিনিয়াম শিল্পও এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শহরটি রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তর শহর; ইহার লোকসংখ্যা ৩৩ লক্ষ। নীপার নদীর তীরে অবস্থিত **কিয়েভ** রাশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহর; ইহার লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ। ইহা ইউরোপীয় রাশিয়ার একটি প্রাচীন শহর। কৃষি অঞ্চলের মধ্যে ইহা অবস্থিত বলিয়া এখানে বিখ্যাত শস্য-বিক্রয়কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানকার শ্রমশিল্পের মধ্যে চিনিশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত **বাকু** রাশিয়ার বিখ্যাত তৈলকেন্দ্র। রপ্তানির উদ্দেশ্যে এই স্থান হইতে নলযোগে কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত বাটুম শহরে খনিজ তৈল নেওয়া হয়; এখানকার লোকসংখ্যা ৯ লক্ষ। **গোর্কী** শহরের লোকসংখ্যা ৯ লক্ষ। ইহা একটি উন্নতিশীল শিল্পকেন্দ্র। এখানকার কার্পাস-বস্ত্র ও মোটর-শিল্প বিখ্যাত। **খারকভ** ইউক্রেনের রাজধানী। এখানকার লোকসংখ্যা ৯ লক্ষ। এখানকার শ্রমশিল্পের মধ্যে ট্র্যাক্টর, মোটর-গাড়ী ও কৃষি-যন্ত্রপাতি-নির্মাণশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **তাশখন্দ** মধ্য এশিয়ার একটি বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। ইহার লোকসংখ্যা ৯ লক্ষ। **মুরমানস্ক** কোলা উপদ্বীপের উত্তরাংশে অবস্থিত। এই বন্দর বৎসরের সকল সময় বরফ-মুক্ত থাকে। লেনিনগ্রাডের সহিত ইহা রেলপথে যুক্ত। শীতকালে এই বন্দরটির গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। **নীপারপেট্রোভস্ক**—নীপার নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর ইস্পাত ও যন্ত্র-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। নীপার নদীর উপর পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বাঁধ এখানে অবস্থিত। বাঁধের জলবিদ্যুৎ হইতে স্থানীয় শিল্প চালিত হয়; ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ। কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীরে অবস্থিত **ওডেসা** বন্দরের মারফত রাশিয়ার গম রপ্তানি হইয়া থাকে।

বৃটেন (The United Kingdom)

বৃটেন একসময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। বর্তমানে রাশিয়া, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির হার বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃটেনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কিছুটা কমিয়া আসিতেছে। এখনও শিল্প ও বাণিজ্যে এই দেশ পৃথিবীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ বলিতে গ্রেট বৃটেন (ইংল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স ও স্কটল্যাণ্ড) এবং আয়ারল্যাণ্ডকে (উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ও আইরিস প্রজাতন্ত্র) বুঝায়। যুক্তরাজ্য (The United Kingdom) বলিতে গ্রেট বৃটেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে বুঝায়; আইরিশ সমুদ্র, উত্তর সাগর এবং নিকটবর্তী আটলান্টিক মহাসাগরের কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপও ইহার অন্তর্গত। যুক্তরাজ্য বা বৃটেন* সম্বন্ধেই শুধু এখানে আলোচনা করা হইবে। বৃটেনের আয়তন ২,২৩,৬৫৭ বর্গ-কিলোমিটার।

অর্থনৈতিক উন্নতির কারণ (Causes for Economic Development)—শিল্প ও বাণিজ্যে বৃটেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে এই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও উপনিবেশসমূহ। (ক) এখানকার **জলবায়ু** অত্যন্ত মৃদু; ইহা মানুষের কর্মশক্তির প্রেরণা দেয়। আটলান্টিক মহাসাগর হইতে উষ্ণ-স্রোত এই দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া নিকটবর্তী অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে শীতের প্রকোপ কিছুটা কম। সেইজন্য সারাবৎসরই এখানে কৃষিকার্য ও শিল্পোৎপাদন সম্ভব। (খ) এই দেশের **সৈকতরেখা** ভগ্ন হওয়ায় এখানে বন্দর-নির্মাণ অত্যন্ত সহজসাধ্য। দেশের কোনস্থানই সমুদ্রোপকূলহইতে ১৫০ কিলোমিটারের বেশী দূরে নহে। এইজন্য শিল্পাঞ্চল হইতে জিনিসপত্র বন্দরে নেওয়া ও রপ্তানি করা মোটেই ব্যয়সাধ্য নহে। এই দেশের নদী বিশেষ কোন কাজে

পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে বৃটেনের অবস্থান লক্ষণীয়

* যুক্তরাজ্যকে এই অধ্যায়ে 'বৃটেন' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

না আসিলেও নদীর মোহনায় বড় বড় বন্দরের উৎপত্তি হইয়াছে। আটলান্টিক উষ্ণস্রোতের প্রভাবে কোন বন্দরই কখনও বরফে আবৃত থাকে না। (গ) এই দেশের **অবস্থান** বাণিজ্যের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক। পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় বৃটেন হইতে কোন দেশের দূরত্বই খুব বেশী নহে। ফলে আমদানি-রপ্তানির জন্য খুব বেশী ভাড়া দিতে হয় না। দ্বৈপ অবস্থানভুক্ত দেশ বলিয়া অন্যদেশ হইতে আক্রমণের আশঙ্কাও খুব কম। এইজন্য নৌ-বাহিনীর উপর এই দেশ অধিক নির্ভরশীল। স্থল-বাহিনীর সংখ্যা অধিক না থাকায় সামরিক কার্যে খুব বেশী লোক প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য শিল্পে সাধারণতঃ লোকের অভাব হয় না। চারিদিকে জল থাকায় সামরিক খরচ অন্যান্য মহাদেশীয় অবস্থানভুক্ত দেশ অপেক্ষা কম। ইহাতে শিল্পে অধিক মূলধন নিয়োজিত করা সম্ভবপর। ইউরোপের অন্যান্য উন্নতিশীল দেশসমূহ বৃটেনের নিকটেই অবস্থিত বলিয়া বাণিজ্যের উন্নতি সহজসাধ্য হইয়াছে। (ঘ) এই দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর **কয়লা ও লৌহ আকরিক** পাশাপাশি পাওয়া যায় বলিয়া ইস্পাতশিল্পের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। (ঙ) এই দেশের **সরকার** অত্যন্ত স্থিতিশীল এবং দায়িত্বপূর্ণ; এখানকার মানুষের চরিত্রবল উন্নত এবং ইহারা ধৈর্যশীল ও কর্মনিপুণ; কারিগরী শিক্ষায় ইহারা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। (চ) এই দেশের **পরিবহণ-ব্যবস্থা** অত্যন্ত উন্নত ধরনের। দেশের আয়তন অত্যন্ত কম হইলেও, এখানকার রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০,০০০ কিলোমিটার। রাস্তাঘাটসমূহ মোটর-গাড়ী চালানোর পক্ষে উৎকৃষ্ট। ১৯৪৭ সালে এই দেশের পরিবহণ-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়-করণ করা হইয়াছে। (ছ) প্রবাদ আছে, বৃটিশ **সাম্রাজ্যে** সূর্য অস্ত যায় না। বর্তমানে এই সূর্য অস্তগামী হইলেও পূর্বে বৃটেন পৃথিবীর বহুদেশ দখল করিয়া ইহাদের ধনসম্পদ শোষণ করিয়া নিজের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিয়াছিল। বর্তমানে কোনও কোনও দেশকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া হইলেও, বহু স্বাধীন দেশ হইতে বৃটেন এখনও বিভিন্ন সম্পদ আহরণ করে ও বহু সুবিধা ভোগ করে। (জ) এই দেশের অপর্যাপ্ত **জাহাজ** থাকায় বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রচুর সুবিধা হইয়াছে। জাহাজে করিয়া লোকজন উপনিবেশে লইয়া যাওয়া, উপনিবেশ হইতে স্বল্পমূল্যে কাঁচামাল আমদানি করা এবং শিল্পদ্রব্য ঐ সকল উপনিবেশ ও অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা সহজসাধ্য। (ঝ) ইংরেজী ভাষা পৃথিবীর বহুলোক জানে বলিয়া এই ভাষার

মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্য করা সহজ। (এ) ইউরোপের যে-কোন দেশ অপেক্ষা বৃটেনের সহিত আমেরিকার দূরত্ব সর্বাপেক্ষা কম। সেইজন্য কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পসম্পদে সমৃদ্ধ উত্তর আমেরিকার সহিত বৃটেনের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সর্বাধিক উন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

এই দেশের উন্নতিতে কয়েকটি **অসুবিধাও** পরিলক্ষিত হয়। অত্যধিক ঘন লোকবসতি ও জমির স্বল্পতা, অধিক হারের মজুরি, জলবিদ্যুতের অভাব ইত্যাদি এই দেশের শিল্পোন্নতির পক্ষে অসুবিধাজনক। এই দেশে শিল্পের কাঁচামাল পর্যাপ্ত পরিমাণে না পাওয়ায় অধিকাংশ কাঁচামাল বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। এতদিন বিভিন্ন উপনিবেশ হইতে কাঁচামাল স্বল্পমূল্যে সংগ্রহ করা যাইত। কিন্তু বর্তমানে কোন কোন উপনিবেশ স্বাধীন হওয়ায় কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে বৃটেনকে ভীষণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। যেমন, ভারত স্বাধীন হওয়ায় তুলা, পাট ও লৌহ আকরিক সুবিধাজনক শর্তে সংগ্রহ করা বৃটেনের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়াছে।

ভূ-প্রকৃতি (Physical Features)—বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের চতুর্দিকে সমুদ্র। দ্বীপপুঞ্জের চতুষ্পার্শ্ববর্তী সমুদ্র অগভীর। ইহা মৎস্য-শিকারের অনুকূল। চারিদিকে জল থাকায় বন্দরস্থাপন ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের সুবিধা হইয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে কোথাও কোন সুউচ্চ পর্বত নাই; এইজন্য পরিবহণ-ব্যবস্থার কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতে পারে না। এই দেশের সর্বোচ্চ পর্বত স্কটল্যাণ্ডের বেন নেভিস্; ইহার উচ্চতা মাত্র ১,৩৪০ মিটার। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সের সর্বোচ্চ স্থানের উচ্চতাও ১,২০০ মিটারের বেশী নহে। কিন্তু এই দেশের বহুস্থানে ছোট ছোট পাহাড় আছে। ইহাদের উচ্চতা খুবই কম বলিয়া দেশের উন্নতিতে ইহারা খুব বিঘ্ন ঘটায় না। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এই দেশকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(ক) স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমি—স্কটল্যাণ্ডের **উত্তরাংশ** উচ্চভূমি। এই এলাকায় অনেক পাহাড়-পর্বত আছে। কঠিন শিলাদ্বারা এই অঞ্চল গঠিত। পূর্বে এই অঞ্চল বরফাচ্ছন্ন থাকিত; বর্তমানে শুধু পর্বতের শৃঙ্গসমূহ সারা-বৎসর বরফাচ্ছন্ন থাকে। স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে মেষ পালন করা হয় এবং উপকূলভাগে মৎস্য শিকার করা হয়। সেইজন্য এখানকার অধিবাসীরা সাধারণতঃ মেষপালক অথবা ধীবর। দক্ষিণ স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমির দক্ষিণে প্রচুর উৎকৃষ্টশ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। এখানকার লোকবসতি অত্যন্ত

বিরল। এখানকার স্বল্প বৃষ্টিপাত ও সূর্যকিরণোজ্জ্বল জলবায়ু শুষ্ক চাষের উপযোগী। এই অঞ্চলের আর্কনীজ শেটল্যাণ্ডে উর্বর লালমৃত্তিকা থাকায় যই, যব, আলু প্রভৃতির চাষ হয়।

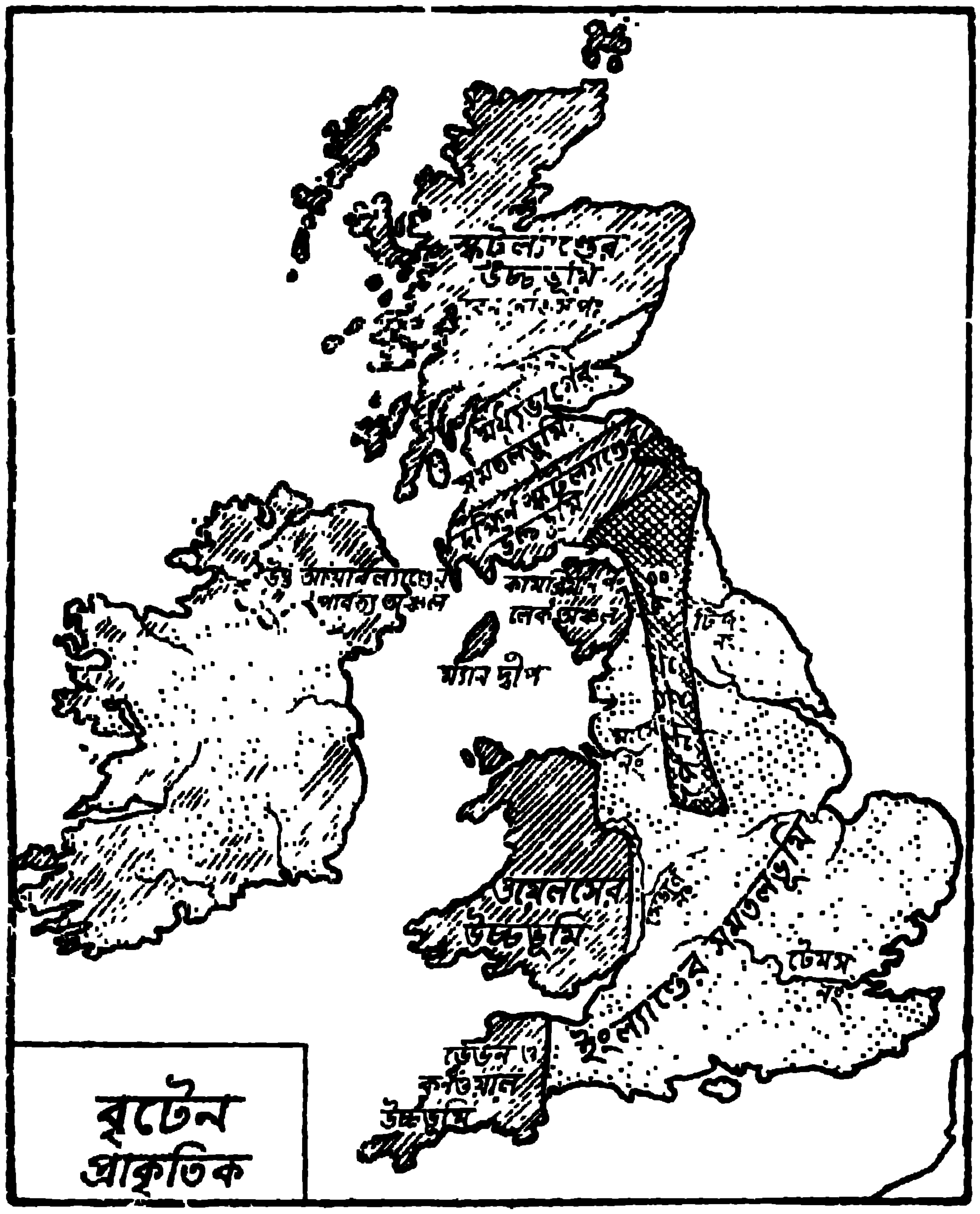

স্কটল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশের উচ্চভূমির উত্তরাংশের উচ্চভূমি হইতে মধ্যবর্তী অঞ্চলের সমতলভূমি দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে। দক্ষিণাংশের উচ্চভূমি পুরাতন শিলাদ্বারা গঠিত। এখানকার অধিকাংশ স্থান মালভূমি। মৃত্তিকা উর্বর না হওয়ায় পশুপালনের উন্নতি হইয়াছে; এখানকার পশম বিখ্যাত। দক্ষিণ উপকূলের কিছু অংশ ও টুইড উপত্যকার মৃত্তিকা উর্বর বলিয়া এখানে যব, রাই ও যই উৎপন্ন হয়। এখানকার অধিকাংশ লোক পশুপালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে; এই উচ্চভূমির দক্ষিণাংশে উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায়।

(খ) মধ্যভাগের সমতলভূমি—উত্তর ও দক্ষিণ স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত সমতলভূমি একসময়ে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। নূতন শিলা ও মাটিদ্বারা এই অঞ্চল ক্রমশঃ আচ্ছাদিত হওয়ায় সমতলভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমতলভূমির কোন কোন অংশে আগ্নেয়গিরির শিলা দ্বারা গঠিত ছোট ছোট পাহাড় দেখা যায়। ক্লাইড, ফোর্থ, টে, আয়ার প্রভৃতি নদী এই সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই সকল নদীর মোহনায় বড় বড বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে; গ্লাসগো, ডাণ্ডি প্রভৃতি। এই সমতলভূমির পূর্বাংশ অত্যন্ত উর্বর বলিয়া এখানে কৃষিকার্যের উন্নতি হইয়াছে। এখানে তিনটি বৃহদাকার কয়লাখনির (লানার্কশায়ার, আয়ার-শায়ার ও ফাইফশায়ার) নিকটবর্তী অঞ্চলে বড় বড় শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্লাইড নদীর মোহনায় অবস্থিত গ্লাসগোতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাহাজ-নির্মাণশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

(গ) পেনাইন অঞ্চল—ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সের পচিমাংশ কঠিন শিলাদ্বারা গঠিত উচ্চভূমি। ইহার তিনটি স্থানে পাহাড়-পর্বতও দেখা যায়। যথা—ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী চিভিয়ট পাহাড়, এই পাহাড়ের দক্ষিণাংশে পেনাইন পর্বত, লেক জিলার কাম্বিয়ান পর্বত, ওয়েল্‌সের পর্বতশ্রেণী ইত্যাদি। এই সকল পর্বতের মধ্যে পেনাইন পর্বতকে ইংল্যাণ্ডের মেরুদণ্ড বলা হয়। কারণ এই পর্বতের তিনদিকের সমতলভূমি এই দেশের শ্রেষ্ঠ অঞ্চল। পেনাইন পর্বত হইতে বিভিন্ন নদী এই সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় জল সরবরাহের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। পেনাইন পর্বত মেষপালনের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট স্থান। এই পর্বতের দুইপার্শ্বে এই দেশের বিখ্যাত কয়লাখনিসমূহ অবস্থিত।

(ঘ) লেক অঞ্চল—অতি পুরাতন শিলাদ্বারা গঠিত এই অঞ্চল কোন একসময়ে হয়ত ম্যান দ্বীপের সহিত যুক্ত ছিল। ইহার কোন কোন অংশে নূতন শিলা পুরাতন শিলাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই পর্বতের উপত্যকা অতি সুন্দর এবং বহুলোক এখানে বেড়াইতে আসে। সেইজন্য এখানকার হোটেল-শিল্প খুব উন্নত। এখানকার উচ্চতম অংশের উত্তর-পশ্চিমে বিখ্যাত কাম্বারল্যাণ্ড কয়লাখনি অবস্থিত; উত্তর-পূর্বাংশে উর্বর জমি দেখা যায়। এই অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিখ্যাত জাহাজ-নির্মাণশিল্পের নগরী ব্যারো অবস্থিত।

(ঙ) ওয়েল্‌সের উচ্চভূমি—ওয়েল্‌সের অধিকাংশ স্থান পাহাড়-পর্বতে আচ্ছাদিত। উত্তর ও মধ্য ওয়েল্‌সের পার্বত্য অঞ্চলে ও উপত্যকায় মেষপালন করা এখানকার মানুষের প্রধান উপজীবিকা। এখানকার লোক-বসতি অত্যন্ত বিরল। দক্ষিণ ওয়েল্‌সে প্রচুর কয়লাখনি বিদ্যমান। এখানকার অধিকাংশ কয়লা বিদেশে বা দেশের অন্যত্র প্রেরিত হয়। কয়লাখনি থাকায় দক্ষিণ ওয়েল্‌সের লোকবসতি নাতিনিবিড়। স্থানীয় কয়লা হইতে কোন কোন শিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে।

(চ) ডেভন ও কর্ণওয়াল অঞ্চল—বৃটেনের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এই উপদ্বীপ কঠিন পুরাতন শিলাদ্বারা গঠিত। এই অঞ্চল উচ্চভূমি হইলেও পাহাড়-পর্বতের সংখ্যা নগণ্য; অধিকাংশ স্থান মালভূমি। সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলেই অধিকাংশ লোক বাস করে।

(ছ) ইংল্যাণ্ডের সমতলভূমি অঞ্চল—এই অঞ্চল বৃটেনের সর্বশ্রেষ্ঠ অঞ্চল। পেনাইন পর্বতের দুইপার্শ্বেই সমতলভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া এই অঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। **উত্তর ইংল্যাণ্ডে** পেনাইন পর্বতের দুইদিকে বৃক্ষহীন সমতলভূমির লোকবসতি খুব ঘন নহে। কয়লাখনি এই অঞ্চলের প্রধান সম্পদ। পেনাইন পর্বতের পশ্চিমদিকে ল্যাঙ্কাশায়ার কয়লাখনি এবং পূর্বদিকে ইয়র্কশায়ার কয়লাখনি অবস্থিত। আরওউত্তরে নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও ডারহামের কয়লাখনি অবস্থিত। কয়লাসম্পদের জন্য উত্তর ইংল্যাণ্ড শিল্পে সমৃদ্ধ। ইংল্যাণ্ডের **মধ্যভাগের সমতলভূমি** পুরাতন লালমৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। পশ্চিমাংশে ডীন বনভূমি অবস্থিত। এই অঞ্চলের উত্তরে কয়লা-সমৃদ্ধ "ব্ল্যাক কান্টি" অবস্থিত। **দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যাণ্ড** প্রধানতঃ একটি কৃষি অঞ্চল। ইহার পশ্চিমদিকে ছোট ছোট পাহাড় ও উচ্চভূমি দেখা যায়; যেমন, কট্‌সূউণ্ড পাহাড়, নর্দাম্পটন উচ্চভূমি প্রভৃতি। কয়েকটি চুনামাটির পাহাড়ও আছে। খড়ি-সমৃদ্ধ চিলটার্ণ পাহাড় দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলে বিভিন্ন ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যবর্তী অংশে উপত্যকার সৃষ্টি হইয়াছে। টেমস্ নদীর অববাহিকা অঞ্চল কৃষিকার্যের উপযোগী। পাহাড় অঞ্চলে পশুপালনের উন্নতি হইয়াছে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন শহর পার্শ্ববর্তী পল্লী অঞ্চলের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখানকার কোনস্থানই সমুদ্র হইতে ১৫০ কিলোমিটারের বেশী দূরে নহে। সেইজন্য এই অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্যাদি রপ্তানি করা খুব সহজ।

(জ) উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চল—এখানকার পর্বতশ্রেণী একসময়ে স্কটল্যাণ্ডের পর্বতশ্রেণীর শাখা বলিয়া বিবেচিত হইত। এখানকার লোকবসতি বিরল হইলেও আইরিশ প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা বেশী। এখানকার মৌর্ণ পর্বত গ্রানাইট দ্বারা গঠিত; ইহার উপত্যকা অত্যন্ত উচ্চ এবং কৃষিকার্যের পক্ষে উপযোগী। যই ও শণ এখানকার প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। রাজধানী বেলফাস্টের জাহাজ-নির্মাণশিল্প ও লিনেনশিল্প বিখ্যাত।

জলবায়ু (Climate)—বৃটেনের জলবায়ু এই দেশের উন্নতিতে যথেষ্ট

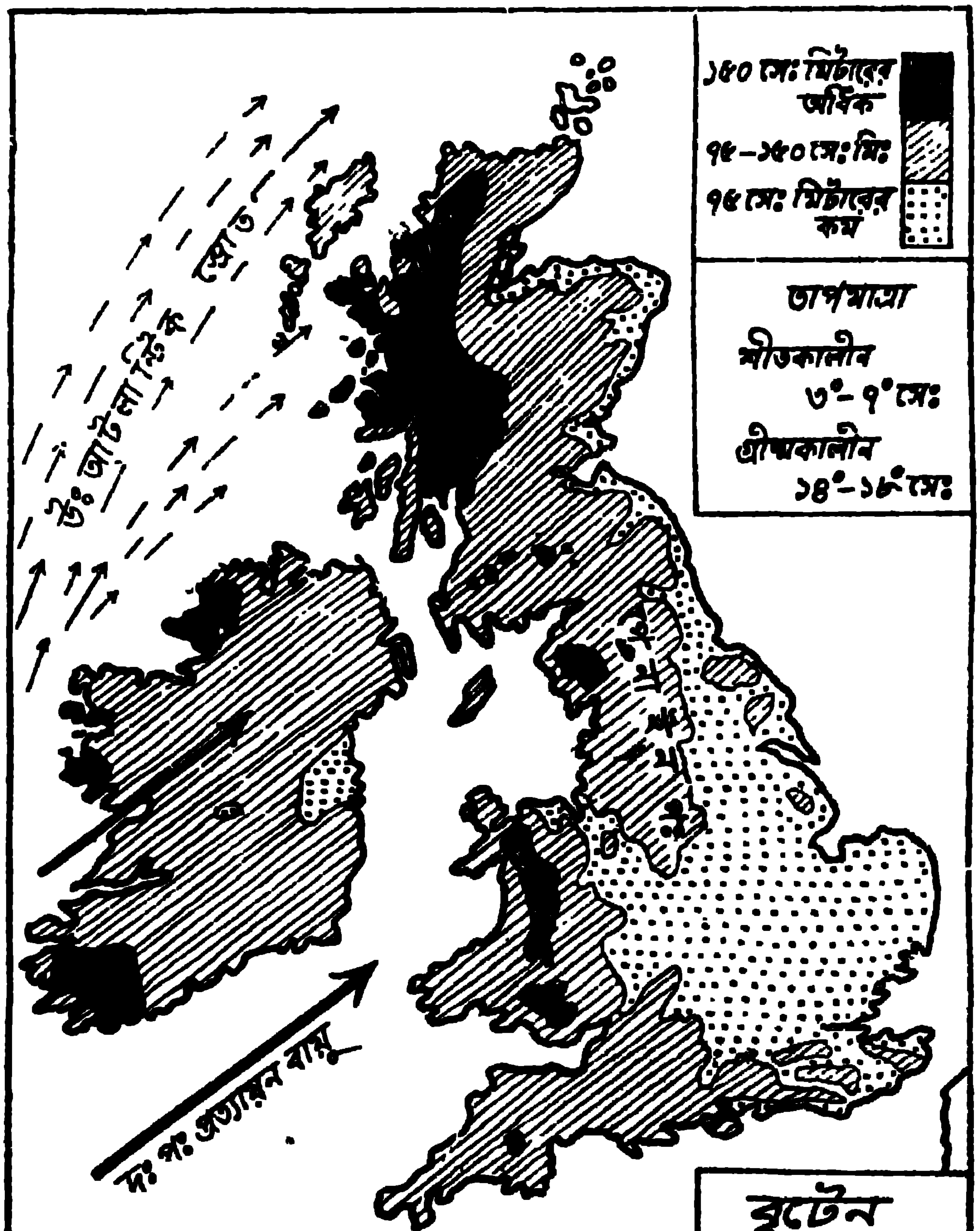

সাহায্য করিয়াছে। এখানকার জলবায়ু মোটামুটি মৃদুভাবাপন্ন। এইজন্য

এখানকার জলবায়ু মানুষের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই দেশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ৫০° হইতে ৬০° উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং এখানে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগর হইতে আগত উষ্ণবায়ুর প্রভাবে এখানে শীতের আধিক্য বেশী হইতে পারে না। সেইজন্য শীতকালেও এখানকার বন্দরসমূহ বরফাবৃত থাকে না। শীতকালীন **তাপমাত্রা** ৩° হইতে ৭° সেঃ পর্যন্ত হয় এবং গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ১৪° হইতে ১৮° সেঃ পর্যন্ত হইয়া থাকে। শীতকালে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিমদিক হইতে আসে বলিয়া এই দেশের পশ্চিমাংশ (আয়ারল্যাণ্ড ও গ্রেট বৃটেনের পশ্চিম তীর) পূর্বাংশ অপেক্ষা অধিকতর গরম।

পর্বতশ্রেণী সাধারণতঃ দেশের পশ্চিমাংশে ও মধ্যাংশে অবস্থিত বলিয়া পশ্চিমাংশে বেশী **বৃষ্টিপাত** হয় এবং পূর্বাংশ বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে পরিণত হয়। কর্কটক্রান্তির নিকটবর্তী অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন নিম্নচাপবলয়ের নিকট বৃটেন অবস্থিত; উত্তর হিমমণ্ডলের উচ্চচাপবলয় ইহার উত্তরেই অবস্থিত। শীতকালে অত্যধিক ঠাণ্ডার জন্য পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে উচ্চচাপবলয়ের সৃষ্টি হয়। বৃটেনের তিনদিকের এইসব চাপবলয়ের পারস্পরিক ক্ষমতার উপর এই দেশের বৃষ্টিপাত নির্ভর করে। মোটামুটি এখানে সারাবৎসর বৃষ্টিপাত হয়; বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেশের পশ্চিমাংশের পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় ১৫০ সেঃ মিঃ, পশ্চিমাংশের অন্যান্য স্থানে ৭৫ হইতে ১৫০ সেঃ মিঃ এবং পূর্বাংশের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে প্রায় ৫০ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ। অত্যধিক গরম না থাকায় বৃষ্টিপাতের জল সহজে শুকায় না বলিয়া পূর্বাংশের অল্প বৃষ্টিপাতেও কৃষিকার্য হইয়া থাকে। গম, যব, যই, রাই ও বীট এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। পূর্বাংশের অল্প বৃষ্টিপাত ছোট ছোট ঘাস জন্মাইবার উপযোগী বলিয়া এই অংশে ছোট-তৃণভোজী মেষ পালিত হয়। পশ্চিমাংশে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে বড় বড় ঘাস জন্মায়। এই ঘাস গবাদি পশুর খাদ্যোপযোগী বলিয়া এই অঞ্চলে গবাদি পশুপালন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

লোকবসতি—১৯৬৪ সালে এই দেশের লোকসংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৩৮ লক্ষ; প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে এই দেশের লোকবসতি প্রায় ২১৪ জন। উত্তর ইংল্যাণ্ড ও দক্ষিণ ওয়েল্‌সে সর্বাপেক্ষা অধিক বসতি পরিলক্ষিত হয়। লণ্ডন ও ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লোকবসতি সর্বাপেক্ষা ঘন। উপনিবেশসমূহে এই দেশের বহুলোক বাস করে। ১৮১৪ সালের পর হইতে ম্যাকন

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে প্রায় ২ কোটি লোক যাইয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। বৃটেনের লোকসংখ্যার শতকরা ১১ ভাগ মাত্র কৃষিকার্য ও পশুপালনের উপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ লোক শিল্প ও বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। এই দেশের শতকরা ৮০ জন লোক শহরাঞ্চলে বাস করে; গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা খুব কম। কয়লাখনি অঞ্চলে এবং লণ্ডনের চতুষ্পার্শ্বে সর্বাপেক্ষা বেশী লোক বাস করে।

নদী (River)—বৃটেনের নদীসমূহ ক্ষুদ্রকায় হইলে খুব উপকারী। স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড ভিন্ন অন্যান্য অংশের নদীর স্রোতের বেগ কম, সেইজন্য ইহা জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের উপযোগী নহে। নদীর গভীরতা কম থাকায় বড় বড় স্টীমার নদীর অভ্যন্তরে যাইতে পারে না; কিন্তু এই নদীসমূহের মুখে বন্দর পর্যন্ত বড় বড় জাহাজ আসিতে পারে। আটলান্টিক মহাসাগরের উষ্ণস্রোতের প্রভাবে বৃটেনের নদাগুলি কখনই বরফাচ্ছাদিত হয় না বলিয়া সারাবৎসর ইহাদের তীরে অবস্থিত বন্দরসমূহে জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে। স্কটল্যাণ্ডের পূর্বাংশের টে, ডে ও ফোর্থ এবং পশ্চিমাংশের ক্লাইড, ইংল্যাণ্ডের পূর্বদিকের টাইন, টিজ, হাম্বার ও টেম্‌স এবং পশ্চিমদিকের মার্সে ও সেভার্ণ এই দেশের উল্লেখযোগ্য নদী। এই সকল নদীসমূহের মুখে বড় বড় বন্দর অবস্থিত। এই দেশের পূর্বতীরের বন্দরসমূহ হইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য চালানো সহজসাধ্য। লণ্ডন ও দক্ষিণাংশের বন্দরসমূহ পৃথিবীর সকল দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে পারে এবং পশ্চিমতীরের বন্দরসমূহের পক্ষে আমেরিকার সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করা সহজসাধ্য।

কৃষিকার্য (Agriculture)—অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বৃটেন প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল এবং লোকসংখ্যা কম থাকায় কৃষিজ দ্রব্যে স্বাবলম্বী ছিল। ক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৃটেনের উপনিবেশ গঠিত হওয়ায় এই দেশ কৃষিকার্যের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব দেখাইতে শুরু করিল। কারণ ইহারা বুঝিতে পারিল যে, উপনিবেশ হইতে সস্তায় কৃষিজ দ্রব্য আনা যায় এবং শিল্পদ্রব্য ঐ সকল দেশে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করা যায়। সেইজন্য বহু কৃষিক্ষেত্র শিল্পের ও পশুপালনের স্থান করিয়া দিল। ইহা ছাড়া এখানকার প্রচুর কয়লাসম্পদও এই দেশকে শিল্পোন্নয়নে উৎসাহিত করিয়াছে। বর্তমানে শিল্পোৎপাদনের তুলনায় এখানকার কৃষিকার্যের গুরুত্ব অনেক কম। এই

দেশের মোট শিল্পোৎপাদনের মূল্য প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা ; কিন্তু মোট কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ; অর্থাৎ কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনের (মূল্য হিসাবে) প্রায় $\frac{1}{15}$ ভাগ। বর্তমানে এই দেশের মোট চাহিদার মাত্র এক-চতুর্থাংশ কৃষিজ দ্রব্য এখানে উৎপন্ন হয়। বাকী অংশ বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা খুব কষ্টসাধ্য ছিল। সেইজন্য মহাযুদ্ধের সময় ও ইহার পরে অধিকতর কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের দিকে নজর দেওয়া হয়। কিন্তু দেশের কৃষির উপযোগী উর্বর জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম বলিয়া এই প্রচেষ্টা খুব সার্থক হয় নাই।

কৃষি-জমির স্বল্পতার জন্য এখানকার চাষীরা হেক্টর-প্রতি অধিক শস্য উৎপাদন করে। এখানে কৃষি-জমিতে অত্যধিক সার দেওয়া হয় এবং আধুনিক কৃষি-যন্ত্রপাতি ও ভালো বীজ ব্যবহার করা হয়। ইহার ফলে এখানে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বেশী হয়।

হেক্টর-প্রতি উৎপাদন (কিলোগ্রাম)

গম	৩,৫৩০	বীট	১৬,৫৬৩
যব	৩,১৫৭	যই	২,৬৫৮

বৃটেনের একই জমিতে প্রতিবৎসর শস্য পরিবর্তন (Crop rotation) করিয়া চাষ করা হয়। একই জমিতে পাঁচ বৎসরে পাঁচটি শস্য রোপণ করা হয়। ইহা উৎপাদন-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বৃটেনের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের সমতলভূমির মৃত্তিকা কৃষিকার্যের বিশেষ উপযোগী। স্কটল্যাণ্ডের পূর্বাংশেও কৃষিকার্য হইয়া থাকে। পশ্চিমাংশে পাহাড়-পর্বত ও উচ্চভূমি থাকায় এবং অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য বড় বড় ঘাসের সৃষ্টি হয়। সেইজন্য এই অংশের অধিকাংশ স্থানে পশুপালন হইয়া থাকে। এই অংশে কৃষিকার্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই।

পূর্ব ইংল্যাণ্ডের জলবায়ু ও মৃত্তিকা গম-চাষের অনুকূল বলিয়া লিঙ্কন, নরফোক, সাফোক, এসেক্স এবং বেডফোর্ডশায়ারের শুষ্ক জলবায়ুতে গমের চাষ হইয়া থাকে। এই সকল অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে গমচাষের উপযোগী উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত পাওয়া যায়। স্কটল্যাণ্ডের পূর্বাংশেও কিছু গমের চাষ হয়। যব ও গম চাষের উপযোগী জলবায়ু একই প্রকার হওয়ায় এই সকল

অঞ্চলে যবের চাষও হইয়া থাকে। **যই** অধিকতর ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে বলিয়া স্কটল্যাণ্ডের পূর্বাংশে, উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের নিম্নভূমিতে এবং পূর্ব ইংল্যাণ্ডে ইহার চাষ অধিক হইয়া থাকে। পূর্ব ইংল্যাণ্ডের গমচাষের জমিতে, উত্তর স্রফশায়ার, ফাইফশায়ার ও আয়ারল্যাণ্ডের ব্যারো উপত্যকায় **বীটের** চাষ হয়। ইহা ছাড়া দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে আলু ও ফলের চাষ হইয়া থাকে।

কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩-৬৪)

	কৃষি-জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)		কৃষি-জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)
গম	৭'৮	৩১	যই	৮'১	১৫
যব	১৩৬	৭০	বীট	৩'৪	৫৪

পশুপালন—বৃটেনের সকল স্থানেই কমবেশী **গবাদি পশু** পালিত হয়। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাংস এবং চামড়ার জন্য গবাদি পশু ব্যবহৃত হয়। গবাদি পশু হইতে ডেয়ারী-শিল্প বিভিন্ন অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। কর্ণওয়াল, ডেভন ও সমারসেট অঞ্চলে পনীর তৈয়ার হয়, ওয়েল্‌সের নিম্নভূমি অঞ্চলে দুগ্ধ ও পনীর পাওয়া যায়; চেশায়ার বৃটেনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ডেয়ারী-শিল্পাঞ্চল। অক্সফোর্ডের ডেয়ারী হইতে লণ্ডনে দুগ্ধ প্রেরিত হয়। আয়ারল্যাণ্ডেও ডেয়ারী-শিল্পের উন্নতি হইয়াছে।

বৃটেনের পশু ও প্রাণিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩-৬৪)

গবাদি পশু	১'৬৭ কোটি	দুগ্ধ	১'৩১ কোটি মেঃ টন
মেষ	২'৮১ „	মাংস	১৯'৯ লক্ষ „
শূকর	'৬১ „	ডিম	১৩৩০ কোটি
মুরগী, হাঁস ইত্যাদি	১০'৭১ „	পনীর	১'৭ লক্ষ মেঃ টন

পূর্বে বৃটেন **মেষপালনে** বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহার বহুলাংশে অবনতি হইয়াছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য যে সকল স্থানে কৃষিকার্য সম্ভব নয়, শুধু সেই সকল স্থানে মেষপালন হইয়া থাকে। পেনাইন পর্বতের উভয়দিকে সর্বাপেক্ষা অধিক মেষ পালিত হয়। ইহা ছাড়া ওয়েল্‌স ও স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে এবং আয়ারল্যাণ্ডে মেষ পালিত হয়। লিঙ্কন ও লিসেস্টারে উৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যায়। **শূকর-**

পালনেও এই দেশ মোটামুটি উন্নতি লাভ করিয়াছে। শূকরমাংস এখানকার লোকদের প্রিয় খাদ্য। মোটর-গাড়ীর ব্যবহার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই দেশের **অশ্বের** সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। বর্তমানে অশ্বের সংখ্যা মাত্র ১০ লক্ষ।

মৎস্য-চাষ (Fisheries)—একসময়ে মৎস্য-চাষে বৃটেন পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত। বর্তমানে মৎস্য-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে অষ্টম স্থান অধিকার করে। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত হওয়ায়, শীতল ও উষ্ণ স্রোতের মিলন হওয়ায় এবং শিল্পসমৃদ্ধ জনবহুল ইউরোপীয় দেশসমূহ নিকটবর্তী থাকায় এই দেশে মৎস্যশিল্পের উন্নতি হইয়াছে। দেশের পূর্বদিকে উত্তর সাগরেই অধিকাংশ মৎস্য পাওয়া যায়; এখানকার ডগার্স ব্যাঙ্ক মৎস্য-চাষের জন্য বিখ্যাত। ট্রলার, সিন, ড্রিফ্টার প্রভৃতির সাহায্যে এখানে মৎস্য ধরা হয়। হেরিং, কড্, হ্যাড্ডক ও ম্যাকারেল মৎস্য উত্তর সাগরে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। উইক, এবারডিন, পিটারহেড, স্টোনহ্যাভেন, হাল, গ্রিম্স্বি ও ইয়ারমাউথ বন্দর মৎস্য-শিল্পের ও মৎস্য-রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। ইহার মধ্যে হাম্বার নদীতীরে অবস্থিত গ্রিম্স্বি বন্দর মৎস্য-রপ্তানির জন্য জগদ্বিখ্যাত। হাল বন্দর দূরবর্তী সমুদ্রের মৎস্য-আহরণের ও রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। বৃটেনের পশ্চিম উপকূলে মৎস্য-শিল্প প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে ল্যাঙ্কাশায়ারের ফ্লিটউডে। এখানে হেক্, কড্ ও হ্যাড্ডক মৎস্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ১৯৬৪ সালে এই দেশে প্রায় ১ কোটি মেঃ টন মৎস্য উত্তোলিত হইয়াছে। যদিও বৃটেন মৎস্য-শিল্পে বিশেষ উন্নত, কিন্তু এই দেশকে এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও নরওয়ে হইতে অল্পবিস্তর মৎস্য আমদানি করিতে হয়। এই দেশের আভ্যন্তরীণ জলভাগেও কিছু কিছু মৎস্য পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ডের নদীসমূহে স্যামন, ট্রাউট ও ইল্স্ মৎস্য পাওয়া যায়।

খনিজ সম্পদ (Minerals)

বৃটেন প্রধানতঃ দুইটি খনিজ দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত—কয়লা ও লৌহ আকরিক। এই দুইটি খনিজ পদার্থ পাশাপাশি অবস্থিত হওয়ায় এখানকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সহজেই উন্নতি লাভ করিয়াছে।

কয়লা—মূল্য হিসাবে এই দেশের মোট খনিজ সম্পদের শতকরা ৯০ ভাগ কয়লা। কয়লার প্রাচুর্যের জন্য এখানকার শিল্পোন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

বৃটেনের সঞ্চিত (Reserves) কয়লার পরিমাণ প্রায় ১৯,০০০ কোটি মেঃ টন। ইহার মধ্যে ইংল্যাণ্ডে শতকরা ৬১ ভাগ, স্কটল্যাণ্ডে ১২ ভাগ, ওয়েল্‌সে ২১ ভাগ এবং আয়ারল্যাণ্ডে ৬ ভাগ বিদ্যমান। এখানকার কয়লা শুধু পরিমাণেই বেশী নহে, ইহা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর—অধিকাংশই বিটুমিনাস্‌-জাতীয়।

কয়লা-উৎপাদনে বর্তমানে বৃটেন পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। কয়লাশিল্পে এখানে প্রায় ১০ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। সমুদ্রতীরের নিকটবর্তী অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায় বলিয়া বিদেশে কয়লা রপ্তানি করা ও জাহাজে বোঝাই করা সহজসাধ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বৃটেনের কয়লা-রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪'৬ কোটি মেঃ টন। কিন্তু বর্তমানে বৃটেন প্রতি-বৎসর মাত্র ৩৪ লক্ষ মেঃ টন কয়লা বিদেশে রপ্তানি করে; ইহা মোট রপ্তানির শতকরা ৫ ভাগ এবং মোট উৎপাদিত কয়লার শতকরা ২ ভাগ। এই দেশের মোট উৎপন্ন কয়লার মধ্যে শতকরা ২৪ ভাগ বিদ্যুৎ-উৎপাদনে (বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী ও ট্রামগাড়ী সহ), ১৬ ভাগ ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্পে, ১৫ ভাগ গৃহস্থ-ইন্ধনে, ১১ ভাগ গ্যাস-উৎপাদনে, ২ ভাগ রপ্তানিতে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে শ্রমিকদল সরকারে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময় ১৯৪৬ সালে বৃটেনের কয়লাশিল্প জাতীয়করণ করা হয়। দেশের কয়লা-সম্পদকে জনস্বার্থে ব্যবহারের জন্য এবং আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় কয়লার উত্তোলন-বৃদ্ধির জন্য ইহা জাতীয়করণ করা হয়। দেশের কয়লা-শিল্প দেখাশুনার ভার "জাতীয় কয়লা বোর্ডের" হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। জাতীয়করণের পরে কয়লা-উৎপাদন কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও, বর্তমানে উৎপাদন ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে।

বৃটেনের কয়লা-উৎপাদন (কোটি মেঃ টন)

১৯৪৬	১৮'৯	১৯৫৮	২১'৬
১৯৫৩	২২'৪	১৯৫৯	২০'৬
১৯৫৬	২২'২	১৯৬৩	১৯ ৯

নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে প্রধানতঃ বৃটেনের কয়লা পাওয়া যায়:—

(ক) পেনাইন অঞ্চল—পেনাইন পর্বতের দুইদিকে প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে বৃটেনের মোট কয়লা-উৎপাদনের শতকরা ৫৭ ভাগ উৎপন্ন হয়। পেনাইন পর্বতের পূর্বদিকে নর্দাম্বারল্যাণ্ড, ডারহাম,

ইয়র্কশায়ার, ডার্বিশায়ার, নটিংহামশায়ারের খনিসমূহ অবস্থিত। এই সকল খনি অঞ্চলের নিকটবর্তী স্থানে লৌহ আকরিক পাওয়া যায় বলিয়া এখানে লৌহ ও ইস্পাতশিল্প ও জাহাজ-নির্মাণশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। নটিংহাম ও ইয়র্কশায়ারের কয়লা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় পশমশিল্পের জন্য; লীডস্ ও ব্র্যাডফোর্ডের পশমশিল্প এখানকার কয়লার উপর নির্ভরশীল। পেনাইন পর্বতের পশ্চিমাংশে ল্যাঙ্কাশায়ার ও উত্তর স্টাফোর্ডশায়ারের কয়লাখনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ল্যাঙ্কাশায়ারের কয়লা প্রধানতঃ কার্পাস-বয়নশিল্পের জন্য এবং উত্তর স্টাফোর্ডশায়ারের কয়লা মৃন্ময়শিল্পের জন্য ব্যবহৃত হয়।

(খ) মধ্যসমভূমি অঞ্চল—ইংল্যাণ্ডের মধ্যভাগের সমতলভূমি দক্ষিণ

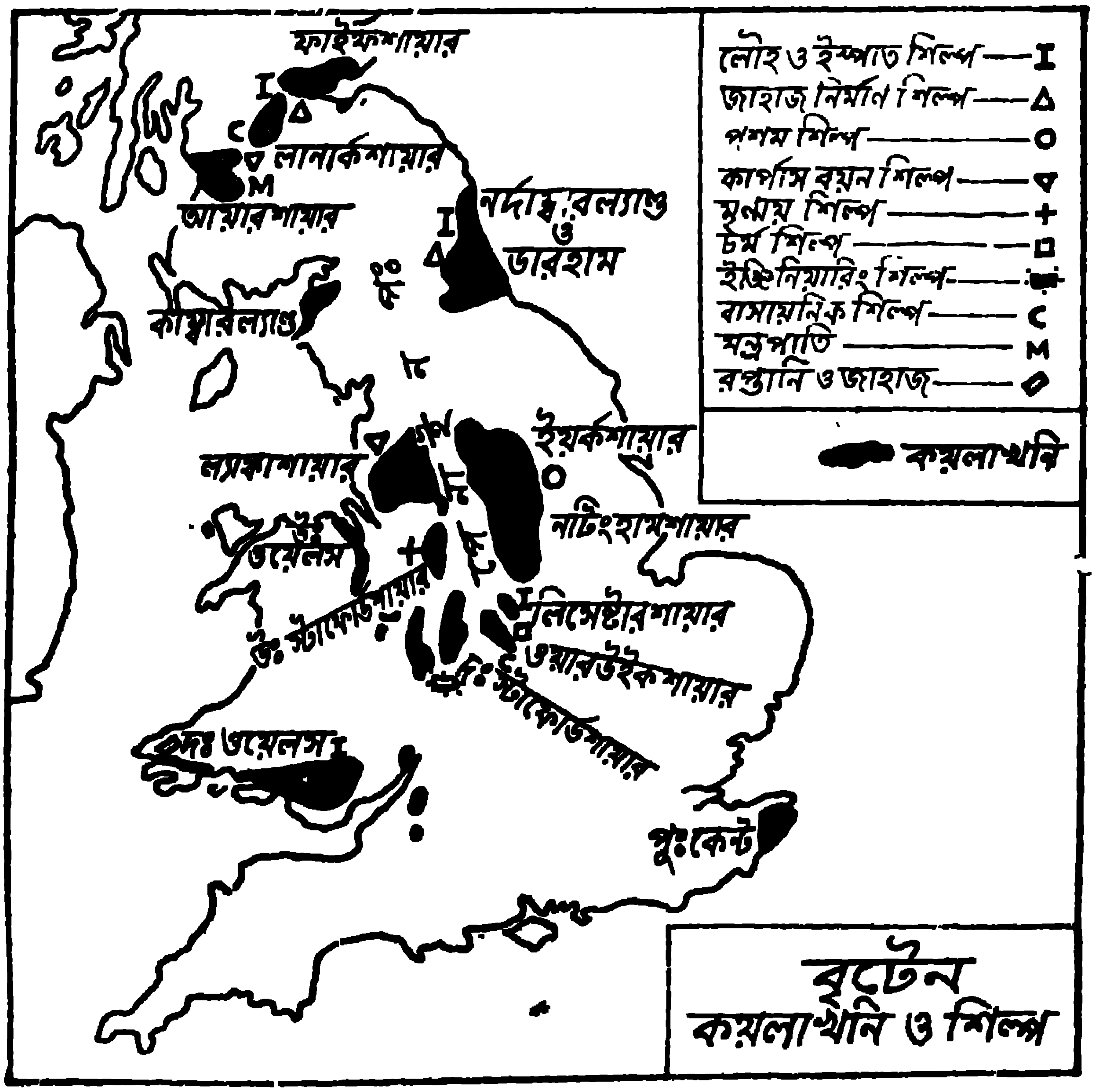

স্থানীয় কয়লার উপর বৃটেনের শিল্পের নির্ভরশীলতা এই মানচিত্রে বিশেষ লক্ষণীয়।

স্টাফোর্ডশায়ার, ওয়ারউইক ও লিসেস্টারশায়ার কয়লাখনির জন্য বিখ্যাত। এই অঞ্চলে বৃটেনের মোট উৎপাদনের শতকরা ১১ ভাগ কয়লা পাওয়া

যায়। এই অঞ্চলের কয়লা প্রধানতঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এখানকার ইস্পাত দ্বারা রেল-ইঞ্জিন হইতে আরম্ভ করিয়া আলপিন পর্যন্ত সকল প্রকার ইস্পাত-দ্রব্য উৎপন্ন হয়। বার্মিংহাম ও কভেন্ট্রির বিখ্যাত ইস্পাতশিল্প এবং নিকটবর্তী স্থানসমূহের চর্মশিল্প ও রাসায়নিক শিল্প এই অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল।

(গ) ওয়েল্‌স অঞ্চল—দক্ষিণ ওয়েল্‌সে বৃটেনের মোট উৎপাদনের শতকরা ১৬ ভাগ কয়লা পাওয়া যায়। উত্তর ওয়েল্‌সেও অল্পবিস্তর কয়লা পাওয়া যায়। দক্ষিণ ওয়েল্‌সের কয়লা সাধারণতঃ জাহাজের জন্য ও রপ্তানির জন্য ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন কারণে বর্তমানে ওয়েল্‌সের কয়লা-রপ্তানি বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে। স্থানীয় ইস্পাতশিল্পেও দঃ ওয়েল্‌সের কয়লা ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) স্কটল্যাণ্ডের মধ্য উপত্যকা—স্কটল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী সমতল-ভূমিতে আয়ারশায়ার, লানার্কশায়ার ও ফাইফশায়ার কয়লাখনিসমূহ অবস্থিত। বৃটেনের মোট উৎপাদনের শতকরা ১৪ ভাগ কয়লা এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। এখানকার কয়লা প্রধানতঃ জাহাজ-নির্মাণশিল্পে ও ইস্পাত-শিল্পে ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় কার্পাস-বয়নশিল্প, রাসায়নিক শিল্প এবং যন্ত্রপাতি-শিল্পও এই অঞ্চলের কয়লার উপর নির্ভরশীল।

লৌহ আকরিক—বৃটেন পৃথিবীতে লৌহ আকরিক-উৎপাদনে সপ্তম স্থান অধিকার করে। ১৯৬৩ সালে বৃটেন ১.৫২ কোটি মেঃ টন লৌহ আকরিক উৎপন্ন করিয়াছিল। এখানকার লৌহ আকরিক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহে। ইহা ছাড়া এই দেশের মোট উৎপাদন স্থানীয় শিল্পের চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নহে। সেইজন্য এই দেশকে প্রতিবৎসর প্রায় ১.২৯ কোটি মেঃ টন লৌহ আকরিক বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ আকরিক এই দেশে আমদানি করা হইত। কিন্তু বর্তমানে লৌহ আকরিক আমদানি হয় প্রধানতঃ স্পেন, সুইডেন, ফ্রান্স, গ্রীস প্রভৃতি দেশ হইতে। বৃটেনের অধিকাংশ লৌহ আকরিক পাওয়া যায় ইয়র্কশায়ারের ক্লীভল্যাণ্ড পর্বতে, লিঙ্কনশায়ারের স্কানটোর্প ও ফোর্ডিংহাম অঞ্চলে এবং উত্তর অক্সফোর্ডের ব্যানবারিতে (৭৫ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। দক্ষিণ ওয়েল্‌সের খনিসমূহ প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে; সেইজন্য এখানকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রধানতঃ স্পেন ও ফ্রান্সের লৌহ আকরিক আমদানির উপর নির্ভরশীল।

বৃটেনের অন্যান্য খনিজ সম্পদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। কর্ণওয়াল প্রদেশে অতি অল্প পরিমাণে সীসা, তাম্র, দস্তা, রাং ও টাংস্টেন পাওয়া যায়। চেশায়ার ও উত্তর-পূর্ব ডারহামে লবণ, কর্ণওয়াল ও ডেভনশায়ারে চীনামাটি, এবারডিন, ডার্টমুর ও আয়ারল্যাণ্ডে গ্রানাইট, উত্তর ওয়েল্‌স ও কর্ণওয়ালে শ্লেট অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

শ্রমশিল্প (Manufacturing Industries)

বৃটেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান দেশ। এই দেশের শিল্পদ্রব্য পৃথিবীর বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। বৃটেনের শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে এই দেশের বিভিন্ন সমৃদ্ধিশালী উপনিবেশ, স্থানীয় কয়লা ও লৌহ আকরিক, স্থানীয় নিপুণ ও কর্মঠ শ্রমিক ও দেশের অবস্থান। এই দেশে শিল্পের বিভিন্ন কাঁচামাল না পাওয়া গেলেও উপনিবেশ হইতে সহজে এই সকল কাঁচামাল কমমূল্যে সংগ্রহ করা যাইত। ভারতীয় তুলা ও পাটের জন্যই বৃটেনের কার্পাস-বয়ন ও পাট শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া বিভিন্ন উপনিবেশে বৃটেনের শিল্পের উৎকৃষ্ট বাজার ছিল। ভারতীয় তুলায় বৃটেনে উৎপন্ন কাপড় পুনরায় ভারতীয় বাজারেই বিক্রয় করা হইত।

বর্তমান অবস্থা—এশিয়ার উপনিবেশসমূহ স্বাধীন হওয়ায় শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহের ও একচেটিয়া বাজারের দেশসমূহ বৃটেন হারাইয়াছে। আফ্রিকার দেশসমূহও স্বাধীনতা পাইতেছে। এইজন্য বৃটেনের শিল্পের চরিত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। শিল্পের উৎপাদন-খরচ কমাইয়া ইউরোপের বাজারে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় বৃটেন বর্তমানে সচেষ্ট হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে (European Common Market) বৃটেন যোগদান করিতেছে। চিরাচরিত উপানবেশের বাজার সে আজ উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে। কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যাপারেও বৃটেন আজ নির্ভর করিতেছে ইউরোপীয় দেশসমূহ, আমেরিকা ও আফ্রিকার পরাধীন দেশসমূহের উপর। লৌহ আকরিক আসিতেছে স্পেন, সুইডেন, ফ্রান্স ও গ্রীস হইতে। তুলা আসিতেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকার প্রাক্তন উপনিবেশসমূহ (কেনিয়া, উগাণ্ডা ও ট্যাঙ্গানাইকা) হইতে। পশম আমদানি হইতেছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও আর্জেন্টিনা হইতে।

বৃটেনের শিল্পদ্রব্যের সুনাম এখনও সর্বত্র বিদ্যমান। মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে আজও বৃটেনের আধিপত্য আছে। এশিয়া ও আফ্রিকার লোকেরা এখনও পাইলে এই দেশের শিল্পদ্রব্য কিনিয়া থাকে। কিন্তু এশিয়ায় বিভিন্ন দেশের স্থানীয় শিল্প সংরক্ষণের জন্য বৃটেনের ভোগ্যদ্রব্য বেশী পরিমাণে ঐ সকল দেশে আমদানি হয় না। সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহে শিল্পোন্নয়নের কাজ শুরু হওয়ায় বৃটেনের ঐ সকল দেশে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য রপ্তানি করিতে সমর্থ হইতেছে, কিন্তু এই সকল দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে, বৃটেনের যন্ত্রপাতি-রপ্তানিও কমিয়া যাইবে। তখন এই দেশকে তাহার শিল্পের কাঠামোকে নূতন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। এই সকল কারণে বৃটেন আজও আফ্রিকায় উপনিবেশগুলি রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে এবং এই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সহিত জড়াইয়া ফেলিতেছে।

বৃটেনের বহুবিধ শিল্পের মধ্যে ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি, জাহাজ-নির্মাণ, কার্পাস-বয়ন ও রাসায়নিক শিল্প সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে; কিন্তু অধিকাংশ কাঁচামাল বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয় বলিয়া এই দেশের শিল্প সাধারণতঃ কয়লাখনির নিকটে অবস্থিত।

বৃটেন বর্তমানে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য আণবিক শক্তির উৎপাদক। এই দেশের কাম্বারল্যাণ্ডে আণবিক শক্তির উৎপাদনকেন্দ্রটি অবস্থিত। উহার নাম ক্যানুডার হল নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন। এই কেন্দ্রের উৎপাদিত শক্তি মনুষ্য-হিতকরকার্যে ব্যবহৃত হয়।

বৃটেনের শিল্পোৎপাদন (১৯৬৩)

(লক্ষ মেঃ টন)

ইস্পাত	২২৯	মোটর-গাড়ী (লক্ষ)	১৮.৯
কার্পাস-বস্ত্র	১.৫৩	জাহাজ (লক্ষ GRT)	৯.৪
বীট-চিনি	৮.২	পশম-বস্ত্র (সুতা)	২.৫

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—ইস্পাতশিল্পে বৃটেন একসময় পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত; কিন্তু বর্তমানে ইহা চতুর্থ স্থান অধিকার করে। উৎকৃষ্ট কয়লা ও লৌহের পাশাপাশি অবস্থান, পেনাইন অঞ্চলের চুনাপাথর,

শিল্পাঞ্চলের নিকটবর্তী উৎকৃষ্ট বন্দর এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। ইহা ছাড়া সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল দেশ বলিয়া এখানকার আভ্যন্তরীণ চাহিদা অত্যন্ত বেশী; বৈদেশিক বাজারেও এই দেশের আধিপত্য বিদ্যমান। এই সকল কারণে এই দেশ ইস্পাতশিল্পে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইস্পাত-উৎপাদনের তুলনায় লৌহ আকরিকের উৎপাদন অনেক কম বলিয়া এই দেশকে সুইডেন, ফ্রান্স, স্পেন ও গ্রীস হইতে লৌহ আকরিক আমদানি করিতে হয়।

যদিও পূর্বে অধিকাংশ ইস্পাতশিল্প কয়লাখনি ও লৌহখনির নিকটে গড়িয়া ওঠে, কিন্তু বর্তমানে বিদেশ হইতে লৌহ, টুকরা লৌহ প্রভৃতি আমদানি করিতে হয় বলিয়া এবং শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিতে হয় বলিয়া, বহু ইস্পাতশিল্প সমুদ্রতীরের শহরসমূহে গড়িয়া উঠিতেছে।

১৯৫৩ সালে এই শিল্পের রক্ষণাবেক্ষণের ভার একটি বোর্ডের হাতে দেওয়া হয়। ইস্পাতের মূল্য-নির্ধারণ, সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও কাঁচামালের সুবন্দোবস্ত করার দায়িত্ব এই বোর্ডকে পালন করিতে হইতেছে। বর্তমানে এই শিল্পের উৎপাদন-বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে; আশা করা যায়, ১৯৬৫ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটি ৯০ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে। ইস্পাতশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশে বিভিন্ন যন্ত্রশিল্প, জাহাজ-নির্মাণশিল্প, রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণশিল্প, কার্পাস-বয়নের যন্ত্রশিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

বৃটেনের প্রধানতঃ পাঁচটি অঞ্চলে ইস্পাতশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে:— ১

(ক) **উত্তর-পূর্ব উপকূল**—টাইন, উইয়ার ও টি নদীর মুখে অবস্থিত হার্টলপুল, মিড্‌ল্‌স্‌বরো ও ডার্লিংটনে এদেশের সর্বাপেক্ষা বেশী লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের নিকট বৃটেনের প্রধান প্রধান লৌহখনি-সমূহ অবস্থিত। ইহা ছাড়া সুইডেন হইতে বিভিন্ন বন্দর মারফত এই অঞ্চলে লৌহ আমদানি করা সহজ। দক্ষিণ ডারহামের উৎকৃষ্ট কয়লা এখনকার ইস্পাতশিল্পে ব্যবহৃত হয়। পেনাইন পর্বতের চুনাপাথর ও জল এই অঞ্চলের ইস্পাতশিল্পে ব্যবহৃত হয়। এই অঞ্চলের হার্টলপুল জাহাজ-নির্মাণের জন্য, ডার্লিংটন রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণের জন্য এবং নিউক্যাস্‌ল্‌ আধুনিক ডিজাইনের জাহাজ-নির্মাণের জন্য বিখ্যাত।

(খ) **ব্ল্যাক কান্ট্রি অঞ্চল**—বার্মিংহাম, কভেন্ট্রি, ডাড্‌লি, রেড্‌ডিচ প্রভৃতি শহর এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চল বৃটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

ইস্পাত-শিল্পাঞ্চল। স্থানীয় লৌহ আকরিক, কাষ্ঠ ও চুনাপাথর স্থানীয় শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। সমুদ্রোপকূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত হওয়ায় পরিবহণ-খরচ কিছু বেশী হয় বলিয়া এই অঞ্চলে প্রধানতঃ মূল্যবান্ ক্ষুদ্রাকার জিনিসপত্র উৎপন্ন হয়। বার্মিংহাম মোটর-গাড়ী, সাইকেল, রেলের

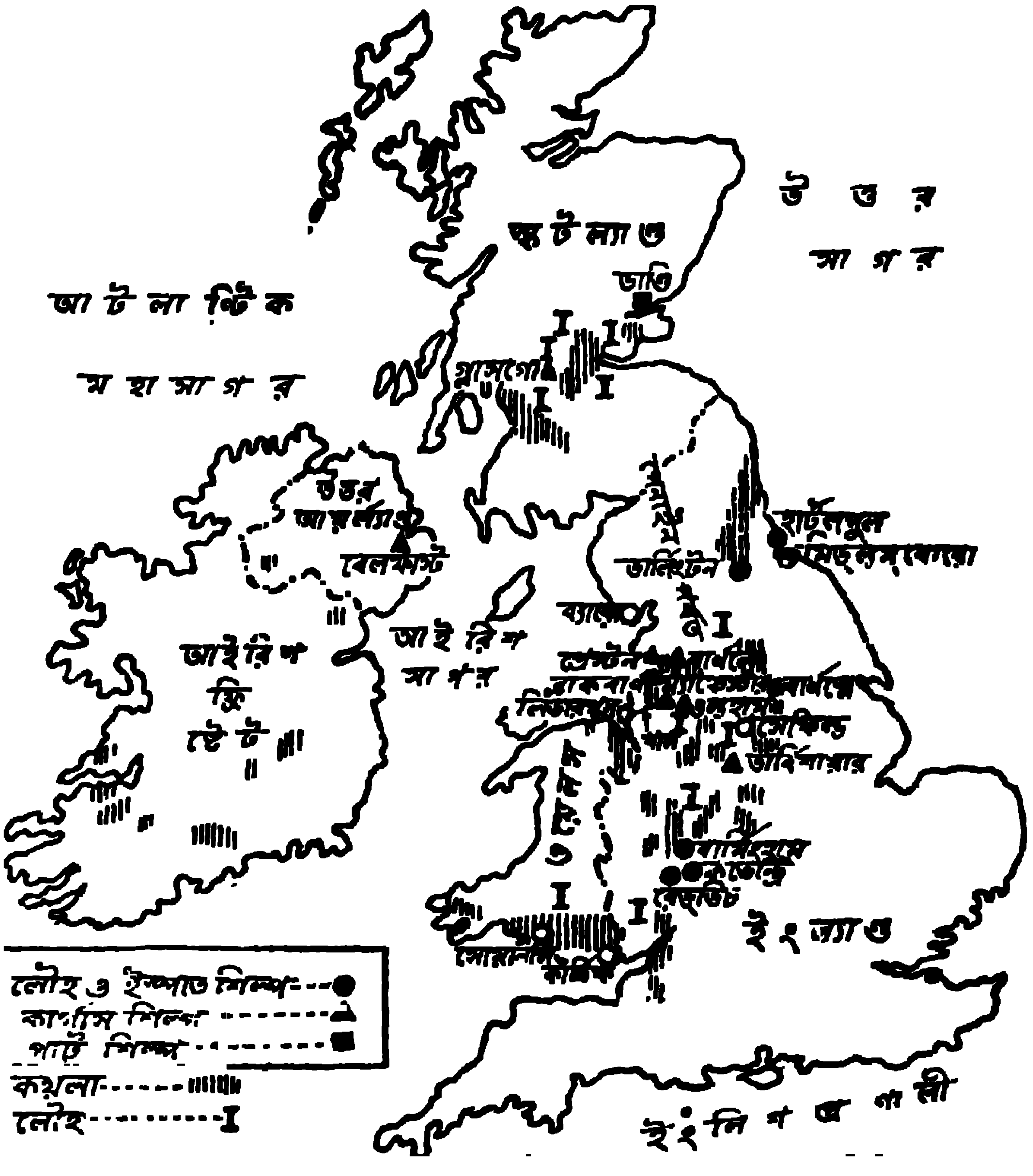

মানচিত্রে কয়লা ও লৌহের পাশাপাশি অবস্থান লক্ষণীয়।

যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত; মোটর-গাড়ী ও সাইকেলের জন্য কভেন্টি, সূচের জন্য রেডিচ এবং শিকলের জন্য ডাড্‌লি বিখ্যাত।

(গ) **শেফিল্ড**—এই অঞ্চলের ইস্পাতশিল্পের গোড়ার দিকে স্থানীয় লৌহ আকরিক, কাষ্ঠ ও জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ আকরিক লিঙ্কনশায়ার ও সুইডেন হইতে আনা হয়। শেফিল্ডে ভারী ও

লঘু উভয় জাতীয় ইস্পাতই উৎপন্ন হয়। ম্যাঙ্গানিজ-ইস্পাত, ক্রোমিয়াম-ইস্পাত, টাংস্টেন-ইস্পাত প্রভৃতি ভারী ধরনের ইস্পাত এখানে উৎপন্ন হয়। ছুরি-কাঁচির জন্যও শেফিল্ড জগদ্বিখ্যাত। এই অঞ্চলের অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের নাম রথারহাম ও চেস্টারফিল্ড।

(ঘ) **স্কটল্যাণ্ডের মধ্য-সমভূমি**—এই অঞ্চলের ইস্পাত প্রধানতঃ জাহাজ-নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। গ্লাসগো এই অঞ্চলের বিখ্যাত ইস্পাত ও জাহাজ-নির্মাণ-শিল্পকেন্দ্র।

(ঙ) **দক্ষিণ ওয়েল্‌স**—এই অঞ্চলের ইস্পাত হইতে প্রধানতঃ টিনের পাত এবং পাইপ প্রস্তুত হয়। স্পেন ও আলজেরিয়া হইতে এই অঞ্চলে লৌহ আকরিক এবং মালয়, বলিভিয়া ও নাইজেরিয়া হইতে এখানে টিন আমদানি করা হয়। সোয়ান্‌সি, লান্‌লে ও কার্ডিফ এই অঞ্চলের উল্লেখ-যোগ্য ইস্পাতশিল্পকেন্দ্র।

ইহা ছাড়া ইংল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে ব্যারো অঞ্চলে ইস্পাত ও জাহাজ-নির্মাণশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

জাহাজ-নির্মাণশিল্প—বহু শতাব্দী ধরিয়া এই শিল্পে বৃটেন পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু বর্তমানে জাপানেব পরে বৃটেনের স্থান। ১৯৬৩ সালে এই দেশে ৯'৪ লক্ষ GRT জাহাজ নির্মিত হইয়াছে। এই শিল্পের উন্নতির জন্য যে-সকল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রয়োজন তাহা বৃটেনে বিদ্যমান। (ক) ভগ্ন সৈকতরেখা, পরিবহণের উপযোগী নদী ও সমুদ্রোপকূলে জাহাজ নামাইবার উপযুক্ত স্থান ও জলের গভীরতা জাহাজ-নির্মাণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। (খ) জাহাজ-নির্মাণের উপযোগী ইস্পাত, কয়লা, কাঠ প্রভৃতি স্থানীয় ইস্পাতশিল্প ও বনভূমি হইতেই পাওয়া যায়। (গ) এই শিল্পের জন্য প্রচুর মূলধন প্রয়োজন; এই বিষয়ে বৃটেনের কোনও অসুবিধা নাই। (ঘ) ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তারের ফলে এই দেশে জাহাজের চাহিদার কোন অভাব নাই। বর্তমানে এই শিল্পে প্রায় ২ লক্ষ ৫ হাজার শ্রমিক কাজ করে।

প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে যখন বৃটেনের টেম্‌স্ নদীর উপকূলে লণ্ডনে প্রথম জাহাজ-নির্মাণশিল্প গড়িয়া ওঠে, তখন স্থানীয় ও আমদানীকৃত কাঠের সাহায্যে জাহাজ নির্মাণ করা হইত। এই সময় জাহাজ-নির্মাণে ইস্পাতের প্রয়োজন ছিল না; সেইজন্য নদীর মোহনায় বনভূমির নিকট এই শিল্প

গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে যখন ইস্পাতের সাহায্যে জাহাজ-নির্মাণের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইল, তখন এই শিল্প দেশের উত্তরাঞ্চলের ইস্পাতশিল্পের নিকটবর্তী অঞ্চলে স্থানান্তরিত হইল। ১৯১১ সালের পরে লণ্ডনে আর কোনও জাহাজ নির্মিত হয় নাই। বৃটেনের জাহাজ-নির্মাণশিল্প প্রধানতঃ ৫টি অঞ্চলে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। যথা—

(ক) স্কটল্যাণ্ডের ক্লাইড নদীর উপত্যকায় গ্লাসগো অঞ্চল।

(খ) উত্তর-পূর্ব উপকূলের টাইন, উইয়ার ও টিজ্ নদীর মোহনা।

(গ) ব্যারো অঞ্চল।

(ঘ) উত্তর-পশ্চিম উপকূলের বার্কেনহেড অঞ্চল।

(ঙ) উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বেলফাস্ট অঞ্চল।

(ক) **স্কটল্যাণ্ডের** ক্লাইড নদীর উপত্যকায় বৃহদাকার যাত্রিবাহী জাহাজ ও যুদ্ধ-জাহাজ নির্মিত হইয়া থাকে। এখানকার গ্লাসগো বন্দর জাহাজ-নির্মাণের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। উপকূলভাগের গভীরতা, সুন্দর পোতাশ্রয় এবং কয়লা ও ইস্পাতশিল্পের নিকটবর্তিতা গ্লাসগোর জাহাজ-নির্মাণশিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে; বৃটেনের অধিকাংশ জাহাজ এই অঞ্চলে নির্মিত হইয়া থাকে। (খ) **উত্তর-পূর্ব উপকূলে** নিউক্যাস্‌ল, স্যাণ্ডারল্যাণ্ড, দক্ষিণ শীল্ডস্, হার্টলপুল, মিড্‌ল্‌স্‌বরো প্রভৃতি বিখ্যাত জাহাজ-নির্মাণকেন্দ্র। স্থানীয় ইস্পাতশিল্প ও কয়লা এবং উপকূলভাগের জলভাগের স্বাভাবিক গভীরতা এই অঞ্চলের জাহাজ-নির্মাণশিল্পের উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। (গ) **ব্যারো অঞ্চলে** প্রধানতঃ মালবাহী জাহাজ, সাবমেরিণ ও যুদ্ধ-জাহাজ নির্মিত হইয়া থাকে। (ঘ) উত্তর-পূর্ব উপকূলের **বার্কেনহেডে** যাত্রিবাহী জাহাজ, যুদ্ধ-জাহাজ ও ড্রেজার নির্মিত হইয়া থাকে। (ঙ) উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের **বেলফাস্টে** এই শিল্প সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

কার্পাস-বয়নশিল্প—একসময়ে বৃটেন কার্পাসশিল্পে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত। কিন্তু জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত প্রতিযোগিতা, কাঁচামালের অপ্রতুলতা, শ্রমিকের মজুরি-বৃদ্ধি এবং উপনিবেশসমূহ হারাইবার ফলে এই শিল্পের অবনতি হইয়াছে। বর্তমানে এই দেশ কার্পাস-বস্ত্র-উৎপাদনে **অষ্টম** স্থানে নামিয়া গিয়াছে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র-উৎপাদনে এবং রপ্তানি-বাণিজ্যে এখনও বৃটেন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

এই দেশের কার্পাসশিল্পের উন্নতির মূলে নিম্নলিখিত কারণসমূহ বিদ্যমান

ছিল। (ক) উপনিবেশসমূহ শিল্পে উন্নত না হওয়ায় এই সকল স্থান হইতে **কাঁচা তুলা** সংগ্রহের ও ঐ সকল উপনিবেশে বস্ত্রাদি বিক্রয় করিবার সুযোগ ছিল। (খ) বৃটেনের **জাহাজ-নির্মাণশিল্প** উন্নতি লাভ করায় এই সকল কাঁচামাল ও বস্ত্রাদি পরিবহণে কোন অসুবিধা ছিল না। (গ) ল্যাঙ্কাশায়ারের

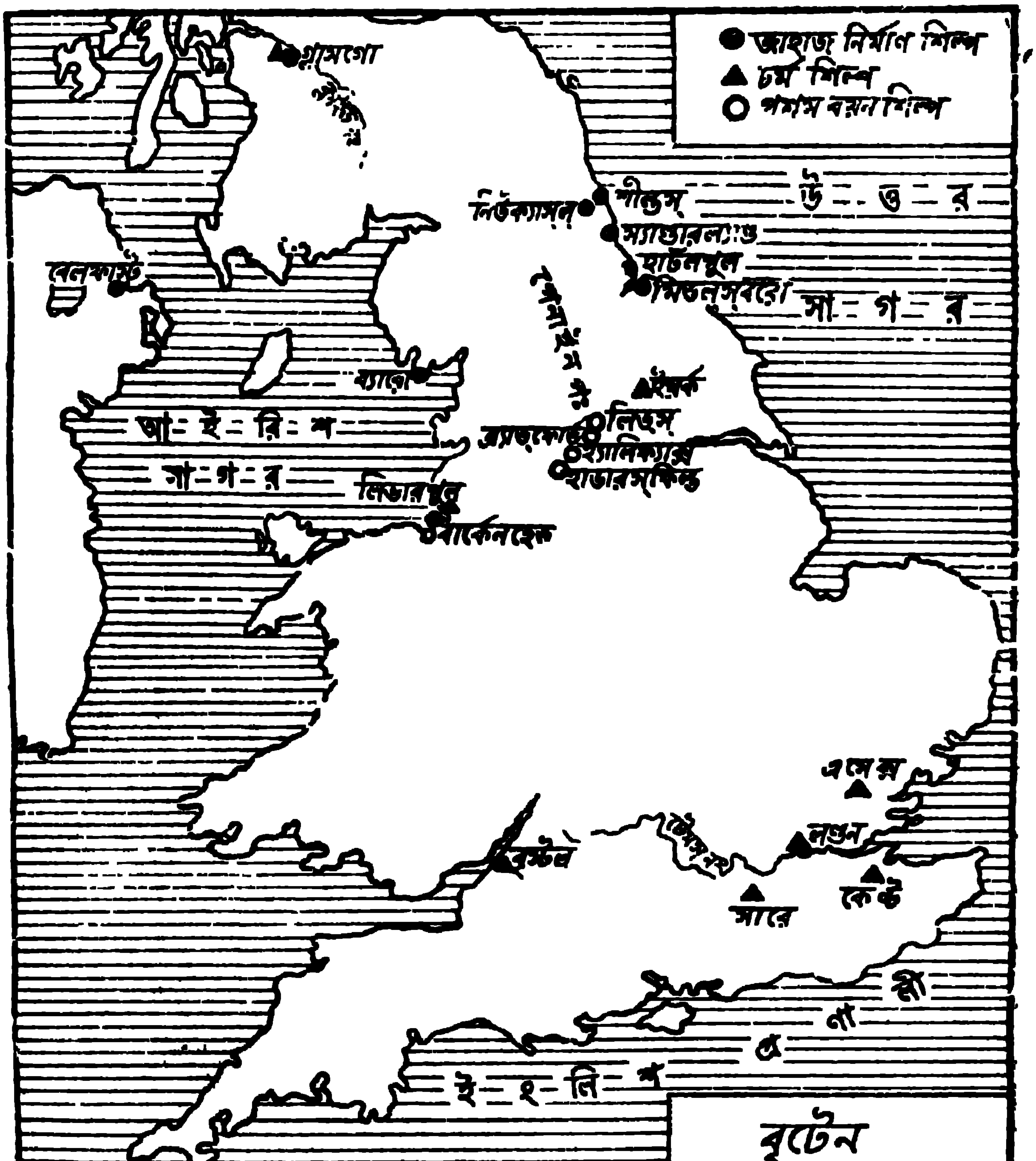

জলবায়ু আর্দ্র হওয়ায় মিহি সূতা প্রস্তুতের সুবিধাও এই শিল্পের উন্নতির একটি প্রধান কারণ। (ঘ) স্থানীয় কয়লা এই শিল্পের উন্নতির অন্যতম কারণ। (ঙ) এই দেশে **বৈজ্ঞানিক** ও **কারিগরী** বিদ্যার উন্নতির ফলে নূতন নূতন কার্পাস-বয়নযন্ত্র আবিষ্কৃত হইতে থাকে। ইহার ফলে এই দেশেই প্রথম বৃহদাকার ও আধুনিক কার্পাস-বয়নশিল্পের শুরু হয়।

(চ) **ইউরোপের যুদ্ধ** ও রাজনৈতিক গোলযোগের দরুন বৃটেন সহজেই এই শিল্পের চাহিদা বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছিল।

বৃটেনের **ল্যাঙ্কাশায়ারে** প্রধানতঃ এই শিল্পের একদেশীভবন হইয়াছে। এই দেশের কার্পাসশিল্পে নিযুক্ত মোট ৩০০,০০০ শ্রমিকের শতকরা ৮০ জন ল্যাঙ্কাশায়ারে কাজ করে। এই সকল শ্রমিকের দুই-তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোক।

নিম্নলিখিত কারণসমূহ ল্যাঙ্কাশায়ারের কার্পাস-বয়নশিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে :—(১) মিহি সুতা পাকাইবার উপযোগী আর্দ্র জলবায়ু এই

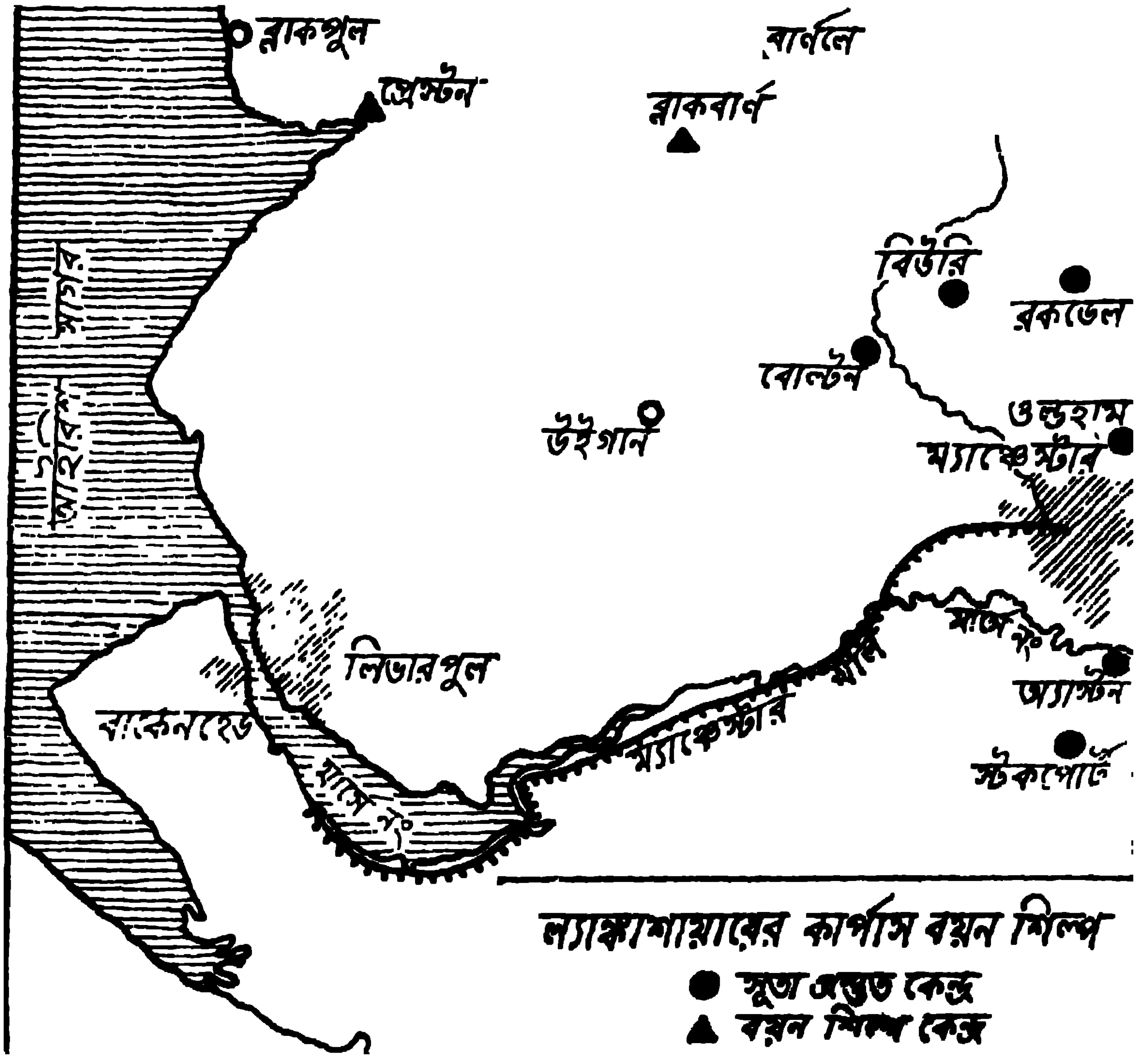

অঞ্চলে বিদ্যমান। (২) ল্যাঙ্কাশায়ারের লিভারপুল বন্দর মারফত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে তুলা আমদানি করা হয়; ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বৃটেনের নিকটতম বন্দর। (৩) স্থানীয় কয়লা এই শিল্পের প্রথমাবস্থায় খুব উপকারে আসিয়াছিল। (৪) স্থানীয় লোকের নিপুণ অভিজ্ঞতা, (৫) ম্যাঞ্চেস্টার খাল কাটিয়া লিভারপুলের সহিত ম্যাঞ্চেস্টারের যোগাযোগ এবং (৬) যন্ত্র-শিল্পের উন্নতিও এই অঞ্চলের কার্পাসশিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে।

বৃটেনে **তুলা** মোটেই উৎপন্ন না হওয়ায় শিল্প সম্পূর্ণভাবে আমদানীকৃত তূলার উপর নির্ভরশীল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল, সুদান, পেরু, মিশর, ভারত প্রভৃতি দেশ হইতে এদেশে তূলা আমদানি করিয়া কার্পাস-বয়নশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। এই সকল দেশে বিশেষতঃ ভারতে কার্পাস-বয়নশিল্পের উন্নতি হওয়ায় বর্তমানে তূলা আমদানি করিতে বৃটেনকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। সেইজন্য বর্তমান পৃথিবীতে এই শিল্পে বৃটেন অষ্টম স্থানে নামিয়া আসিয়াছে।

ম্যাঞ্চেস্টারের দক্ষিণে অবস্থিত অ্যাস্টন ও স্টকপোর্ট এবং উত্তরে অবস্থিত রকডেল, ওল্ডহাম, বোল্টন, বিউরি প্রভৃতি শহর কার্পাস-সূতা-প্রস্তুতে এবং আরও উত্তরে অবস্থিত ব্লাকবার্ণ, বার্ণলে ও প্রেস্টন শহর বস্ত্রবয়নে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চল ছাড়া গ্লাসগো, ডার্বিশায়ার, বেলফাস্ট প্রভৃতি শহরও এই শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

পূর্বে এই দেশ প্রচুর পরিমাণে বস্ত্রাদি **রপ্তানি** করিত। বর্তমানে এই রপ্তানির পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। এমনকি, ভারত প্রভৃতি দেশ হইতে বৃটেনকে বস্ত্রাদি আমদানি করিতে হয়। বর্তমানে রপ্তানীকৃত বস্ত্রাদির মধ্যে উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদিই প্রধান। জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে বৃটেনের অনেক বাজার অধিকার করিয়াছে। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ভারত ও চীন প্রচুর পরিমাণে বস্ত্রাদি বৃটেন হইতে আমদানি করিত। তাহারা এখন স্বাবলম্বী হওয়ায় এই দুইটি দেশও বৃটেনকে হারাইতে হইয়াছে। নিম্নের সংখ্যাসমূহ হইতে বৃটেনের অধোগতি লক্ষ্য করা যাইবে:

কার্পাস-শিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি

(কোটি বর্গগজ)

সাল	পৃথিবীর মোট রপ্তানি	বৃটেন	জাপান
১৯২৮	৮৫৫	৩৯৪	১৩৭
১৯৩৮	৬৪৫	১৭২	২৫১
১৯৫০	৫৬০	৮২	১১০
১৯৫৬	×	৪৭	১২৬
১৯৬৪	×	২১	×

বর্তমানে বৃটেন কার্পাস-বস্ত্র রপ্তানি করে প্রধানতঃ ইউরোপীয় দেশসমূহে, আফ্রিকার দেশসমূহে এবং কিছু পরিমাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহে।

বর্তমানে বৃটেনের কার্পাসশিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে প্রধানতঃ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্রাদির উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ মোটা কাপড়ের উৎপাদনে প্রাচ্যের দেশসমূহ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

পশম-বয়নশিল্প—এই শিল্প বৃটেনের একটি অতি পুরাতন শিল্প। এই শিল্প হইতে বৃটেনের প্রচুর অর্থাগম হইয়া থাকে। ইয়র্কশায়ারে এই শিল্পের একদেশীভবন হইয়াছে। পেনাইন পর্বতের মেষ, পশম ধুইবার জন্য পেনাইন পর্বতের জলের সরবরাহ, স্থানীয় কয়লা, সমুদ্রের নৈকট্য, উপযুক্ত নিপুণ শ্রমিক ও অনুকূল জলবায়ুর জন্যই ইয়র্কশায়ারে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইয়র্কশায়ারের লিডস্, ব্র্যাড্ফোর্ড, হ্যালিফ্যাক্স ও হাডারস্ফিল্ড প্রভৃতি শহর এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত। পেনাইন পর্বত, ওয়েল্স ও স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমিতে মেষচারণ হইলেও স্থানীয় পশমের উৎপাদন এত কম যে, দেশের মোট চাহিদার শতকরা ৯০ ভাগ এখনও অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি করিতে হয়; এই সকল দেশের অধিকাংশ পশম বৃটেনে রপ্তানি হয়। বৃটেন বর্তমানে পৃথিবীর রপ্তানিযোগ্য পশমের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আমদানি করে। অন্যদিকে বৃটেন হইতে প্রচুর পরিমাণে পশম-দ্রব্য জার্মানী, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, স্পেন, ইটালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে রপ্তানি হয়।

চর্মশিল্প—এই শিল্পে বৃটেন পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। প্রায় এক কোটি মেষশাবকের চামড়া ও সেই পরিমাণে বাছুরের চামড়া এই শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া প্রায় ২৫ লক্ষ গবাদি পশুর চামড়া স্থানীয় পশুপালন-শিল্প হইতে পাওয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও বহু চামড়া ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি করা হয়। বৃটেনের চর্মশিল্পে প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার শ্রমিক কাজ করে। লণ্ডন, বৃস্টল, লিভারপুল, গ্লাসগো প্রভৃতি শহর চর্মশিল্পের জন্য বিখ্যাত। ইহা ছাড়া ইয়র্কশায়ার, এসেক্স, কেণ্ট ও সারে অঞ্চলে ভারী চামড়ার কাজ হয়। জুতা-প্রস্তুতে বৃটেন পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

রেশমশিল্প প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে ডার্বিশায়ার, চেশায়ার ও স্টাফোর্ডশায়ারে। এখানে রেশম ও রেয়ন উভয় শিল্পই বিদ্যমান। চীন, জাপান ও ভারত হইতে রেশমের গুটি বৃটেনে আমদানি হইয়া থাকে।

বর্তমানে রেশম-দ্রব্য অপেক্ষা রেয়নের কাপড় অধিক উৎপন্ন হয়। এখনও ইটালি হইতে এই দেশ রেশম-দ্রব্য আমদানি করে।

পাকিস্তান হইতে পাট আমদানি করিয়া এই দেশের ডাণ্ডি ও বার্ণস্লে শহরে **পাটশিল্প** চালিত হয়। এই সকল শিল্প ছাড়াও বৃটেনে রসায়নশিল্প, রবারশিল্প, ঔষধ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি শিল্প সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

পরিবহণ-ব্যবস্থা (Communications)—কোনও দেশের শিল্পোন্নতির জন্য পরিবহণ-ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। বৃটেনের শিল্পোন্নতির জন্য এই দেশের পরিবহণ-ব্যবস্থার অবদান কম নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রেলপথের মধ্যে এই দেশে হেক্টর-প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশী **রেলপথ** আছে। বৃটেনের রেলপথের দৈর্ঘ্য ৩৩,৭২০ কিলোমিটার। যদিও এই দেশে অধিকাংশ রেলগাড়ী বাষ্পীয় ইঞ্জিনে চালানো হয়, কিন্তু এখানকার ডিজেল ও বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীর সংখ্যাও কম নহে। দক্ষিণাংশের অধিকাংশ স্থানে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী দেখা যায়। এই দেশে প্রতিবৎসর প্রায় ২৫ কোটি টন পণ্যদ্রব্য রেলপথে চালিত হয়। ১৯৪৮ সালে এই দেশের রেলপথ জাতীয়করণ করা হয়।

আয়তনের তুলনায় এই দেশে বহু **রাস্তাঘাট** আছে—প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ১'৪ কিলোমিটার বড় পাকা রাস্তা আছে। আয়তনের তুলনায় এই দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক মোটর-গাড়ী আছে। এখানকার মোটর-গাড়ীর সংখ্যা ৮৫ লক্ষ।

আভ্যন্তরীণ **জলপথে** এই দেশ বিশেষ উন্নত না হইলেও, ছোট ছোট নদী ও খালের সাহায্যে এদেশের বিভিন্ন বন্দরের সঙ্গে দেশের অভ্যন্তর-ভাগকে সংযুক্ত করা হইয়াছে। রেলপথ ও স্থলপথের তুলনায় এদেশের আভ্যন্তরীণ জলপথে অল্প পরিমাণে মালপত্র প্রেরিত হয়। এই দেশে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খাল মারফত বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য প্রেরিত হয়। তন্মধ্যে ল্যাঙ্কা-শায়ার খাল, লীডস্ ও লিভারপুল খাল, ম্যাঞ্চেস্টার খাল, লী, ট্রেণ্ট, শেফিল্ড ও দক্ষিণ ইয়র্কশায়ার খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্কটল্যাণ্ডে ক্যালি-ডোনিয়ান খাল ইনভারনেস্ ও ফোর্ট উইলিয়ামকে যুক্ত করিয়াছে। এই দেশে প্রায় ৪,২০০ কিলোমিটার খাল আছে। ১৯৪৭ সালে এই দেশে একটি 'পরিবহণ-কমিশন' গঠিত হয়। এই কমিশন দেশের পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের বন্দোবস্ত করিতেছে।

বৃটেনের **বিমানপথ** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাতীয়করণের পর এই দেশের বিমানপথের আরও উন্নতি হইয়াছে। দুইটি বিমানপোত প্রতিষ্ঠানের মারফত এই দেশের বিমানপথ পরিচালিত হয়। ইহাদের নাম—বৃটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন (B. O. A. C.) এবং বৃটিশ ইউরোপিয়ান এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন (B. E. A. C.)। উত্তর ও দক্ষিণ আটলান্টিক, পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান, ভারত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, অস্ট্রেলিয়া ও দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহে B. O. A. C.-র মাধ্যমে এবং ইউরোপ, ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহ ও বৃটেনের অভ্যন্তরভাগে B. E. A. C.-র মাধ্যমে বিমান চালিত হয়।

এই দেশে প্রায় ১০০-টির বেশী বিমাবন্দর আছে। এর মধ্যে লণ্ডন, প্রেস্টউইক্, লিভারপুল, বেলফাস্ট, গ্লাসগো, ম্যাঞ্চেস্টার, বার্মিংহাম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দেশে বিমানপথে প্রতিবৎসর প্রায় ৫০ লক্ষ লোক ও ২ লক্ষ ২৫ হাজার টন পণ্যদ্রব্য পরিবাহিত হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)—পৃথিবীর মধ্যস্থলে বৃটেন অবস্থিত। কোনও দেশই বৃটেন হইতে খুব বেশী দূরে নহে। ইহার ফলে পণ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি করিতে অন্যান্য দেশের তুলনায় বৃটেনের ভাড়া কম লাগে; ইহা বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়ক। ইহা ছাড়া বৃটেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশ। কাঁচামাল-আমদানি এবং শিল্পদ্রব্য-রপ্তানি এই দেশের প্রধান বাণিজ্য। ইহা ছাড়া বহু পণ্যদ্রব্য এই দেশ একবার আমদানি করিয়া পুনরায় রপ্তানি (Entrepot) করে; যথা—চা, রবার, পশম ইত্যাদি। পৃথিবীর মোট শিল্পদ্রব্যের বাণিজ্যের শতকরা ১৯ ভাগ বৃটেন রপ্তানি করে। পৃথিবীর মোট বৈদেশিক বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই বৃটেনের স্থান।

বৃটেনের আমদানি সর্বদাই রপ্তানি অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু জাহাজ, বীমা ও ব্যাঙ্কিং-এর আয় এবং লগ্নীর সুদ ও লাভ প্রভৃতি 'অদৃশ্য রপ্তানি' (Invisible exports) পণ্য-রপ্তানির সহিত যোগ করিলে বৃটেনের মোট রপ্তানি সর্বদাই মোট আমদানির চেয়ে বেশী হইবে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বৃটেনের আধিপত্য ও উপনিবেশ থাকিবার দরুন এই 'অদৃশ্য রপ্তানি'র ব্যবসায় সম্ভবপর হইয়াছে। বর্তমানে উপনিবেশের সংখ্যা কিয়দংশ কমিয়া যাওয়ায় এই সকল দেশের সঙ্গে বৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোর

কিছুটা পরিবর্তন হইয়াছে। যেমন, ভারতে পূর্বের মতো যে-কোন মূল্যে শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য রপ্তানি করা সম্ভবপর হইতেছে না এবং পাট, তুলা, লৌহ আকরিক প্রভৃতি কাঁচামাল পূর্বের মতো সস্তায় আমদানি করা সম্ভবপর হইতেছে না। বর্তমানে বৃটেন ভারতকে কিছু কিছু ভারী শিল্পগঠনের উপযোগী যন্ত্রপাতি রপ্তানি করিতে বাধ্য হইয়াছে।

বৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রগতি

(কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং)

	রপ্তানি			আমদানি		
	১৯৫১	১৯৫৬	১৯৫৯	১৯৫১	১৯৫৬	১৯৫৯
খাদ্য ও পানীয়	১৬	১৮	১৯	১২৯	১৪৫	১৫২
কাঁচামাল	১১	১২	১৩	১৫২	১১০	৯৩
খনিজ তৈল ও তৈলজাত দ্রব্যাদি	৭	১৬	১২	৩২	৪১	৪৭
শিল্পজাত দ্রব্য	২১৯	২৬২	২৮১	৭৬	৯১	১৫২
অন্যান্য	৫	৯	৮	১	২	২
মোট	২৫৮	৩১৭	৬৩৩	৩৯০	৩৮৯	৬৯৯

উপরের পরিসংখ্যানে দেখা যাইবে যে, বৃটেন সর্বদাই রপ্তানি অপেক্ষা বেশী আমদানি করে। কিন্তু 'অদৃশ্য রপ্তানি'-র পরিমাণ ইহার সহিত হিসাব করিলে অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইবে। ১৯৫৭ সালে লগ্নী বাবদ ১১ কোটি স্টার্লিং, ব্যাঙ্কিং, বীমা ও জাহাজের বাবদ ১৭ কোটি স্টার্লিং আয় হইয়াছিল। এই সকল 'অদৃশ্য রপ্তানি'র জন্য বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃটেনের অনুকূলে চলিয়া আসে।

আমদানি—বৃটেনে সাধারণতঃ পাঁচ শ্রেণীর দ্রব্যাদি আমদানি হইয়া থাকে ; যথা,—(ক) খাদ্য, পানীয় ও তামাক, (খ) শিল্পের কাঁচামাল, (গ) খনিজ তৈল ও দ্রব্যাদি, (ঘ) শিল্পজাত দ্রব্যাদি।

(ক) খাদ্য, পানীয় ও তামাক—খাদ্যোৎপাদনে বৃটেনের স্থান স্থানীয় চাহিদার তুলনায় খুবই নগণ্য। জমির অভাবে ব্যাপক কৃষিকার্য করা সম্ভব নহে। সেইজন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য বৃটেনকে আমদানি করিতে হয়। খাদ্যদ্রব্যাদি বৃটেনের সর্বপ্রধান আমদানি দ্রব্য—মোট আমদানির শতকরা

প্রায় ৩৮ ভাগ। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দ্রব্যাদি নিম্নলিখিত দেশসমূহ হইতে আমদানি করা হয়:

গম—কানাডা, আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়া।

চাউল—ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড ও স্পেন।

চা—ভারত, পাকিস্তান, চীন, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়া।

কফি—পূর্ব আফ্রিকা, কোস্টারিকা ও ব্রেজিল। কোকো—ঘানা।

চিনি—কিউবা, অস্ট্রেলিয়া, মরিশাস্।

মেষ-মাংস—নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা।

মাখন ও ডেয়ারী-দ্রব্যাদি—ডেনমার্ক, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা।

ফল ও মদ—ফ্রান্স, ইটালি, স্পেন।

তামাক—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন।

(খ) **শিল্পের কাঁচামাল**—বৃটেন শিল্পোন্নত দেশ, কিন্তু শিল্পের কাঁচামালের স্থানীয় উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। সেইজন্য অধিকাংশ কাঁচামাল বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। বৃটেনের মোট আমদানির শতকরা ২৪ ভাগ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। নিম্নলিখিত দেশসমূহ হইতে প্রধানতঃ কাঁচামাল এই দেশে আমদানি হইয়া থাকে:

তুলা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুদান, মিশর, ভারত ও পাকিস্তান।

পাট—পূর্ব পাকিস্তান। ফ্লাক্স—রাশিয়া, বেলজিয়াম ও পোল্যাণ্ড।

রবার—ইন্দোনেশিয়া, মালয় ও সিংহল।

লৌহ আকরিক—সুইডেন, গ্রীস, স্পেন, আলজেরিয়া ও ভারত।

পশম—অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আর্জেন্টিনা।

কাষ্ঠ—সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, কানাডা ও রাশিয়া।

টিন—মালয়, চিলি, বলিভিয়া ও নাইজেরিয়া।

(গ) **খনিজ তৈল ও তৈলজাত দ্রব্যাদি**—বৃটেনে কোন তৈলখনি নাই। কিন্তু তবুও এই দেশ পৃথিবীর তৈল সরবরাহের উপর প্রভূত কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের তৈলখনির মালিক বৃটেন। সেইজন্য সেই সকল তৈলের কিয়দংশ বৃটেনে আনীত হয় এবং তৈল-শোধনের সময় এই সকল তৈল হইতে লুব্রিকেটিং ও নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়।

(ঘ) **শিল্পজাত দ্রব্য**—বৃটেন শিল্পোন্নত দেশ হইলেও এখনও এই দেশকে প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করিতে হয়। বৃটেনের

মোট আমদানির শতকরা ২৭ ভাগ শিল্পজাত দ্রব্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ হইতে ইস্পাত-দ্রব্য, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে কার্পাস-বস্ত্র, ভারত ও পাকিস্তান হইতে পাটজাত দ্রব্য, জাপান ও চীন হইতে রেশমদ্রব্য, কানাডা, ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে ও সুইডেন হইতে কাগজ প্রভৃতি বৃটেনের উল্লেখযোগ্য আমদানি-দ্রব্য।

নিম্নলিখিত দেশসমূহ হইতে বৃটেনের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পণ্যদ্রব্য আমদানি হইয়া থাকে :

বৃটেনের আমদানি (১৯৬৩)

(কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৭	ভারত	১৪
কানাডা	৩১	সুইডেন	১৩
অস্ট্রেলিয়া	২২	ফ্রান্স	১০
নিউজিল্যাণ্ড	১৯	পাকিস্তান	৩

রপ্তানি—পূর্বে এই দেশ প্রধানতঃ শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য রপ্তানি করিত। কার্পাস-বস্ত্র-রপ্তানিতে এই দেশ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহা ছাড়া মৎস্য, পশমদ্রব্য, চর্মদ্রব্য, রসায়ন-দ্রব্য, ইস্পাতসামগ্রী প্রভৃতি ভোগ্যদ্রব্য রপ্তানির জন্যও বৃটেন খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। উপনিবেশ ও অন্যান্য অনুন্নত দেশে এইসব ভোগ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। উপনিবেশসমূহের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃটেনের হাতে ছিল বলিয়া ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল। সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ এখনকার মতো এত অধিক ছিল না। ক্রমশঃ বৃটেন বিভিন্ন উপনিবেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি তখন তাহাদের দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নতির জন্য শিল্পোন্নতির দিকে দৃষ্টি দিল। ফলে এই সকল দেশে বৃটেনের অবাধ ভোগ্যদ্রব্য রপ্তানি কমিয়া আসিল এবং এই সকল দেশে যন্ত্রপাতি, রসায়ন-দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি ও শিল্পগঠনের উপযোগী পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইল। ফলে বৃটেনকে ভোগ্যদ্রব্যের পরিবর্তে যন্ত্রপাতির রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে হইল। যুদ্ধের পূর্বে বৃটেনের মোটর-রপ্তানির শতকরা ২৫ ভাগ ছিল যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি ; কিন্তু যুদ্ধের পরে ইহার

অংশ আসিয়া দাঁড়াইল শতকরা ৪০ ভাগে। সেই সময় আবার কার্পাস-যন্ত্রাদির রপ্তানির অংশ শতকরা ৩২ ভাগ হইতে শতকরা ১১ ভাগে নামিয়া আসিল।

এইজন্য বর্তমানে যন্ত্রপাতি-শিল্পের দিকে এবং রপ্তানিযোগ্য ভোগ্য-দ্রব্যাদির উৎকর্ষতা-বৃদ্ধির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হইয়াছে। বর্তমানে শিল্পোন্নত দেশেই বৃটেনের অধিকাংশ ভোগ্যদ্রব্য রপ্তানি হয়। অনুন্নত দেশে ভোগদ্রব্যের চেয়ে যন্ত্রপাতিও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি রপ্তানির পরিমাণই সবচেয়ে বেশী ; কারণ অনুন্নত দেশে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভোগ্যদ্রব্য রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য বৃটেন দুইটি পন্থা অনুসরণ করিতেছে। প্রথমতঃ, অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশসমূহের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন-খরচ কমাইবার চেষ্টা হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, শুল্ক সম্বন্ধে সুবিধা ভোগ করিয়া পশ্চিম ইউরোপের বাজার দখল করিবার জন্য বৃটেন **ইউরোপের সাধারণ বাজারে*** **(European Common Market)** প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ; অবশ্য ইহা হইলে, কমন্‌ওয়েল্‌থের দেশগুলিকে অতিরিক্ত শুল্ক দিয়া বৃটেনে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করিতে হইত এবং সেইজন্য এই সকল দেশসমূহের সঙ্গে বৃটেনের বাণিজ্যের পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পাইত।

শহর ও বন্দর (Cities & Ports) : লণ্ডন—টেমস্‌ নদীর তীরে অবস্থিত লণ্ডন শহর বৃটেনের রাজধানী ; ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম শহর এবং শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক বন্দর। পুনরায় রপ্তানির উদ্দেশ্যে এখানে বহু পণ্যদ্রব্য আমদানি করা হয়। ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলে কাগজ, রেয়ন, রাসায়নিক ও বয়ন-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় সকল দেশের সঙ্গে লণ্ডনের বাণিজ্যিক যোগাযোগ রহিয়াছে। চা, কফি, তামাক, রবার, তুলা প্রভৃতি সামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানি করা হয় এবং কাগজ, বস্ত্রাদি, যন্ত্রপাতি, মোটর-গাড়ী ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। বৃটেনের দক্ষিণ-পূর্বাংশের বিস্তীর্ণ ঘনবসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। **গ্লাসগো**—ক্লাইড নদীর মোহনায় অবস্থিত স্কটল্যাণ্ডের এই

*পশ্চিম ইউরোপের ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালি, পশ্চিম জার্মানী, হল্যাণ্ড ও লুক্সেমবুর্গ একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া নিজেদের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের বন্দোবস্ত করিয়াছে। বৃটেন এই সকল দেশগুলির সঙ্গে মিশিয়া ইউরোপে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বন্দরটি পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ-নির্মাণকেন্দ্র। এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কয়লা ও লৌহ পাওয়া যায়; এইজন্য এখানে ইস্পাতশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে সুন্দর পোতাশ্রয় আছে। গ্লাসগোর সন্নিকটে নদীর গভীরতা অত্যন্ত বেশী। এই সকল সুবিধা থাকার জন্য এখানে জাহাজ-নির্মাণ সহজসাধ্য হইয়াছে। ইহা ছাড়া এখানে পশম, কার্পেট, কাগজ ও রাসায়নিক শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। স্কটল্যাণ্ডের ঘনবসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। **লিভারপুল**—ল্যাঙ্কাশায়ার প্রদেশের পশ্চিম উপকূলে মার্সে নদীর মোহনায় অবস্থিত লিভারপুল বন্দরের মারফত বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং কাঁচামাল বৃটেনে আমদানি করা হয়। ইহার পশ্চাদ্‌ভূমিতে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিখ্যাত কার্পাস ও রাসায়নিক শিল্পকেন্দ্রগুলি অবস্থিত। লিভারপুল হইতে ম্যাঞ্চেস্টার পর্যন্ত একটি খাল কাটিয়া ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্রাদি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য এই বন্দরে আনীত হয়। এই খালের নাম 'ম্যাঞ্চেস্টার খাল'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এই বন্দর নিকটবর্তী বলিয়া এই বন্দরের মারফত বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে।

ম্যাঞ্চেস্টার—মার্সে নদীর শাখা ইরওয়েল নদীর তীরে অবস্থিত এই বন্দরের নিকটবর্তী স্থানে বিখ্যাত কার্পাসশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রগামী জাহাজ লিভারপুল বন্দর হইতে ম্যাঞ্চেস্টার খাল মারফত এই বন্দরে প্রবেশ করে। বয়নশিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করা এবং বিদেশ হইতে তূলা আমদানি করা এই বন্দরের প্রধান কাজ। **কার্ডিফ**—দক্ষিণ ওয়েল্‌সের টাফ নদীর মোহনার নিকট অবস্থিত এই বন্দর কয়লা-রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। বর্তমান যুগে কয়লার ব্যবহার কিছুটা কমিয়া যাওয়ায় এই বন্দরের গুরুত্ব সামান্য কমিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া কাঠ, খাদ্যশস্য ও লৌহ আকরিক এই বন্দরের অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য। ইহার নিকট ইস্পাতশিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। **বার্মিংহাম**—মিডল্যাণ্ডের বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। বিভিন্ন ক্ষুদ্রকায় ইস্পাত-দ্রব্যের জন্য এই শহর বিখ্যাত। এখানে বন্দুক, বাইসাইকেল, মোটর-গাড়ী, কলম প্রভৃতি পাওয়া যায়। **শেফিল্ড**—ভারী ইস্পাত-সামগ্রী ও ছুরি-কাঁচির জন্য এই শহর বিখ্যাত। **লীড্‌স্**—চর্ম-দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবসায়-কেন্দ্র। ইহা বৃটেনের চর্ম-দ্রব্যের ব্যবসায়ের বৃহত্তম কেন্দ্রস্থল। এখানে বহু সাবানের কারখানা এবং তৈল-শোধনাগার আছে।

ব্রিস্টল—ব্রিটেনের পশ্চিম তীরের সেভার্ণ নদীর মোহনার নিকট ইহা অবস্থিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই শহরের বাণিজ্যের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। তামাক এই শহরে সবচেয়ে বেশী আমদানি হয়। উপকূলীয় বাণিজ্যেও ব্রিস্টলের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **হাল**—হাম্বার নদীর মোহনার নিকট অবস্থিত এই বন্দর প্রধানতঃ নরওয়ে, হল্যাণ্ড ও জার্মানীর সহিত বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ফ্রান্স (France)

ইউরোপে রাশিয়ার পরেই আয়তনে ফ্রান্সের স্থান। এই দেশের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে সমুদ্র থাকায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে। উত্তরে ইংলিশ চ্যানেলের অপর তীরে ব্রিটেন অবস্থিত; পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা; দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর মারফত আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ায় যাইবার সুযোগ বিদ্যমান। ইহা ছাড়া স্থলপথ ও রেলপথে এই দেশ ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহের সহিত সংযুক্ত।

ফ্রান্সের আয়তন ৫,৫১,৬০৬ বর্গ-কিলোমিটার। ১৯৬৪ সালে ইহার লোকসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৮৪ লক্ষ। লোকবসতি প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৮৩ জন। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী স্থানসমূহ, আলসাস্, ব্রিটানি, ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী অঞ্চল, প্যারিস উপত্যকা ও সাওন নদীর নিম্ন উপত্যকায় লোকবসতি অপেক্ষাকৃত ঘন। ফ্রান্সের নিকটবর্তী দেশসমূহ—ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী দেশ; সেইজন্য ফ্রান্সের সঙ্গে এই সকল দেশের বাণিজ্যের উন্নতিসাধন সম্ভবপর হইয়াছে।

ভূ-প্রকৃতি (Physical Features)—ফ্রান্সের ভূ-প্রকৃতি দুইপ্রকার—উচ্চভূমি ও সমতলভূমি। এই দেশের পশ্চিম ও উত্তর অংশ ইউরোপীয় সমতলভূমির অন্তর্গত। মধ্যভাগে মালভূমি বিদ্যমান; ইহার দক্ষিণ-পূর্বাংশ সুউচ্চ। পূর্বাংশে সেভেন্স্ পর্বত অবস্থিত। ইহা ক্রমশঃ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমদিকে নামিয়া আসিয়া সমতলভূমির সহিত মিশিয়াছে। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বাংশে আল্পস্ পর্বত ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত গিয়াছে। সেভেন্স্ ও আল্পস্ পর্বতের মধ্যবর্তী রোণ-অববাহিকা অত্যন্ত উর্বর সমতলভূমি। ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে পীরেনীজ পর্বত স্পেনের সহিত এই দেশের সীমারেখা টানিয়াছে।

জলবায়ু (Climate)—ফ্রান্সের আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে মহাসাগরীয় জলবায়ু পরিলক্ষিত হয় এবং যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই মহাদেশীয় জলবায়ুর আধিক্য দেখা যায়। এই দেশের দক্ষিণাংশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু দেখা যায়। উত্তর ফ্রান্স পশ্চিমা-বায়ুবলয়ের অন্তর্ভুক্ত। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত অংশে গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্যকিরণ ও শুষ্ক আবহাওয়া এবং শীতকালে বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়। এই দেশের উত্তরে ও মধ্যাংশে সারাবৎসর বৃষ্টিপাত হয়; গড় বৃষ্টিপাত ৭৫ সেঃ মিঃ। উচ্চভূমিতে ও পার্বত্য অঞ্চলে উচ্চতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা কমিয়া যায়। এই দেশের গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ১৫° সেঃ হইতে ২১° সেঃ পর্যন্ত এবং শীতকালীন তাপমাত্রা ৫° সেঃ হইতে ১০° সেঃ পর্যন্ত হইয়া থাকে। এই দেশের জলবায়ু মোটামুটি কৃষিকার্যের অনুকূল। শীতের তীব্রতা খুব বেশী না থাকায় সারাবৎসর কৃষি-জমিতে কাজ করা সম্ভব।

প্রাকৃতিক অঞ্চল (Natural Regions)—ফ্রান্সের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, কৃষিজ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি উৎপাদনের বিভিন্নতা অনুসারে এই দেশকে আটটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়:

(১) প্যারিস উপত্যকা—সীন নদীর উপত্যকা এবং লয়ের নদীর মধ্য-অববাহিকায় অবস্থিত উত্তর ফ্রান্সের এই অঞ্চল কৃষিকার্যের জন্য বিখ্যাত। এখানে পলিমাটি দ্বারা গঠিত মৃত্তিকা পুরাতন শিলাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য এখানকার মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর। গম, যই, বীট প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কৃষিজ দ্রব্য। নর্মাণ্ডি অঞ্চলে আপেল ও অন্যান্য ফল উৎপন্ন হয়; ফ্ল্যাণ্ডার্সে অতসীতন্তুর উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। শুষ্ক খড়িমাটি অঞ্চলে মেষ পালিত হয়; লয়ের নদীর অববাহিকার মধ্যভাগে দ্রাক্ষার উৎপাদন এবং মদ্যশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর ফ্রান্সে কয়লা পাওয়া যায় বলিয়া এই অঞ্চল শিল্পে অত্যন্ত উন্নত। ফ্রান্সের মোট কয়লার শতকরা ৬০ ভাগ এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। বিদেশ হইতে এখানকার ডানকার্ক ও হ্যাভার বন্দর মারফত কিছু কিছু কাঁচামাল আমদানি হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের রুবের পশম-বয়নশিল্প, অ্যামিয়েঁ ও রুয়েঁর কার্পাস-বয়নশিল্প, লীলে ও রুবের লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প ও বীট-চিনিশিল্প ফ্রান্সের শিল্পোৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস এখানকার কৃষিজ অঞ্চলের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং একটি বড়

ব্যবসায়-কেন্দ্র। প্যারিস অঞ্চলে মোটর-গাড়ী, জুতা, চিনি, কাগজ প্রভৃতি শিল্প বিদ্যমান।

(২) **আর্মোরিকান মালভূমি**—বৃটানি ও পশ্চিম নর্মাণ্ডি লইয়া গঠিত এই অঞ্চল পুরাতন শিলাদ্বারা গঠিত। ইহা পর্বতসঙ্কুল, উপকূলভাগ

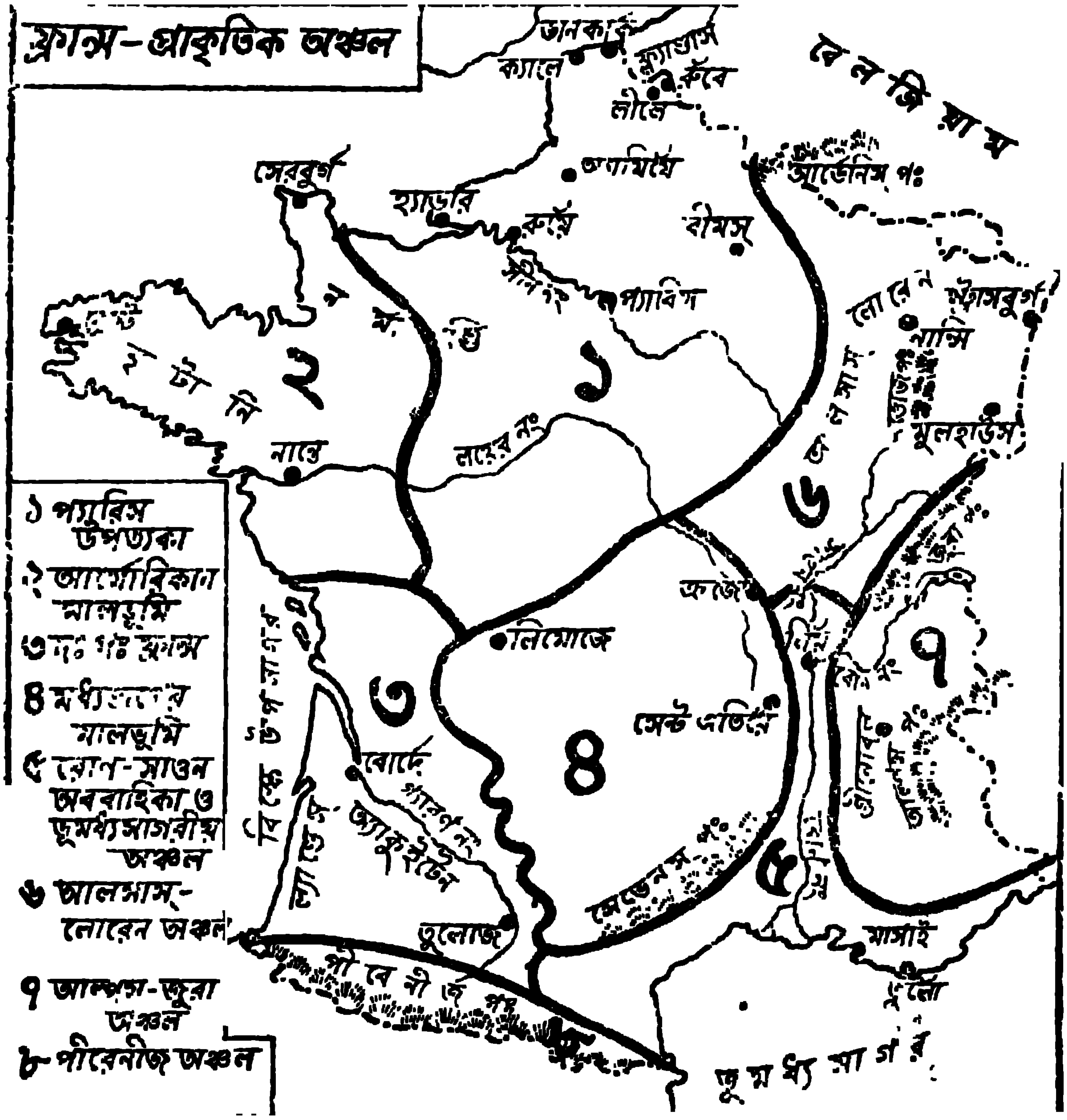

ভগ্ন ও স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ে পরিপূর্ণ। কোন কোন স্থানে বনভূমি বিদ্যমান। এই অঞ্চল পশ্চিমা-বায়ুর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং এখানকার মৃত্তিকা অনুর্বর হওয়ায় কৃষিকার্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। কিন্তু গম, যব ও রাই জাতায় খাদ্যশস্য এখানে উৎপন্ন হয়। এখানে নানাবিধ ফল, ফুল ও শাকসব্জী পাওয়া যায়। আঙুর হইতে এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত হয় ও রপ্তানি হয়। গবাদি পশু ও মেষপালনের জন্যও

এই অঞ্চল বিখ্যাত। এখানকার উপকূলভূমিতে মৎস্যচাষ হইয়া থাকে। নান্তে অঞ্চলে জাহাজ-নির্মাণশিল্প, রাসায়নিক শিল্প, কার্পাস-বয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্রেস্ট ও শেরবুর্গ এখানকার প্রধান নৌ-ঘাঁটি।

(৩) দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্স—আর্মোরিকান মালভূমির দক্ষিণে এবং পীরেনীজ পর্বতের উত্তরে গ্যারণ নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এই অঞ্চল অ্যাকুইটেন নিম্নভূমি নামে পরিচিত। ইহার পশ্চিমাংশ ল্যাণ্ডেস্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে; পূর্বে বালুকারাশি বিস্কে উপসাগর হইতে এই অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া উর্বর মৃত্তিকা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিত। পরে পাইন বৃক্ষ রোপণ করিয়া ইহা বন্ধ করা হইয়াছে। সেইজন্য উপকূলবর্তী অঞ্চলে পাইন বৃক্ষের বনভূমি লক্ষ্য করা যায়। এই বনভূমিতে কাষ্ঠ, তার্পিন তৈল, রজন প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর এবং জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। সেইজন্য এখানে কৃষিকার্য উন্নতি লাভ কবিয়াছে। পশ্চিমাংশে ভুট্টা, তুলোজ অঞ্চলে গম এবং বোর্দে অঞ্চলে দ্রাক্ষা উৎপন্ন হয়। এখানকার দ্রাক্ষা হইতে উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত হয় ও বোর্দে বন্দর মারফত রপ্তানি হয়। বৃষ্টিপাতযুক্ত এলাকার দীর্ঘ তৃণভূমি অঞ্চলে গবাদি পশু এবং পীরেনীজ পর্বতের সানুদেশে মেষপালন হইয়া থাকে।

(৪) মধ্যভাগের মালভূমি—প্রাচীন শিলা ও লাভাদ্বারা গঠিত এই অঞ্চল ৪৫০ মিটার হইতে ১৫০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চ। এই অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্বদিকের সেভেনস্ পর্বত সোজা নামিয়া রোণ নদীর উপত্যকার সহিত মিলিত হইয়াছে। এখানকার মৃত্তিকা সাধারণতঃ অনুর্বর; অ্যালিয়েঁ ও অন্যান্য নদীর উপত্যকা অঞ্চলে উর্বর মৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয়। এই সকল স্থানে গম, বীট, দ্রাক্ষা, যই, রাই প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই মালভূমিতে মেষপালন বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই অঞ্চলে ছোট ছোট কয়লা ও লৌহ আকরিকের খনি বিদ্যমান; তন্মধ্যে সেন্ট এতিয়েঁ ও ক্রজো কয়লাখনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল কয়লাখনিকে কেন্দ্র করিয়া লৌহ ও ইস্পাত, রেশম, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে সাধারণতঃ বিরল লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়; শুধু শিল্পাঞ্চলে নাতিনিবিড় লোকবসতি বিদ্যমান। নিম্নোক্ত এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য উন্নত শহর।

(৫) রোণ-সাওন অববাহিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল—আল্পস্ ও জুরা পর্বতের পশ্চিমে এবং মধ্য মালভূমির পূর্বদিকে অবস্থিত

রোণ-সাওন উপত্যকা ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী স্থানসমূহ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। এখানকার সম্পূর্ণ অংশ সমতলভূমি; উত্তরাংশে প্রখর গ্রীষ্ম, মৃদু শীত এবং প্রায় সারাবৎসরব্যাপী বৃষ্টিপাত বিদ্যমান; দক্ষিণাংশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু থাকায় শীতকালে বৃষ্টিপাত, মৃদু গ্রীষ্ম ও শীত পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চল আঙ্গুর, তুঁত, জলপাই ও নানাবিধ ফল ও শাকসব্জীর জন্য বিখ্যাত। খনিজ সম্পদের অভাবে এখানকার শ্রমশিল্প সাধারণতঃ আল্পস্ পর্বতের জলস্রোত হইতে উদ্ভূত জলবিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। মদ্যশিল্প ও রেশম-শিল্পে এই অঞ্চল উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। এই অঞ্চলের লিয়ঁ ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রেশমশিল্পকেন্দ্র। রোণ নদী হইতে একটি খাল কাটিয়া মার্সাই বন্দরের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। এই বন্দরের নিকটেই জাহাজনির্মাণ, মোমবাতি ও সাবানের কারখানা আছে। মার্সাই-এর পূর্বে অবস্থিত তুলোঁ বন্দর প্রধানতঃ নৌঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(৬) আলসাস্-লোরেন অঞ্চল—ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত এই অঞ্চলের পূর্বাংশে ভোজ পর্বত, উত্তরাংশে আর্ডেনিস্ পর্বত, দক্ষিণাংশে জুরা পর্বত এবং পশ্চিমাংশে প্যারিস উপত্যকা অবস্থিত। মিউজ ও মোসেল নদীর উপত্যকায় অবস্থিত লোরেন মালভূমি অনুর্বর; কোন কোন স্থানে বনভূমি বিদ্যমান; সেইজন্য অধিকাংশ স্থানে বিরল লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু লোরেন অঞ্চলে ফ্রান্সের শতকরা ৮০ ভাগ লৌহ আকরিক উৎপন্ন হয়। সেইজন্য লৌহখনি অঞ্চলের নিকটস্থ নান্সি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। ভোজ পর্বতে বিশাল বনভূমি বিদ্যমান। ইহার সানুদেশে আঙ্গুর উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের সমতলভূমিতে গম, যব, তামাক ও ফলের চাষ হইয়া থাকে। রাইন নদীর উপত্যকায় অবস্থিত আলসাস্ অঞ্চলে প্রচুর পটাশ পাওয়া যায়। আলসাস্ অঞ্চলের মৃত্তিকা উর্বর বলিয়া গম, রাই প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এখানকার ইল নদীর উপত্যকায় অবস্থিত স্ট্রাসবুর্গ একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। নান্সি, মুলহাউস প্রভৃতি স্থানে পশম ও কার্পাস বয়নশিল্প সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

(৭) আল্পস্-জুরা অঞ্চল—ফ্রান্সের পূর্বাংশে আল্পস্ ও জুরা পর্বত বিদ্যমান। এই সকল পর্বত হইতে বিভিন্ন নদী নির্গত হওয়ায় কোন কোন

স্থানে পর্বতসমূহ খণ্ডিত হইয়াছে এবং নদী-উপত্যকায় লোকবসতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখানকার পার্বত্য নদীসমূহ ফ্রান্সের জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। এখানকার ভার অঞ্চলে প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায়। সুলভ জলবিদ্যুৎ ও স্থানীয় বক্সাইট এখানকার অ্যালুমিনিয়াম-শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। ইজ নদীর অববাহিকায় অবস্থিত গ্রীনোবল দস্তানা ও কাগজ শিল্পের জন্য, সাঁবেরী অঞ্চল রেশমশিল্পের জন্য এবং ডুব অববাহিকায় অবস্থিত বেশাসঁ অঞ্চল ঘড়ি-নির্মাণের জন্য বিখ্যাত।

(৮) পীরেনীজ অঞ্চল—ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে পীরেনীজ পর্বত এই দেশকে স্পেন হইতে বিভক্ত করিতেছে। এই পর্বতের উচ্চতা ২,১০০ মিটার হইতে ৩০০০ মিটার পর্যন্ত। এই পর্বতের পশ্চিম প্রান্তের লেয়ঁ। এবং পূর্বদিকের পারপিনিয়াঁর মধ্য দিয়া প্রসারিত রেলপথ ফ্রান্স ও স্পেনকে যুক্ত করিয়াছে। এখানকার পার্বত্য জলস্রোত জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে সহায়তা করিয়াছে। পার্বত্য অঞ্চলে গবাদি পশু ও মেষপালন হইয়া থাকে; উপত্যকা অঞ্চলে ভুট্টা, যব প্রভৃতির চাষ হয়।

কৃষিকার্য (Agriculture)—ফ্রান্স কৃষিকার্যে বিশেষ উন্নত। এই দেশে ১·৮ কোটি হেক্টর জমিতে কৃষিকার্য করা হয়। এই দেশের শতকরা ৩৫ জন লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত। স্থানীয় সরকার কৃষকদের বিভিন্ন বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ায় সাধারণতঃ কৃষকগণ গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসে না। অতি-উৎপাদন ব্যবস্থার (Intensive farming) জন্য এই দেশের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন অনেক বেশী।

হেক্টর-প্রতি উৎপাদন
(কিলোগ্রাম)

গম	২,৫০০	আলু	১৭,১০০
যই	২,০০০	আঙুর	৫,০০০
যব	২,৭১০	বীট	২০,০০০

ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর তারতম্যের জন্য এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ কৃষিজ দ্রব্যে এই দেশ মোটামুটি স্বাবলম্বী।

কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩-৬৪)
(লক্ষ মেঃ টন)

গম	১০২	আলু	১৫২
যব	৭৭	বীট	৭১
যই	২৮	আঙুর	৮২

গম-উৎপাদনে ফ্রান্স পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। এই দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে গমের চাষ হয়। তন্মধ্যে প্যারিস উপত্যকায় অধিক পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়। **রাই**-উৎপাদনেও এই দেশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। মধ্যভাগের মালভূমির এবং ফ্রান্সের নিকৃষ্ট মৃত্তিকায় ইহা উৎপন্ন হয়। **যই** সাধারণতঃ উত্তর ও পশ্চিম ফ্রান্সে উৎপন্ন হয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে **ভুট্টা** উৎপন্ন হয়। প্যারিস উপত্যকায় **আলু** ও **বীটের** চাষ হয়। **আঙুর**-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ছাড়াও লয়ের নদীর অববাহিকা, চম্পাগ্‌নি ও বোর্দে অঞ্চলে আঙুর উৎপন্ন হয়। এই আঙুর হইতে মদ্য প্রস্তুত হয়। এত আঙুর হওয়া সত্ত্বেও এই দেশকে আরও মদ্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অন্যান্য ফলও উৎপন্ন হয়; যথা, লেবু, অ্যাপ্রিকট, জলপাই, চেরী প্রভৃতি। রোণ অববাহিকায় তুঁত গাছ জন্মিয়া থাকে। সেইজন্য এখানে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হয়।

ফ্রান্সে **পশুপালন** প্রায় সর্বত্রই ছড়াইয়া আছে। অধিকাংশ স্থানে অশ্ব, গবাদি পশু, শূকর ও মেষ পালন হইয়া থাকে। ভূমধ্যসাগরীয় ও আটলান্টিক উপকূলে প্রচুর **মৎস্য**-শিকার হইয়া থাকে। মৎস্য-শিল্পে এই দেশে প্রায় ১.৪ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে এবং প্রতিবৎসর এখানে প্রায় ১৫ কোটি টাকা মূল্যের মৎস্য আহরিত হয়। পিলচার্ড ও সার্ডিন্‌স মৎস্য এখানে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

খনিজ সম্পদ (Minerals)—বিভিন্ন খনিজ সম্পদে ফ্রান্স সমৃদ্ধ; তন্মধ্যে **লৌহ আকরিক** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোরেন অঞ্চলে এই দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এই লৌহ নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইলেও জার্মানী ও বেলজিয়ামের সীমানার নিকট এই লৌহখনি অবস্থিত হওয়ায় ঐ সকল দেশের শিল্পে সহজেই এই লৌহ আকরিক নিয়োজিত হইতে

পারে। নর্মাণ্ডি, বৃটানি ও পীরেনীজ অঞ্চলেও লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। লৌহ আকরিকের তুলনায় কয়লা-সম্পদে এই দেশ ততটা সমৃদ্ধ নহে। দেশের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত **কয়লা** এই দেশে পাওয়া যায় না। সেইজন্য ফ্রান্সে প্রচুর পরিমাণে কয়লা আমদানি হইয়া থাকে। লীলে অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক কয়লা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া সেণ্ট এতিয়েঁ ও ক্রজো অঞ্চলেও কয়লা পাওয়া যায়। দক্ষিণাংশের এ্যালয়েঁ অঞ্চলেও অল্পবিস্তর

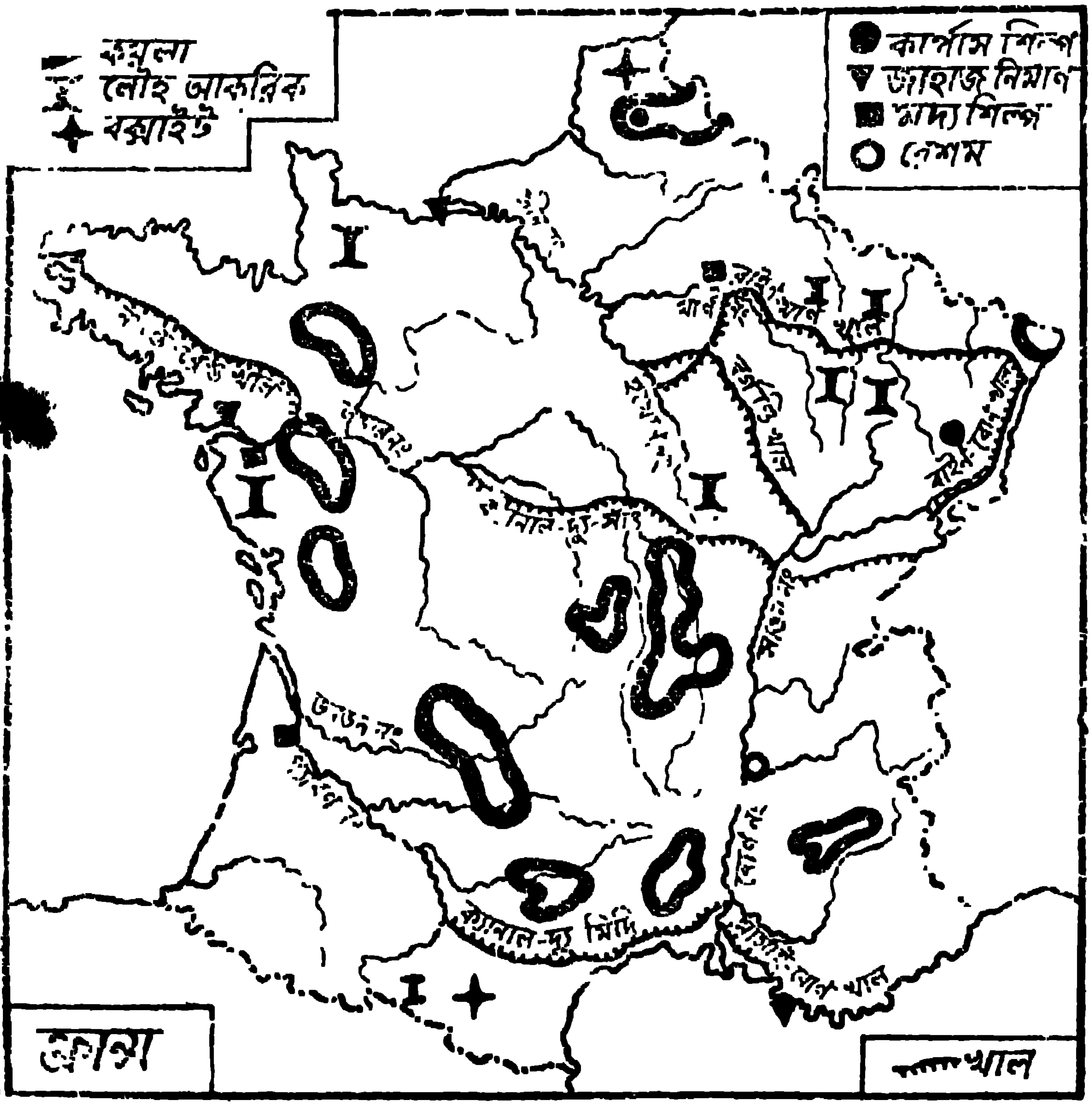

কয়লা পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্বে এই দেশে **খনিজ তৈল** আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সেণ্ট মার্সেল অঞ্চলে তৈল উত্তোলিত হইতেছে। অধিকাংশ খনিজ তৈল বিদেশ হইতে আমদানি হয় এবং ডানকার্কে পরিশোধিত হয়। **বক্সাইট**-উৎপাদনে ফ্রান্স পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। বক্সাইট হইতে অ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হয়। ফ্ল্যাণ্ডার্স

অঞ্চলে ও পীরেনীজ পর্বতের উত্তরে সর্বাপেক্ষা বেশী বক্সাইট পাওয়া যায়। আলসাস্ অঞ্চলের মুলহাউসে প্রচুর **পটাশ** পাওয়া যায়। মধ্যভাগের অধিত্যকায় অ্যান্টিমনি ও কেওলিন পাওয়া যায়।

খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩)

(লক্ষ মেঃ টন)

কয়লা	৫০২	বক্সাইট	১৮'৬
লৌহ আকরিক	৫৮৮	পটাশ	১৭'৮

কয়লা সম্পদে এই দেশ খুব সমৃদ্ধিশালী না হইলেও এখানে প্রচুর পরিমাণে **জলবিদ্যুৎ** উৎপন্ন হয়। আল্পস্ ও পীরেনীজ পর্বতের নিকটেই অধিকাংশ জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। সেভেনস্ পর্বতের নিকটেও কয়েকটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র রহিয়াছে। জলবিদ্যুৎ ফ্রান্সের কয়লা ও খনিজ তৈলের অভাব বহুলাংশে মোচন করিয়াছে এবং বর্তমানে বহু শিল্প ও রেলগাড়ী ইহার সাহায্যে চালিত হইতেছে। গ্রীনোবল, রোম্যাঁশ, দ্রাক অঞ্চলে এবং ভোজ্ ও জুরার পার্বত্য অঞ্চলেই অধিকাংশ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

শ্রমশিল্প (Industries)—ফ্রান্সের অর্থনীতি বহুলাংশে কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল হইলেও এই দেশ শিল্পে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। এখানকার শিল্পজাত দ্রব্যাদি সাধারণতঃ উচ্চশ্রেণীর; সৌন্দর্যপূর্ণ জিনিসের জন্য এই দেশ জগদ্বিখ্যাত। সেইজন্য এখানকার শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্য খুব বেশী। কয়লা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া থাকায় সাধারণতঃ শিল্পসমূহ বাজারের বা কাঁচামালের উৎপাদনকেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানসমূহে গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানকার শ্রমিকদের কর্মনৈপুণ্য ও সৌন্দর্যবোধের জন্য উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে এই দেশ মদ্যশিল্পে পৃথিবীতে প্রথম, ইস্পাত ও জাহাজনির্মাণ-শিল্পে পঞ্চম, বীট-চিনিশিল্পে তৃতীয়, পশমবয়ন-শিল্পে চতুর্থ এবং কার্পাস-বয়নশিল্পে সপ্তম স্থান অধিকার করে।

শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন (১৯৬৩)

(লক্ষ মেঃ টন)

কার্পাস-বস্ত্র	২'৩	ইস্পাত	১৭'৬
পশম-বস্ত্র (সুতা)	১'৬	মদ্য (কোটি হেক্টোলিটার)	৪'৮
জাহাজ (লক্ষ GRT)	৪'৪	বীট-চিনি	২০'৪

ফ্রান্সের অধিকাংশ কয়লা দেশের উত্তর-পূর্বাংশে পাওয়া যায় বলিয়া এবং এই অঞ্চল বেলজিয়াম ও জার্মানীর কয়লাখনিসমূহের নিকট অবস্থিত হওয়ায় ফ্রান্সের **লৌহ ও ইস্পাতশিল্প** রুবে, লীলে নান্সি প্রভৃতি স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় লৌহ এই শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এখানকার ইস্পাত হইতে মার্সাই, হ্যাভার ও সীন অঞ্চলে জাহাজনির্মাণ-শিল্প এবং লীলে, সেন্ট এতিয়েঁ ও প্যারিস অঞ্চলে যন্ত্রপাতি-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **মদ্যশিল্পে** ফ্রান্স পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিলেও এবং এই দেশ মদ্য রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অবলম্বন করিলেও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর মদ্য বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে। বোর্দো, স্যাম্পেন ও কোৎ-দ্য-ওর অঞ্চলে মদ্যশিল্প প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। বয়নশিল্পে ফ্রান্স বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনের তুলনায় এখানে কাঁচামাল পাওয়া যায় না। সেইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে তুলা, চীন, জাপান ও ইটালি হইতে রেশম এবং অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও আর্জেন্টিনা হইতে পশম আমদানি করিয়া এখানকার বয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। মুলহাউস, লীলে, অ্যামিয়েঁ ও রুয়েঁ অঞ্চলে **কার্পাসবয়ন-শিল্প**, রুবে, অ্যামিয়েঁ, রীমস্ ও লীলে অঞ্চলে **পশমবয়ন-শিল্প** এবং রোণ উপত্যকায় অবস্থিত লিয়ঁ অঞ্চলে **রেশমবয়ন-শিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে। লিয়ঁ অঞ্চলে তুঁত গাছ হইতে রেশম উৎপন্ন হইলেও ইহা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নহে। এই দেশে প্রচুর বীট উৎপন্ন হওয়ায় **বীট-চিনিশিল্প** উন্নতি লাভ করিয়াছে। দেশের উত্তরাংশে প্যারিস উপত্যকায় অধিকাংশ চিনির কল অবস্থিত। ইহা ছাড়া জুরা অঞ্চলে ঘড়িনির্মাণশিল্প, প্যারিস অঞ্চলে রাসায়নিক দ্রব্য, বিলাস দ্রব্য ও গন্ধদ্রব্য উৎপাদনের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

পরিবহণ-ব্যবস্থা (Communcations)—পরিবহণ-ব্যবস্থায় ফ্রান্স খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছে। প্যারিসকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র দেশে **রেলপথ** বিস্তৃত। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের রেলপথের সহিত ফ্রান্সের রেলপথ যুক্ত। খনি অঞ্চলের সহিত বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র রেলপথে যুক্ত। ফ্রান্সের রেলপথের দৈর্ঘ্য ৩৯,৬০০ কিলোমিটার। তন্মধ্যে ৫,৭৯০ কিলোমিটার রেলপথ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হয়। এই দেশের প্রায় ৬'৫৬ লক্ষ কিলোমিটার **রাজপথ** আছে; ইহাদের বহু শাখা-প্রশাখা দেশের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিয়াছে। **বিমানপথ** পরিচালনায় এই দেশ বর্তমানে বিশেষ উন্নতি লাভ

করিয়াছে। প্রতিবৎসর বিমানপথে প্রায় ২৪ লক্ষ যাত্রী ও ৭'২ কোটি টন-কিলোমিটার মালপত্র পরিবাহিত হয়। দেশের অভ্যন্তরভাগের বিভিন্ন শহর এবং পৃথিবীর অন্যান্য বড় বড় শহরের সহিতও ফ্রান্স বিমান-পথে যুক্ত।

ফ্রান্সের **আভ্যন্তরীণ জলপথ** দেশের পণ্য-পরিবহণের কাজে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। সীন, মিউজ, সাওন, রোণ, গ্যারণ, লয়ের প্রভৃতি নদী ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ জলপথের উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। জলপথের পরিবহণ-খরচ অত্যন্ত কম। সেইজন্য ফ্রান্সের শিল্পসমূহ কম-খরচে জলপথে পণ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল লইয়া যাইতে পারে। এই সকল নদী বিভিন্ন খাল দ্বারা যুক্ত। ইহার ফলে বহুদূর পর্যন্ত জলপথে মালপত্র লওয়া যায়। ফ্রান্সের নাব্য নদী ও খালের মোট দৈর্ঘ্য ৮,৬৫০ কিলোমিটার: তন্মধ্যে খালসমূহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪,৮৩০ কিলোমিটার। **রোণ** নদী (৭৯০ কিলোমিটার) সুইজারল্যাণ্ডের আল্পস্ পর্বত হইতে নির্গত হইয়া ফ্রান্সের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভূমধ্যসাগরে পড়িয়াছে। বিখ্যাত মার্সাই বন্দর এই নদীর মোহনার ৩৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। রোণ নদীর সহিত এই বন্দর **মার্সাই-রোণ খাল** দ্বারা যুক্ত। রোণ নদী জার্মানীর বিখ্যাত নদী রাইনের সহিত **রাইন-রোণ খাল** দ্বারা যুক্ত। **সীন** নদী (৭৭০ কিলোমিটার) বর্গাণ্ডির পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া প্যারিস অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইংলিশ চ্যানেলে পড়িয়াছে। এই নদী **বর্গাণ্ডি খাল** দ্বারা রোণের সহিত এবং **রাইন-মার্ণ খাল** দ্বারা রাইনেব সহিত যুক্ত। এই নদী ও খালসমূহের মারফত প্রচুর পরিমাণে কয়লা পরিবাহিত হয়। **লয়ের** নদী (৯২০ কিলোমিটার) ফ্রান্সের মধ্যভাগের পার্বত্য অঞ্চল হইতে নির্গত হইয়া প্যারিস ও অর্মোরিকান অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বিস্কে উপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার সম্পূর্ণ অংশই সুনাব্য। **ক্যানাল-দ্যু-সাঁৎ** দ্বারা ইহা সাওন নদীর সহিত এবং **নান্তে-ব্রেস্ত খাল** দ্বারা ব্রেস্ত বন্দরের সহিত যুক্ত। **গ্যারণ** (৫৬০ কিলোমিটার) ও **ডরডন** নদী বিস্কে উপসাগরে পড়িয়াছে। ইহারা উভয়েই সুনাব্য। **ক্যানাল-দ্যু-মিদি** গ্যারণকে রোণের সহিত যুক্ত করিয়াছে। এই সকল নদী, উপনদী ও খালের সাহায্যে ফ্রান্সের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে সুলভে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করা সম্ভব। এই সকল জলপথ দেশের শিল্পোন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

ফ্রান্সের জলপথ, নদী ও খালদ্বারা বেলজিয়াম ও জার্মানীর জলপথের সহিত যুক্ত থাকায় বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়ক হইয়াছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)—ফ্রান্সের বিভিন্ন শিল্প বৈদেশিক কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল ; কয়লা উৎপাদন কম বলিয়া নিকটবর্তী দেশসমূহ হইতে ইহা **আমদানি** করিতে হয়। পশ্চিম জার্মানী ও বৃটেন হইতে কয়লা ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও মিশর হইতে তূলা ; অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা ও নিউজিল্যাণ্ড হইতে পশম ; চীন, জাপান ও ইটালি হইতে রেশম প্রভৃতি আমদানি করিয়া স্থানীয় শিল্পে নিয়োজিত হয়। ইহা ছাড়া ফরাসী-অধিকৃত আফ্রিকার দেশসমূহ হইতে চাউল, চিনি, কফি, রবার, খনিজ তৈল প্রভৃতি আমদানি হয়। গম আমদানি হয় আর্জেন্টিনা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হইতে ; মদ্য আমদানি হয় স্পেন ও আলজেরিয়া হইতে এবং বয়ন-যন্ত্রপাতি আমদানি হয় বৃটেন হইতে।

ফ্রান্স সাধারণতঃ শিল্পজাত দ্রব্যাদি **রপ্তানি** করিয়া থাকে ; তন্মধ্যে রেশম-বস্ত্র, কার্পাস-বস্ত্র, পশম-বস্ত্র, ইস্পাত, মোটর-গাড়ী, মদ্য প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া নিকটবর্তী পশ্চিম জার্মানী ও বেলজিয়ামে লৌহ আকরিক রপ্তানি হয়। অধিকাংশ রপ্তানি দ্রব্য বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানীতে প্রেরিত হয়। বর্তমানে ফ্রান্স "ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের" (European Common Market) সদস্য হইয়া ইউরোপের অন্যান্য পাঁচটি দেশের (বেলজিয়াম, পশ্চিম জার্মানী, ইটালি, হল্যাণ্ড ও লুক্সেমবার্গ) সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহাতে ফ্রান্সের আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগ দিলে ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্যের আরও উন্নতি হইবে।

শহর ও বন্দর—প্যারিস (Paris)—ফ্রান্সের রাজধানী, বাণিজ্যকেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সীন নদীর উপত্যকায় অবস্থিত বলিয়া ইহা একটি উৎকৃষ্ট নদী-বন্দর। এই দেশের বিচ্ছিন্ন রেলপথের ইহা প্রধান কেন্দ্র। **মার্সাই (Marseilles)**—রোণ নদীর মোহনার পূর্বপ্রান্তে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ফ্রান্সের সর্বপ্রধান বন্দর ; রোণ নদীর সহিত ইহা মার্সাই-রোণ খাল দ্বারা যুক্ত। ফ্রান্সের উত্তরাংশে অবস্থিত ক্যালে বন্দরের সহিত ইহা রেলপথে যুক্ত। রোণ নদীর সমৃদ্ধিশালী অববাহিকা এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। এই বন্দরের মারফত রেশমজাত দ্রব্যাদি, সাবান, গন্ধদ্রব্য, বিলাস-দ্রব্য, মদ্য

প্রভৃতি রপ্তানি হয় এবং কয়লা, চিনি, গম, পশম, চামড়া, তুলা, রবার, কফি প্রভৃতি আমদানি হয়। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত হওয়ায় এই বন্দরের পক্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, উভয় বাজারের সঙ্গেই ব্যবসায় চালানো সহজসাধ্য। **হ্যাভার (Havre)**—সীন নদীর মোহনায় অবস্থিত এই বন্দর মারফত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির সহিত প্রধানতঃ বাণিজ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। **লিয়ঁ (Lyons)**—রোণ নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রেশমবয়ন-শিল্পকেন্দ্র। রোণ-সাওন অববাহিকার তুঁত গাছ হইতে রেশমগুটি আহরণ করিয়া এই শহরে প্রেরিত হয়। ইহা ছাড়া জাপান, চীন ও ইটালি হইতে রেশম আমদানি করিয়া স্থানীয় শিল্পে নিয়োজিত হয়। এখানকার কুটিরশিল্প ও ছোটখাটো কারখানায় রেশম-বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বর্তমানে এই শহর রেয়ন প্রস্তুতেও খ্যাতি লাভ করিয়াছে; ফ্রান্সের শতকরা ৮০ ভাগ রেয়ন এখানে উৎপন্ন হয়। **বোর্দো (Bordeaux)**—মদ্যশিল্পের জন্য বিখ্যাত। গ্যারণ নদীর তীরে অবস্থিত এই বন্দর হইতে ফ্রান্সের অধিকাংশ মদ্য বিদেশে রপ্তানি হয়। সম্প্রতি এখানে জাহাজনির্মাণ-শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। **রুয়েঁ (Rouen)**—সীন নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর কার্পাসবয়ন-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। **লীলে (Lille)**—উত্তর-পূর্বাংশের কয়লাখনি অঞ্চলে অবস্থিত এই শহর লিনেন ও কার্পাসবয়ন-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। **সেণ্ট এতিয়েঁ (St. Etienne)**—মধ্যভাগের কয়লাখনি অঞ্চলে অবস্থিত; এই শহরে বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানকার লৌহ ও ইস্পাতশিল্প এবং রেশম-বয়নশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **ডানকার্ক (Dunkirk)**—উত্তর ফ্রান্সের একটি বন্দর। দক্ষিণ আমেরিকার সহিত এই বন্দর অধিকতর বাণিজ্য করিয়া থাকে। **ক্যালে** বন্দর মারফত বৃটেনের সহিত বাণিজ্য হইয়া থাকে।

জার্মানী (Germany)

জার্মানীর রাজনৈতিক ইতিহাসে বহু পরিবর্তন আসিয়াছে। ১৯১৪ সালের পূর্বপর্যন্ত আফ্রিকা ও ইউরোপের বহু দেশ জার্মান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। আরও রাজ্য গ্রাস করিবার আশায় জার্মানী প্রথম মহাযুদ্ধের সৃষ্টি করে, কিন্তু এই যুদ্ধে ১৯১৮ সালে জার্মানী পরাজিত হয়। ইহার ফলে জার্মানীর উপনিবেশসমূহ বিজয়ী দেশসমূহের অধীনে চলিয়া যায়। এমনকি জার্মানীর নিজস্ব ৭২,৬০০ বর্গ-কিলোমিটার স্থান বিজয়ী দেশসমূহকে ছাড়িয়া

দিতে হয়। আলসাস্-লোরেনের লৌহখনিসমূহ ও সারের কয়লাখনি অঞ্চল ইহার ফলে জার্মানীর অধিকারমুক্ত হইয়া যায়। এই সকল লৌহ ও কয়লাখনি অঞ্চল হাতছাড়া হওয়ায় জার্মানীর শিল্পোন্নয়নে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৮ সালের মধ্যেই এই দেশ হিটলারের ফ্যাসীবাদের নেতৃত্বে পুনর্গঠিত হইয়া পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল। ১৯৩৫ সালে সারা অঞ্চল জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৩৯ সালে জার্মানী অস্ট্রিয়া, বোহেমিয়া, মোরাভিয়া, স্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ নিজের করতলভুক্ত করিয়া লইল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু করিল। ১৯৪৫ সালে জার্মানী পুনরায় মিত্রশক্তির (বৃটেন, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স) নিকট পরাজিত হইল। জার্মানীর শক্তি খর্ব করিবার জন্য মিত্রশক্তিবর্গ পট্‌সডাম চুক্তি অনুসারে এই দেশটিকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করিল। উত্তর-পশ্চিম অংশ বৃটেনের, দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, পশ্চিমাংশ ফ্রান্সের এবং পূর্বাংশ রাশিয়ার সামরিক তত্ত্বাবধানে আনা হইল। ১৯৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও বৃটেনের অধিকারভুক্ত অঞ্চলসমূহ "জার্মান সাধারণতন্ত্র" (German Federal Republic) বা পশ্চিম জার্মানী নামে একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সেইরূপ রাশিয়ার অধিকারভুক্ত অঞ্চলও ১৯৪৯ সালে "জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র" (German Democratic Republic) বা পূর্ব জার্মানী নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জার্মানীর রাজধানী বার্লিন শহর পূর্ব জার্মানীতে অবস্থিত হইলেও এই শহরটিও পূর্ব বার্লিন ও পশ্চিম বার্লিন এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। পশ্চিম বার্লিন বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের সামরিক তত্ত্বাবধানে এবং পূর্ব বার্লিন পূর্ব জার্মানীর রাজধানী হিসাবে পূর্ব জার্মানীর অধীনে চলিয়া যায়। বর্তমানে বন পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী।

পশ্চিম জার্মানীর আয়তন ২,৪৫,৩৫৯ বর্গ-কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৬·৫ কোটি ; পূর্ব জার্মানীর আয়তন ১,০৭,১৭৩ বর্গ-কিলোমিটার এবং লোক-সংখ্যা ১·৭ কোটি। জার্মানীর অধিকাংশ লোক শহরাঞ্চলে বাস করে। কয়লাখনি অঞ্চলের লোকবসতি ঘন। কৃষি অঞ্চলের লোকবসতি নাতিনিবিড়।

ভূ-প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক অঞ্চল—ভূ-প্রকৃতি অনুসারে জার্মানীকে প্রধানতঃ দুইটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়:—(ক) উত্তর জার্মানীর সমভূমি এবং (খ) দক্ষিণাংশের উচ্চভূমি।

(ক) **উত্তর জার্মানীর সমভূমি** ইউরোপের বিশাল সমতলভূমির অংশ; বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের সীমানা হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা বাল্‌টিক্‌ রাজ্যসমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের উপর দিয়া ওয়েজার, রাইন, এল্‌ব্‌, এম্‌স্‌, ওডার প্রভৃতি নদী প্রবাহিত। বালুকা দ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া এখানকার মৃত্তিকা অনুর্বর এবং কৃষিকার্যের সহায়ক নহে। সেইজন্য

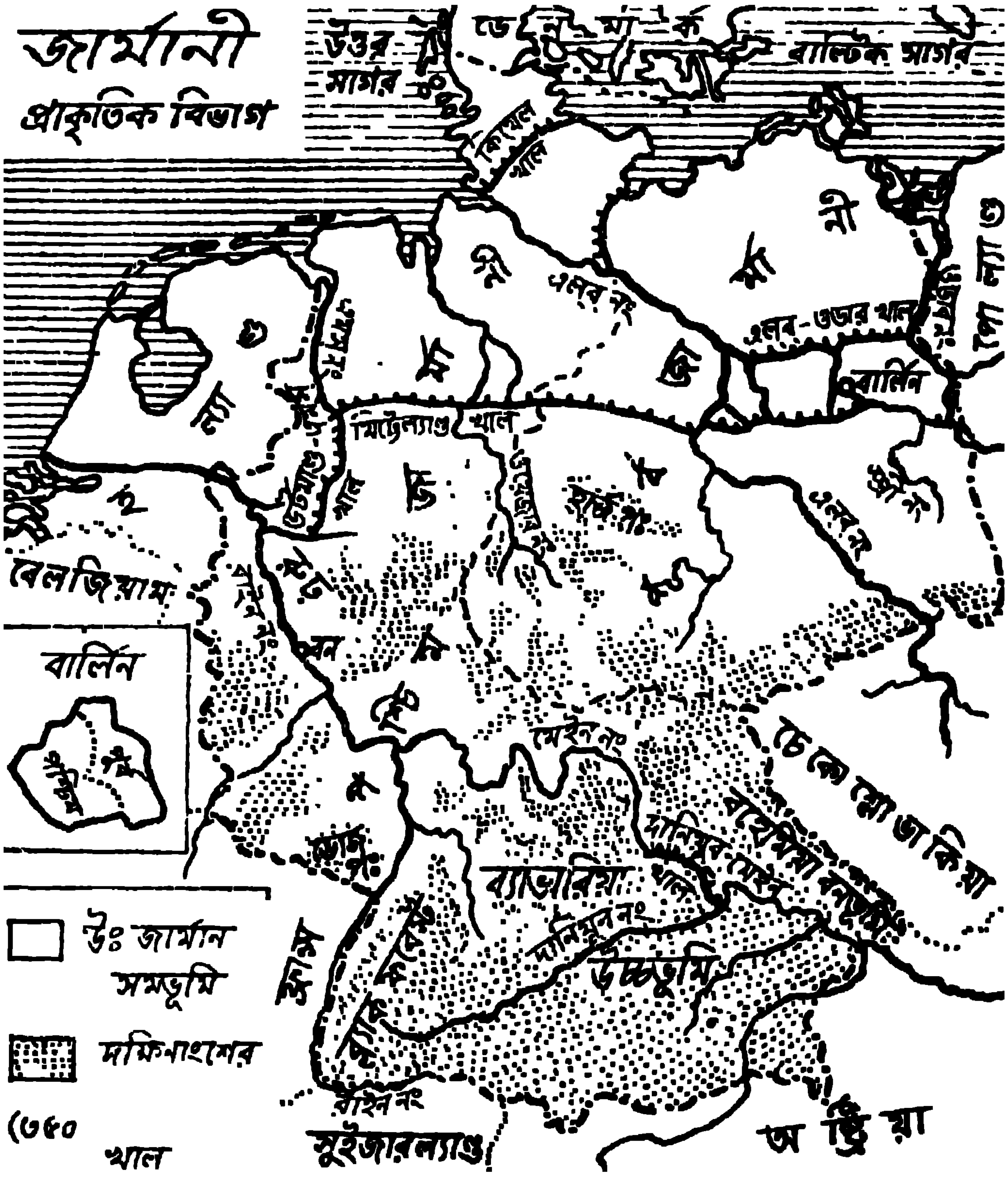

অত্যধিক সার ও জলসেচের সাহায্যে এখানে কৃষিকার্য হইয়া থাকে; রাই এখানকার প্রধান ফসল; যই, গম, আলু এবং বীট প্রভৃতি শস্যও প্রচুর পরিমাণে এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের উত্তরাংশে বনভূমি লক্ষ্য করা যায়। কৃষিক্ষেত্র অধিকাংশই দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এই অঞ্চলের দক্ষিণাংশে হার্জ পর্বত হইতে বিভিন্ন নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

(খ) **দক্ষিণাংশের উচ্চভূমি** রাইন উপত্যকা হইতে চেকো-স্লোভাকিয়া ও অস্ট্রিয়ার সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের বিভিন্ন মালভূমি কোন কোন স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আল্পস্ পর্বত এই অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত হওয়ায় এখানকার উচ্চভূমি সাধারণতঃ উত্তরদিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাইন নদীর উপত্যকায় সমতলভূমি বিদ্যমান। এই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ সম্পদ থাকায় শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। রাইন উপত্যকায় বিখ্যাত রুঢ় শিল্পাঞ্চল অবস্থিত। এসেন, আচেন প্রভৃতি অঞ্চলে বহু শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের পশ্চিমাংশে রাইন নদী বিভিন্ন গিরিখাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। রাইন নদীর নিম্ন উপত্যকা উর্বর; এখানে যব, গম, তামাক ও আঙ্গুর উৎপন্ন হয়।

রাইন উপত্যকা ব্যতীত দক্ষিণাংশের অন্যান্য স্থান মালভূমি; ইহা **ব্যাভেরিয়া উচ্চভূমি** নামে পরিচিত। এই মালভূমির উচ্চতা প্রায় ৩৫০ মিটার। এই মালভূমি পশ্চিমে ব্ল্যাক ফরেস্ট হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে বোহেমিয়ার বনভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত; পার্বত্য অঞ্চলে সরলবর্গীয় বৃক্ষ বিদ্যমান। বহুস্থানে তৃণভূমি থাকায় মেষপালনের সুবিধা হইয়াছে। এই অঞ্চলের উর্বর মৃত্তিকায় যব, রাই ও গম উৎপন্ন হয়। বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল শিল্পদ্রব্য (খেলনা, পেনসিল ইত্যাদি) এখানে প্রস্তুত হয়। কয়লাখনি দূরে অবস্থিত হওয়ায় ভারী শিল্প এই অংশে বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই।

জলবায়ু (Climate)—জার্মানীর পশ্চিমাংশের জলবায়ু মৃদু; কিন্তু অন্যান্য অংশে প্রখর গ্রীষ্ম ও শীতল শীত বিদ্যমান। শীতকালীন তাপমাত্রা হিমাঙ্ক পর্যন্ত নামিয়া আসে; কিন্তু গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ২৭° সেঃ পর্যন্ত ওঠে। এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম—প্রায় ৫০ সেঃ মিঃ। দক্ষিণে আল্পস্ পর্বত থাকায় এবং আটলান্টিক হইতে দূরে অবস্থিত হওয়ায় এই দেশের পূর্বাংশ ও দক্ষিণাংশ পশ্চিমা-বায়ুর আওতায় আসে না। দেশের পশ্চিমাংশে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় জলবায়ু এবং পূর্বাংশে মহাদেশীয় জলবায়ু বিদ্যমান। যতই পূর্বে যাওয়া যায়, ততই শীত-গ্রীষ্মের তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণাংশে শীতের তীব্রতা কিছু কম থাকায় আঙ্গুর-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কৃষিকার্য (Agriculture)—জার্মানীর অধিকাংশ কৃষি-জমি উর্বর নহে। কিন্তু অত্যধিক সার ও কৃষি-যন্ত্রের প্রয়োগের ফলে এখানে হেক্টর-প্রতি

উৎপাদন অত্যন্ত বেশী। এই দেশে অতি-উৎপাদন কৃষি-ব্যবস্থা (Intensive cultivation) প্রচলিত; কারণ কম জমিতে বেশী শস্য উৎপাদন করিতে হয়।

হেক্টর-প্রতি উৎপাদন (কিলোগ্রাম)

রাই	২,৫৮০	আলু	২০,৫০০
বীট	৩৭,৩১০	গম	৩,৫৪০
যই	২,৭৮০	যব	৩,১৯০

জার্মানীর দক্ষিণ-পূর্ব অংশে প্রধানতঃ গম ও বীটের চাষ হয়; দেশের অধিকাংশ স্থানেই রাই ও আলু উৎপন্ন হয়। বীট-উৎপাদনে জার্মানী পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান, রাই-উৎপাদনে তৃতীয় স্থান এবং যই-উৎপাদনে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ম্যাগডেবার্গ অঞ্চল বীট-চাষের জন্য বিখ্যাত। অধিকাংশ জমি অনুর্বর বলিয়া রাই এই দেশের প্রধান ফসল। এখানকার আলু হইতে সুরাসারও প্রস্তুত হয়।

কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩-৬৪)

(লক্ষ মেঃ টন)

	পঃ জার্মানী	পূঃ জার্মানী		পঃ জার্মানী	পূঃ জার্মানী
গম	৪৯	১৩	যব	৩৬	১২
রাই	৩২	১৪	বীট	১১৭	৫৭
যই	২৩	১১	আ	২৪৭	১২৫

পশুপালনে জার্মানী মোটামুটি উন্নতি লাভ করিয়াছে। পশ্চিম জার্মানীতে প্রায় ১'২ কোটি গবাদি পশু, ১'৫ কোটি শূকর এবং ১১ লক্ষ মেষ আছে। পূর্ব জার্মানীতে প্রায় ৩৫ লক্ষ গবাদি পশু, ৮৩ লক্ষ শূকর ও ২১ লক্ষ মেষ আছে। **মৎস্য-শিকারেও** এই দেশ উন্নত। উত্তর সাগর, বাল্টিক সাগর ও জার্মানীর নদীসমূহ হইতে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য উত্তোলিত হয়। প্রতিবৎসর প্রায় ৭ লক্ষ মেঃ টন মৎস্য শিকার হইয়া থাকে।

খনিজ সম্পদ (Minerals)—জার্মানীর খনিজ সম্পদ-উৎপাদনে প্রায় ৮ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। খনিজ দ্রব্য এই দেশের প্রধান সম্পদ। পূর্ব জার্মানীর তুলনায় পশ্চিম জার্মানীর খনিজ সম্পদ অনেক বেশী। **কয়লা-উৎপাদনে** এই দেশ পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। পশ্চিম জার্মানীর রুঢ় ও সার অঞ্চলে ও পূর্ব জার্মানীর স্যাক্সনী অঞ্চলেই অধিকাংশ কয়লা

পাওয়া যায়। রুঢ় অঞ্চলেই সর্বাধিক কয়লা উত্তোলিত হয়। পূর্ব জার্মানীতে প্রচুর পরিমাণে লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায়; ইহার পরিমাণ প্রায় ২২ কোটি

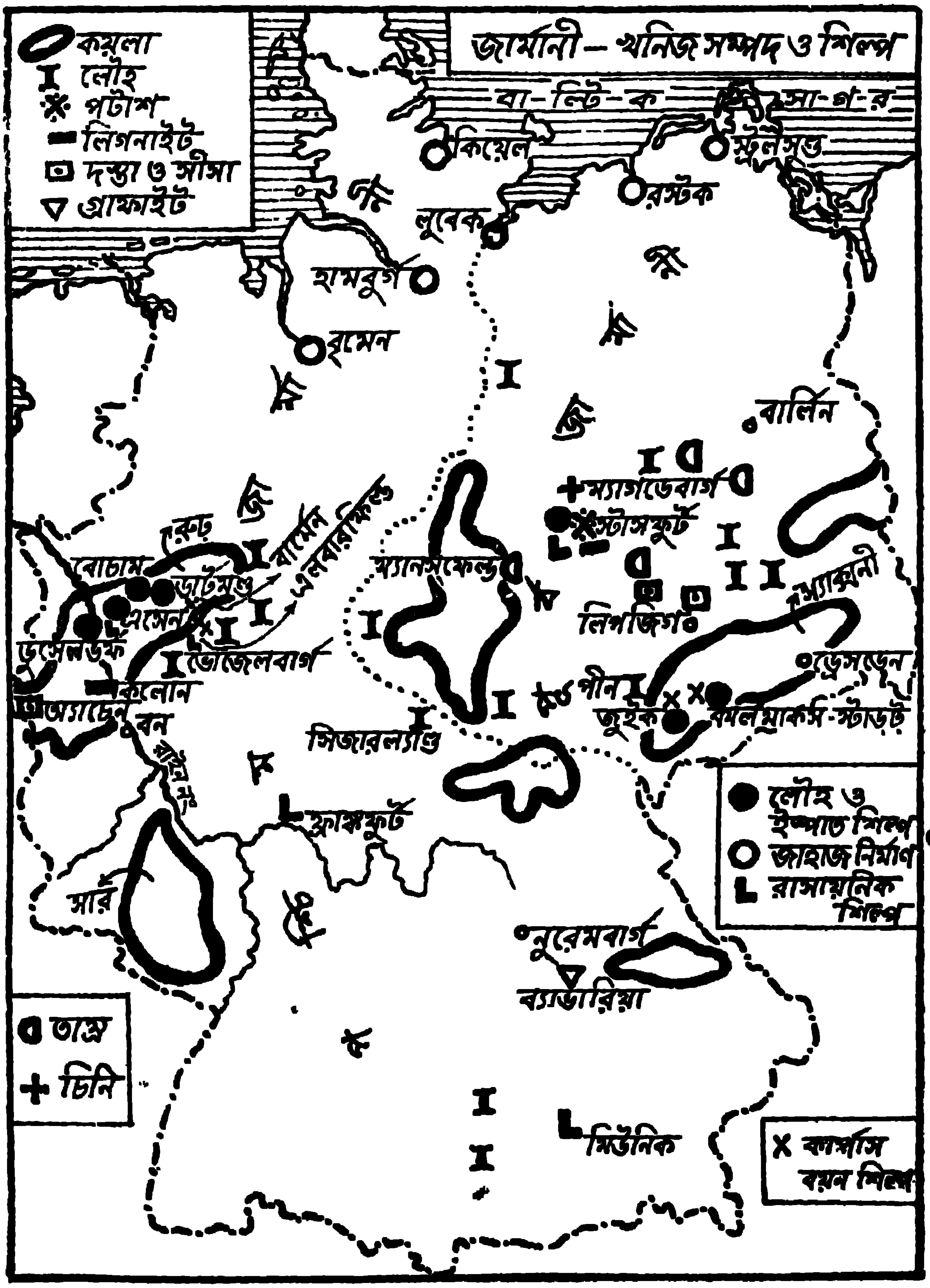

মেঃ টন। সাধারণতঃ ৯ মেঃ টন লিগনাইট কয়লা দ্বারা ১ মেঃ টন বিটুমিনাস কয়লার কাজ হয়। পূর্ব জার্মানী লিগনাইট-উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এখানকার স্যাক্সনী অঞ্চলে অধিকাংশ লিগনাইট

কয়লা পাওয়া যায়। পশ্চিম জার্মানীর রাইন উপত্যকার কলোন অঞ্চলেও লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায়। বিদ্যুৎ-উৎপাদনে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। লৌহ আকরিক-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে অষ্টম স্থান অধিকার করে। ইহা প্রধানতঃ উৎপন্ন হয় সিজারল্যাণ্ড অঞ্চলে। ভোজেল-বার্গ ও পীন অঞ্চলেও লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এখানকার লৌহ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। ভোজেলবার্গ ও সিজারল্যাণ্ডের লৌহ প্রধানতঃ রূঢ় শিল্পাঞ্চলে প্রেরিত হয়। রাইন উপত্যকায় অ্যাচেনে দস্তা ও সীসা পাওয়া যায়। হার্জ পর্বতের নিকট ম্যানস্ফেল্ডে তাম্রখনি আছে। ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে গ্রাফাইট ও স্টাসফুর্ট অঞ্চলে পটাশ পাওয়া যায়। হল্যাণ্ডের সীমানার নিকট এম্স্ল্যাণ্ডে এবং দক্ষিণ স্যাক্সনীতে খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩)

(লক্ষ মেঃ টন)

	পঃ জার্মানী	পূঃ জার্মানী		পঃ জার্মানী	পূঃ জার্মানী
কয়লা	১,৪২১	২৭	খনিজ তৈল	৫৭	—
লিগনাইট	১০৮৪	২,৫৭৪	তাম্র	৩'০২	—
লৌহ আকরিক	১৩২	১৬	দস্তা	২'০৩	—
পটাশ	১৬৭	১৭	সীসা	১'৪৬	—

শ্রমশিল্প (Industries)—জার্মানী পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান দেশ। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষায় এই দেশ অত্যন্ত উন্নত। প্রায় ১ কোটি ২৩০ লক্ষ লোক এখানকার শিল্পে নিযুক্ত। খরচ কমাইবার পন্থা (Rationalisation) গ্রহণ করায় অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এখানকার শিল্পদ্রব্যের খরচ কিছুটা কম। জার্মানীর শিল্পকেন্দ্রসমূহ দেশের সীমানার নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় দুইটি মহাযুদ্ধের আঘাতে শিল্পসমূহ বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু নিজেদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা ইহারা খুব শীঘ্রই শিল্প-উৎপাদন যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছে। স্থানীয় কয়লা ও লৌহ আকরিক দেশের শিল্পোৎপাদনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু লৌহ আকরিকের উৎপাদন দেশের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নহে। ইহা ছাড়া এই দেশের তাম্র, রাং, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ, টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম, মলিবডেনাম, নিকেল, কোবাল্ট, ভ্যানেডিয়াম প্রভৃতি ধাতব খনিজ ও খনিজ তৈলের অভাব, পশম, কার্পাস ও অন্যান্য শিল্প-ফসলের অপ্রাচুর্য এখানকার

শিল্পের উন্নতিতে কিছুটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য এবং শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের বাজারের জন্য এই দেশকে বিভিন্ন সময় সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিতে হইয়াছে। দুইটি মহাযুদ্ধেই জার্মানীকে বিরাট পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। বিভক্ত জার্মানীর পশ্চিম অংশেই অধিকাংশ শিল্প অবস্থিত।

শিল্প-দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩)

(লক্ষ মেঃ টন)

	পঃ জার্মানী	পূঃ জার্মানী		পঃ জার্মানী	পূঃ জার্মানী
ইস্পাত	৩১৬	৩৩	জাহাজ		
কার্পাস-বস্ত্র	২·৫৮	·৩৪	(লক্ষ GRT)	৯·৮	—
বীট-চিনি	২১	৭·৩	মোটর-গাড়ী (লক্ষ)	৪	৮

রুঢ় শিল্পাঞ্চল—পশ্চিম জার্মানীর শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল রুঢ়। এই দেশের অধিকাংশ শিল্প এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই শিল্পাঞ্চলের দৈর্ঘ্য ৮০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ৪০ কিলোমিটার। এই অঞ্চলে প্রায় ১২টি বড় শহর বিদ্যমান যেখানে লোকসংখ্যা এক লক্ষ হইতে পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত। এই শিল্পাঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প অত্যন্ত সুন্দরভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইস্পাত-উৎপাদনে ইউরোপে রাশিয়ার পরেই এই অঞ্চলের স্থান। লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প ছাড়াও এই অঞ্চলে যন্ত্রপাতি-শিল্প, বয়নশিল্প ও রাসায়নিক শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

এই অঞ্চলের শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে—(ক) উৎকৃষ্ট কোক কয়লার অপর্যাপ্ত সরবরাহ; (খ) রাইন নদী ও বিভিন্ন খালের সাহায্যে গঠিত উৎকৃষ্ট জলপথ; (গ) স্থানীয় শ্রমিকদের দক্ষতা ও কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শিতা; (ঘ) কলোন হইতে আগত ব্যবসায়ীদের মূলধন এবং (ঙ) ইউরোপের শিল্পোন্নত অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিতি। এখানকার ইস্পাতশিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে উপরিউক্ত কারণসমূহ এবং সুইডেন, লোরেন, স্পেন, আলজেরিয়া, টিউনিসিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আগত লৌহসম্ভার। রাইন নদীর সুলভ জলপথে এই সকল দেশ হইতে লৌহ আকরিক শিল্পকেন্দ্রে আনা হয়। ফ্রান্সের লোরেন অঞ্চলের লৌহ আকরিক রুঢ় অঞ্চলের অত্যন্ত নিকটে থাকায় এবং রেলপথের সুবন্দোবস্ত থাকায় লোরেন অঞ্চলের লৌহ আকরিকও রুঢ়

অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের সৃষ্টি হওয়ায় লৌহ-আমদানির আরও সুবিধা হইয়াছে। এই সকল কারণে রুঢ় শিল্পাঞ্চল ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল।

লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প—লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে **পশ্চিম জার্মানী** 'পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এখানকার লৌহ আকরিকের উৎপাদন শিল্পের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নহে; সেইজন্য সুইডেন, ফ্রান্স ও স্পেন হইতে এখানে লৌহ আমদানি করা হয়। রুঢ় অঞ্চলে এখানকার বৃহত্তম ইস্পাতশিল্প অবস্থিত। পশ্চিম জার্মানীর মোট লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ রুঢ় অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। স্থানীয় কয়লা, রাইন ও অন্যান্য নদীর জলপথের সুবন্দোবস্ত, স্থানীয় শ্রমিকের নিপুণতা ও সরকারের সাহায্য এখানকার শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করিয়াছে। এচেন, বোচাম, ডার্টমণ্ড, ডুসেলডর্ফ প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্র।

পূর্ব জার্মানীর স্টাস্‌ফুর্ট, কার্ল-মার্কস্‌-স্টাড্‌ট্‌ (চেম্‌নিজ) ও জুইক অঞ্চলে আমদানীকৃত লৌহের সাহায্যে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। রাশিয়ার লৌহ এবং পোল্যাণ্ডের কয়লা এখানকার শিল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

জাহাজনির্মাণ-শিল্প—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানী এই শিল্পে উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল। ভগ্ন তটরেখা, তটরেখার নিকটবর্তী জলের গভীরতা, বন্দর হইতে কয়লাখনির নৈকট্য এবং ইস্পাতশিল্পের উন্নতি এই দেশের জাহাজনির্মাণ-শিল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। পশ্চিম জার্মানীর এল্‌ব্‌ নদীর মোহনায় হামবুর্গ, লুবেক উপসাগরের তীরে অবস্থিত লুবেক, ওয়েজার নদীর মোহনায় অবস্থিত ব্রমেন এবং কিয়েল খালের তীরে অবস্থিত কিয়েল বন্দর এখানকার উল্লেখযোগ্য জাহাজনির্মাণ-কেন্দ্র। পূর্ব জার্মানীর হ্যাভেল নদীর মুখে অবস্থিত রস্টক এবং স্ট্রলসুণ্ড জাহাজনির্মাণের জন্য বিখ্যাত। ১৯৫১ সালে এই দেশের জাহাজনির্মাণের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এখানকার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বর্তমানে জাহাজনির্মাণে জাপান ও বৃটেনের পরেই জার্মানীর স্থান।

জাহাজ-নির্মাণ (হাজার GRT)

১৯৫০	১৪১	১৯৫২	৫০৩
১৯৫১	৩০২	১৯৬৩	৯৮০

মোটর-গাড়ী-উৎপাদনে বর্তমানে এই দেশ পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই শিল্পে প্রায় আড়াই লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে।

কার্পাস-বয়নশিল্প—কার্পাস-বস্ত্র-উৎপাদনে পশ্চিম জার্মানী পৃথিবীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। মার্কিন, যুক্তরাষ্ট্র ব্রেজিল ও মিশর হইতে তুলা আমদানি করিয়া এখানকার কার্পাস-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। রটারডাম (হল্যাণ্ড) ও হামবুর্গ বন্দর মারফত তুলা আমদানি ও বস্ত্র রপ্তানি হইয়া থাকে। রুঢ় অঞ্চলের কয়লা এবং রাইন ও এল্‌ব্‌ নদীর সুন্দর জলপথ এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। রুঢ় অঞ্চলের বার্মেন ও এল্‌বারফিল্ড উল্লেখযোগ্য কার্পাস-শিল্পকেন্দ্র। পূর্ব জার্মানীর স্যাক্সনী অঞ্চলের কার্ল-মার্কস্‌-স্টাড্‌ট্‌ (চেম্‌নিজ) এই দেশের শ্রেষ্ঠ কার্পাস-শিল্পকেন্দ্র ; এই দেশের জুইক শহরও কার্পাস-শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

বীট-চিনিশিল্প—পূর্ব জার্মানীর ম্যাগডেবার্গ এই দেশের শ্রেষ্ঠ চিনি-শিল্পকেন্দ্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এই দেশ বীট-চিনি-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিলেও বর্তমানে রাশিয়া সেই স্থান অধিকার করিয়াছে।

রাসায়নিক শিল্প—জার্মানী বহুদিন যাবৎ এই শিল্পে পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই দেশের কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, গবেষণা এবং পটাশের প্রচুর সরবরাহ এই দেশের রাসায়নিক শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণ। এল্‌ব্‌ ও রুঢ় উপত্যকায় এই শিল্প প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম জার্মানীর রাইন উপত্যকায় এসেন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, এলবারফিল্ড ও লিডুইগস্থাফেন এবং মিউনিক বিখ্যাত রাসায়নিক শিল্পকেন্দ্র। পূর্ব জার্মানীর এল্‌ব্‌ উপত্যকায় স্টাস্‌ফুর্টে ও স্কুনেবেকে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইহা ছাড়া পশ্চিম জার্মানীর এচেন অঞ্চলে এবং পূর্ব জার্মানীর কার্ল-মার্কস্‌-স্টাড্‌টে পশমবয়ন-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলেও এই শিল্প কমবেশী পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব জার্মানীর লিপজিগ ও স্টার্টগার্ট এবং মেইন নদীর উপত্যকায় আচকেনবার্গ কাগজশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

পরিবহণ-ব্যবস্থা (Communications)—জার্মানীর অর্থনৈতিক উন্নতিতে দেশের পরিবহণ-ব্যবস্থা সর্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছে। স্থল,

জল ও আকাশপথে দেশের সমগ্র অংশ সুন্দরভাবে সংযোজিত। জার্মানীর **রেলপথ** পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিবহণ-ব্যবস্থা। পশ্চিম জার্মানীর রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬,০০০ কিলোমিটার এবং পূর্ব জার্মানীর রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫,০০০ কিলোমিটার। দেশের ভূ-প্রকৃতি বিশেষ উঁচু-নীচু না হওয়ায় রেলপথ-নির্মাণে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় নাই। **আকাশপথে** দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং পৃথিবীর বড় বড় শহরে যাইবার সুবন্দোবস্ত আছে। জার্মানীর সুন্দর দীর্ঘ ও সোজা **রাজপথ** পণ্যবহনের সহায়ক।

জার্মানীর **আভ্যন্তরীণ জলপথ** দেশের পরিবহণ-ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বিভিন্ন নদী সুনাব্য ও খাল দ্বারা একে অপরের সহিত সংযুক্ত। বেলজিয়াম, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডের সহিত জার্মানী খালপথে যুক্ত। এল্‌ব্‌ নদীকে কিয়েল খাল বাল্টিক সাগরের সহিত যুক্ত করিয়াছে। দানিয়ুব নদীকে মেইন নদীর সহিত দানিয়ুব-মেইন খাল দ্বারা সংযুক্ত করা হইয়াছে। রাইন নদীর উপত্যকায় অবস্থিত ডুইসবার্গ শহর পর্যন্ত সমুদ্রগামী জাহাজ আসিতে পারে; এই শহর হইতে ডার্টমাণ্ড-এম্‌স্‌ খাল কাটিয়া এম্‌স্‌ নদীকে রাইনের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। ডার্টমাণ্ড-এম্‌স্‌ খাল হইতে মিটেল্যাণ্ড খাল কাটিয়া এম্‌স্‌ নদীকে ওয়েজার ও এল্‌ব্‌ নদীকে রাইন নদীর সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। রাইন নদী ফ্রান্সের জলপথের সহিত রাইন-রোণ ও রাইন-মার্ণ খাল দ্বারা সংযুক্ত (১০৩ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

এল্‌ব্‌ নদী ও ওডার নদী এল্‌ব্‌-ওডার খাল দ্বারা যুক্ত। ওডার নদী পোল্যাণ্ডের ভিশ্চুলা নদীর সহিত ব্রমবার্গ খাল দ্বারা যুক্ত। এই সকল নদী ও খাল জার্মানীর শিল্পসমূহের কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির পরিবহণের সহায়ক। ইহা ছাড়া স্প্রী, ইন্‌, এলার প্রভৃতি ছোটখাটো নদীগুলিও সুনাব্য। জার্মানীর পরিবহণের উপযুক্ত নদী ও খালের দৈর্ঘ্য প্রায় ১১,৩০০ কিলোমিটার। এই দেশের মোট পণ্যদ্রব্যের শতকরা ২০ ভাগ জলপথে পরিবাহিত হয়। মিটেল্যাণ্ড খাল জার্মানীর পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা পরে এল্‌ব্‌-ওডার ও ওডার-ভিশ্চুলা খালের সহিত যুক্ত হইয়াছে; ভিশ্চুলা নদীকে পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার সরকার খাল কাটিয়া নীস্টার নদীর সহিত যুক্ত করিতেছে। ইহার ফলে পশ্চিম জার্মানী হইতে জলপথে সোজা রাশিয়া পর্যন্ত যাওয়া যাইবে।

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)—জার্মানী শিল্পোন্নত দেশ বলিয়া স্বভাবতঃই বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়াছে। উত্তর জার্মানীর বিভিন্ন বন্দর (হামবুর্গ, ব্রেমেন, লুবেক, কিয়েল, এমডেন) মারফত এবং বেলজিয়ামের আন্তওয়ার্প ও হল্যাণ্ডের রটারডাম বন্দর মারফত এই দেশের সহিত সমুদ্রপথে বৈদেশিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়। ইহা ছাড়া ফ্রান্স, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, হল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রাশিয়া পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত স্থলপথে ও আভ্যন্তরীণ জলপথে বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

জার্মানীর রপ্তানি-বাণিজ্য

পশ্চিম জার্মানী	(কোটি মার্ক)	পূর্ব জার্মানী	(কোটি রুব্‌ল)
হল্যাণ্ড	৩০০	রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড	৫৮০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৬৪	পশ্চিম জার্মানী	৮৪
বেলজিয়াম	২৪৫	অন্যান্য	৯১
সুইডেন	২২৭		
ফ্রান্স	২১৬		
সুইজারল্যাণ্ড	২০৬		
বৃটেন	১৪৬		

পশ্চিম জার্মানীর বাণিজ্য সাধারণতঃ পশ্চিম ইউরোপের ও উত্তর আমেরিকার দেশসমূহের সহিত হইয়া থাকে। এই দেশের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে শিল্পের কাঁচামাল শতকরা ৩০ ভাগ; যথা, তূলা, লৌহ, পশম, তৈলবীজ, কাষ্ঠমণ্ড। খাদ্যদ্রব্য শতকরা ৩২ ভাগ; যথা, খাদ্যশস্য, মদ্য, তামাক, কফি, কোকো। পশ্চিম জার্মানীর রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে অধিকাংশই শিল্পজাত দ্রব্য। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য-বৃদ্ধির আশায় পশ্চিম জার্মানী "ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের" (European Common Market) সদস্য হইয়াছে। ইহার ফলে এই বাজারের অন্যান্য সদস্যদের (বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, লুক্সেমবার্গ, ইটালি ও ফ্রান্স) মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃটেন এই বাজারের সদস্য হইলে পশ্চিম জার্মানীর সহিত বৃটেনের বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পাইবে।

পূর্ব জার্মানী শিল্পে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত ছিল। কিন্তু বর্তমানে রাশিয়ার অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য এই দেশ শিল্পে প্রভূত উন্নতি লাভ

করিয়াছে। বিভিন্ন শিল্পগঠনের সাজ-সরঞ্জাম রাশিয়া এই দেশকে রপ্তানি করিয়াছে। ইহার ফলে পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য সর্বাধিক। এই দেশের মোট বাণিজ্যের শতকরা ৭০ ভাগ রাশিয়ার সহিত সংঘটিত হয়। আমদানি-দ্রব্যের মধ্যে ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য, চিনি, পশম-বস্ত্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শহর ও বন্দর (Cities & Ports): বার্লিন (Berlin)—জার্মানীর বৃহত্তম শহর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে বার্লিনকে চারিটি ভাগ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বৃটেন ও রাশিয়ার সামরিক তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। পরে পশ্চিমী শক্তিবর্গের অংশ একত্রিত হইয়া পশ্চিম বার্লিন নামে অভিহিত হয়। রাশিয়ার অংশ পূর্ব বার্লিন নামে পূর্ব জার্মানীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং ইহা বর্তমানে পূর্ব জার্মানীর রাজধানী। পশ্চিম বার্লিনের আয়তন ৪৮১ বর্গ-কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ২২ লক্ষ। পূর্ব জার্মানীর আয়তন ৪০৩ বর্গ-কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ। স্প্রী ও হ্যাভেল নদীর তীরে এবং জার্মানীর রেলপথের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া এই শহর সমগ্র দেশের সহিত সুন্দর পরিবহণ-ব্যবস্থা দ্বারা সংযুক্ত। ইউরোপের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের পক্ষে এই শহর উৎকৃষ্ট। লোকসংখ্যায় ইউরোপে লণ্ডনের পরেই বার্লিনের স্থান।

বন (Bonn)—রাইন নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী। **কলোন (Cologne)**—রাইন নদীর তীরে অবস্থিত নদী-বন্দর। ইহা ইস্পাত ও মদ্যশিল্পের জন্য বিখ্যাত। ইহা পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত রেলকেন্দ্র ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। **হামবুর্গ (Hamburgh)**—সমুদ্র হইতে প্রায় ১৩৩ কিলোমিটার দূরে এল্‌ব্ নদীর উপর অবস্থিত। এই বন্দর পশ্চিম জার্মানীর শ্রেষ্ঠ বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার মারফত পশ্চিম জার্মানী, নরওয়ে, সুইডেন ও বাল্‌টিক রাজ্যসমূহের পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহা একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম বন্দর (Entrepot)। বিখ্যাত রুঢ় শিল্প-কেন্দ্রের সহিত ইহা জলপথে যুক্ত। ইহার মারফত তুলা, কফি, কোকো, কয়লা, পশম প্রভৃতি আমদানি হয় এবং নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য, লবণ, চিনি ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হয়। এখানকার জাহাজনির্মাণ-শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **বৃমেন (Bremen)**—ওয়েজার নদীর তীরে অবস্থিত পশ্চিম জার্মানীর বন্দর। ইহা জাহাজনির্মাণ-শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

ড্রেসডেন (Dresden)—এল্‌ব্ নদীর তীরে অবস্থিত পূর্ব জার্মানীর এই শহর যন্ত্রপাতি, চিনি, মৃৎশিল্প ও মদ্যশিল্পের জন্য বিখ্যাত। **লিপজিগ (Leipzig)**—এল্‌ব্ নদীর তীরে অবস্থিত পূর্ব জার্মানীর এই শহর একটি জগদ্বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে চর্ম, পুস্তক, পশমবয়ন ও বাদ্যযন্ত্রের শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। **ম্যাগডেবার্গ (Magdeburg)**—পূর্ব জার্মানীর এই শহর এল্‌ব্ নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিনি-শিল্পকেন্দ্র। **কার্ল-মার্কস-স্টাড্‌ট্ (Karl Marx Stadt)** পূর্ব জার্মানীর শিল্পকেন্দ্রে অবস্থিত। ইহার পূর্বতন নাম চেম্‌নিজ। এখানে লৌহ ও ইস্পাত, চিনি, পশমবয়ন ও কার্পাসবয়ন শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহা জার্মানীর শ্রেষ্ঠ কার্পাস-শিল্পকেন্দ্র।

প্রশ্নাবলী

রাশিয়া

1. Describe the reasons why U. S. S. R. is today one of the foremost countries of the world, and narrate how she developed gradually under different plans.

উঃ—রাশিয়ার 'অর্থনৈতিক উন্নতির কারণ' এবং 'অর্থনৈতিক উন্নতির ইতিহাস' (২৩ পৃঃ—২৭ পৃঃ) লিখ।

2. What are the agricultural commodities of which Soviet Russia is the leading producer in the world? In which part of Soviet Russia are these produced? Briefly describe the special features of Soviet agriculture.

[C. U. B. Com. 1958]

উঃ—রাশিয়ার 'কৃষিজ সম্পদ' (২৭ পৃঃ—২৯ পৃঃ) এবং গম, রাই, যব, যই, বীট, অতসী, আলু ও শণ (৩১—৩৩ পৃঃ) সম্বন্ধে লিখ।

3. "Self-sufficiency is the keynote of the economy of the U. S. S. R."—Discuss the statement with special reference to the principal agricultural, mineral and industrial products of Soviet Russia. [C. U. B. Com. 1955].

উঃ—রাশিয়ার কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ বর্ণনা করিয়া দেখাও যে, রাশিয়া এই সকল দ্রব্যে স্বাবলম্বী (৩০ পৃঃ—৩৯ পৃঃ, ৪২ পৃঃ—৪৯ পৃঃ)। এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার 'বৈদেশিক বাণিজ্য' (৫৪ পৃঃ) হইতে দেখাও যে, রাজনৈতিক কারণে রাশিয়াকে সর্বদাই স্বাবলম্বী হইতে হইয়াছে।

4. Write an account of the soil and climatic conditions in the different agricultural regions of the Soviet Union, and the chief agricultural products of each. [C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উঃ—'কৃষিজ অঞ্চল' (২৯ পৃঃ—৩০ পৃঃ) লিখ।

5. Examine how far it is true to say that in its long-term programme for the geographical distribution of industries, Soviet planning has treated the fuel and power network as the basis of its industrial structure.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1963]

উ :—'শক্তিসম্পদ ও কাঁচামাল এবং রাশিয়ার শিল্প-পরিকল্পনা' (৪০ পৃঃ—৪২ পৃঃ) লিখ।

6. Give an idea of the manufacturing industries in the principal industrial regions of U. S. S. R. [B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উঃ— 'শ্রমশিল্প'—শিল্পাঞ্চল' অধ্যায়ের 'রাশিয়া' লিখ।

7. Comment on the geographical distribution of industries in the U. S. S. R. with reference to the raw material position.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1962]

উঃ—রাশিয়ার 'শ্রমশিল্প' (৪০ পৃঃ—৪৯ পৃঃ) হইতে শিল্পের কাঁচামাল সম্পর্কে লিখ।

8. Narrate briefly recent development of foreign trade of the U. S. S. R.

উঃ—রাশিয়ার 'বৈদেশিক বাণিজ্য' (৫৪ পৃঃ—৫৫ পৃঃ) লিখ।

বৃটেন

9. Discuss the geographical factors influencing the growth of Britain's prosperity and trade. Do you think Britain can still count on those factors ?

[C. U. Three-Year Degree Course B. Com. 1962]

উঃ—বৃটেনের 'অর্থনৈতিক উন্নতির কারণ' (৫৭ পৃঃ—৫৯ পৃঃ) লিখ এবং 'রপ্তানি' ([illegible] পৃঃ—৮৭ পৃঃ) ও 'শ্রমশিল্প' (৭২ পৃঃ—৭৩ পৃঃ) হইতে বৃটেনের ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

10. Discuss the importance of ship-building industry of Great Britain, Account for the location and the principal concentrations of the industry.

[C. U. B. Com. 1956]

উঃ—বৃটেনের 'জাহাজনির্মাণ-শিল্প' (৭৬ পৃঃ—৭৭ পৃঃ) লিখ।

11. Write an account of the Cotton Textile trade of Great Britain stating (a) the centres of manufacture, (b) the sources of raw materials, and (c) the markets to which Great Britain sends her products.

[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1963]

উঃ—বৃটেনের 'কার্পাসবয়ন-শিল্প' (৭৭ পৃঃ—৮১ পৃঃ) লিখ।

12. Describe the principal coalfields of Great Britain and show how these have helped the development of her industry.

[C. U. B. Com. 1946 ; B. U. Inter. 1962]

উঃ—বৃটেনের 'কয়লা' (৬৮ পৃঃ—৭১ পৃঃ) লিখ।

13. Point out and account for the chief features of the *foreign* trade of Britain. Describe the recent changes in the pattern of her trade. What are the reasons of Great Britain's willingness to join the European Common Market ?

উঃ— বৃটেনের 'বৈদেশিক বাণিজ্য' (৮৩ পৃঃ—৮৭ পৃঃ) হইতে লিখ।

14. Account for the location of Iron and Steel industry in U. K. with reference to the supply of coal and iron-ore.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উঃ—বৃটেনের 'লৌহ ও ইস্পাতশিল্প' (৭৩ পৃঃ—৭৭ পৃঃ) লিখ।

15. Examine the sites of the chief ports of Great Britain and name the commodities which are imported into and exported from these ports.

[C. U. B. Com. 1954]

উঃ—বৃটেনের 'শহর ও বন্দর' (৮৭ পৃঃ—৮৯ পৃঃ) হইতে শুধু বন্দরসমূহ লিখ।

ফ্রান্স ও জার্মানী

16. Describe carefully and explain the importance of the inland waterways of France. [C. U. B. Com. 1949]

উঃ—ফ্রান্সের 'পরিবহণ-ব্যবস্থা' (৯৮ পৃঃ—১০০ পৃঃ) হইতে আভ্যন্তরীণ জলপথ সম্বন্ধে লিখ।

17. How far has France attained self-sufficiency in regard to agricultural, mineral and industrial products ? Evaluate the position of power-resources with a view to feeding the growing industries of France.

[C. U. B. Com. 1957]

উঃ—ফ্রান্সের 'কৃষিকার্য', 'খনিজ সম্পদ' ও 'শ্রমশিল্প' (৯৪ পৃঃ—৯৮ পৃঃ) হইতে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন লিখ এবং 'বৈদেশিক বাণিজ্য' (১০০ পৃঃ) হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখ।

18. Suggest a division of France into natural regions and describe them.

[C. U. Inter. 1952]

উঃ—ফ্রান্সের 'প্রাকৃতিক অঞ্চল' (৯০ পৃঃ—৯৪ পৃঃ) লিখ।

19. Is it environment or man that has made the Ruhr basin the greatest manufacturing regions of Germany ? What are the natural environmental conditions ? [D. U. B. A. Hons. 1951]

উঃ—জার্মানীর 'শ্রমশিল্প' হইতে 'রুঢ়' (১০৮ পৃঃ—১০৯ পৃঃ) লিখ।

20. Describe the inland waterways and the coal-fields of Germany. Narrate how these two factors have helped in the development of her industries.

উঃ—জার্মানীর 'আভ্যন্তরীণ জলপথ', (১১১ পৃঃ) 'কয়লা' ও 'শ্রমশিল্প' (১০৫ পৃঃ—১১১ পৃঃ) হইতে লিখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উত্তর আমেরিকা (North America)

আয়তনে উত্তর আমেরিকা পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ; এশিয়া ও আফ্রিকার পরেই ইহার স্থান। পৃথিবীর মোট জমির শতকরা ১৭ ভাগ এই মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই মহাদেশের **আয়তন** ২ কোটি ৪২ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি। প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় দশজন লোক বাস করে। ৮° হইতে ৮০° উঃ অক্ষাংশের মধ্যে এই মহাদেশ অবস্থিত। কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা (গুয়াটেমালা, কোস্টারিকা, হণ্ডুরাস, সালভাডোর ও পানামা) এবং পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (কিউবা, জ্যামেইকা, হাইতি, সান ডোমিনিকো ও পোর্টোরিকো) লইয়া এই মহাদেশ গঠিত।

উত্তর আমেরিকা চারিদিকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় এবং **তটরেখা** মোটামুটি ভগ্ন হওয়ায় বন্দর-স্থাপন ও বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে। ইহার উত্তর-পশ্চিমাংশ এশিয়া মহাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের নিকটবর্তী এবং উত্তর-পূর্বাংশ হইতে ইউরোপ মহাদেশের দূরত্ব খুব বেশী নহে। পানামা খাল কাটিবার পর উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের সহিত এই মহাদেশের পশ্চিম উপকূলের ও এশিয়ার দেশসমূহের বাণিজ্যিক যোগসাধন সহজসাধ্য হইয়াছে।

ভূ-প্রকৃতি (Physical Features)—উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা অনুসারে এই মহাদেশকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(ক) **পশ্চিমাংশের পার্বত্য অঞ্চল**—এই মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত আলাস্কা হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাট ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণী দক্ষিণে পানামা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছে। এই অঞ্চলের পর্বতশ্রেণী তিন অংশে বিভক্ত। **কোস্ট রেঞ্জ** এই মহাদেশের পশ্চিম তীর ধরিয়া উত্তরে আলাস্কার দক্ষিণাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পূর্বে অবস্থিত তীরভূমির সমান্তরাল পর্বতের নাম **ক্যাসকেড-সিয়েরা নেভাডা** পর্বতশ্রেণী ; ইহার উত্তরাংশ ক্যাসকেড নামে এবং দক্ষিণাংশ সিয়েরা নেভাডা নামে অভিহিত। কলম্বিয়া নদী ক্যাসকেড ও সিয়েরা নেভাডা পর্বতশ্রেণীকে বিভক্ত করিয়াছে। এই

পর্বতশ্রেণীর পূর্বে কোস্ট রেঞ্জ পর্বতের সমান্তরাল রকি পর্বতশ্রেণী; আলাস্কার উত্তরাংশ হইতে পানামা পর্যন্ত বিস্তৃত; ইহা কোথাও ভগ্ন নহে।

রকি পর্বতশ্রেণীর বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন নামে পরিচিত। পশ্চিমাংশের এই তিনটি পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী অংশে বিভিন্ন মালভূমি বিদ্যমান। আলাস্কা অঞ্চলে কোস্ট রেঞ্জ ও রকি পর্বতের মধ্যবর্তী অংশ ইউকন মালভূমি নামে পরিচিত। রকি পর্বত ও ক্যাসকেড পর্বতের মধ্যবর্তী অংশে কলম্বিয়া মালভূমি অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে কলোরাডো মালভূমি এবং সর্বদক্ষিণে মেক্সিকো মালভূমি অবস্থিত। এই সকল মালভূমির অধিকাংশ স্থানে

মেষ-পালন হইয়া থাকে। তীরভূমি অঞ্চলে গম ও ফল পাওয়া যায়। মধ্যভাগে মিশ্র-কৃষিকার্য হইয়া থাকে। ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে খনিজ তৈল এবং কলোরাডো অঞ্চলে তাম্র পাওয়া যায়। রকি পর্বত অঞ্চলে স্বর্ণ ও লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

(খ) **পূর্বভাগের উচ্চভূমি**—গ্রানল্যাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া লাব্রাডার হইয়া হ্রদ অঞ্চলের উত্তরভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত উচ্চভূমি, অ্যাপালাচিয়ান পর্বত এবং পূর্বাংশের পিয়েডমণ্ট মালভূমি ইহার অন্তর্গত। সেণ্ট লরেন্স নদী এই উচ্চভূমিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

(গ) **মধ্যভাগের সমতলভূমি**—রকি পর্বতমালার পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া অ্যাপালাচিয়ান পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত সমতলভূমি ইহার অন্তর্গত। ইহা উত্তরে তুন্দ্রা অঞ্চল হইতে দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগরের তীরবর্তী সমভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার মধ্যাংশ কিছুটা উচ্চ এবং উত্তর ও দক্ষিণে ইহা ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। এই সমতলভূমিতে দেশের অধিকাংশ কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। লরেন্সীয় শীল্ড ও রকি পর্বতের মধ্যবর্তী উত্তর কানাডার নিম্নভূমি, বৃহৎ হ্রদ অঞ্চলের দক্ষিণাংশের নিম্নভূমি, মিসিসিপি-মিসৌরী উপত্যকার সমতলভূমি এবং রকি পর্বত-সন্নিহিত উচ্চভূমি—এই চারিটি অংশে এই অঞ্চলকে বিভক্ত করা যায়।

(ঘ) **উপকূলের সমতলভূমি**—সমুদ্রোপকূল-সন্নিহিত স্থান সমতলভূমি হওয়াই স্বাভাবিক। এই মহাদেশের পূর্ব উপকূলে সেণ্ট লরেন্স নদীর উভয় পার্শ্বে ও মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলের প্রশস্ত সমতলভূমি এবং পশ্চিম উপকূলে পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমের সঙ্কীর্ণ সমতলভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলভূমি তুলা-চাষের জন্য বিখ্যাত।

(ঙ) **লরেন্সীয় শীল্ড**—হাডসন উপসাগরের চতুর্দিকের নিম্নভূমি এই মহাদেশে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়। পূর্বে ইহা পর্বত ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন ; কিন্তু বর্তমানে এই অঞ্চলে ক্ষয়ীভূত নিম্নভূমি পরিলক্ষিত হয়।

জলবায়ু (Climate)—উত্তর আমেরিকা মহাদেশের অধিকাংশ স্থান উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। সুতরাং এখানকার জলবায়ু মোটামুটি মৃদু ও শীতপ্রধান হওয়াই স্বাভাবিক। এই মহাদেশের বিশাল আয়তনের জন্য এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। যেমন, আলাস্কা ও কানাডার উত্তরাংশের তুন্দ্রা অঞ্চলে প্রায় সর্বদাই তাপমাত্রা

হিমাঙ্কের নীচে নামিয়া আসে। সেইজন্য এখানে সর্বদাই বরফ জমিয়া থাকে; ইহার ফলে কৃষিকার্য করা সম্ভব হয় না। গ্রীষ্মকালে বরফ গলিবার পর লতা, গুল্ম প্রভৃতি জন্মে। এই তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণে কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত কৃষি-অঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মহাদেশের দক্ষিণাংশ গ্রীষ্ম-মণ্ডলের নিকটবর্তী বলিয়া সেখানে অধিকতর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়। ভূ-প্রকৃতি দুইপ্রকারে এই মহাদেশের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমতঃ, রকি পর্বতশ্রেণী ও অ্যাপালাচিয়ান পর্বতশ্রেণী এই মহাদেশের জলবায়ু-নিয়ন্ত্রণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। রকি পর্বতমালা এই মহাদেশের উত্তর হইতে দক্ষিণ সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা কোথাও ভগ্ন নহে। সেইজন্য এই পর্বত পশ্চিমা-বায়ু এবং প্রত্যায়ন বায়ুর গতিতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে। অ্যাপালাচিয়ান পর্বতও মহাদেশের পূর্বাংশের জলবায়ুর উপর একই ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কোন পর্বতমালা না থাকায় এই মহাদেশের মধ্যভাগ উত্তরের আর্কটিক অঞ্চলের ঠাণ্ডা বায়ু এবং দক্ষিণের মেক্সিকো উপসাগরের বৃষ্টিপাতযুক্ত উষ্ণ বায়ুর প্রভাবে আসে।

শীতকালে উষ্ণ প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোত হইতে উদ্ভূত উষ্ণ বায়ু কোস্ট রেঞ্জ ও ক্যাসকেড পর্বতে ধাক্কা খাইয়া উত্তরে ও দক্ষিণে চলিয়া যায়। শুধু উপকূলের সমভূমি অঞ্চলে ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পূর্বাংশের উপকূলভাগেও উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই সময় সমগ্র উপকূলভাগের তাপমাত্রা ১০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হইয়া থাকে; কিন্তু মহাদেশের মধ্যে ও উত্তর অংশে উত্তর আর্কটিকের শীতল বায়ুর প্রভাবে তাপমাত্রা হিমাঙ্ক পর্যন্ত নামিয়া আসে। উপকূলের নিকটবর্তী মধ্য সমভূমির তাপমাত্রা ১০° সেঃ-এর নীচে নামিয়া আসে। শীতকালে প্রত্যায়ন বায়ুর প্রভাবে উপকূলভাগে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়—প্রায় ১০০ সেঃ মিঃ। মধ্যভাগের সমভূমি ও উত্তরাংশে এই সময় বিশেষ কোন বৃষ্টিপাত হয় না এবং কোস্ট রেঞ্জ ও রকি পর্বতের মধ্যভাগ বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে পরিণত হয়।

গ্রীষ্মকালে মহাদেশের পূর্ব ও মধ্যভাগ গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে আগত উষ্ণ-বায়ুর প্রভাবে আসে এবং এখানকার তাপমাত্রা প্রায় ২১° সেঃ পর্যন্ত ওঠে। পশ্চিমাংশেও প্রশান্তমহাসাগরীয় উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে তাপমাত্রা ১৫° সেঃ হইতে ২১° সেঃ পর্যন্ত হইয়া থাকে। মধ্যভাগের তাপমাত্রা-বৃদ্ধির ফলে আয়ন বায়ু এই মহাদেশের মধ্যভাগের দিকে সমুদ্র হইতে প্রবাহিত হয় এবং

বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে। এইজন্য গ্রীষ্মকালে পূর্ব উপকূলে এবং মধ্যভাগে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মধ্যভাগে প্রায় ১০০ সেঃ মিঃ এবং পূর্বাংশে প্রায় ২০০ সেঃ মিঃ। পশ্চিমা-বায়ুর প্রভাবে পশ্চিম উপকূলের উত্তরাংশে গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়; শীতকালেও এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ সেঃমিঃ-এর বেশী।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ (Natural Vegetation)—উত্তর আমেরিকায় বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু বিদ্যমান। সুতরাং জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন

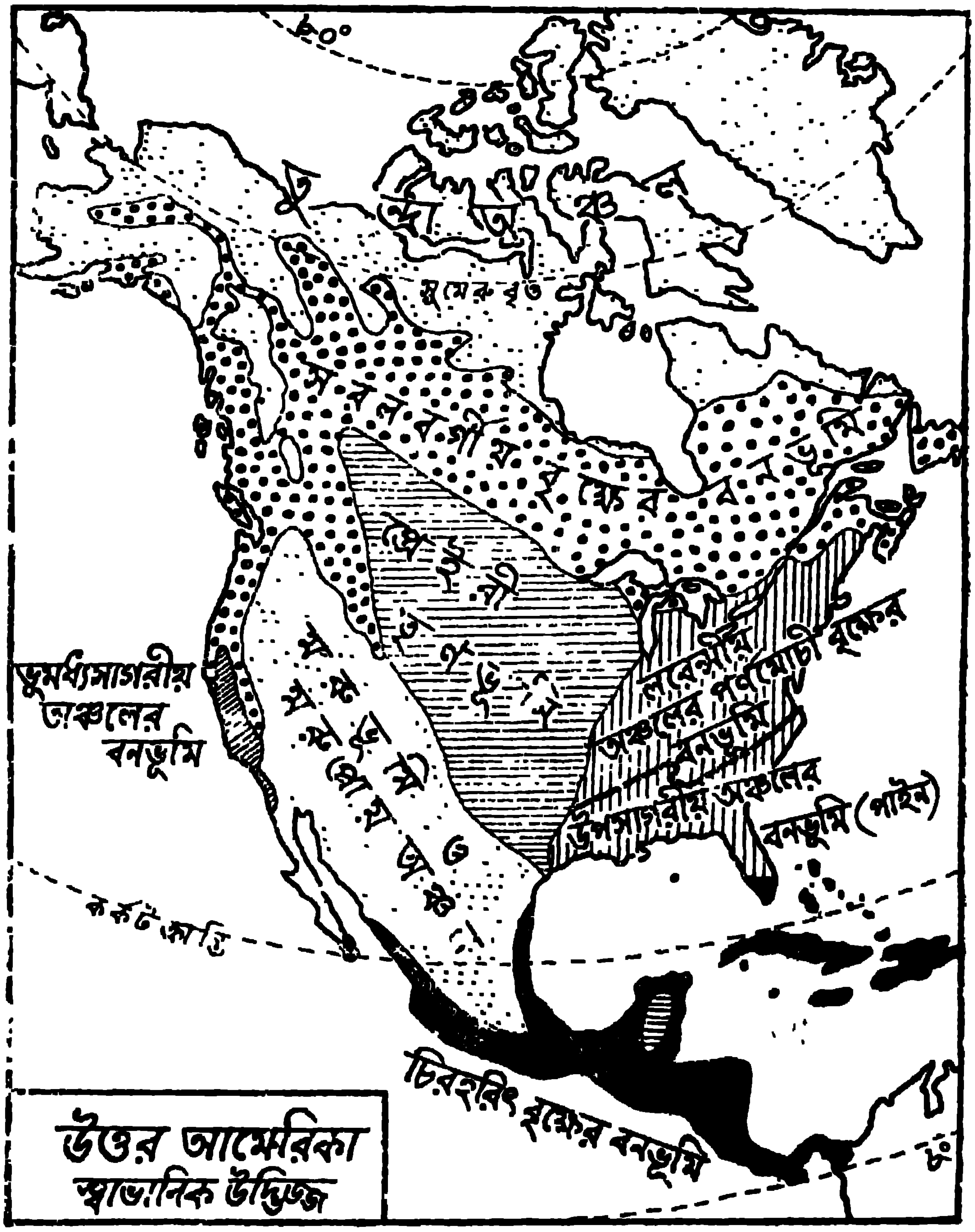

প্রকার বনভূমি এই মহাদেশে থাকা স্বাভাবিক। (১) এই মহাদেশের উত্তরাংশে তুন্দ্রা অঞ্চলে সর্বদাই বরফ জমিয়া থাকে। আলাস্কা হইতে

লাব্রাডার পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। এখানে কোনপ্রকার বনভূমি নাই। শুধু শৈবালজাতীয় কিছু কিছু উদ্ভিদ দেখা যায়। (২) তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ স্থান জুড়িয়া নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বিদ্যমান। এখানে **সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি** দেখা যায়। কানাডার অধিকাংশ স্থান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বনভূমিতে স্প্রুস, ফার ও পাইন বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই বনভূমির বৃক্ষাদি কাষ্ঠমণ্ড উৎপাদনের সহায়ক বলিয়া কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাগজশিল্পে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। (৩) এই মহাদেশের মধ্যভাগের মহাদেশীয় জলবায়ুতে বিস্তীর্ণ তৃণভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। এই তৃণভূমির নাম **প্রেইরী তৃণভূমি**। এই তৃণভূমির পূর্বাংশে দীর্ঘকায় তৃণ এবং পশ্চিমাংশে ক্ষুদ্রকায় তৃণ জন্মিয়া থাকে। দীর্ঘকায় তৃণ গবাদি পশুপালনের পক্ষে এবং ক্ষুদ্রকায় তৃণ মেষপালনের পক্ষে খুবই উপযোগী। (৪) পশ্চিম উপকূলে ক্যালিফোর্নিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে **ভূমধ্যসাগরীয়** জলবায়ু থাকায় ওক্ ও চিরহরিৎ বৃক্ষাদি জন্মে। এখানকার আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (৫) রকি পর্বত ও কোস্ট রেঞ্জ পর্বতের মধ্যবর্তী বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে **মরুভূমি** এবং মরুপ্রায় অঞ্চলের সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে কাঁটাগাছ, সেজ ও ক্রিয়োজোট গুল্ম জন্মিয়া থাকে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান মালভূমি। (৬) মেক্সিকো **উপসাগরীয় অঞ্চলের বনভূমিতে** বিভিন্ন প্রকার পাইন গাছ জন্মিয়া থাকে; ইহার মধ্যে দীর্ঘপত্রযুক্ত পাইন গাছ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (৭) পূর্ব উপকূলের উত্তরাংশে লরেন্সীয় জলবায়ুতে **পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমির** সৃষ্টি হয়। (৮) মধ্য আমেরিকা ও পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত বলিয়া এখানে নিরক্ষীয় বনভূমি পরিলক্ষিত হয়। এখানকার **চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি** বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অর্থনৈতিক উন্নতি (Economic Development)—উত্তর আমেরিকা কৃষিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ ও শিল্পে সমৃদ্ধ। প্রকৃতি এই মহাদেশকে, বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাঁহার ভাণ্ডার হইতে বিভিন্ন সম্পদ অকৃপণভাবে ঢালিয়া দিয়াছে। **কৃষিকার্যে** এই মহাদেশ খুবই উন্নত। বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের উপযোগী জলবায়ু ও মৃত্তিকা এ দেশে বিদ্যমান। এখানকার শ্রমিক বিশেষতঃ নিগ্রো শ্রমিক খুবই পরিশ্রমী। খাদ্যশস্য-উৎপাদনে এই মহাদেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তুলা-উৎপাদনে এই মহাদেশ প্রথম স্থান

অধিকার করে। এখানকার তূলা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। ইহা কার্পাসবয়ন-শিল্পের উন্নতি-সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। অধিকাংশ শস্যে এই মহাদেশ স্বাবলম্বী। বিভিন্ন খাদ্যশস্য বিশেষতঃ গম-রপ্তানিতে এই মহাদেশ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

কৃষিজ দ্রব্য-উৎপাদনে উত্তর আমেরিকার স্থান (১৯৬৩-৬৪)

(কোটি মেঃ টন)

	পৃথিবীর মোট উৎপাদন	উঃ আমেরিকার উৎপাদন	উঃ আমেরিকার অংশ (শতকরা)	পৃথিবীতে উঃ আমেরিকার স্থান
গম	২৫'১	৫'২	২১%	তৃতীয়
ভুট্টা	২৩'৩	১০'৫	৪৫%	প্রথম
যই	৫	২'২	৪৪%	দ্বিতীয়
যব	১০	১'৩	১৩%	দ্বিতীয়
বীট	১৪'৩	১'৮	১২%	দ্বিতীয়
তূলা	১'১৭	'৪	৩৪%	প্রথম
তামাক	'৩৮	'১৩	৩৪%	প্রথম

পশুপালনে উত্তর আমেরিকা বিশেষ উন্নত। এখানে প্রচুর পরিমাণে গবাদি পশু, মেষ ও শূকর পালন করা হয়। পশুপালনের জন্য এখানে প্রচুর পশুখাদ্য উৎপন্ন করা হয়। এই মহাদেশের অধিকাংশ ভুট্টা পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। **মৎস্য**-শিল্পে উত্তর আমেরিকা বিশেষ উন্নত। এই মহাদেশের প্রায় চারিদিকেই জলরাশি বিদ্যমান ; উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রচুর মৎস্য সংগৃহীত হইয়া থাকে ; এখানকার উপকূলের অগভীর সমুদ্র, উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলন ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মৎস্যক্ষেত্রের বিশেষ উপযোগী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা মৎস্য-শিকারে পৃথিবীতে উল্লেখ-যোগ্য স্থান অধিকার করে।

খনিজ সম্পদ-উৎপাদনে উত্তর আমেরিকা পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ; ইউরোপের পরেই এই মহাদেশের স্থান। অধিকাংশ খনিজ সম্পদ এই মহাদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ; তন্মধ্যে কয়লা, লৌহ আকরিক, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস, তাম্র, স্বর্ণ, নিকেল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রকি ও অ্যাপালাচিয়ান পর্বতমালা ও মধ্যভাগের সমভূমিতে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ বিদ্যমান। অধিকাংশ খনিজ সম্পদে উত্তর আমেরিকা স্বাবলম্বী ; বহু খনিজ দ্রব্য এই মহাদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়।

পৃথিবীর খনিজ দ্রব্য-উৎপাদনে উঃ আমেরিকার স্থান (১৯৬৩-৬৪)

(কোটি মেঃ টন)

	পৃথিবীর মোট উৎপাদন	উঃ আমেরিকার উৎপাদন	উঃ আমেরিকার অংশ (শতকরা)	পৃথিবীতে উঃ আমেরিকার স্থান
কয়লা	২২৩	৪৩	১৯%	তৃতীয়
খনিজ তৈল	১২১	৪১	৩৪%	প্রথম
লৌহ আকরিক	৪৮·৩	১০	২১%	দ্বিতীয়
তাম্র (লক্ষমেঃ টন)	৩৬·৭	১৬	৪৪%	প্রথম
সাল্‌ফার	০·৬৬	০·৬১	৯%	প্রথম
রৌপ্য	·০০৬৭	·০০৩৬	৫৪%	প্রথম

শিল্পের উন্নতিতে উত্তর আমেরিকা পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ইউরোপের পরেই এই মহাদেশের স্থান। অপর্যাপ্ত কয়লা, খনিজ তৈল ও লৌহ আকরিক এই মহাদেশের শিল্পোৎপাদনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর জন্য এখানকার শ্রমিকের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই মহাদেশে বহু নিগ্রো শ্রমিক বাস করে। ইহারা অত্যন্ত কর্মঠ। এই মহাদেশের উৎকৃষ্ট পরিবহণ-ব্যবস্থাও এখানকার শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। এই মহাদেশের অধিকাংশ লোকের উন্নত জীবনযাপনের জন্য এখানকার শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার-রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় এখানকার শিল্পদ্রব্য রপ্তানি করিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। এই মহাদেশের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিল্পে অত্যন্ত উন্নত হইলেও কানাডা, মেক্সিকো ও অন্যান্য দেশসমূহ শিল্পে বিশেষ উন্নত নহে। প্রধানতঃ কয়লার অভাবে এই সকল অংশ শিল্পসমৃদ্ধ নহে।

পৃথিবীর শিল্পোৎপাদনে উত্তর আমেরিকার স্থান (১৯৬৩)

(কোটি মেঃ টন)

	পৃথিবীর মোট উৎপাদন	উঃ আমেরিকার উৎপাদন	উঃ আমেরিকার অংশ (শতকরা)	পৃথিবীতে উঃ আমেরিকার স্থান
ইস্পাত	৩৬·০০	১০·১	২৮%	দ্বিতীয়
কার্পাস-বস্ত্র	০·৬৩	০·১৫	২৪%	দ্বিতীয়
পশম-বস্ত্র (সুতা)	০·১৬	·০৩	২১%	দ্বিতীয়
চিনি	৫·৬০	১·৪	২৭%	দ্বিতীয়
মোটর-গাড়ী	১৬০ কোটি	৭১	৬৭%	প্রথম

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (The United States of America) অর্থনৈতিক উন্নতিতে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই এই দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এই দেশের **আয়তন** প্রায় ৭৭ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার—পৃথিবীর মোট স্থল-ভাগের শতকরা ৫ ভাগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ১৯ কোটি ২১ লক্ষ —পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৬ ভাগ। এই দেশের উত্তরে কানাডা, দক্ষিণে মেক্সিকো ও মেক্সিকো উপসাগর, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর এবং পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর; দেশের প্রায় তিনদিকেই জলভাগ বিরাজমান। উপকূলভাগের **সৈকতরেখা** মোটামুটি ভগ্ন হওয়ায় বন্দর-স্থাপন সহজসাধ্য হইয়াছে। এই দেশে অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ বিদ্যমান। প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে সকল প্রকার সম্পদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দান করিয়াছে। ইহার ফলে এই দেশের জনপ্রতি গড় বাৎসরিক আয় অনেক বেশী। এই দেশের শ্রমিক কর্মচারীদের গড় সাপ্তাহিক আয় ৯০'৫৪ ডলার। স্বভাবতঃই এই দেশের জীবনমান অত্যন্ত উন্নত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের পূর্বপুরুষগণ পশ্চিম ইউরোপ হইতে আসিয়াছিল বলিয়া এই দেশের লোকেরা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে ও বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই দেশের জাতীয় ভাষাও ইংরাজী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৫০টি **রাজ্য** আছে। যদিও এই রাজ্যগুলির স্থানীয় ব্যাপারে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু ক্রমশঃই ইহাদের ক্ষমতা সংকুচিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

অর্থনৈতিক উন্নতির কারণসমূহ (Causes for Economic Development)—প্রকৃতি এই দেশকে অপর্যাপ্ত সম্পদ ঢালিয়া দিয়াছে। **খনিজ সম্পদ**-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ আকরিক, প্রাকৃতিক গ্যাস, তাম্র প্রভৃতি মূল্যবান্ সম্পদে এই দেশ পরিপূর্ণ। **কৃষিকার্যের** উপযোগী সকল প্রকার ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এই দেশে বিদ্যমান। সেইজন্য এই দেশে প্রচুর পরিমাণে গম, বার্লি, যই, ভুট্টা, বাজরা, তামাক, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগে ও দক্ষিণাংশে উর্বর **সমতলভূমি** থাকায়

কৃষিকার্যে ও শিল্পে এই দেশ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার প্রায় তিনদিকে জল থাকায় বহির্বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব হইয়াছে; ভগ্ন **সৈকতরেখা** বন্দরের উন্নতিসাধনে সাহায্য করিয়াছে। অপর্যাপ্ত খনিজ, প্রাণিজ ও কৃষিজ সম্পদ এবং ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি দূরে অবস্থিত হওয়ায় এই দেশ প্রথমেই **শিল্পগঠনে** উদ্যোগী হইয়াছিল; বর্তমানে ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হইয়াছে।

দেশের আয়তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় এখানকার **লোকসংখ্যা** খুব বেশী নহে। সেইজন্য এখানকার অধিবাসীদের জনপ্রতি আয় অনেক বেশী। ইহা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে লোক আসিয়া সহজে এই দেশে বসতি স্থাপন করিতে পারে না। শুধু কাজের সুবিধার জন্য নিগ্রোদের এখানে বাস করিতে দেওয়া হয়।

দুইটি **মহাযুদ্ধের** সময় ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং যুদ্ধের দরুন এই সকল দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইয়াছে; ইহার পুনরুদ্ধার করিতে এই সকল দেশের বহু সময় ও সম্পদ ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূরে বসিয়া মহাযুদ্ধের সময় শুধু অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা অর্জন করিয়াছে। মহাযুদ্ধের জন্য ইহাকে বিশেষ কোন ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই। যুদ্ধের জন্য অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইবার পরিবর্তে এই দেশের শিল্পের মুনাফা অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই দেশের নিগ্রো **শ্রমিকগণ** খুব কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। দেশের উন্নতিসাধনে ইহাদের দান অসামান্য। ইহা ছাড়া শ্বেতকায় অধিবাসিগণ বুদ্ধিমত্তায়, শিক্ষায় ও চাতুর্যে পারদর্শী। সেইজন্য এই দেশের দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। এই দেশ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া এখানকার **জলবায়ু** মৃদু ও কর্মশক্তির প্রেরণাদায়ক। এই জলবায়ুর দরুন শ্রমিকগণ অধিক সময় দক্ষতার সহিত কাজ করিতে পারে।

উৎকৃষ্ট পরিবহণ-ব্যবস্থা, স্থায়ী সরকার এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাব এই দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে।

লোকবসতি (Population)—এই দেশে প্রায় ১৫'৫ কোটি শ্বেতকায়, ১'৫ কোটি নিগ্রো এবং অল্পসংখ্যক এশিয়ার লোক বাস করে। ১৭৮৯ সালে

এই দেশে মাত্র ৪০ লক্ষ লোক বাস করিত। ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৩০ সালে ১ কোটি ৩০ লক্ষ এবং ১৮৬০ সালে ৩ কোটি ২০ লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। ১৯৬৪ সালে ইহার লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ১৯ কোটি ২১ লক্ষ। বর্তমানে লোকসংখ্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে; চীন, ভারত ও রাশিয়ার পরেই এই দেশের স্থান। এই দেশে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ২৪ জন লোক বাস করে। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় এখানকার লোকসংখ্যা প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে অনেক কম। প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ফ্রান্সে ৭০ জন, জার্মানীতে ১৭০ জন, বৃটেনে ২১৪ জন এবং বেলজিয়ামে ২৮০ জন লোক বাস করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশের তুলনায় পূর্বাংশের সমভূমিতে অনেক বেশী লোক বাস করে—প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ৫০ জন। এদেশের শিল্পাঞ্চলের লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। উত্তর-পূর্বাংশের শিল্পাঞ্চলে এই দেশের অধিক লোক এবং দক্ষিণ-পূর্ব শিল্পাঞ্চলে এক-তৃতীয়াংশ লোক বাস করে। উনবিংশ শতাব্দীতে এই দেশের লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল বলিয়া প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করিতে বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল। এইজন্য ঐ সময় আফ্রিকা হইতে অনেক নিগ্রো শ্রমিককে এই দেশে ক্রীতদাস হিসাবে আনা হয়। পরে এই ক্রীতদাসদের স্বাভাবিক নাগরিক হিসাবে থাকিবার আইনগত সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু আজ পর্যন্তও এই সভ্যদেশে নিগ্রোদের সমান অধিকার দেওয়া হয় নাই। ইহারা এখনও সামাজিক জীবনের অসাম্যতার দরুন দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করে। বর্তমানে এই দেশের নিগ্রোদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-দশমাংশ।

ভূ-প্রকৃতি (Physical Features)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চতা সমান নহে। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এই দেশকে মোটামুটি চারিটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়—পশ্চিমাংশের পার্বত্য অঞ্চল, অ্যাপালাচিয়ান উচ্চভূমি, মধ্যভাগের সমতলভূমি এবং উপকূলের সমতলভূমি। (১১৮ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য।)

(ক) পশ্চিমাংশের পার্বত্য অঞ্চল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে অবস্থিত রকি পর্বত, কোস্ট রেঞ্জ ও সিয়েরা নেভাডা পর্বত উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রসারিত; এই সকল স্থানের উচ্চতা সর্বাপেক্ষা বেশী। পার্বত্য অঞ্চল বলিয়া এখানকার লোকসংখ্যা কম, কিন্তু কোন কোন স্থানে খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। রকি পর্বত এবং সিয়েরা নেভাডা পর্বতের মধ্যভাগে

এক বিস্তীর্ণ মালভূমি বিদ্যমান; ইহার নাম ইণ্টারমনটেন মালভূমি। এই মালভূমির উত্তরাংশের নাম কলম্বিয়া মালভূমি এবং দক্ষিণাংশের নাম কলোরাডো মালভূমি।

(খ) অ্যাপালাচিয়ান উচ্চভূমি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত অ্যাপালাচিয়ান পর্বতশ্রেণী আটলাণ্টিক উপকূলের সহিত সমান্তরাল অবস্থায় বিদ্যমান। এই পর্বতশ্রেণী দেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। সেইজন্য উত্তরাংশের নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলের অধিবাসীদের সহিত দক্ষিণাংশের অধিবাসীদের সম্পর্ক ভালোভাবে গড়িয়া ওঠে নাই। এই পর্বতশ্রেণী এখানকার পরিবহণ-ব্যবস্থার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অ্যাপালাচিয়ান পর্বত কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ আকরিক প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ।

(গ) মধ্যভাগের সমতলভূমি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত সমতলভূমিকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়। (১) হ্রদ অঞ্চলের পশ্চিমাংশ ও দক্ষিণাংশের সমভূমি—এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ লৌহ আকরিক এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। (২) মধ্যভাগের তৃণভূমি অঞ্চল—এই অঞ্চলের প্রেইরী তৃণভূমি কোথাও ছোট, কোথাও বড়। এই অঞ্চলের পশ্চিমাংশ ক্ষুদ্র তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত; কিন্তু ইহার পূর্বাংশে দীর্ঘ তৃণ পরিলক্ষিত হয়। (৩) রকি পর্বত-সংলগ্ন উচ্চভূমি—ওজার্ক ও উয়াচিটা পর্বত মধ্যভাগের সমতলভূমি হইতে পুরাতন শিলাদ্বারা গঠিত হইয়া যুক্ত দ্বীপের মতো উঠিয়াছে। এই অঞ্চল কয়লা, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ।

(ঘ) উপকূলের সমতলভূমি—অ্যাপালাচিয়ান পর্বত ও মধ্যভাগের সমতলভূমির দক্ষিণাংশে অবস্থিত মেক্সিকো-উপসাগরীয় উপকূল তুলা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। খনিজ তৈল, কয়লা, লৌহ আকরিক প্রভৃতি খনিজ সম্পদও এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। কোস্ট রেঞ্জ পর্বতের পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে সংকীর্ণ উপকূলভূমি এবং আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলে প্রশস্ত সমতলভূমি বিদ্যমান। এই সকল উপকূলভূমিতে বিভিন্ন বন্দর ও শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

মৃত্তিকা (Soil)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃষিকার্যে বিশেষ উন্নত। এখানকার অনুকূল জলবায়ু ও মৃত্তিকার উর্বরাশক্তির জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। এই

দেশের মৃত্তিকাকে প্রধানত: দুইভাগে বিভক্ত করা যায় :—আর্দ্র অরণ্যাঞ্চলের মৃত্তিকা (Pedalfers) ও শুষ্ক তৃণাঞ্চলের মৃত্তিকা (Pedocals)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশে আর্দ্র অরণ্যাঞ্চলের মৃত্তিকা এবং পশ্চিমাংশে শুষ্ক তৃণাঞ্চলের মৃত্তিকা দেখা যায়।

(ক) এই দেশের **আর্দ্র অরণ্যাঞ্চলের মৃত্তিকাকে** আবার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা, ধূসরবর্ণের (Podzol) মৃত্তিকা, ধূসর-বাদামী বর্ণের (Gray Brown Podzolic) মৃত্তিকা, রক্ত ও পীতবর্ণের (Red and Yellow) মৃত্তিকা এবং প্রেইরী (Prairie) মৃত্তিকা। (১) **ধূসরবর্ণের** মৃত্তিকা সাধারণত: বনভূমির আচ্ছাদনে গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল অঞ্চল শীতপ্রধান এবং বনভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত সেই অঞ্চলে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। বনভূমি পরিষ্কার করিয়াও সাধারণত: এই মৃত্তিকায় ভালোভাবে কৃষিকার্য করা সম্ভব হয় না। বর্তমানে এই সকল অঞ্চলে ঘাস জন্মাইয়া ও সার দিয়া কৃষিকার্যের প্রচলন করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশ এবং হ্রদসমূহের দক্ষিণাংশে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। (২) **ধূসর-বাদামী** মৃত্তিকা ধূসরবর্ণের মৃত্তিকা অপেক্ষা কৃষিকার্যের পক্ষে অধিক উপযোগী ; কারণ এই মৃত্তিকায় কম পরিমাণে অ্যাসিড থাকে। পূর্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক উপকূল হইতে পশ্চিম ইণ্ডিয়ানা ও উত্তর মিসৌরী পর্যন্ত অঞ্চলে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। এই মৃত্তিকা ভুট্টা, গম, তামাক ও ফল উৎপাদনের উপযোগী। (৩) **রক্ত ও পীতবর্ণের** মৃত্তিকা দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাংশে। এই মৃত্তিকার নিজস্ব উর্বরতা-শক্তি না থাকিলেও সার দিলে চাষের উপযোগী হয়। এই অঞ্চলে সারের সাহায্যে তুলা, তামাক ও যই-এর চাষ হয়। (৪) **প্রেইরী** মৃত্তিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগের সমতলভূমিতে দেখা যায় ; এই মৃত্তিকা কৃষ্ণকায়। গমচাষের পক্ষে এই মৃত্তিকা বিশেষ উপযোগী। ইহাতে ঘাসও প্রচুর জন্মে। সার প্রয়োগ না করিয়াও এই মৃত্তিকায় মোটামুটি ভালো শস্য উৎপন্ন করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ গম এই মৃত্তিকায় উৎপন্ন হয়।

(খ) **শুষ্ক তৃণাঞ্চলের মৃত্তিকা** মোটামুটি চারি প্রকার ; যথা, কৃষ্ণমৃত্তিকা (Chernozem), গাঢ় বাদামী (Dark Brown), বাদামী (Brown) ও ধূসর (Gray) মৃত্তিকা। (১) **কৃষ্ণমৃত্তিকা** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগের সমতলভূমির উত্তর সীমান্ত হইতে দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত

বিস্তৃত অঞ্চলে দেখা যায়। উত্তরাংশের মৃত্তিকা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের হইলেও, ক্রমশঃ যতই দক্ষিণে যাওয়া যায়, এই মৃত্তিকার রং ততই কৃষ্ণ-বাদামীতে পরিণত হয়। উত্তরাংশের মৃত্তিকায় গম, বার্লি এবং দক্ষিণাংশের মৃত্তিকায় তামাক, তুলা ও ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। (২) **গাঢ় বাদামী** মৃত্তিকা অঞ্চল কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলের পশ্চিমে অবস্থিত। গম, যব ও ঘাসের পক্ষে এই মৃত্তিকা খুবই উপযোগী। (৩) **বাদামী** মৃত্তিকা রকি পর্বতমালার পাদদেশে দেখা যায়। যথেষ্ট পরিমাণে জল দিলে এই মৃত্তিকায় শস্যাদি উৎপন্ন করা যায়। কিন্তু এই মৃত্তিকা যে সকল স্থানে দেখা যায় সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত কম। সেইজন্য জলসেচের দ্বারা এই মৃত্তিকা হইতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন করা হয়। (৪) **ধূসর** মৃত্তিকায় জলসেচের ব্যবস্থা থাকিলে কৃষিকার্য করা সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মরুভূমি অঞ্চলে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। জলের অভাবে এই মৃত্তিকা অঞ্চলে কৃষিকার্য করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

জলবায়ু (Climate)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোটামুটি ২৭° ও ৪৯° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। উত্তর আমেরিকার জলবায়ু সম্বন্ধে ১১৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া এবং ৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত-রেখাকে মাঝখানে রাখিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছয়টি* জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়:

(ক) **প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর উপকূল**—এখানে ঠাণ্ডা জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২০০ সেঃ মিঃ; কারণ শীতকাল এবং গ্রীষ্মকাল, উভয় ঋতুতেই এখানে বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চলের শীতকালীন তাপমাত্রা প্রায় ১৯° সেঃ এবং গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা প্রায় ১৫° সেঃ। (খ) **প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ উপকূল**—এই অঞ্চলে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এখানে শীতকালে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে; বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১০ সেঃ মিঃ। উষ্ণ প্রশান্ত-মহাসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে তাপমাত্রা শীতকালেও ১০° সেঃ-এর নীচে নামে না। গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রার পরিমাণ প্রায় ২১° সেঃ। (গ) **মালভূমি অঞ্চল**—একদিকে রকি পর্বত এবং অন্যদিকে সিয়েরা নেভাডা পর্বত থাকায়

* R. de C. Ward-এর মত অনুসারে।

এই দেশের কলম্বিয়া ও কলোরাডো মালভূমি বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে পরিণত হয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান মরুভূমি বা মরুপ্রায় মালভূমি। **(ঘ) মধ্যভাগের সমতলভূমি**—এই অঞ্চলে মহাদেশীয় জলবায়ু বিদ্যমান। এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০ সেঃ মিঃ-এর কম। আর্কটিক অঞ্চল

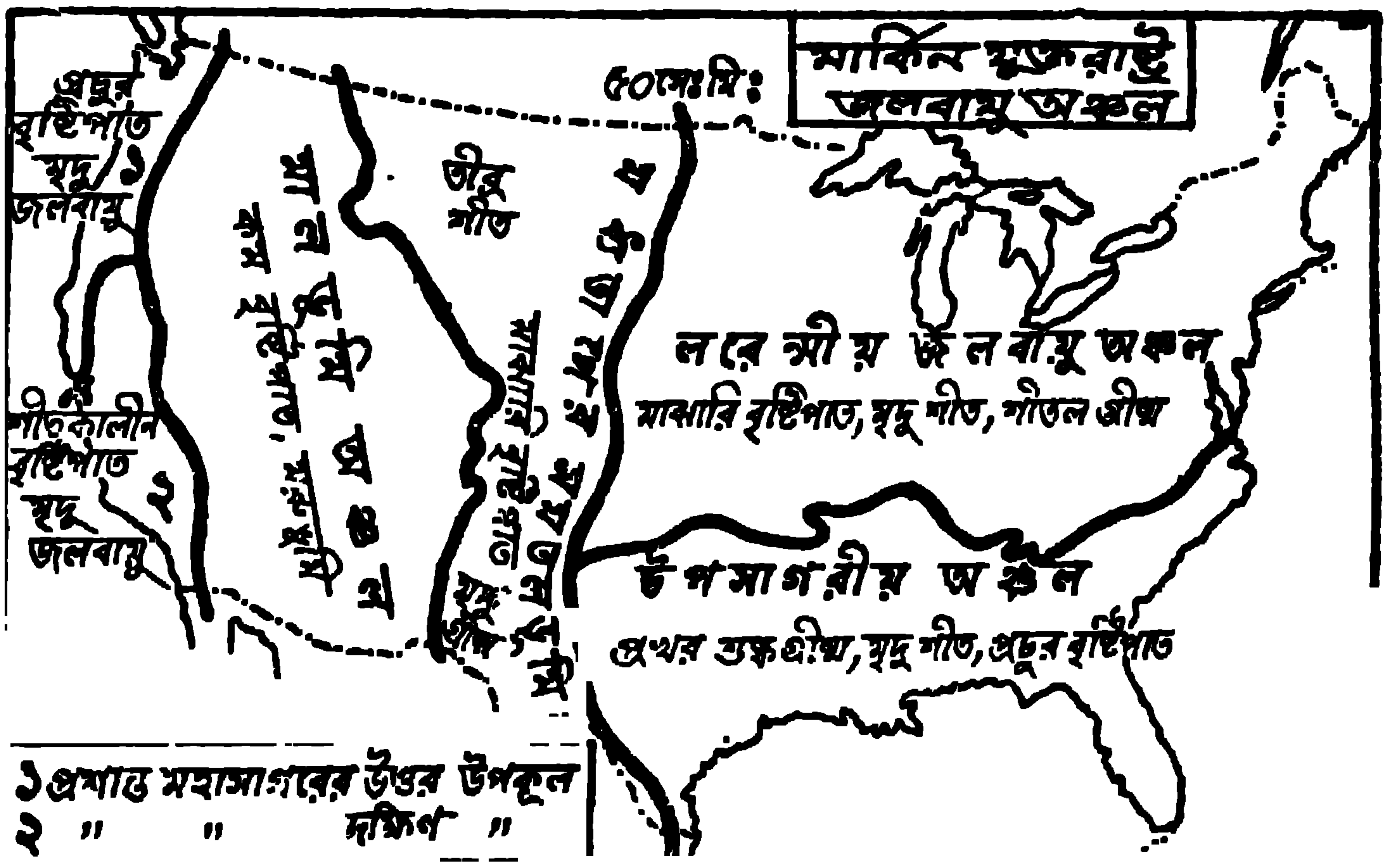

হইতে আগত শীতল বায়ুর প্রভাবে শীতকালে উত্তরাংশের তাপমাত্রা হিমাঙ্ক পর্যন্ত নামিয়া আসে। দক্ষিণাংশের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশী। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে তৃণভূমি থাকায় পশুপালন-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান প্রেইরী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই দেশের প্রচুর বাসন্তিক গম এখানে উৎপন্ন হয়। **(ঙ) উপসাগরীয় অঞ্চল**—উষ্ণমণ্ডলের নিকটবর্তী হওয়ায় এখানকার তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে ২৭° সেঃ পর্যন্ত হইয়া থাকে। শীতকালীন তাপমাত্রা উত্তরাংশে ১০° সেঃ হইতে ২২° সেঃ পর্যন্ত হয়। আয়ন বায়ু ও প্রত্যায়ন বায়ুর প্রভাবে এখানে সারা-বৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়; বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ হইতে ২০০ সেঃ মিঃ। এই দেশের অধিকাংশ ইক্ষু, তুলা ও অন্যান্য ক্রান্তীয় ফসল এখানে উৎপন্ন হয়। (চ) **লরেন্সীয় জলবায়ু অঞ্চল**—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশ লইয়া গঠিত এই অঞ্চলে লরেন্সীয় জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। এখানকার বৃষ্টিপাত ৫০ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত হইয়া থাকে; শীতকালীন তাপমাত্রা প্রায় ১২° সেঃ এবং গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ১৮° সেঃ। এইজন্য এই অঞ্চলে কৃষিকার্য ও পশুপালন উন্নতি লাভ করিয়াছে।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ (Natural Vegetation)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের জলবায়ু বিদ্যমান। সুতরাং এই দেশে নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে। পূর্বে ১২১ পৃষ্ঠায় উত্তর আমেরিকার স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনা অনুসারে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনপ্রকার উদ্ভিজ্জ বিদ্যমান—বনভূমি, তৃণভূমি ও মরুভূমি (১২১ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

(ক) **বনভূমি**—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বনভূমি প্রধানতঃ পশ্চিমাংশে ও পূর্বাংশে দেখা যায়। উত্তর-পূর্বাংশে ও উত্তর-পশ্চিমাংশে **সরলবর্গীয় বৃক্ষের** বনভূমি বিদ্যমান; এখানে স্প্রুস্, ফার ও পাইন গাছ জন্মিয়া থাকে। এই সকল গাছের নরম কাঠ কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ উৎপাদনে সাহায্য করিয়াছে। পূর্বাংশে সরলবগায় বৃক্ষের বনভূমির দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বনভূমিতে দুইপ্রকার বৃক্ষ দেখা যায়; উত্তরাংশে লরেন্সীয় জলবায়ুতে **পর্ণমোচী** বৃক্ষ (বীচ্, বার্চ, হেমলক্, ওক্, চেস্টনাট) এবং দক্ষিণাংশে মেক্সিকো উপকূলে প্রধানতঃ দীর্ঘপত্রযুক্ত **পাইন** বৃক্ষ দেখা যায়।

সিয়েরা নেভাডা পর্বতের পশ্চিম পাদদেশের কোন কোন স্থানে ফার, পাইন ও লার্চ বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। এই বনভূমির দক্ষিণাংশে **ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমিতে** ওক্, চেরি প্রভৃতি বৃক্ষ দেখা যায়।

(খ) **তৃণভূমি**—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম বলিয়া বিস্তীর্ণ তৃণভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। এই তৃণভূমি **প্রেইরী** নামে পরিচিত। পশ্চিমাংশের তৃণভূমি ছোট বলিয়া এখানে মেষপালন উন্নতি লাভ করিয়াছে। পূর্বাংশের তৃণভূমি বড় বলিয়া এখানে গবাদি পশুপালন হইয়া থাকে। এই তৃণভূমি কানাডা হইতে আরম্ভ করিয়া টেক্সাস্ পর্যন্ত বিস্তৃত।

(গ) **মরুভূমি**—রকি পর্বত ও সিয়েরা নেভাডা পর্বতের মধ্যবর্তী বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে মরুভূমি এবং মরুপ্রায় অঞ্চলের সৃষ্টি হইয়াছে। এখানকার উদ্ভিজ্জের মধ্যে সেজ ও ক্রিয়োজোট গুল্ম ও কাঁটাগাছ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কৃষিকার্য (Agriculture)

কৃষিজ দ্রব্য-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। যদিও এই দেশ শিল্পে উন্নত, ইহার কৃষিকার্যও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। শিল্পের উন্নতির প্রথম

অবস্থায় এই দেশের কৃষিজ দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল শিল্পসমূহের উন্নতি হইয়াছিল। একশত বৎসর পূর্বেও দেশের শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। ক্রমশ: শিল্পের অধিক উন্নতি হওয়ায় কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির সংখ্যা ১৯০০ সালে শতকরা ৩৭ জন, ১৯৪৪ সালে ২০ জন এবং ১৯৬৪ সালে ১০ জনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।) এই দেশের কৃষি-জমির পরিমাণ প্রায় ১২'৪ কোটি হেক্টর এবং কৃষকের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪৭ লক্ষ কৃষিক্ষেত্র বিদ্যমান। প্রতিটি কৃষিক্ষেত্রে গড়ে ৯৩'৮ হেক্টর জমি আছে। সমগ্র জমির শতকরা ২৩'৫ ভাগ কৃষিকার্যে নিযুক্ত হয়। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পাইলেও কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন সর্বদাই চাহিদা অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে। সেইজন্য প্রচুর পরিমাণে কৃষিজ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়। প্রথমাবস্থায় পুরাতন পদ্ধতিতে কৃষিকার্য হইয়া থাকিলেও বর্তমানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় সর্বত্র কৃষিকার্য হইয়া থাকে। সেইজন্য হেক্টর-প্রতি উৎপাদনও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখানকার কৃষিকার্যের উন্নতির মূলে রহিয়াছে কৃষির উপযোগী জলবায়ু, উর্বর মৃত্তিকা এবং কৃষিকার্যে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন। ভূমিকর্ষণ, ফসল-কাটা প্রভৃতি অধিকাংশ কাজ বর্তমানে যন্ত্রাদির সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে ব্যবসায়িগণ জমি কিনিয়া মজুরের সাহায্যে যান্ত্রিক কৃষি-প্রথায় চাষ-আবাদ করিয়া থাকে।

এই দেশের কোন একটি কৃষিজ দ্রব্য শুধু কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। সেইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কয়েকটি **কৃষিবলয়ে (Agricultural Belts)** বিভক্ত করা যায়; যথা:

(ক) **বাসন্তিক গমবলয়**—উত্তর ডাকোটা ও মিনেসোটা অঞ্চলের লোহিত নদীর উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে বাসন্তিক গম উৎপন্ন হয়। এখানকার শীতকালীন শৈত্য তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে; গ্রীষ্মকাল স্বল্পস্থায়ী ও মৃদু। সেইজন্য এই অঞ্চলে বসন্তকালে গম চাষ হইয়া থাকে। এই দেশের অধিকাংশ গম এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। (খ) **ভুট্টাবলয়**—হ্রদসমূহের দক্ষিণে অবস্থিত এই অঞ্চলে শীতকাল মৃদু এবং গ্রীষ্মকাল দীর্ঘস্থায়ী ও উষ্ণ হওয়ায় ভুট্টাচাষের সুবিধা হইয়াছে। এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০ সে: মি:-এর অধিক। এই অঞ্চলের ভুট্টা পশুপালনের জন্য ব্যবহৃত হয়; সেইজন্য এই অঞ্চল মাংস-উৎপাদনে ও রপ্তানিতে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। (গ) **মিশ্র কৃষিবলয়**—হ্রদ অঞ্চলব্যাপী সরেলীয়

নিম্নভূমিতে আর্দ্র জলবায়ু থাকায় বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ভুট্টা ও অন্যান্য পশুখাদ্য এই অঞ্চলে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এইজন্য এখানে পশুপালন-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, মাংস প্রভৃতি এই অঞ্চল হইতে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। (ঘ) **ভুট্টা** ও **শীতকালীন গমবলয়**—ভুট্টাবলয়ের দক্ষিণে অবস্থিত এই অঞ্চলে শীত মৃদু হওয়ায় ভুট্টা ও শীতকালীন গম উৎপন্ন হয়। (ঙ) **কার্পাস-বলয়**—ভুট্টা ও শীতকালীন গমবলয়ের দক্ষিণে টেক্সাস্, মিসিসিপি, আরকানসাস্, জর্জিয়া, আলাবামা রাজ্য লইয়া গঠিত এই অঞ্চলে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু বিদ্যমান। বৎসরে প্রায়

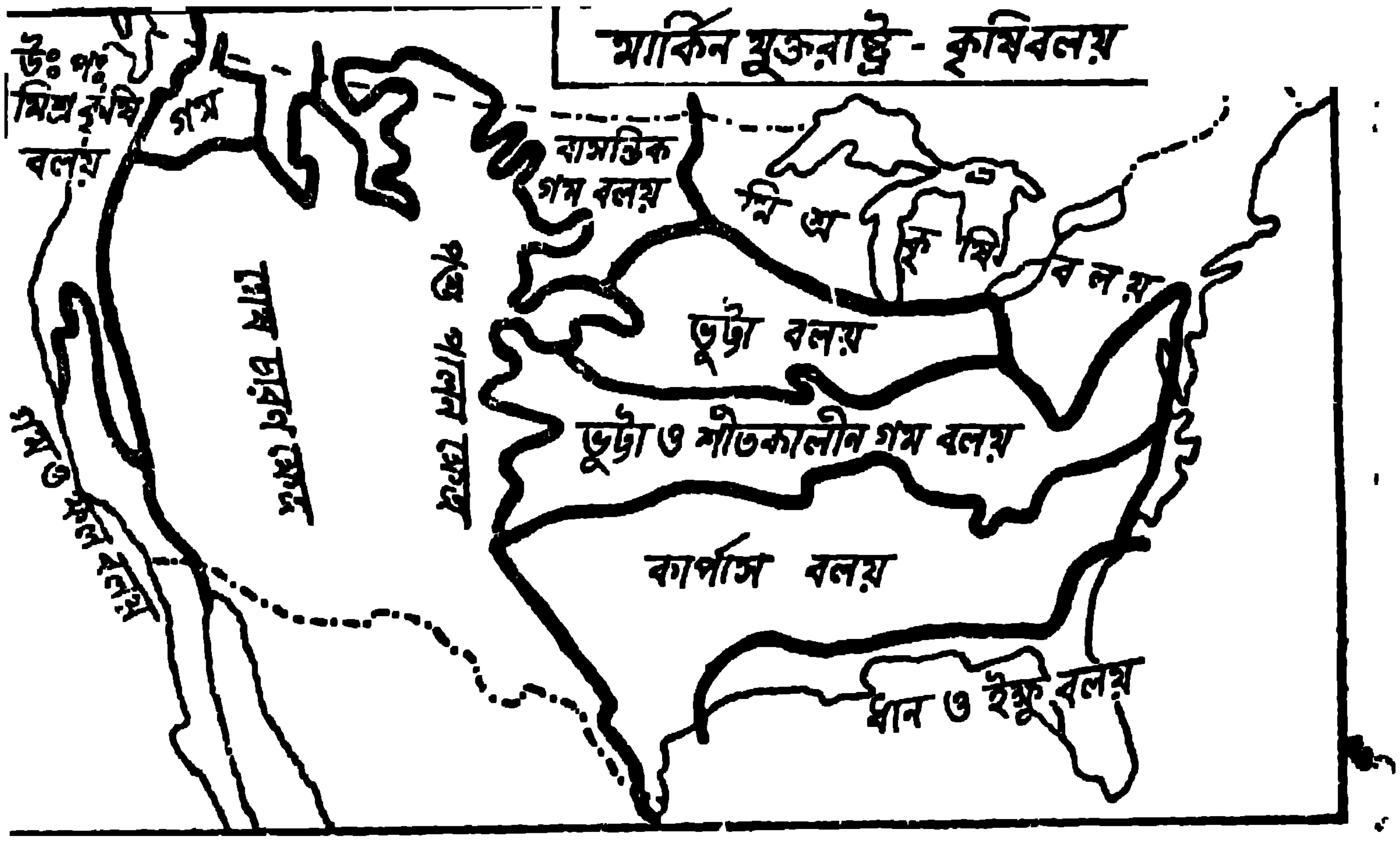

৭ মাস কাল এই অঞ্চল তুহিনমুক্ত থাকায় কার্পাস-চাষের সুবিধা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ তূলা এই বলয়ে উৎপন্ন হয়। (চ) **ধান ও ইক্ষু বলয়**—কার্পাস-বলয়ের দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলে উষ্ণ গ্রীষ্ম, অধিক বৃষ্টিপাত ও পলিমাটি থাকায় ধান ও ইক্ষুচাষের উন্নতি হইয়াছে। (ছ) **গম ও ফল বলয়**—ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকায় ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু থাকায় এই অঞ্চলে ফল ও গম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আঙ্গুর, লেবু প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য ফল। সাক্রামেন্টো অঞ্চলে অল্পবিস্তর ধান উৎপন্ন হয়। (জ) **উত্তর-পশ্চিমাংশের মিশ্র-কৃষিবলয়**—এই অঞ্চলে গম, ভুট্টা ও অন্যান্য শস্য উৎপন্ন হয়। ইহার পূর্বাংশে একটি ছোট **গমবলয়** **অবস্থিত**।

তুলাবলয়ের ভবিষ্যৎ (Future of Cotton Belt)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ দক্ষিণভাগ লইয়া এই দেশের তূলাবলয় গঠিত। টেক্সাস্, মিসিসিপি, ওকলাহোমা, আরকানসাস্, লুইসিয়ানা, ভার্জিনিয়া, মিসৌরী, উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা, ফ্লোরিডা, টেনেসি, আলাবামা ও জর্জিয়া—এই ১২টি রাজ্য লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তূলাবলয় গঠিত।

এই তূলাবলয়ের নাম হইতে বুঝা যায় যে, এই অঞ্চলটি তূলা-চাষের জন্য বিখ্যাত। প্রকৃতপক্ষে তূলা-চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার **ভৌগোলিক অবস্থা** ও অর্থনৈতিক অবস্থা এখানে বিদ্যমান। ইহার উত্তরভাগ ২০০ দিন তুহিনমুক্ত এলাকার শেষ সীমা। তূলা-চাষের জন্য ২০০টি তুহিনমুক্ত দিবস প্রয়োজন। তূলাবলয়ের পশ্চিম প্রান্তে ৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত-রেখা এবং দক্ষিণ প্রান্তে ২৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত-রেখা বিদ্যমান। ২৫ সেঃ মিঃ হইতে ৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত তূলা-চাষের পক্ষে উপযোগী। স্থানীয় উপক্রান্তীয় তাপমাত্রা তূলা-চাষের সহায়ক। এই অঞ্চলের কোন কোন স্থানে উর্বর পলিমাটি ও কৃষ্ণমৃত্তিকা বিদ্যমান। মিসিসিপি ও টেনেসি নদীর জলস্রোত হইতে জলসেচ ও জলবিদ্যুতের সুবন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

এই সকল অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থা ছাড়াও এই অঞ্চলে অনুকূল **অর্থনৈতিক অবস্থা** বিদ্যমান। যান্ত্রিক চাষের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ও যন্ত্রপাতি এখানে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া তূলা-চাষে শ্রমিকের সমস্যাই সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। কারণ তূলা-চাষের প্রতিটি স্তরে—চাষ, বীজবপন, আগাছা-পরিষ্কারকরণ ও সময়মতো তূলা আহরণ—বহু শ্রমিকের প্রয়োজন। জমির চাষ উত্তমরূপে না হইলে তূলা উৎপন্ন করা কঠিন। বাংলাদেশে একটি প্রবাদ আছে—

"ষোল চাষে তূলা, তার অর্ধেকে মূলা,
তার অর্ধেকে ধান, বিনা চাষে পান।"

এই সকল কারণে তূলা-চাষে শ্রমিক সুলভ না হইলে লাভজনক ভাবে তূলা-চাষ করা সম্ভব হয় না। এইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকা হইতে ক্রীতদাস আনিবার পরেই এখানে তূলা-চাষের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। কারণ ক্রীতদাসের সাহায্যে তূলার চাষ করায় শ্রমিকের জন্য বিশেষ কোন খরচ হইত না। ক্রীতদাস প্রথা অবসানের পরেও বর্তমানে সুলভে নিগ্রো শ্রমিক পাওয়া যায় বলিয়া এখানে তূলা-চাষের উন্নতি অব্যাহত আছে।

যে সকল অঞ্চলে তূলা-চাষ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেখানকার অনুকূল ভৌগোলিক উপাদান হয়তো কোনদিনই পরিবর্তিত হইবে না; কিন্তু তূলা-চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—শ্রমিকের অবস্থা সর্বদাই পরিবর্তিত হয়। রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণে হয়তো চিরকাল স্বল্পভে শ্রমিককে খাটানো সম্ভব হইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পূর্বে তূলা-চাষে বিনা পারিশ্রমিকে ক্রীতদাস নিযুক্ত হইত। সরকারের আইন-প্রণয়নের ফলে এখন কিছু কিছু পারিশ্রমিক নিগ্রো শ্রমিকদের দিতে হয়। এইভাবে যদি কোন কারণে শ্রমিকের মজুরি বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে তূলা-চাষের ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক আবহাওয়া এমন নয় যাহাতে নিগ্রো শ্রমিকদের মজুরি অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই জন্য মনে হয় তূলাবলয়ে তূলা-চাষের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

একথা মনে করা ভুল হইবে যে, তূলাবলয়ে তূলা ভিন্ন অন্য কোন শস্য উৎপাদিত হয় না। এখানকার বহু রাজ্যে তূলা অপেক্ষা অন্যান্য শস্য বেশী পরিমাণে চাষ হয়। এখানকার **অন্যান্য শস্যের** মধ্যে ভুট্টা, সরগাম, মটর, ধান, তামাক, সয়াবীন, শাকসব্জী, ফল, ইক্ষু প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে ধান, ভুট্টা ও তামাক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই সকল শস্য উৎপাদনের যাবতীয় ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক উপাদান এখানে বিদ্যমান। স্থানীয় পশুপালনের জন্য এখানে প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর বাজারে ধানের অভাবের দরুন ইহার চাহিদা অত্যধিক হারে বাড়িয়া গিয়াছে। কিউবার সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার দরুন ইক্ষুর স্থানীয় চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভার্জিনিয়া তামাকের বাজার পৃথিবী-ব্যাপী বিদ্যমান। স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সরগাম, মটর, সয়াবীন, ফল, শাকসব্জী প্রভৃতি প্রয়োজন। এই সকল কারণে মনে হয় যে, তূলা-বলয়ে এই সকল শস্যাদির চাষ বৃদ্ধি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই বহুস্থানে তূলার পরিবর্তে, এই সকল শস্য রোপণের বন্দোবস্ত হইতেছে।

তূলাবলয়ের শ্রমশিল্প—তূলাবলয় যদিও একসময়ে শিল্পে অনুন্নত ছিল, কিন্তু নিগ্রোদের আগমনের পর শ্রমিকসমস্যার সমাধান হওয়ায় ক্রমশঃই এই অঞ্চল শিল্পে উন্নতি লাভ করিতেছে। অ্যাপালাচিয়ান-অঞ্চলের উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস্ কয়লা, টেক্সাস্ ও লুইসিয়ানার খনিজ তৈল ও গ্যাস, আলাবামা

রাজ্যের লৌহ আকরিক, আরকানসাস্ ও টেক্সাসের অপর্যাপ্ত বক্সাইট ও গন্ধক, স্থানীয় অপর্যাপ্ত তুলা, স্থানীয় ভুট্টা অঞ্চলের পশুসম্পদ ও পাইন বনভূমির কাষ্ঠের অপর্যাপ্ত সম্ভার তুলাবলয়ের শিল্পোন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এখানকার নিগ্রো শ্রমিকগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু ; ইহারা অধিক সময় কম মজুরিতে কাজ করে। এই অঞ্চলের শিল্পোন্নতিতে নিগ্রোদের অবদান সর্বাপেক্ষা বেশী। টেনেসি ও মিসিসিপি নদীর সুলভ জলপথ স্থানীয় পরিবহণ-ব্যবস্থায় যথেষ্ট সাহায্য করে। তুলাবলয়ে এই সকল অনুকূল অবস্থা থাকিবার জন্য এখানকার আলাবামা অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, দক্ষিণাংশে চিনিশিল্প এবং দক্ষিণ অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলে রেয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

কার্পাসবয়ন-শিল্প তুলাবলয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প। এই শিল্পের উপযোগী সকল প্রকার উপাদান এখানে বিদ্যমান। সেইজন্য এখানকার অধিকাংশ রাজ্যে বিশেষতঃ দক্ষিণ অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলের রাজ্যসমূহে এই শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। উপরে বর্ণিত অনুকূল অবস্থা ছাড়াও এই শিল্পের উপযোগী আরও কয়েকটি উপাদান এখানে বিদ্যমান ; স্থানীয় তুলা, টেনেসি নদীর জলবিদ্যুৎ, স্থানীয় অপর্যাপ্ত চাহিদা এবং দক্ষিণ আমেরিকার বাজারের নৈকট্য এই শিল্পের উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। ইহা ছাড়া এই অঞ্চলে জমির মূল্য, খাজনা ও করের হার অনেক কম বলিয়া শিল্পস্থাপন সহজসাধ্য হইয়াছে। তুলাবলয়ে যে সকল অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান, তাহাতে মনে হয় যে, এই অঞ্চল শীঘ্রই শিল্পে আরও উন্নতি লাভ করিবে।

কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩-৬৪)

(লক্ষ মেঃ টন)

গম	৩১০	ভুট্টা	১,০৩৬
যব	৮৭	বীট	১৫৪
যই	১৪২	তুলা	৩২
বাজরা	১৫৬	তামাক	১০

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে গম-উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। প্রায় ২'৩৫ কোটি হেক্টর জমিতে গমের চাষ হয়। স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়াও এই দেশ বিদেশে গম রপ্তানি করে। গমচাষের উপযোগী জলবায়ু ও মৃত্তিকা

প্রধানতঃ দুইটি অঞ্চলে দেখা যায়—বাসন্তিক গমবলয় ও শীতকালীন গমবলয়। এই দেশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গম-উৎপাদক অঞ্চল উত্তর প্রেইরী অঞ্চলে অবস্থিত। কানাডার আলবার্টা, ম্যানিটোবা ও শাস্‌কাচুয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া লোহিত নদীর উপত্যকায় অবস্থিত এই দেশের ডাকোটা ও মিনেসোটা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, এই অঞ্চলকে পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি (Bread Basket of the World) বলা হয়। এই অঞ্চলে বসন্তকালে গমের চাষ হয়। এখানকার জলবায়ু ও প্রেইরী মৃত্তিকা এবং উন্নত ধরনের যান্ত্রিক চাষের ব্যবস্থা গমচাষের উন্নতিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। পঞ্চহ্রদের মাধ্যমে এই অঞ্চল হইতে প্রচুর গম বিদেশে রপ্তানি হয়। শীতকালীন গমবলয় গড়িয়া উঠিয়াছে এই দেশের মধ্যভাগে নেব্রাস্কা, কানসাস্‌, কলোরাডো, ওকলাহোমা ও টেক্সাস্‌ রাজ্যে। এখানেও উন্নত ধরনের যান্ত্রিক চাষের ব্যবস্থা আছে। এই অঞ্চল হইতে গ্যালভেস্টন ও নিউ অরলিয়ঁ বন্দর মারফত গম রপ্তানি হয়। তৃতীয় গমবলয় সৃষ্টি হইয়াছে ভুট্টাবলয় ও কার্পাসবলয়ের মধ্যস্থলে মিসৌরী, ইলিনয়, ইণ্ডিয়ানা ও ওহিও রাজ্যে। এখানকার গম স্থানীয় লোকের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কলম্বিয়া অঞ্চলে এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যেও অল্প-বিস্তর গম উৎপন্ন হয়। (প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত 'কৃষিকার্য' অধ্যায়ে 'গম' দ্রষ্টব্য)

ভুট্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ফসল; ভুট্টা-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এখানকার ভুট্টার অধিকাংশ উত্তরাংশে পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়; দক্ষিণাংশের নিগ্রোগণ ইহাকে তাহাদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। আইওয়া, ইলিনয়, ইণ্ডিয়ানা, মিসৌরী ও কানসাস্‌ অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী ভুট্টা উৎপন্ন হয়। সেণ্ট লুই, কানসাস্‌ সিটি ও চিকাগো শহর ভুট্টার প্রধান বাজার। **যই**-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এখানকার যই প্রধানতঃ পশুখাদ্য হিসাবে এবং মানুষের প্রাতরাশের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশের রাজ্যসমূহে অধিকাংশ যই উৎপন্ন হয়। **রাই**-উৎপাদনে এই দেশ বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। হ্রদ অঞ্চলে ও আটলাণ্টিক উপকূলের উত্তরাংশের বালুকাময় মৃত্তিকায় ইহার চাষ হয়। **যব**-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। অধিকাংশ যব পশুখাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়।

তুলা-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। মাঝারি আঁশযুক্ত ও দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা এই দেশে উৎপন্ন হয়। তুলা-বলয়ের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব টেক্সাস্, আরকানসাস্, আলাবামা, মিসিসিপি, জর্জিয়া ও ক্যারোলিনায় অধিকাংশ তুলা উৎপন্ন হয়। এখানকার কৃষ্ণমৃত্তিকা তুলা-চাষের উপযোগী। এই দেশের দক্ষিণাংশে ২১০টি বরফমুক্ত দিবস এবং ২০° সেঃ উত্তাপ তুলাচাষের সহায়ক। এখানকার বৃষ্টিপাত ২৫ সেঃ মিঃ হইতে ৫০ সেঃ মিঃ-এর মধ্যে। এখানে বল উইভিল নামক কীট প্রায় নাই বলিলেই হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ তুলা এই দেশে উৎপন্ন হয় এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ এখানকার তুলার উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল। বর্তমানে জলসেচের সাহায্যে নিউ মেক্সিকো, আরিজোনা ও ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলেও তুলার চাষ হইতেছে। এই দেশের নিগ্রো শ্রমিক তুলাচাষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। (প্রথম খণ্ডের "কৃষিকার্যের" অন্তর্গত 'তুলা' দ্রষ্টব্য)।

তামাক-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এই দেশে উৎপন্ন হয়। ইউরোপ হইতে আগত অধিবাসিগণ প্রথমে ভার্জিনিয়া ও মেরীল্যাণ্ডে শুধুমাত্র একধরনের তামাকের চাষ শুরু করে। যেহেতু তামাক জমির উর্বরতা চুষিয়া নেয়, সেইজন্য ইহারা ক্রমশঃ অন্যান্য রাজ্যেও তামাকের চাষ ছড়াইয়া দেয়। বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের তামাকের চাষ হইয়া থাকে। তামাক-চাষের প্রতি স্তরে বিভিন্ন কাজে বহু শ্রমিক দরকার। স্থানীয় নিগ্রো শ্রমিক এই কাজের সহায়ক। তামাক-চাষে প্রচুর সার প্রয়োজন; কারণ তামাক জমির উর্বরতা তাড়াতাড়ি ধ্বংস করিয়া ফেলে। ইহার ফলে অনেকসময় তামাকের উৎপাদন-খরচ বাড়িয়া যায়। ইহা ছাড়া কীটপতঙ্গের উৎপাত তো আছেই। বর্তমানে উত্তর ক্যারোলিনা এই দেশের অধিকাংশ তামাক উৎপন্ন করে। কেন্টুকি, ভার্জিনিয়া, টেনেসি, দক্ষিণ ক্যারোলিনা এবং জর্জিয়া রাজ্যেও প্রচুর তামাক উৎপন্ন হয়। পেনসিলভেনিয়া, উইস্‌কনসিন এবং ওহিও রাজ্যে অল্পবিস্তর তামাক উৎপন্ন হয়।

এই দেশের দক্ষিণাংশে মেক্সিকো উপসাগরের তীরে **ধান** ও **ইক্ষু** উৎপন্ন হয়। ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে ধান উৎপন্ন হয়। এখানকার চাউল হইতে

প্রধানতঃ মণ্ড প্রস্তুত হয়। **তৈলবীজ**-উৎপাদনেও এই দেশ প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। সয়াবীন, তিসিবীজ ও কার্পাসবীজ উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। **বীট**-উৎপাদনে এই দেশ বর্তমানে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। উত্তরাংশে অধিকাংশ বীট উৎপন্ন হয়। **বাজরা** ও **খড়** উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ভুট্টাবলয়ে অধিকাংশ খড় উৎপন্ন হয় এবং পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মূল্য হিসাবে ভুট্টার পরেই এই দেশে খড়ের স্থান। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ও ফ্লোরিডা রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে ফল উৎপন্ন হয়।

পশুপালন (Pastoral Industry)—শূকর-পালনে ও গবাদি পশু-পালনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। মেষপালনেও এই দেশ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জমির শতকরা ৪০ ভাগ পশুচারণক্ষেত্র; প্রায় ৩০ কোটি হেক্টর জমিতে পশুপালন করা হয়। ইহা ছাড়া দেশের মোট শস্যক্ষেত্রের দুই-তৃতীয়াংশ পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত হয়। বনভূমির অর্ধাংশ পশুচারণের জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকে; ইহা মোট জমির শতকরা ১৬ ভাগ। সুতরাং পশুপালন এই দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প। দেশের পূর্বাংশ আর্দ্র হওয়ায় এখানে অধিকাংশ গবাদি পশু ও শূকর পালিত হয়। পশ্চিমাংশের শুষ্ক অংশে অধিকাংশ মেষ পালিত হয়। ভুট্টাবলয় এবং ভুট্টা ও শীতকালীন গমবলয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী গবাদি পশু পাওয়া যায়। ভুট্টাবলয়ে মধ্যভাগের সমভূমিতে এবং পশ্চিমাংশের মালভূমি অঞ্চলে মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশু পাওয়া যায়। উত্তর-পূর্বাংশে অধিকাংশ দুগ্ধপ্রদায়ী গবাদি পশু পাওয়া যায়। ভুট্টাবলয়ে অধিকাংশ শূকর পালিত হয় এবং পশ্চিমাংশের পার্বত্য অঞ্চলে অধিকাংশ মেষ পালিত হয়।

বিভিন্ন স্থানের প্রাণিজ সম্পদের সাহায্যে এই দেশ পশুপালন-শিল্পে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। উইস্‌কনসিন্, মিনেসোটা, আইওয়া, নিউ ইয়র্ক ও পেনসিলভেনিয়া অঞ্চলে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি (পনীর, মাখন) উৎপন্ন হয়। হ্রদ অঞ্চলের দক্ষিণাংশে চিকাগোতে মাংসের শ্রেষ্ঠ বাজার অবস্থিত। ইহা ছাড়া মিলওয়াকি, ফিলাডেল্‌ফিয়া, বোস্টন, কানসাস্‌সিটি, সেন্ট পল, সেন্ট লুই প্রভৃতি মাংস-শিল্প ও চর্মশিল্পের জন্য বিখ্যাত। দেশীয় চাহিদা মিটাইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করিয়া থাকে।

মৎস্যশিল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। তিনটি অঞ্চলে এই দেশের মৎস্য-শিকার হইয়া থাকে; (ক) আটলান্টিক উপকূলের উত্তরাংশে নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে প্রচুর মৎস্য-শিকার করা হয়। মেনহ্যাডেন, কড্, হ্যালিবাট, হেক ও হ্যাড্ডক মৎস্য এই অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়। (খ) প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর উপকূলে আলাস্কায় এবং কলম্বিয়া নদীর মোহনায় প্রচুর স্যামন মৎস্য পাওয়া যায়। (গ) ইহা ছাড়া এই দেশের পঙ্কহ্রদ ও বিভিন্ন নদীতে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। মিসিসিপি ও ইহার শাখা-নদী-সমূহে বিখ্যাত মুশেল মৎস্য পাওয়া যায়।

খনিজ সম্পদ (Minerals)

প্রকৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রচুর পরিমাণে খনিজ সম্পদ অকাতরে বিতরণ করিয়াছে। বিভিন্ন খনিজ সম্পদে এই দেশ সমৃদ্ধ; ইহার মধ্যে কয়লা, খনিজ তৈল, তাম্র, লৌহ আকরিক, রৌপ্য, সীসা, দস্তা, লবণ, ফসফেট প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খনিজ সম্পদের উৎপাদনের মাত্রা এই দেশে এত বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এই হারে উৎপাদন করিলে শীঘ্রই সমগ্র সঞ্চিত খনিজ সম্পদ নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। সেইজন্য বর্তমানে উৎপাদনের হার কিছুটা কমিয়া আসিতেছে। অন্যদিকে রাশিয়া তাহার উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়াইতেছে। সেইজন্য গত কয়েক বৎসরে কয়লা, লৌহ আকরিক প্রভৃতি উৎপাদনে রাশিয়া এই দেশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩)

(লক্ষ মেঃ টন)

কয়লা	৪৩২৯	খনিজ তৈল	৩৭৩১
লৌহ আকরিক	৭৩৪	সীসা	৭'৩১
তাম্র	১৭'২৮	অ্যালুমিনিয়াম	২৫'৫৬
দস্তা	৮'৬৭	গন্ধক	৬২

কয়লা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ১,৮৩,৮৬৬ কোটি মেঃ টন। কয়লা-উৎপাদনে এই দেশ বর্তমানে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে; রাশিয়ার পরেই এই দেশের স্থান। পৃথিবীর

মোট উৎপাদনের শতকরা ১৮ ভাগ কয়লা এখানে উত্তোলিত হয়। এই দেশে নিম্নলিখিত চারিটি অঞ্চলে প্রধানতঃ কয়লা পাওয়া যায়:—

অ্যাপালাচিয়ান পর্বতমালার পশ্চিমাংশে উত্তরে পেনসিলভেনিয়া হইতে দক্ষিণে আলাবামা রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত সকল রাজ্যে প্রচুর অ্যানথ্রাসাইট ও উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস্ কয়লা পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট সরবরাহের শতকরা ৭০ ভাগ কয়লা এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। **মধ্যভাগের সমতলভূমিতে** কেন্টুকি, ইলিনয়, ইণ্ডিয়ানা, মিসৌরী, নেব্রাস্কা, আইওয়া, ডাকোটা প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর কয়লা উত্তোলিত হয়। **রকি পর্বতমালার** উত্তরে কানাডা-সীমান্ত হইতে দক্ষিণে মেক্সিকো-সীমান্ত পর্যন্ত কয়লাখনি বিস্তৃত; এই অঞ্চলের কলোরাডো রাজ্যে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে লোকসংখ্যা বেশী না থাকায় খনিসমূহ হইতে খুব বেশী কয়লা তোলা যায় না। ইহা ছাড়া **প্রশান্তমহাসাগরীয় উপকূলে** অবস্থিত রাজ্যসমূহে, আলাস্কায় ও উপসাগরীয় উপকূল অঞ্চলেও কয়লাখনি আছে। শেষোক্ত অঞ্চলে লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায় (প্রথম খণ্ডের 'শক্তিসম্পদ' অধ্যায়ের অন্তর্গত 'কয়লা' দ্রষ্টব্য)।

খনিজ তৈল—পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৩৩ ভাগ খনিজ তৈল উৎপন্ন করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৈল-উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। একসময় এই দেশে পৃথিবীর অধিকাংশ তৈল উৎপন্ন হইত। কিন্তু বর্তমানে রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের তৈল-উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় তৈলের আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া আধিপত্য ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। নিজদেশের তৈলখনি ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে অনেক তৈলখনির মালিক। এই দেশের নিউ অরলিয়ন্স স্যানফ্রান্সিস্কো ও নিউ ইয়র্ক বন্দর মারফত অধিকাংশ খনিজ তৈল বিদেশে রপ্তানি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নলিখিত সাতটি অঞ্চলে তৈল পাওয়া যায়:—

(ক) উত্তরে নিউ ইয়র্ক রাজ্য হইতে দক্ষিণে টেনেসি পর্যন্ত বিস্তৃত **অ্যাপালাচিয়ান পর্বতমালায়** তৈল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে পেনসিলভেনিয়ায় বহু পুরাতন খনি আছে। এখানকার তৈল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং সাল্ফার-বর্জিত। শিল্পাঞ্চলের নিকট অবস্থিত বলিয়া এখানকার তৈলের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। একসময়ে এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

শতকরা ৯৫ ভাগ তৈল পাওয়া যাইত। অন্যান্য অঞ্চলে বহু খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় বর্তমানে ইহার উৎপাদন অনেক কমিয়া গিয়াছে। (খ) **ইলিনয়** ও **দক্ষিণ-পশ্চিম ইণ্ডিয়ানা** অঞ্চলে মোট উৎপাদনের শতকরা ৩ ভাগ তৈল উৎপন্ন হয়। এখানকার তৈল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং ইহা সহজেই পরিশোধন করা যায়। (গ) বৃহৎ হ্রদসমূহের দক্ষিণে অবস্থিত ওহিও এবং ইণ্ডিয়ানা রাজ্যের **লিমা-ইণ্ডিয়ানা** অঞ্চলে প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। সাল্‌ফার মিশ্রিত থাকায় তৈল পরিশোধন করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। এই অঞ্চলের লিমা সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য তৈলকেন্দ্র। (ঘ) **মধ্য-মহাদেশীয় অঞ্চলে** কানসাস্‌, ওকলাহোমা ও উত্তর ও পূর্ব টেক্সাসে প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। এখানে সবরকমের তৈল পাওয়া যায়, বর্তমানে এই অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী তৈল পাওয়া যায়। (ঙ) মেক্সিকো উপসাগরের নিকটবর্তী **উপসাগরীয় অঞ্চলের** টেক্সাস্‌ ও লুইসিয়ানায় এই দেশের শতকরা ২৫ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। (চ) **রকি পর্বত** অঞ্চলের সঞ্চিত তৈলের পরিমাণ অধিক হইলেও উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম; এই অঞ্চলে উইয়োমিং, মনটানা ও কলোরাডো রাজ্যে তৈল পাওয়া যায়। (ছ) **ক্যালিফোর্নিয়া** অঞ্চলের তৈলখনি লস্‌ এঞ্জেল্‌স্‌ হইতে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। মোট উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ তৈল এখানে পাওয়া যায়; এখানে লস্‌ এঞ্জেল্‌স্‌ প্রধান তৈলকেন্দ্র। (প্রথম খণ্ডের 'শক্তি-সম্পদ' অধ্যায়ের অন্তর্গত 'খনিজ তৈল' দ্রষ্টব্য।)

প্রাকৃতিক গ্যাস—কখনও খনিজ তৈলের সঙ্গে, কখনও শুধু মাত্র গ্যাস খনি হইতে পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তির উৎপাদনে গ্যাসের প্রচুর অবদান আছে। অ্যাপালাচিয়ান তৈলখনির উত্তরাংশে অধিকাংশ গ্যাস পাওয়া যায়। অধিকাংশ গ্যাস স্থানীয় শিল্পের চাহিদা মিটাইতে ব্যয় হয়; কিয়দংশ ইরি হ্রদ অঞ্চলে পাইপযোগে প্রেরিত হয়।

লৌহ আকরিক—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঞ্চিত লৌহ আকরিকের পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে। অনেক ভৌগোলিক মনে করেন যে, এই দেশের লৌহ আকরিক আগামী ৫০ বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, সেইজন্য ইহার উৎপাদন অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে এই দেশ লৌহ আকরিক-উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সুপিরিয়র হ্রদ অঞ্চলে মিচিগান ও মিনেসোটা প্রদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট-উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। মিনেসোটা

প্রদেশের মেসাবী, ভারমিলিয়ান ও কুইনা অঞ্চল লৌহ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এখানকার অধিকাংশ লৌহ হেমাটাইট শ্রেণীভুক্ত। মিচিগান প্রদেশে গোজেবিক, মোনোমিনি, মারকোয়েট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য লৌহখনি অঞ্চল। হ্রদ অঞ্চলের লৌহখনি হইতে বৎসরে ৫ মাস লৌহ আকরিক পাঠানো সম্ভব নহে; কারণ এই ৫ মাস হ্রদসমূহ বরফাবৃত থাকে। ইহা ছাড়া উইসকনসিনে, অ্যাপালাচিয়ান পর্বতের দক্ষিণে **আলাবামা** প্রদেশে, রকি পর্বত অঞ্চলে এবং নিউ ইয়র্কের **অ্যাডিরণ-ড্যাক্সে** লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। প্রচুর উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও শিল্পের চাহিদা মিটাইবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশসমূহ হইতে লৌহ আমদানি করে। (প্রথম খণ্ডের 'শক্তিসম্পদ' অধ্যায়ের অন্তর্গত 'লৌহ আকরিক' দ্রষ্টব্য।)

তাম্র—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাম্র-উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ২৮ ভাগ তাম্র এই দেশে উৎপন্ন হয়। এই দেশের **আরিজোনা** অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী তাম্র পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া মনটানা, মিচিগান, ইউটা, নেভাডা ও কলোরাডো রাজ্যেও প্রচুর তাম্র পাওয়া যায়। এখানকার অধিকাংশ তাম্র বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। তাম্র-উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় মোট সঞ্চিত তাম্র হয়তো মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে; সেইজন্য বর্তমানে প্রচুর তাম্র আমদানি করিয়া উৎপাদন হ্রাস করা হইতেছে।

অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী অ্যালুমিনিয়াম এই দেশে উৎপন্ন হয়। যে বক্সাইট হইতে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হয়, তাহা এই দেশের আরকানসাস্ রাজ্যে পাওয়া যায়। পৃথিবীর মোট বক্সাইটের শতকরা দশ ভাগ মাত্র এই দেশে পাওয়া গেলেও সুরিনাম ও বৃটিশ গায়না হইতে বক্সাইট আমদানি করিয়া এখানকার অ্যালুমিনিয়াম শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। টেক্সাস্ রাজ্য **গন্ধক (Sulphur)** উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীর অধিকাংশ গন্ধক এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। **সীসা** ও **দস্তা** উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। মিসৌরী রাজ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী সীসা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ওকলাহোমা, কানসাস্, ইডাহো, ইউটা, মনটানা, কলোরাডো এবং আরিজোনা রাজ্যেও প্রচুর সীসা ও দস্তা পাওয়া যায়। **লবণ**-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

মিচিগান, নিউ ইয়র্ক, ওহিও ও মেক্সিকো উপকূলে অধিকাংশ লবণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ১১ ভাগ স্বর্ণ এবং ২৫ ভাগ রৌপ্য

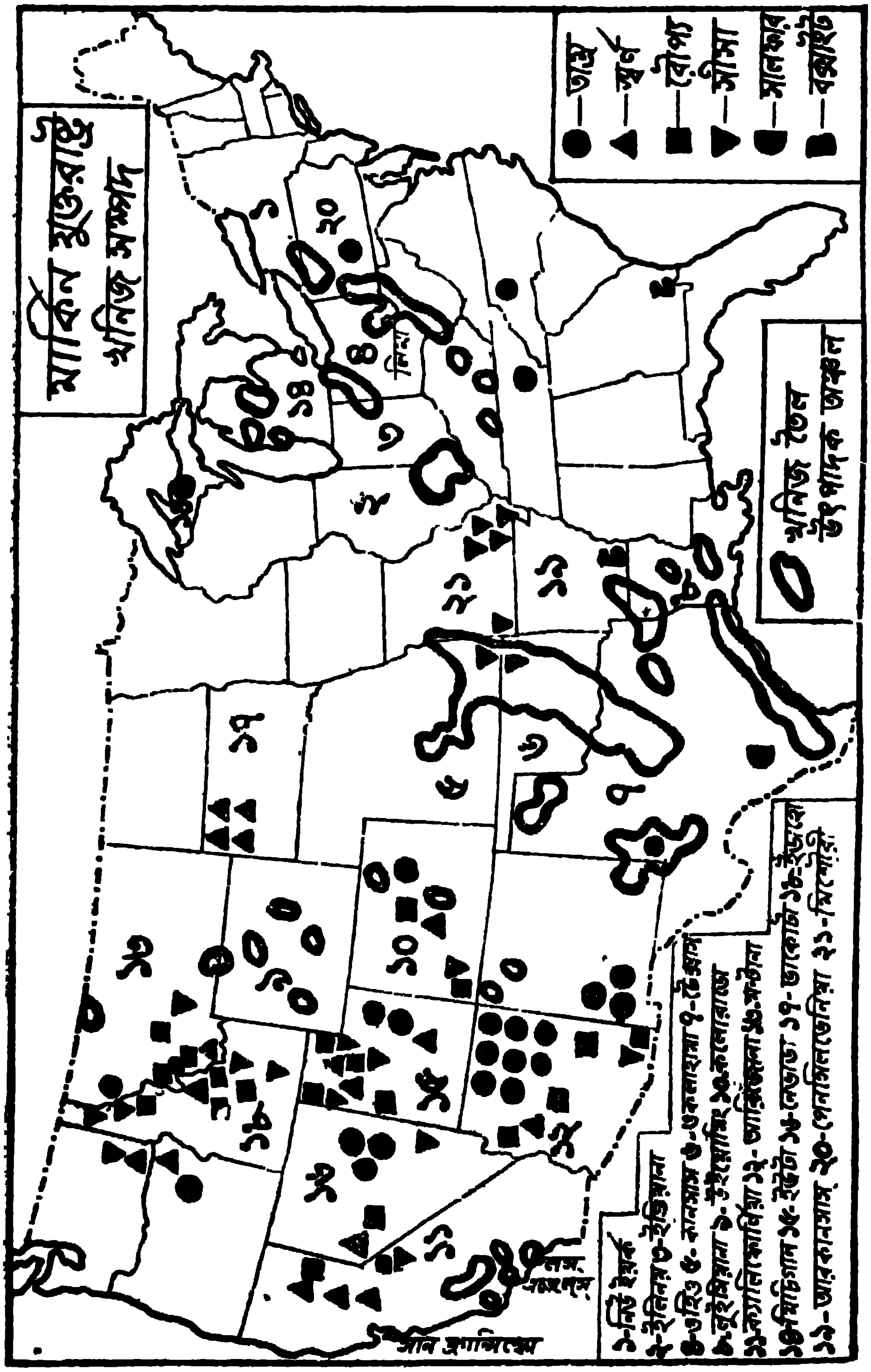

এই দেশে পাওয়া যায়। আরিজোনা, নেভাডা, কলোরাডো ও ইউটা রৌপ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। দক্ষিণ ডাকোটার 'ব্ল্যাক হিল' অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা

বেশী স্বর্ণ পাওয়া যায়। সিয়েরা নেভাডা পর্বতের পাদদেশে ক্যালিফোর্নিয়ায় এত স্বর্ণ পাওয়া যায় যে, এই রাজ্যের নাম দেওয়া হইয়াছে "স্বর্ণরাজ্য" (Golden State)। এই দেশের বিভিন্ন স্থানে দস্তা, মলিবডেনাম প্রভৃতি পাওয়া যায়। বিভিন্ন খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হইলেও এই দেশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্য মোটেই পাওয়া যায় না বা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না; যথা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, রাং ও ক্রোমিয়াম। এই সকল খনিজ দ্রব্যের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণতঃ বা আংশিকভাবে আমদানির উপর নির্ভরশীল।

জলবিদ্যুৎ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। এখানকার বিভিন্ন শিল্প, বিশেষতঃ অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প জলবিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। প্রধানতঃ তিনটি অঞ্চলে এই দেশের জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে—(ক) **টেনেসি** নদীর উপর বাঁধ দিয়া বহুমুখী পরিকল্পনার মারফত বিদ্যুৎ-উৎপাদন, জলসেচ, নৌ-চলাচল ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণের কাজ চলিতেছে। টেনেসি পরিকল্পনার মারফত ৫,৯০০ কোটি কিলোওয়াট্ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই পরিকল্পনার ফলে ১,১৬,২০০ বর্গ-কিলোমিটার জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে। টেনেসি, কেণ্টুকি, মিসিসিপি, আলাবামা, উত্তর ক্যারোলিনা, জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়া রাজ্য এই পরিকল্পনার ফলে উপকৃত হইয়াছে। (খ) এই দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। **নায়াগ্রা** ও অন্যান্য নদীর জলপ্রপাত হইতে এখানকার জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। নিউ ইয়র্ক, নিউ ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়; এই অঞ্চলকে 'ফল-লাইন' (Fall-line) বলা হয়। এখানকার বহু শিল্প জলবিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। (গ) **প্রশান্তমহাসাগরীয় উপকূলে** রকি পর্বত হইতে নির্গত নদীর স্রোত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ওয়াশিংটন, ওরেগন ও ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যেই এখানকার অধিকাংশ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই দেশের মোট উৎপাদনক্ষম জলবিদ্যুতের শতকরা ৬০ ভাগ এই অঞ্চলে পাওয়া গেলেও স্থানীয় চাহিদা বেশী না থাকায় মোট উৎপাদনের পরিমাণ খুব বেশী নহে। ইহা ছাড়া মিসিসিপি, মিসৌরী উপত্যকায় নদীস্রোতের সাহায্যে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

শ্রমশিল্প (Industries)

শিল্পোন্নতির কারণ—শিল্পোৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই দেশের উন্নতির প্রথমাবস্থায় কৃষির উপর মানুষ বেশী নির্ভরশীল থাকিলেও বর্তমানে শ্রমশিল্পই এই দেশের শ্রেষ্ঠ উপজীবিকা। কয়লা, খনিজ তৈল, গ্যাস ও জলবিদ্যুৎ অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া **শক্তি-সম্পদের** কোন অভাব নাই। লৌহ আকরিক, তাম্র, বক্সাইট, সাল্‌ফার, তুলা, পশম, কাষ্ঠ প্রভৃতি **কাঁচামাল** এই দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। স্থানীয় উন্নত জীবনমান ও লোকসংখ্যার আধিক্য শিল্পদ্রব্যের **চাহিদা**-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। **পরিবহণ-ব্যবস্থায়** এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই দেশের নাতিশীতোষ্ণ **জলবায়ু** শ্রমিকের কর্মদক্ষতা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। স্থানীয় **শ্রমিক** বিশেষতঃ নিগ্রো শ্রমিক অত্যন্ত কর্মঠ ও পরিশ্রমী। এইভাবে দেখা যায় যে, শিল্পোৎপাদনের উপযোগী যাবতীয় উপকরণ এই দেশে বিদ্যমান। ইউরোপের উন্নতিশীল ও শিল্পনিপুণ অধিবাসিগণ যখন নিউ ইংল্যাণ্ডে আসিয়া প্রথম বসতি স্থাপন করে, সেই সময় হইতেই এদেশে শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হয়। নিউ ইংল্যাণ্ডে প্রথমে শিল্পের গোড়াপত্তন হইলেও ক্রমশঃ ইহা দক্ষিণে ও পশ্চিমে বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিল্পে প্রায় ১·৬ কোটি লোক নিযুক্ত আছে; তন্মধ্যে ধাতুশিল্পে ১৮ লক্ষ, পরিবহণ-শিল্পে ১৩ লক্ষ, যন্ত্রপাতি-শিল্পে ১২ লক্ষ, খাদ্যদ্রব্য-প্রস্তুতে ১১ লক্ষ, বয়নশিল্পে ১০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। এই দেশের শিল্পে অধিকাংশক্ষেত্রে **স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি** ব্যবহারের ফলে অল্প শ্রমিকের সাহায্যে বেশী উৎপাদন সম্ভবপর। এখানকার বিভিন্ন সম্পদের উৎপাদন একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। কৃষিজ দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য ও প্রাণিজ দ্রব্য শিল্পের চাহিদার উপর নির্ভরশীল। শিল্পের উৎপাদন আবার সাধারণ কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য লোকের আয়ের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে এই দেশের বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদন এতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, এইভাবে চলিতে থাকিলে এই দেশ বহুদিন উন্নত জীবনমান রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে। পৃথিবীর বহু দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের **তাঁবেদার-রাষ্ট্রে** পরিণত হওয়ায় এই দেশের শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিতে কোন অসুবিধা হয় না।

শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩)

(লক্ষ মেঃ টন)

ইস্পাত	৯৯১	জাহাজ (লক্ষ GRT)	৪'৮৫
কার্পাস-বস্ত্র	১৩'৬২	মোটর-গাড়ী (লক্ষ)	৮৭'৪
পশম-বস্ত্র (সুতা)	৩'৩৪	চিনি	৩৮'৭৮
রেয়ন-বস্ত্র	২'২৯	সিমেণ্ট	৪৭

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ শিল্প প্রধানতঃ দুইটি অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে—উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্ব শিল্পাঞ্চল। এই দেশের শিল্পাঞ্চল সম্বন্ধে পূর্বে প্রথম খণ্ডের 'শ্রমশিল্প' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—লৌহ আকরিক ও কয়লা উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সুতরাং এদেশে কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদের কোন অভাব নাই। হ্রদ অঞ্চলের সুলভ জলপথ এবং দেশব্যাপী রেলপথের সুবন্দোবস্ত থাকায় **পরিবহণ-ব্যবস্থার** কোন অসুবিধা হয় না। হ্রদ অঞ্চলের (মিনেসোটা ও মিচিগান) লৌহ আকরিক হ্রদ ও খালের মাধ্যমে অতি অল্পব্যয়ে পূর্বদিকে বিভিন্ন ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্রে আনীত হয়। সমৃদ্ধিশালী, জনবহুল ও শিল্পপ্রধান দেশ বলিয়া এখানে **চাহিদার** কোন অভাব নাই। বৈদেশিক বাজারেও এই দেশের প্রভাব আছে। এখানকার **শ্রমিকগণও** কর্মক্ষম। এই সকল কারণে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে প্রধানতঃ চারিটি অঞ্চলে এই শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে :—

(ক) **পিট্‌স্‌বার্গ অঞ্চল**—এই দেশের মোট লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা ৪৫ ভাগ এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লা ও হ্রদ অঞ্চলের লৌহ আকরিক এখানকার শিল্পে ব্যবহৃত হয়। পিট্‌স্‌বার্গ ও ইয়ংস্‌টাউন এই অঞ্চলের বিখ্যাত ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্র। (খ) **হ্রদ অঞ্চল**—পৃথিবীর বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এই অঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার শিল্পও হ্রদ অঞ্চলের লৌহ ও অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লার উপর নির্ভরশীল। মিচিগান হ্রদ-সন্নিহিত চিকাগো ও গেরী, ইরি হ্রদ-সন্নিহিত ডেট্রয়েট, বাফেলো, ক্লীভল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থান লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। (গ) **পেনসিলভেনিয়া অঞ্চল**—আটলাণ্টিক মহাসাগরের

তীরবর্তী অঞ্চলে বাল্টিমোর, স্প্যারোজ পয়েন্ট, ফিলাডেল্‌ফিয়া প্রভৃতি স্থানে স্থানীয় কয়লা ও আমদানীকৃত লৌহের সাহায্যে বড় বড় ইস্পাত-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। কানাডা, স্পেন, চিলি, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ হইতে এখানে লৌহ আমদানি করা হয়। (ঘ) **বার্মিংহাম অঞ্চল**—আলাবামা রাজ্যের এই অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক, কয়লা, চুনাপাথর ও ডোলোমাইট পাওয়া যায় বলিয়া বার্মিংহাম বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

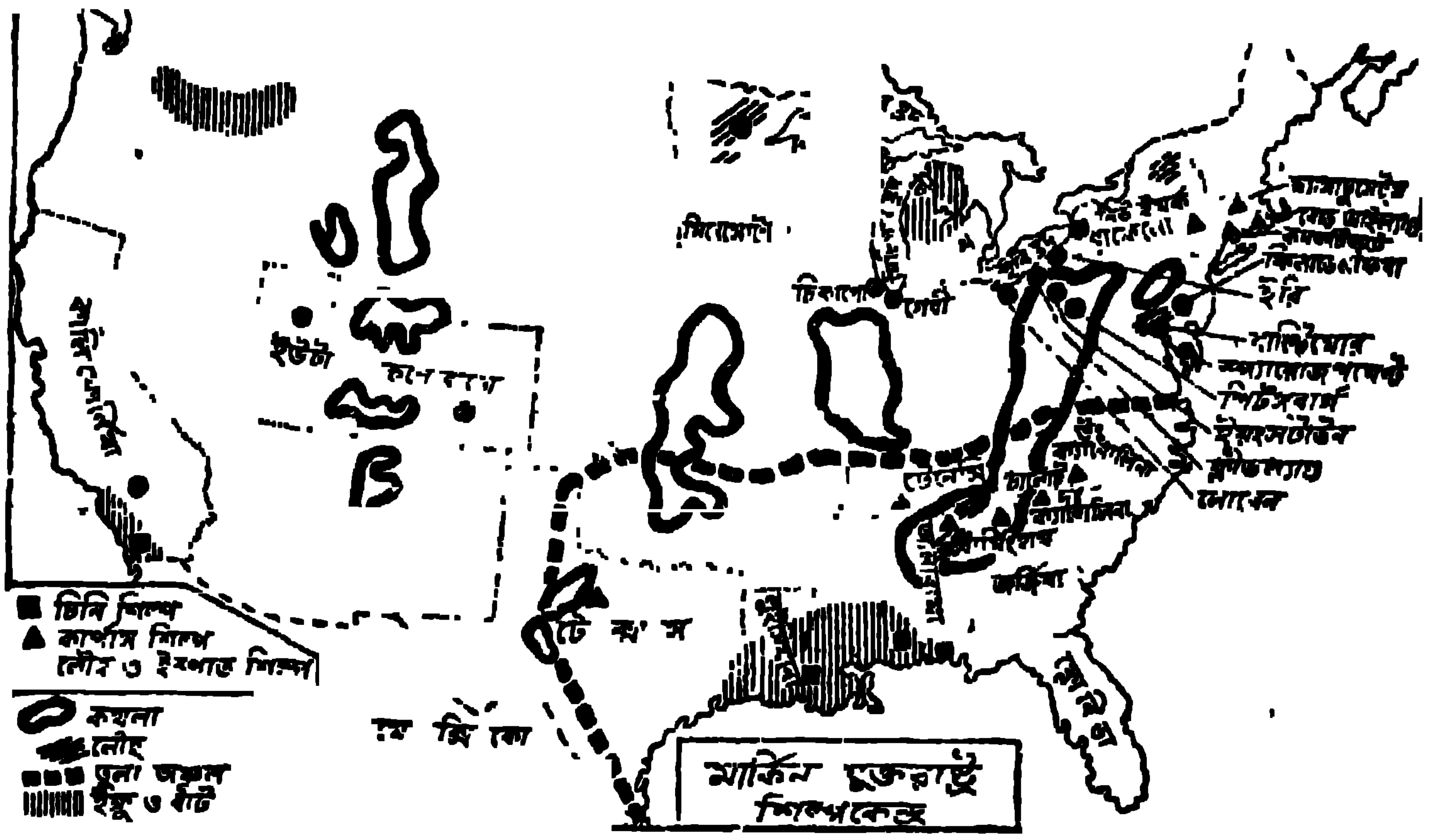

এই চারিটি অঞ্চল ছাড়াও কলোরাডো, ক্যালিফোর্নিয়া, ইউটা প্রভৃতি রাজ্যে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল রাজ্যের ইস্পাত-শিল্পে স্থানীয় কয়লা ও লৌহ আকরিক ব্যবহৃত হয়।

অপর্যাপ্ত ইস্পাত উৎপাদনের ফলে এই দেশে ইস্পাতের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চল এক-একটি শিল্পে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। কৃষি-অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া চিকাগো **কৃষি-যন্ত্রপাতি** শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। মিলওয়াকি অঞ্চলেও কৃষি-যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়। কার্পাসশিল্পে এই দেশ শ্রেষ্ঠ বলিয়া এখানে **কার্পাসবয়নের যন্ত্রপাতির** চাহিদা অত্যন্ত বেশী; সেইজন্য নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে এই সকল যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ওয়ারসেস্টার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্পাসবয়ন-যন্ত্রপাতি নির্মাণ-কেন্দ্র। নিউ ইয়র্ক অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবন্দোবস্ত হওয়ায় এখানে **বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি** নির্মাণের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

বিভিন্ন রেলকেন্দ্রসমূহে বড় বড় **রেল-ইঞ্জিন** নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; ফিলাডেল্‌ফিয়া, চিকাগো, পিট্‌স্‌বার্গ, সেণ্ট লুই প্রভৃতি শহরে এই শিল্প সর্বাপেক্ষা বেশী উন্নতি লাভ করিয়াছে। **জাহাজনির্মাণ**-শিল্পে এই দেশ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দর ও পঞ্চহ্রদের তীরে অবস্থিত বন্দরেই অধিকাংশ জাহাজ-নির্মাণের কারখানা অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ উপকূলেও এই শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা, লৌহ, কাঠ প্রভৃতি এই অঞ্চলে অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ১৯৬০ সালে এই দেশে ৪৮·৫ লক্ষ GRT পরিমিত জাহাজ নির্মিত হইয়াছে এবং ৫·২৪ লক্ষ GRT পরিমিত জাহাজ নির্মিত হইতেছিল। **মোটর-গাড়ী** নির্মাণ-শিল্পে এই দেশ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ইরি হ্রদের উত্তরাংশে অবস্থিত ডেট্রয়েট পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মোটর-গাড়ী-নির্মাণকেন্দ্র। ইণ্ডিয়ানাপোলিস্, মিলওয়াকি, ফিলাডেল্‌ফিয়া, ক্লীভল্যাণ্ড, বাফেলো শহরও মোটর-গাড়ী নির্মাণ-শিল্পে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চলের কাষ্ঠসম্পদ, ইস্পাত, কয়লা প্রভৃতি এই শিল্পের উন্নতিসাধনে সাহায্য করিয়াছে। হেনরী ফোর্ড ১৯০৩ সালে ডেট্রয়েটে এই শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া সুলভে মোটর-গাড়ী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার ফলে বর্তমানে এই দেশের শতকরা ২৫ ভাগ লোক ইহা ব্যবহার করে। প্রতিবৎসর এখানে প্রায় ৬৭ লক্ষ মোটর-গাড়ী এবং ১২ লক্ষ ট্রাক প্রস্তুত হয়।

বিমানপোত-নির্মাণশিল্পে এই দেশ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চাহিদা মিটাইবার জন্য এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়। ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে ও উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চলে এই শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। মধ্যভাগের সমতলভূমিতেও বর্তমানে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

কার্পাসবয়ন-শিল্প—উৎকৃষ্ট তুলা ও শক্তিসম্পদের প্রাচুর্য, আর্দ্র জলবায়ু, বন্দরের নৈকট্য, জলপথে ও রেলপথে উৎকৃষ্ট পরিবহণ-ব্যবস্থা, সুনিপুণ শ্রমিকের প্রাচুর্য এদেশে কার্পাসবয়ন-শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল দেশ বলিয়া এখানে কার্পাস-বস্ত্রের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। বৈদেশিক বাজারেও এই দেশের কর্তৃত্ব সুবিদিত। এই সকল কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে কার্পাস-বস্ত্র-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধানতঃ তিনটি অঞ্চলে এই শিল্প প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে (১৪৯ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য) :—

(ক) **নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চল**—বৃটেনের কিছু দক্ষ তাঁতী এই অঞ্চলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করায় এখানে কার্পাস-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। মেক্সিকো, ব্রেজিল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল হইতে এই অঞ্চলে তুলা আমদানি করা হয়। তুলার উৎপাদক অঞ্চলসমূহ দূরে থাকিলেও স্থানীয় শ্রমিকেব নিপুণতা একদিন যে সুনাম অর্জন করিয়াছিল, তাহারই ভৌগোলিক স্থিতিপ্রবণতার (Inertia) জন্য এই অঞ্চল এখনও সূক্ষ্ম বস্ত্রাদির উৎপাদনে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। এখানকার স্বাভাবিক আর্দ্র জলবায়ু সূক্ষ্ম সূতা-প্রস্তুতে ও শ্রমিকের কর্মদক্ষতা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বোস্টন বন্দর বহুপূর্ব হইতেই তুলা-ব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এইজন্য তুলা সংগ্রহ করিতে বিশেষ অসুবিধা হইত না। এই স্থান পর্বতসঙ্কুল বলিয়া বহু স্রোতস্বিনী নদী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আটলান্টিক মহাসাগরে পডিয়াছে। ইহার ফলে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন সহজসাধ্য হইয়াছে। ইহা ছাড়া পেনসিলভেনিয়া হইতে সুলভ সমুদ্রপথে কয়লা আনা সহজসাধ্য। বালি ও পাথরপূর্ণ জমি থাকায় এখানে চাষের সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব নয়। এইজন্য সকলকেই কারখানায় কাজ করিতে হয়। ইউরোপ, কানাডা ও বৃটেন হইতে বহু দক্ষ তাঁতী এখানে আসায় এই শিল্পের উন্নতি সহজসাধ্য হয়। এই দেশের উত্তব-পূর্বাংশে বসতি প্রথম শুরু হওয়ায় এতদঞ্চলে বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই সকল কারণে এই অঞ্চল কার্পাস বয়ন-শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিল। অবশ্য বর্তমানে তুলার অপ্রাচুর্যবশতঃ মোট উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। রোড আইল্যাণ্ড, ম্যাসাচুসেট্‌স্ ও কনেক্‌টিকাট এই অঞ্চলের বিখ্যাত কার্পাস-শিল্পাঞ্চল।

(খ) **দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল**—জর্জিয়া, আলাবামা, টেনেসি, টেক্সাস্, ক্যারোলিনা এই অঞ্চলের প্রধান তুলা-উৎপাদক রাজ্য। সেইজন্য এই অঞ্চলের কার্পাস-শিল্প ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতেছে। সুলভ নিগ্রো শ্রমিক, দক্ষিণ অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লা এবং উৎকৃষ্ট জলপথ ও রেলপথ এই অঞ্চলের কার্পাস-শিল্পের উন্নতির সহায়ক। বর্তমানে এই অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক বস্ত্র উৎপন্ন হয়। চার্লোটে, কলম্বিয়া, অগাস্টা, গ্রানভীল, স্পার্টানবার্গ, গ্যাস্টোমা, কংকর্ড প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কার্পাস-শিল্পকেন্দ্র।

(গ) **মধ্য-আটলাণ্টিক অঞ্চল**—এই অঞ্চলে প্রচুর সুলভ জলবিদ্যুৎ পাওয়া যায়; বন্দর ও তুলা অঞ্চল নিকটেই অবস্থিত। এই সকল কারণে নিউ ইয়র্ক, পেনসিলভেনিয়া ও মেরীল্যাণ্ড অঞ্চলে কার্পাস-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলে গেঞ্জী ও মোজার উৎপাদন বেশী হইয়া থাকে। ফিলাডেলফিয়া এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কার্পাস-শিল্পকেন্দ্র।

দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কার্পাস-শিল্পের ক্রমোন্নতির কারণ—বিভিন্ন কারণে নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলের উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের কার্পাস বয়ন-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ, দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের নিকটস্থ তুলা-বলয়ে প্রচুর তুলা পাওয়া যায় বলিয়া তুলার পরিবহণ-খরচ বহুলাংশে কম লাগে; কিন্তু নিউ ইংল্যাণ্ড হইতে তুলা-বলয় অনেক দূরে অবস্থিত। দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণ অ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলের উৎকৃষ্ট কয়লা, খনিজ তৈল ও গ্যাস, টেনেসি উপত্যকার জলবিদ্যুৎ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের **শক্তিসম্পদের** প্রয়োজন সুলভে মিটাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের নিগ্রো **শ্রমিক** অত্যন্ত কম মজুরিতে বেশীসময় কাজ করে। পূর্বে এই অঞ্চলে নাতিনিবিড় লোকবসতি থাকায় শ্রমিকের অভাবে শিল্পের উন্নতি সাধন করা কঠিন ছিল; কিন্তু বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির প্রচলন হওয়ায় অল্প শ্রমিকের সাহায্যে শিল্প পরিচালনা করা সম্ভব। কৃষিকার্যে যন্ত্রপাতির প্রচলন হওয়ায় অতিরিক্ত কৃষি-শ্রমিক শিল্পে নিয়োজিত করা সম্ভব হইয়াছে। চতুর্থতঃ, দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের লোকসংখ্যা বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট লোকসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। সুতরাং কার্পাস-বস্ত্রের স্থানীয় **চাহিদা** প্রচুর; ইহা ছাড়া পানামা খাল কাটিবার পর দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় তীরের দেশসমূহ এই অঞ্চলের নিকটবর্তী হওয়ায় এই সকল দেশে কার্পাস-বস্ত্র রপ্তানি করা সহজসাধ্য হইয়াছে; অন্যদিকে নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চল হইতে দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ অনেক বেশী দূরে অবস্থিত। পঞ্চমতঃ, দক্ষিণাংশের স্থানসমূহের জমির মূল্য, খাজনা ও কর অনেক কম। এই সকল কারণে বর্তমানে কার্পাস বয়ন-শিল্প বহুলাংশে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে সরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু একথা মনে করা ভুল হইবে যে, নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে এই শিল্পের অস্তিত্ব মোটেই থাকিবে না। নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে যে ধরনের দক্ষ শ্রমিক আছে তাহা এই দেশের অন্য কোথাও নাই। তুলা-পরিবহণের জন্য খরচ

বেশী হইলেও সূক্ষ্ম বস্ত্রাদির উচ্চমূল্যে তাহা পোষাইয়া যায়। ইহার ফলে সূক্ষ্ম ও রকমারী বস্ত্রাদি প্রস্তুতে চিরকাল এই অঞ্চল বৈশিষ্ট্য লাভ করিবে।

পশম বয়ন-শিল্প—পশম-বস্ত্র-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশ হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দরের মারফত এই দেশে কাঁচা পশম আমদানি করা হয়। সুতরাং এই সকল বন্দরের নিকটেই এই শিল্পের প্রসার হওয়া স্বাভাবিক। ইহা ছাড়া এই দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ইংরেজগণ আসিয়া যখন উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন হইতেই দক্ষ ইংরেজগণ এখানে পশম-বয়নশিল্পের প্রতিষ্ঠা করে। এই সকল কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে—মেইন হইতে মেরীল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এই শিল্পের প্রসারলাভ হইয়াছে। ওহিও, পেনসিলভেনিয়া, নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক, নিউ ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চল পশম বয়ন-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। **ফিলাডেলফিয়া** ও **ক্লীভল্যাণ্ড** পশম-শিল্পের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। শীতপ্রধান দেশ বলিয়া পশমী দ্রব্যের স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত বেশী; কয়লা, খনিজ তৈল ও জলবিদ্যুৎ নিকটেই পাওয়া যায়; এই অঞ্চলে যন্ত্রপাতি এবং সুনিপুণ শ্রমিকের পর্যাপ্ত সরবরাহ বিদ্যমান।

রেশম বয়ন-শিল্প—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রেশম বয়ন-শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এই দেশে রেশম উৎপন্ন না হইলেও জাপান হইতে অধিকাংশ রেশম এখানে আমদানি করা হয়। সুনিপুণ শ্রমিক ও শক্তিসম্পদের নৈকট্য, স্থানীয় চাহিদার ব্যাপকতা ও পরিবহণ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের জন্য এই দেশের পেনসিলভেনিয়া, নিউ জার্সি, নিউ ইংল্যাণ্ড ও নিউ ইয়র্ক রাজ্যে এই শিল্প প্রসারলাভ করিয়াছে। নিউ জার্সির **প্যাটারসন** এই অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ রেশম-শিল্পকেন্দ্র। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ রেশম-দ্রব্য এই অঞ্চলে প্রস্তুত হয়।

অপর্যাপ্ত তুলা ও কাষ্ঠসম্পদ এবং শক্তিসম্পদ ও সুনিপুণ শ্রমিক **রেয়ন-শিল্পের** উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলেই প্রধানতঃ এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। টেনেসি, ভার্জিনিয়া, ক্যারোলিনা ও পেনসিল-ভেনিয়া রাজ্যে অধিকাংশ রেয়ন উৎপন্ন হয়।

কাগজশিল্প—হ্রদ অঞ্চলের সুলভ জলবিদ্যুৎ ও পরিবহণ-ব্যবস্থা, স্থানীয় নিপুণ শ্রমিক, দেশের উত্তরাংশের বিস্তীর্ণ সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি

এই দেশের কাগজশিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। বিদেশে কাগজ রপ্তানির সুযোগ থাকায় এবং উৎপাদক অঞ্চলের নিকটেই বন্দর গড়িয়া উঠায় কাগজ-বিক্রয়ে মোটেই অসুবিধা হয় না। এই সকল কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৩৩ ভাগ কাগজ উৎপন্ন করিয়া **প্রথম** স্থান অধিকার করে। উৎপাদনের তুলনায় কাষ্ঠমণ্ড কম থাকায় কানাডা, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে এই দেশে কাষ্ঠমণ্ড আমদানি করা হয়।

রাসায়নিক-শিল্প—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। লবণ, গন্ধক, পাইরাইট, চুনাপাথর, পটাশ, কয়লা ও খনিজ তৈলের উপজাত দ্রব্যাদি রাসায়নিক শিল্পের প্রধান উপাদান। এই সকল উপাদান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড, সোডা অ্যাশ, কস্টিক সোডা, রাসায়নিক সার, ঔষধপত্র, সাবান প্রভৃতি উৎপাদনে এই দেশ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। অধিকাংশ রাসায়নিক দ্রব্যাদি এই দেশের উত্তর-পূর্বাংশে উৎপন্ন হয়।

ইহা ছাড়া এই দেশে চর্মশিল্প, তামাকশিল্প ও রবারশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। নিউ ইয়র্ক, রচেস্টার, বোস্টন, মিলওয়াকি ও সেণ্ট লুই **চর্মশিল্পে** উন্নতি লাভ করিয়াছে। ওহিও রাজ্যের অন্তর্গত অ্যাক্রন এই দেশের শ্রেষ্ঠ **রবারশিল্পকেন্দ্র**। নিউ ইয়র্ক, রিচমণ্ড, ফ্লোরিডার অন্তর্গত টাম্পা এবং হ্রদ অঞ্চলের ডেট্রয়েট **সিগারেট** ও **চুরুট** প্রস্তুতে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

পরিবহণ-ব্যবস্থা (Communications)—পরিবহণ-ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার শতকরা মাত্র ৬ জন লোক এই দেশে বাস করে; কিন্তু পৃথিবীর মোট পরিবহণ-ব্যবস্থার শতকরা ৩০ ভাগ রেলপথ, ৭২ ভাগ মোটর-গাড়ী, ৩৮ ভাগ রাজপথ এই দেশে বিদ্যমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের **রাজপথ** এই দেশের পরিবহণ-ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। দেশের অধিকাংশ স্থান রাজপথে যুক্ত। এই দেশে মোট ৪৮ লক্ষ কিলোমিটার রাজপথ আছে; প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে রাজপথের পরিমাণ প্রায় ০·৬২ কিলোমিটার। এই দেশের রাজপথে ৪ কোটি মোটর-গাড়ী ও ট্রাক সর্বদা যাতায়াত করে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এত মোটর-গাড়ী নাই।

বিমানপথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই দেশে প্রায় ১,১০,০০০ কিলোমিটার নিয়মিত **বিমানপথ** আছে। বৎসরে ইহাতে প্রায় ১'৩ কোটি যাত্রী আরোহণ করে; বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে মালপত্রও বিমানপথে যাতায়াত করে। এখানকার আভ্যন্তরীণ বিমানপথ কানাডা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং আন্তর্জাতিক বিমানপথ পৃথিবীর সকল দেশের সহিত যুক্ত। এই দেশে প্রায় ৬,০০০ বিমান-বন্দর আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রেলপথে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই দেশে প্রায় ৩,৭৫,৮৬২ কিলোমিটার রেলপথ আছে। উত্তর-পূর্বাংশে এই **রেলপথ** জালের ন্যায় বিস্তারিত। শীতের প্রকোপে এই দেশের উত্তরাংশের আভ্যন্তরীণ জলপথ বৎসরে কয়েক মাস বন্ধ থাকে। সেইজন্য এখানকার রেলপথ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এই দেশের তিনটি মহাদেশীয় রেলপথ আটলান্টিক উপকূল হইতে প্রশান্ত উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাদের নাম নর্দার্ন প্যাসিফিক, ইউনিয়ন প্যাসিফিক ও সাদার্ন প্যাসিফিক রেলপথ। চিকাগো এই দেশের শ্রেষ্ঠ রেলকেন্দ্র। অধিকাংশ রেলপথ বিভিন্ন দিক হইতে এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ **জলপথ** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃহৎ পঞ্চহ্রদ ও সেণ্ট লরেন্স, মিসিসিপি-মিসৌরী, ওহিও ও মনঙ্গাহালা নদী এই দেশের জলপথের উন্নতিসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বৎসরে এই দেশে প্রায় ২০ কোটি টন মালপত্র আভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবাহিত হয়; ইহার শতকরা ৬০ ভাগ মিসিসিপি, ওহিও ও মনঙ্গাহালা নদীপথে পরিবাহিত হয়।

বৃহৎ পঞ্চহ্রদ (The Great Lakes)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যবর্তী পাঁচটি হ্রদ এই দুইটি দেশের জলপথকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলপথে পরিবহণযোগ্য পণ্যের দুই-তৃতীয়াংশ এই পঞ্চহ্রদের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। সুপিরিয়র, হুরণ, মিচিগান, অণ্টারিও ও ইরি—এই পাঁচটি হ্রদকেই পঞ্চহ্রদ বলা হয়। ইহার সহিত একদিকে যুক্ত হইয়াছে সেণ্ট লরেন্স নদী এবং এই নদী পঞ্চহ্রদকে আটলাণ্টিক মহাসাগরের সহিত যুক্ত করিয়াছে। অন্যদিকে এই পঞ্চহ্রদ ইরি খাল ও হাডসন নদীর সাহায্যে নিউ ইয়র্ক-এর সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইলিনয় খাল ও নদীর সাহায্যে এই পঞ্চহ্রদ মিসিসিপি নদের সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন হ্রদ আবার বিভিন্ন খালের সাহায্যে একে অপরের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

এই পঞ্চহ্রদের আয়তন প্রায় পশ্চিম জার্মানীর সমান। ইহার তীরবর্তী বন্দরসমূহে সর্বাধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বিদ্যমান—যাহার সাহায্যে অত্যন্ত দ্রুতবেগে মালপত্র ভর্তি ও খালাস করা যায়। এই হ্রদসমূহ বৎসরে পাঁচ মাসের বেশী বরফে ঢাকা থাকিলেও অন্যান্য সময় এই জলপথে প্রচুর মালপত্র পরিবাহিত হয়। প্রচুর লৌহ আকরিক, কয়লা, চুনাপাথর, তৈল, গম ও

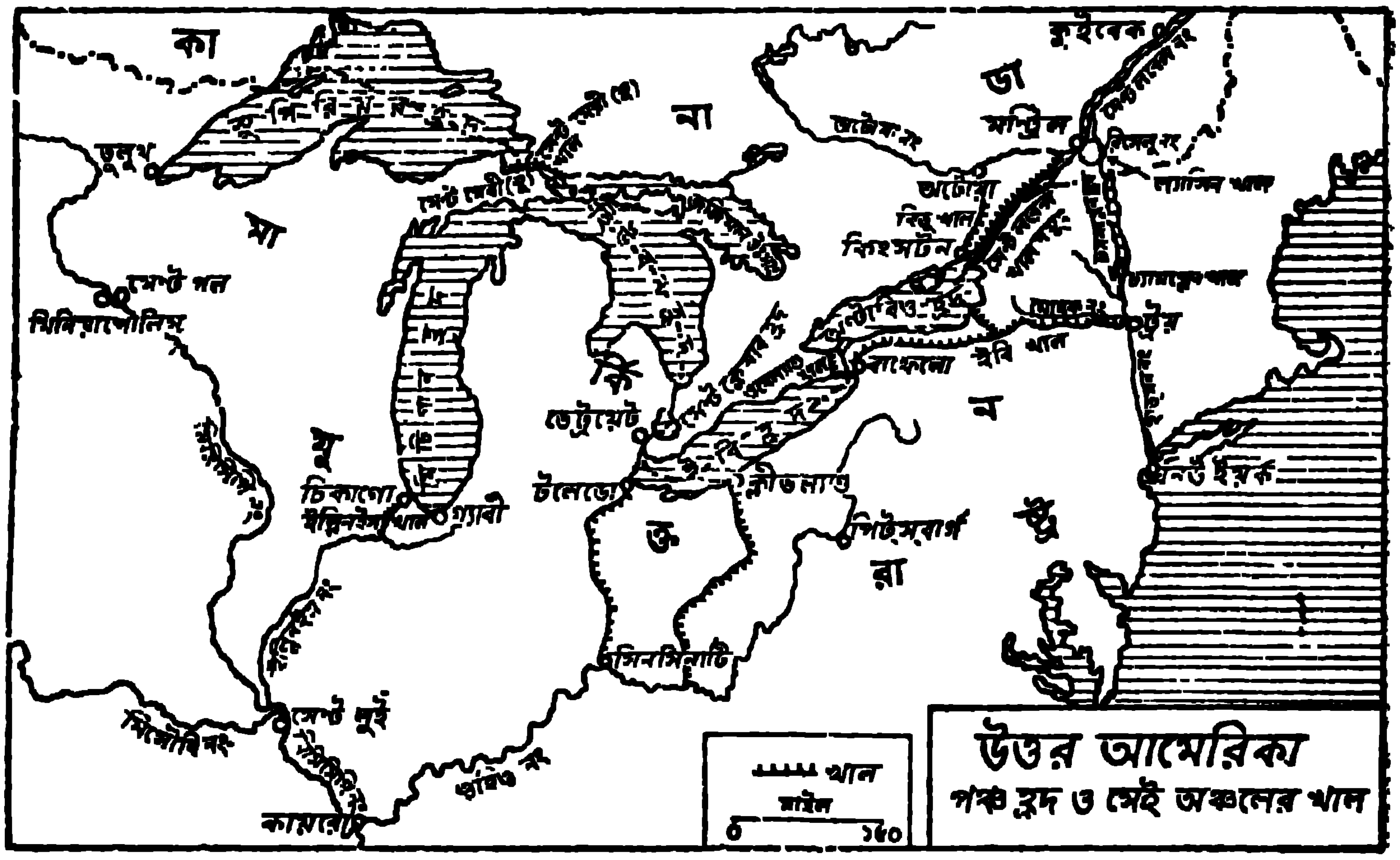

অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্য পঞ্চহ্রদ মারফত শিল্পকেন্দ্রে সুলভে আনীত হয়। পানামা ও সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া পরিবাহিত মোট মালপত্রের চেয়ে অনেক বেশী মালপত্র এই পঞ্চহ্রদ মারফত পরিবাহিত হয়। হ্রদসমূহের মাধ্যমে মালপত্র পরিবহণের খরচ রেলপথের খরচের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। ইহার ফলে ভারী লৌহ আকরিকও সুপিরিয়র হ্রদের তীরবর্তী মেসাবী হইতে প্রচুর পরিমাণে ইরি হ্রদের তীরবর্তী বিভিন্ন বন্দরে প্রেরিত হয়। এই পঞ্চহ্রদের সুলভ জলপথের জন্যই কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত কম খরচে প্রচুর গম বিদেশে রপ্তানি করিতে পারে। এই সুলভ জলপথে ভারী কয়লাও ইরি হ্রদের তীরবর্তী টলেডো বন্দর হইতে সুদূর ডুলুথ ও কানাডার বিভিন্ন অঞ্চলে যায়।

সেণ্ট লরেন্স নদী পঞ্চহ্রদের এই জলপথকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে সাহায্য করিয়াছে। এই নদীর মাধ্যমেই এই জলপথ সমুদ্রের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছে; নতুবা এই পঞ্চহ্রদ একটি আভ্যন্তরীণ জলপথে

পরিণত হইত। এখন এই নদীর মাধ্যমে বড় বড় জাহাজ পঞ্চহ্রদের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করিতে পারে এবং এইভাবে সমুদ্রতীর হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩,৭০০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে জাহাজ যাইতে পারে।

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বৃটেন বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিত। কিন্তু যুদ্ধের সময় একদিকে বৃটেনের বহির্বাণিজ্য ক্রমশঃ কমিয়া আসে, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া নিজ দেশের শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করে। বর্তমানে এই দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি

(কোটি ডলার)

১৯০০	২০০	১৯৪৬	১৪৬৮
১৯১৮	৯০৮	১৯৫৮	২৮৬৬
১৯৩৯	৫৫০	১৯৬০	৩৫০৩*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বদাই অনুকূল বহির্বাণিজ্য হইয়া থাকে। এখানকার আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি সর্বদাই অনেক বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে পণ্য-আমদানিকারক দেশসমূহ প্রতিকূল বহির্বাণিজ্যের জন্য ক্রমশঃ ক্রয়-ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিতেছে। ইহার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি বৃদ্ধি করা বা সমতা রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হয়তো শীঘ্রই এই দেশের রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্য বিশেষতঃ অস্ত্র-শস্ত্র-রপ্তানি আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই দেশের রপ্তানির পরিমাণ বজায় রাখিবার জন্য পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে ঠাণ্ডা যুদ্ধ বা যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ইহা ছাড়া পৃথিবীর বহু দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার-রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু এইভাবে রাজনৈতিক চাপ ও অস্বাভাবিক উপায়ে কতদিন এই দেশের বহির্বাণিজ্য উন্নতি লাভ করিবে ইহা বলা কঠিন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি-দ্রব্যের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ শিল্পজাত দ্রব্য,

* আমদানি ১৪৭১ কোটি এবং রপ্তানি ২০৩২ কোটি ডলার।

১৩ ভাগ অর্ধ-প্রস্তুত দ্রব্য, ১২ ভাগ কাঁচামাল, ৮ ভাগ খাদ্যশস্য এবং ৬ ভাগ শিল্পজাত খাদ্যদ্রব্য। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি ও মোটর-গাড়ী মোট রপ্তানির শতকরা ২৫ ভাগ। অন্যান্য রপ্তানি-দ্রব্যের মধ্যে খনিজ তৈলজাত সামগ্রী, বস্ত্রাদি, তূলা, কাঠ ও কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, খাদ্যদ্রব্য ও তামাক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল, অর্ধ-প্রস্তুত দ্রব্যাদি, শিল্পজাত বিলাসদ্রব্য, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় আমদানি করিতে হয়। জাপান হইতে রেশম ও চা, ভারত হইতে পাটজাত দ্রব্য, চর্ম, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, চা ও চিনি, মালয় হইতে রবার ও রাং, ব্রেজিল হইতে কফি, ফিলিপাইন হইতে চিনি ও শণ, অস্ট্রেলিয়া হইতে পশম, কানাডা হইতে কাগজ ও নিকেল, ফ্রান্স ও বৃটেন হইতে বিলাসদ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য, সুরিনাম ও বৃটিশ গায়না হইতে বক্সাইট এই দেশে আমদানি হইয়া থাকে।

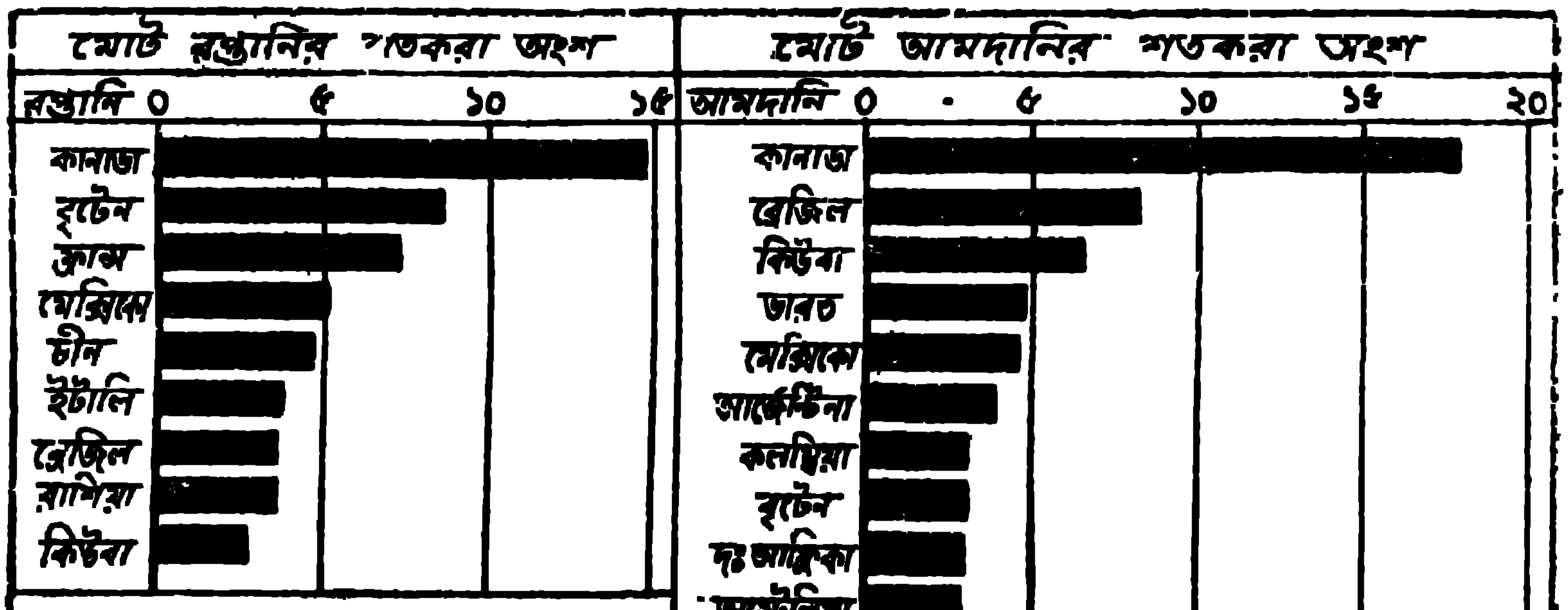

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি

শহর ও বন্দর (Cities & Ports): নিউ ইয়র্ক—আটলান্টিক উপকূলের হাডসন নদীর মোহনায় অবস্থিত এই বন্দরের মারফত সারাবৎসর আমদানি-রপ্তানিকার্য চলিয়া থাকে। শীতকালে এই বন্দরটি বরফাচ্ছন্ন হয় না; এইজন্য ইহার গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বন্দর ও পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক বৈদেশিক বাণিজ্য এই বন্দরের মারফত হইয়া থাকে। পাকা রাস্তা, রেলপথ ও জলপথে এই বন্দরের সহিত দেশের অন্যান্য স্থান যুক্ত। উত্তরে ভার্জিনিয়া হইতে দক্ষিণে আলাবামা

পর্যন্ত সকল রাজ্য এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। এই পশ্চাদ্‌ভূমিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্রগুলি অবস্থিত। কার্পাস, গম, মাংস, ভুট্টা, দুগ্ধজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য এই বন্দরের মারফত রপ্তানি করা হয় এবং রবার, চা, চিনি, ম্যাঙ্গানিজ, পাটজাত দ্রব্য, নিকেল, টিন প্রভৃতি ইহার মাধ্যমে আমদানি করা হয়। **চিকাগো**—মিচিগান হ্রদের তীরে অবস্থিত এই শহর ও বন্দর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রেলপথগুলির সঙ্গমস্থল। ইহার নিকটবর্তী ভুট্টা-বলয়ে বহু পশু পালিত হয়। এইজন্য এই স্থান মাংস রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। চিকাগো বন্দরের মারফত প্রচুর গম বিদেশে রপ্তানি হয়। এখানে ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। **স্যানফ্রান্সিস্কো**—ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকায় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত এই বন্দর মারফত প্রধানতঃ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। পানামা খাল কাটিবার পর এই বন্দরের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বন্দর মারফত গম, ফল, খনিজ তৈল, স্বর্ণ প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং চা, রেশম, চিনি প্রভৃতি আমদানি করা হইয়া থাকে। **বোস্টন**—যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত এই বন্দর পশম-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। নিউ ইংল্যাণ্ডের শিল্পাঞ্চল ইহার প্রধান পশ্চাদ্‌ভূমি। এই বন্দরের মারফত তুলা, পশম, চামড়া প্রভৃতি আমদানি করা হয়; মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য, বস্ত্রাদি প্রধানতঃ ইহার মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়। ইউরোপীয় বন্দরগুলি হইতে ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকটতম বন্দর। **নিউ অরলিয়ঁ**—মিসিসিপি নদীর মোহনায় মেক্সিকো উপসাগরের নিকট অবস্থিত এই বন্দর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রধান বন্দর। ইহা তুলা-ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। মিসিসিপি-মিসৌরী উপত্যকা ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। এই বন্দর মারফত কার্পাস, খনিজ তৈল, কাঠ, গবাদি পশু, গম প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং কফি, চিনি, ফল ও পাটজাত দ্রব্য প্রধানতঃ আমদানি করা হয়। **গ্যারী**—মিচিগান হ্রদের দক্ষিণ-তীরে অবস্থিত এই দেশের বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র। সুপিরিয়র হ্রদের তীরে অবস্থিত **ডুলুথ** একটি বিখ্যাত ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্র ও গমের বাণিজ্যকেন্দ্র। ইরি হ্রদের তীরে অবস্থিত **বাফেলো** বিখ্যাত গমের বাণিজ্যকেন্দ্র। ইরি হ্রদ-সন্নিহিত **ডেট্রয়েট** পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মোটর-গাড়ী-নির্মাণকেন্দ্র। পেনসিলভেনিয়ার কয়লাখনির মধ্যস্থলে অবস্থিত **পিট্‌সবার্গ** এই দেশের শ্রেষ্ঠ লৌহ ও

ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র। আলাবামা রাজ্যে অবস্থিত **বার্মিংহাম** দক্ষিণ-পূর্ব শিল্পাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র। ভার্জিনিয়া রাজ্যে অবস্থিত **রিচমণ্ড** তামাক-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত। মিসিসিপি ও মিসৌরী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত **সেণ্ট লুই** বিখ্যাত রেলকেন্দ্র, শিল্পকেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্র। চেসাপিক উপসাগরের তীরে অবস্থিত **বাল্টিমোর** একটি বিখ্যাত বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। এখানকার কার্পাসবয়ন ও পশমবয়ন শিল্প এবং সিগারেট-শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়লা ও বিভিন্ন কাঁচামাল উৎপাদন-কেন্দ্রের নিকট অবস্থিত **ফিলাডেল্‌ফিয়া** পশম বয়ন-শিল্পের জন্য জগদ্বিখ্যাত; ইহা স্বাভাবিক পোতাশ্রয়যুক্ত একটি বিখ্যাত বন্দর। গ্যালভেস্টন উপসাগরের তীরে অবস্থিত **গ্যালভেস্টন** বন্দর কার্পাস রপ্তানির জন্য জগদ্বিখ্যাত।

কানাডা (Canada)

আয়তনে কানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অস্ট্রেলিয়া হইতে বড়। এই দেশের আয়তন ৯৯,৭১,৫০০ বর্গ-কিলোমিটার; কিন্তু ইহার অধিকাংশ স্থান মানুষের বসবাসের অযোগ্য। যদিও বর্তমানে এখানকার মানুষ নূতন নূতন স্থানকে বাসোপযোগী করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু প্রতিকূল জলবায়ুর দরুন দেশের বহু অঞ্চল হয়তো চিরকাল বসবাসের অযোগ্য থাকিয়া যাইবে। কানাডার যে অঞ্চলে মানুষ বাস করে তাহা এতই সমৃদ্ধ যে, আরও অনেক লোক এই দেশে আসিয়া স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারে।

কমনওয়েল্‌থ রাজ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত কানাডা দশটি প্রদেশ ও দুইটি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল লইয়া গঠিত। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, নোভাস্কোশিয়া, নিউ বার্ণসউইক, প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ, কুইবেক, অণ্টারিও, ম্যানিটোবা, শাস্‌কাচুয়ান, আলবার্টা ও বৃটিশ কলম্বিয়া গভর্ণর-শাসিত এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও ইউকন কেন্দ্রীয় শাসনাধীন এলাকা।

লোকবসতি (Population)—কানাডার অর্ধেকের বেশী লোক ইংরেজ, এক-তৃতীয়াংশ ফরাসী, অবশিষ্টাংশ জার্মান, অস্ট্রিয়ান বা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান। এশিয়াবাসীর সংখ্যা শতকরা ১ জনেরও কম।

১৯৬৪ সালে কানাডার লোকসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৯৩ লক্ষ; প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে দুইজনেরও কম লোক এদেশে বাস করে। আয়তনের তুলনায়

এই দেশের লোকবসতি অত্যন্ত কম। ভূ-প্রকৃতির বন্ধুরতা ও শীতের তীব্রতার জন্য এই দেশের উত্তরাংশ ও উত্তর-পশ্চিমাংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মানুষের বসবাসের অযোগ্য। কানাডার দক্ষিণাংশে ও পূর্বাংশে শীতের তীব্রতা কম বলিয়া এবং ভূমি উর্বর হওয়ায় লোকবসতির ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী। সেন্ট লরেন্স উপত্যকায় এই দেশের শতকরা ৬০ জন লোক বাস করে; ইহা ছাড়া নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে শতকরা ১১ জন, প্রেইরী অঞ্চলে ১৮ জন এবং বৃটিশ কলম্বিয়ায় ৮ জন লোক বাস করে। প্রেইরী অঞ্চলে কৃষিকার্যের উন্নতির ফলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অঞ্চল (Climate & Natural Regions)—উত্তর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উত্তরাংশে প্রায় ৪৯° হইতে ৮০° উঃ অক্ষাংশে কানাডা অবস্থিত। সুতরাং এখানকার জলবায়ু শীতপ্রধান হওয়াই স্বাভাবিক। শীতের তারতম্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের। এখানে সূর্য তির্যক্‌ভাবে কিরণ দেয় বলিয়া তাপমাত্রাও মোটামুটি কম। ইতিপূর্বে (১১৯-১২১ পৃঃ) উত্তর আমেরিকার দেশসমূহের জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও অর্থনৈতিক উন্নতির বিভিন্নতা অনুসারে কানাডাকে কয়েকটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়:

(ক) প্রেইরী অঞ্চল—কানাডার দক্ষিণাংশে ম্যানিটোবা, শাস্‌কাচুয়ান ও আলবার্টা লইয়া প্রেইরী তৃণভূমি গঠিত। এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম বলিয়া বিস্তীর্ণ তৃণভূমির সৃষ্টি হয়। অত্যধিক শীতের জন্য শীতকালে কৃষিকার্যের উন্নতি না হইলেও বসন্তকালে এই অঞ্চলে কানাডার অধিকাংশ গম উৎপন্ন হয়। গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশী (১৫° সেঃ) হওয়ায় গমচাষের সুবিধা হইয়াছে। শীতকালীন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নামিয়া আসে। তৃণভূমি থাকায় এখানে পশুপালন উন্নতি লাভ করিয়াছে।

(খ) সমুদ্রবেষ্টিত পূর্বাঞ্চল—নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, নোভাস্কোশিয়া, প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ, নিউ বার্ণস্‌উইক ও কুইবেক প্রদেশের পূর্বাংশ লইয়া গঠিত এই অঞ্চলে সামুদ্রিক জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা প্রায় ৩০° সেঃ এবং শীতকালীন তাপমাত্রা হিমাঙ্ক পর্যন্ত নামিয়া আসে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১০০ সেঃ মিঃ। এখানকার মৎস্যশিকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়লা, লৌহ আকরিক, অ্যাস্‌বেস্টস্‌ প্রভৃতি খনিজ সম্পদে ও বনজ সম্পদে এই অঞ্চল সমৃদ্ধ। কৃষিকার্যও এই অঞ্চলে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

(গ) লরেন্সীয় নিম্নভূমি অঞ্চল—কুইবেক হইতে আরম্ভ করিয়া সেণ্ট লরেন্স নদীর উপত্যকা ধরিয়া হুরণ, ইরি ও অণ্টারিও হ্রদের মধ্যবর্তী এলাকা পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। সেণ্ট লরেন্স নদীর উপত্যকায় অবস্থিত হওয়ায় এখানে কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমানায় অবস্থিত হওয়ায় শিল্পে এই অঞ্চল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানকার লোক-বসতির ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী। গৃহনির্মাণের প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা প্রায় ২১° সেঃ। বৎসরে সারাবৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৎসরে ৩।৪ মাস এখানে বরফ পড়ে।

(ঘ) লরেন্সীয় শীল্ড—হাডসন উপসাগরের তিনদিকে এই দেশের এক-তৃতীয়াংশ ব্যাপিয়া এই অঞ্চল গঠিত। নিকেল, তাম্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, গ্রাফাইট, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি খনিজ সম্পদে এই অঞ্চল পরিপূর্ণ। যদিও শীতকালে এখানে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে নামিয়া যায়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে কোন কোন সময় তাপমাত্রা ৩০° সেঃ পর্যন্ত উঠিয়া যায়। এই অঞ্চলের উত্তরাংশে তুন্দ্রা অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ এবং দক্ষিণাংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি বিদ্যমান। এখানকার কাষ্ঠসম্পদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ঙ) পশ্চিমাংশের পার্বত্য অঞ্চল—বৃটিশ কলম্বিয়া এবং আলবার্টার কিয়দংশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলের উত্তরাংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। কয়লা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসা ও দস্তার অপর্যাপ্ত সম্ভার এখানে বিদ্যমান। কোস্ট রেঞ্জ ও রকি পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চল মরুপ্রায় হইলেও প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্কীর্ণ উপকূলভূমি কৃষিজ দ্রব্য ও মৎস্যের জন্য বিখ্যাত।

(চ) তুন্দ্রা অঞ্চল—কানাডার উত্তরাংশ সারাবৎসর বরফে আবৃত থাকে। এখানকার অধিবাসিগণকে এস্কিমো বলা হয়। ইহারা বল্গা হরিণে চড়িয়া পশুশিকার ও মৎস্যশিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। অত্যধিক শীতের জন্য এই অঞ্চল মনুষ্যবাসের অযোগ্য।

কৃষিকার্য (Agriculture)—কৃষিকার্য ও পশুপালন কানাডার প্রধান উপজীবিকা। এই দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক কৃষিকার্যে লিপ্ত থাকে এবং কৃষিজ ও প্রাণিজ দ্রব্যাদি স্থানীয় শিল্পের অধিকাংশ কাঁচামালের যোগান দেয়। কানাডার উত্তরাংশ বরফে আচ্ছন্ন থাকিলেও দক্ষিণাংশের সমতল-ভূমির অধিকাংশ স্থানে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। এই দেশের সমগ্র ভূমিভাগের শতকরা ৩·৮ ভাগ জমিতে কৃষিকার্য হয়। বর্তমানে এই দেশে কৃষি-ব্যবস্থার

প্রভৃত উন্নতি হইয়াছে। উন্নত ধরনের বীজ, কৃষিক্ষেত্রে সার ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কৃষিজ দ্রব্য সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত এবং যানবাহনের উন্নতির ফলে বর্তমানে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কানাডার কৃষিজ ও প্রাণিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩-৬৪)

(লক্ষ মেঃ টন)

গম	১৯৬	মাংস	·৮
যব	৪৮	দুগ্ধ	৮৭
যই	৭০	মাখন	·১৪
আলু	২১	পনীর	·০৬

গম-উৎপাদনে কানাডা পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। এই দেশে সাধারণতঃ বাসন্তিক গমের চাষ হয়। প্রেইরী অঞ্চলের ম্যানিটোবা, শাস্‌কাচুয়ান ও আলবার্টা প্রদেশে এই দেশের শতকরা ৯২ ভাগ গম উৎপন্ন হয়; বৃটিশ কলম্বিয়া প্রদেশেও গম পাওয়া যায়। উৎপাদন অঞ্চলের মধ্যে গমের বিখ্যাত বাজার উইনিপেগ অবস্থিত। এই দেশের উৎপাদনের তুলনায় লোকসংখ্যা অনেক কম; সেইজন্য মোট উৎপাদনের মাত্র এক-চতুর্থাংশ এখানে ব্যবহৃত হয় এবং তিন-চতুর্থাংশ বিদেশে রপ্তানি হয়। গম-রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। মন্টিল, হ্যালিফাক্স, ভ্যাঙ্কুভার ও পোর্ট আর্থার বন্দর মারফত এই দেশের অধিকাংশ গম বিদেশে রপ্তানি হয়। পৃথিবীর মোট গম-রপ্তানির এক-চতুর্থাংশ কানাডা হইতে প্রেরিত হয়। **যই** প্রধানতঃ উৎপন্ন হয় কানাডার পূর্বাংশের কুবেক ও অন্টারিও প্রদেশে এবং প্রেইরী অঞ্চলে। গমবলয়ের উত্তরাংশে প্রধানতঃ যই উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ যই স্থানীয় চাহিদা মিটাইতে ব্যয় হয় এবং অল্প-পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়। ম্যানিটোবা অঞ্চলে এই দেশের অধিকাংশ যব উৎপন্ন হয়। মণ্ড প্রস্তুতের জন্য প্রধানতঃ যব ব্যবহৃত হয়। অন্টারিও প্রদেশের ক্লে বেল্ট অঞ্চলে এবং পীস্ নদীর উপত্যকায় যবের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেন্ট লরেন্স নদীর অববাহিকায় অন্টারিও ও কুইবেক প্রদেশে প্রচুর **আলু** উৎপন্ন হয়। এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর **ফল** জন্মে। নোভাস্কোশিয়ার অ্যানপোলিস উপত্যকা, অন্টারিও উপদ্বীপ, কলম্বিয়ার ওকানাগান উপত্যকা, অন্টারিও হ্রদের উত্তরাংশ, মন্টিল ও ভ্যাঙ্কুভার আঙ্গুর, আপেল প্রভৃতি ফলের জন্য বিখ্যাত। ইহা

ছাড়া এই দেশের অন্টারিও ও আলবার্টা প্রদেশে বীট, এবং অন্টারিও ও কুইবেকে তামাক জন্মে।

পশুপালন কানাডায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই দেশের সমগ্র জমির শতকরা ৩০ ভাগ পশুচারণে নিযুক্ত থাকে। প্রেইরী অঞ্চলের তৃণ-ভূমিতে বহু দুগ্ধপ্রদায়ী গবাদি পশু ও শূকর পালিত হয়। আলবার্টা, শাস্‌কাচুয়ান, অন্টারিও এবং কুইবেক প্রদেশেও বহু গবাদি পশু পরিলক্ষিত হয়। লরেন্সীয় অঞ্চলের নিম্নভূমিতে প্রচুর মেষ পালিত হয়। দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির মধ্যে পনীর ও মাখন উৎপাদনে কানাডা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে।

কানাডা **মৎস্য**-শিল্পে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। উপকূলভাগের বিস্তীর্ণ অগভীর সমুদ্র, ভগ্ন সৈকতরেখা, নৌকা-নির্মাণের কাষ্ঠের প্রাচুর্য, শীতল ল্যাব্রাডার স্রোতের সহিত উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের মিলনের ফলে এই দেশের পূর্বাংশে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকটবর্তী বিখ্যাত গ্রেট ব্যাঙ্কে অপর্যাপ্ত মৎস্য পাওয়া যায়। কড, হ্যালিবাট, হ্যাড্ডক, হেক, হেরিং, ম্যাকারেল প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য মৎস্য। পশ্চিমাংশে কলম্বিয়া, স্কীনা ও ফ্রেজার নদীর মোহনায় স্যামন মৎস্য এবং প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর সমুদ্রে হ্যালিবাট ও হেরিং মৎস্য প্রচুর পাওয়া যায়; এই অঞ্চলে কানাডার শতকরা ৪০ ভাগ মৎস্য উত্তোলিত হয়। প্রিন্স রুপার্ট এখানকার বিখ্যাত মৎস্যকেন্দ্র। ইহা ছাড়া হাডসন উপসাগর, পঞ্চহ্রদ ও সেন্ট লরেন্স নদী প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ জলাশয়ে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। এই দেশের শতকরা ৬০ ভাগ মৎস্য বিদেশে রপ্তানি হয়; টাটকা মৎস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং টিনবন্দী মৎস্য দূরদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। কানাডায় প্রতিবৎসর ৭০ রকমের প্রায় ৯'১৩ লক্ষ মেঃ টন মৎস্য উত্তোলিত হয়।

বনভূমি (Forest)—কাষ্ঠসম্পদে কানাডা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই দেশের মোট ভূমিভাগের এক-তৃতীয়াংশ বনভূমি। বনভূমির আয়তনে রাশিয়ার পরেই কানাডার স্থান। কানাডার অর্থনৈতিক উন্নতিতে খনিজ সম্পদের পরেই বনজ সম্পদের স্থান। সেইজন্য স্থানীয় সরকার বনভূমির সংরক্ষণে অত্যন্ত যত্নবান্। বনভূমিতে অগ্নি-প্রতিরোধক ব্যবস্থা আছে। ছোট ছোট বৃক্ষসমূহকে সযত্নে রক্ষা করা হয়। অপরিকল্পিতভাবে গাছ কাটিবার অনুমতি দেওয়া হয় না। বরফের উপর দিয়া এবং নদীর মাধ্যমে এই দেশের অধিকাংশ কাঠ পরিবাহিত হওয়ায় পরিবহণ-খরচ অত্যন্ত কম। বনভূমির উত্তরাংশে

পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবে ও প্রতিকূল জলবায়ুর জন্য কাষ্ঠসংগ্রহের অসুবিধা

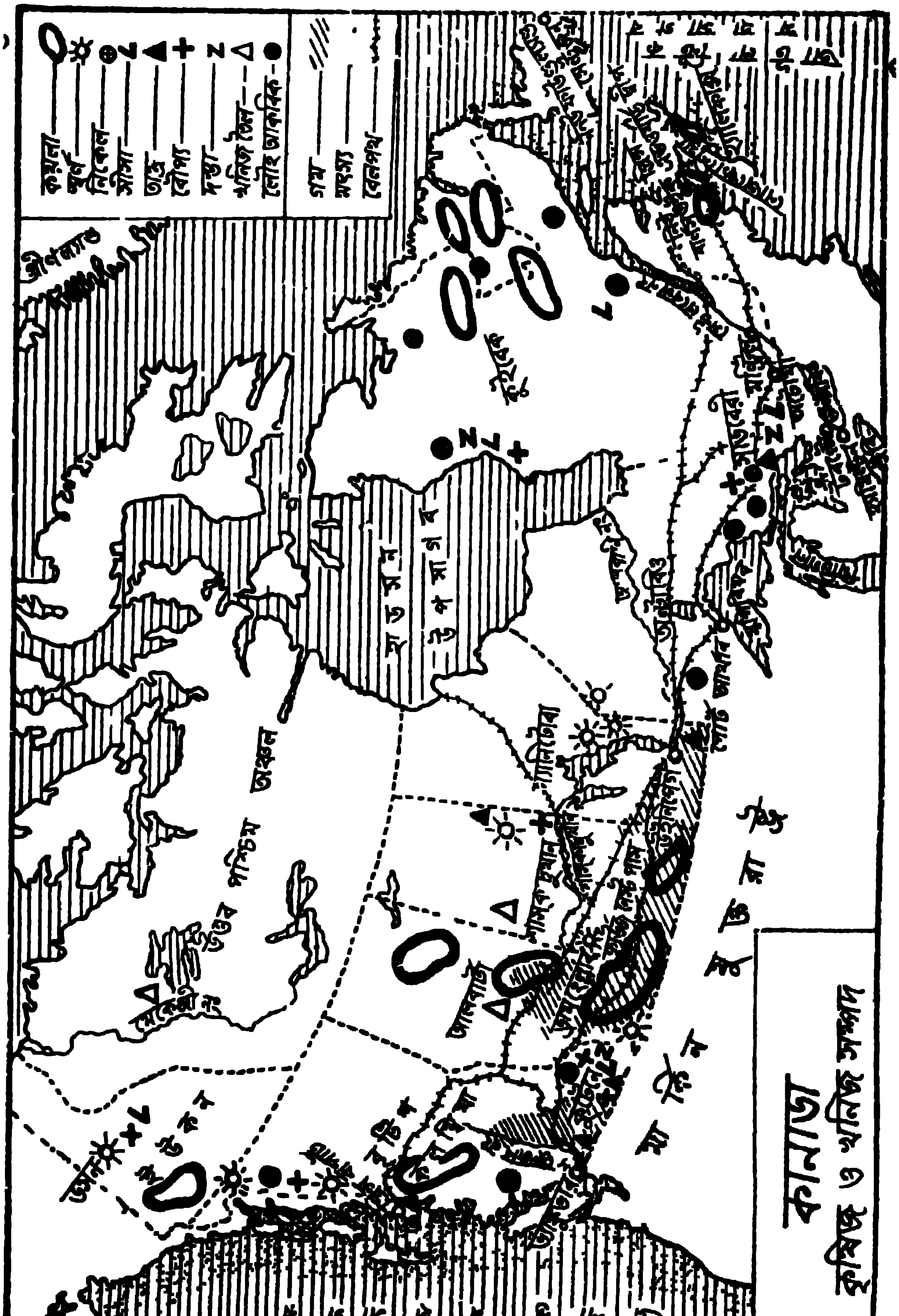

হইলেও এই দেশের মোট বনভূমির শতকরা ২৭ ভাগ হইতে মূল্যবান্ কাষ্ঠ সংগৃহীত হয়।

লরেন্সীয় নিম্নভূমিতে ওক্, চেস্টনাট প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ (শক্ত কাঠ) পাওয়া গেলেও, কানাডার বনভূমির অধিকাংশই **সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি** (১২১ পৃষ্ঠায় মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। পশ্চিমাংশের বৃটিশ কলম্বিয়া, লরেন্সীয় শীল্ডের কুইবেক ও অন্টারিও, সমুদ্রবেষ্টিত পূর্বাঞ্চল এবং প্রেইরী অঞ্চলের উত্তরে এই বনভূমি দেখা যায়। বৃটিশ কলম্বিয়া এবং লরেন্সীয় শীল্ড অঞ্চলে কাষ্ঠসংগ্রহের পরিমাণ অনেক বেশী। এখানকার স্প্রুস্, ডগলাস, ফার, সীডার, শ্বেত পাইন, হেমলক প্রভৃতি নরম কাঠের গাছ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্প্রুস্ কাঠ কাষ্ঠমণ্ড ও **কাগজ** উৎপাদনের উপযোগী; পাইন, হেমলক ও সীডার কাঠ গৃহাদি ও জাহাজ-নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। কাগজ-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ইহার স্থান। নিউজপ্রিন্ট-উৎপাদনে ও রপ্তানিতে কানাডা পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ খবরের কাগজ কানাডার নিউজপ্রিন্টে ছাপা হয়। কাষ্ঠ-রপ্তানিতেও এই দেশ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া এই দেশের কাঠ, কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজের প্রধান আমদানিকারক। কানাডার বনভূমির উত্তরাংশে বহু লোমশ পশু আসিয়া আশ্রয় নেয়। এই সকল পশুর গাত্র হইতে মূল্যবান্ লোম সংগ্রহ করিয়া বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

খনিজ সম্পদ (Minerals)—কানাডা বিভিন্ন খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ১৮৮৬ সালে এই দেশের মোট খনিজ সম্পদের মূল্য ছিল মাত্র ১ কোটি ডলার; ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৩ সালে ২০ কোটি, ১৯৪৬ সালে ৫০ কোটি এবং ১৯৫৯ সালে ২১২ কোটি ডলারে পরিণত হয়। কানাডার সঞ্চিত (Reserves) খনিজ সম্পদের পরিমাণ এত বেশী যে, হয়তো শীঘ্রই এই দেশ খনিজ দ্রব্য-উৎপাদনে পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে।

কানাডার খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩)

(লক্ষ মেঃ টন)

কয়লা	৯৬	নিকেল	১'৯
লৌহ আকরিক	২৭৩	সীসা	১'৪
স্বর্ণ (মেঃ টন)	১৪৪	দস্তা	২'৬
রৌপ্য („)	৯৬৯	তাম্র	৩'৪
অ্যালুমিনিয়াম	৭	খনিজ তৈল	৩৫০

কয়লা—কানাডার সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৩,৮৩,৮৬৬ কোটি মেঃ টন। কিন্তু সেই তুলনায় এখানকার উৎপাদন অনেক কম। কারণ, এই দেশের শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে প্রধানতঃ জনবহুল অন্টারিও ও কুইবেক প্রদেশে; কিন্তু এই দেশের কয়লাখনিসমূহ এই সকল প্রদেশ হইতে দূরে রকি পর্বত অঞ্চলের বৃটিশ কলম্বিয়া, আলবার্টা ও শাস্‌কাচুয়ান প্রদেশে, প্রশান্ত-মহাসাগরীয় উপকূলে এবং পূর্বাঞ্চলের নোভাস্কোশিয়া ও নিউ বার্ণসুউইকে অবস্থিত। অন্টারিও ও কুইবেক প্রদেশের শিল্পাঞ্চল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়লাখনি অঞ্চলের অধিকতর নিকটবর্তী বলিয়া পেনসিলভেনিয়া ও ওহিও অঞ্চলের কয়লা এই দুইটি প্রদেশে আমদানি হইয়া থাকে। ইহার ফলে কানাডার কয়লা-খনিসমূহকে পুরাপুরি কাজে লগোনো সম্ভব হয় নাই। নোভাস্কোশিয়ার শ্রেষ্ঠ কয়লাখনির নাম সিডনী ফিল্ড। ইহা অ্যাপালাচিয়ান কয়লাখনির উত্তরাংশ। আল্‌বার্টা ও শাস্‌কাচুয়ান অঞ্চলের প্রধান খনি অঞ্চলের নাম ক্রাউজ নেস্ট পাস্ (Crow's Nest Pass) ও ড্রামহেল্লার।

স্বর্ণ-উৎপাদনে কানাডা পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দেশে প্রথম স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই ১৮৯৬ সালে বৃহত্তম স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয় ক্লনডাইক নদীর উপত্যকায় ডসন শহরের নিকট। ইহার পূর্বে বৃটিশ কলম্বিয়ায় থমসন ও ফ্রেজার নদীর উপত্যকায়ও স্বর্ণখনি পাওয়া গিয়াছিল। ১৯১৪ সালে অন্টারিও প্রদেশে আরও একটি স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে ইউকন অঞ্চলের ক্লনডাইক উপত্যকায় স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ নগণ্য হইয়া গেলেও কলম্বিয়ার ফ্রেজার উপত্যকা ও অন্টারিও প্রদেশের খনিসমূহে প্রচুর স্বর্ণ পাওয়া যায়।

পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৮৫ ভাগ উৎপন্ন করিয়া কানাডা **নিকেল**-উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। অন্টারিও প্রদেশের স্যাডবেরি জিলায় অধিকাংশ নিকেল পাওয়া যায়। **সীসা**-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। কলম্বিয়া প্রদেশের কুটেনে জিলায় অধিকাংশ সীসা পাওয়া যায়। অন্টারিও, কুইবেক, নোভাস্কোশিয়া এবং ইউকন অঞ্চলেও অল্পবিস্তর সীসা পাওয়া যায়। অন্টারিও প্রদেশের স্যাডবেরি অঞ্চলে এবং বৃটিশ কলম্বিয়ার ষ্টীনা, টেৈলক্রীক ও ভ্যাঙ্কুভার অঞ্চলে অধিকাংশ **তাম্র** পাওয়া যায়। মোট উৎপাদনের শতকরা ১১ ভাগ উৎপন্ন করিয়া তাম্র-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার

করে। মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ উৎপন্ন করিয়া এই দেশ **রৌপ্য**-উৎপাদনে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। কলম্বিয়া প্রদেশের কুটেনে জিলায় সীসা ও দস্তার সহিত, অন্টারিও প্রদেশের স্যাডবেরি অঞ্চলে নিকেল ও তামার সহিত এবং কোবাল্ট অঞ্চলে কোবাল্টের সহিত এই দেশের অধিকাংশ রৌপ্য পাওয়া যায়।

দস্তা-উৎপাদনে কানাডা পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। বৃটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের ট্রেইল ও কুটেনে অঞ্চলে অধিকাংশ দস্তা পাওয়া যায়। কুইবেক প্রদেশের ব্ল্যাক লেক ও থেটফোর্ড অঞ্চলে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৭৫ ভাগ **অ্যাস্‌বেস্‌টস্** উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া অন্টারিও প্রদেশে কোবাল্ট এবং আলবার্টা ও ইউকন প্রদেশে খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। সেণ্ট লরেন্স অঞ্চলে প্লাটিনাম ও টাইটানিয়াম, কুইবেক, নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড ও রকি পর্বত অঞ্চলে লৌহ আকরিক, লবণ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে এই দেশ অত্যন্ত উন্নত। এই দেশের বিদ্যুতের শতকরা ৯৭·৫ ভাগ জলবিদ্যুৎ হইতে উৎপন্ন হয়। নায়াগ্রা জলপ্রপাত এবং সেণ্ট লরেন্স, অটোয়া, অ্যাবিটিবি, উইনিপেগ, নিপিগন প্রভৃতি নদীর জলস্রোত হইতে এই দেশের জলবিদ্যুৎ সুলভে উৎপন্ন হয়। এই দেশের শিল্পের শতকরা ৮০ ভাগ জলবিদ্যুতের সাহায্যে চালিত হয়।

পরিবহণ-ব্যবস্থা (Communications)—কানাডা বর্তমানে রেলপথ ও জলপথে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। পঞ্চহ্রদ (সুপিরিয়র, মিচিগান, হুরণ, অন্টারিও ও ইরি) ও সেণ্ট লরেন্স নদীর সুলভ **জলপথ** এই দেশের শিল্পোন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। সমুদ্র হইতে ৩,২২০ কিলোমিটার পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে এই জলপথে যাওয়া যায়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য অধিকাংশই এই জলপথের সাহায্যে হইয়া থাকে। কানাডার বিভিন্ন খালপথের দৈর্ঘ্য ৯২০ কিলোমিটার। তন্মধ্যে ওয়েল্যাণ্ড খাল ইরি ও অন্টারিও হ্রদকে, সেণ্ট মেরী (সু) খাল সুপিরিয়র হ্রদ ও হুরণ হ্রদকে, রিডু খাল অন্টারিও হ্রদ ও অটোয়া নদীকে যুক্ত করিয়াছে। (১৫৬ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য।) এই দেশের অধিকাংশ নদী (মেকেঞ্জি, শাস্‌কাচুয়ান, ইউকন, আলবানি, কলম্বিয়া, ফ্রেজার, স্কীনা, নেলসন) সারাবৎসর বরফ-মুক্ত থাকে না বলিয়া এবং কোন-কোনটি খরস্রোতা হওয়ায় জলপথের কাজে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং দেশের অভ্যন্তরভাগে রেলপথই

পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ। কানাডার অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে এই দেশের **রেলপথ**। এই দেশের রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৪,৬০০ কিলো-মিটার। এখানকার দুইটি মহাদেশীয় রেলপথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫,৬০০ কিলো-মিটার। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত ভ্যাঙ্কুভার বন্দর হইতে এই রেলপথ ফ্রেজার ও থমসন নদীর উপত্যকার উপর দিয়া উইনিপেগ শহরে পৌঁছিয়াছে। এই শহর হইতে রেলপথটি হ্রদ অঞ্চলের উত্তরদিক দিয়া ফোর্ট উইলিয়াম, পোর্ট আর্থার, স্যাডবেরি এবং কানাডার রাজধানী অটোয়া হইয়া মন্ট্রিল পর্যন্ত গিয়াছে। এই স্থান হইতে একটি লাইন কুইবেক পর্যন্ত গিয়াছে এবং অপর একটি লাইন আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত হ্যালিফাক্স বন্দরে পৌঁছিয়াছে। এই রেলপথ কানাডার উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। উইনিপেগ শহরে এই দেশের বৃহত্তম গমের বাজার অবস্থিত। এই স্থান হইতে এই রেলপথের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রচুর গম বিভিন্ন বন্দরে প্রেরিত হয়। মৎস্য, কাঠ এবং হ্রদ অঞ্চলের শিল্পজাত দ্রব্যাদি এই রেলপথের মাধ্যমে প্রেরিত হয়।

কানাডিয়ান ন্যাশন্যাল রেলপথটি প্রায় ৪,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। ভ্যাঙ্কুভার বন্দর হইতে এই রেলপথ ফ্রেজার ও থমসন নদীর উপত্যকার উপর দিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়া ইয়েলোহেড গিরিপথ অতিক্রম করিয়া এডমণ্টনে পৌঁছিয়াছে। প্রিন্স রূপার্ট হইতে একটি লাইন আসিয়া এই রেলপথের সহিত মিশিয়াছে। এডমণ্টন হইতে রেলপথটি শাস্‌কাটুন হইয়া উইনিপেগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই স্থান হইতে রেলপথটি কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথের উত্তরদিক দিয়া কুইবেক পর্যন্ত গিয়াছে। কুইবেক হইতে একটি লাইন নোভাস্কোশিয়া দ্বীপের হ্যালিফাক্স বন্দরে পৌঁছিয়াছে। একটি শাখা-রেলপথ শাস্‌কাটুন হইতে হাডসন উপসাগরের তীরে অবস্থিত চার্চিল বন্দর পর্যন্ত গিয়াছে। উইনিপেগ হইতে একটি লাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো, বাফেলো প্রভৃতি শিল্পপ্রধান অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই রেলপথের সাহায্যে প্রচুর গম, কাঠ ও মৎস্য কানাডার বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিদেশে প্রেরিত হয়।

মহাদেশীয় রেলপথ ছাড়াও হাডসন বে রেলপথ শাস্‌কাটুন হইতে গমক্ষেত্র-সমূহের মধ্য দিয়া চার্চিল পর্যন্ত গিয়াছে ; এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ৯৭৬ কিলো-

মিটার। ইউকন রেলপথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্কাগোয়ে বন্দর হইতে ইউকন নদীর তীরে অবস্থিত হোয়াইট হর্স পর্যন্ত গিয়াছে। বর্তমানে কানাডার **বিমানপথের** বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এই দেশে প্রায় ৮,৯১,৯৪০ কিলোমিটার রাজপথ আছে। ট্রান্স-কানাডা রাজপথে ভ্যাঙ্কুভার হইতে হ্যালিফাক্সে এবং আলাস্কা রাজপথে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া যায়। দেশের আয়তনের তুলনায় এখনও **রাজপথ** অনেক কম।

শ্রমশিল্প (Industries)—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে কানাডা শিল্পে মোটেই উন্নত ছিল না। জনসংখ্যা কম বলিয়া স্থানীয় চাহিদা ও শ্রমিকের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানকার লোকের মাতৃভূমি বৃটেন ও ফ্রান্সের অর্থনীতির উন্নতির জন্য এই দেশ হইতে প্রচুর কাঁচামাল ঐ দুইটি দেশে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয় এবং ঐ সকল দেশ হইতে শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানি হয়। ইহার ফলে শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হয়। সেইজন্য কানাডা কৃষি, পশুপালন ও বনভূমির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় কানাডা শিল্পোন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হয় এবং কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদের প্রাচুর্যের ফলে শীঘ্রই শিল্পোৎপাদনে পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় চাহিদা ও শ্রমিকের যোগানের বিশেষ কোন অসুবিধা হইতেছে না। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি শিল্পোন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিতেছে। কানাডার বিভিন্ন সম্পদের দিকে দৃষ্টি দিলে মনে হয় এই দেশ শীঘ্রই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইবে।

এই দেশের অধিকাংশ শিল্প স্থানীয় কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। অপর্যাপ্ত গম, কাঠ, মৎস্য, লৌহ আকরিক এবং পঞ্চহ্রদ অঞ্চলের জলবিদ্যুতের সাহায্যে ময়দা, কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ, মৎস্য-সংরক্ষণ, ধাতব শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রধান শিল্পকেন্দ্র হইতে অধিকাংশ কয়লাখনিসমূহ দূরে অবস্থিত হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এই দেশে কয়লা আমদানি করা হয়। আমদানীকৃত কাঁচামালের সাহায্যেও এই দেশে কয়েকটি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। মালয়ের রবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও তুলা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের পশম, আর্জেন্টিনার চর্ম প্রভৃতি আমদানি করিয়া এই দেশে রবার-শিল্প, কার্পাস ও পশমবয়ন-শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

কানাডার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিভিন্ন কাঁচামাল পাওয়া গেলেও এই দেশের প্রধানতঃ **দুইটি শিল্পাঞ্চল** বিশেষ উল্লেখযোগ্য;—হ্রদ ও পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিম উপকূলের শিল্পাঞ্চল। হ্রদ অঞ্চলের সুলভ জলবিদ্যুৎ, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের লৌহ আকরিক ও মৎস্য, নোভাস্কোশিয়ার কয়লা, অণ্টারিও প্রদেশের নিকেল, কুইবেক প্রদেশের তাম্র, সন্নিকটস্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ আকরিক ও কয়লা এবং পঞ্চহ্রদ-সেণ্ট লরেন্স নদীর সুলভ জলপথের সাহায্যে হ্রদ ও পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের কুইবেক ও অণ্টারিও প্রদেশে কানাডার শতকরা ৮০ ভাগ শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয়। এখানকার শিল্প-সমূহের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত, মৎস্য-সংরক্ষণ, কাগজ, কার্পাস, পশমবয়ন ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি-শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্ট্রিল ও টরণ্টো শহরেই অধিকাংশ শিল্প অবস্থিত। মন্টিল কার্পাস ও পশমবয়ন, কাগজ ও চর্মশিল্পের জন্য, টরণ্টো ও হ্যামিল্টন লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য, উইণ্ডসর মোটর-গাড়ী-নির্মাণশিল্পের জন্য এবং অটোয়া কাগজশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

কানাডার **পশ্চিম উপকূলের শিল্পাঞ্চলে** স্থানীয় কয়লা ও লৌহ আকরিকের সাহায্যে প্রধানতঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। মৎস্য-সংরক্ষণ এবং কাষ্ঠশিল্প এই অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। ভ্যাঙ্কুভার এই অঞ্চলের প্রধান শিল্পকেন্দ্র।

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে কানাডা প্রধানতঃ কাঁচামাল রপ্তানি করিত এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানি করিত; কিন্তু বর্তমানে ক্রমশঃ শিল্পের উন্নতি হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমানে এই দেশের বাৎসরিক রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্য ৫০৬ কোটি ডলার এবং আমদানি-দ্রব্যের মূল্য ৫৬৫ কোটি টাকা। রপ্তানি-দ্রব্যের শতকরা ৫২ ভাগ শিল্পজাত দ্রব্য এবং ২৬ ভাগ কাঁচামাল। এই দেশে **রপ্তানি**-দ্রব্যের মধ্যে কাগজ, কাষ্ঠমণ্ড, গম, কাষ্ঠ, ফল, দুগ্ধ, মাংস, পনীর, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, নিকেল, অ্যাস্‌বেস্‌টস্ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ রপ্তানি-দ্রব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে যাইয়া থাকে। লৌহ ও ইস্পাতদ্রব্য, তুলা, পশম, খনিজ তৈল, কয়লা, রবার, লৌহ আকরিক, রাং, পাট, চা, কফি, কোকো প্রভৃতি কানাডার প্রধান **আমদানি**-দ্রব্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে অধিকাংশবহির্বাণিজ্য বৃটেনের সঙ্গে হইত। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে

কানাডার অধিকাংশ বাণিজ্য হইয়া থাকে ; এই দেশের শতকরা ৩৮ ভাগ রপ্তানি-বাণিজ্য এবং ৭৫ ভাগ আমদানি-বাণিজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হইয়া থাকে।

শহর ও বন্দর (Cities & Ports)—অটোয়া কানাডার রাজধানী ও শিল্পকেন্দ্র। অন্টারিও প্রদেশে অবস্থিত এই শহর কানাডার একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার কাগজশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপের পশ্চাদ্দিকে ফ্রেজার নদীর তীরে অবস্থিত **ভ্যাঙ্কুভার** বন্দর বিভিন্ন মহাদেশীয় রেলপথ দ্বারা ইহার পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত যুক্ত। পশ্চিম প্রেইরী অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। এই বন্দর মৎস্যের জন্য বিখ্যাত। ইহার মারফত মৎস্য, তাম্র, রৌপ্য, গম, কাগজ, কাঠ প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং যন্ত্রপাতি, চিনি প্রভৃতি আমদানি করা হয়। অটোয়া ও সেণ্ট লরেন্স নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত **মণ্ট্রিল** কানাডার সর্বপ্রধান বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। মহাদেশীয় রেলপথ দ্বারা ইহা দেশের অভ্যন্তরস্থ স্থানসমূহের সহিত ও নিউ ইয়র্কের সহিত যুক্ত। শীতকালে এই বন্দর বরফাচ্ছন্ন থাকে। কানাডার পূর্বাঞ্চলের কৃষিপ্রধান অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। এই বন্দরের মারফত গম, নিকেল, রৌপ্য, তাম্র, কাঠ ও কাগজ রপ্তানি করা হয় এবং যন্ত্রপাতি, পশমবস্ত্র ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়। ইহা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গম ও ময়দা রপ্তানির বন্দর।

টরণ্টো কানাডার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্র ; লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ, মোটর-গাড়ী, কার্পাস ও পশমবয়ন প্রভৃতি শিল্পের জন্য ইহা বিখ্যাত। **উইনিপেগ** দুইটি মহাদেশীয় রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গম ও ময়দার বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে ময়দা-শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। সুপিরিয়র হ্রদের তীরে অবস্থিত **পোর্ট আর্থার** গম রপ্তানির বন্দর। **হ্যালিফাক্স** বন্দর শীতকালে বরফাবৃত না থাকায় ঐ সময় ইহার মাধ্যমে পূর্বাংশের অধিকাংশ পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে। নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ডের **সেণ্ট জন** মৎস্য-শিল্পের কেন্দ্রস্থল।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the importance of the Lawrence and the Great Lakes in eloping the economy of North America. [C. U. B. Com. 1961]

উঃ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার 'পরিবহণ-ব্যবস্থা' (১৬৪ পৃঃ এবং ১৬৮ পৃঃ) হইতে

পরিবহণের উপকারিতা বর্ণনা করিয়া দেখাও কিভাবে ইহা শ্রমশিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'শ্রমশিল্প' অধ্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পাঞ্চলের মানচিত্রটি বিশেষ লক্ষণীয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

2. Describe the factors that have led the U. S. A. to be one of the most prosperous countries of the world.'

উঃ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'অর্থনৈতিক উন্নতির কারণসমূহ' (১২৫ পৃঃ—১২৬ পৃঃ) লিখ।

3. Examine the geographical conditions under which crops are cultivated in the different crop belts of the U. S. A.

[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উঃ—যুক্তরাষ্ট্রের 'কৃষিকার্য' ও 'কৃষিবলয়' (১৩২ পৃঃ—১৩৪ পৃঃ) লিখ।

4. Write an account of the major coalfields of the United States and indicate their influence on the location of industries in the country.

[C. U. Inter. 1944, '55]

উঃ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'খনিজ সম্পদ' হইতে কয়লা সম্বন্ধে (১৪১ পৃঃ—১৪২ পৃঃ) লিখ এবং 'শ্রমশিল্প' হইতে শিল্পের অবস্থান সম্বন্ধে (১৪৭ পৃঃ—১৪৫ পৃঃ) লিখ।

5. Describe the present position of petroleum and Iron-ore production in the U. S. A. Where are they obtained ?

উঃ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'খনিজ তৈল' ও 'লৌহ আকরিক' (১৪২ পৃঃ—১৪৪ পৃঃ) লিখ।

6. What are the advantages of the U. S. A. for the development of manufacturing industries ? Comment on the location of the major industries of the country. [C. U. B. Com. 1952]

উঃ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'শ্রমশিল্প' (১৪৭ পৃ—১৫৪ পৃঃ) হইতে লিখ।

7. Indicate the geographical background of the location of iron and steel industry of the U. S. A., and explain the advantages of the United States over the iron and steel industry of the N. W. European countries.

[C. U. B. Com. 1956 ; D. U. B. Com. 1959]

উঃ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'শ্রমশিল্প' (১৪৭ পৃঃ—১৪৮ পৃঃ) এবং বৃটেন (৭২ পৃঃ—৭৬ পৃঃ), জার্মানী (১০৭ পৃঃ—১০৯ পৃঃ) ও ফ্রান্সের 'শ্রমশিল্প' (৯৭ পৃঃ—৯৮ পৃঃ) হইতে লিখ।

8. Indicate the main regions of iron and steel production in U. S. A. and account for the heavy concentration of the industry in the North-eastern part of the country. [C. U. B. Com. 1958]

উঃ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'লৌহ ও ইস্পাত শিল্প' (১৪৮ পৃঃ—১৫০ পৃঃ) হইতে লিখ। উত্তর-পূর্বাংশের শিল্পোন্নতির জন্য 'শ্রমশিল্প' অধ্যায়ের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'শিল্পাঞ্চল' দ্রষ্টব্য।

9. Describe and account for the distribution of the cotton textile industry in U. S. A. [C. U. B. Com. 1959.]

উঃ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'কার্পাসবয়ন-শিল্প' (১৫০ পৃঃ—১৫৩ পৃঃ) লিখ।

10. Discuss the factors of localisation of the cotton textile industries in North-eastern U. S. A. and account for the gradual decline of the North-east and ascendency of the Southern States in cotton manufactures in recent years. [C. U. B. Com. 1955, '57]

উঃ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'কার্পাসবয়ন-শিল্প' (১৫০ পৃঃ—১৫৩ পৃঃ) হইতে লিখ।

11. Describe the features of the Foreign Trade of the U. S. A. How far U. S. A. will be able to maintain the present status of Foreign Trade ?

উঃ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'বৈদেশিক বাণিজ্য' (১৫৭ পৃঃ—১৫৮ পৃঃ) লিখ।

12. Comment on the agricultural possibilities of the Cotton Belt of the United States of America. Examine the progress of manufacturing in this region. [C U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1963]

উঃ—'তুলাবলয়ের ভবিষ্যৎ' (১৩৫ পৃঃ ১৩৭পৃঃ) লিখ।

কানাডা

13. Divide Canada into Natural Regions and show the Climatic conditions and the principal products in each of these regions.

উঃ—কানাডার 'জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অঞ্চল' (১৬১ পৃঃ—১৬২ পৃঃ) লিখ।

14. Discuss the position of Canada as an agricultural country and as a producer and exporter of food and raw materials. [C. U. B. Com. 1958, '59]

উঃ—কানাডার 'কৃষিকার্য' (১৬২ পৃঃ—১৬৪ পৃঃ); 'খনিজ সম্পদ' (১৬৬ পৃঃ—১৬৮ পৃঃ) এবং 'বৈদেশিক বাণিজ্য' (১৭১ পৃঃ—১৭২ পৃঃ) হইতে লিখ।

তৃতীয় অধ্যায়

দক্ষিণ আমেরিকা (South America)

দক্ষিণ আমেরিকার আয়তন প্রায় ১৭,৮৭১,০০০ বর্গ-কিলোমিটার। মকরক্রান্তি এই মহাদেশের মধ্য দিয়া এবং বিষুবরেখা উত্তরাংশের আমাজন নদীর মোহনার নিকট দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই মহাদেশের অধিকাংশ স্থান দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। ১২½° উত্তর অক্ষাংশ হইতে ৫৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত এই মহাদেশ বিস্তৃত। ৬০° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার দৈর্ঘ্য ৭,৫৭০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ৫,১৫০ কিলোমিটার। দক্ষিণভাগ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে; দক্ষিণ-প্রান্তের নাম হর্ণ অন্তরীপ।

দক্ষিণ আমেরিকা নিম্নলিখিত কয়েকটি দেশ লইয়া গঠিত :

দেশ	রাজধানী	দেশ	রাজধানী
১। কলম্বিয়া	বোগোটা	৭। বলিভিয়া	লা পাজ
২। ইকুয়েডর	কুইটো	৮। চিলি	স্যান্টিয়াগো
৩। ভেনেজুয়েলা	কারাকাস্	৯। আর্জেন্টিনা	বুয়েনস্ আয়ার্স
৪। (ক) বৃটিশ গায়না	জর্জ টাউন	১০। পারাগুয়ে	আসুনসিয়ন
(খ) ফরাসী গায়না	কাইয়েন	১১। উরুগুয়ে	মন্টেভিডো
৫। সুরিনাম	পারামারিবো	১২। পেরু	লিমা
৬। ব্রেজিল	রায়ো-ডি-জেনিরো		

দক্ষিণ আমেরিকার চতুর্দিকে সমুদ্র থাকিলেও এই মহাদেশের এখনও বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। এই মহাদেশের **অনুন্নতির কারণ-**সমূহের মধ্যে এখানকার প্রতিকূল জলবায়ু, অভগ্ন সৈকতরেখা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ঔপনিবেশিক জাতিসমূহের শোষণ, শক্তিসম্পদের অভাব, পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার অধিবাসিগণ ভারতীয়, নিগ্রো, শ্বেতকায় বা মিশ্রজাতীয়। জাতীয়তাবাদের উন্নতি না হওয়ায়, সুস্থ ও সবল সরকার বিশেষ গড়িয়া ওঠে নাই। অধিকাংশ দেশের সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার। প্রতিকূল জলবায়ুর জন্য জ্বর ও

অন্যান্য রোগের ভয়ে এখানকার বহুস্থান জনমানবশূন্য। খনিজ, কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও কয়লার অভাবে এই মহাদেশ শিল্পে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। জলবিদ্যুৎশক্তির উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা থাকিলেও ঔপনিবেশিক দেশসমূহের স্বার্থে এবং মূলধন ও কারিগরী বিদ্যার অভাবে জলবিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদনের সুবন্দোবস্ত হয় নাই। এই মহাদেশ খনিজ, কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও ঔপনিবেশিকদের দল এখানে শিল্পসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটাইয়া অধিকাংশ কাঁচামাল তাহাদের দেশে লইয়া যায়; আর্জেন্টিনার পশম, মাংস, চর্ম ও তিসি, চিলির নাইট্রেট ও

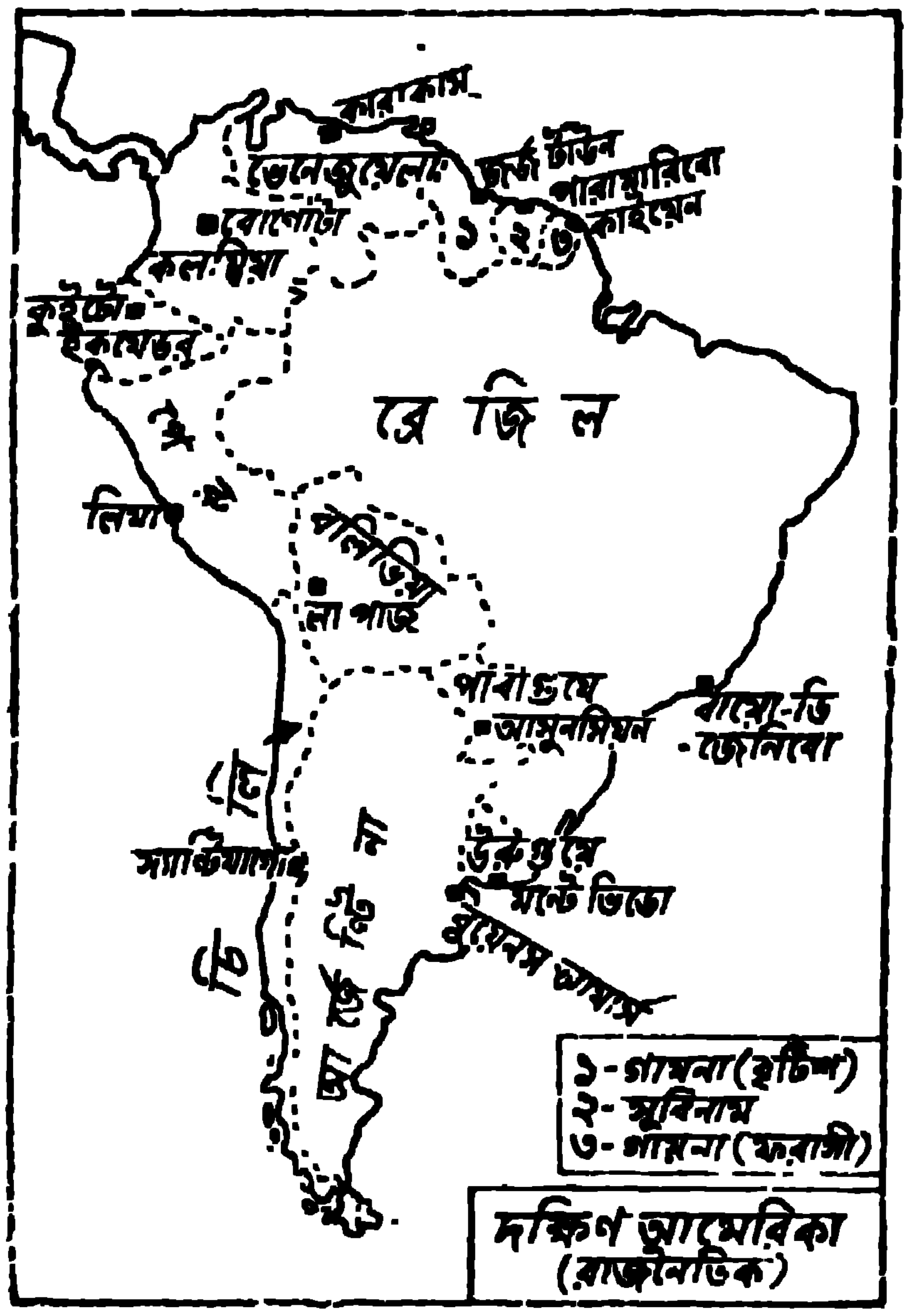

দক্ষিণ আমেরিকা (রাজনৈতিক)

তাম্র, ভেনেজুয়েলার খনিজ তৈল, ব্রেজিলের কফি, বৃটিশ গায়না ও সুরিনামের বক্সাইট, পেরুর তূলা, তাম্র প্রভৃতি অধিকাংশই রপ্তানি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে। এই সকল দেশের শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎকৃষ্ট বাজার দক্ষিণ আমেরিকা। এইজন্য দক্ষিণ আমেরিকার শিল্পোন্নতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি দেশ সর্বদাই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

ভূ-প্রকৃতি (Physical Features)—দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা সমান নহে। পার্বত্যভূমি, মালভূমি এবং সমভূমি বিভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হয়। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এই মহাদেশকে মোটামুটি নিম্নলিখিত চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়:

(ক) পশ্চিমাংশের পার্বত্য অঞ্চল—এই মহাদেশের পশ্চিমাংশে আণ্ডিজ পর্বতমালা বিদ্যমান; ইহা উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতমালারই দক্ষিণাংশ; সেইজন্য পানামা হইতে হর্ণ অন্তরীপ পর্যন্ত এই পর্বতমালা বিস্তৃত।

(খ) উত্তর ও পূর্বভাগের উচ্চভূমি—দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশের গায়না উচ্চভূমি এবং পূর্বাংশের ব্রেজিল উচ্চভূমি লইয়া এই অঞ্চল গঠিত ; এই দুইটি উচ্চভূমিকে আমাজন নদী দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। **(গ) উত্তর ও মধ্যভাগের সমভূমি**—বিস্তীর্ণ আমাজন-উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া আর্জেন্টিনার দক্ষিণ উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল সমতলভূমি। বিভিন্ন নদী-উপত্যকা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। উত্তরের আমাজন নদীর উপত্যকা

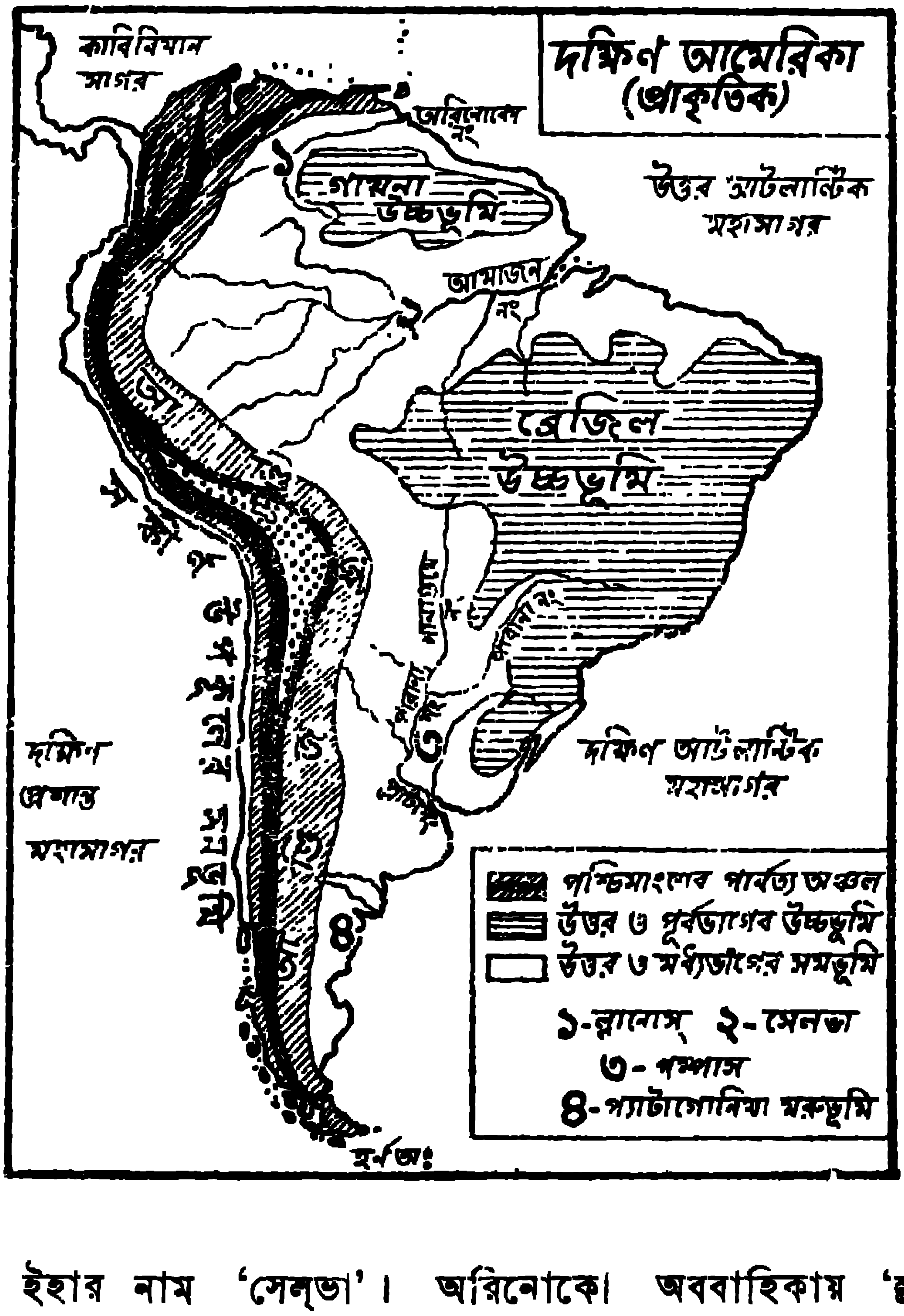

অরণ্যময় ; ইহার নাম 'সেল্ভা'। অরিনোকো অববাহিকায় 'ল্লানোস্' নামে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি বিদ্যমান। আটলান্টিক উপকূলের মধ্যভাগে প্লাটা অববাহিকার তৃণভূমির নাম পম্পাস্। আর্জেন্টিনার পারানা-পারাগুয়ে অববাহিকার সমভূমিতে প্রচুর কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের

তৃণভূমিতে পশুপালন ও কৃষিকার্য উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমাজন-উপত্যকায় কৃষিকার্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়; এখানে বন্য রবার পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের দক্ষিণাংশে প্যাটাগোনিয়া মরু অঞ্চল বিদ্যমান। **(ঘ) উপকূলের সমভূমি**—প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে সঙ্কীর্ণ সমতলভূমি বিদ্যমান। এই অঞ্চলে কৃষিকার্য উন্নতি লাভ করিয়াছে। চিলির খনিজ সম্পদও এই অঞ্চলেই রহিয়াছে।

জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ (Climate & Natural Vegetation)—দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশের উপর দিয়া নিরক্ষরেখা এবং মধ্যভাগের উপর দিয়া মকরক্রান্তি চলিয়া গিয়াছে বলিয়া এখানকার অধিকাংশ স্থান (৭০%) **গ্রীষ্মমণ্ডলে** অবস্থিত। উত্তরাংশের গায়না, ব্রেজিল, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলায় নিরক্ষীয় জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। ব্রেজিলের আমাজন-উপত্যকার সেল্‌ভা অঞ্চলে বিস্তীর্ণ বনভূমি বিদ্যমান। এখানে চিরহরিৎ বৃক্ষ থাকিলেও অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য এবং পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবে এখানকার বনজ সম্পদকে কাজে লাগানো যায় নাই। এখানকার বৃষ্টিপাত ও উত্তাপ অত্যন্ত বেশী। শুধু ইকুয়েডরে মৃদু জলবায়ু দেখা যায়; কারণ ইহার উচ্চতা অনেক বেশী। আণ্ডিজ পর্বতের **পূর্বাংশ বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল**; সেইজন্য পেরু, চিলি ও আটাকামায় **মরু অঞ্চলের** সৃষ্টি হইয়াছে। ছোট ছোট কাঁটাগাছ এখানে জন্মে। ভেনেজুয়েলার অরিনোকো অববাহিকায় ও দক্ষিণ ব্রেজিলে স্যাভানা জলবায়ু বিদ্যমান থা.ায় দীর্ঘকায় তৃণ জন্মে। ইহা পশুপালনের সহায়ক।

মকরক্রান্তির দক্ষিণে অবস্থিত **নাতিশীতোষ্ণ** অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম জলবায়ু দেখা যায়। প্রশান্তমহাসাগরীয় উপকূলে পশ্চিমা-বায়ুর জন্য দক্ষিণাংশে সারাবৎসর এবং চিলির ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে শীতকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়; বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০-২০০ সেঃ মিঃ। এই অংশের দক্ষিণাংশে মিশ্র বনভূমি দেখা যায় এবং উত্তরাংশে ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমি দেখা যায়। আটলান্টিক উপকূলের মধ্যাংশে আর্জেন্টিনার নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে পম্পাস্ তৃণভূমি বিদ্যমান। এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০ সেঃ মিঃ মাত্র। ইহার উত্তরাংশে পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। আণ্ডিজ পর্বতের পূর্বাংশে দক্ষিণ আর্জেন্টিনার বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে প্যাটাগোনিয়ার মরু অঞ্চল অবস্থিত; এখানে কাঁটাগাছ জন্মে।

এই মহাদেশের উত্তরাংশ নিরক্ষীয় ও গ্রীষ্মমণ্ডলের অধীন বলিয়া **অধিক তাপমাত্রা** (২৫° সেঃ) পাইয়া থাকে। দক্ষিণাংশের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পশ্চিমাংশ শীতল স্রোতের প্রভাবে ঠাণ্ডা থাকে ; এখানকার তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে ১৫° সেঃ এবং শীতকালে হিমাঙ্ক পর্যন্ত নামিয়া আসে। পূর্বাংশের তাপমাত্রা গরম স্রোতের প্রভাবে কিছু বেশী থাকে।

নদী (Rivers)—দক্ষিণ আমেরিকার পাঁচটি নদী (আমাজন, প্লাটা, অরিনোকো, পারানা, পারাগুয়ে) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আণ্ডিজ পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর বৃহত্তম নদী **আমাজন** (৬,৪৪০ কিলোমিটার) ব্রেজিলের অরণ্যময় সেল্‌ভার মধ্য দিয়া আটলান্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে। ইহার উপত্যকা অঞ্চল বহুদূর পর্যন্ত প্লাবিত হয় বলিয়া সাধারণতঃ মনুষ্যবাসের অযোগ্য। এখানে সারাবৎসর বৃষ্টিপাত হওয়ায় এই নদীতে সর্বদা জল থাকে। মোহনা হইতে এই নদী প্রায় ৪,২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত সুনাব্য ; কিন্তু উপত্যকা অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ও অনুন্নত বলিয়া ইহার জলপথের গুরুত্ব অনেক কম। আমাজন নদীর বামতীরে রায়ো-নিগ্রো এবং দক্ষিণতীরে রায়ো-মাডিরো প্রভৃতি উপনদী অত্যন্ত খরস্রোতা বলিয়া নাব্য নহে। ব্রেজিলের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া **পারানা** নদী মত্তোগ্রসো উচ্চভূমিতে উৎপন্ন **পারাগুয়ে** নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পারানা-পারাগুয়ে নদীপথে বড় বড় স্টীমার চলে ; এই নদীপথের সহিত উরুগুয়ে নদী মিলিত হইবার পর ইহার নাম হইয়াছে **প্লাটা** নদী ; ইহা আটলান্টিক মহাসাগরে পড়িয়াছে। পারানা-পারাগুয়ে পর্যন্ত কৃষিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। গিয়ানা মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া **অরিনোকো** নদী ভেনেজুয়েলার ল্লানোস্‌ তৃণভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা মোহনা হইতে ১,৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত সুনাব্য। এই মহাদেশের উত্তরাংশে কয়েকটি ছোট ছোট নদী আছে ; ইহার মধ্যে ম্যাগডালিনা নদী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লোকবসতি (Population)—দক্ষিণ আমেরিকার লোকসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। এই মহাদেশের লোকবসতির ঘনত্ব সর্বত্র সমান নহে। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, কৃষিজ, প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদ এই মহাদেশের বসতি-ঘনত্ব নির্ণয়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের আমাজন-উপত্যকায় লোকবসতি প্রায় নাই বলিলেই হয়। আটাকামা, প্যাটাগোনিয়া প্রভৃতি মরু অঞ্চলও জনবিরল। পূর্ব উপকূলে ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনায়

সর্বাপেক্ষা বেশী লোক বাস করে। পশ্চিম উপকূলে সর্বাপেক্ষা বেশী লোক বাস করে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অন্তর্গত চিলির মধ্যভাগে। এই দেশের খনি অঞ্চলেও বহুলোক বাস করে।

কৃষিকার্য (Agriculture)—দক্ষিণ আমেরিকার আয়তন লোকসংখ্যার অনুপাতে অনেক বড় হইলেও জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতির জন্য সকল স্থানে কৃষিকার্য করা সম্ভব নহে। নদী-উপত্যকা ও মহাসাগরীয় উপকূলের সমভূমিতে এই মহাদেশের কৃষিকার্য সীমাবদ্ধ। এই মহাদেশের কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ব্রেজিলের কফি, কোকো, তুলা, ইক্ষু, ভুট্টা ও ধান, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়ের গম, রাই, যব, ভুট্টা ও যই এবং মধ্য চিলির গম, ফল ও শাক-সব্জী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার অধিকাংশ কৃষিজ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়, তন্মধ্যে কফি, কোকো, তুলা, চিনি, গম, রবার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ রপ্তানি-দ্রব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে রপ্তানি হয়।

পশুপালনে দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল ও উরুগুয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। আর্জেন্টিন ও উরুগুয়ের পম্পাস্ তৃণভূমিতে এবং ব্রেজিলের মাতো-গ্রাসো-দো-সুল অঞ্চলে এই মহাদেশের অধিকাংশ গবাদি পশু, মেষ ও শূকর পালিত হয়। মাংস-রপ্তানিতে এই মহাদেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। পশম ও চর্ম প্রভৃতিও এখানকার উল্লেখযোগ্য রপ্তানি-দ্রব্য।

খনিজ সম্পদ (Minerals)—কয়েকটি খনিজ দ্রব্য-উৎপাদনে দক্ষিণ আমেরিকা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ইহার অধিকাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও বৃটেনে রপ্তানি হইয়া থাকে। ভেনেজুয়েলার খনিজ তৈল, সুরিনাম ও বৃটিশ গায়নার বক্সাইট, চিলি ও পেরুর তাম্র ও নাইট্রেট, ব্রেজিল ও চিলির লৌহ আকরিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলিভিয়ায় রৌপ্য, রাং, সীসা, দস্তা ও তাম্র পাওয়া যায়। এখানকার রপ্তানি-দ্রব্যের শতকরা ৯০ ভাগ খনিজ দ্রব্য, ইহার মধ্যে রাং-রপ্তানি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর খনিজ সম্পদ লুক্কাইত আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবে এবং প্রতিকূল জলবায়ুর দরুন এখানকার খনিজ দ্রব্য-উত্তোলনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। কয়লার অভাবে শিল্পের উন্নতি না হওয়ায় অধিকাংশ খনিজ দ্রব্য না গলাইয়া বিদেশে রপ্তানি হয়।

বিভিন্ন দ্রব্য-উৎপাদনে দক্ষিণ আমেরিকার স্থান

১৯৬৩-৬৪ (লক্ষ মেঃ টন)

	পৃথিবীর মোট উৎপাদন	দঃ আমেরিকার উৎপাদন	দঃ আমেরিকার অংশ (শতকরা)	দঃ আমেরিকার স্থান
বক্সাইট	১৭৭	৫৮	৩৩%	প্রথম
খনিজ তৈল	১২১	২০	১৬%	চতুর্থ
তাম্র	৩৬'৭	৬'৬	১৮%	চতুর্থ
পশম	২৭	৩'৩	১২%	তৃতীয়
কফি	৩৯'৮	২১'৭	৫৬%	প্রথম
কোকো	১২'২	২'৬	২১%	দ্বিতীয়

ব্রেজিল (Brazil)

দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ ব্রেজিলের আয়তন ৮৫,১৩,৮৪৪ বর্গ-কিলোমিটার। ১৯৬৪ সালে ইহার লোকসংখ্যা ছিল ৭'৮৮ কোটি। সাও পলো অঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। বিভিন্ন কৃষিজ, খনিজ ও প্রাণিজ সম্পদে এই দেশ সমৃদ্ধ হইলেও শিল্পোন্নতি না হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। ঔপনিবেশিক দেশসমূহের স্বার্থ ও কয়লার অভাব ইহার প্রধান কারণ। এখানকার বিভিন্ন সম্পদের উৎপাদন-বৃদ্ধির সম্ভাবনা এত বেশী যে, অনেকে এই দেশকে একটি 'নিদ্রিত দানব' (Sleeping Giant) বলিয়া অভিহিত করেন। এই দেশ পূর্বে পর্তুগীজদের অধীনে ছিল বলিয়া এখনও এখানকার লোকদের জাতীয় ভাষা পর্তুগীজ। এই দেশে বিস্তীর্ণ উপকূলভাগ থাকিলেও পূর্বাংশে কয়েকটি স্থান ভিন্ন সর্বত্র ইহা অভগ্ন।

ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু—গায়না উচ্চভূমির দক্ষিণাংশ ব্রেজিলের উত্তরাংশে আসিয়া মিশিয়াছে। এখানে স্তাভানা জলবায়ু বিদ্যমান। আমাজন নদীর অববাহিকায় নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু থাকায় বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। জলপথ এখানকার প্রধান পরিবহণ-ব্যবস্থা। অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য এখানকার বন্য রবার সংগ্রহ করা খুব কঠিন। ব্রেজিলের পূর্বাংশ উচ্চভূমি; পারানা-উপত্যকায় এবং আটলান্টিক উপকূলে বৃষ্টিপাত (১০০ সেঃ মিঃ) বেশী হওয়ায় প্রচুর কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

কৃষিজ দ্রব্য সংগ্রহ ও রপ্তানির জন্য এই অঞ্চলে রেলপথ ও বন্দর নির্মিত হইয়াছে। উচ্চভূমি থাকায় কফি ও কোকোর চাষ করা সহজ। অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ইক্ষু, তুলা, ভুট্টা, ধান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বাভানা তৃণভূমি থাকায় গবাদি পশুপালন উন্নতি লাভ করিয়াছে। এখানে লৌহ আকরিক, স্বর্ণ, হীরক প্রভৃতি খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। ব্রেজিলের দক্ষিণাংশে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বনভূমি বিদ্যমান; সর্বদক্ষিণে তৃণভূমি থাকায় এই অঞ্চলে ব্রেজিলের অধিকাংশ মেষ পালিত হয়। এখানে কফি, কোকো এবং অন্যান্য ফসলও প্রচুর জন্মে।

কৃষিকার্য—ব্রেজিল প্রধানতঃ একটি কৃষিপ্রধান দেশ; কিন্তু আয়তনের তুলনায় কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ অনেক কম—শতকরা মাত্র ৭ ভাগ। অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলে দেশের পূর্বাংশে কৃষিকার্য সীমাবদ্ধ। সাও পলো, মিনাস্ গেরায়েস্ এবং রায়ো-গ্রাণ্ডি-দোস্থল রাজ্যে অধিকাংশ কৃষি-জমি অবস্থিত। রপ্তানিযোগ্য খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনের দিকে বেশী উৎসাহ থাকায়, খাদ্যশস্যের উৎপাদন ততটা বৃদ্ধি পায় নাই। সেইজন্য ব্রেজিলকে গম আমদানি করিতে হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৪৬ ভাগ কফি এবং ১৫ ভাগ কোকো এই দেশে উৎপন্ন হয়। সাও পলো এবং মিনাস্ গেরায়েস্ অঞ্চলেই অধিকাংশ **কফি** উৎপন্ন হয়; কারণ এখানকার লৌহ-কণিকাযুক্ত মৃত্তিকা, মৃদু জলবায়ু ও উচ্চভূমি (৬৫০ মিটার উচ্চ) কফি ও কোকো চাষের উপযোগী। পারানা অঞ্চলেও কফির চাষ হয়। সাণ্টোস্ ও রায়ো-ডি-জেনিরো বন্দরের মারফত এই দেশের অধিকাংশ কফি বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে; উদ্বৃত্ত অংশ প্লাস্টিক দ্রব্য-প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। বাহিয়া রাজ্যের ক্রান্তীয় সমভূমিতে এই দেশের অধিকাংশ **কোকো** উৎপন্ন হয় এবং বাহিয়া বন্দর মারফত রপ্তানি হয়। সাও পলো অঞ্চলে এবং বাহিয়ার উত্তরাংশে ব্রেজিলের অধিকাংশ **তুলা** ও **ইক্ষু** উৎপন্ন হয়। এখানকার জলবায়ুর সঙ্গে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের তুলা-বলয়ের জলবায়ুর সাদৃশ্য আছে। আটলান্টিক উপকূলের মধ্যাংশে ও দক্ষিণাংশে ভুট্টা, ধান, ক্যাসাভা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বাহিয়া অঞ্চলে মাটে চা, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পারা অঞ্চলে উৎকৃষ্ট আবাদী রবার উৎপন্ন হইতেছে। ব্রেজিল পৃথিবীতে কফি-উৎপাদনে প্রথম এবং কোকো, ইক্ষু ও ভুট্টা উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

বিস্তীর্ণ তৃণভূমি থাকায় ব্রেজিল **পশুপালনে** উন্নতি লাভ করিয়াছে। উত্তরাংশের ক্যাম্পস অঞ্চলের দীর্ঘ তৃণ গবাদি পশুপালনে এবং দক্ষিণাংশের তৃণভূমির ক্ষুদ্র তৃণ শূকর ও মেষপালনে সহায়তা করিয়াছে। মাংস ও চর্ম

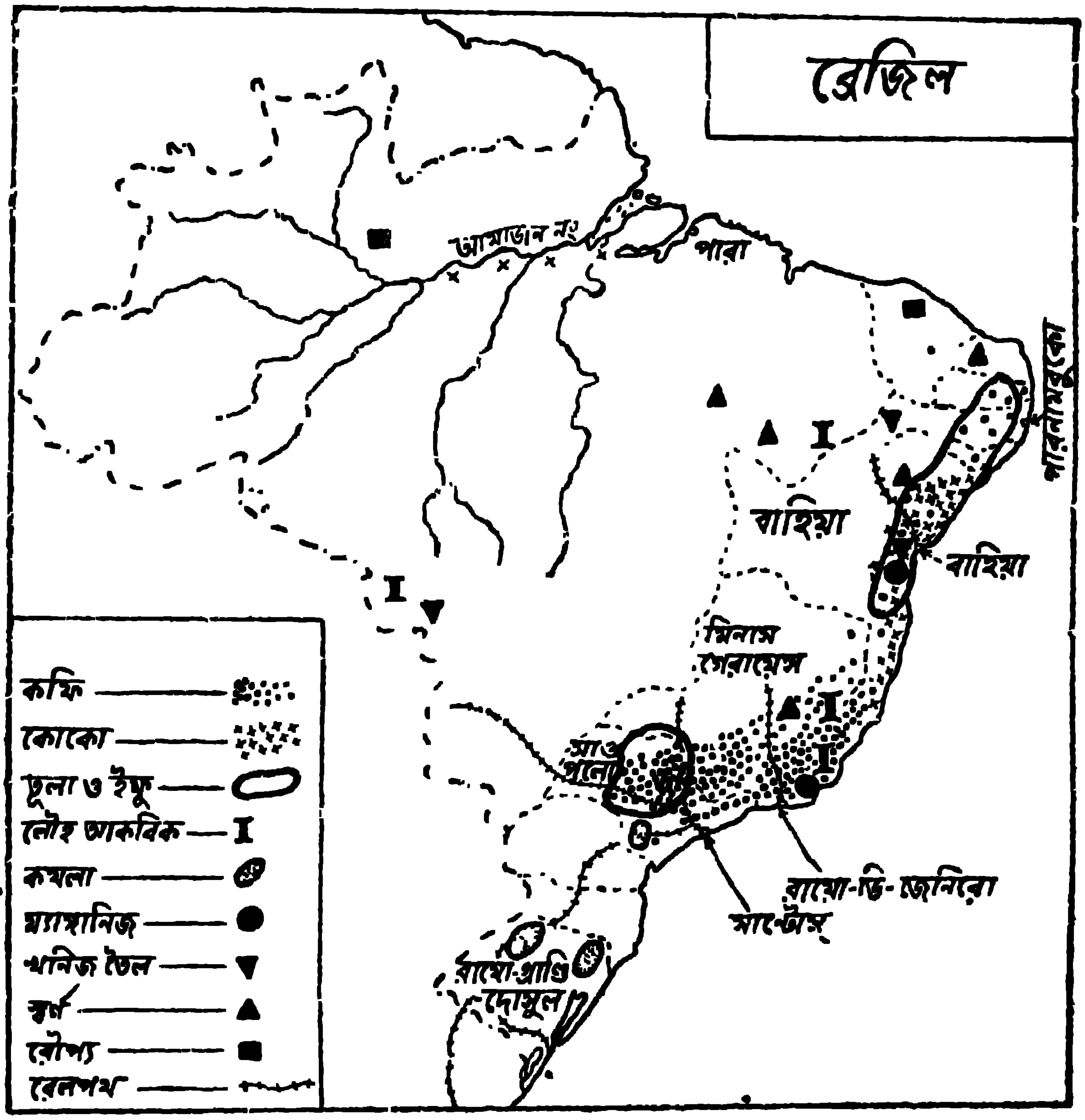

ব্রেজিলের রপ্তানি-বাণিজ্যে উখেল্লযোগ্য স্থান অধিকার করে। রায়ো-গ্রাণ্ডি-দোসুল ব্রেজিলের শ্রেষ্ঠ পশুপালন-কেন্দ্র।

খনিজ সম্পদ—ব্রেজিলের ইটাবিরা অঞ্চলে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ **লৌহ**-খনি বিদ্যমান। কয়লার অভাবে এখানকার অল্প পরিমাণ লৌহ উত্তোলিত হয়। মিনাস্ গেরায়েস্ অঞ্চলেও লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এই দেশের সঞ্চিত লৌহ আকরিকের পরিমাণ ১,৬০০ কোটি মেঃ টন হইলেও বাৎসরিক উৎপাদন মাত্র ৫২ লক্ষ মেঃ টন। পরিমাণে অল্প হইলেও রায়ো-গ্রাণ্ডি-দোসুল, সান্টা ক্যাথেরিনা, সাও পলো ও পারানা অঞ্চলে **কয়লা** পাওয়া যায়।

ম্যাঙ্গানিজ-উৎপাদনে ব্রেজিল পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। মিনাস্ গেরায়েসের লাফায়েটি জিলায় অধিকাংশ ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়; বাহিয়া অঞ্চলেও ইহা পাওয়া যায়। **ক্রোমিয়াম**-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। থোরিয়াম সমেত মোনাজাইট পাওয়া যায় প্রধানতঃ রায়ো-ডি-জেনিরো ও বাহিয়া অঞ্চলে। এখানকার অধিকাংশ খনিজ দ্রব্য প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে রপ্তানি হইয়া থাকে; কারণ এই দেশে এখনও শিল্প ভালোভাবে গড়িয়া ওঠে নাই।

ব্রেজিলের **বনজ সম্পদ** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বন্য রবার, কাঠ ও ফলমূল এখানকার বিভিন্ন বনভূমি হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব ব্রেজিলের পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমির মূল্যবান্ কাঠ ও উচ্চভূমির সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির নরম কাঠ প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়। কিছু পরিমাণে নরম কাঠ স্থানীয় কাগজশিল্পে ব্যবহৃত হয়।

ব্রেজিলের উৎপাদন (১৯৬৩-৬৪)

(লক্ষ মেঃ টন)

কফি	১৫·৬	লৌহ আকরিক	৮৩
কোকো	১·৯	ম্যাঙ্গানিজ	৩·৫
ভুট্টা	১০২	গবাদি পশু (কোটি)	৬·৫
তামাক	২·৬	মেষ (কোটি)	২
তুলা	৪·৯	ইক্ষু	৪১০
ধান	৫৪	চিনি	৩৪

পরিবহণ-ব্যবস্থায় ব্রেজিল এখনও বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। আমাজন নদী সুনাব্য হইলেও ইহার উপত্যকা অনুন্নত হওয়ায় জলপথে ইহার গুরুত্ব অনেক কম। এই দেশের রাজপথ ও রেলপথ পূর্বাংশের কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৩৭,০০০ কিলোমিটার এবং রাজপথের দৈর্ঘ্য ৪,৬৭,৫০০ কিলোমিটার হইলেও দেশের বিশাল আয়তনের তুলনায় ইহা নগণ্য। এই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে মোট ২·৬৫ কোটি গ্রস্ টনের জাহাজ নিযুক্ত হয়।

শ্রমশিল্প—১৮৮৯ সাল পর্যন্ত ব্রেজিল পর্তুগীজদের দখলে ছিল। সুতরাং সেই সময় পর্যন্ত পর্তুগীজগণ এই দেশের কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদ আহরণে ব্যস্ত ছিল। দেশের শিল্পোন্নতি ইহাদের স্বার্থের প্রতিকূল ছিল। স্বাধীনতার

পরেও এই দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাবে আসায় দেশের শিল্পোন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য এখানকার কাঁচামাল তাহাদের দেশে লইয়া যাওয়া এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি এই দেশে রপ্তানি করা। কৃষিজ, প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদে এই দেশ পরিপূর্ণ। শীঘ্রই এমন দিন আসিতেছে যখন এই দেশ জাগিয়া উঠিবে এবং একটি বিশিষ্ট শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইবে। কয়লার অভাব থাকিলেও এই দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। বর্তমানে সরকার দেশের শিল্পোন্নতির দিকে কিছুটা দৃষ্টি দেওয়ায় কার্পাসবয়ন, চিনি, চর্ম, তামাক, কাগজ, দিয়াশলাই ও মদ্য-শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। এই সকল ভোগ্যদ্রব্যের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলেও ভারী শিল্পের উন্নতি বিভিন্ন কারণে সম্ভব হইতেছে না; কয়লার অভাব তন্মধ্যে অন্যতম। সাও পলো, মিনাস্ গেরায়েস্ ও রায়ো-ডি-জেনিরো অঞ্চলেই অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার শিল্প স্থানীয় কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। কার্পাসবয়ন-শিল্প ব্রেজিলের শ্রেষ্ঠ শিল্প; ৪২৩টি কাপড়ের কলে প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। এই শিল্পের বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় ১১২ কোটি মিটার কার্পাস-বস্ত্র। সাও পলো এবং মিনাস্ গেরায়েসে অধিকাংশ কাপড়ের কল অবস্থিত। পারানার মণ্টে অ্যালজারে দক্ষিণ আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কাগজের কল গড়িয়া উঠিয়াছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য—এখানকার **রপ্তানি**-দ্রব্য প্রধানতঃ কৃষিজ ও প্রাণিজ কাঁচামাল এবং খাদ্যদ্রব্য। তন্মধ্যে কফি, কোকো, তুলা, তামাক, মাংস, চিনি, রবার ও চর্ম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **আমদানি**-দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি, বস্ত্রাদি, ঔষধপত্র ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্যই প্রধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সঙ্গে এই দেশের প্রায় অর্ধেক বৈদেশিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়। জার্মান, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ইটালি প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও ব্রেজিলের বহির্বাণিজ্য হইয়া থাকে। এই দেশের বাৎসরিক রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্য প্রায় ১৪০ কোটি ডলার এবং আমদানি-দ্রব্যের মূল্য প্রায় ১৪৯ কোটি ডলার।

শহর ও বন্দর—ব্রাজিলিয়া—ব্রেজিলের রাজধানী ও বড় শহর। আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত **রায়ো-ডি-জেনিরো** ব্রেজিলের সর্বপ্রধান বন্দর। উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় থাকায় এই বন্দর ভালোভাবে গড়িয়া

উঠিয়াছে। সাও পলো, মিনাস্ গেরায়েস্ প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। রবার, কফি, কোকো, তামাক, চর্ম, লৌহ আকরিক এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য এবং কয়লা, যন্ত্রপাতি, বস্ত্রাদি এবং খাদ্যশস্য প্রধান আমদানি-দ্রব্য। **পারণামবুকো** ও **বাহিয়া** বন্দর মারফত তুলা, কফি, তামাক ও চিনি রপ্তানি হইয়া থাকে। **পারা** উৎকৃষ্ট রবারের জন্য বিখ্যাত। **সাণ্টোস্** বন্দর কফি রপ্তানির জন্য এবং **ডায়মণ্টিনা** হীরকখনির জন্য বিখ্যাত। **মানাও** বন্য রবার সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র।

আর্জেণ্টিনা (Argentina)

আর্জেণ্টিনার আয়তন ২৭,৭৮,৪২৮ বর্গ-কিলোমিটার; ১৯৬৪ সালে ইহার লোকসংখ্যা ছিল ২ কোটি ১৭ লক্ষ; অর্থাৎ প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে এই দেশের **লোকবসতি** প্রায় ৮ জন। এখানকার অধিকাংশ লোক উর্বর 'পম্পাস্' অঞ্চলে বাস করে। শুধু রাজধানীতে বাস করে দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ জন। ইটালি ও স্পেন হইতে আগত বহুলোক এখানে বাস করে। আর্জেণ্টিনার নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ইউরোপীয়গণের বসবাসের উপযোগী। ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে এই দেশ স্পেনের অধীনে ছিল। স্বাধীনতার পরেও এখানকার সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবে চালিত হয়।

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে আর্জেণ্টিনাকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। আণ্ডিজ পর্বত ইহার পশ্চিম সীমানা বরাবর চলিয়া গিয়াছে। আণ্ডিজ পর্বত-সংলগ্ন **উচ্চভূমির** উত্তরাংশ শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চল; দক্ষিণাংশেও **প্যাটাগোনিয়া** মরু অঞ্চল দক্ষিণ আমেরিকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সকল অঞ্চলে লোকবসতি সমগ্র দেশের শতকরা ১ ভাগেরও কম। এখানে কোন কোন স্থানে অল্পবিস্তর খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের নদীসমূহ হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সকল উচ্চভূমির পূর্বে বিখ্যাত **পম্পাস্** তৃণভূমি বিদ্যমান। এখানকার মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর বলিয়া এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী হওয়ায় কৃষি-কার্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। তৃণভূমির সাহায্যে পশুপালনও উন্নতি লাভ করিয়াছে। আটলাণ্টিক উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় আর্জেণ্টিনার অধিকাংশ

বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র এই অঞ্চলে অবস্থিত। আর্জেন্টিনার উত্তরাংশে **চাকো** নিম্নভূমি কৃষিকার্যের উপযোগী; এই অঞ্চলে তিসি, ইক্ষু ও তুলার চাষ হয়। এখানে বিস্তীর্ণ বনভূমি রহিয়াছে।

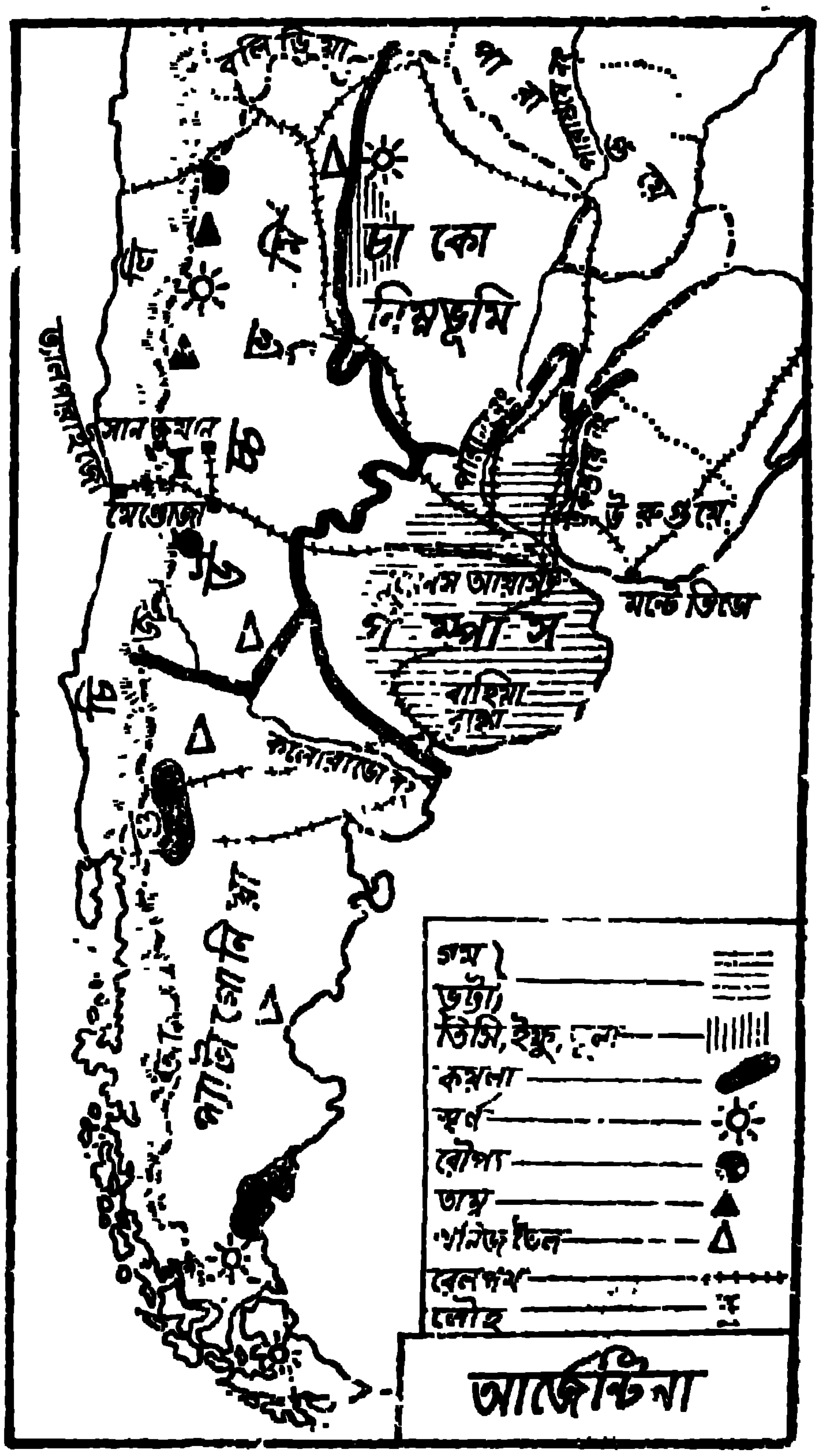

আর্জেন্টিনা দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত হওয়ায় মৃদু **জলবায়ু** উপভোগ করে। আটলান্টিক উপকূলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ সেঃ মিঃ-এর বেশী। উত্তরাংশ গ্রীষ্মমণ্ডলের নিকটবর্তী হওয়ায় 'চাকো' অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষের **বনভূমি** দেখা যায়। মধ্যভাগের তৃণভূমি ও পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি থাকিলেও দক্ষিণাংশের প্যাটাগোনিয়ার মরু অঞ্চলে কাঁটাগাছ জন্মে। আর্জেন্টিনার বনভূমি হইতে মূল্যবান্ কাঠ সংগ্রহ করা হয়।

কৃষিকার্য—আর্জেন্টিনা একটি কৃষিপ্রধান দেশ। ইহার সমগ্র ভূমি-ভাগের মধ্যে শতকরা ৪১ ভাগ পশুচারণ-ক্ষেত্র, ৩২ ভাগ বনভূমি এবং ১১ ভাগ কৃষি-জমি। প্রায় ২·৯ কোটি হেক্টর জমিতে বর্তমানে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। **গম** এই দেশের শ্রেষ্ঠ ফসল। পম্পাস্ অঞ্চলে অধিকাংশ গম উৎপন্ন হয়। মোট গমের শতকরা ৫১ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। **ভুট্টা** উৎপাদন ও রপ্তানিতে আর্জেন্টিনা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। পম্পাস্ অঞ্চলে অধিকাংশ ভুট্টা উৎপন্ন হয়। এই দেশের অধিকতর শীতল

অংশে বুয়েনস্ আয়ার্সের দক্ষিণাংশে যই উৎপন্ন হয় ; ইহার অধিকাংশ রপ্তানি হয়। উত্তরাংশের উপক্রান্তীয় অঞ্চলে ইক্ষু, তুলা, তিসি, তৈলবীজ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। উচ্চভূমি অঞ্চলে মেণ্ডোজা ও সানজুয়ানে প্রচুর আঙ্গুর উৎপন্ন হয়। তিসি-উৎপাদনে আর্জেন্টিনা পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

পশুপালনে আর্জেন্টিনা প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। 'পম্পাস্' অঞ্চলের তৃণভূমিতে এই দেশের অধিকাংশ মেষ ও গবাদি পশু পালিত হয়। কোন কোন তৃণভূমি পরিষ্কার করিয়া গমচাষ হওয়ায় মেষের সংখ্যা কিছু কমিয়াছে। বুয়েনস্ আয়ার্সে এই দেশের শতকরা ৪০ ভাগ মেষ পালিত হয়। পশম, চর্ম ও মাংস রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

আর্জেন্টিনার কৃষিজ ও প্রাণিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩-৬৪)

(লক্ষ মেঃ টন)

গম	৮৫	গবাদি পশু (কোটি)	৪˙৪
ভুট্টা	৫০˙৮	মেষ (কোটি)	৫
তিসি	৬˙৪	পশম	২
তামাক	˙৪৯	মাংস	˙১

খনিজ সম্পদে আর্জেন্টিনা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এই দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে আণ্ডিজ পর্বতের পাদদেশে অল্পবিস্তর স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কয়লা, রাং, টাংস্টেন পাওয়া যায়। খনিজ তৈল এই দেশের শ্রেষ্ঠ খনিজ সম্পদ হইলেও ইহার পরিমাণ মাত্র ৯২ লক্ষ মেঃ টন ; প্যাটাগোনিয়া অঞ্চলের রিভাডেভিয়া ও উত্তরাংশে আণ্ডিজ পর্বতের পাদদেশে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। সম্প্রতি প্যাটাগোনিয়া অঞ্চলে লৌহ আকরিকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সানজুয়ান অঞ্চলে বর্তমানে লৌহ পাওয়া যায়। আণ্ডিজ পর্বতের দক্ষিণাংশে সানজুয়ানের উত্তরে স্বর্ণ পাওয়া যায়। আণ্ডিজ পর্বতের পাদদেশে তাম্র এবং রৌপ্য অল্পবিস্তর পাওয়া যায়।

শ্রমশিল্পে আর্জেন্টিনা কিছুটা উন্নতি লাভ করিলেও, ইহার অধিকাংশই ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের শিল্প। স্থানীয় গম হইতে ময়দা প্রস্তুত করা এবং মাংস সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করাই এখানকার প্রধান শ্রমশিল্প। ইহা ছাড়া চিনি, কার্পাসবয়ন ও রাসায়নিক শিল্প কোন কোন স্থানে পরিলক্ষিত হয়। প্রায় ৯ লক্ষ শ্রমিক এই দেশের শিল্পে নিয়োজিত আছে।

আর্জেন্টিনার **পরিবহণ-ব্যবস্থার** মধ্যে রেলপথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দেশে ৪৬,২৩০ কিলোমিটার রেলপথ আছে। চিলি-আর্জেন্টিনা রেল-পথের অধিকাংশ এই দেশের মধ্য দিয়া গিয়াছে; এই মহাদেশীয় রেলপথটির দৈর্ঘ্য ১,৪৫০ কিলোমিটার। আর্জেন্টিনার কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদ-আহরণে এই রেলপথের প্রচুর অবদান আছে। আর্জেন্টিনার রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র বুয়েনস্ আয়ার্স হইতে এই রেলপথ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়া মেণ্ডোজা হইয়া আণ্ডিজ পর্বত ভেদ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত চিলির প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ভ্যাল্-পারাইজো বন্দর পর্যন্ত গিয়াছে। এই রেলপথে একাধিক 'গেজ' থাকায় মালপত্র-পরিবহণে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বুয়েনস্ আয়ার্স হইতে বহু রেলপথ 'পম্পাস্' অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে গিয়াছে। সমগ্র কৃষি অঞ্চল ও পশুপালনকেন্দ্র রেলপথে বুয়েনস্ আয়ার্সের সহিত যুক্ত। বলিভিয়া, ব্রেজিল, পারাগুয়ে ও উরুগুয়ের সহিত আর্জেন্টিনা রেলপথে যুক্ত। এই দেশের রাজপথের দৈর্ঘ্য মাত্র ৫,১৫০ কিলোমিটার। পারাগুয়ে, পারানা ও উরুগুয়ে নদীর মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ জলপথের বন্দোবস্ত আছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে আর্জেন্টিনা প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। কয়লা ও লৌহের অভাবে স্থানীয় কৃষিজ ও প্রাণিজ কাঁচামালের সাহায্যে শ্রমশিল্পের বিশেষ উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয় নাই। সেইজন্য এখানকার রপ্তানি-দ্রব্যের মধ্যে গম, মাংস, তিসির তৈল, পশম ও তামাক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাংস-রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। আমদানি-দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, ইস্পাতদ্রব্য, কার্পাস ও পশম-বস্ত্র, কাঠ এবং রেলপথের সরঞ্জাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সঙ্গে এই দেশের অধিকাংশ বহির্বাণিজ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ইটালি, জার্মানী, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও আর্জেন্টিনার বৈদেশিক বাণিজ্য চলে। এই দেশের মোট রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্য প্রায় ৯৭ কোটি ডলার এবং আমদানি-দ্রব্যের মূল্য প্রায় ১৩১ কোটি ডলার।

শহর ও বন্দর—প্লাটা নদীর মোহনায় আটলান্টিক উপকূলে অবস্থিত **বুয়েনস্ আয়ার্স** আর্জেন্টিনার রাজধানী ও প্রধান বন্দর। এই দেশের কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদ অধিকাংশই এই বন্দরের মারফত রপ্তানি হইয়া

থাকে। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সঙ্গে এই বন্দর রেলপথে যুক্ত। গম, ভুট্টা, পশম, মাংস, চর্ম, তিসি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। আমদানি-দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, যন্ত্রপাতি কার্পাস-বস্ত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। **রোজারিও** ভুট্টা ও গম রপ্তানির প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় থাকায় এই বন্দর শীঘ্রই আরও উন্নতি লাভ করিবে। **বাহিয়া ব্লাঙ্কা** গম রপ্তানির অন্যতম বন্দর।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the factors that are checking economic development of the countries of South America.

উঃ—দক্ষিণ আমেরিকার 'অনুন্নতির কারণ' (১৭৫ পৃঃ—১৭৬ পৃঃ) লিখ।

2. Describe the main features of the economy of Brazil and Argentina.
[C. U. Inter, 1954]

উঃ—ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনার 'কৃষিকার্য', 'খনিজ সম্পদ' ও 'শিল্প' (১৮২ পৃঃ—১৮৪ পৃঃ, ১৮৭ পৃঃ—১৮৮ পৃঃ) লিখ।

3. Indicate the present position of foreign trade of Brazil and Argentina

উঃ—ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনার 'বৈদেশিক বাণিজ্য' (১৮৫ পৃঃ এবং ১৮৯ পৃঃ) লিখ।

4. Describe the economic products of the Pampas region of Argentina.

উঃ—আর্জেন্টিনার 'ভূ-প্রকৃতি' হইতে পম্পাস্ অঞ্চল (১৮৬ পৃঃ—১৮৭ পৃঃ) এবং 'কৃষিকার্য' (১৮৭ পৃঃ—১৮৮ পৃঃ) ও পশুপালন (১৮৮ পৃঃ) হইতে লিখ।

5. "Argentina is likely to remain, for many years, one of the most exclusively agricultural countries of the world."—Discuss.

উঃ—আর্জেন্টিনার 'কৃষিকার্য' ও 'পশুপালন' (১৮৭ পৃঃ—১৮৮ পৃঃ) হইতে লিখ।

চতুর্থ অধ্যায়

অস্ট্রেলিয়া (Australia)

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ* একটি বিশালকায় দ্বীপ। ইহার সম্পূর্ণ অংশ দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। মকরক্রান্তি ইহার প্রায় মধ্যভাগের উপর দিয়া গিয়াছে; ইহার ফলে এই মহাদেশের শতকরা ৪০ ভাগ গ্রীষ্মমণ্ডলে এবং ৬০ ভাগ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত।

এই দেশের চতুর্দিকে সমুদ্র থাকিলেও সৈকতরেখা অধিকাংশ স্থানেই অভগ্ন। দেশের পূর্বাংশের কোন কোন অংশে সৈকতরেখা ভগ্ন থাকায় কয়েকটি উৎকৃষ্ট বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভূ-প্রকৃতি (Physical Features)—অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের কোথাও সুউচ্চ পর্বত বা অত্যধিক অসমতলভূমি দেখা যায় না। ইহার তিন-চতুর্থাংশের উচ্চতা ১৮০ মিটার হইতে ৪৫০ মিটারের মধ্যে; শুধু পূর্বদিকে পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান; ইহার উচ্চতাও খুব বেশী নহে। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে অস্ট্রেলিয়াকে মোটামুটি চারিভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা, (ক) পূর্বাংশের পার্বত্য অঞ্চল, (খ) মধ্যভাগের সমতলভূমি, (গ) পশ্চিমাংশের মালভূমি এবং (ঘ) উপকূলের সমভূমি।

(ক) পূর্বাংশের পার্বত্য অঞ্চল—এই দেশের পূর্বদিকে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ নামে এক পর্বতমালা বিদ্যমান। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,২০০ কিলোমিটার। ইহার উচ্চতা খুব বেশী নহে; এই পর্বতশ্রেণীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কস্‌কিউস্কো; ইহার উচ্চতা ২,২২৫ মিটার। এই পর্বতমালা পূর্বদিকে খাড়াই এবং পশ্চিমে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রোপকূল হইতে ইহার দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার হইতে ২০০ কিলোমিটারের

---

* অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, নিউগিনি, সলোমন দ্বীপ, নিউ ক্যালিডোনিয়া, হাওয়াই, নিউ হেব্রাইডিজ ও প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য ছোট ছোট দ্বীপ লইয়া গঠিত মহাদেশকে ওশিয়ানিয়া মহাদেশ বলা হয়। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ইহাদের নিকটবর্তী ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জকে অস্ট্রেলেশিয়া নামেও অভিহিত করা হয়। এই অধ্যায়ে শুধু অস্ট্রেলিয়া সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে।

মধ্যে। উত্তরদিক হইতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রসারিত হইলেও ভিক্টোরিয়ার নিকট এই পর্বতমালা পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। ইহার সর্বশেষ অংশের নাম অস্ট্রেলিয়ান আল্পস্।

এই পর্বতমালার কোন কোন স্থানে উচ্চতা খুবই কম। ইহার ফলে এই পর্বতমালার মধ্য দিয়া রাস্তাঘাট ও রেলপথ প্রসারিত হইয়াছে; ইহার সাহায্যে উপকূলের নিম্নভূমি অঞ্চলে বহু শহর ও বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি ছোটখাটো নদী (ক্লেরেন্স, রিচমণ্ড, টুইড, ব্রিসবেন প্রভৃতি) এই পর্বত হইতে নির্গত হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে পড়িয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূলের অদূরে এই পর্বতের সমান্তরাল "গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ্" (Great Barrier Reef) থাকার ফলে উপকূলভাগে জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের প্রকোপ হইতে রক্ষা পায়; কিন্তু ইতস্ততঃ পার্বত্য শিলা থাকায় এখানে খুব সাবধানে জাহাজ চালাইতে হয়।

(খ) মধ্যভাগের সমভূমি—পূর্বাংশের গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ পশ্চিম-দিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগের সমতলভূমির সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সমতলভূমি পশ্চিমাংশের মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের দক্ষিণাংশে **মারে** ও **ডার্লিং** নদীর অববাহিকা অত্যন্ত উর্বর এবং সেইজন্য এখানে কৃষিকার্যের উন্নতি হইয়াছে। মারে, ডার্লিং এবং ইহার শাখানদী মুরুমবিজি বৎসরে কয়েক মাস নাব্য থাকে। বর্তমানে এই সকল নদী জলসেচনের পক্ষে খুবই উপযোগী। মারে-ডার্লিং উপত্যকার উত্তরে **আয়ার হ্রদের** তীরবর্তী স্থানসমূহ বৃষ্টিপাতের অভাবে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। গ্রেট ডিভাইডিং পর্বতমালার দরুন দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু এই অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে না। আয়ার হ্রদের লবণাক্ত জল জলসেচনের অনুপযুক্ত। এখানে গবাদি পশু ও মেষপালন হইয়া থাকে। কিন্তু শুষ্ক আবহাওয়ার দরুন এই সকল পশুর সংখ্যা খুব কম। এখানকার লোকবসতি অত্যন্ত অল্প। আয়ার হ্রদ অঞ্চলের উত্তরে **কার্পেণ্টারিয়া উপসাগরের** তীরবর্তী অঞ্চলে মৃত্তিকা অনুর্বর হইলেও এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী হওয়ায় কৃষিকার্য করা সম্ভব। কিন্তু এখানকার শ্বেতকায় অধিবাসিগণ পরিশ্রমী না হওয়ায় এবং কৃষ্ণকায় শ্রমিক এখানে আসিতে পারে না বলিয়া এই অঞ্চল এখনও অত্যন্ত অনুন্নত। এখানকার লোক গবাদি পশুচারণ, মৎস্যশিকার ও খনিজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল।

আয়ার হ্রদ অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া কার্পেন্টারিয়া উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে আর্টেজিয়ান বেসিন (Artesian Basin) বলা হয়। এখানে গর্ত করিলেই ফোয়ারার মতো জল বাহির হইয়া আসে ; সেইজন্য এখানকার কূপকে আর্টেজিয়ান কূপ বলা হয়।

(গ) পশ্চিমাংশের মালভূমি—ভারতমহাসাগরীয় উপকূলের অপ্রশস্ত সমতলভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যভাগের সমভূমি পর্যন্ত এই মালভূমি বিস্তৃত। এই অঞ্চল সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ। ইহার উচ্চতা ১৮০ মিটার হইতে ৪৫০ মিটার। এই অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ স্বর্ণখনির জন্য বিখ্যাত। এই স্বর্ণখনিসমূহ রেলপথে দেশের পূর্বাংশের সহিত যুক্ত। এই অঞ্চলের উত্তরাংশে ছোট ছোট কয়েকটি নদী (ফিজরয়, ভিক্টোরিয়া ও রোপার) খরস্রোতা বলিয়া নাব্য নহে। দক্ষিণাংশের হেলেনা নদী জল সরবরাহের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান মরুভূমি অথবা মরুপ্রায় মালভূমি।

(ঘ) উপকূলের সমভূমি—অস্ট্রেলিয়ার চতুর্দিকের উপকূলভাগে অপ্রশস্ত সমতলভূমি বিদ্যমান ; ইহা কৃষিকার্যের উপযোগী। পূর্বাংশের এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের উপকূলভূমি বিশেষ উন্নত। এই সকল স্থানে লোকবসতি অপেক্ষাকৃত বেশী। এই অঞ্চলেই অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ শহর ও বন্দর অবস্থিত।

জলবায়ু (Climate)—অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উত্তরাংশ গ্রীষ্মমণ্ডলে এবং দক্ষিণাংশ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত ; কারণ মকরক্রান্তি ইহার প্রায় মধ্যভাগের উপর দিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া এখানকার বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা দেশের জলবায়ুর বিভিন্নতার জন্য দায়ী। সূর্য যখন মকরক্রান্তির উপর আসে, তখন উত্তরাংশের প্রখর তাপ পরিলক্ষিত হয় এবং ঐ সময় উত্তরদিক হইতে মৌসুমী বায়ু এই অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে উত্তরাংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী—৭৫ সেঃ মিঃ হইতে ১৫০ সেঃ মিঃ। যতই দক্ষিণে যাওয়া যায়, এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়া আসে। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ুর জন্য এই দেশের ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে এবং দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর জন্য গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের পূর্বাংশে প্রচুর **বৃষ্টিপাত** হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগে বৃষ্টিপাত হয় না বলিলেই হয় ; সেই-

জন্য এখানে মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। উত্তরাংশ গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত বলিয়া গ্রীষ্মকালে **উত্তাপ** (২৭° সেঃ) পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণাংশে এই সময় মাঝারি উত্তাপ (২০° সেঃ) পরিলক্ষিত হয়। শীতকালে উত্তরাংশের উত্তাপ প্রায় ২১° সেঃ পর্যন্ত নামিয়া আসে এবং দক্ষিণাংশের উত্তাপ আরও নীচে নামে—প্রায় ১০° সেঃ পর্যন্ত।

বনভূমি ও জলবায়ুর বিভিন্নতা অনুসারে অস্ট্রেলিয়াকে মোটামুটি চারিভাগে বিভক্ত করা যায়:—(ক) উত্তরাংশের মৌসুমী অঞ্চল—এখানে গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ অধিক এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। এখানে চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি বিদ্যমান। (খ) দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বাংশের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল—এখানকার শীতকালীন বৃষ্টিপাত, উত্তাপযুক্ত ও শুষ্ক গ্রীষ্মকাল ও মৃদু শীতকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে। (গ) পূর্ব উপকূলের চৈনিক জলবায়ু অঞ্চল—এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী হওয়ায় পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। (ঘ) পশ্চিমাংশের মালভূমির মহাদেশীয় জলবায়ু অঞ্চল—এখানে উষ্ণ মরুদেশীয় জলবায়ু বিদ্যমান; এই অঞ্চলে নিকৃষ্ট তৃণ জন্মিয়া থাকে। (ঙ) মধ্যভাগের সমভূমির মহাদেশীয় জলবায়ু অঞ্চল—এখানে অল্প বৃষ্টিপাত ও অধিক উত্তাপ পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলের উত্তরাংশে স্যাভানা তৃণভূমি এবং মারে-ডার্লিং অববাহিকায় নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি (Downs) বিদ্যমান। (চ) টাসমানিয়া দ্বীপে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের দরুন মিশ্র বনভূমি দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় ৬৬ লক্ষ হেক্টর-ব্যাপী বনভূমি বিদ্যমান। এই দেশের বৃক্ষাদির মধ্যে ইউক্যালিপটাস্, জারা, কারি, সীডার, পাইন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মৃত্তিকা (Soil)—অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে নানাপ্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। যথা,

অঞ্চল	**রাজ্য**	**মৃত্তিকা**
উত্তরাঞ্চল	উঃ অস্ট্রেলিয়া,	পডসল্-জাতীয়;
	উঃ কুইন্সল্যাণ্ড,	কৃষিকার্যের
	পঃ অস্ট্রেলিয়ার উত্তারাংশ	অনুপযুক্ত
পূর্বাঞ্চল	কুইন্সল্যাণ্ডের অধিকাংশ,	কৃষ্ণকায় চেস্টনাট;
	নিউ সাউথ ওয়েল্স ও ভিক্টোরিয়া	উর্বর, কৃষিকার্যের উপযোগী

অঞ্চল	রাজ্য	মৃত্তিকা
দক্ষিণাঞ্চল	পঃ অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাংশ, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	চুনপ্রধান মৃত্তিকা ; উর্বর, কৃষিকার্যের উপযোগী
মধ্যাঞ্চল	পঃ অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাংশ ও মধ্যাংশ, দঃ অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশ	মরুভূমির বালুকাময় মৃত্তিকা ; কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত
পার্বত্য অঞ্চল	নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ও কুইন্সল্যাণ্ডের কিয়দংশ	প্রাচীন ভঙ্গিল শিলাস্তর ; বনভূমির উপযোগী

লোকবসতি (Demographic Pattern)—১৮৫০ সালে অস্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণখনি আবিষ্কারের পূর্বে এখানকার লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৪ লক্ষ। স্বর্ণখনি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ হইতে বহুলোক এখানে আসিয়া বসবাস করিতে শুরু করে। এই সকল শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বর্তমানে এই দেশের লোকসংখ্যা ১ কোটি ১১ লক্ষ ; আয়তন ৭৭,১০,৪০৯ বর্গ-কিলোমিটার। প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে লোকবসতি দেড় জনেরও কম।

অস্ট্রেলিয়ার লোকবসতি

রাজ্য ও রাজধানী	আয়তন (বর্গ-কিলোমিটার)	লোকসংখ্যা (লক্ষ) (১৯৬৩)	প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে লোকসংখ্যা
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স (সিডনী)	৮,০২,০৮১	৩৭.৫	৪.৬৭
ভিক্টোরিয়া (মেলবোর্ণ)	২,২৪,৮০৪	২৮	১২.৩৮
কুইন্সল্যাণ্ড (ব্রিসবেন)	১৭,৩৮,০০৩	১৫.৫	০.৮২
দঃ অস্ট্রেলিয়া (অ্যাডিলেড)	৯,৮৫,১৭৯	৯.২	০.৯৩
পঃ অস্ট্রেলিয়া (পার্থ)	২৫,২৯,৬৮২	৭.৮	০.২৮
টাসমানিয়া (হোবার্ট)	৬৬,৯৫১	৩.৪	৫.০৬
উত্তর অঞ্চল (ডারউইন)	১৩,৫৭,২৭৫	.২	০.০১
রাজধানী অঞ্চল (ক্যানবেরা)	২,৪৩৪	.৪	১৬.৪০
	৭৭,১০,৪০৯	১০২	

এই দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের তুলনায় লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম। অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনবিরল দেশ। ইংরেজগণ এখানে আসিয়া

সরকার গঠন করিয়াই **"শ্বেত অস্ট্রেলিয়া নীতি" (White Australia Policy)** প্রবর্তন করিয়া অশ্বেতকায় লোকদের বসবাস নিষিদ্ধ করিয়াছে। এইজন্য ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের লোকেরা এই দেশে আসিয়া বসবাস করিতে পারে না ; ইহার ফলে ক্রান্তীয় অস্ট্রেলিয়ার উন্নতি ব্যাহত হইয়াছে। দুইটি কারণে এই নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, কৃষ্ণকায় লোকদের সহিত শ্বেতকায় লোকেরা বাস করিতে ঘৃণা-বোধ করে। দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে এশিয়ার লোকেরা অস্ট্রেলিয়ায় আসিয়া এখানকার সম্পদ ভোগ করিতে না পারে। দ্বিতীয় কারণটি এই নীতি প্রবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে ইংরেজগণই এখানকার প্রধান অধিবাসী

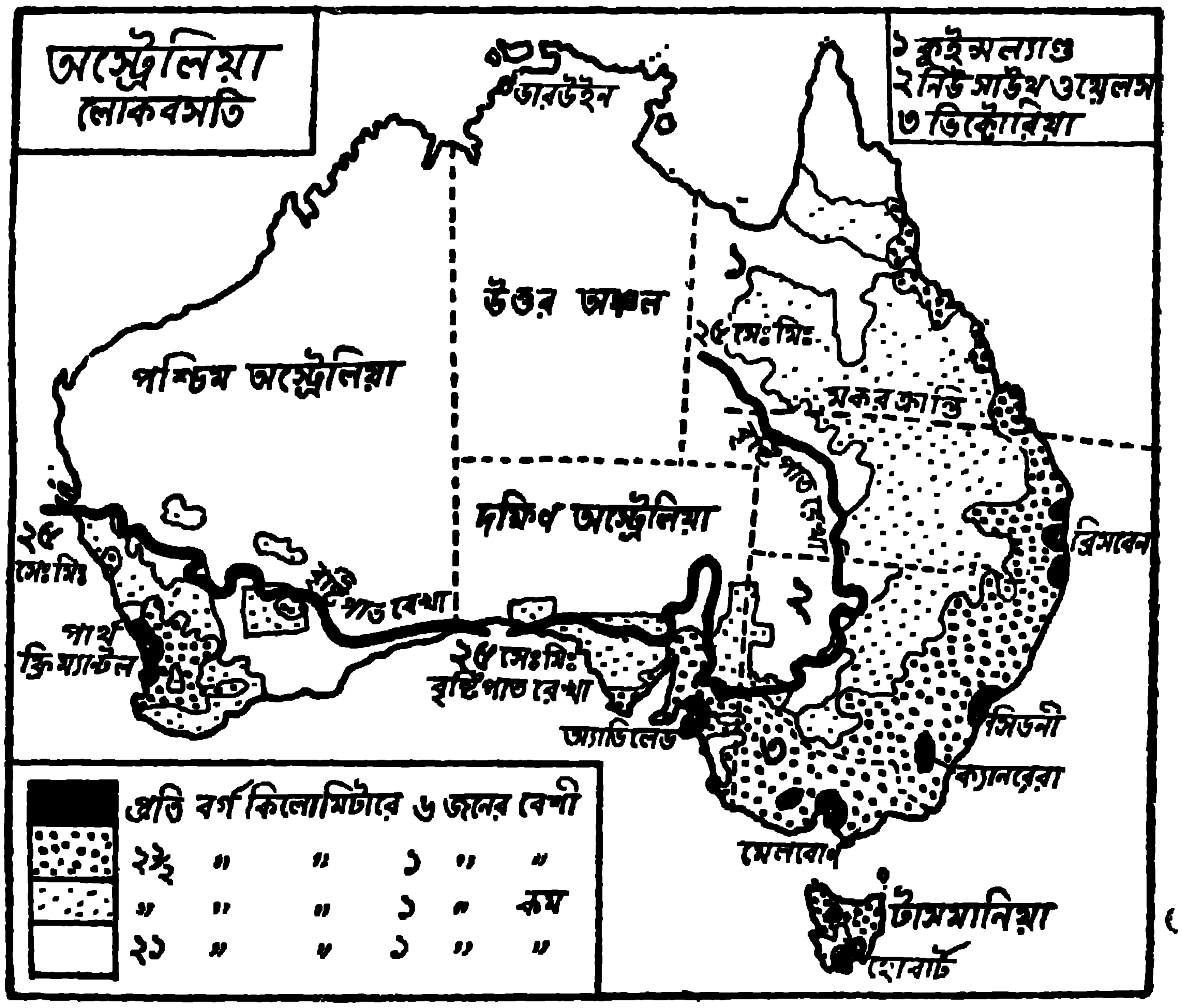

(শতকরা ৯৮ জন) এবং সরকারের কর্তা। অনেকেই মনে করেন যে, 'শ্বেত অস্ট্রেলিয়া নীতি' প্রবর্তন না করিলে আরও এক কোটি লোক ভালো-ভাবে এই দেশে উন্নত জীবনমান রক্ষা করিয়া বসবাস করিতে পারিত।

অস্ট্রেলিয়ায় লোকবসতির ঘনত্ব সর্বত্র সমান নহে। অর্থনৈতিক সম্পদ এবং বৃষ্টিপাত এই দেশের বসতি-ঘনত্বের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বৃষ্টিপাতের উপর কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদের উন্নতি নির্ভরশীল।

যে সকল স্থানে অন্ততঃ ২৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয়, সেই সকল অঞ্চলে কৃষিকার্য অথবা পশুপালন উন্নতি লাভ করিয়াছে। অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে কৃষিকার্যের প্রাধান্য এবং কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে তৃণভূমির প্রাধান্য দেখা যায়। তৃণভূমির উপর পশুপালন নির্ভরশীল বলিয়া তৃণভূমি অঞ্চলে পশুপালন উন্নতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং দেখা যায় ২৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত-রেখা এই দেশকে দুইটি অংশে বিভক্ত করিয়াছে—সমৃদ্ধিশালী **জনবহুল অস্ট্রেলিয়া** এবং **বিরল বসতিযুক্ত অস্ট্রেলিয়া**। দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব অস্ট্রেলিয়া (ভিক্টোরিয়া, নিউ সাউথ ওয়েল্‌স এবং কুইন্সল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্বাংশ), টাসমানিয়া, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার দঃ-পূঃ অংশ, রাজধানী ক্যানবেরা অঞ্চল, এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনি অঞ্চল **ঘনবসতি** বা নাতিনিবিড় বসতিপূর্ণ অঞ্চল। কারণ এই সকল অঞ্চলে খনিজ সম্পদ, প্রাণিজ সম্পদ ও কৃষিজ দ্রব্য সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয়। এই সকল স্থান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় শ্বেতকায় লোকদের বসবাসের উপযোগী। এই দেশের শতকরা ৯৫ জন লোক নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বাস করে; তন্মধ্যে ভিক্টোরিয়া রাজ্যে বসতি-ঘনত্ব সর্বাধিক। দঃ-পূর্ব এবং দঃ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া মৃদু জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া এই অঞ্চলে স্বর্ণ, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। সুতরাং এই অঞ্চলে ঘন লোকবসতি হওয়াই স্বাভাবিক। দঃ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে শ্বেতাঙ্গগণ সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করায় এবং পশুপালন ও কয়লা উত্তোলনের উন্নতি হওয়ায় লোকবসতি অত্যন্ত ঘন।

বিভিন্ন কারণে এই দেশের **শহরাঞ্চলে লোকসংখ্যা সর্বাধিক**। ছয়টি রাজ্যের রাজধানীতে দেশের মোট লোকসংখ্যার অর্ধেক বাস করে। আদিবাসীদের ভয়, শহরাঞ্চলে শিল্পের কেন্দ্রীভবন, পরিবহণের সুবন্দোবস্ত এবং খনিজ সম্পদের নৈকট্যের জন্য শহরাঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব সর্বাধিক।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় মরুভূমি থাকায় এবং বৃষ্টিপাতের অভাবে কৃষিকার্য সম্ভবপর না হওয়ায় এখানে **বিরল লোকবসতি** পরিলক্ষিত হয়। শুধু খনি অঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব কিছু বেশী। খনি অঞ্চলে স্বর্ণ, লৌহ আকরিক, বক্সাইট ও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায় বলিয়া এবং ইহা এশিয়া ও আফ্রিকার বাজারের নিকটবর্তী বলিয়া ইহার উন্নতি সহজসাধ্য হইয়াছে। কিন্তু কয়লার অভাব ও পূর্ব অস্ট্রেলিয়া হইতে ইহার দূরত্ব কিছুটা অসুবিধার

সৃষ্টি করে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশ এবং মধ্য-অস্ট্রেলিয়ায় বৃষ্টিপাতের অভাবে কৃষিকার্য হয় না বলিয়া এখানেও বিরল লোকবসতি বিদ্যমান।

কৃষিকার্য (Agriculture)—অস্ট্রেলিয়ার মোট কৃষি-জমির পরিমাণ প্রায় ৮৪ লক্ষ হেক্টর—সমগ্র দেশের শতকরা ১'৫ ভাগ মাত্র। বৃষ্টিপাতযুক্ত উর্বর নদী-উপত্যকায় অধিকাংশ কৃষিকার্য হইয়া থাকে। সেইজন্য উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কৃষিকার্য সীমাবদ্ধ। এই দেশের শতকরা ৩০ জন লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত। লোকসংখ্যা কম বলিয়া কৃষিক্ষেত্রে বহুদিন হইতে কৃষি-যন্ত্রপাতি নিয়োজিত হইতেছে। সম্পূর্ণভাবে দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত বলিয়া কৃষিজ দ্রব্যের বাণিজ্যে এই দেশের কিছুটা একচেটিয়া সুবিধা রহিয়াছে। কারণ, উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল এবং সাধারণতঃ কম শস্য উৎপন্ন হয়, সেই সময় অস্ট্রেলিয়ায় গ্রীষ্মকাল এবং প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল ও শস্যাভাব, সেই সময় এই দেশ হইতে প্রচুর কৃষিজ দ্রব্য উচ্চমূল্যে উত্তর গোলার্ধের দেশসমূহে রপ্তানি হইয়া থাকে।

কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩-৬৪)

	কৃষি-জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)
গম	৫৫	৯০
যই	১৪	১২'৫
যব	১০'৯	১০
ভুট্টা	'৮৩	১'৯
ইক্ষু	১'৫	১০৪

গম অস্ট্রেলিয়ার সর্বপ্রধান ফসল; মোট কৃষি-জমির অর্ধেকের বেশী জমিতে গমের চাষ হইয়া থাকে। এই দেশে শীতকালেই অধিকাংশ গম উৎপন্ন হয়। মারে-ডার্লিং উপত্যকায় ভিক্টোরিয়া ও নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে অধিকাংশ গম উৎপন্ন হয়। ভূমধ্যসাগরীয় দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশেও গম উৎপন্ন হয়। ১৮৯৭ সাল হইতেই এই দেশের অধিকাংশ গম বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। কারণ, এখানকার উৎপাদনের তুলনায় লোকসংখ্যা অনেক কম। অধিকাংশ গম বৃটেনে প্রেরিত হয়। জাপান প্রভৃতি দেশেও এই দেশের গম রপ্তানি হয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় এই দেশে গম-উৎপাদন কয়েকমাস পূর্বে হওয়ায় বিদেশে রপ্তানির পক্ষে সুবিধা

হয়। বর্তমানে গম-রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে গমের পরেই **যই**-এর স্থান। শীতল ও আর্দ্র অঞ্চলে যই উৎপন্ন হয়। ভিক্টোরিয়া রাজ্যে অধিকাংশ যই উৎপন্ন হয়। মোট যই উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ মনুষ্যখাদ্য হিসাবে এবং ৮৫ ভাগ পশু-খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। **যব** প্রধানতঃ পূর্বাঞ্চলে উৎপন্ন হয়। ইহার অধিকাংশই বৃটেনে রপ্তানি হয়। কুইন্সল্যাণ্ডে ও নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে উৎপন্ন **ভুট্টা** মনুষ্যখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উত্তর-পূর্ব অংশের আর্দ্র অঞ্চলের ভুট্টা প্রধানতঃ পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কিছু কিছু ভুট্টা এই দেশে আমদানি করা হয়। ভিক্টোরিয়ায় **আলুর** চাষ হয়। উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার ক্রান্তীয় অঞ্চলে **তুলা** ও **ইক্ষু** উৎপন্ন হয়। কুইন্সল্যাণ্ডের উপকূল-সংলগ্ন সমভূমিতে অধিকাংশ ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ইক্ষু-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এখানকার অধিকাংশ ইক্ষু-চিনি বিদেশে রপ্তানি হয়। ভূমধ্যসাগরীয় দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় আপেল, আঙ্গুর, কমলা, পীচ, অ্যাপ্রিকট প্রভৃতি **ফলের** চাষ হয়। এই অঞ্চলের আঙ্গুর ফলের সাহায্যে মদ্যশিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। **ধান** উৎপাদনে অস্ট্রেলিয়া ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতেছে। নিউ সাউথ ওয়েলসে সেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে মারে-ডার্লিং উপত্যকায় ইহার প্রথম চাষ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ধান-উৎপাদনকারী দেশসমূহ জাপানীদের অধীনে চলিয়া যায়; সেই সময় অস্ট্রেলিয়া একটি উল্লেখযোগ্য চাউল-রপ্তানিকারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

পশুপালন (Pastoral Industry)—পশুপালনে অস্ট্রেলিয়া খুব উন্নত। কম বৃষ্টিপাতের জন্য দেশের তিন-চতুর্থাংশ স্থান কৃষিকার্যের অযোগ্য হইলেও, ইহার কিয়দংশ পশুপালনের উপযোগী। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া পশুপালনে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ।

পশুপালন (১৯৬৪)

মেষ	১৬.৭ কোটি	শূকর	.১৬ কোটি
গবাদি পশু	১.৯ "		

প্রধানতঃ দুইটি কারণে এই দেশ পশুপালনে উন্নতি লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কৃষিকার্যের উপযোগী না হইলেও তৃণভূমির

সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এই দেশের ডাউনস্ (Downs) তৃণভূমি পশুপালনের জন্য বিখ্যাত। দ্বিতীয়তঃ, লোকসংখ্যা কম থাকায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অল্পসংখ্যক লোক দ্বারা বহু পশু পালন করা যায়। একজন মেষপালক ঘোড়ায় চড়িয়া দুই হাজার হেক্টর জমিতে দশ হাজার মেষ চরাইতে পারে। বৃষ্টিপাত কম হইলেও আর্টেজিয়ান কূপের সাহায্যে মেষপালন-ক্ষেত্রের জলের চাহিদা মিটানো হয়।

অস্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক জীবনে পশুপালন একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। মূল্য হিসাবে এই দেশের মোট রপ্তানির শতকরা ৩৮ ভাগ

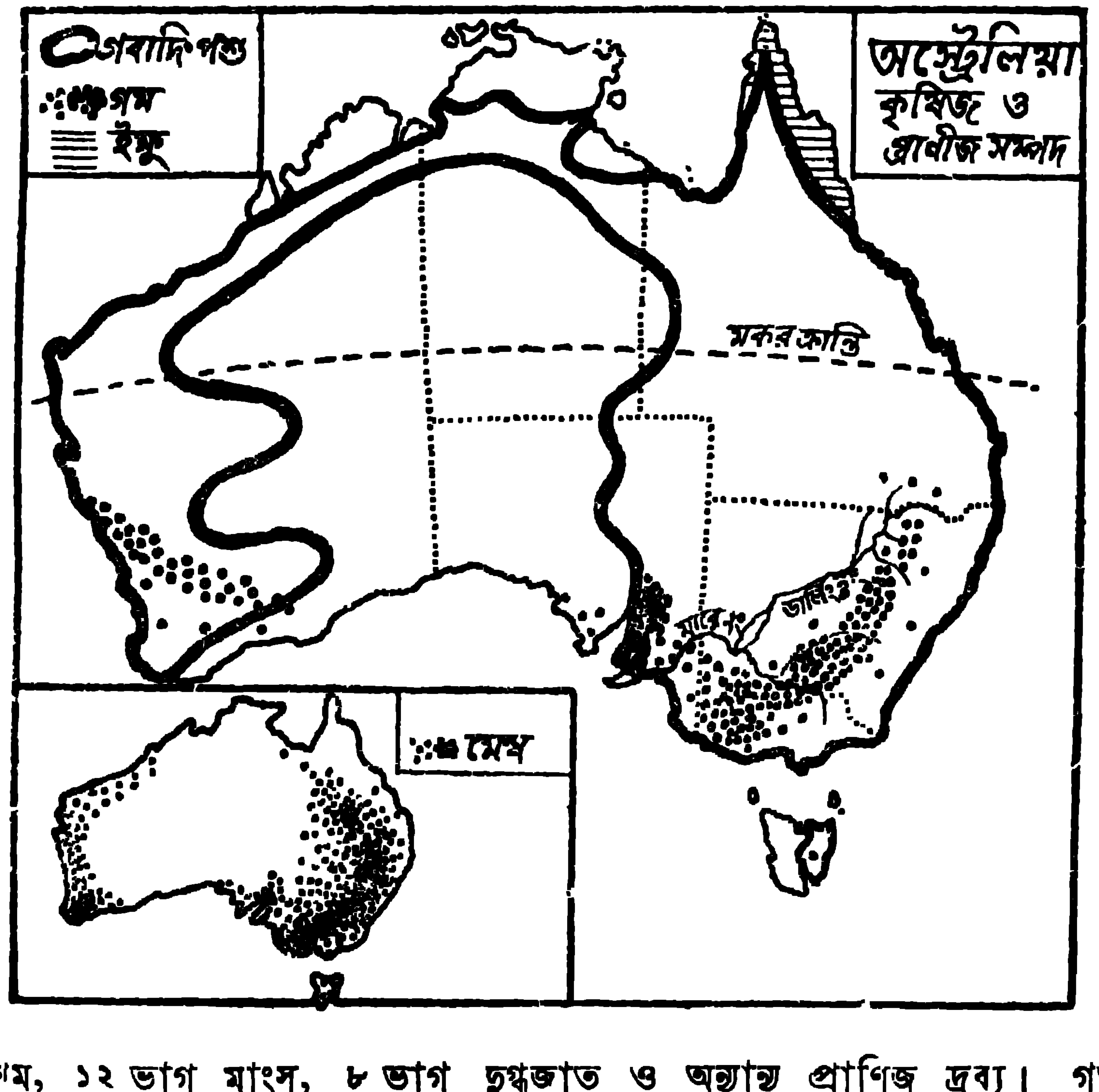

পশম, ১২ ভাগ মাংস, ৮ ভাগ দুগ্ধজাত ও অন্যান্য প্রাণিজ দ্রব্য। গত ১০০ বৎসরে এই দেশ মোট যত স্বর্ণ আহরণ করিয়াছে তাহার তিন-চতুর্থাংশের মূল্য এই দেশের এক বৎসরের পশমের মূল্যের সমান। পূর্বে এই দেশ প্রধানতঃ বিভিন্ন পশু এবং কাঁচা পশম, চর্ম প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি করিত; কিন্তু বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পশুজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার ও সংরক্ষণ করিবার শিল্প গড়িয়া উঠায় বর্তমানে পনীর, মাখন,

সংরক্ষিত মাংস, গুঁড়া দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

প্রাণিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৪)

(হাজার মেঃ টন)

মাখন	১৭	দুগ্ধ	৬৯৩৭
পনীর	৫	গো-মাংস	১৩৮
পশম	৮০৯	মেষ-মাংস	৩০৭

মেষপালনে অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এখানকার অধিকাংশ মেষ পশমের জন্য প্রতিপালন করা হয় বলিয়া এই দেশ পশম-উৎপাদনেও পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এখানকার অধিকাংশ মেষ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 'মেরিণো'-জাতীয় (Merino sheep)। নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্, ভিক্টোরিয়া, কুইন্সল্যাণ্ড, পশ্চিম ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় মেষপালন হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর এই দেশে প্রায় ৭'৩৩ লক্ষ মেঃ টন পশম উৎপন্ন হয়; ইহার অধিকাংশ পশম বৃটেনে প্রেরিত হয়। ফ্রান্স, জাপান, বেলজিয়াম, জার্মানী প্রভৃতি দেশ এখানকার পশমের অন্যান্য ক্রেতা। পশম-রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এখানকার পশম অধিকাংশই কাঁচা অবস্থায় রপ্তানি হয়; বর্তমানে গিলং, সিডনী প্রভৃতি স্থানে পশমবয়ন-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। মাংস এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির জন্য এখানে **গবাদি পশুপালন** হইয়া থাকে। কুইন্সল্যাণ্ড, উত্তর অঞ্চল, ভিক্টোরিয়া ও নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের উপকূলভূমি এবং দঃ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় গবাদি পশুপালন হইয়া থাকে। এখানকার যই ও ভুট্টা গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত কম্ বলিয়া এই দেশ দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। গো-মাংস অধিকাংশই স্থানীয় চাহিদা মিটাইতে ব্যয় হয়; শতকরা ১০ ভাগ মাত্র বিদেশে রপ্তানি হয়। এখানকার **অশ্ব** অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর; অধিকাংশ অশ্ব কৃষিকার্যে নিয়োজিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ **শূকর** পাওয়া যায় ভিক্টোরিয়া, নিউ সাউথ ওয়েল্‌স এবং কুইন্সল্যাণ্ডে। এই দেশ প্রচুর পরিমাণে শূকর-মাংস রপ্তানি করে।

খনিজ সম্পদ (Minerals)—অস্ট্রেলিয়ার প্রাথমিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে এখানকার খনিজ সম্পদ। এই দেশের খনিজ সম্পদ, বিশেষতঃ স্বর্ণ

ইংরেজগণকে এখানে আসিতে উৎসাহিত করে। স্বর্ণ বিদেশীয়গণকে প্রথমে আকৃষ্ট করিলেও ক্রমশঃ স্বর্ণ অপেক্ষা কয়লার গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় ১০ লক্ষ লোক খনিজ সম্পদ-আহরণে নিযুক্ত আছে।

খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩)

(লক্ষ মেঃ টন)

কয়লা	২৫২	লৌহ আকরিক	২৭
স্বর্ণ (মেঃ টন)	৩৫	দস্তা	১'৮
রৌপ্য („)	৫০৭	তাম্র	১'০১
সীসা	৩	রাং	'২৬

কয়লা অস্ট্রেলিয়ার সর্বপ্রধান খনিজ সম্পদ। এই দেশের সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ১,২০০ কোটি মেঃ টন। ইহার বার্ষিক উৎপাদনের মূল্য অন্যান্য সকল খনিজ দ্রব্যের মোট মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। এই

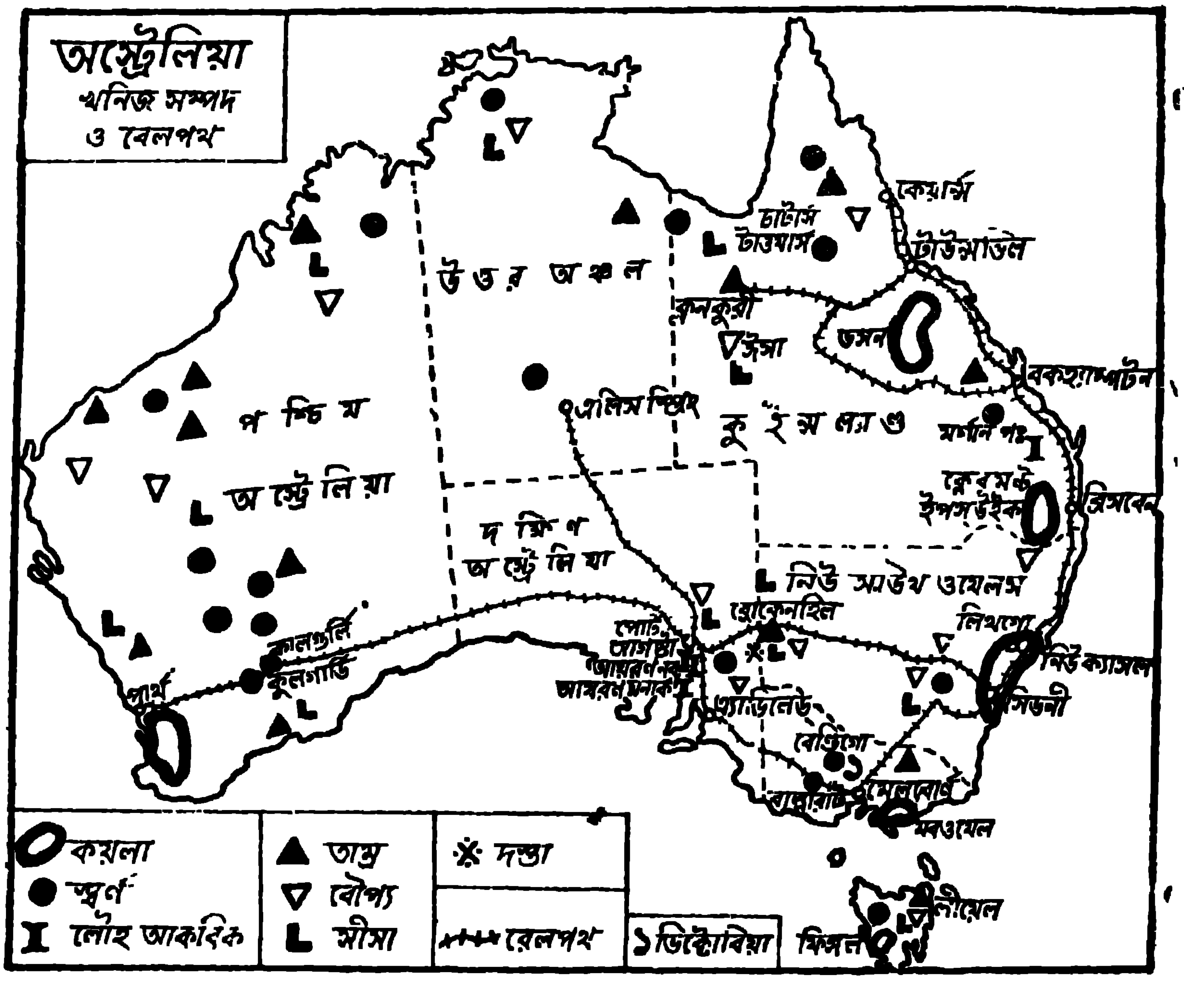

দেশের মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ পাওয়া যায় নিউ সাউথ ওয়েল্সে। এই রাজ্যে নিউক্যাস্ল্, লিথগো ও ইল্লাওয়ালা কয়লাখনিতে

অধিকাংশ কয়লা পাওয়া যায়। সিডনীকে কেন্দ্র করিয়া এই সকল খনি অবস্থিত। নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের অ্যাশফোর্ডে এবং কুইন্সল্যাণ্ডের ডসন উপত্যকায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়; কুইন্সল্যাণ্ডের ইপস্‌উইক্ ও ক্লেরমণ্টে কয়লা পাওয়া যায়। টাসমানিয়ার ফিঙ্গল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার জন্য বিখ্যাত। ভিক্টোরিয়ার মরওয়েল্ অঞ্চলে লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায়; ইহা দ্বারা ব্রিকুইট ও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

স্বর্ণ এই দেশের অন্যতম প্রধান সম্পদ। মোট উৎপাদনের শতকরা ৪ ভাগ স্বর্ণ উৎপন্ন করিয়া অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কুলগার্ডি ও কালগুর্লি, ভিক্টোরিয়ার বাল্লারাট ও বেণ্ডিগো, কুইন্সল্যাণ্ডের চার্টার্স টাওয়ার্স ও মর্গান পর্বতে স্বর্ণখনিসমূহ অবস্থিত। অর্ধেকের বেশী স্বর্ণ উত্তোলিত হয় কুলগার্ডি ও কালগুর্লিতে; এই দুইটিস্থান মরুভূমিতে অবস্থিত হইলেও নলযোগে অন্যস্থান হইতে জল আনিয়া এখানে লোক বাস করে। অস্ট্রেলিয়ার পুরাতন স্বর্ণখনিসমূহ ক্রমশঃই নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে এবং শীঘ্রই স্বর্ণ-উৎপাদনে এই দেশের কোন উল্লেখযোগ্য অবদান থাকিবে না।

লৌহ আকরিক পাওয়া যায় প্রধানতঃ দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার 'আয়রণ নব' ও 'আয়রণ মনার্ক' অঞ্চলে। নিকটবর্তী স্থানে কয়লা না থাকায় নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের কয়লাখনির নিকট ইহা লইয়া যাওয়া হয়।

নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের ব্রোকেন হিল অঞ্চলে, কুইন্সল্যাণ্ডের চিলাগো ও ঈসা পর্বতাঞ্চলে এবং টাসমানিয়ার ফারেল পর্বত, কীয়েল পর্বত ও জীহানে **রৌপ্য** ও **সীসা** পাওয়া যায়। ব্রোকেন হিল অঞ্চলে **দস্তা** পাওয়া যায়। কুইন্সল্যাণ্ডের ক্লনকুরী, টাসমানিয়ার কীয়েল পর্বত ও নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের ব্রোকেন হিল অঞ্চলে **তাম্র** পাওয়া যায়। টাসমানিয়া, নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ও কুইন্সল্যাণ্ডের হার্বার্টন ও চিলাগো অঞ্চলে **রাং** (Tin) পাওয়া যায়।

ইহা ছাড়া লবণ, জিপসাম, কোবাল্ট, অ্যান্টিমনি, খনিজ তৈল, আর্সেনিক, মলিবডেনাম, প্লাটিনাম, উল্‌ফ্রাম প্রভৃতি নানাবিধ খনিজ দ্রব্য এই দেশে অল্পবিস্তর পাওয়া যায়।

জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে অস্ট্রেলিয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। সম্প্রতি ২০ কোটি অস্ট্রেলীয় পাউণ্ড স্টার্লিং ব্যয়ে 'ডসন উপত্যকা পরিকল্পনা' নামে কুইন্সল্যাণ্ডে একটি জলবিদ্যুৎ ও সেচ-পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে।

এখানে পার্বত্য অঞ্চল হইতে নিঃসৃত বিভিন্ন নদীর জলস্রোতের উপর বাঁধ দিয়া ২৬ লক্ষ কিলোওয়াট্ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইবে এবং ১'৬ লক্ষ হেক্টর-ফুট জল সংগ্রহ করিয়া কৃষিকার্যে নিয়োজিত করা হইবে। মারে নদীর জল সংরক্ষিত করিয়া বিভিন্ন স্থানে জলসেচনের কাজ চলে। ইহা ছাড়া মুরুমবিজি নদীর উপর ব্যারেন জ্যাক পরিকল্পনা মারফত ৫,০০০ কিলোওয়াট্ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। ভিক্টোরিয়ার লোফ রুবিকন পরিকল্পনার মারফত প্রায় ২৫,০০০ কিলোওয়াট্ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। টাসমানিয়ার ওয়াড্ডামানা, মার্গারেট হ্রদ ও লাউনসেস্টনে বড় বড় জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র অবস্থিত; এখানে প্রায় ৭ লক্ষ কিলোওয়াট্ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারে। এখানকার অধিকাংশ শিল্প জলবিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। এই দেশের আর্টেজিয়ান অঞ্চলে গর্ত করিলে জল বাহির হইয়া আসে। ইহা কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে জলের অভাব কিছুটা মোচন করে। এই জলে লবণের পরিমাণ বেশী বলিয়া ইহা সর্বত্র জলসেচের উপযোগী নহে।

শ্রমশিল্প (Industries)—অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন কাঁচামাল (পশম, চর্ম, লৌহ আকরিক) পাওয়া গেলেও বিভিন্ন কারণে এই দেশ বহুদিন শিল্পে অনুন্নত ছিল। শক্তিসম্পদের অপ্রাচুর্য, 'শ্বেত অস্ট্রেলিয়া নীতি', শ্রমিকের অপ্রতুলতা, পরিবহণের অসুবিধা, অধিকাংশ স্থানের প্রতিকূল জলবায়ু, কৃষি ও পশুপালনের উপর নির্ভরশীলতা প্রভৃতি কারণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বপর্যন্ত এখানকার শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। আরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণে এই দেশ শিল্পোন্নত হয় নাই; এখানকার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ বিত্তশালী ইংরেজ; ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য স্বদেশের (বৃটেনের) উন্নতি। সেইজন্য ইহারা এই দেশের কাঁচামাল (পশম, চর্ম ইত্যাদি) বৃটেনে রপ্তানি করিয়া এবং বৃটেন হইতে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করিয়া সেই দেশের শিল্পের উন্নতিসাধনে সাহায্য করিত। এইজন্য অস্ট্রেলিয়ার শিল্পের উন্নতির জন্য ইহাদের কোন আগ্রহ ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটেনের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার যোগাযোগ বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ঐ দেশের সঙ্গে মালপত্র আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া যায়। সেইজন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে অস্ট্রেলিয়ার সরকার সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য করিয়া, আর্থিক সাহায্য দিয়া, কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া এবং পরিবহণ-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিয়া দেশের শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়াছে।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে নানাপ্রকার শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে এই দেশে ৫৩,২০০টি কারখানায় প্রায় ১০·৬৩ লক্ষ লোক কাজ করে। এখানকার অধিকাংশ শিল্প শহরাঞ্চলে অবস্থিত।

অস্ট্রেলিয়ার **লৌহ ও ইস্পাত শিল্প** ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে; অত্যন্ত কম খরচে এখানে ইস্পাত উৎপন্ন হয়; এই দেশের মোট ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩৭ লক্ষ মেঃ টন। এই দেশের ইস্পাতশিল্পে প্রায় ৩·৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে; সিডনী অঞ্চলেই এই শিল্প প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় কয়লা ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার লৌহ আকরিকের উপর এখানকার শিল্প নির্ভরশীল। সিডনী ও মেলবোর্ণ অঞ্চলে **জাহাজ-নির্মাণ-শিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বাঞ্চলে পশম ও কয়লা পাওয়া যায় বলিয়া **পশমবয়ন-শিল্প** এই অঞ্চলেই উন্নতি লাভ করিয়াছে। কুইন্স-ল্যাণ্ডের ইপস্‌উইক এই দেশের শ্রেষ্ঠ পশমবয়ন-শিল্পকেন্দ্র। পশম উৎপাদনের তুলনায় পশমবয়ন-শিল্প আদৌ উন্নতি লাভ করে নাই। (এই সম্বন্ধে 'পশুপালন' অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী দ্রষ্টব্য।) এই তিনটি প্রধান শিল্প ছাড়াও এই দেশে চিনিশিল্প, চর্মশিল্প, কাগজশিল্প, রেয়নশিল্প, যন্ত্রপাতি, মোটর-গাড়ী ও ট্র্যাক্টর নির্মাণ-শিল্প মোটামুটি উন্নতি লাভ করিয়াছে।

পরিবহণ-ব্যবস্থা (Communications)—অস্ট্রেলিয়া এখনও পরিবহণ-ব্যবস্থায় বিশেষ উন্নত নহে। এই দেশের অধিকাংশ লোক নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্বাংশে বাস করে। সেইজন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের পরিবহণ-ব্যবস্থা মোটেই উন্নত নহে। **রেলপথ** কিছুটা উন্নতি লাভ করিলেও ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে, বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন গেজের রেলপথ বিদ্যমান। সেইজন্য এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে মালপত্র প্রেরণে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এই দেশের রেলপথের দৈর্ঘ্য ৫৮,০০০ কিলোমিটার। এখানকার রেলপথসমূহ প্রধানতঃ শহর ও বন্দরের সহিত খনিজ, প্রাণিজ ও কৃষিজ সম্পদের উৎপাদনকেন্দ্রসমূহকে যুক্ত করিয়াছে। প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব রেলপথ আছে। ১৯২৭ সালে এই দেশে একটি মহাদেশীয় রেলপথ নির্মিত হয় (২০২ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। ইহা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী পার্থ বন্দর হইতে পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া বিখ্যাত স্বর্ণখনি-কেন্দ্র কালগুর্লি হইয়া অ্যাডিলেড বন্দরে পৌঁছিয়াছে। এই বন্দর হইতে একটি লাইন ব্রোকেন হিল ও সিডনী হইয়া ব্রিসবেন পর্যন্ত গিয়াছে। অপর একটি লাইন অ্যাডিলেড

হইতে মেলবোর্ণ শহরে গিয়াছে। ব্রিসবেন হইতে বর্তমানে এই রেলপথে রকহ্যাম্পটন হইয়া ক্লনকুরী পর্যন্ত যাওয়া যায়। পোর্ট আগস্টা হইতে একটি লাইন উত্তরদিকে এলিস্ স্প্রিংস পর্যন্ত গিয়াছে। এই রেলপথের সাহায্যে এই দেশের কৃষিজ, প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদ দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বিদেশে রপ্তানির জন্য বিভিন্ন বন্দরে প্রেরিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার **রাজপথ** এখনও বিশেষ উন্নত নহে; ইহার দৈর্ঘ্য মাত্র ৮.০৫,০০০ কিলোমিটার। দক্ষিণ-পূর্বাংশের মারে-ডার্লিং উপত্যকা ভিন্ন অস্ট্রেলিয়ার অন্য কোন অঞ্চলে **জলপথ** বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ নদী ছোট এবং খরস্রোতা। মারে নদী এখানকার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নদী; ইহার শাখা ডার্লিং ও মুরুমবিজি মোটামুটি আভ্যন্তরীণ জলপথের উপযোগী। বর্ষাকালে মারে-উপত্যকায় অ্যাল্‌বিউরী হইতে ডার্লিং-উপত্যকার বোর্কি পর্যন্ত স্টীমার যাতায়াত করে। **বিমানপথে** অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহের সহিত যুক্ত। আভ্যন্তরীণ বিমানপথে ডাক-চলাচল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)—এই দেশের বাৎসরিক রপ্তানি-দ্রব্য ও আমদানি-দ্রব্যের মূল্য যথাক্রমে ৭৯'৫ কোটি ও ৭৯'৭ কোটি অস্ট্রেলীয় পাউণ্ড স্টার্লিং। **রপ্তানি**-দ্রব্যের মধ্যে পশম, গম, স্বর্ণ, চর্ম, মাখন, চিনি, মাংস, ফল, মদ্য, পনীর, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; রপ্তানি-দ্রব্যের মোট মূল্যের শতকরা ৩৮ ভাগ আসে শুধু পশম হইতে। রপ্তানি-দ্রব্যের অর্ধেকের বেশী যায় বৃটেনে। **আমদানি**-দ্রব্যের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রী, মোটর-গাড়ী, খনিজ তৈল, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়, ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য ও কাগজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শতকরা ৫০ ভাগের বেশী আমদানি-দ্রব্য আসে বৃটেন হইতে। বৃটেনের সহিত এই দেশের বাণিজ্য সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহার পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। বর্তমানে ভারতের সহিত বাণিজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা ছাড়া ইন্দোনেশিয়া, জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স, কানাডা প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য হইয়া থাকে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে অস্ট্রেলিয়া সর্বদা আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশী করে। বর্তমানে ক্রমশঃ আমদানি বৃদ্ধি পাইয়া রপ্তানির কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই দেশের রপ্তানি-দ্রব্যের অধিকাংশই কাঁচামাল এবং

আমদানি-দ্রব্যের অধিকাংশই শিল্পজাত দ্রব্য; বৃটেনের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা বেশী বাণিজ্য হয় বলিয়া এই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের নীতি বৃটেনের শিল্পোন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

অস্ট্রেলিয়ার রপ্তানি-দ্রব্য

(লক্ষ অস্ট্রেলীয় পাউণ্ড-স্টার্লিং)

পশম	৩,০২২	চিনি	৩২২
মাংস	৯৭২	চর্ম	২৩৬
গম	৬৮৪	খনিজ দ্রব্য	১৭০
মাখন	২৫০	ফল	২২২

এই দেশের পাঁচটি বন্দর মারফত অধিকাংশ বাণিজ্য সংঘটিত হইয়া থাকে; যথা, সিডনী, মেলবোর্ণ, অ্যাডিলেড, ব্রিসবেন ও পার্থ।

শহর ও বন্দর (Ports & Cities)—ক্যানবেরা অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী। **মেলবোর্ণ** ভিক্টোরিয়া রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। ইহা একটি বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। **সিডনী** নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের রাজধানী এবং অস্ট্রেলিয়ার সর্বপ্রধান বন্দর। এই বন্দরে একটি সুন্দর পোতাশ্রয় আছে। ইহা অস্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠ নৌ-বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। এই বন্দর রেলপথে ইহার পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত যুক্ত। ইহার মারফত গম, পশম, মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি হয় এবং যন্ত্রপাতি ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি হয়। **ব্রিসবেন** কুইন্সল্যাণ্ডের রাজধানী, বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। এই বন্দর মারফত পশম, মাংস, মাখন, চর্ম, ফল প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হয়। **অ্যাডিলেড** দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী। ইহার সন্নিকটস্থ পোর্ট অ্যাডিলেড মারফত পশম, গম, ময়দা, চর্ম, মাংস, তাম্র, ফল ও মদ্য রপ্তানি হইয়া থাকে। **পার্থ** পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী এবং শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার সন্নিকটস্থ বন্দরের নাম ফ্রিম্যাণ্টল্; ইহার মারফত পশম, স্বর্ণ ও কাষ্ঠ রপ্তানি হয়। **হোবার্ট** টাসমানিয়ার রাজধানী ও প্রধান রেলকেন্দ্র। সুন্দর পোতাশ্রয়যুক্ত এই বন্দরের মারফত পশম, রাং, রৌপ্য, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, ফল প্রভৃতি রপ্তানি হয়।

প্রশ্নাবলী

1. Describe and account for the distribution of population in Australia. and estimate the reasons for its population scarcity [C. U. Inter, 1949, '51]

উঃ—অস্ট্রেলিয়ার 'লোকবসতি (১৯৫ পৃঃ—১৯৮ পৃঃ) লিখ।

2. Discuss about the demographic pattern of Australia.

উঃ—অস্ট্রেলিয়ার 'লোকবসতি' (১৯৫ পৃঃ—১৯৮ পৃঃ) লিখ।

3 In recent years the commercial progress of Australia has been remarkable, How has this been possible ? [C. U. B. Com. 1949]

উঃ—অস্ট্রেলিয়ার 'বৈদেশিক বাণিজ্য' (২০৬ পৃঃ—২০৭ পৃঃ) এবং 'কৃষিজ, প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদ' (১৯৮ পৃঃ—২০৩ পৃঃ) সম্বন্ধে লিখ।

4. Australia has made rapid progress in developing the industry of food preservation. How has this been possible and which countries are her buyers ? [C. U. B. Com. 1951]

উঃ—অস্ট্রেলিয়ার 'পশুপালন' (১৯৯ পৃঃ—২০১ পৃঃ), 'শ্রমশিল্প' ও 'বৈদেশিক বাণিজ্য' (২০৪ পৃঃ—২০৭ পৃঃ) হইতে লিখ।

5. Discuss the development of east and west coasts of Australia and show how far the influence of climate is responsible for such development. [C. U. Inter, 1952]

উত্তর-সংকেত : বিভিন্ন কারণে পূর্ব উপকূল পশ্চিম উপকূল অপেক্ষা অনেক উন্নত ; কৃষিজ, প্রাণিজ, খনিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে পূর্ব উপকূল উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ভগ্ন সৈকতরেখা, গ্রেট ব্যারিয়ার রীফের অবস্থানের দরুন নিরাপদে জাহাজের চলাফেরা, অনুকূল জলবায়ু এবং মারে-ডার্লিং নদীর জন্য পূর্ব উপকূল উন্নতি লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল ধরিয়া শীতল স্রোত উত্তরাভিমুখে যায় বলিয়া পশ্চিম উপকূলে অত্যধিক শীত বিরাজমান ; কিন্তু পূর্ব উপকূলে উষ্ণ স্রোত দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হওয়ায় ইহা অধিকতর গরম থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর জন্য পূর্ব উপকূলে সারাবৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া কৃষিকার্যের উন্নতি হইয়াছে। এইজন্য পূর্ব উপকূলে ঘন লোকবসতি বিদ্যমান এবং পশ্চিম উপকূলে বিরল লোকবসতি দেখা যায়। গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের পশ্চিমে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলিয়া পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নগণ্য ; এই কয়েকটি বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া পূর্ব উপকূলের ও পশ্চিম উপকূলের কৃষিজ, প্রাণিজ, খনিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বর্ণনা কর।

6. "Australia leads in world's wool production, but she could not properly develop woollen industry."—Elucidate.

উঃ—'পশুপালন' অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী দ্রষ্টব্য।

7. Give an account of the mineral resources of Australia and indicate the chief mining areas of the country.

[C,. U. Three-year Degree Course, B. Com. 1965]

উঃ—'খনিজ সম্পদ' (২০১ পৃঃ—২০৩ পৃঃ) লিখ।

পঞ্চম অধ্যায়

আফ্রিকা (Africa)

আয়তনে আফ্রিকা পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে; এশিয়া মহাদেশের পরেই ইহার স্থান। ইহার আয়তন ২'৯৮ কোটি বর্গ-কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২২ কোটি। আয়তনেব তুলনায় এই মহাদেশেব লোকবসতি অনেক কম। এই মহাদেশের **আয়তন** ইউরোপের তিনগুণ, ভারত ও পাকিস্তানের ছয়গুণ এবং এশিয়া মহাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ। ইহার দৈর্ঘ্য ৮,০৫০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ৭,৪০০ কিলোমিটার। পূর্বে আফ্রিকা সুয়েজ যোজকেব মারফত এশিয়ার সঙ্গে এবং জিব্রাল্টারের মারফত ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সুয়েজ খাল কাটিবার পব ইহা এশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তনের ফলে জিব্রাল্টার প্রণালীর সৃষ্টি হওয়ায় ইউরোপ হইতেও এই মহাদেশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বর্তমানে আফ্রিকা সম্পূর্ণভাবে একটি বিশাল দ্বীপ।

লোকবসতি অনুসারে সাহারা মরুভূমি এই মহাদেশকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। মরুভূমির উত্তরে মুর ও আরবগণ বাস করে; ইহারা দক্ষিণ ইউরোপের জাতিসমূহের মতো চলিয়া থাকে; কিন্তু সাহারা মরুভূমির দক্ষিণাংশে প্রধানতঃ কৃষ্ণকায় নিগ্রো ও বান্টু জাতীয় লোক বাস করে। বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শ্বেতকায় ইউরোপীয়গণ গিয়া বসবাস করিতেছে। লোকবসতির ঘনত্ব সর্বত্রই অত্যন্ত কম। শহরাঞ্চলে ও খনি অঞ্চলে বসতি-ঘনত্ব কিছু বেশী। ইউরোপের নিকটবর্তী দেশ বলিয়া বৃটিশ, ডাচ, পর্তুগীজ, ফরাসী প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের কবলে আসায় আফ্রিকা এতদিন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে নাই। এই মহাদেশের বিভিন্ন কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ পশ্চিম ইউরোপীয় বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকে। ১৪৮৮ সালে প্রথমে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদিগণ এখানে আসিয়া বিস্তীর্ণ উপকূলভাগ দখল করে; তারপর আসে ১৬৩৭ সালে ডাচগণ, তারপর বৃটিশ, ফরাসী এবং সর্বশেষে ১৮৭৬ সালে আসে বেলজিয়ামের

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এখনও আফ্রিকার বহুদেশে এই সকল সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্ন সম্পদ আহরণ করিতেছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার নির্লজ্জ 'বর্ণবিদ্বেষ নীতির' (Apartheid policy) মতো বিভিন্ন নিয়ম চালু করিয়া আফ্রিকার অধিবাসীদের উপর বীভৎস অত্যাচার চালাইতেছে।

ভূ-প্রকৃতি (Physical Features)—আফ্রিকার উত্তরাংশে অ্যাটলাস্ পর্বত বিদ্যমান। ইহা ইউরোপীয় আল্পস্ পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণাংশ। ইহা ছাড়া

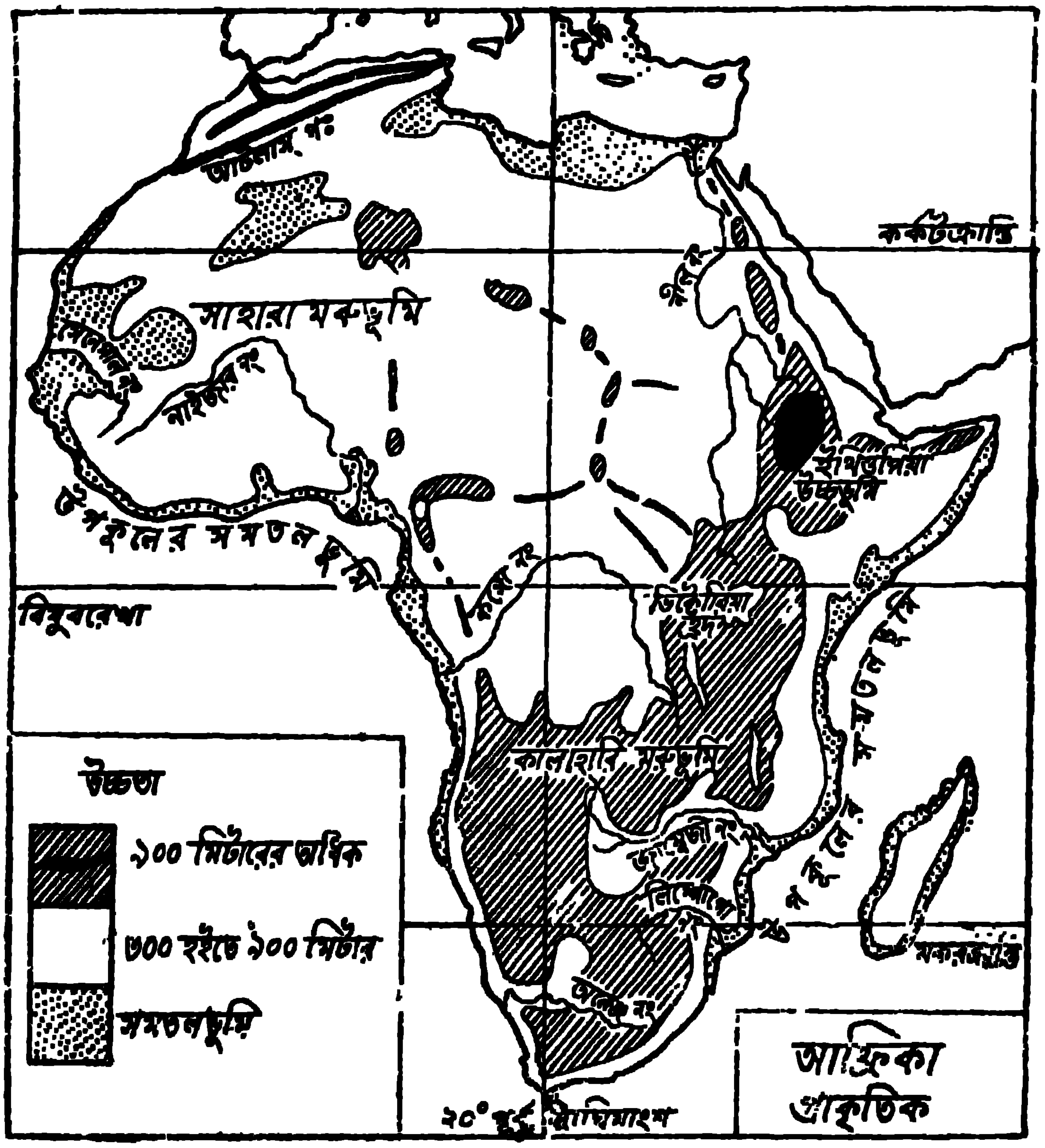

এই মহাদেশে সর্বত্রই মালভূমি দেখা যায়। শুধু সমুদ্রের উপকূলভাগে সংকীর্ণ সমতলভূমি বিদ্যমান। আফ্রিকার পূর্বাংশের ও দক্ষিণাংশের মালভূমির উচ্চতা ৯০০ মিটারের বেশী; পূর্বাংশের মালভূমির মধ্যে ইথিওপিয়ার উচ্চভূমি সর্বাপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু উত্তরাংশের মালভূমির উচ্চতা ৩০০ হইতে ৯০০ মিটার পর্যন্ত। বিভিন্ন নদী-উপত্যকা ও হ্রদ-সন্নিহিত স্থানের উচ্চতা

প্রায় ৩০০ মিটার। বিস্তীর্ণ সমতলভূমির অভাব এই মহাদেশের অনুন্নতির একটি প্রধান কারণ।

জলবায়ু (Climate)—বিষুবরেখা আফ্রিকার মধ্যভাগের উপর দিয়া গিয়াছে। কর্কটক্রান্তি এবং মকরক্রান্তিও এই মহাদেশের উপর দিয়া গিয়াছে। সেইজন্য এখানে প্রায় সকল রকম জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। নভেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত উত্তরাংশের পার্বত্য অঞ্চলের তাপমাত্রা ১৫° সেঃ পর্যন্ত ওঠে; কিন্তু সমগ্র মহাদেশের মালভূমি অঞ্চলে প্রায় ২৭° সেঃ তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। উপকূল অঞ্চলে তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে এই সময় বিষুবরেখার উত্তরাংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম (২৫ সেঃ মিঃ-এর কম) হয়। শুধু ভূমধ্যসাগরীয় উত্তর-পশ্চিমাংশে ২৫ সেঃ মিঃ-এর বেশী বৃষ্টিপাত হয়। বিষুবরেখার দক্ষিণে অবস্থিত অংশে এই সময় দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে প্রায় ৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয়। শুধু দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছুটা কম হয়।

মে হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত উত্তর ও মধ্য আফ্রিকায় প্রচণ্ড গরম (২৭° সেঃ-৩২° সেঃ) অনুভূত হয়; কিন্তু ঠাণ্ডা স্রোতের প্রভাবে দক্ষিণাংশের তাপমাত্রা ১৫° সেঃ-এর বেশী হয় না। নিরক্ষীয় আফ্রিকায় এই সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত (৭৫-১৫০ সেঃ মিঃ) হইয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫ সেঃ মিঃ-এর কম। বিশাল মহাদেশ বলিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চল বিদ্যমান। কঙ্গো অববাহিকায় ও গিনি উপকূলে নিরক্ষীয় জলবায়ু, দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকায় মৌসুমী জলবায়ু, উত্তর আফ্রিকায় উষ্ণ মরুদেশীয় জলবায়ু, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু এবং সুদান অঞ্চলে স্তাভানা জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। এই মহাদেশের বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে তৎস্থানীয় স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে। এখানকার বনভূমিতে মেহগিনি ও আবলুস বৃক্ষ এবং বন্য রবার পাওয়া যায়।

অনুন্নতির কারণ (Causes for backwardness)—আফ্রিকা মহাদেশ বিভিন্ন কারণে এখনও অনুন্নত। প্রথমতঃ, এই মহাদেশের আয়তন ইউরোপের তিনগুণ হইলেও ইহার **সৈকতরেখা** ইউরোপের অর্ধেকের কম। এই সৈকতরেখা প্রায় সর্বত্রই অভগ্ন। সুতরাং এখানে বন্দর নির্মাণ করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, এই মহাদেশের **নদীসমূহ** খরস্রোতা বলিয়া নৌ-চলাচলের উপযোগী নহে। তৃতীয়তঃ, এই মহাদেশের **মৃত্তিকা**

অধিকাংশ স্থানেই অনুর্বর থাকায় কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন সহজসাধ্য নহে। চতুর্থতঃ, সমতলভূমি কম থাকায় **কৃষিকার্য** ও **পরিবহণ**-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা কষ্টকর। পঞ্চমতঃ, অধিকাংশ স্থান প্রতিকূল জলবায়ুর দরুন **অস্বাস্থ্যকর** বনভূমি ও মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ষষ্ঠতঃ, আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশ বহুদিন যাবৎ পশ্চিম ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের অধীনে থাকায় আফ্রিকার সম্পদ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ ভোগ করিয়া থাকে, ইউরোপীয়গণ স্থানীয় জনসাধারণকে মানুষের মতো বাঁচিতে দেয় না। বৃহৎ শক্তিবর্গের দেশসমূহের শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলিয়া আফ্রিকায় শিল্পের উন্নতি হয় না। সুখের বিষয় বর্তমানে বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ আফ্রিকার দেশসমূহকে **পরাধীনতার** গ্লানি হইতে মুক্তি দিতে বাধ্য হইতেছে এবং ইহার ফলে কোন কোন দেশ ক্রমশঃ অর্থ নৈতিক উন্নতির দিকে আগাইয়া চলিয়াছে।

কৃষিকার্য (Agriculture)—আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চল ভিন্ন অন্য কোথাও কৃষিকার্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। নীলনদের উপত্যকায় অবস্থিত মিশর কৃষিকার্যে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে; এই দেশের তূলা ও ভুট্টা উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। নিরক্ষীয় অঞ্চলের দেশসমূহে (ঘানা, নাইজেরিয়া, গিনি, কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা প্রভৃতি) কোকো, কফি, চা, রবার প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া ও মরক্কোতে ফল, গম, যব, তামাক, জলপাই প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ইহ ছাড়া উগাণ্ডার কফি, দক্ষিণ আফ্রিকার ভুট্টা, সুদানের তূলা, নাইজেরিয়া ও কঙ্গোর তাল তৈল, নাইজেরিয়া ও সেনেগালের বাদাম এবং ক্রান্তীয় অঞ্চলের ইক্ষু ও ধান উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পশুপালনে আফ্রিকা মহাদেশের কয়েকটি দেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার 'ভেল্ড্' তৃণভূমিতে প্রচুর মেষ, গবাদি পশু, ছাগল প্রভৃতি পালিত হয়। আফ্রিকার 'স্যাভানা' তৃণভূমি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সুদান, রোডেশিয়া, অ্যাঙ্গোলা, নাইজেরিয়া, উগাণ্ডা, কেনিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা প্রভৃতি দেশে গবাদি পশু ও শূকর পালিত হয়। 'ভেল্ড্' অঞ্চলের তৃণ ক্ষুদ্রকায় বলিয়া মেষপালনের এবং 'স্যাভানা' অঞ্চলের তৃণ দীর্ঘকায় বলিয়া গবাদি পশুপালনের উপযোগী। এই মহাদেশের পশুপালন-ক্ষেত্র হইতে প্রচুর পশম, চর্ম, মাংস প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হয়।

খনিজ সম্পদ (Minerals)—আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চল বিভিন্ন খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এই সকল খনিজ সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহকে এই মহাদেশে উপনিবেশ-স্থাপনে উৎসাহিত করিয়াছে। কঙ্গো ও উত্তর রোডেশিয়ার তাম্র; কঙ্গো, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ঘানার হীরক; দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা ও দক্ষিণ রোডেশিয়ার স্বর্ণ; দক্ষিণ রোডেশিয়ার ক্রোমিয়াম ও কোবাল্ট; এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও ঘানার ম্যাঙ্গানিজ জগদ্বিখ্যাত। কঙ্গোর কাটাঙ্গা অঞ্চলে প্রচুর তাম্র, রাং, কোবাল্ট, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি খনিজ সম্পদ বিদ্যমান; এইজন্যই সম্প্রতি এই অঞ্চলের কর্তৃত্বরক্ষার জন্য বেলজিয়াম ও কঙ্গোর সঙ্গে ঝগড়া চলিতেছে।

আফ্রিকার নদীসমূহ খরস্রোতা এবং **জলবিদ্যুৎ** উৎপাদনের সহায়ক হইলেও পরাধীনতার ফলে এখানকার জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন সুবন্দোবস্ত হয় নাই। সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত ঘানা, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বন্দোবস্ত করিতেছে।

বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনে আফ্রিকার স্থান (১৯৬৩-৬৪)

(লক্ষ মে: টন)

	পৃথিবীর মোট উৎপাদন	আফ্রিকার উৎপাদন	আফ্রিকার অংশ (শতকরা)	আফ্রিকার স্থান
কোকো	১২.২	৮.৬৩	৭০%	প্রথম
কফি	৩৯.৮	৮.৭০	২৩%	দ্বিতীয়
তাল তৈল	১১.৯	৯.২	৭৯%	প্রথম
বাদাম	১৩৬	৩৯.৬	২৯%	দ্বিতীয়
জলপাই তৈল	১৪.৬	১.৯	.১৩%	দ্বিতীয়
স্বর্ণ (মে: টন)	৯৩৮	৬০৫	৬৫%	প্রথম
তাম্র	৩৬.৭	৯.১	২২%	দ্বিতীয়
রাং	১.৭৭	.২৫	১৪%	তৃতীয়
ক্রোমিয়াম	৮.৩	৩.৭	৪৬%	প্রথম
কোবাল্ট	৭১	৬২	৮৮%	প্রথম
হীরক (লক্ষ ক্যারেট)	১৫৬	১৪৮	৯৪%	প্রথম
ম্যাঙ্গানিজ	৫২	৫.৫	১১%	দ্বিতীয়

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ **শিল্পে** অত্যন্ত অনুন্নত। পরাধীনতা ও বিভিন্ন ভৌগোলিক কারণে এই অঞ্চলে শিল্পের উন্নতি হয় নাই। বর্তমানে মিশর,

দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

পরিবহণ-ব্যবস্থায় এই দেশ অত্যন্ত অনুন্নত। একটিমাত্র মহাদেশীয় পথ (জলপথ ও রেলপথের সমষ্টি) কায়রো হইতে কেপ টাউন পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ আফ্রিকা ভিন্ন অন্য কোথাও রেলপথ ভালোভাবে স্থাপিত হয় নাই। বহুস্থানে জলপথ ও রাস্তাঘাটের উপর নির্ভর করিতে হয়। পশ্চিম উপকূলে বন্দরের একান্ত অভাব থাকায় কয়েকটি কৃত্রিম পোতাশ্রয়ের মাধ্যমে বাণিজ্য চলে।

আভ্যন্তরীণ জলপথের মধ্যে **নীলনদ** (৬,৪৪০ কিলোমিটার) ইহার মোহনা হইতে খার্টুম পর্যন্ত সারাবৎসর নাব্য। **কঙ্গো** নদী (৪,৮৩০ কিলো-মিটার) নিয়াসা হ্রদের পশ্চিমাংশে উৎপন্ন হইয়া আটলান্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে; ইহার উপত্যকার আয়তন প্রায় ৩৯ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবৎসর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া ইহা সর্বদাই জলে পূর্ণ থাকে; স্ট্যান্‌লী জলপ্রপাত পর্যন্ত এই নদী প্রায় ১,৬০০ কিলোমিটার নাব্য। কং পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া **নাইজার** নদী (৩,৭০০ কিলো-মিটার) সুদানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিনি উপসাগরে পড়িতেছে। এই নদী প্রায় ৮০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নাব্য। অ্যাঙ্গোলার মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া **জাম্বেজী** নদী (২,৯০০ কিলোমিটার) রোডেশিয়া ও মোজাম্বিকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভারত মহাসাগরে পড়িয়াছে। মোহনা হইতে এই নদী প্রায় ৪০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নাব্য। দক্ষিণ আফ্রিকার **অরেঞ্জ** ও **লিম্পোপো** নদী স্টীমার-চলাচলের উপযোগী নহে। ট্যাঙ্গানাইকা ও নিয়াসা হ্রদসমূহ সুনাব্য।

আফ্রিকার দেশসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানতঃ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের সঙ্গে সংঘটিত হয়। নানাবিধ কৃষিজ, খনিজ ও প্রাণিজ দ্রব্য এই মহাদেশের প্রধান **রপ্তানি-দ্রব্য** এবং পশ্চিমে ইউরোপীয় দেশসমূহ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আগত যন্ত্রপাতি ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য এই মহাদেশের প্রধান **আমদানি-দ্রব্য**। আলজিরিয়া ও টিউনিসিয়া ভূমধ্য-সাগরের বিপরীত দিকে অবস্থিত স্পেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা বেশী বাণিজ্য করিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার অধিকাংশ বাণিজ্য সংঘটিত হয় বৃটেনের সঙ্গে।

মিশর (Egypt)

নীলনদের তীরে অবস্থিত মিশর প্রাচীন সভ্যতার বাহক। লোহিত সাগরের বিশেষতঃ সুয়েজ খালের সংলগ্ন বলিয়া এই দেশের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব অনেক বেশী। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দেশসমূহের মধ্যস্থলে বলিয়া এই দেশের বাণিজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে; প্রাচীনকালেও এই দেশ পৃথিবীর বাণিজ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত। ১৯৫৮ সালে মিশর ও সিরিয়া মিলিয়া "সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র" (United Arab Republic) নাম ধারণ করিলেও ১৯৬১ সালে পুনরায় সিরিয়া বিদ্রোহ করিয়া ভিন্ন রাষ্ট্র গঠন করে।

মিশরের আয়তন ১০ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ২ কোটি ৮০ লক্ষ; অর্থাৎ প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে **লোকবসতি** প্রায় ২৮ জন। এই দেশের শতকরা ৯২ জন লোক ইসলাম-ধর্মাবলম্বী। এই দেশের অধিকাংশ লোক বাস করে নীলনদের উপত্যকায় এবং দেশের উত্তরাংশের ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে; অন্যান্য স্থান মরুভূমি বলিয়া প্রায় জনমানবশূন্য। মিশরের মোট ভূমিভাগের শতকরা ৯৭ ভাগ মরু অঞ্চলে অবস্থিত; লিবিয়া মরুভূমি এই দেশের সমগ্র পশ্চিমাংশ ও দক্ষিণাংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। শুধু নীলনদের উপত্যকা এই মরুভূমির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

নীলনদের উর্বর উপত্যকা সমভূমি বলিয়া এই দেশের কৃষিকার্য এই উপত্যকা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ; সেইজন্য এই দেশের অধিকাংশ লোক নীলনদের উপত্যকায় বাস করে; এই অঞ্চলের লোকবসতি প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ৭৪৬ জন। পৃথিবীর অন্য কোন নদী-উপত্যকায় এত ঘন লোকবসতি দেখা যায় না।

সুয়েজ খাল মিশরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই খালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবৎসর প্রায় ৬,০০০ জাহাজ এই খালটির মধ্য দিয়া যায়। খালটির দুইদিকে দুইটি বন্দর আছে—সৈয়দ বন্দর ও সুয়েজ বন্দর।

মিশরে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পূর্বে এই খালটি ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির কবলে ছিল; কিন্তু এই স্থানটি সম্পূর্ণই মিশরের অন্তর্গত। ১৯৫৬ সালের ২৬শে জুলাই মিশরের বিপ্লবী সরকার এই খালটিকে মিশরের জাতীয় সম্পত্তিতে

পরিণত করে এবং ইহার পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এই কর্তৃত্ব হারাইবার ফলে অন্ধ হইয়া ক্ষমতালিপ্সু বৃটেন ও ফ্রান্স এই সময় মিশর আক্রমণ করিয়াছিল। রাশিয়ার হুমকিতে শেষপর্যন্ত ইহারা যুদ্ধ বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে বর্তমানে এই খালটির উপর মিশর সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব

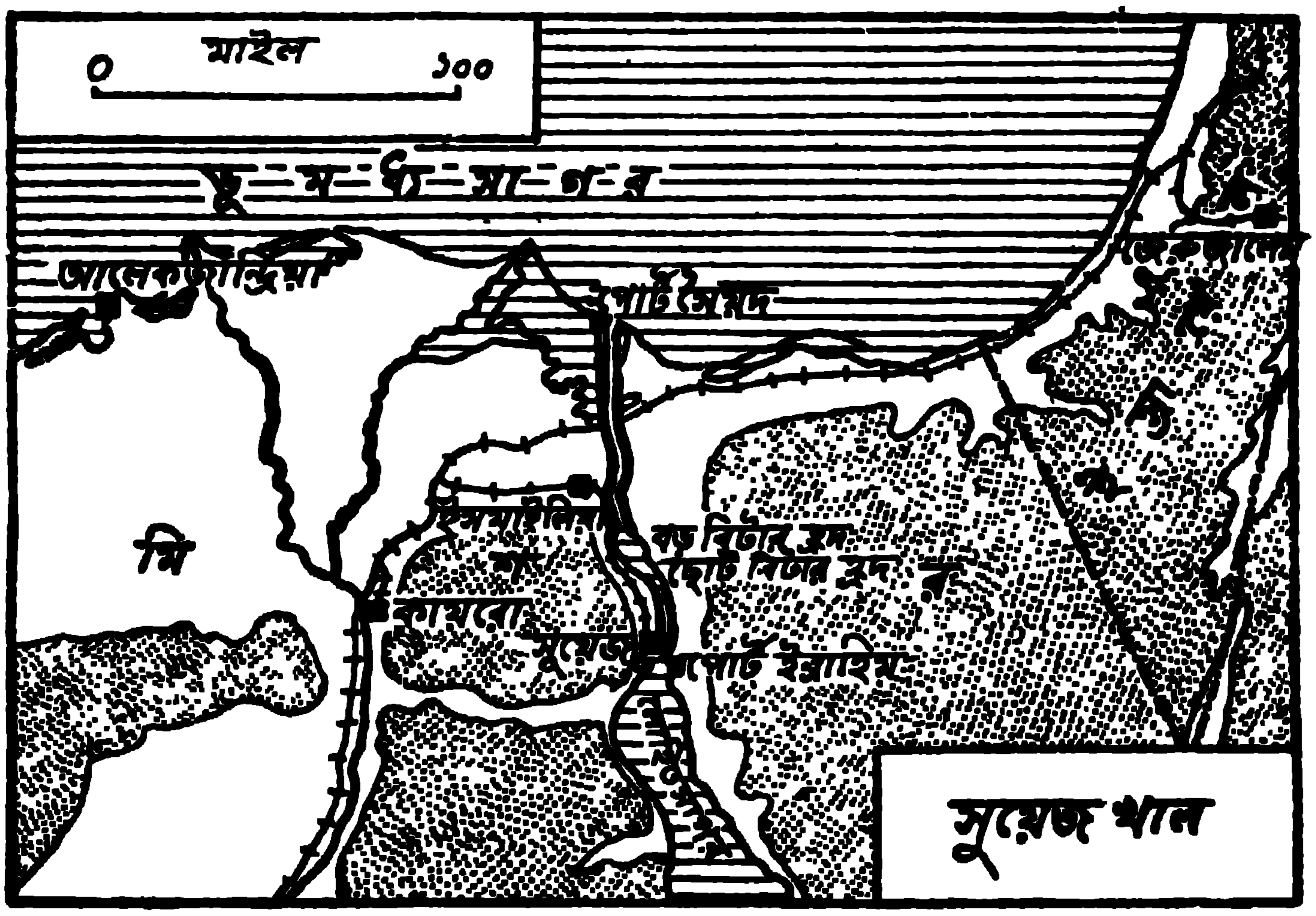

বিরাজমান। সুয়েজ খাল জাতীয়করণের ফলে মিশরের অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়। কারণ এই খাল হইতে প্রচুর কর মিশর সরকারের তহবিলে আসে। সুয়েজ খালের অধিকাংশ আয় বর্তমানে আসোয়ান বাঁধে নিয়োজিত করা হইতেছে।

নীলনদের দান—মিশরের অর্থনৈতিক উন্নতি নীলনদের জন্য সম্ভবপর হইয়াছে। সেইজন্য মিশরকে 'নীলনদের দান' বলা হয়।* হোয়াইট নীল নিরক্ষরেখার দক্ষিণস্থ মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া ভিক্টোরিয়া হ্রদের মধ্য দিয়া উত্তরদিকে প্রবাহিত হইয়া ব্লু নীলের সহিত খার্টুমের নিকট মিলিত হইয়াছে; ব্লু নীল ইথিওপিয়া উচ্চভূমির অন্তর্গত টানা হ্রদ হইতে নির্গত হইয়াছে। নীলনদ ওয়াদি হাইফার নিকট মিশরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রায় ১০° উত্তর অক্ষাংশের নিকট বাহ্‌র-এল-গজল নদী পশ্চিমদিক হইতে এবং ইথিওপিয়া উচ্চভূমি হইতে নির্গত সোবাত নদী পূর্বদিক হইতে হোয়াইট নীলের সহিত মিলিত হইয়াছে। আটবারা নদী বার্বারের নিকট নীল-

* "Egypt is the Gift of the Nile"—Herodotus.

নদের সহিত মিশিয়াছে। গ্রীষ্মকালে নিরক্ষীয় অঞ্চলের অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এই সকল উপনদীর মারফত নীলনদে আসিয়া জড় হয় এবং ব্লু নীলনদে বন্যার সৃষ্টি করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবৎসর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া নীলনদে সর্বদাই জল থাকে। বন্যার জল নীলনদের দুই তীরকে পলিমাটির সাহায্যে উর্বর করিয়া রাখে। ইহার ফলে নদী-উপত্যকায় প্রচুর কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

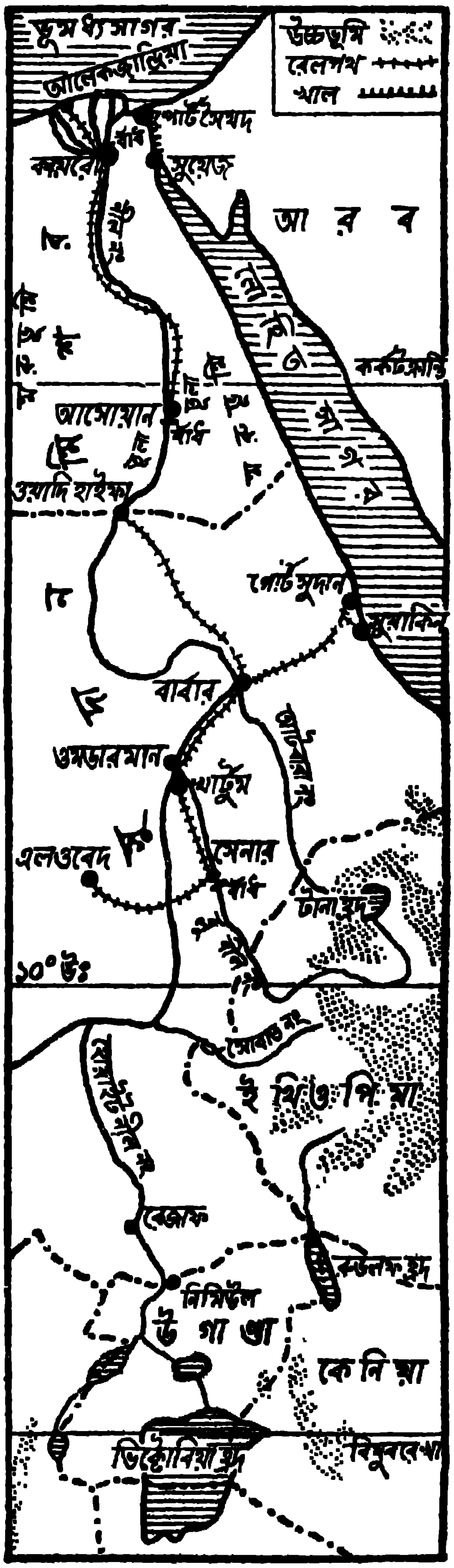

নিরক্ষীয় অঞ্চলে নীলনদ খরস্রোতা বলিয়া নাব্য নহে; কিন্তু খার্টুম হইতে মোহনা পর্যন্ত ইহার প্রায় ১,৬০০ কিলোমিটার পথ নাব্য। নীলনদের জল মিশরের কৃষিক্ষেত্রে **জলসেচনের** কার্যে নিয়োজিত হয় বলিয়া এই দেশ কৃষিকার্যে উন্নতি লাভ করিয়াছে। নিত্যবহ খালের সাহায্যে এবং সঞ্চিত জলাধারের সাহায্যে এই দেশে জলসেচ করা হইয়া থাকে। জলসেচের সাহায্যে কৃষিকার্য হয় বলিয়া এই দেশের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন অত্যন্ত বেশী হয় এবং তূলা ও অন্যান্য ফসল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়া থাকে। মিশরীয় তূলা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া জগদ্বিখ্যাত। মিশর মরুভূমি অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও নীলনদের জলীয় বাষ্পপূর্ণ আবহাওয়ার

দরুন সম্পূর্ণতঃ মরুভূমিতে পরিণত হয় নাই; নদী-উপত্যকায় সৃষ্ট স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ সাহারা মরুভূমি হইতে আগত গরম বায়ুর হাত হইতে মিশরকে রক্ষা করে। অন্যদিকে ইহা উত্তর-পূর্বদিক হইতে সমুদ্রবায়ু আসিতে পারে বলিয়া উত্তপ্ত বালুকারাশি এই দেশের উর্বর কৃষি-জমিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে না। এইভাবে নীলনদ সর্বপ্রকারে মিশরের ভৌগোলিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে বলিয়া মিশরকে 'নীলনদের দান' বলা হয়। নীলনদ না থাকিলে মিশর সম্পূর্ণভাবে মরুভূমিতে পরিণত হইত।

নীলনদ এত উপকারী বলিয়া স্থানীয় সরকার ইহার জল হইতে নানা-প্রকার সুবিধা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। ১৯০২ সালে প্রথমে আসোয়ানে একটি বাঁধ দিয়া জলসেচের বন্দোবস্ত করা হয়। মোহনা হইতে ৩,২২০ কিলো-মিটার দূরে সুদানের সেনারেও ১৯২৬ সালে একটি বাঁধ দেওয়া হয়; ইহার ফলে সুদানের প্রায় ১,২০,০০০ হেক্টর জমিতে তুলা উৎপাদন করা সম্ভব হয়। সম্প্রতি মিশর সরকার রাশিয়ার অর্থ ও ইঞ্জিনিয়ারগণের সাহায্যে নূতন **আসোয়ান বাঁধ** নির্মাণের দশবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিতেছে। নূতন বাঁধটির নাম হইবে সাদ্-এল-আলি (উচ্চ বাঁধ)। ইহার উচ্চতা হইবে ১১১ মিটার, দৈর্ঘ্য হইবে ৪·৮ কিলোমিটার এবং আয়তন হইবে ১,৯০২ বর্গ-কিলোমিটার। ইহাই হইবে পৃথিবীর মনুষ্যকৃত বৃহৎ জলাধার। ইহার কার্য শেষ হইলে ৩২ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হইবে। এই বাঁধে ১৩,০০০ কোটি কিউবিক মিটার জল সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইবে। বর্তমানে আসোয়ান বাঁধে মাত্র ৫০০ কোটি কিউবিক মিটার জল রাখা যায়।

এই বাঁধের সাহায্যে ৭·৫ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া শিল্পে ও অন্যান্য কার্যে নিয়োজিত হইবে। ১৯৬৪ সালে ইহার কার্য শেষ হইয়াছে। সুদান মিশরের সঙ্গে ১৯৫৯ সালে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় আসোয়ান বাঁধ হইতে জল ও অন্যান্য সুবিধা পাইবে।

কৃষিকার্য—মিশরের সমগ্র ভূমিভাগের মধ্যে মাত্র ৩৪·৮ লক্ষ হেক্টর জমি কৃষিকার্যে নিযুক্ত হইলেও ইহা একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল। উর্বর পলিমাটিতে নীলনদের বন্যার জল হইতে জলসেচের সাহায্যে কৃষিকার্য হয় বলিয়া এই দেশের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন অত্যন্ত বেশী; এখানে প্রতি হেক্টরে ২,২১০ কিলোগ্রাম ভুট্টা,

১,০০০ কিলোগ্রাম তিসি, ২,০৬০ কিলোগ্রাম বাদাম, ৬০৭ কিলোগ্রাম তুলা, ৫০০০ কিলোগ্রাম ধান এবং ২,৪৫০ কিলোগ্রাম গম উৎপন্ন হয়। অনুকূল জলবায়ুর দরুন সারাবৎসর এখানে চাষ-আবাদ করা যায়। মিশরেব মোট রাজস্বের শতকরা ৬০ ভাগ আসে শুধু কৃষিকার্য হইতে। এই দেশের কৃষিকার্যে পুরাতন প্রথা ও নূতন বৈজ্ঞানিক প্রথা উভয়ই বিদ্যমান। সুলভ শ্রমিকের জন্য এখনও কৃষিকার্যে যন্ত্রপাতি বিশেষ প্রবর্তিত হয় নাই।

তুলা মিশরের শ্রেষ্ঠ ফসল; মোট রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্যের শতকরা ৭৫ ভাগ আসে শুধু তুলা হইতে। নীলনদের উপত্যকার দক্ষিণাংশে তুলা উৎপন্ন হয়। এখানকার তুলা অত্যন্ত উৎকৃষ্টশ্রেণীব। গম, ভুট্টা, ইক্ষু, ধান প্রভৃতি এখানকাব অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শস্য। লোকসংখ্যার অনুপাতে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন কম বলিয়া এখনও মিশর প্রতিবৎসর প্রায় ৪ লক্ষ মেঃ টন গম আমদানি করে।

মিশরের কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩-৬৪)

	লক্ষ হেক্টর	লক্ষ মেঃ টন		লক্ষ হেক্টর	লক্ষ মেঃ টন
গম	৬˙১৫	১৭˙২	ভুট্টা	৭˙৬৫	১৮˙২
তূলা	৭˙৮৭	৩ ৭	ইক্ষুচিনি	...	৩ ৪
ধান	২˙৯৭	১৫˙২	যব	˙৬৩	১˙৩

মিশরের **খনিজ সম্পদের** মধ্যে খনিজ তৈল ও ফস্‌ফেট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোহিত সাগরের তীরে রাস্ ঘারিব অঞ্চলে অধিকাংশ খনিজ তৈল পাওয়া যায়; মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৫৫,৯২,০০০ মেঃ টন (১৯৬৪)। আস্‌ল্, রাস্ মার্টার্মা, রাস্ সদ্‌র্ ও ফির়ান অঞ্চলেও অল্পবিস্তর খনিজ তৈল পাওয়া যায়। লোহিত সাগরের উত্তর-পূর্ব উপকূলে ফস্‌ফেট পাওয়া যায়। অধিকাংশ ফস্‌ফেট অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ইল্‌মেনাইট, জিপসাম্, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি অল্প পরিমাণে এই দেশে পাওয়া যায়।

মিশরের **শ্রমশিল্পের** মধ্যে কার্পাস-বয়ন, চিনি ও রাসায়নিক শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় তুলা, ইক্ষু ও ফস্‌ফেট হইতে এই সকল শিল্প চালিত হইয়া থাকে। সিগারেট ও সিমেন্ট প্রস্তুতের কারখানাও এই দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়া অঞ্চলেই অধিকাংশ শিল্প

কেন্দ্রীভূত। বর্তমানে এই দেশ কার্পাস-বস্ত্র, চিনি, সিমেন্ট প্রভৃতি ভোগ্য-দ্রব্যে স্বাবলম্বী হইয়াছে। ৮০ হাজার টন উৎপাদনক্ষম একটি ছোট ইস্পাত-কারখানা এখানে স্থাপিত হইয়াছে। এই দেশে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ।

মিশরের **পরিবহণ-ব্যবস্থা** শুধু নীলনদের উপত্যকায় সীমাবদ্ধ। এই দেশের মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪,৩৪০ কিলোমিটার। আলেকজান্দ্রিয়া হইতে প্রধান রেলপথটি কায়রো হইয়া আসোয়ান পর্যন্ত গিয়াছে। এই রেলপথটি কেপ-টু-কায়রো পথের একটি অঙ্গ। আসোয়ান হইতে নদীপথে ওয়াদি হাইফা পর্যন্ত যাইয়া পুনরায় রেলপথে সুদানে যাওয়া যায়। মিশরের রাজপথের দৈর্ঘ্য ৩,১০০ কিলোমিটার; কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য ১২,৫২০ কিলোমিটার এবং মরু-রাস্তার দৈর্ঘ্য ৩,১০০ কিলোমিটার। এই দেশের আভ্যন্তরীণ জলপথ ও খালপথের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,০০০ কিলোমিটার। নীলনদ মোহনা হইতে ১,৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত সারাবৎসর নাব্য।

মিশরের **বৈদেশিক বাণিজ্য** প্রধানতঃ সংঘটিত হয় রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, চীন, ভারত, পূর্ব জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, স্পেন এবং পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে। এই দেশের শ্রেষ্ঠ রপ্তানি-দ্রব্য তুলা। ইহা ছাড়া কার্পাস তৈল, চাউল, শাকসব্জী প্রভৃতিও রপ্তানি হয়। আমদানি-দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি, ইস্পাত-সামগ্রী, গম, মোটর-গাড়ী এবং সার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের (মিশরের) রাজধানী **কায়রো** আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম শহর। নীলনদের তীরে ইহা অবস্থিত। এখানে একটি আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দর আছে। এই শহরের লোকসংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। সুয়েজ খালের উত্তরে অবস্থিত **সৈয়দ** বন্দর মারফত সুয়েজ খালে প্রবেশ করিতে হয়। ইহা একটি বিখ্যাত মাধ্যম বন্দর। এখানে জাহাজে কয়লা ভর্তি করা হয়। মিশরের সর্বপ্রধান বন্দর **আলেকজান্দ্রিয়া**। ভূমধ্যসাগরের তীরে সুয়েজ খালের পথে নীলনদের মোহনায় ইহা অবস্থিত। নীলনদের উপত্যকা এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। ইহার মারফত তুলা, চিনি, চাউল ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়। মিশরের শতকরা ৯০ ভাগ বৈদেশিক বাণিজ্য এই বন্দর মারফত হইয়া থাকে।

দক্ষিণ আফ্রিকা (The Union of South Africa)

দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্র চারিটি প্রদেশ লইয়া গঠিত—ট্রান্সভাল, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট, নাটাল ও অন্তরীপ প্রদেশ। ইহার আয়তন ১২.২৫ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ১.৭৫ কোটি। মোট লোকসংখ্যার মধ্যে ৩০ লক্ষ ইউরোপীয়, (প্রধানতঃ বৃটিশ, ডাচ ও ফরাসী), ১০ লক্ষ মিশ্রজাতীয় কৃষ্ণকায়, ৪.২৫ লক্ষ ভারতীয় এবং ১ কোটি আফ্রিকার আদিবাসী। ইউরোপীয় অধিবাসিগণ সংখ্যায় কম হইলেও এই দেশের শাসন-ক্ষমতা দখল করিয়া ইহারা কৃষ্ণকায় ও ভারতীয়গণের উপর বর্ণবিদ্বেষ নীতি (Apartheid policy) প্রয়োগ করিয়া বীভৎস অত্যাচার চালাইতেছে। পৃথিবীর সভ্য সমাজ ও রাষ্ট্রসংঘ (U. N. O.) দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে এই অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও কোন ফল হইতেছে না। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধেই একদিন মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই অত্যাচারের প্রতিবাদে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বহির্বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এই দেশের অধিকাংশ স্থান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া এখানকার মৃদু জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ও আরামপ্রদ। সেইজন্য শ্বেতকায় অধিবাসিগণ এখানে থাকিতে ভালবাসে, এই দেশের সমগ্র সম্পদ যাহাতে ইহারা নিজেরাই ভোগ করিতে পারে সেজন্য ইহারা কৃষ্ণকায় লোকদের এদেশে আসা পছন্দ করে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ স্থান মালভূমি; শুধু দক্ষিণাংশে নিউভেল্ড্ ও ড্রাকেন্সবার্গ পর্বত এবং উপকূলে নিম্নভূমি বিদ্যমান। উপকূলভাগের নিকটেই সুউচ্চ মালভূমি; ইহার অভ্যন্তরভাগ ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। সুউচ্চ মালভূমি থাকায় এই দেশে মৃদু জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বিদ্যমান; ইহার ফলে এই অংশে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়; কিন্তু পূর্ব উপকূলে আয়ন বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে ৭৫ সেঃ মিঃ-এর বেশী বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। দেশের অভ্যন্তরভাগে ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নগণ্য।

দক্ষিণ আফ্রিকার নদীসমূহের মধ্যে অরেঞ্জ ও লিম্পোপো বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অরেঞ্জ নদী এই দেশের দক্ষিণাংশের পার্বত্য অঞ্চল হইতে নির্গত হইয়া উত্তর-পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়া আটলান্টিক মহাসাগরে

পড়িয়াছে। উচ্চভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় এই নদী অধিকাংশ স্থানে নাব্য নহে। লিম্পোপো নদী উত্তরাংশের উচ্চভূমি হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল ও দক্ষিণ রোডেশিয়ার সীমানা হিসাবে অগ্রসর হইয়া ভারত মহাসাগরে পড়িয়াছে। লিম্পোপো নদীও অধিকাংশ স্থানে নাব্য নহে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় ৮·৬ কোটি হেক্টর জমিতে **কৃষিকার্য** হইয়া থাকে। এই দেশের পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত বেশী হয় বলিয়া অধিকাংশ কৃষিকার্য দেশের এই অংশে সীমাবদ্ধ। বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা, ভূমিক্ষয়, জলসেচের অভাব, কীটের উপদ্রব ও সুলভ পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবে এই দেশে কৃষিকার্য বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কৃষিকার্য অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া পশুপালন ও ফল উৎপাদনে অধিক জমি নিয়োজিত হয়। সরকারের আর্থিক সাহায্য সত্ত্বেও কৃষিকার্য অনেক পেছনে পড়িয়া আছে। **ভুট্টা** এই দেশের প্রধান ফসল; দক্ষিণ ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের 'উচ্চ ভেল্ডে' ইহা প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে **গম** ও নাটালের জুলুল্যাণ্ডে **ইক্ষু** উৎপন্ন হয়। পশ্চিমাংশের অধিকতর শুষ্ক অংশে আদিবাসিগণ প্রচুর **কাফির বাজরা** উৎপন্ন করে। ইহা ছাড়া যই, আলু, তামাক, চা ও কফি এই দেশে অল্পবিস্তর উৎপন্ন হয়। এই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ (কেপটাউন অঞ্চল) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় **ফল** উৎপাদনের উপযোগী। আপেল, পিয়র, পীচ, অ্যাপ্রিকট, আঙুর, কলা প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য ফল। বর্তমানে এই দেশের ফল হইতে মদ্য, ফল-সংরক্ষণ প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

পশুপালনে দক্ষিণ আফ্রিকা পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। এই দেশের ভেল্ড্ তৃণভূমি পশুপালনের জন্য বিখ্যাত। এখানে প্রায় ৩ কোটি ৮৩ লক্ষ মেষ এবং ৩১ লক্ষ গরু পালিত হয়। পশম-উৎপাদনে দক্ষিণ আফ্রিকা পৃথিবীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই দেশের অধিকাংশ পশম বৃটেনে রপ্তানি হয়। পশম-রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। চর্ম রপ্তানি করিয়াও এই দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। অন্তরীপ প্রদেশের শুষ্ক অঞ্চলে প্রায় ৬০ লক্ষ ছাগল পালন করা হয়। ট্রান্সভাল ও অন্তরীপ প্রদেশে প্রায় ১০ লক্ষ শূকর আছে।

নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু থাকায় এই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের অগভীর সমুদ্র মৎস্য-শিকারের উপযোগী; কিন্তু শ্রমিক-সমস্যার জন্য এখানকার মৎস্য উত্তোলনের পরিমাণ খুব বেশী নহে।

দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে এখানকার অপর্যাপ্ত **খনিজ সম্পদ**। এখানকার স্বর্ণের লোভেই প্রথমে ইউরোপীয়গণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। **স্বর্ণ** দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ খনিজ সম্পদ। স্বর্ণের উপর এই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এতটা নির্ভরশীল যে, কোন বৎসরে ইহার উৎপাদন কম হইলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। এইজন্য স্বর্ণকে 'দক্ষিণ আফ্রিকার মেরুদণ্ড' (Backbone of South Africa) বলা হয়। বর্তমানে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক স্বর্ণ এই দেশে উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্বর্ণ-উৎপাদন ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে; ইহার ফলে শীঘ্রই এই দেশে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিতে পারে। এই সংকট মোচন করিতে হইলে এই দেশকে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির দিকে নজর

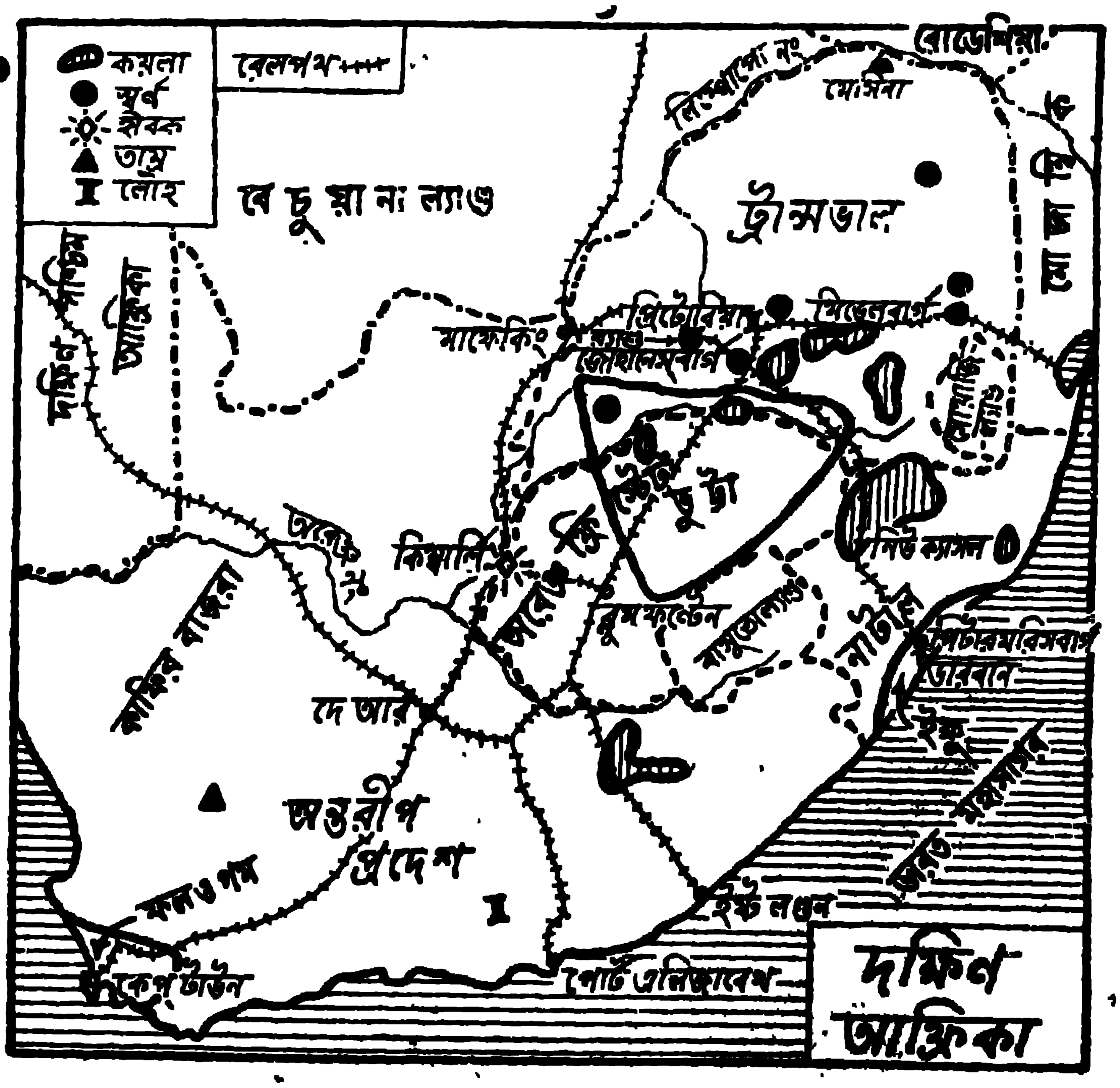

দিতে হইবে। অরেঞ্জ ও লিম্পোপো উপত্যকার মধ্যবর্তী পাহাড়ে উইট-ওয়াটার্স র‍্যাণ্ডে অধিকাংশ স্বর্ণ পাওয়া যায়। ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮৮৫ সালে। র‍্যাণ্ড অঞ্চলের বিভিন্ন শহরের মধ্যে জোহানেস্‌বার্গ, জার্মিস্টন, বেনোনি, বকস্‌বার্গ ও ক্রুগার্সড্রপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইউরোপীয়গণের শতকরা ১০ ভাগ অধিবাসী এই 'স্বর্ণ-শহরগুলিতে' বাস করে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ১৮ ভাগ **হীরক** এই দেশে উৎপন্ন হয়। হীরক-উৎপাদনে কঙ্গোর পরেই ইহার স্থান। অন্তরীপ প্রদেশের কিম্বার্লিতে অধিকাংশ হীরক ও **ম্যাঙ্গানিজ** পাওয়া যায়। নাটাল, ট্রান্স-ভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে **কয়লা** পাওয়া যায়। নাটালের নিউ ক্যাসল ও ট্রান্সভালের উইটব্যাঙ্ক ও মিডেলবার্গ কয়লা উত্তোলনের প্রধান কেন্দ্র। এখানকার সুলভ কয়লা শিল্পোৎপাদনে প্রধানতঃ নিয়োজিত না হইলেও, মূল্যবান্ খনিজ দ্রব্য আহরণ স্থানীয় কয়লার উপর নির্ভরশীল। ট্রান্সভালের প্রিটোরিয়া অঞ্চলে অধিকাংশ **লৌহ আকরিক** পাওয়া যায়; সেইজন্য এই দেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প শুধু এই অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ট্রান্সভালের মেসিনা অঞ্চলে এবং অন্তরীপ প্রদেশের লামাকুয়ালাণ্ডে **তাম্র** পাওয়া যায়। ট্রান্সভালের বুশভেল্ড্ অঞ্চলে **রাং** পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া প্লাটিনাম, সীসা, রৌপ্য প্রভৃতি খনিজ সম্পদও এই দেশে পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩)

স্বর্ণ	৩'৯	লক্ষ	কিলোগ্রাম	কয়লা	৪'২ কোটি	মে: টন
রৌপ্য	'৭	„	„	লৌহ আকরিক	৪৪ লক্ষ	„
হীরক	২'৮	লক্ষ	ক্যারেট	ম্যাঙ্গানিজ	৩'৬ „	„

দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকগোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য এই দেশের কাঁচামাল ও খনিজ সম্পদ বৃটেনে রপ্তানি করা। সেইজন্য ইহারা কখনও **শিল্পের** উন্নতির *জন্য সচেষ্ট ছিল না। বর্তমান স্বর্ণের উৎপাদন ক্রমশঃ কমিয়া আসায় লৌহ ও ইস্পাত, কার্পাসবয়ন, যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক শিল্পের সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত* হইতেছে। স্থানীয় কয়লা ও লৌহ আকরিকের সাহায্যে প্রিটোরিয়া শহরে মাত্র ১'৭ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদনক্ষম একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

আফ্রিকা মহাদেশে সর্বাপেক্ষা বেশী **রেলপথ** দেখা যায় দক্ষিণ আফ্রিকায়। ট্রান্সভাল ও অন্তরীপ প্রদেশে এই দেশের প্রায় অর্ধেক রেলপথ বিদ্যমান। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ২২,৫৪০ কিলোমিটার। এই দেশের রেলপথ প্রধানতঃ খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য খনিকেন্দ্রসমূহকে বন্দরের সহিত যুক্ত করিয়াছে। কেপটাউন হইতে প্রধান রেলপথটি দে আর

(De Aar), কিম্বার্লি ও মাফেকিং হইয়া রোডেশিয়ার মধ্য দিয়া কঙ্গো পর্যন্ত গিয়াছে। অন্য একটি রেলপথ পোর্ট এলিজাবেথ হইতে দে আর হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার স্বকোপমুণ্ড পর্যন্ত গিয়াছে। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন রেলপথ কিম্বার্লি ও জোহানেসবার্গকে নিউ ক্যাসল, ডারবান, ইস্ট লণ্ডন ও পোর্ট এলিজাবেথের সহিত যুক্ত করিয়াছে। এই দেশে প্রায় ৪৫,০৮০ কিলোমিটার উৎকৃষ্ট রাজপথ আছে। আকাশপথেও এই দেশের বিভিন্ন শহরে যাওয়া যায়। স্বর্ণ, রৌপ্য ও হীরক বহু ক্ষেত্রে আকাশপথে প্রেরিত হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার **বৈদেশিক বাণিজ্যের** প্রধান লক্ষ্য হইল বিভিন্ন কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা এবং বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে নানাবিধ শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য আমদানি করা। সেইজন্য এই দেশের রপ্তানি-দ্রব্যের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, ম্যাঙ্গানিজ, কয়লা, লৌহ আকরিক, পশম, চর্ম, মাংস প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমদানি-দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র, বস্ত্রাদি প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃটেনের সঙ্গে এই দেশের শতকরা ৬০ ভাগ আমদানি-বাণিজ্য ও ৮০ ভাগ রপ্তানি-বাণিজ্য সংঘটিত হইয়া থাকে।

শহর ও বন্দর—কেপ টাউন উত্তমাশা অন্তরীপের রাজধানী ও এই দেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর। প্রায় সমগ্র দেশ ও রোডেশিয়ার কিয়দংশ ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। এখানে একটি উৎকৃষ্ট কৃত্রিম পোতাশ্রয় আছে। অধিকাংশ হীরক ও স্বর্ণ এই বন্দর মারফত রপ্তানি হয়। **পিটারমরিসবার্গ** নাটালের রাজধানী, **প্রিটোরিয়া** ট্রান্সভালের রাজধানী এবং **ব্লুমফন্টিন** অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের রাজধানী। **ডারবান** দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ বন্দর। খনি অঞ্চল ও কৃষি অঞ্চলের সহিত ইহা রেলপথে যুক্ত। এই বন্দর মারফত স্বর্ণ, তাম্র, গম, ভুট্টা, চাউল, হীরক প্রভৃতি রপ্তানি হয় এবং খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল, কার্পাস-বস্ত্র ও বিলাসদ্রব্য আমদানি হয়। **ইস্ট লণ্ডন ও পোর্ট এলিজাবেথ** অন্তরীপ প্রদেশের উল্লেখযোগ্য বন্দর।

প্রশ্নাবলী

1. **Account for the commercial and industrial backwardness the tropical countries of Africa.**

উঃ—আফ্রিকার 'অনুন্নতির কারণ' (২১১ পৃঃ—২১২ পৃঃ) লিখ।

"Egypt is the Gift of the Nile". Discuss fully. [C. U. Inter. 1949]

উঃ—মিশরের 'নীলনদের দান' (২১৬ পৃঃ—২১৮ পৃঃ) লিখ।

3. Describe the effects of flood on the development of agricultural resources of Egypt, with special reference to cotton cultivation.

[C. U. B. Com. 1957]

উঃ—মিশরের 'কৃষিকার্য' (২১৮ পৃঃ—২১৯ পৃঃ) এবং 'নীলনদের দান' (২১৬ পৃঃ—২১৮পৃঃ) হইতে বন্যার উপকারিতা এবং কৃষিকার্যের উন্নতি সম্বন্ধে লিখ।

4. Discuss the part played by cotton in the economic development of Egypt and describe the factors leading to the production of this raw material.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উঃ—'কৃষিকার্য' হইতে 'তুলা' লিখ, এবং প্রথম খণ্ডের 'কৃষিকার্য' অধ্যায় হইতে তুলার 'চাষের উপযোগী অবস্থা' এবং 'মিশরের তুলাচাষ' (২১৯ পৃঃ) লিখ।

5. Discuss the present economic condition of South Africa with special reference to its (a) mineral resources, (b) pastoral industry.

উঃ—দক্ষিণ আফ্রিকার 'খনিজ সম্পদ' (২২৩ পৃঃ—২২৪ পৃঃ) এবং 'পশুপালন' (২২২ পৃঃ) লিখ।

6. "The gold-mines are the backbone of South Africa". Discuss the statement. What commercial interests induced Britain to colonise in South Africa ?

উঃ—দক্ষিণ আফ্রিকার 'খনিজ সম্পদ' (২২৩ পৃঃ—২২৪ পৃঃ) ও ইতিহাস (২২১ পৃঃ) হইতে লিখ।

7. Give an account of the mineral resources of the Union of South Africa and indicate the chief mining areas of the country.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1965]

উঃ—দক্ষিণ আফ্রিকার 'খনিজ সম্পদ' (২২৩ পৃঃ—২২৪ পৃঃ) লিখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এশিয়া (Asia)

আয়তনে ও লোকসংখ্যায় এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ। ইহার আয়তন প্রায় ৪'৪০ কোটি বর্গ-কিলোমিটার—পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। উত্তরে মেরুসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা ১০° দঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মহাদেশের দৈর্ঘ্য ৯,৬৬০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ৮,৫৩০ কিলোমিটার; কিন্তু আয়তনের তুলনায় সৈকতরেখার দৈর্ঘ্য অত্যন্ত কম—প্রতি ৭৭০ বর্গ-কিলোমিটারে মাত্র ১ কিলোমিটার। এই মহাদেশের বহুস্থান সমুদ্র হইতে ৯৫০ কিলোমিটারেরও অধিক দূরে অবস্থিত।

এশিয়াকে মোটামুটি তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়—দূর-প্রাচ্য, মধ্য-প্রাচ্য এবং নিকট-প্রাচ্য। ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, জাপান, চীন, লাওস, ক্যাম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েটনাম, রাশিয়ার পূর্বাংশ, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ফিলিপাইন দূর-প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত। সিরিয়া, লেবানন, ইস্রায়েল, তুরস্ক, জর্ডন, নিকট-প্রাচ্যের অন্তর্গত। আফগানিস্তান, ইরাণ, ইরাক, সৌদি আরব, ইয়েমেন, বেহ্‌রিন, ওমান ও কুওয়েট লইয়া মধ্য-প্রাচ্য গঠিত।

বৃহদাকার বলিয়া এই মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের ভূ-প্রকৃতি বিদ্যমান। পার্বত্যভূমি, মালভূমি ও মরুভূমি থাকায় বহুস্থান এখনও অত্যন্ত অনুন্নত। এই সকল কারণে পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি সকল স্থানে সম্ভব হয় নাই। বহু মানুষ এখনও সভ্যজগতের আলোকরশ্মি হইতে বহুদূরে সরিয়া আছে। বিস্তীর্ণ ভূমিভাগ থাকায় জলীয় বাষ্পযুক্ত বায়ু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না; ইহার ফলে বৃষ্টিপাতের অভাব দেখা যায় এবং কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয় না। এই মহাদেশের বিভিন্ন দেশ বহুদিন পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহের অধীনে থাকায় শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূর-প্রাচ্যের দেশসমূহ সমুদ্রের নিকটবর্তী বলিয়া উন্নতিলাভে কিছুটা সক্ষম হইয়াছে। বিশেষতঃ, এই সকল দেশ সম্প্রতি স্বাধীনতা পাওয়ায় শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতেছে; চীন, ভারত

ও ইন্দোনেশিয়া এই দেশসমূহের অন্যতম। জাপান বহুদিন হইতেই অত্যন্ত উন্নত দেশ ছিল।

লোকবসতি (Population)—এশিয়া মহাদেশে প্রধানতঃ মঙ্গোলীয় (এশীয় রাশিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, নেপাল, সিকিম, ভুটান, ইন্দোনেশিয়া, মালয় প্রভৃতি দেশ) ও ককেশীয় (ভারত, পাকিস্তান, ইরাণ, আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইরাক ও আরব দেশসমূহ) জাতিসমূহের লোক বাস করে।

এশিয়া মহাদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ১৫৫ কোটি—পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। এই মহাদেশের লোকবসতির গড় ঘনত্ব প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৩৪ জন হইলেও সকল স্থানের বসতি-ঘনত্ব সমান নহে। লোকসংখ্যায় চীন পৃথিবীতে প্রথম স্থান এবং ভারত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে; ইহা ছাড়া পাকিস্তান, জাপান ও ইন্দোনেশিয়ায় বহুলোক বাস করে। এই পাঁচটি দেশের লোকসংখ্যা প্রায় ১৩৯ কোটি—পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৪৬ ভাগ। এশিয়ার অধিকাংশ লোক সমুদ্রের নিকটবর্তী এই পাঁচটি দেশে বাস করে; এখানকার লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ১২৫ জনের বেশী। অন্যদিকে রাশিয়ার পূর্বাংশ, মধ্য-প্রাচ্য এবং নিকট-প্রাচ্যের লোকবসতির ঘনত্ব অত্যন্ত কম—প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ১ জন হইতে ১০ জন মাত্র। সাধারণতঃ নদী-উপত্যকায় ও সমুদ্রোপকূলে অধিক লোক বাস করে। ভারতের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র, চীনের হোয়াংহো, ইয়াং-সি-কিয়াং ও সি-কিয়াং, পাকিস্তানের পদ্মা, যমুনা, মেঘনা ও সিন্ধু নদীর উপত্যকায় ঘনবসতি বিদ্যমান। দ্বৈপ অবস্থানভুক্ত বলিয়া জাপান ও ইন্দোনেশিয়ার লোকসংখ্যা অনেক বেশী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নদী-উপত্যকায় কৃষিকার্য ভালোভাবে উন্নতি লাভ করায় প্রাচীনকাল হইতেই চীন ও ভারতে বহুলোক বাস করিতে শুরু করে। এই সকল দেশের জলবায়ু মোটামুটি বসবাসের উপযোগী এবং কৃষিকার্যের সহায়ক বলিয়া ক্রমশঃই লোকবসতি বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভূ-প্রকৃতি (Physical Features)—বিশাল আয়তনের এই মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের ভূ-প্রকৃতি থাকাই স্বাভাবিক।

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এই মহাদেশকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(ক) উত্তরাংশের নিম্নভূমি এশীয় রাশিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশের বিস্তীর্ণ সমতলভূমি লইয়া গঠিত; ওব, ইনেসি ও লেনা নদী ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইউরাল পর্বত এই নিম্নভূমিকে ইউরোপের সমতলভূমি হইতে পৃথক করিয়াছে।

(খ) মধ্যভাগের পর্বতশ্রেণী ও মালভূমি তুরস্ক হইতে আরম্ভ করিয়া সাইবেরিয়ার পূর্বাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। পামির গ্রন্থি এই সকল পর্বতমালার কেন্দ্রস্থল। এই গ্রন্থি হইতে হিমালয়, তিয়েনসান, আলতিন ও কুয়েনলুন পর্বত পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়াছে। হিমালয় পর্বতশ্রেণী আসাম, ব্রহ্মদেশ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়া বিভিন্ন নামে ইন্দোনেশিয়ার আণ্ডালাস্ (সুমাত্রা)

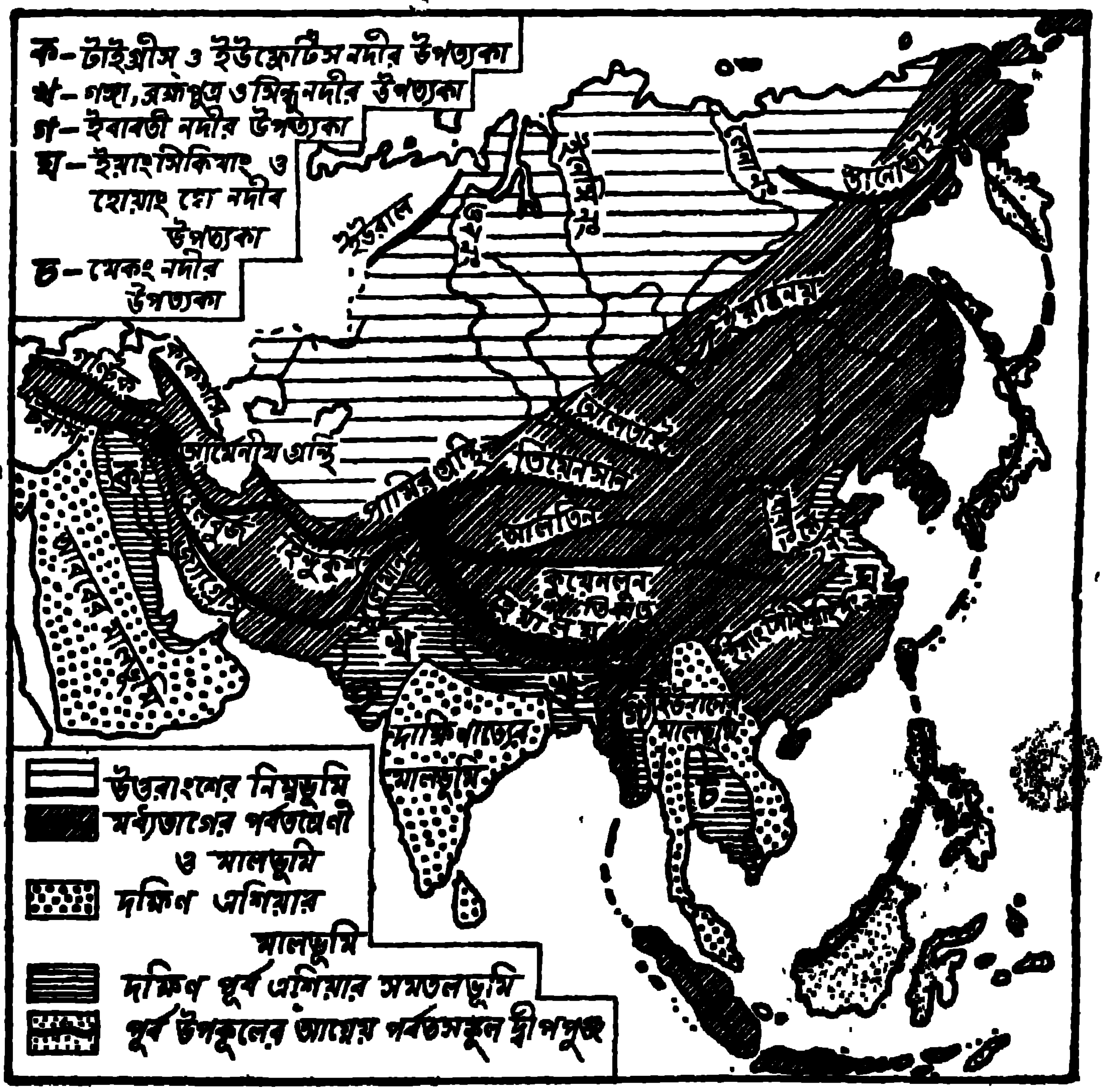

ও জাভা পর্যন্ত গিয়াছে। হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বত পামির গ্রন্থি হইতে পশ্চিমদিকে নির্গত হইয়া যথাক্রমে ইরাণের উত্তরে এলবুর্জ নামে এবং দক্ষিণে জ্যাগ্রোস

নামে অগ্রসর হইয়া আর্মেনীয় গ্রন্থিতে পুনরায় মিলিত হইয়াছে ; এই গ্রন্থি হইতে একটি শাখা তুরস্কের উত্তরে পন্টিক নামে এবং দক্ষিণে টরাস নামে অভিহিত হইয়াছে। হিন্দুকুশের একটি শাখা কাস্পিয়ান সাগর অতিক্রম করিয়া ককেশাস্ নাম ধারণ করিয়াছে। এই সকল পর্বতশ্রেণী ছাড়াও এশিয়ার পূর্বাংশে বিচ্ছিন্ন পর্বতমালা বিদ্যমান। ইহার মধ্যে সাইবেরিয়ার আলতাই, স্তানোভাই ও ইয়াব্লনয় পর্বতশ্রেণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সকল পর্বতের মধ্যবর্তী অংশে বহু **মালভূমি** বিদ্যমান। ইহার মধ্যে হিমালয় ও কুয়েনলুন পর্বতের মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত পৃথিবীর সর্বোচ্চ তিব্বত মালভূমি, আলতিন ও তিয়েনসানের মধ্যে অবস্থিত তারিম নদীর বিস্তীর্ণ উপত্যকা, আলতিন ও কুয়েনলুনের মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত চিংঘাই মালভূমি, আলতিনের উত্তর-পূর্বাংশে এবং আলতাই ও ইয়াব্লনয় পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত গোবি মরুভূমি, এলবুর্জ ও জ্যাগ্রোস পর্বতের মধ্যবর্তী ইরাণের মালভূমি এবং পন্টিক ও টরাস পর্বতের মধ্যে অবস্থিত তুরস্কের মালভূমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল মালভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল বসবাস, পরিবহণ-ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতিকূল বলিয়া এখানকার লোক-বসতি অত্যন্ত কম ; কোন কোন স্থানে লোকবসতি নাই বলিলেই চলে। অনেক পার্বত্য অঞ্চলে খনিজ সম্পদ দেখা যায় বলিয়া খনি অঞ্চলে নাতিনিবিড় লোকবসতি দেখা যায়।

(গ) দক্ষিণ এশিয়ার মালভূমি প্রধানতঃ আরবের মালভূমি, ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও ইউনানের মালভূমি লইয়া গঠিত। আরবের মালভূমি প্রধানতঃ মরু অঞ্চলে অবস্থিত ; কিন্তু দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উচ্চতা কম হওয়ায় কৃষিকার্যে উন্নতি লাভ করিয়াছে ; ইহা পূর্বে ও পশ্চিমে যথাক্রমে ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরের দিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। ইউনান মালভূমির উচ্চতা কম বলিয়া কৃষিকার্যে উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং লোকবসতি বৃদ্ধি পাইতেছে।

(ঘ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমতলভূমি টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকা (মেসোপোটেমিয়া বা ইরাক), গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুনদের উপত্যকা (পাকিস্তান ও উত্তর ভারত), ইরাবতী নদীর উপত্যকা (ব্রহ্মদেশ), মেকং নদীর উপত্যকা (ক্যাম্বোডিয়া, ভিয়েৎনাম, লাওস ও থাইল্যাণ্ড) এবং চীনের ইয়াং-সি-কিয়াং ও হোয়াংহো নদীর উপত্যকা লইয়া গঠিত। এই

সকল নদীর উপত্যকায় উর্বর পলিমাটি থাকায় কৃষিকার্য বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং ইহার ফলে এখানকার অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন সহজসাধ্য হইয়াছে।

(ঙ) পূর্ব উপকূলের আগ্নেয় পর্বতসঙ্কুল দ্বীপপুঞ্জ প্রধানতঃ সাখালিন, কিউরাইল, জাপান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়ার কালিমান্তান (বোর্ণিও) প্রভৃতি লইয়া গঠিত। উত্তরে কামচাট্‌কা ও সাখালিন হইতে একটি পর্বতমালা দক্ষিণে কালিমান্তান দ্বীপ পর্যন্ত গিয়াছে। মাঝে মাঝে ইহা সমুদ্রের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া গিয়াছে। এই পর্বতমালা খুব বেশী উচ্চ না হওয়ায় এই সকল দেশের উন্নতিতে বিশেষ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে নাই।

জলবায়ু (Climate)—১০° দঃ অক্ষরেখা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর মেরুসাগর পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশ বিস্তৃত। সুতরাং এই মহাদেশে সকল প্রকার জলবায়ু থাকাই স্বাভাবিক। অবস্থান ও উচ্চতা এই মহাদেশের জলবায়ুর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। শীতকালে উত্তরাংশ ও মধ্যাংশ অত্যন্ত ঠাণ্ডা হওয়ায় এই অঞ্চলের উপর দিয়া বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে এই অঞ্চলের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নামিয়া আসে। পামির গ্রন্থি হইতে নির্গত হিমালয় ও অন্যান্য পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় উত্তর হইতে আগত শীতল বায়ু এই পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে প্রবেশ করিতে পারে না। সেইজন্য দক্ষিণাংশের মালভূমি ও সমভূমি অঞ্চলে শীতকালীন তাপমাত্রা ২০° সেঃ-এর নীচে নামিতে পারে না। শীতকালীন এই শীতল বায়ু স্থলভাগ হইতে আসে বলিয়া বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে না; কিন্তু যখন এই বায়ু কোন কোন স্থানে সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া কোন পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন সামান্য বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে। কেরালা, মাদ্রাজের উপকূল, আন্দামান ও জাপানে এইজন্য প্রায় ২৫ সেঃ মিঃ এবং ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে প্রায় ৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে এশিয়ার মধ্যাংশ অত্যন্ত গরম হওয়ায় নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। সেইজন্য দক্ষিণাংশের ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর হইতে বায়ুরাশি উত্তর-পূর্বদিকে ধাবিত হয়। ইহাতে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সময় এশিয়ার মধ্যাংশে প্রায় ১৫° সেঃ, মরু অঞ্চলে প্রায় ৩২° সেঃ এবং দক্ষিণ এশিয়ার মালভূমি ও সমভূমি অঞ্চলে প্রায় ২৭° সেঃ তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। গ্রীষ্মকালে হিমালয় পর্বতের দক্ষিণাংশে জাপান ও চীনে মোটামুটি ১৫০-২০০ সেঃ মিঃ এবং

দক্ষিণ-পূর্ব সাইবেরিয়ায় প্রায় ২৫-৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টি হইয়া থাকে। হিমালয় পর্বতশ্রেণীর উত্তরাংশে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করিতে না পারায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নগণ্য। বৃষ্টিপাতের উপর কৃষিকার্য নির্ভরশীল বলিয়া অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল শস্যশ্যামলা হইয়াছে; ধান, পাট, চা প্রভৃতি এই সকল অঞ্চলের প্রধান ফসল। কম বৃষ্টিপাতযুক্ত শুষ্ক অঞ্চলে গম, যব, বাজরা, তূলা ও ইক্ষু উৎপন্ন হয়।

মৃত্তিকা (Soil)—এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানাপ্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। মৃত্তিকার উর্বরাশক্তির উপর কৃষিকার্যের উন্নতি নির্ভরশীল। সুতরাং এই মহাদেশের মৃত্তিকা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে বিভিন্ন দেশের কৃষিকার্যের উন্নতি বিশ্লেষণ করা কঠিন হইবে। মোটামুটি এই মহাদেশকে নিম্নলিখিত নয়টি মৃত্তিকাবলয়ে বিভক্ত করা যায় :—

(১) উত্তরাংশের **তুন্দ্রা** অঞ্চলের মৃত্তিকায় কৃষিকার্য করা সম্ভব নহে। বর্তমানে রাশিয়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রথায় এই অঞ্চলে কৃষিকার্যের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিতেছে। (২) তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণে সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ নিম্নভূমিতে **পড্‌সল**-জাতীয় মৃত্তিকা দেখা যায়; ইহা সরলবর্গীয় বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত। (৩) এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে প্রধানতঃ **পার্বত্য** মৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয়। শক্ত কাদামাটি থাকায় এই অঞ্চলে বনভূমির সৃষ্টি হয়। কোন কোন পর্বতের ঢালে চা, কফি, রবার, গম, ধান ও সয়াবীনের চাষ হয়। (৪) জাপানের উত্তরাংশে, চীন, কোরিয়া, পশ্চিম পাকিস্তান ও কিরঘিজস্তানে **বাদামী** রঙের মৃত্তিকা দেখা যায়। এই মৃত্তিকায় উদ্ভিদ্-খাদ্য বেশী থাকায় কম বৃষ্টিপাতেও এখানে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। যই, যব, ভুট্টা ও পশুখাদ্য এই মৃত্তিকায় জন্মিয়া থাকে। অল্পবিস্তর বৃষ্টিপাত হইলে গমও উৎপন্ন হইতে পারে। (৫) ভারতের অধিকাংশ স্থান, মধ্য ও দক্ষিণ চীন ও থাইল্যাণ্ডে **রক্ত** ও **পীতবর্ণের** মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত উর্বর বলিয়া চাষের উপযোগী। ধান, গম, ইক্ষু, তূলা, তামাক প্রভৃতি এই মৃত্তিকায় উৎপন্ন হয়। (৬) **রক্তবর্ণের** মৃত্তিকা প্রধানতঃ দেখা যায় পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে, পূর্ব পাকিস্তানে এবং মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে। অম্লধর্মী হওয়ায় এই মৃত্তিকা বিশেষ উর্বর নহে। সার প্রয়োগ করিয়া ধান, ভুট্টা, তূলা, চা, রবার প্রভৃতি এই মৃত্তিকায় উৎপন্ন করা যায়। (৭) আণ্ডালাস্ (সুমাত্রা) ও কালিমান্তান (বোর্ণিও) দ্বীপের মধ্যস্থল,

চীনের উত্তরাংশ, মঙ্গোলিয়া এবং এশীয়রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে **রক্তাভ-বাদামী** মৃত্তিকা দেখা যায়; এখানে নিকৃষ্ট তৃণভূমির সৃষ্টি হয়। উপযুক্ত জলসেচের বন্দোবস্ত থাকিলে এই মৃত্তিকায় গম, ভুট্টা ও তূলা উৎপন্ন হয়। (৮) ভারতের পশ্চিমাংশে, উত্তর চীন এবং সাইবেরিয়ার কিয়দংশে **কৃষ্ণ-মৃত্তিকা** দেখা যায়। ইহা তূলা ও গমচাষের উপযোগী। এই মৃত্তিকায়

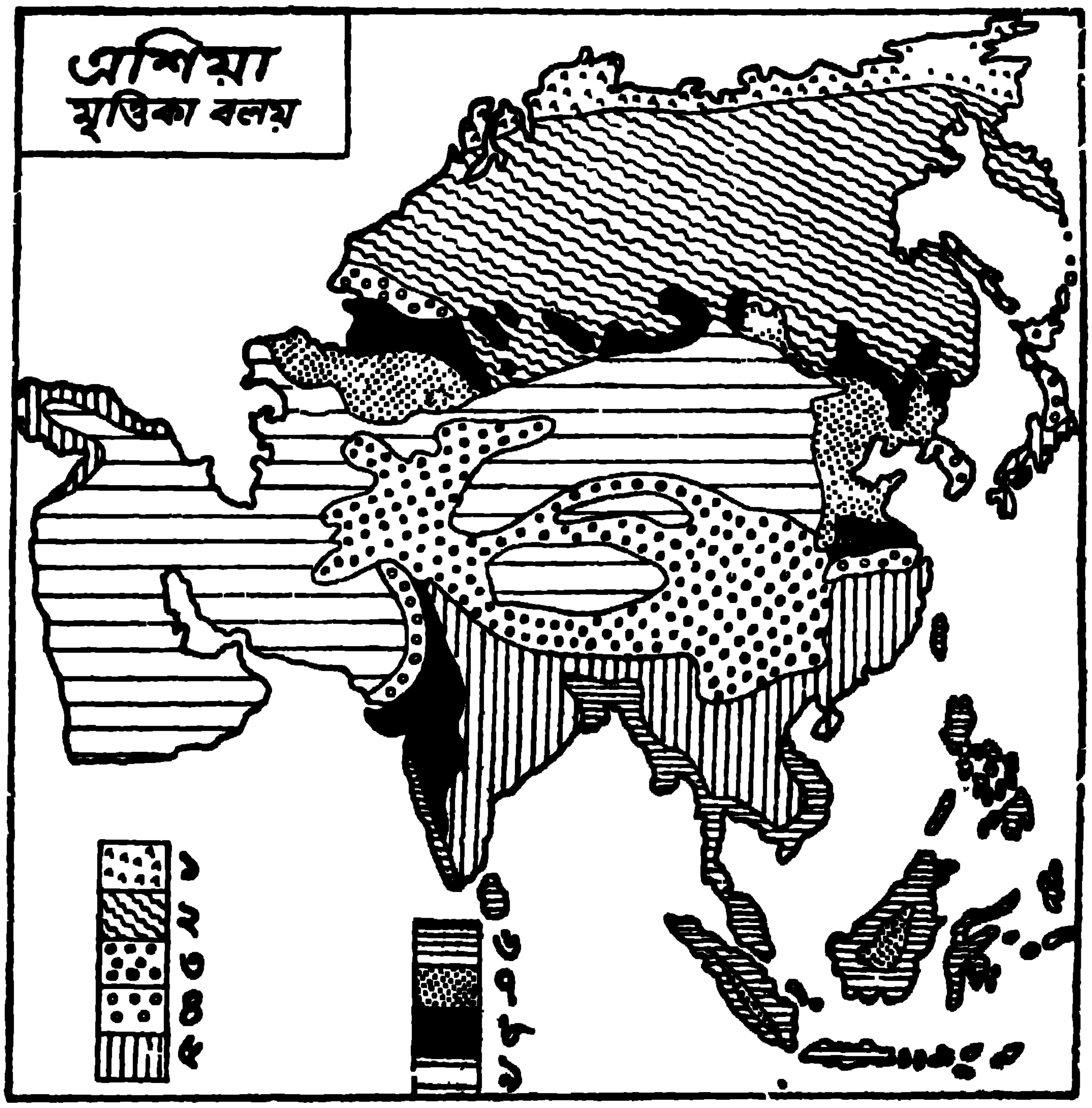

(১) তুন্দ্রা অঞ্চলের মৃত্তিকা, (২) পড্‌সল-জাতীয় মৃত্তিকা, (৩) পার্বত্য অঞ্চলের মৃত্তিকা, (৪) বাদামী মৃত্তিকা, (৫) রক্ত ও পীতবর্ণের মৃত্তিকা, (৬) রক্তবর্ণের মৃত্তিকা, (৭) রক্তাভ-বাদামী মৃত্তিকা, (৮) কৃষ্ণমৃত্তিকা, (৯) মরু অঞ্চলের পিঙ্গলবর্ণের মৃত্তিকা।

প্রচুর উদ্ভিদ্‌-খাদ্য বিদ্যমান থাকায় ইহা অত্যন্ত উর্বর। (৯) মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, তুর্কিস্তান, ইরাণ, তুরস্ক ও আরবদেশে সাধারণতঃ মরু অঞ্চলের **পিঙ্গলবর্ণের** মৃত্তিকা দেখা যায়। জলসেচের ব্যবস্থা থাকিলে কোন কোন স্থানে কৃষিকার্য করা সম্ভব। রাশিয়ার তুর্কিস্তানে জলসেচের সাহায্যে ভুট্টা, তূলা ও তামাক উৎপন্ন হয়। এই মৃত্তিকায় খেজুর ও কাঁটা গাছ জন্মে।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ (Natural Vegetation)—বিশাল আয়তনের এই মহাদেশে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ থাকাই স্বাভাবিক। জলবায়ুর উপর এশিয়ার বিভিন্ন অংশের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের সৃষ্টি নির্ভরশীল। (১) সুমেরু বৃত্তের উত্তরাংশে সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ **তুন্দ্রা** অঞ্চলে গুল্ম ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে। (২) তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণাংশের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ **সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি** বিদ্যমান, পাইন, স্প্রুস্, এল্‌ম্, বার্চ, সীডার প্রভৃতি বৃক্ষ এই অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে। এই বনভূমিকে 'তৈগা' নামে অভিহিত করা হয়। এখানকার নরম কাঠ কাষ্ঠমণ্ড-প্রস্তুতে ও কাগজশিল্পে ব্যবহৃত হয়। (৩) উত্তর-পূর্ব এশিয়ার লরেন্সীয় জলবায়ু অঞ্চলে **পর্ণমোচী বৃক্ষ** পরিলক্ষিত হয়; ওক্, ওয়ালনাট, ম্যাপ্‌ল্ প্রভৃতি এই অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে। মঙ্গোলিয়ার মালভূমি ও সাইবেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে **স্টেপ্‌স্** তৃণভূমি দেখা যায়। এই তৃণভূমিতে পশুপালন উন্নতি লাভ করিয়াছে ; কোন কোন স্থানে তৃণভূমি পরিষ্কার করিয়া গম, রাই, বীট, সয়াবীন, আলু প্রভৃতির চাষ হয়। (৪) মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মরুভূমিতে ও মরুপ্রায় অঞ্চলে **কাঁটাগাছ** জন্মে ; ইহার মধ্যে ক্যাক্‌টাস গাছ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোবি ও তিব্বতে মন্দোষ্ণ মরুভূমি এবং আরব, ইরাণ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও রাজপুতানায় উষ্ণ মরুভূমি পরিলক্ষিত হয়। (৫) চীনের মধ্য ও উত্তরাংশ, জাপানের দক্ষিণাংশ, সাইবেরিয়ার পূর্ব উপকূল ও মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাংশে উষ্ণ শীতোষ্ণ অঞ্চলের **মিশ্র বনভূমি** দেখা যায়। এখানে সরলবর্গীয় ও চিরহরিৎ বৃক্ষের মিশ্র বনভূমি বিদ্যমান। কোন কোন অংশে পর্ণমোচী বৃক্ষও পরিলক্ষিত হয়। (৬) ভারত, ব্রহ্ম, পাকিস্তান, শ্যাম, ইন্দোচীন ও দক্ষিণ চীনের **মৌসুমী** অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের বনভূমি দেখা যায় ; পার্বত্য অঞ্চলে পাইন ও দেবদারু এবং অন্যান্য অঞ্চলে সেগুন, মেহগিনি, চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। (৭) ইন্দোনেশিয়া ও মালয়ের নিরক্ষীয় অঞ্চলে এবং ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অত্যধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে **চিরহরিৎ** বৃক্ষের নিবিড় বনভূমি বিদ্যমান। এই অঞ্চলের শক্ত কাঠ সর্বত্র মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভব নহে। (৮) ইউরোপের নিকটবর্তী **ভূমধ্য-সাগরীয়** জলবায়ু অঞ্চলের তুরস্ক, সিরিয়া, ইস্রাইল, আর্মেনিয়া এবং ইরাণের কিয়দংশে তৈলাক্ত দীর্ঘমূল ও কাঁটাযুক্ত গাছ এবং বিভিন্ন ফল জন্মিয়া থাকে।

অর্থনৈতিক উন্নতি (Economic Development)—কৃষিকার্যে এশিয়া মহাদেশ খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছে। বিস্তীর্ণ সমতলভূমি, নদী-উপত্যকা ও অনুকূল জলবায়ুর জন্য বিভিন্ন দেশে নানাপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে চীন, ভারত, পাকিস্তান, জাপান, এশীয় রাশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশী। এশিয়ার অধিকাংশ দেশ বহুদিন সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের অধীনে থাকায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয় নাই। বর্তমানে অধিকাংশ দেশ স্বাধীন হওয়ায় কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ধান, চা, পাট, রেশম, সয়াবীন ও আবাদী রবার এই মহাদেশের একচেটিয়া ফসল। ইহা ছাড়া গম, জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু, তৈলবীজ, তুলা, তামাক, সিঙ্কোনা প্রভৃতি এই মহাদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

পৃথিবীর কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনে এশিয়ার স্থান (১৯৬৩-৬৪)*

(কোটি মেঃ টন)

	পৃথিবীর মোট উৎপাদন	এশিয়ার উৎপাদন	এশিয়ার অংশ (শতকরা)	পৃথিবীতে এশিয়ার স্থান
ধান	২৪·৫৬	২২·৩০	৯০%	প্রথম
পাট	·২৪	·২৩	৯৬%	প্রথম
চা	·১০	·০৯	৯০%	প্রথম
রবার (আবাদী)	·২১	·১৯	৯৫%	প্রথম
ইক্ষু	৩১	১২	৩৯%	প্রথম
তামাক	·৩৮	১৪	৩৮%	প্রথম
তুলা	১·১৭	·২৯	২৫%	দ্বিতীয়
গম	২৫·১	৬·২	২৫%	দ্বিতীয়
রেশম	...	...	৮০%	প্রথম
যব	১০	১২	২২%	তৃতীয়

পশুপালনে এশিয়ার কয়েকটি দেশ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। গবাদি পশুপালনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। মেষপালনে চীন পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান এবং ভারত ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। শূকরপালনে চীন পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

* এশিয়ার পরিসংখ্যানে রাশিয়ার উৎপাদন ধরা হয় নাই। Source—F. A. O. Monthly Bulletins.

মৎস্য-শিল্পে বর্তমানে এশিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ মৎস্য এই মহাদেশে পাওয়া যায়। জাপান মৎস্য-শিকারে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং চীন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। জাপান ও চীনের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ও অগভীর সমুদ্র এই অঞ্চলের মৎস্য-শিকারে সাহায্য করিয়াছে। এশিয়ার-আভ্যন্তরীণ জলভাগেও মৎস্য পাওয়া যায়।

এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর **খনিজ সম্পদ** থাকিলেও পরাধীনতার ফলে এতদিন এই সকল খনিজ দ্রব্য আহরণে এই মহাদেশ ততটা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। বিভিন্ন দেশ স্বাধীন হইবার ফলে বর্তমান খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে; এশিয়ার খনিজ সম্পদের মধ্যে মালয়, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড ও চীনের রাং; ভারত ও চীনের লৌহ আকরিক; ভারত, চীন ও জাপানের কয়লা; ইরাক, ইরাণ, সৌদি আরব, কুওয়েট, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ ও ভারতের খনিজ তৈল; ভারতের ম্যাঙ্গানিজ ও অভ্র এবং চীনের অ্যান্টিমনি, টাংস্টেন ও কেওলিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীর খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনে এশিয়ার স্থান (১৯৬৩)

(কোটি মেঃ টন)

	পৃথিবীর মোট উৎপাদন	এশিয়ার উৎপাদন	এশিয়ার অংশ (শতকরা)	পৃথিবীতে এশিয়ার স্থান
কয়লা	২২৩	৫০	২২%	দ্বিতীয়
খনিজ তৈল	১২১	৩৭	২৯%	দ্বিতীয়
লৌহ আকরিক	৪৮·৩	৬·২	১২%	তৃতীয়
রাং (লক্ষ মেঃ টন)	১·৪৫	·৯২	৬৩%	প্রথম
অভ্র (সহস্র মেঃ টন)	১৩·৩	১১·১	৮৩%	প্রথম

পরিবহণ-ব্যবস্থায় এশিয়া মহাদেশ বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। আয়তনের তুলনায় এখানকার রেলপথ ও রাস্তাঘাট অনেক কম। অধিকাংশ দেশ পরাধীন ছিল বলিয়া এই দেশে **শিল্পের** উন্নতিসাধন সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই। পরাধীন থাকাকালীন সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ এশিয়ার দেশসমূহ হইতে কাঁচামাল লইয়া যাইত এবং শিল্পজাত দ্রব্য এই সকল দেশে রপ্তানি করিত। ভারত, চীন, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ বর্তমানে স্বাধীনতা লাভ করায় এই সকল দেশে পরিবহণ-ব্যবস্থার ও শিল্পের

উন্নতিসাধন হইতেছে। জাপান বহুদিন যাবৎ শিল্পে উন্নত ছিল। এশিয়া মহাদেশে বহু কুটীরশিল্প পরিলক্ষিত হয়। ভারত, চীন ও জাপান কুটীর-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য রাশিয়ার কয়েকটি দেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও চীনের চিনিশিল্প; ভারত, চীন ও জাপানের কার্পাসবয়ন-শিল্প; চীন ও জাপানের রেশমবয়ন-শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে জাপান পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান, চীন সপ্তম এবং ভারত দশম স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ এবং এশীয় রাশিয়া ক্রমশঃই বিভিন্ন শিল্পে উন্নতি লাভ করিতেছে।

জাপান (Japan)

জাপান বর্তমানে হনসু, হোক্কাইডো, কিউসিউ ও শিকোকু এই চারিটি দ্বীপ লইয়া গঠিত; ইহার আয়তন ৩,৬৮,৫০০ বর্গ-কিলোমিটার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বর্তমান জাপান, ফরমোসা, কারাফুটো (দঃ সাখালিন), কোরিয়া, কোয়াংটুং, মাঞ্চুরিয়া ও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ লইয়া জাপান সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। মহাযুদ্ধে হারিয়া যাইবার ফলে জাপান এই সাম্রাজ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

প্রাচ্যের বৃটেন—জাপানের অবস্থান বহুলাংশে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের মতো। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে এই দেশটি অবস্থিত। এখানকার জলবায়ুর সহিত বৃটেনের জলবায়ুর সাদৃশ্য দেখা যায়। দুইটি দেশই শিল্প ও বাণিজ্যে অত্যন্ত উন্নত। এইজন্য অনেকে জাপানকে "প্রাচ্যের বৃটেন" (Britain of the East) বলেন। জাপানের আয়তন বৃটেনের আয়তন অপেক্ষা সামান্য (২৫%) বেশী হইলেও জাপানের লোকসংখ্যা বৃটেন অপেক্ষা অনেক বেশী। উভয় দেশেই ঘন লোকবসতি বিদ্যমান; উভয় দেশ মহাদেশের প্রধান ভূভাগের অনতিদূরে অবস্থিত হওয়ায় বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে। উভয় দেশ দ্বৈপ অবস্থানভুক্ত এবং সৈকতরেখা ভগ্ন। ইহার ফলে উভয় দেশের বন্দর, জাহাজ-নির্মাণ ও বহির্বাণিজ্য উন্নতি লাভ করিয়াছে। উভয় দেশের লোক নৌবিদ্যায় সুনিপুণ এবং কর্মঠ। উভয় দেশের উপর দিয়া উষ্ণ সমুদ্রস্রোত যাইবার ফলে শীতের প্রকোপ কিছুটা কম। উভয় দেশ মৎস্য-শিল্পে উন্নত।

জাপানের সঙ্গে বৃটেনের এই সকল সাদৃশ্য থাকিলেও কয়েকটি বিষয়ে

উভয় দেশের মধ্যে **বৈসাদৃশ্য** বিদ্যমান। জাপান মহাদেশের পূর্বদিকে এবং বৃটেন পশ্চিমদিকে অবস্থিত। বৃটেন জাপানের মতো ততটা পর্বত-সঙ্কুল নহে এবং এই দেশে আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের উৎপাত নাই। জাপানের প্রায় অর্ধেক লোক কৃষিজীবী, কিন্তু বৃটেনে শতকরা মাত্র ১০ ভাগ কৃষিজীবী। বৃটেনে অপর্যাপ্ত কয়লা ও লৌহ আকরিক পাশাপাশি বিদ্যমান, কিন্তু জাপানে এই দুইটি খনিজ সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। জাপানের প্রধান শক্তিসম্পদ জলবিদ্যুৎ, কিন্তু বৃটেনেব প্রধান শক্তিসম্পদ কয়লা। বৃটেনে শ্রমিকের মজুরির হার অনেক বেশী ; কিন্তু জাপানে ইহার বিপরীত ; বৃটেনে অধিকাংশই বৃহদাকার শিল্প, কিন্তু জাপানেব শিল্প প্রধানতঃ মাঝারি ও ক্ষুদ্র কুটীবশিল্প লইয়া গঠিত।

অর্থনৈতিক উন্নতির কারণ (Causes of Economic Development)—জাপান শিল্প ও বাণিজ্যে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। তুলা পাওয়া না গেলেও কার্পাসবয়ন-শিল্পে এই দেশ পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার কবে এবং কার্পাস-বস্ত্র-রপ্তানিতে প্রথম স্থান অধিকার কবে। পর্যাপ্ত লৌহ আকরিক ও কয়লা এই দেশে পাওয়া না গেলেও এই দেশ পৃথিবীতে ইস্পাত-উৎপাদনে পঞ্চম স্থান এবং জাহাজ-নির্মাণে প্রথম স্থান অধিকাব করে। রেয়ন-বস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানিতে জাপান পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই দেশের অভাবনীয় অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে নিম্নলিখিত কারণসমূহ বিদ্যমান :

(ক) জাপানের **অবস্থান** বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়ক। পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় জাপান হইতে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার দেশসমূহের দূরত্ব খুব বেশী নহে ; ফলে আমদানি-রপ্তানির জন্য খুব বেশী ভাড়া দিতে হয় না। দ্বৈপ অবস্থানভুক্ত দেশ বলিয়া অন্য দেশ হইতে আক্রমণের আশঙ্কাও খুব কম। (খ) দ্বৈপ অবস্থানের জন্য এই দেশের **সৈকতরেখা** অনেক বেশী ; অধিকাংশ স্থানে ইহা ভগ্ন ; জাপানের কোন স্থানই সমুদ্রোপকূল হইতে ৩০০ কিলোমিটারের বেশী দূরে নহে। ইহার ফলে বন্দর-নির্মাণ সহজসাধ্য হইয়াছে এবং জাহাজ-নির্মাণ-শিল্পে এই দেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে। **জাহাজ**-নির্মাণে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। জাহাজের জন্য অন্ত দেশের উপর নির্ভরশীল নহে বলিয়া বহির্বাণিজ্যের উন্নতিসাধন সহজসাধ্য হইয়াছে। (গ) উষ্ণ কুরোশিও স্রোতের প্রভাবে

এখানে শীতের তীব্রতা কিছুটা কম থাকায় শীতকালেও কৃষিকার্য এবং অন্যান্য কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না। জলবায়ু মৃদু হওয়ায় শ্রমিকের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে বন্দরসমূহ সর্বদাই বরফমুক্ত থাকে। (ঘ) নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, শীতল ও উষ্ণ স্রোতের মিলন এবং অগভীর সমুদ্রের জন্য এই দেশ মৎস্য-শিকারে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। (ঙ) এই দেশের **মানুষ** অত্যন্ত নিপুণ ও কর্মঠ; ইহাদের চরিত্রবল উন্নত। ঘনবসতির জন্য কোন কাজে লোকের অভাব হয় না। (চ) জাপান সাম্রাজ্য পূর্বে নিকটবর্তী দেশ ও দ্বীপসমূহ লইয়া গঠিত ছিল বলিয়া ঐ সকল স্থানের কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ জাপানের শিল্পে নিয়োজিত হইত এবং এই দেশের শিল্পজাত দ্রব্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পরাধীন দেশসমূহে বিক্রয় হইত। (ছ) সমৃদ্ধিশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের নিকটবর্তী বলিয়া তুলা, লৌহ আকরিক প্রভৃতি এই দেশ হইতে আমদানি করা এবং রেশম, রেয়ন ও অন্যান্য জিনিস ঐ দেশে রপ্তানি করা সহজ। এইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্য সর্বাধিক হইয়া থাকে।

এই দেশের উন্নতিতে কয়েকটি **অসুবিধাও** পরিলক্ষিত হয়। অত্যধিক ঘনবসতি ও সমতলভূমির স্বল্পতা, কয়লা, লৌহ আকরিক ও তুলার জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভরশীলতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাব এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিপন্থী।

● **ভূ-প্রকৃতি (Physical Features)**—জাপানের অধিকাংশ স্থান পর্বত-সঙ্কুল; পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল ধরিয়া দুইটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী এই দেশের উত্তরদিক হইতে দক্ষিণদিকে প্রসারিত। ইহা ছাড়া দেশের মধ্যভাগে বিক্ষিপ্ত আগ্নেয়পর্বত বিদ্যমান। জাপান ভূমিকম্পবলয়ের অন্তর্গত বলিয়া দিনে গড়ে ৪ বার মৃদু ভূমিকম্প হয়; ৬।৭ বৎসরে একবার করিয়া এই ভূমিকম্প ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। এই দেশের আগ্নেয়গিরিসমূহের মধ্যে ফুজিয়ামা বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইহার উচ্চতা ৩,৬৬০ মিটার। এই দেশের অন্যান্য পর্বতসমূহের উচ্চতাও ২,১০০ মিটারের বেশী। সুতরাং এই দেশকে একটি পর্বতসঙ্কুল দেশ বলা যায়। জাপানে প্রধানতঃ তিনটি সমতলভূমি বিদ্যমান; যথা, টোকিও, কোবে-ওসাকা এবং নাগাসাকি সমতলভূমি। এই সমতলভূমির মোট আয়তন খুব বেশী নহে। এই দেশের অন্যান্য স্থানে পর্বত থাকায় এই তিনটি সমতলভূমিতে শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের সর্বাধিক উন্নতি

হইয়াছে। এই অঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী। পর্বতশ্রেণী এবং সমতলভূমি ভিন্ন জাপানের অন্যান্য স্থান মোটামুটি উচ্চভূমি।

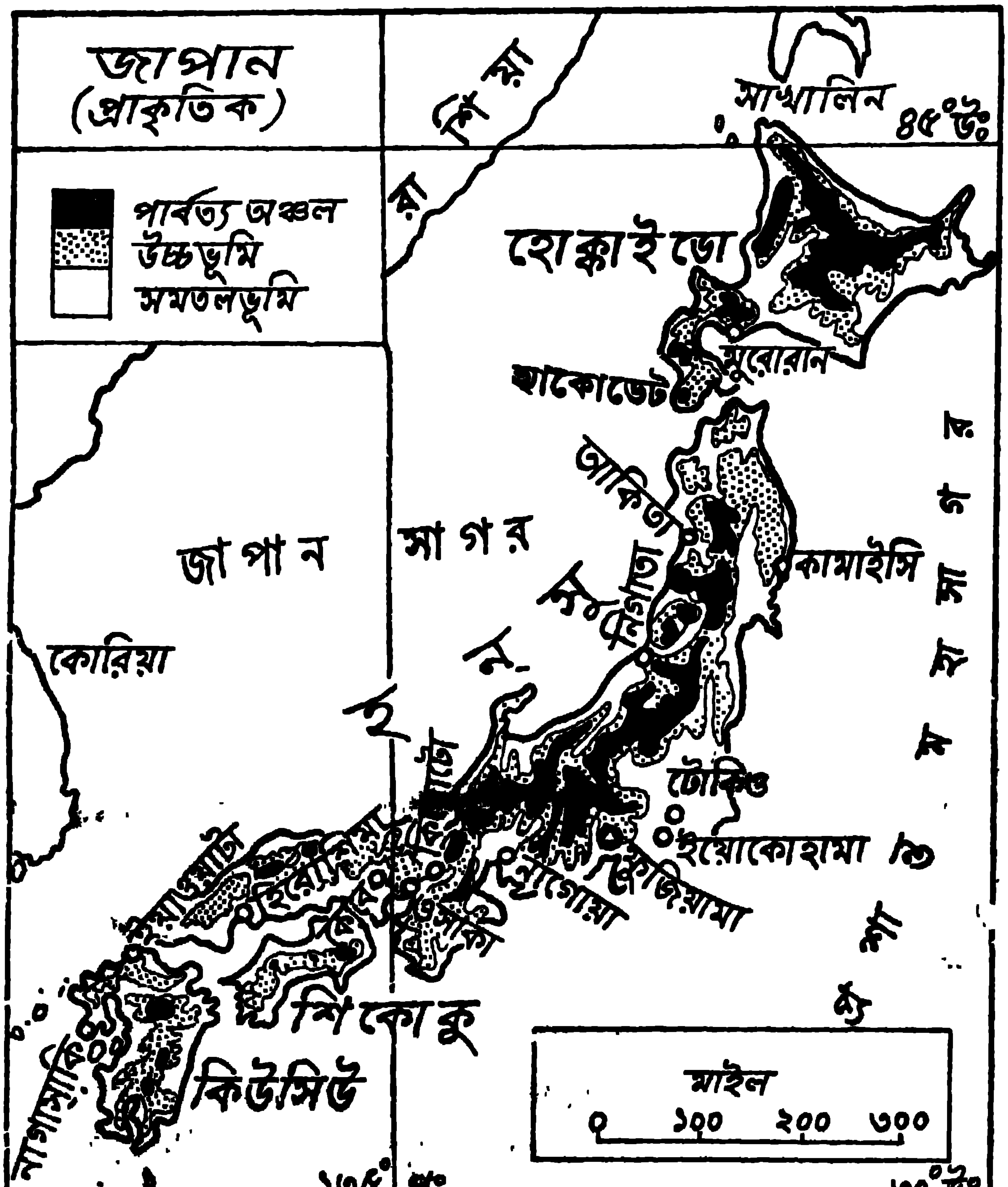

জলবায়ু (Climate)—জাপান ৩০° ও ৪৫° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া সম্পূর্ণভাবে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। ইহা ছাড়া সামুদ্রিক বায়ু এখানকার জলবায়ুর উপর প্রভাব বিস্তার করে। উষ্ণ কুরোসিও স্রোতের প্রভাবে জাপানের পশ্চিম উপকূলে তীব্র শীত পরিলক্ষিত হয় না। জাপানের শীতকালীন তাপমাত্রার গড় উত্তরাংশে –১০° সেঃ এবং দক্ষিণাংশে

৮° সেঃ পর্যন্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শীতকালে এই দেশে বৃষ্টিপাত হয় না; কিন্তু উত্তর-পশ্চিমা বায়ু জাপান সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার পর এই দেশে কোন কোন অংশে তুষারপাতের সৃষ্টি করে; পশ্চিমাংশের উপকূলে ইহার ফলে শীতকালে অল্প বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে এই দেশের গড় তাপমাত্রা উত্তরাংশে ১৫° সেঃ এবং দক্ষিণাংশে ২৭° সেঃ। অধিকাংশ বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালে হয়; বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উত্তরাংশে ১২০ সেঃ মিটার এবং দক্ষিণাংশে ৩০০ সেঃ মিটার পর্যন্ত হইয়া থাকে। জাপানের মৃদু জলবায়ু এখানকার শ্রমিকগণের কর্মক্ষমতা-বৃদ্ধির সহায়ক; আর্দ্র সামুদ্রিক বায়ু বয়ন-শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। স্থানীয় চাপবলয়ের জন্য জাপানে প্রায়ই প্রবল টাইফুন ঝটিকার সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে বহু বাড়ী, ফসল, গাছপালা ও সম্পত্তি নষ্ট হয়।

লোকবসতি (Population)—জাপানের লোকসংখ্যা ১৯৬৪ সালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ৯ কোটি ৬৯ লক্ষে, অর্থাৎ প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ২৫৩ জন। আয়তনের তুলনায় এখানকার লোকবসতি অত্যন্ত বেশী; ঘন লোকবসতি জাপানের একটি প্রধান সমস্যা। ইহার সমাধানের জন্য এই দেশকে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে হইয়াছে। জাপানের ভূমিভাগের শতকরা ১৭ ভাগ মাত্র কৃষিকার্যের উপযোগী। সেইজন্য এই সকল কৃষি অঞ্চলে অত্যধিক লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়—প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ১,০৭০ জন। বৃটেন, জার্মানী, ইটালি প্রভৃতি দেশের কৃষি অঞ্চলের বসতি-ঘনত্ব জাপান অপেক্ষা অনেক কম। কৃষকদের আয়ের দ্বিতীয় পন্থা হিসাবে কুটীরশিল্পের প্রসার হওয়ায় কৃষিকার্যে বহুলোক নিযুক্ত থাকে। স্থানীয় সরকার দেশের লোককে ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, পেরু প্রভৃতি দেশে যাইয়া বসবাস করিতে উৎসাহিত করিলেও জাপানীরা উগ্র জাতীয়তাবোধের জন্য বিদেশে যাইতে সাধারণতঃ রাজী হয় না। ইহা ছাড়া আমেরিকায় জাপানীদের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষ বিদ্যমান থাকায় এই মহাদেশে যাইয়া বসবাস করাও জাপানীদের পক্ষে কঠিন। অত্যধিক লোকবসতির জন্য এখানকার শ্রমিকের মজুরি অনেক কম।

কৃষিকার্য (Agriculture)—জাপানে কৃষিকার্যের উপযোগী জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম—মোট ভূমিভাগের শতকরা ১৭ ভাগ মাত্র। এইজন্য এই দেশের সমগ্র কৃষির উপযোগী জমির সামান্যতম অংশকেও চাষের আওতায়

আনা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পন্থায় অতি-উৎপাদন কৃষিপদ্ধতি (Intensive cultivation) এই দেশে প্রচলিত থাকায় হেক্টর-প্রতি উৎপাদন অত্যন্ত বেশী। কিন্তু মোট কৃষি-জমির পরিমাণ কম থাকায় এখনও এই দেশকে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হয়।

হেক্টর-প্রতি উৎপাদন

(কিলোগ্রাম)

ধান	৪,৮৬০	যব	২,৭৪৬
গম	২,৫৪৩	তামাক	২,০০০

জাপানের কৃষি-জমির পরিমাণ মাত্র ৫৪ লক্ষ হেক্টর; কৃষিকার্যের উপর এই দেশের শতকরা ৪৬ জন লোক নির্ভরশীল। গড়ে প্রতি পরিবার প্রায় '৯৭ হেক্টর জমির মালিক। অন্যান্য শিল্প-প্রধান দেশে কৃষক-প্রতি জমির পরিমাণ অনেক বেশী; জার্মানীতে কৃষক-প্রতি জমির পরিমাণ জাপানের ৫ গুণ, ফ্রান্সে ৭ গুণ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ গুণ। জাপানের নদী-উপত্যকা ও উপকূল ভাগের জলসিক্ত উর্বর 'হা' বা স্ুঁংসেঁতে জমিতে প্রধানতঃ ধান-চাষ হয়। 'হাটা' বা শুষ্ক জমির চাষ হয় প্রধানতঃ উত্তরাংশের শুষ্ক ও শীতল অংশে। পার্বত্য অঞ্চলের ঢালু জমিতে ও মালভূমিতে প্রধানতঃ চা-এর চাষ হইয়া থাকে; পাহাড়ের ঢালে 'সোপান' কৃষিপ্রথায় (Terrace-cultivation) চাষ হইয়া থাকে। সমতল সোপানে ধান এবং ঢালু সোপানে চা উৎপন্ন হয়। এই সকল সোপান প্রস্তুত করিতে বহু সুলভ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এই দেশের কৃষি-জমিতে প্রচুর পরিমাণে সার দেওয়া হয়। অধিকাংশ অঞ্চলে বৎসরে দুই বা ততোধিক বার শস্যোৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। কোন কোন স্থানে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একই সময়ে একই কৃষি-ক্ষেত্রে একাধিক শস্য রোপণ করা হইয়া থাকে।

কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩-৬৪)

(লক্ষ মেঃ টন)

ধান	১৬০	চা	'৮১
গম	১২	তামাক	১'৫৭
যব	১২	সয়াবীন	৪'১৮

ধান জাপানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফসল; ইহা জাপানের মোট কৃষি-জমির শতকরা ৬১ ভাগ দখল করিয়া আছে। এখানে হেক্টর-প্রতি ধান

উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। দক্ষিণ ও মধ্যভাগের উপক্রান্তীয় জলবায়ু, প্রচুর বৃষ্টিপাত, পলিমাটি এবং জলসেচের সুবন্দোবস্ত এই দেশের ধান-উৎপাদনে সাহায্য করিয়াছে। ধান-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। অধিকাংশ ধান দক্ষিণ ও মধ্য জাপানে উৎপন্ন হয়। এখনও জাপানকে বিদেশ হইতে চাউল আমদানি করিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোচীন ও ব্রহ্মদেশ হইতে এই দেশে চাউল আমদানি হইয়া থাকে।

চা জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল। দক্ষিণ জাপানের পার্বত্য অঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিম ঢালে অধিকাংশ চা উৎপন্ন হয়। চা-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দেশ হইতে প্রচুর চা আমদানি করে। **তামাক**-উৎপাদনে জাপান পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। **গম, যব, রাই** ও **সয়াবীন** প্রধানতঃ শুষ্ক অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া দক্ষিণাংশে বিভিন্ন **ফলের** চাষ হয়; ইহার মধ্যে আপেল, পীচ, আঙ্গুর, কমলালেবু প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৭৮ ভাগ উৎপন্ন করিয়া জাপান পৃথিবীতে **রেশম**-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। রেশম-কীটের জন্য নাগোয়া, বিওয়া হ্রদ ও সিওয়া নদীর মোহনায় প্রচুর তুঁত ও এরণ্ডের চাষ হইয়া থাকে। যেখানে প্রাকৃতিক কারণে ধানচাষ করা সম্ভবপর নহে, সেখানেই চাষীরা রেশম-চাষের উন্নতিসাধনে নিজেদের নিয়োগ করে। এই দেশে সারাবৎসরই সমানভাবে বৃষ্টিপাত ও উত্তাপ পাওয়া যায়। ইহাতে তুঁতগাছের শ্রীবৃদ্ধিসাধন সহজসাধ্য হয়। রেশম-কীট হইতে রেশম বাহির করিবার জন্য যে সুলভ ও নিপুণ শ্রমিক প্রয়োজন, তাহা এই দেশে অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়। কুটীরশিল্প হিসাবে **রেশম-চাষ** ও **রেশম-প্রস্তুতের কাজ (Sericulture)** সুন্দরভাবে করা হয়। প্রতি স্তরে সরকারী সাহায্য এই শিল্পের উন্নতির অন্যতম কারণ। সরকারী গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও নমুনা-কেন্দ্র ইহার উন্নতিতে সাহায্য করে। এইজন্য আজ জাপান রেশম-চাষ ও রেশম-প্রস্তুতে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

পশুপালন জাপানে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই; কারণ এখানকার প্রায় সমগ্র সমতলভূমি ও মালভূমি কৃষিকার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই দেশে প্রায় ৪০ লক্ষ গবাদি পশু, ১০ লক্ষ মেষ এবং ১৫ লক্ষ শূকর আছে।

মৎস্যশিল্পে জাপান পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ এই দেশে পাওয়া যায়। জাপানের নিকটবর্তী ওখটস্ক, বেরিং ও জাপান সাগরে অধিকাংশ মৎস্য পাওয়া যায়। উষ্ণ কুরোসিও ও শীতল কিউরাইল স্রোতের সংমিশ্রণ, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এবং অগভীর সমুদ্র থাকায় জাপানের তীরবর্তী অঞ্চলে বহু মৎস্য আসিয়া জড় হয়। এখানে হেরিং, হ্যাডক, সার্ডিন, বনিটো, কড্ প্রভৃতি মৎস্য আহৃত হয়। এই দেশের শতকরা ৯০ জন ধীবর উপকূলে মৎস্য-আহরণে নিযুক্ত থাকিলেও গভীর সমুদ্রে মৎস্য-আহরণ এই দেশে ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতেছে।

জাপানের সমগ্র ভূমিভাগের অর্ধেকের বেশী স্থানে **বনভূমি** দেখা যায়। বনজ সম্পদে এই দেশ কানাডা ও স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার সমকক্ষ। দক্ষিণ জাপানে উপক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি বিগুমান। পূর্ব ও পশ্চিম জাপানে সরলবর্গীয় ও পর্ণমোচী বৃক্ষের মিশ্র বনভূমি পরিলক্ষিত হয়; এই বনভূমির কাঠ অত্যন্ত মূল্যবান্ এবং কাগজশিল্পের উপযোগী। হোক্কাইডো ও হনসুর পার্বত্য অঞ্চলে প্রধানতঃ সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। জাপানের বনভূমি হইতে জ্বালানি, কাষ্ঠমণ্ড, বাঁশ, ফলমূল, তুঁত, কর্পূর প্রভৃতি মূল্যবান্ বনজ সম্পদ সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই দেশের বৃক্ষাদির মধ্যে পাইন, ওক্ ও ম্যাপ্‌ল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বনভূমির তুঁতগাছ এই দেশের রেশম-উৎপাদনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। ভূমিকম্পের জন্য এখানকার অধিকাংশ বাড়ী বাঁশ দ্বারা নির্মিত হয়; বনভূমির বাঁশ গৃহনির্মাণে সাহায্য করিয়াছে। এখানকার সরলবর্গীয় বৃক্ষ ও বাঁশ কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ প্রস্তুতে সহায়তা করে।

খনিজ সম্পদ (Minerals)—জাপানের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির তুলনায় খনিজ সম্পদের উৎপাদন অনেক কম; অধিকাংশ খনিজ দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। খনিজ সম্পদের অভাব না থাকিলে এই দেশ শিল্পে আরও উন্নতি লাভ করিতে পারিত।

খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩)

(লক্ষ মেঃ টন)

কয়লা	৫২	তাম্র	২·৯৫	স্বর্ণ (কিলোগ্রাম)	৯,৪১৫
লৌহ আকরিক	২৫	দস্তা	২·১৬	রৌপ্য (মেঃ টন)	২৫৯
খনিজ তৈল	৭·৮	সীসা	১·০১	গন্ধক	২·১৮

কয়লা এই দেশের প্রধান খনিজ সম্পদ; এই দেশের খনিজ দ্রব্যের মোট মূল্যের শতকরা ৬০ ভাগ আসে কয়লা হইতে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম বলিয়া বিদেশ হইতে কয়লা আমদানি করিতে হয়। ১৮৭৩ সালে সরকার প্রথম কয়লা-উত্তোলন আরম্ভ করিলেও, কয়লা-শিল্প উন্নতি লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা একশ্রেণীর ধনিকের ('জাইবাৎসু') হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই দেশের কয়লাখনিসমূহ আয়তনে ছোট বলিয়া সর্বত্র আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব নহে। জাপানের অধিকাংশ স্থানে কমবেশী কয়লা পাওয়া গেলেও কিউসিউ দ্বীপের উত্তরাংশ (৬০%) এবং হোক্কাইডো দ্বীপে (১৭%) অধিকাংশ কয়লা পাওয়া যায়। এই দেশের কয়লা উচ্চশ্রেণীর নহে। এখানকার কয়লার শতকরা ৪৪ ভাগ শ্রমশিল্পে, ৪২ ভাগ শক্তি-উৎপাদনে, ১২ ভাগ পরিবহণে ব্যয় করা হয়।

জাপানে খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লার পরেই স্বর্ণের স্থান। উত্তর হনসু এবং দক্ষিণ কিউসিউ অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী **স্বর্ণ** আহরিত হয়। সাধারণতঃ এই দেশে তাম্র ও রৌপ্যের সঙ্গে স্বর্ণ পাওয়া যায়। খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে **তাম্র**। তাম্র-উৎপাদনে জাপান পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। অধিকাংশ স্থানে ইহা পাওয়া গেলেও প্রধানতঃ আসিও, বেস্‌হি, ওসাকা, হিতাচি ও সাগানোসেকি অঞ্চলেই অধিকাংশ তাম্রখনি অবস্থিত। **খনিজ তৈল** এই দেশে প্রধানতঃ পাওয়া যায় টোকিও হইতে ৩৪০ কিলোমিটার উত্তরে আকিতা ও নিগাতা অঞ্চলে। হোক্কাইডোতেও অল্পবিস্তর তৈল পাওয়া যায়। এই দেশের চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগ তৈল বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। মধ্য এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এই দেশে অধিকাংশ তৈল আমদানি হইয়া থাকে। জাপানে প্রচুর **গন্ধক** (Sulphur) পাওয়া যায়। আগ্নেয় পর্বতশ্রেণী থাকিবার ফলেই গন্ধকের প্রাচুর্য সম্ভব হইয়াছে। উৎপন্ন গন্ধকের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানকার গন্ধক স্থানীয় সার-উৎপাদনে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম হইলেও কামাইসি ও মুরোরাণ অঞ্চলে এই দেশের অধিকাংশ **লৌহ আকরিক** উৎপন্ন হয়। এই দেশের সঞ্চিত লৌহভাণ্ডারের পরিমাণও অনেক কম। সুতরাং এই দেশকে চিরকাল বিদেশ হইতে লৌহ আমদানি করিতে হইবে। **দস্তা** ও **সীসা** উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য

স্থান অধিকার করে। ইহা প্রধানতঃ পাওয়া যায় হনসু ও কিউসিউ দ্বীপে। রাং, ম্যাঙ্গানিজ ও অ্যান্টিমনি কোন কোন অঞ্চলে অল্পবিস্তর পাওয়া যায়।

১৮৯২ সালে বিওয়া হ্রদের একটি স্রোত হইতে কিয়োটোতে জাপানের প্রথম জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। খনিজ তৈল ও কয়লার অভাব এই দেশকে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে উৎসাহিত করিয়াছে। বর্তমানে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। এখানকার সমগ্র শক্তিসম্পদের শতকরা ৭৫ ভাগ আসে জলবিদ্যুৎ হইতে। জাপানের শ্রমশিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে জলবিদ্যুৎ। শিল্প, পরিবহণ-ব্যবস্থা ও বাসস্থানে প্রধানতঃ জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। এই দেশের শতকরা ৯০ ভাগ বাসগৃহে বিদ্যুতের বন্দোবস্ত আছে। জাপানের ভূ-প্রকৃতি, অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, খরস্রোতা নদী, শ্রমশিল্পে বিদ্যুতের প্রচুর চাহিদা এবং কয়লা ও খনিজ তৈলের অভাব এই দেশের জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে সহায়তা করিয়াছে। মধ্য হনসুর পর্বতশ্রেণীর পূর্ব ও পশ্চিম ঢালে অধিকাংশ জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র অবস্থিত। জাপানের জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রসমূহের মধ্যে টোকিও, ইয়োকোহামা, ওসাকা, কোবে, কিয়োটো ও নাগোয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রমশিল্প (Industries)—জাপানের শিল্পোন্নতির ইতিহাস বহুদিনের নহে। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর অবসানের পর ১৮৯৪ সালে প্রকৃতপক্ষে এই দেশের শিল্পোন্নতি আরম্ভ হয়। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই দেশের শিল্পোৎপাদন ও রপ্তানি অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ছোট, মাঝারি ও বৃহদাকার এই তিনপ্রকার শিল্পেই জাপান উন্নত। জাপানে শিল্পে নিযুক্ত মোট ১·৮ কোটি লোকের মধ্যে মাঝারি ও ছোট শিল্পে ১.৪ কোটি (৭৮%) লোক নিযুক্ত আছে। দেশের শিল্পোন্নয়নে ও রপ্তানি-বৃদ্ধিতে এই মাঝারি ও ছোট শিল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। অর্থনৈতিক উন্নতির গর্বে মদোন্মত্ত হইয়া জাপান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। পরাজিত হইবার পর ইহার অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া যায় এবং শিল্পের ক্ষতিসাধন হয়। যুদ্ধের সময় এই দেশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইহার বাজার হারাইয়া ফেলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের রেশমদ্রব্যের প্রধান ক্রেতা ছিল; কিন্তু যুদ্ধের সময় এই দেশ ইহার পরিবর্তে রেয়ন ব্যবহার করিতে শুরু করে। ফলে যুদ্ধের পরেও জাপান তাহার পূর্বের বাজার উদ্ধার করিতে পারিতেছে

না। চীন, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতে জাপানের কার্পাস-বস্ত্র বিক্রয় হইত। যুদ্ধের সময় ইহারা জাপান হইতে কাপড় না পাইয়া কার্পাসবয়ন-শিল্পে স্বাবলম্বী হইয়া যাওয়ায় জাপান চিরকালের মতো এই সকল দেশের বাজার হারাইয়াছে। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপান শিল্পের উন্নতিসাধনে ব্রতী হইয়াছে। শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎকর্ষ সাধন করিয়া এবং খরচ কমাইয়া এই দেশ পুনরায় পৃথিবীর বাজারে প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে।

জাপানের শ্রমশিল্প সাধারণতঃ 'জাইবাৎসু' নামক একশ্রেণীর ধনীর করতলভুক্ত। চারিটি পরিবার এই দেশের সমগ্র শিল্পের এক-তৃতীয়াংশের মালিক এবং ১৫টি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান দেশের শতকরা ৭০ ভাগ শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে। এই দেশের মৃদু জলবায়ু, সুলভ জলবিদ্যুৎ, অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান, সরকারের সাহায্য, স্থানীয় সুলভ শ্রমিকের কর্মদক্ষতা, সমবায় পদ্ধতিতে কুটীরশিল্পের উন্নতি, বন্দর ও পোতাশ্রয়ের প্রাচুর্য এবং জাপানীদের উগ্র জাতীয়তাবোধ এই দেশের অভাবনীয় **শিল্পোন্নতির কারণ**। এই দেশের কুটীরশিল্প আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সুলভ জলবিদ্যুতের সাহায্যে চালিত হয় বলিয়া উৎপাদন-খরচ অনেক কম। কৃষকগণ অবসর সময়ে কুটীরশিল্পে কাজ করে বলিয়া ইহাদের মজুরি অত্যন্ত কম। জাপানের কুটীরশিল্প ও বৃহদাকার শিল্প একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। বহু কুটীরশিল্পে বৃহদায়তনের শিল্পের উৎপাদনের কোন কোন অংশ প্রস্তুত হয়; সর্বশেষে বিভিন্ন অংশ একত্র করিয়া বৃহদায়তনের শিল্প হইতে সম্পূর্ণ শিল্পজাত দ্রব্যাদি বাহির হইয়া আসে; যেমন, জাহাজনির্মাণ-শিল্পে জাহাজের বিভিন্ন অংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে প্রস্তুত হয়; এবং সকল অংশ একত্রিত হইয়া জাহাজটি বৃহদায়তন শিল্প হইতে বাহির হইয়া আসে। সুতা প্রস্তুত হয় কাপড়ের কলে; কিন্তু সেই সুতা হইতে কাপড় প্রস্তুত হয় কুটীরশিল্পে এবং কাপড়ে রং করা হয় পুনরায় কাপড়ের কলে।

জাপানের শ্রমশিল্পে কয়েকটি **অসুবিধাও** পরিলক্ষিত হয়। কয়লা ও লৌহ আকরিকের পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাব তন্মধ্যে অন্যতম। তুলা বিদেশ থেকে আমদানি করিতে হয়, কিন্তু জাহাজের অপর্যাপ্ত সরবরাহ, সুলভ জলপথ ও অন্যান্য সুবিধা এই সকল অসুবিধাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে।

শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৩)

(লক্ষ মেঃ টন)

ইস্পাত	৩১৫	অ্যালুমিনিয়াম	৩'২
কার্পাস-বস্ত্র	৪'৯	রেশম-বস্ত্র	১'৯৮
জাহাজ (লক্ষ GRT)	২৩৭	পশম (সূতা)	১'৫৩

জাপানের বিভিন্ন শিল্প কয়েকটি শিল্পাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এই সকল শিল্পাঞ্চল সম্বন্ধে পূর্বে "শ্রমশিল্প" অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

কার্পাসবয়ন-শিল্প—একসময় কার্পাস-বস্ত্র-উৎপাদনে জাপান পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেও বর্তমানে এই দেশ পঞ্চম স্থানে নামিয়া আসিয়াছে। ইহাই জাপানের সর্বপ্রধান শিল্প। এখনও কার্পাসবস্ত্র-রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। দেশের মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশের অধিক কার্পাস-বস্ত্র **রপ্তানি** করিয়া জাপান প্রভূত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে: ১৯৫০ সালে এই দেশ ১৫ লক্ষ মেঃ টন কার্পাস-বস্ত্র রপ্তানি করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশসমূহে এই দেশের কাপড় প্রধানতঃ রপ্তানি হয়। এই দেশে তূলা উৎপন্ন হয় না; সম্পূর্ণভাবে আমদানীকৃত তূলার উপর এই শিল্প নির্ভরশীল। ১৯৬১ সালে এই দেশ প্রায় ৩৩ লক্ষ গাঁট তূলা আমদানি করিয়াছিল। (ক) উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি, (খ) সুলভ ও নিপুণ স্ত্রী-শ্রমিক, (গ) আর্দ্র জলবায়ু, (ঘ) উৎকৃষ্ট পরিবহণ-ব্যবস্থা, (ঙ) সুলভ জলবিদ্যুৎ, (চ) নিকটবর্তী বন্দর ও (ছ) সরকারী সাহায্য এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মিশর হইতে এই দেশে অধিকাংশ **তূলা আমদানি** হইয়া থাকে। তূলা ও বাজারের জন্য জাপান বিদেশের উপর নির্ভরশীল বলিয়া এই শিল্পের উন্নতি বৈদেশিক রাজনীতি, অর্থনীতি এবং তূলা-সরবরাহকারী দেশসমূহের শিল্পোন্নতির উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের বাজার হারাইবার ফলে এবং বহু কারখানা যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইবার ফলে জাপানের কার্পাস-বস্ত্র রপ্তানির পরিমাণ ১৯৩৮ সালের ২৫১ কোটি বর্গগজ হইতে ১৯৪৮ সালে ৪২ কোটি বর্গগজে নামিয়া আসিয়াছিল; ১৯৫৬ সালে আবার ১২৬ কোটি বর্গগজে পৌঁছিয়াছে। এখনও পর্যন্ত জাপান যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থায় পৌঁছাইতে পারে নাই। জাপান বর্তমানে কার্পাস-বস্ত্র-রপ্তানিতে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার

করিলেও, বর্তমানে তাহাকে ভারতের সঙ্গে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অন্যদিকে চীনের উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় চীনের বিশাল বাজারও তাহাকে হারাইতে হইয়াছে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশেই ভারতের বস্ত্র রপ্তানি হইতেছে। দক্ষিণ আমেরিকার বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দখল করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং জাপানের কার্পাসবয়ন-শিল্পের ভবিষ্যৎ যে সন্দেহাতীত ভাবে উজ্জ্বল, একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, উৎপাদনের খরচ এখনও জাপানের সবচেয়ে কম* এবং এই দেশ বিভিন্ন রুচির কাপড় সহজেই প্রস্তুত করিতে পারে। এই সকল কারণে জাপানকে প্রতিযোগিতায় হারাইয়া দেওয়া কঠিন। বর্তমানে এই দেশ কার্পাস-বস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়া ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। **ওসাকা** জাপানের শ্রেষ্ঠ কার্পাস-শিল্পকেন্দ্র। এইজন্য ইহাকে 'প্রাচ্যের ম্যাঞ্চেস্টার' বলা হয়। ইহা ছাড়া কোবে, নাগোয়া এবং টোকিও অঞ্চলে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

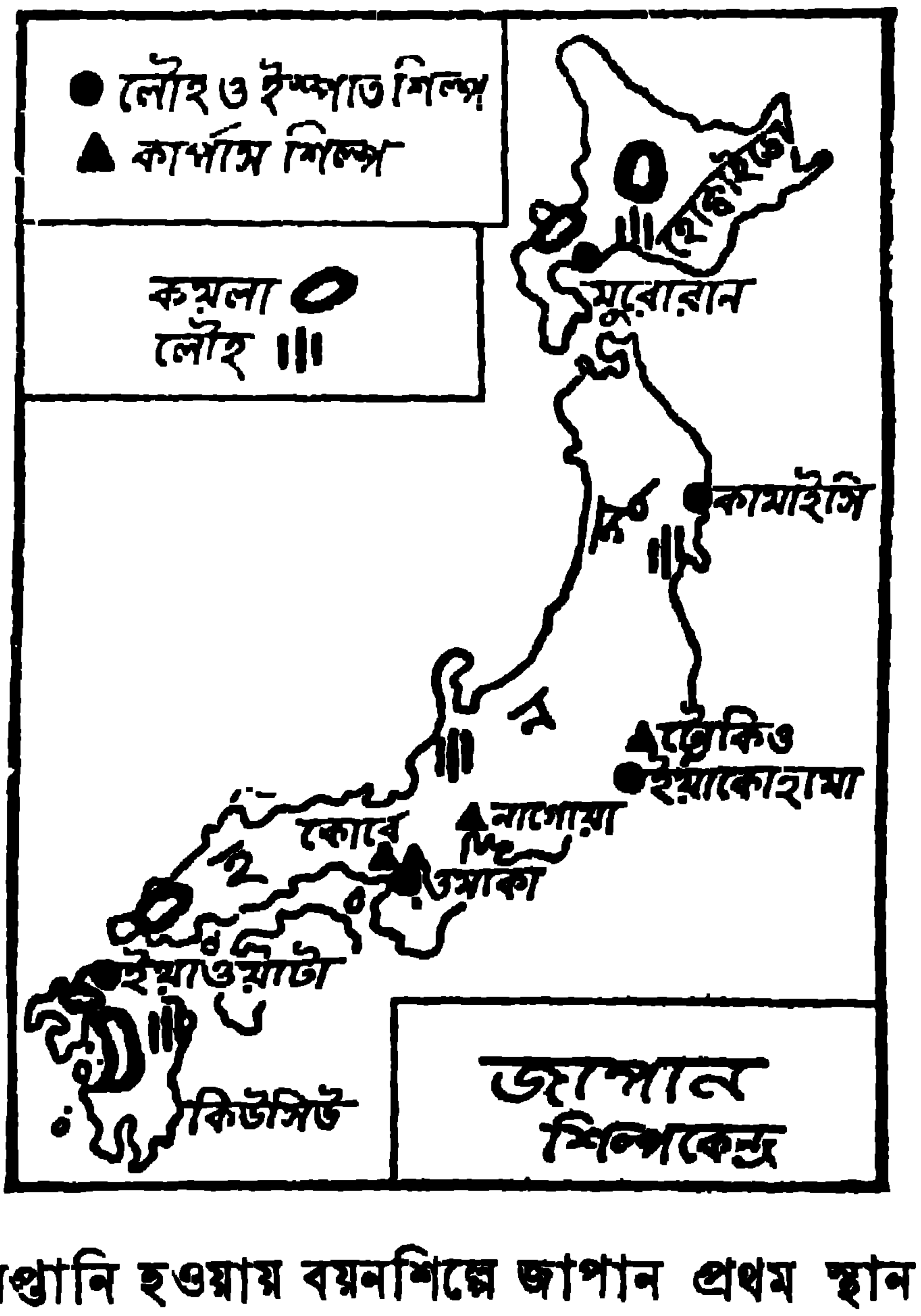

রেশমবয়ন-শিল্পে জাপান প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৭৮ ভাগ রেশম এই দেশে উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই দেশের পক্ষে রেশমবয়ন-শিল্পে উন্নতি লাভ করা সহজ। বহু রেশম কাঁচা অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়ায় বয়নশিল্পে জাপান প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারে না। কিয়োটো, কোয়াণ্টো, ইসিকাওয়া ও ইয়ামনসী প্রভৃতি স্থানে এই শিল্প প্রধানতঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে। **রেয়ন** বা কৃত্রিম

* ১৯৩০ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, জাপানের কার্পাসবয়ন-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের খরচ ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

রেশমবয়ন-শিল্পে জাপান পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বনভূমির সুলভ কাষ্ঠসম্পদ, সুলভ শ্রমিক ও জলবিদ্যুৎ এই দেশের রেয়নশিল্পের উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। মূল্য কম বলিয়া জাপানে রেয়ন-বস্ত্রের চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা ছাড়া মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক রেয়ন (১ লক্ষ মেঃ টন) রপ্তানি করিয়া রেয়ন-রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ এই দেশের রেয়ন-বস্ত্র আমদানি করিয়া থাকে।

পশমবয়ন-শিল্প—প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জাপান প্রথম পশম-বস্ত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। উত্তরাংশে শীতের প্রকোপ বেশী বলিয়া পশম-বস্ত্রের চাহিদা অনেক বেশী। নাগোয়া ও ওসাকা অঞ্চলেই এই শিল্প প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় পশমের উৎপাদন কম বলিয়া আমদানীকৃত পশমের উপর এই শিল্প নির্ভরশীল; পশম-আমদানিতে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক আওতায় আসিবার ফলে এই দেশের পশম-শিল্প অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে পুনরায় এই শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। ১৯৬০ সালে জাপান পশম-বস্ত্র-উৎপাদনে পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—জাপানের কয়লা ও লৌহ আকরিকের উৎপাদন পর্যাপ্ত না হইলেও বর্তমানে এই দেশ পৃথিবীতে ইস্পাত-উৎপাদনে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। জলবিদ্যুতের সাহায্যে কয়লার অভাব কিছুটা মিটানো হয় এবং অধিকাংশ লৌহ আকরিক ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপাইন, মালয় ও কানাডা হইতে আমদানি করা হয়। কোক-কয়লা আমদানি হয় চীন, অস্ট্রেলিয়া ও কোরিয়া হইতে। টুকরা লৌহ এখানকার শিল্পে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা স্থানীয় শিল্প হইতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত হইতে সংগৃহীত হয়। আমদানীকৃত লৌহ ও কয়লার উপর নির্ভরশীল বলিয়া এই শিল্প প্রধানতঃ বন্দরের নিকটেই গড়িয়া উঠিয়াছে। নিপুণ ও কর্মঠ শ্রমিক, উৎকৃষ্ট পরিবহণ-ব্যবস্থা, সরকারী সাহায্য এবং নিকটবর্তী বন্দর এই শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণ। কিউসিউ অঞ্চলের ইয়াওয়াটায় এশিয়ার বৃহত্তম ইস্পাত-কারখানা অবস্থিত। হনসুর কামাইসি, ইয়োকোহামা ও ওসাকা এবং হোক্কাইডোর মুরোরাণ এই দেশের উল্লেখযোগ্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র। এই দেশের ইস্পাত

প্রধানতঃ দেশীয় শিল্পে ব্যবহৃত হয় এবং বাকী অংশ রপ্তানি হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশসমূহে।

স্থানীয় লৌহ ও ইস্পাতের সাহায্যে এই দেশের কোবে ও নাগাসাকিতে **জাহাজনির্মাণ-শিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই শিল্পের উৎপাদন হ্রাস করিবার চেষ্টা করিলেও, বর্তমানে এই শিল্পে জাপান পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই দেশের সুলভ কাষ্ঠ-সম্পদ ও জলবিদ্যুৎ, স্থানীয় ইস্পাত, বহির্বাণিজ্যের জন্য জাহাজের চাহিদা ও সুন্দর পোতাশ্রয় জাহাজ-নির্মাণে সহায়তা করিয়াছে। জাপানে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায় বলিয়া সুলভ জলবিদ্যুতের সাহায্যে **রাসায়নিক শিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে। সার-উৎপাদনে এই দেশ প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে বলিয়া কৃষিকার্যের উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। জাপানের উত্তরাংশের সরলবর্গীয় বৃক্ষের নরম কাঠ এবং দক্ষিণাংশের বাঁশের সাহায্যে এই দেশ **কাগজশিল্পে** উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই দেশের রাসায়নিক শিল্প এবং সুলভ জলবিদ্যুৎ কাগজশিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। শিজোয়োকা এই দেশের কাগজশিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

ইহা ছাড়া এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোটর-গাড়ী, বাই-সাইকেল, বিমানপোত, চর্মদ্রব্য, সিমেণ্ট, কাচ, খেলনা, চীনামাটির বাসন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি নির্মাণের কারখানা আছে।

পরিবহণ-ব্যবস্থা (Communications)—চারিদিকে সমুদ্র থাকায় জাপান জলপথে উন্নতি লাভ করিয়াছে। সমুদ্রপথে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও সংঘটিত হয়। পর্বতসঙ্কুল দেশ বলিয়া রেলপথের প্রভূত উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয় নাই। প্রধান রেলপথটি হনসুর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের সিমোনোসেকি শহর হইতে আরম্ভ করিয়া হিরোশিমা, কোবে, ওসাকা, কিয়োটো, নাগোয়া, ইয়োকোহামা হইয়া টোকিও পর্যন্ত গিয়াছে; টোকিও হইতে ইহা হনসুর উত্তর প্রান্তে অবস্থিত আওমোরি পর্যন্ত গিয়াছে। অপর একটি রেলপথ কিয়োটো হইতে জাপানের পশ্চিম উপকূল ধরিয়া হনসু দ্বীপের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত গিয়াছে। বর্তমানে এই দেশে প্রায় ২৭,৭৮৭ কিলোমিটার রেলপথ আছে। জাপানের নদীসমূহ নাব্য না হইলেও জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক।

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)—বাণিজ্যে জাপান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। বহুদিন যাবৎ এই দেশ পৃথিবীর বহু দেশের সঙ্গে বাণিজ্য

চালাইয়া আসিতেছে। প্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে জাপান এতদিন সর্বাপেক্ষা বেশী শিল্পোন্নত দেশ ছিল বলিয়া কাছাকাছি দেশসমূহের সঙ্গে জাপান বহির্বাণিজ্য সংঘটিত করিত এবং আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি অধিক হইত। কিন্তু বর্তমানে চীনের অভাবনীয় অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়ায় এই দেশে জাপানের রপ্তানির পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে এবং ইহার ফলে কিছুদিন প্রতিকূল বাণিজ্যের গতি পরিলক্ষিত হইতেছিল। জাপানের বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এই দেশে প্রধানতঃ শিল্পের কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য আমদানি হয় এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানি হয়।

জাপানের বহির্বাণিজ্যের প্রগতি (কোটি ডলার)

	আমদানি	রপ্তানি
১৯৪৬	১'১	০'৬৩
১৯৫৩	৪৪৯'১	১২৭ ৫০
১৯৬০	২৪১'০	৪০৫'৫০

জাপানের **রপ্তানি**-দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস-বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, রেয়ন-বস্ত্র, ইস্পাত-দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, রেশম, চীনামাটির দ্রব্য, খেলনা, চা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোট রপ্তানির শতকরা ৬৬ ভাগ কার্পাস-বস্ত্র এবং ২০ ভাগ যন্ত্রপাতি। এই দেশের **আমদানি**-দ্রব্যের মধ্যে তুলা, লৌহ আকরিক, খনিজ তৈল, চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাপানের অধিকাংশ রপ্তানি-দ্রব্য (৪০%) এশিয়ার দেশসমূহে প্রেরিত হয়। আমদানি-দ্রব্যের অধিকাংশ (৪৫%) আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে। জাপানের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বর্তমান থাকায় জাপানের সহিত আমেরিকার দেশসমূহের বাণিজ্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ফিলিপাইন, মালয়, ভারত ও ইন্দোনেশিয়া হইতে জাপান বিভিন্ন কাঁচামাল (লৌহ, রবার, তূলা প্রভৃতি) আমদানি করিয়া থাকে।

শহর ও বন্দর (Cities & Ports)—টোকিও উপসাগরের তারে অবস্থিত **ইয়োকোহামা** জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। এই বন্দরটি সুরক্ষিত; ইহার মাধ্যমে রেশম, পশম, চা, চাউল, যন্ত্রপাতি ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি হয় এবং খাদ্যদ্রব্য, লৌহ আকরিক, তূলা, ময়দা, চিনি প্রভৃতি আমদানি হয়। **ওসাকা** জাপানের শ্রেষ্ঠ শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার কার্পাস-বয়নশিল্প জগদ্বিখ্যাত; এইজন্য ইহাকে 'প্রাচ্যের ম্যাঞ্চেস্টার' বলা হয়।

ইস্পাত, যন্ত্রপাতি-নির্মাণ, জাহাজ-নির্মাণ, কাগজ প্রভৃতি শিল্পও এখানে উন্নতি লাভ করিয়াছে। জাপানের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বন্দর **কোবে** জাহাজ-নির্মাণ, রেশম, দিয়াশলাই ও রবার শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানে একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় আছে। কোবে শহরের চারিদিকে পর্বত থাকায় স্থানাভাবে ইহার উন্নতি ব্যাহত হয়। **টোকিও** জাপানের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর। লোকসংখ্যায় এই শহর পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে; হনসুর পূর্ব উপকূলে অবস্থিত এই শহরে কাচ, রবার, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও মুদ্রণ-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কৃত্রিম পোতাশ্রয়ের সাহায্যে **নাগোয়া** বন্দর উন্নতি লাভ করিয়াছে; রেশম, চীনামাটির বাসন ও বিমানপোত-নির্মাণশিল্পের জন্য এই বন্দর বিখ্যাত। **কিয়োটো** একটি প্রাচীন শিল্পনগরী। এই শহর জাপানের পুরাতন রাজধানী ও প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। হোক্কাইডো দ্বীপের প্রধান বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র **হাকোডেট**। কিউসিউ দ্বীপের প্রধান শহর **নাগাসাকি** কয়লা আমদানির বন্দর ও নৌ বন্দর। হনসু দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত **হিরোশিমা** বন্দর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল। বর্তমানে পুনরায় ইহার উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

চীন (China)

লোকসংখ্যায় চীন বর্তমানে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দেশ। ২২টি প্রদেশ, ৫টি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং ২টি কেন্দ্রীয় শাসিত শহর লইয়া চীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (People's Republic of China) গঠিত। এই দেশের আয়তন প্রায় ৯৬ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার—এশিয়ার মোট আয়তনের প্রায় এক-চতুর্থাংশের সমান। আয়তনে এই দেশ পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে—রাশিয়া ও কানাডার পরেই চীনের স্থান। বিশাল আয়তনের এই দেশের উত্তরে রাশিয়া ও মঙ্গোলিয়া, পশ্চিমে আফগানিস্তান, দক্ষিণে ভারত, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, লাওস্ ও ভিয়েটনাম এবং পূর্বে কোরিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত। ১৮° উঃ হইতে ৫৩° উঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত এই দেশ বিস্তৃত; উত্তর হইতে দক্ষিণে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫,৫০০ কিলোমিটার এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রায় ৫,০০০ কিলোমিটার।

বহুযুগ ধরিয়া চীনসাম্রাজ্য বিভিন্ন সম্রাটের অধীনে ছিল। ১৯১২ সালে এই সাম্রাজ্যের পতন হওয়ায় এই দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও বহুদিন যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যপুষ্ট চিয়াং কাইশেক চক্রের সরকারের সঙ্গে মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে পরিচালিত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের গৃহযুদ্ধ চলিতেছিল। ১৯৪৯ সালে বিপ্লবীগণ জয়লাভ করে; ফলে চিয়াং চক্রকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া বিপ্লবীগণ স্বাধীন সরকার গঠন করে।

ভূ-প্রকৃতি (Physical Features)—চীনের প্রধান ভূভাগ পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঢালু। মোটামুটি ১১০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের পশ্চিমাংশে পর্বত ও সুউচ্চ মালভূমি বিদ্যমান এবং ইহার পূর্বাংশে সমতলভূমি সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত। যতই পশ্চিমে যাওয়া যায়, ততই ভূমির উচ্চতা বাড়িতে থাকে। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে চীনকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যায়:

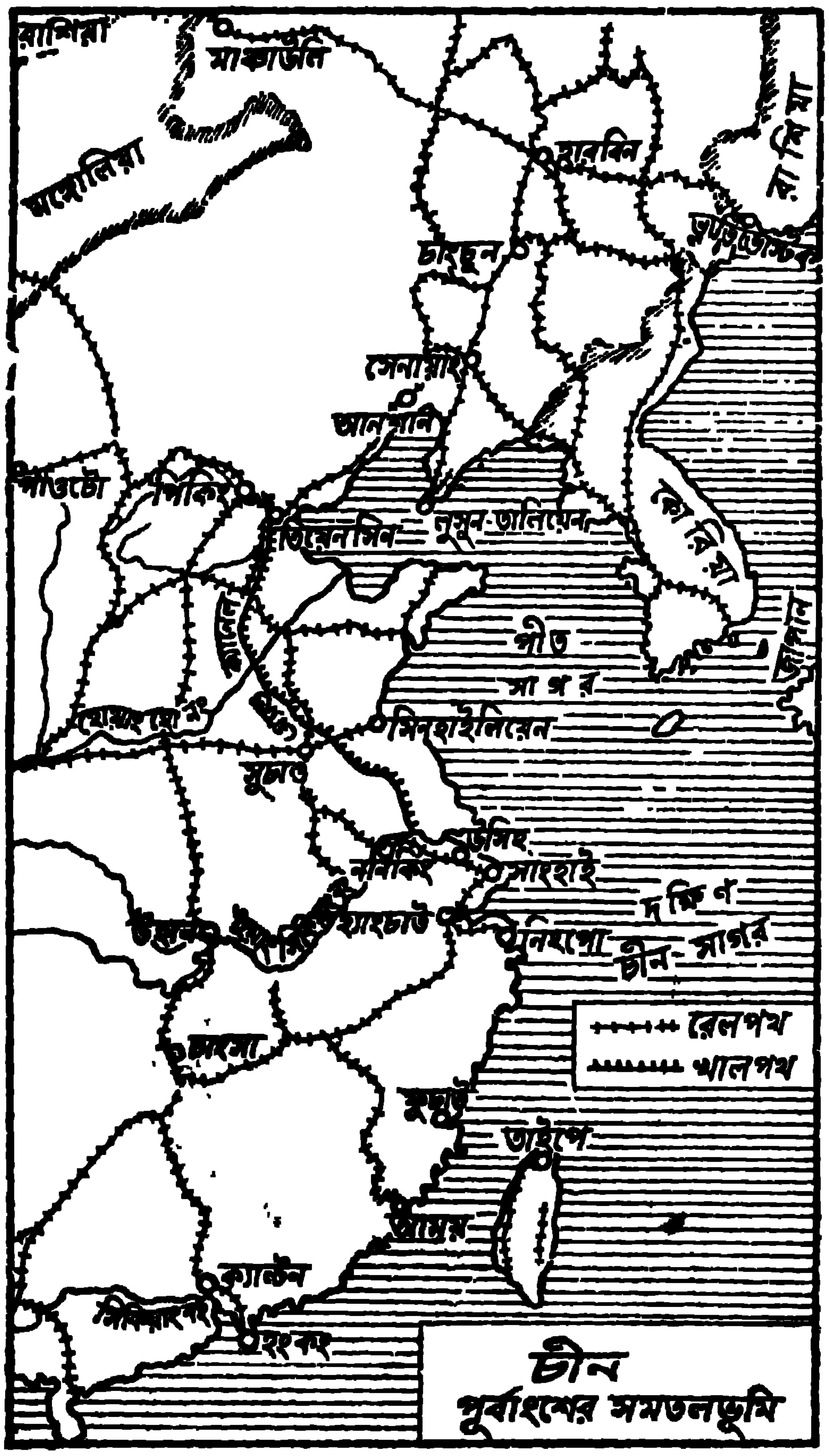

চীন
পূর্বাংশের সমতলভূমি

(ক) পূর্বাংশের সমতল ভূমি—অন্তর্মঙ্গোলিয়ার উত্তরে অবস্থিত খিনগান পর্বত হইতে আরম্ভ করিয়া তাইহাং পর্বত ধরিয়া উত্তর-দক্ষিণে ইউনান মালভূমি পর্যন্ত একটি রেখা টানিলে ইহার পূর্বাংশের অধিকাংশ স্থান

সমতলভূমি; ইহা চীনের মোট ভূমিভাগের মাত্র এক-দশমাংশ। এই সমতলভূমির উপর দিয়া চীনের বিখ্যাত তিনটি নদী প্রবাহিত; উত্তরাংশে হোয়াংহো বা পীত নদী, মধ্যভাগে ইয়াং-সি-কিয়াং এবং দক্ষিণাংশে সি-কিয়াং নদী এই অঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। এই সকল নদীর উপত্যকায় পলিমাটি থাকায় ধান-চাষের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সমুদ্র হইতে আগত বায়ু এই সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং পশ্চিমাংশের পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রচুর বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে। ইহার ফলে চীনের এই অংশ কৃষিকার্যে বিশেষ উন্নত। ইয়াংসি নদী প্রথমে ৩০০ মিটার উচ্চ জেচুয়ান প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় ইহার উপত্যকায় কৃষিকার্যের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। সেইজন্য জেচুয়ান অঞ্চলও কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চল।

(খ) **পশ্চিমাংশের পার্বত্য অঞ্চল**—হোলান পর্বত হইতে দক্ষিণে চিউংলাই পর্বত হইয়া হেংচুয়ান পর্বত পর্যন্ত একটি রেখা টানিলে, এই রেখার পশ্চিমাংশে পর্বত ও সুউচ্চ মালভূমি দেখা যাইবে। এই সকল পর্বত ও মালভূমির উচ্চতা ২০০০ মিটারের বেশী। এখানকার পর্বতের মধ্যে আলতাই, তিয়েনসান, কুয়েনলুন, হিমালয়, হেংচুয়ান ও বায়ান কারা পর্বত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'পৃথিবীর ছাদ' সর্বোচ্চ মালভূমি তিব্বত এই অঞ্চলেই অবস্থিত। এই অঞ্চলের দক্ষিণে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত এভারেস্ট অবস্থিত। চীনের বিভিন্ন নদীর উৎস এই অঞ্চলের পর্বতশ্রেণী। কৃষিকার্যের উপযোগী না হইলেও এই অঞ্চল খনিজ ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ।

(গ) **মধ্যভাগের মালভূমি**—পূর্বাংশের সমতলভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমাংশের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত মধ্যভাগের মালভূমি মোটামুটি ১০০০ হইতে ২০০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চ। এখানকার মালভূমির মধ্যে অন্তর্মঙ্গোলিয়া, লোয়েস্ ও ইউনান-কোয়েচাউ মালভূমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোয়েস্ ও ইউনান-কোয়েচাউ মালভূমির নিম্নাংশে কৃষিকার্য হয় এবং অন্তর্মঙ্গোলিয়া ও তিব্বতে প্রধানতঃ পশুপালন হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে বহু খনিজ সম্পদ বিদ্যমান।

জলবায়ু (Climate)—বিশাল আয়তনের এই দেশে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু থাকা স্বাভাবিক। দক্ষিণ চীনের উপর দিয়া কর্কটক্রান্তি চলিয়া গিয়াছে; সুতরাং এই দেশের দক্ষিণাংশে ক্রান্তীয় বা উপক্রান্তীয় জলবায়ু

এবং উত্তরাংশে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। উত্তরাংশের বরফাচ্ছাদিত অঞ্চলের হারবিন শহরের লোক যখন অত্যধিক শীতের প্রকোপে জড়সড়, তখন দক্ষিণাংশের ক্যান্টন শহরের লোক গরমে ছটফট করে। শীতকালে দক্ষিণাংশের ইউনান অঞ্চলের **তাপমাত্রা** ৮° সেঃ-এর উপরে ওঠে এবং ইয়াংসি-উপত্যকায় ০° সেঃ পর্যন্ত নামে; কিন্তু উত্তরাংশে তাপমাত্রা −৮° হইতে −২০° সেঃ পর্যন্ত হইয়া থাকে। উত্তরাংশের অধিকাংশ স্থান এইসময় বরফে আচ্ছাদিত থাকে। গ্রীষ্মকালে এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রার তারতম্য অনেক কম; উত্তরাংশে এইসময় মোটামুটি ২০° সেঃ এবং দক্ষিণাংশে ২৮° সেঃ তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। অভ্যন্তরভাগের তুর্ফান অঞ্চলে তাপমাত্রা সর্বাপেক্ষা বেশী। চীনের গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা কৃষিকার্যের উপযোগী বলিয়া এই দেশ কৃষিজ দ্রব্য-উৎপাদনে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। চীনের ভূ-প্রকৃতি আলোচনা করিবার সময় দেখা গিয়াছে যে, পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে এই দেশ ঢালু হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সমুদ্র হইতে আগত জলকণাযুক্ত বায়ু মধ্যভাগের মালভূমি ও পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পূর্বাংশে বৃষ্টিপাতের সঞ্চার করে। সেইজন্য পূর্বাংশে অত্যধিক **বৃষ্টিপাত** হইলেও, পশ্চিমাংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত কম। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে ১৫০-২০০ সেঃ মিঃ, দক্ষিণাংশে ১০০-১৫০ সেঃ মিঃ, উত্তর-পূর্ব উপকূলে ৫০-৭৫ সেঃ মিঃ এবং উত্তর ও পশ্চিমাংশের বিভিন্ন অঞ্চলে ০-৫০ সেঃ মিঃ। দক্ষিণ ও পূর্বাংশের প্রচুর বৃষ্টিপাত চীনের কৃষিকার্যে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। এই দেশের অধিকাংশ (৮০%) বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালে হইয়া থাকে। দক্ষিণ চীন মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেশী।

চীনের জলবায়ুর এই বৈসাদৃশ্যের দরুন অর্থনৈতিক সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই বিদ্যমান। শীতপ্রধান উত্তরাংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের কাষ্ঠ জন্মে; ইহা অত্যন্ত মূল্যবান্। দক্ষিণাংশের অত্যধিক বৃষ্টিপাত বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের সহায়ক; উত্তরাংশের শীত ও কম বৃষ্টিপাত গমচাষের উপযোগী। অন্যদিকে পশ্চিমাংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম বলিয়া কৃষিকার্যের উন্নতি সম্ভবপর নহে; শীতকালীন মৌসুমী বৃষ্টিপাত কৃষিকার্যের ক্ষতি সাধন করে। পূর্বাংশে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য নদীতে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। সাইবেরিয়া হইতে আগত ঠাণ্ডা বাতাস উত্তরাংশের প্রচণ্ড শীতের জন্য দায়ী।

টাইফুনের জন্য পূর্ব উপকূল, বিশেষতঃ তাওয়াই (ফরমোসা), ফুকিয়েন ও কোয়াংটুং অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নদী (Rivers)—চীনের অর্থনৈতিক উন্নতিতে এই দেশের নদীসমূহের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমাংশের পর্বত ও উচ্চভূমি হইতে এই দেশের অধিকাংশ নদী উত্থিত হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। কৃষিকার্যে জলের সরবরাহ, উপত্যকায় মৃত্তিকার উর্বরতা-বৃদ্ধি, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন ও জলপথের উন্নতিসাধন এই দেশের নদীসমূহের প্রধান কাজ। মধ্য ও দক্ষিণ চীনের নদীসমূহ শীতকালে বরফাচ্ছাদিত হয় না বলিয়া অধিক কার্যকরী। **হোয়াংহো** বা পীত নদীর দৈর্ঘ্য ৪,৮১৫ কিলোমিটার। ইহা বায়ান কারা পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পো হাই উপসাগরে পড়িয়াছে। এই নদী প্রচুর পরিমাণে পীতবর্ণ পলিমাটি বহন করিয়া আনে এবং নদীগর্ভ ভরাট করে; সেইজন্য প্রায়ই নদীতে বিধ্বংসী বন্যার সৃষ্টি হয় এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়; এইজন্য ইহাকে 'চীনের দুঃখ' (China's Sorrows) বলা হয়। যদিও পূর্বে এই নদীতে গড়ে প্রতি দুই বৎসরে একবার করিয়া ভয়ঙ্কর বন্যা হইত, বর্তমানে সরকার বন্যানিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করায় এখন আর সেরূপ বিধ্বংসী বন্যা হয় না। ইহা ছাড়া এই নদীর উপর ৪৬টি বাঁধ দিয়া ১১,০০০ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, জলপথের উন্নতিসাধন, বন্যা-নিয়ন্ত্রণের পাকা বন্দোবস্ত ও জলসেচের ব্যবস্থা করা হইতেছে; পীত নদী নিয়ন্ত্রণের এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বহুমুখী পরিকল্পনা। এই নদী বিশেষ সুনাব্য নহে; কিন্তু বর্তমানে নিয়ন্ত্রণের ফলে কোন কোন অংশে নৌ-চলাচল হইয়া থাকে। **ইয়াংসি** নদী (৫,৫০০ কিলোমিটার) চীনের দীর্ঘতমা নদী; চিংঘাই প্রদেশের কোকো সিলি পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া মধ্য চীনের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর উপত্যকা অত্যন্ত উর্বর এবং চীনের প্রায় অর্ধেক লোক ইহার উপত্যকায় বাস করে। উপত্যকায় গাছপালা থাকায় পলিমাটি দ্বারা নদীগর্ভ ভর্তি হয় না বলিয়া এই নদীতে বন্যা হয় না। মোহনা হইতে এই নদী প্রায় ২,৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত সুনাব্য। **সিকিয়াং** ইউনান মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ চীনের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ চীন সাগরে পড়িয়াছে। এই নদীর উপত্যকাও উর্বর এবং কৃষিকার্যের উপযোগী। ইহা মোহনা হইতে প্রায় ১,৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত সুনাব্য।

ইয়াংসি ও সিকিয়াং বরফাবৃত না হওয়ায় সারাবৎসর সুনাব্য। হোয়াংহো, ইয়াংসি ও সিকিয়াং এই তিনটি নদীর উপত্যকা চীনের সর্বাপেক্ষা উন্নত অঞ্চল; বস্তুতঃ ইহাই চীনের প্রাণকেন্দ্র। চীনের কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য প্রধানতঃ এই তিনটি নদীর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি নদী ছাড়াও এই দেশে হাই হো, লিয়াও হো, হুয়াই, হিলুং কিয়াং, চিয়েনটাং, লাণ্টসাং, সুকিয়াং, তারিম প্রভৃতি নদী বিদ্যমান।

চীনের **খালপথ** জগদ্বিখ্যাত। চীনের মোট খালপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০,০০০ কিলোমিটার। ইহার মধ্যে গ্র্যাণ্ড ক্যানেল পৃথিবীর দীর্ঘতম খাল; ইহার দৈর্ঘ্য ১,৭৮২ কিলোমিটার। খ্রীঃ পূঃ ৫০০ সালে ইয়াংসির সহিত হোয়াংহোকে যুক্ত করিবার জন্য এই খাল খনন করা হয়। (২৫৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য।) হাই হো, হোয়াংহো, হুয়াই, ইয়াংসি ও চিয়েনটাং এই পাঁচটি নদীকে এই খাল সংযুক্ত করিয়াছে।

লোকবসতি (Population)—লোকসংখ্যায় চীন দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। বর্তমানে এই দেশের লোকসংখ্যা প্রায় ৬৮ কোটি ৬৪ লক্ষ—পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের কিছু কম। গড়ে প্রতিবর্গ-কিলোমিটারে লোকবসতি প্রায় ৭০ জন। লোকবসতির ঘনত্ব সর্বত্র সমান নহে। এই দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া শতকরা ৮৭ জন লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে। দেশের পূর্বাংশের সমতলভূমিতে বিশেষতঃ ইয়াংসি, সিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর উপত্যকায় এই দেশের অধিকাংশ লোক বাস করে; উপত্যকা অঞ্চলের উর্বর মৃত্তিকা ও নদীসমূহের অবদানের জন্য এই অঞ্চলে কৃষিকার্য ও শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে; সেইজন্য এখানে লোকবসতির ঘনত্বও সর্বাধিক, প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ২০০ জন। অন্তর্মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, সিংকিয়াং প্রভৃতি মালভূমি উচ্চ হওয়ায় এবং মরুপ্রায় বলিয়া এখানকার লোকবসতি বিরল। ইউনান মালভূমি অঞ্চলে খনিজ সম্পদের জন্য নিবিড় লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। বিপ্লবের পর সরকার উত্তর-পশ্চিম অংশের উন্নতি সাধন করিবার ফলে ঐ অঞ্চলের লোক-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দেশের অধিকাংশ লোক হানজাতীয়; ইহা ছাড়া মঙ্গোলীয়, হুই, তিব্বতীয় ও চুয়াং জাতীয় লোকও এই দেশে বাস করে।

মৃত্তিকা (Soil)—বিশাল আয়তনের এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা-প্রকার মৃত্তিকা থাকা স্বাভাবিক। চীনের দক্ষিণাংশে প্রধানতঃ পেডলফার-

জাতীয় মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম-কণায় সমৃদ্ধ। এই মৃত্তিকা কোথাও রক্তবর্ণের, কোথাও বাদামী। এই অঞ্চলের নদী-উপত্যকায় পলিমাটি দেখা যায়; ধানচাষের পক্ষে এই মৃত্তিকা বিশেষ উপযোগী। উত্তরাংশের শীতপ্রধান অঞ্চলে ক্যাল্‌সিয়াম-পূর্ণ পেডোক্যাল-জাতীয় মৃত্তিকা অধিক পরিলক্ষিত হয়। গমচাষের পক্ষে এই মৃত্তিকা বিশেষ উপযোগী। এই সকল মৃত্তিকা ছাড়াও চীনের অন্যান্য অঞ্চলে কৃষ্ণমৃত্তিকা, ধূসরবর্ণের মৃত্তিকা, রক্ত ও পীতবর্ণের মৃত্তিকা এবং পিঙ্গলবর্ণের মৃত্তিকা দেখা যায়। এই দেশের বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনে এই সকল মৃত্তিকা খুব উপকারী।

কৃষিকার্য (Agriculture)—চীন প্রধানতঃ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে হইলে কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন প্রয়োজন। এখানকার উত্তাপ, বৃষ্টিপাত ও উর্বর জমি কৃষিকার্যের অনুকূল। ইহা ছাড়া সরকার কর্তৃক ভালো বীজ, উৎকৃষ্ট সার, আর্থিক সাহায্য ও যন্ত্রপাতি দিবার ব্যবস্থা করায় কৃষকগণ কৃষিকার্যের প্রচুর উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হয়। বর্তমানে এই দেশে হেক্টর-প্রতি ২,৭০০ কিলোগ্রাম ধান, ১,২০০ কিলোগ্রাম গম, ৪,০০১ কিলোগ্রাম পাট, ১১০ কিলোগ্রাম তুলা উৎপন্ন হয়। এইভাবে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে এবং বহু অনাবাদী জমি কৃষিকার্যের আওতায় আনা হইয়াছে বলিয়া এই দেশের মোট উৎপাদন বর্তমানে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৪৮ সালে এই দেশে মাত্র ১২ কোটি মেঃ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইত। ১২ বৎসরে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬০-৬১ সালে ১৮ কোটি মেঃ টন হইয়াছে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও, এই অভাবনীয় কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে এই দেশে খাদ্যশস্যের বিশেষ অভাব হয় না। হোয়াংহো, ইয়াংসি ও সিকিয়াং এই তিনটি নদীর উপত্যকায় সর্বাপেক্ষা বেশী কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়; এই উপত্যকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাদ্যশস্য-উৎপাদক অঞ্চল।

কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন

(লক্ষ মেঃ টন)

	১৯৪৯ (প্রাক্‌-বিপ্লব)	১৯৬১-৬২		১৯৪৯ (প্রাক্‌-বিপ্লব)	১৯৬১-৬২
ধান	৪৭৮	৮৫০	তুলা (লক্ষ গাঁট)	৪	৭৬
গম	১৩৫	৩১৩	তামাক	...	৪'৪
চা	'৪	১'৫৪	পাট	...	১'১৮
সয়াবীন	৫০	৯৫	ইক্ষু	২৬	১৩৪

ধান-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক ধান এই দেশে উৎপন্ন হয়। প্রায় সকল কৃষি অঞ্চলেই কমবেশী ধান উৎপন্ন হইলেও পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও উর্বর পলিমাটির জন্য মধ্য চীনের ইয়াংসি অববাহিকা এবং দক্ষিণ চীনের সিকিয়াং অববাহিকার প্রায় সকল স্থানে সর্বাপেক্ষা বেশী ধান উৎপন্ন হয়। **গম**-উৎপাদনে চীন পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। বিপ্লবের পর গম-উৎপাদন প্রায় আড়াই গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। উত্তর চীনের হোয়াংহো অববাহিকায় এবং ইয়াংসি নদীর উত্তরাংশে গম-চাষ সীমাবদ্ধ। **তুলা**-উৎপাদনে চীন দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে; বিপ্লবের পরে ইহার উৎপাদন ৬ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইয়াংসি ও হোয়াংহো উপত্যকায় সর্বাপেক্ষা বেশী তুলা উৎপন্ন হয়। **চা**-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ-পূর্ব চীনের কিয়াংসি ও ফুকিয়েন চা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। **তামাক**-উৎপাদনে চীন পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে; এই দেশের অধিকাংশ স্থানে ইহা উৎপন্ন হয়। বর্তমানে এই দেশ প্রচুর পরিমাণে তামাক রপ্তানি করে। উত্তর চীনের শুষ্ক জলবায়ুতে জোয়ার, বাজরা ও সয়াবীন উৎপন্ন হয়। **সয়াবীন**-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ চীনের মৌসুমী অঞ্চলে প্রচুর **ইক্ষু** উৎপন্ন হয়। **পাট**-উৎপাদনে বর্তমানে এই দেশ পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। দক্ষিণাংশের মৌসুমী অঞ্চলে অধিকাংশ পাট উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া এই দেশের বিভিন্ন স্থানে রেশম, শণ, ভুট্টা, বাদাম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

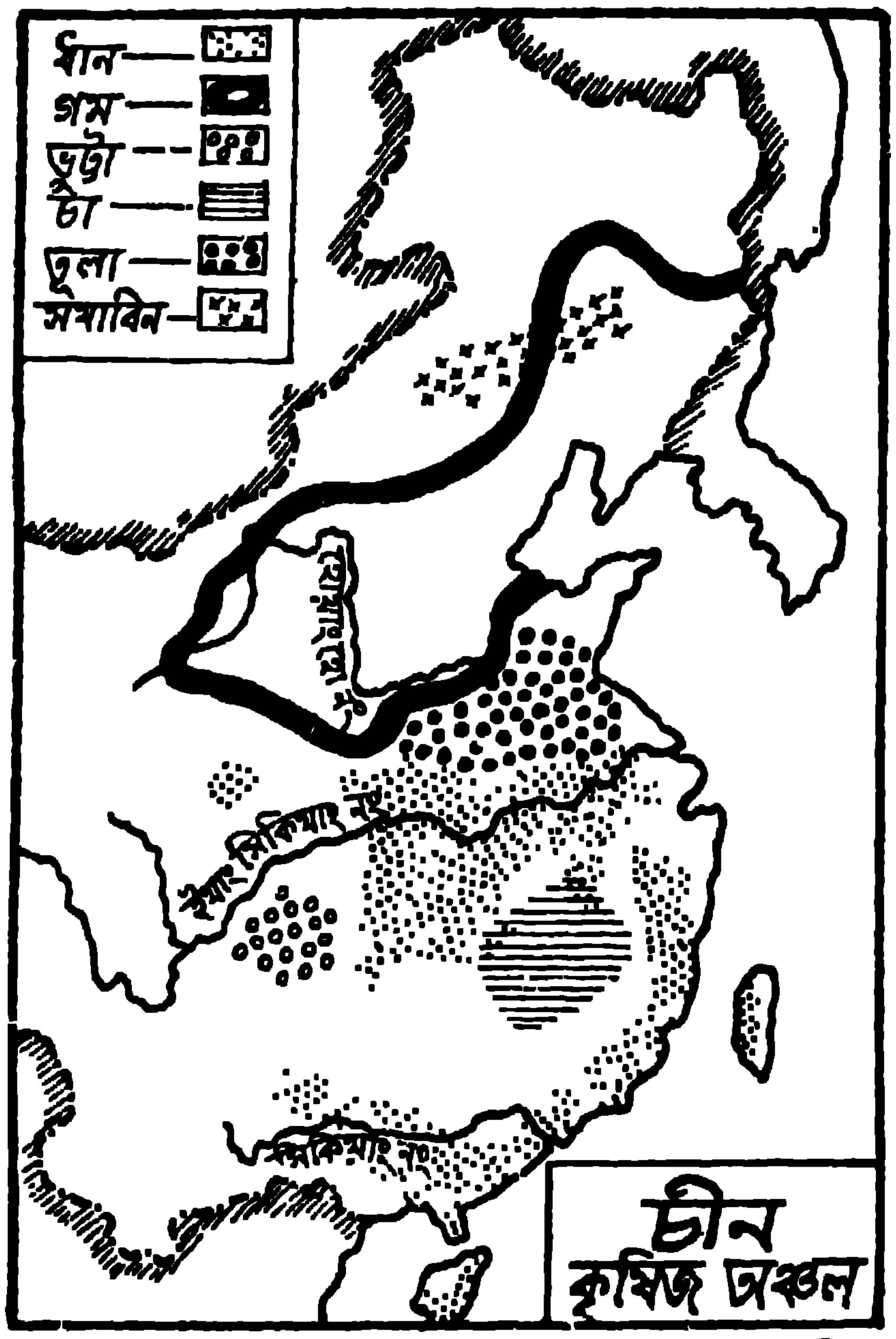

পশুপালনে চীন ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতেছে। এই দেশের সর্বত্র গবাদি পশু পালিত হয়। উত্তরাংশে ও পশ্চিমাংশে মেষপালন হইয়া থাকে। শূকর পাওয়া যায় প্রধানতঃ জেচুয়ান, আনহাই, শান্টুং, হুপে ও কোয়াংটুং প্রদেশে। এই দেশে প্রায় ৭'৪ কোটি গবাদি পশু, ৬ কোটি মেষ এবং ১৩'৮ কোটি শূকর আছে। চীন শূকরপালনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান এবং মেষপালনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এখানকার অধিকাংশ পশু মাংসের জন্য ব্যবহৃত হয়।

খনিজ সম্পদ (Minerals)—খনিজ সম্পদে চীন অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানকার সঞ্চিত খনিজ সম্পদের অতি সামান্য অংশ পূর্বে উত্তোলিত হইত; চীনের বিশাল আয়তন, বিচ্ছিন্নভাবে খনিজ সম্পদের অবস্থান এবং পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাব এই দেশের খনিজ সম্পদ আহরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করিত। বর্তমানে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া এবং খনিতে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। বর্তমানে চীন খনিজ দ্রব্য-উৎপাদনে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ১৯৪৮ সালে এই দেশের কয়লার উৎপাদন ছিল ১ কোটি ৮০ লক্ষ মেঃ টন; ১৯৬০ সালে ইহার উৎপাদন বাড়িয়া হইয়াছে ৩৪ কোটি ৮০ লক্ষ মেঃ টন। ১৯৪৮ সালে লৌহ আকরিকের উৎপাদন ছিল ১৫ লক্ষ মেঃ টন, কিন্তু ১৯৬০ সালে ইহা হইয়াছে ৩ কোটি মেঃ টন। বর্তমানে শিল্পের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় খনিজ দ্রব্যের চাহিদাও প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। সঞ্চিত (Reserves) অ্যান্টিমনি, রাং ও মলিবডেনামে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান এবং সঞ্চিত টাংস্টেন, ম্যাঙ্গানিজ, সীসা ও বক্সাইটে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।*

খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬০)
(লক্ষ মেঃ টন)

কয়লা*	৩,৪৮০	অ্যান্টিমনি	'১৫
লৌহ আকরিক	৩০০	টাংস্টেন	'১৮
খনিজ তৈল	২০	রাং	'১৮

কয়লা-উৎপাদনে চীন পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই দেশের সম্ভাব্য সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ১,০০,০০০ কোটি মেঃ টন।

* Source—Journal of the American Institute of Chemical Engineers, New York, Feb, 1962.

১৯৪৯ সালের তুলনায় বর্তমানে এই দেশের উৎপাদন প্রায় ১৮গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চীনের অধিকাংশ কয়লা উৎকৃষ্ট অ্যান্থ্রাসাইট্ ও বিটুমিনাস্ জাতীয়। শান্সি, শেন্সি, অন্তর্মঙ্গোলিয়া, লায়োনিং, শাণ্টুং, জেচুয়ান ইউনান ও হোপি প্রদেশে অধিকাংশ কয়লা পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে শান্সি ও শেন্সি কয়লা উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ অঞ্চল। এই দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও কমবেশী কয়লা পাওয়া যায়। **লৌহ আকরিক**-উৎপাদনেও চীন প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই দেশের সঞ্চিত লৌহভাণ্ডারের পরিমাণ প্রায় ১,২০০ কোটি মেঃ টন। লায়োনিং, হ্যাংচাউ, হুপে, অন্তর্মঙ্গোলিয়া, শান্সি, চিহ্লি, শাণ্টুং ও তাইওয়ানে অধিকাংশ লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। হুপে প্রদেশের তায়ে এবং লায়োনিং প্রদেশের আন্শান লৌহখনির জন্য বিখ্যাত। অপর্যাপ্ত কয়লা ও লৌহ আকরিক পাওয়া যায় বলিয়া এই দেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতেছে। **খনিজ-তৈল** উৎপাদনে এই দেশ এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিতে না পারিলেও রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের সাহায্যে প্রায়ই নূতন নূতন তৈলখনি আবিষ্কৃত হইতেছে। বর্তমানে কানসু, লায়োনিং, তাইওয়ান, জেচুয়ান, সিংকিয়াং ও শেন্সি প্রদেশেই অধিকাংশ খনিজ তৈল পাওয়া যায়। **অ্যান্টিমনি**-উৎপাদনে চীন পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অ্যান্টিমনি এই দেশের হুনান প্রদেশে পাওয়া যায়। কোয়াংটুং, ইউনান ও কিয়াংসি প্রদেশেও অল্পবিস্তর অ্যান্টিমনি পাওয়া যায়। **টাংস্টেন**-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের অর্ধেকের বেশী টাংস্টেন এই দেশে পাওয়া যায়। কিয়াংসি, হুনান, কোয়াংটুং প্রদেশে অধিকাংশ টাংস্টেন পাওয়া যায়। ইস্পাত ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি-উৎপাদনে টাংস্টেন একান্ত প্রয়োজনীয়। **রাং**-উৎপাদনে চীন পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ ইউনানের কোচিউ জিলায়, কিয়াংসি ও হুনানে অধিকাংশ রাং পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে নান্লিং পর্বতে, ইউনান-কোচিউ মালভূমিতে, সিংকিয়াং অঞ্চল এবং পো হাই উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে নানাবিধ খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ, স্বর্ণ, রৌপ্য, দস্তা, সীসা, তাম্র, মলিবডেনাম, বক্সাইট, জিপসাম, গ্রাফাইট, অ্যাস্বেস্টস্ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রমশিল্প (Industries)—বিভিন্ন কারণে চীন বহুদিন পর্যন্ত শিল্পে পশ্চাৎপদ ছিল। জাপান, বৃটেন এবং সর্বশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শোষণ এবং গৃহযুদ্ধের ফলে এই দেশ শিল্পে এতদিন উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু শিল্পোন্নয়নের পক্ষে এই দেশে সকল প্রকার উপাদান বিদ্যমান। বিপ্লবের পর ১৯৪৯ সাল হইতে বর্তমান সরকার সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে। এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ভারী শিল্পের উন্নতিসাধন, যাহাতে অন্যান্য শিল্পের উন্নতিসাধন সহজ-সাধ্য হয়। বিপ্লবের পর হইতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত দেশের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হয় ; ইহার পর প্রথম পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয় ১৯৫৩ সালে এবং শেষ হয় ১৯৫৭ সালে। এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল শিল্পের উন্নতির প্রাথমিক ভিত্তিস্থাপন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয় ১৯৫৮ সালে এবং শেষ হয় ১৯৬২ সালে ; ইহার প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশে সমাজতান্ত্রিক উপায়ে শিল্পের উন্নতিসাধন। এই দেশের শিল্পের উন্নতির হার অত্যন্ত বেশী। রাশিয়ার শিল্পোন্নতির হার ছিল ৮·৬%, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩·৭% এবং বৃটেনের ২·৯% ; সেই তুলনায় চীনের শিল্পোন্নতির হার ২৮%। ভারী শিল্পের উন্নতিতে এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে যে, প্রথম পরিকল্পনার কার্যকালে মোট শিল্পোৎপাদনের প্রায় অর্ধেক ছিল ভারী শিল্পজাত দ্রব্য। ইহার মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়লা ও লৌহ আকরিকের পর্যাপ্ত উৎপাদন, বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পোন্নতির জন্য সরকারের প্রচেষ্টা, রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্য, তুলা, রেশম, তামাক, পশম, উদ্ভিজ্জ তৈল, কাঠ, লবণ প্রভৃতি কাঁচামালের পর্যাপ্ত সরবরাহ, খাদ্যদ্রব্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা, উৎকৃষ্ট বন্দরের অবস্থান, স্থানীয় ৬৭ কোটি লোকের অপর্যাপ্ত চাহিদা এই দেশের বর্তমান শিল্পোন্নতির প্রধান কারণ।

শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬০)

(লক্ষ মেঃ টন)

ইস্পাত	১৮৪	কাগজ	৯·১
ঢালাই-লৌহ	২০০	রাসায়নিক সার	১৩
কার্পাস-বস্ত্র	৯·১	সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড	১৬
সিমেন্ট	১০০	কষ্টিক সোডা	৪
চিনি	১৪·৪০	সোডা অ্যাশ	৮

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে চীন প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। বিপ্লবের পূর্বে এই দেশের ইস্পাত-উৎপাদন নগণ্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইস্পাত-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে সপ্তম স্থান এবং ঢালাই-লৌহ-উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাতশিল্প এই দেশের আন্‌শানে অবস্থিত। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক ও কয়লা এই শিল্পের উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। চীনা শ্রমিক অত্যন্ত নিপুণ ও কর্মঠ। বর্তমানে পরিবহণ-ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত বেশী। এই সকল কারণে এই দেশের হুপে প্রদেশের উহানে এবং অন্তর্মঙ্গোলিয়ার পাওটো শহরেও বৃহদাকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে (২৫৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। এই দেশের ইস্পাত হইতে বিভিন্ন অঞ্চলে যন্ত্রপাতি-শিল্প ও জাহাজনির্মাণ-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সাংহাই বন্দরের জাহাজনির্মাণ-শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কার্পাসবয়ন-শিল্পে চীন পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ইহার স্থান। তুলা-উৎপাদনেও এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে; স্থানীয় লোকের জন্য কার্পাস-বস্ত্রের অপর্যাপ্ত চাহিদা বিদ্যমান; কয়লার সরবরাহ প্রচুর। এই সকল কারণে চীন এই শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। সাংহাই, নানকিং, নিংপো, হ্যাংচাউ ও উসিহ্ এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত। **রেশমবয়ন-শিল্পেও** এই দেশ প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহা চীনের একটি প্রাচীন শিল্প। স্থানীয় রেশমের অপর্যাপ্ত উৎপাদন এবং স্থানীয় চাহিদা এবং নিপুণ চীনা শ্রমিকের জন্যই এই শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। সাংহাই, নানকিং ও হ্যাংচাউ রেশম বয়ন-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। **পশমবয়ন-শিল্পেও** চীন উন্নতি লাভ করিয়াছে। স্থানীয় পশম হইতেই এখানে পশম-বস্ত্র উৎপন্ন হয়। নানকিং, হ্যাংচাউ ও সাংহাই পশমবয়ন-শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

ইহা ছাড়া কিয়াংসু ও শাণ্টুং অঞ্চলে সিমেন্ট ও চর্মশিল্প, দেশের অভ্যন্তর-ভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে চীনামাটি ও উদ্ভিজ্জ তৈল-শিল্প কুটীরশিল্প হিসাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। স্থানীয় তামাক হইতে সংগঠিত সিগারেট-শিল্পও এই দেশে পরিলক্ষিত হয়। হ্যাংচাউ ও সাংহাই-এর ময়দাশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত কয়েক বৎসরে চীন রাসায়নিক শিল্পে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। স্থানীয় অপর্যাপ্ত লবণের সরবরাহ এই শিল্পের উন্নতিতে প্রভূত

সাহায্য করিয়াছে। নানকিং রাসায়নিক শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। কাগজ ও চিনি শিল্পও এই দেশে উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাইওয়ানে প্রচুর চিনি উৎপন্ন হয়।

পরিবহণ-ব্যবস্থা (Communications)—পূর্বে চীনের ভূ-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, দেশের পশ্চিমাংশে পাহাড়-পর্বত ও মালভূমি বিদ্যমান। সুতরাং এই দেশের পরিবহণ-ব্যবস্থা প্রধানতঃ পূর্বাংশেই উন্নতি লাভ করিয়াছে। বর্তমানে দেশের সকল অংশের উন্নতি সাধন করিবার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পশ্চিমাংশে ও তিব্বতে **রাজপথ** নির্মিত হইতেছে। বর্তমানে এই দেশের রাজপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ১·৮ লক্ষ কিলোমিটার। এই দেশের উল্লেখযোগ্য রাজপথের মধ্যে কুনমিং-লাসিও (বার্মা রোড), জেচুয়ান-হোনান, হানচুং-পাই হো, জেচুয়ান-ইউনান, লাসান-সিচাং এবং সিয়াংগুন-সিচাং রাজপথ-সমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বার্মা রোড আসামের সহিত লেডো রোড (স্টীলওয়েল রোড) দ্বারা যুক্ত। বর্তমানে তিব্বতের পশ্চিমাংশে সিংকিয়াং ও লাসার মধ্যে একটি বড় রাজপথ নির্মিত হইয়াছে। চীনের রাজপথসমূহের মারফত প্রচুর আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংঘটিত হয়। বিপ্লবের পূর্বে এই দেশের **রেলপথের** দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ১৬,০০০ কিলোমিটার; কিন্তু বর্তমানে রেল-পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮,০০০ কিলোমিটার। এই দেশের সর্বপ্রধান রেলপথটি ক্যান্টন হইতে পিকিং পর্যন্ত বিস্তৃত; এই রেলপথটিই সেনায়াং (মুকডেন) ও হারবিন হইয়া ভ্লাডিভোস্টক পর্যন্ত গিয়াছে। অন্যান্য রেলপথসমূহ তিয়েনসিন হইতে সাংহাই (নানকিং হইয়া), চাংচুন হইতে সেনায়াং হইয়া লুসুন-তালিয়েন এবং হারবিন হইতে মাঞ্চাউলি পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঞ্চাউলি হইতে চিতা ও ইরকুটস্ক হইয়া মস্কো যাওয়া যায় (২৫৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

চীনে প্রায় ১,২০০ সমুদ্রগামী জাহাজ আছে; ইহাদের মোট পরিমাপ প্রায় ৭ লক্ষ GRT. চীনের নদী ও খালসমূহ এই দেশের জলপথের উন্নতিতে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। ২৫৭ পৃষ্ঠায় চীনের নদীসমূহ এবং **জলপথ** সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। **আকাশপথে** চীন প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই দেশের ৩৮টি শহর আকাশপথে যুক্ত।

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)—বিপ্লবের পর অধিকাংশ ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের, বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবন্ধকতার ফলে চীনের বহির্বাণিজ্যের কিছুটা ক্ষতি হইলেও, ক্রমশঃ এই দেশের বহির্বাণিজ্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে বিশেষতঃ রাশিয়ার সঙ্গে এই দেশের সর্বাপেক্ষা অধিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়। ইহার পরেই বৃটেনের স্থান। পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ (পূর্ব জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী প্রভৃতি) এবং এশিয়ার দেশসমূহের (ভারত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয় প্রভৃতি) এবং ইটালির সঙ্গে ক্রমশঃই বাণিজ্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

চীনের বহির্বাণিজ্যের গতি (১৯৬৩)*

(কোটি ডলার)

রাশিয়া	৬০	জাপান	১৩.৬
হংকং	২১	কানাডা	১০
অস্ট্রেলিয়া	২০.৯	বৃটেন	৮৮
		ফ্রান্স	৭.৯

এই দেশের রপ্তানি-দ্রব্যের মধ্যে রেশম, তুলা ও চা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া তামাক, কয়লা, লবণ, কাঁচা লৌহ, চিনি, চর্ম, চীনামাটির দ্রব্যাদি, অ্যান্টিমনি, টাংস্টেন, রাং প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমদানি-দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি, জাহাজনির্মাণের দ্রব্যাদি, অস্ত্রশস্ত্র, কার্পাস-বস্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীনের বাৎসরিক বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৪৩০ কোটি ডলার। আমদানি রপ্তানি অপেক্ষা অনেক বেশী। রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ হইতে সাহায্য বা ঋণ গ্রহণ করিয়া বহির্বাণিজ্যের এই ঘাটতি পূরণ করা হয়।

শহর ও বন্দর (Cities & Ports)—**পিকিং** চীনের রাজধানী ও প্রধান শহর। ইহা একটি প্রধান রেলকেন্দ্র। ইস্পাত ও বয়নশিল্প এখানে উন্নতি লাভ করিয়াছে। **সাংহাই** চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। এই দেশের অর্ধেকের বেশী বাণিজ্য এই বন্দর মারফত সংঘটিত হয়। ইয়াংসি নদীর শাখা হোয়াংপো নদীর উপর এই বন্দর অবস্থিত। কার্পাসবয়ন ও রেশমবয়ন শিল্প এখানে উন্নতি লাভ করিয়াছে। দেশের উপকূলভাগের মধ্যস্থলে অবস্থিত

*Source—"Commerce", 31 st October, 1964.

হওয়ায় ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি অত্যন্ত বিস্তৃত। এই বন্দরের পোতাশ্রয় খুব গভীর না হওয়ায় জাহাজগুলি কিছুদূরে অবস্থান করে। চীনের আমদানি ও রপ্তানি-যোগ্য সকল প্রকার দ্রব্যই ইহার মারফত আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে।

উহান (হ্যাংকাউ) ইয়াংসি ও হান নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি নদী-বন্দর। এখানে বৃহদাকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **হ্যাংচাউ** কার্পাসবয়ন, রেশমবয়ন ও ইস্পাত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। **তিয়েনসিন** পিকিং-এর সন্নিকটস্থ একটি বন্দর। সমগ্র উত্তর চীন ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। **নানকিং** কার্পাস ও রেশম বয়নশিল্পের জন্য বিখ্যাত। ইহা চীনের পুরাতন রাজধানী। **ক্যান্টন** সিকিয়াং-এর মোহনায় অবস্থিত দক্ষিণ চীনের প্রধান বন্দর। সমগ্র দক্ষিণ চীন ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। **লাসা** তিব্বতের রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ভারতের সহিত ইহার মাধ্যমে স্থলপথে বাণিজ্য হইয়া থাকে। **হংকং** সিকিয়াং-মোহনায় একটি দ্বীপে অবস্থিত একটি বিখ্যাত বন্দর। বর্তমানে ইহা বৃটেনের অধীন। এই বন্দরের মাধ্যমেও দক্ষিণ চীনের বাণিজ্য হইয়া থাকে। চীনের প্রধান ভূভাগের সহিত এই বন্দর জলপথে ও রেলপথে যুক্ত। ইহা একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম-বন্দর। চাউল, চিনি, চা, তূলা, গম, তৈল, আফিম প্রভৃতি এই বন্দর মারফত আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে জাহাজনির্মাণ-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাইপে তাইওয়ান দ্বীপের* রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র। চীনের অন্যান্য বাণিজ্যকেন্দ্রের মধ্যে লুসুন-তালিয়েন (পোর্ট আর্থার), আময়, সোয়াটো, সিংটাউ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্মদেশ (Burma)

পূর্বে ব্রহ্মদেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৃটিশ সরকারের বিভক্তীকরণ ও শাসন (Divide & Rule) নীতির ফলে এই দেশ ১৯৩৭ সালে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বৃটিশের অধীনে একটি ভিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী এই দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ব্রহ্মদেশ প্রকৃতপক্ষে ইন্দোচীন উপদ্বীপের একটি অংশ। ইহার পূর্বদিকে চীন, লাওস্ ও থাইল্যাণ্ড, পশ্চিমে ভারতের আসাম, পূর্ব পাকিস্তান ও বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে মার্তাবান

* তাইওয়ান বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণে চিয়াং কাইশেক চক্র কর্তৃক শাসিত হইতেছে।

উপসাগর এবং উত্তরে চীন ও ভারতের মিলিত পর্বতশ্রেণী। ব্রহ্মদেশের দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ২,৩৭০ কিলোমিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯২৫ কিলোমিটার। এই দেশের আয়তন ৬,৭৮,০০০ বর্গ-কিলোমিটার; ১৯৬৪ সালে ইহার লোকসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৪২ লক্ষ; প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে **লোকবসতি** প্রায় ৩২ জন। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হইতে এই দেশের বসতি-ঘনত্ব অনেক কম। বিভিন্ন নদী-উপত্যকায়, বিশেষতঃ ইরাবতী-উপত্যকায় কৃষিকার্যের উন্নতির ফলে লোকবসতির ঘনত্ব কিছুটা বেশী। অন্যান্য অঞ্চলে পাহাড়-পর্বত থাকায় বিরল লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। এই দেশের দুই-তৃতীয়াংশ লোক বর্মী অর্থাৎ মঙ্গোলীয়। ইহা ছাড়া ভারতীয় ও চীনদেশীয় লোকও এই দেশে বাস করে। এখানকার ভারতীয়দের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। এই দেশের পার্বত্য অঞ্চল ও মালভূমিতে আদিবাসিগণ বাস করে। ইহাদের মধ্যে আরাকান ইয়োমাতে চীন, পেগু ইয়োমাতে কারেন, পূর্বাংশের মালভূমিতে শান, পালুং ও ওয়া এবং উত্তরাংশে কাচিন-জাতীয় লোক বাস করে।

ব্রহ্মদেশের **ভূ-প্রকৃতি** সর্বত্র সমান নহে। এই দেশ প্রধানতঃ পাহাড়-পর্বত ও নদী-উপত্যকার সমতলভূমি লইয়া গঠিত। উত্তরাংশে হিমালয় পর্বতের পূর্বাংশ আসিয়া মিলিত হইয়াছে। পশ্চিমাংশে চীন, লুসাই, আরাকান ইয়োমা প্রভৃতি পর্বত অবস্থিত। পশ্চিমাংশে শান মালভূমি বিদ্যমান। মধ্যভাগের বিভিন্ন নদী-উপত্যকার সমতলভূমি এই দেশের প্রধান প্রাণকেন্দ্র; সমতলভূমির মধ্যভাগে পেগু ইয়োমা নামে পর্বত মাথা তুলিয়া সিটাং-উপত্যকা ও ইরাবতী-উপত্যকাকে বিভক্ত করিয়াছে। দক্ষিণাংশের সঙ্কীর্ণ ভূভাগের মধ্যস্থলে টেনাসেরিম পর্বত বিদ্যমান। ব্রহ্মদেশের পর্বতশ্রেণী উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রসারিত বলিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে পরিবহণ-ব্যবস্থা বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। পার্বত্য অঞ্চলে ও মালভূমিতে বনভূমি থাকায় এই দেশ কাষ্ঠসম্পদে সমৃদ্ধ। এই দেশের নদীসমূহের মধ্যে ইরাবতী, চিন্দুইন, সিটাং ও সালউইন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল নদীর সমতলভূমিতে উর্বর পলিমাটি থাকায় ইহা কৃষিকার্যের সহায়ক। সেইজন্য ব্রহ্মদেশের অধিকাংশ কৃষিজ দ্রব্য এই সকল নদী-উপত্যকায় উৎপন্ন হয়। এখানকার নদীসমূহ সুনাব্য এবং কাষ্ঠ-পরিবহণের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী।

ব্রহ্মদেশের অধিকাংশ স্থান গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত। সেইজন্য এখানকার

জলবায়ুতে অধিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়। সেইজন্য অধিকাংশ স্থান স্যাঁৎসেঁতে। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। উত্তরাংশে শীতকালে. তাপমাত্রা কিছুটা কম হইলেও দক্ষিণাংশে প্রায় সর্বদাই অধিক তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। আরাকান ইয়োমাতে মৌসুমী বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এই দেশের মধ্য-ভাগ বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে পরিণত হয়, সেইজন্য এই অঞ্চলে কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। উপকূলভাগে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রায় ২৫০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে; কিন্তু মধ্যভাগের নদী-উপত্যকায় ক্রমশঃই বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ কমিয়া ১০০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত নামিয়া আসে। এই দেশের বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা অধিকাংশ স্থানে কৃষিকার্যের অনুকূল।

ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানাপ্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। আরাকান ইয়োমায় লাল দো-আঁশ মৃত্তিকা দেখা যায়। টেনাসেরিম অঞ্চল, পেগু ইয়োমা ও সিটাং-উপত্যকায়ও এইপ্রকার মৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয়; জলধারণের ক্ষমতা

কম বলিয়া ইহা খুব উর্বর নহে ; ইক্ষু, তুলা ও তামাক চাষের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। শান মালভূমিতে লাল এঁটেল মাটি দেখা যায় ; ইহা অনুর্বর বলিয়া কৃষিকার্যের উপযোগী নহে। ব্রহ্মদেশের মধ্যভাগের নদী-উপত্যকায় ও উপকূলভাগে উর্বর পলিমাটি থাকায় এই অঞ্চলে কৃষিকার্যের উন্নতি হইয়াছে। উত্তরাংশের পার্বত্য অঞ্চলে শক্ত এঁটেল মাটি (পার্বত্য মৃত্তিকা) বিদ্যমান ; ইহা স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের সৃষ্টি করে বলিয়া এই অঞ্চলে বিস্তীর্ণ বনভূমি দেখা যায়।

বনভূমি (Forests)—ব্রহ্মদেশের কাষ্ঠসম্পদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোট ভূমিভাগের শতকরা ৬০ ভাগ জুড়িয়া এই দেশের বনভূমি বিদ্যমান। উত্তরাংশের পার্বত্য অঞ্চল, শান মালভূমি, চীন-লুসাই-আরাকান ইয়োমার পর্বতশ্রেণী, পেগু ইয়োমা ও টেনাসেরিম পাহাড়ে অধিকাংশ বনভূমি পরিলক্ষিত হয়। এই সকল বনভূমি হইতে বনজ সম্পদ আহরণ করিবার জন্য কয়েকটি স্থান বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে ; তন্মধ্যে প্রোম, পেগু, ইন্‌সিন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অত্যধিক বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের জন্য অধিকাংশ স্থানে চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ও পর্বতের উপরের অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানে পর্ণমোচী, সরলবর্গীয় ও মিশ্র বনভূমি দেখা যায়। আরাকান অঞ্চলে সেগুন ও শালগাছ এবং বাঁশ ও বেত জন্মে। এই দেশের পর্ণমোচী বৃক্ষের মধ্যে ওক্, চেস্টনাট, ওয়ালনাট ও এল্‌ম্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পর্বতের উচ্চ অংশে সীডার, পাইন, ফার, বার্চ প্রভৃতি সরল-বর্গীয় বৃক্ষও জন্মে। পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবে হাতীর সাহায্যে বনভূমি হইতে কাঠ আনিয়া নদীতে ভাসানো হয়। পরে নদীপথে বন্দরে ও অন্যান্য গন্তব্যস্থলে লওয়া হয়। এই দেশের কাঠের মধ্যে সেগুন কাঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন দেশে ইহা রপ্তানি করিয়া এই দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। মোট উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ সেগুন কাঠ বিদেশে রপ্তানি হয়। ব্রহ্মদেশের বনভূমি হইতে প্রচুর বাঁশ পাওয়া যায় ; ইহা গৃহনির্মাণে ও আসবাবপত্র প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। রেঙ্গুন ও মৌলমীন কাষ্ঠ-রপ্তানির প্রধান বন্দর।

কৃষিকার্য (Agriculture)—ব্রহ্মদেশ প্রধানতঃ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের শতকরা ৭১ জন লোক কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল। এখানকার মোট কৃষি-জমির পরিমাণ প্রায় ৮০ লক্ষ হেক্টর। ধান এই দেশের সর্বপ্রধান

ফসল। ইরাবতী নদীর নিম্ন-উপত্যকায় এবং উত্তর টেনাসেরিমে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। উপকূলভাগেও ধানের চাষ হয়। ১৯৬৩-৬৪ সালে এই দেশে ৮৪ লক্ষ মেঃ টন ধান উৎপন্ন হইয়াছে। দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে ধানের উৎপাদন বেশী হওয়ায় চাউল-রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে উল্লেখ-যোগ্য স্থান অধিকার করে। **ভুট্টা** উৎপন্ন হয় প্রধানতঃ ইরাবতী নদীর মধ্য-অববাহিকায়। সিটাং-উপত্যকা ও আরাকান উপকূলে প্রধানতঃ **ইক্ষু** উৎপন্ন হয়। উত্তর শান রাজ্যে **চা** উৎপন্ন হয়। দেশের পশ্চিমাংশে বিশেষতঃ আরাকান অঞ্চলে অধিকাংশ **তামাক** উৎপন্ন হয়; ব্রহ্ম-দেশের চুরুট বিখ্যাত। ইহা ছাড়া এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জোয়ার, চীনাবাদাম, ডাল, তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

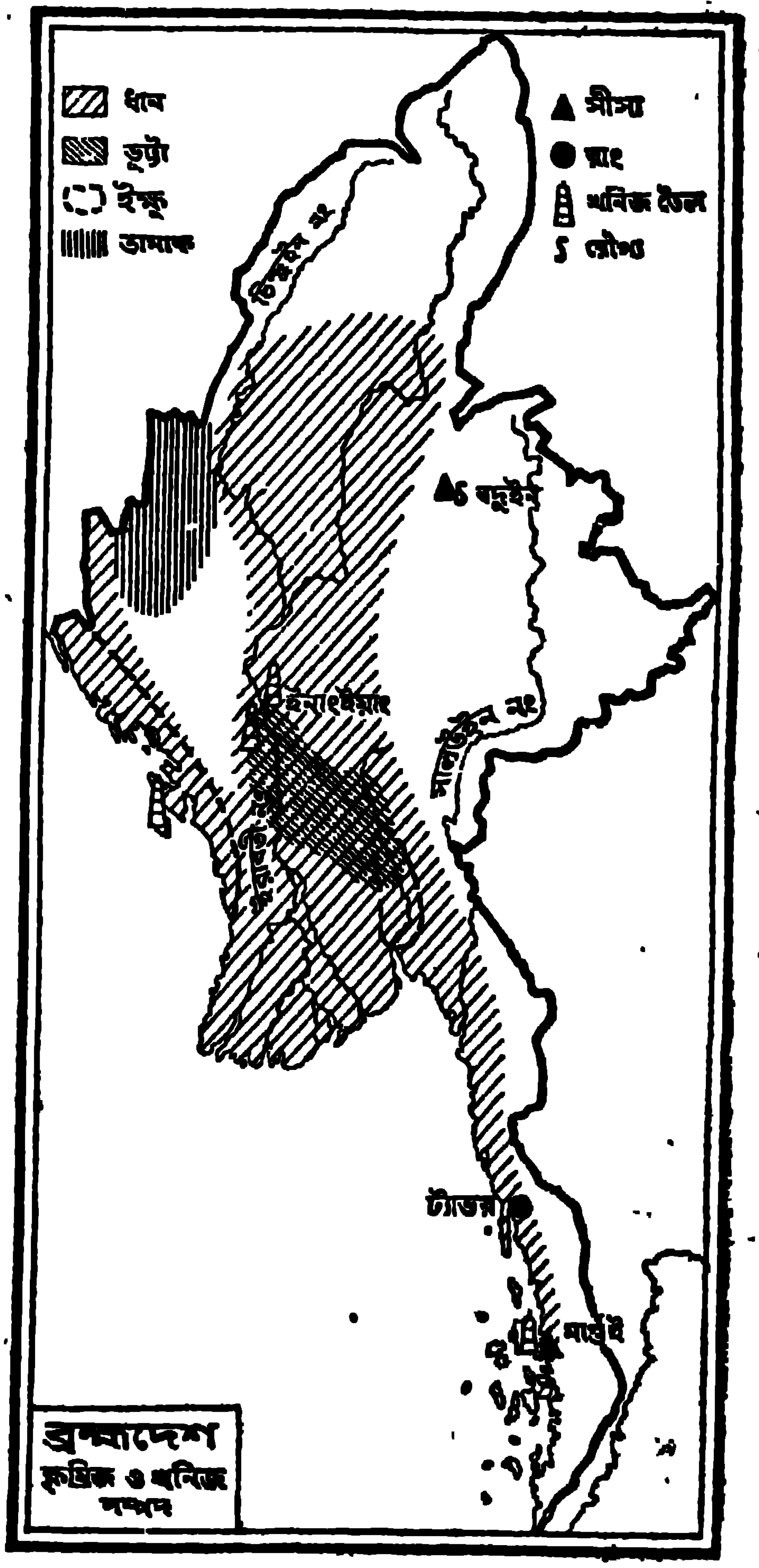

খনিজ সম্পদ (Minerals)—ব্রহ্মদেশ বিভিন্ন খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এই দেশ পৃথিবীতে টাংস্টেন-উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান, রাং (Tin)-উৎপাদনে পঞ্চম স্থান এবং সীসা-উৎপাদনে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। খনিজ তৈল-উৎপাদনেও এই দেশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। **সীসা** পাওয়া যায় প্রধানতঃ এই দেশের পূর্বাংশের মারগুই ও পুটাও জেলায় এবং দক্ষিণ ও উত্তরাংশের সীমান্ত-

বর্তী এলাকায়। শান রাজ্যের বড়ুইন ব্রহ্মদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সীসা-উৎপাদক অঞ্চল। টেনাসেরিম হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে কায়াকসি জিলা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে **টাংস্টেন** পাওয়া যায়। ১৮৮৭ সালে ব্রহ্মদেশে প্রথম **খনিজ তৈল** আবিষ্কৃত হয়। ইরাবতী নদীর নিম্ন-উপত্যকায় অধিকাংশ খনিজ তৈল পাওয়া যায়। মধ্যাংশের ইনাংইয়াং এই দেশের শ্রেষ্ঠ তৈলকেন্দ্র। এই স্থান হইতে রেঙ্গুন পর্যন্ত একটি তৈলের পাইপ স্থাপিত হইয়াছে। মারগুই জিলার চক অন্যমত উল্লেখযোগ্য তৈলখনি-কেন্দ্র। ১৯৬৩ সালে এই দেশে ৬'৪ লক্ষ মেঃ টন খনিজ তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল। টেনাসেরিম অঞ্চলের ট্যাভয় **রাং** উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। বড়ুইন অঞ্চলের **রৌপ্যখনি** অত্যন্ত মূল্যবান্। ব্রহ্মদেশে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কিছু কয়লা পাওয়া যায়। শান মালভূমির উত্তরাংশে, শোয়েবু জিলার কাবওয়েট অঞ্চলে অধিকাংশ কয়লাখনি অবস্থিত। চিন্দুইন, মারগুই এবং মিটকিইনা অঞ্চলে লিগ্‌নাইট-কয়লা পাওয়া যায়। মোগাক অঞ্চল মূল্যবান্ **রত্নের** জন্য বিখ্যাত। রত্ন রপ্তানি করিয়া এই দেশ বহু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ইহা ছাড়া ব্রহ্মদেশে দস্তা, নিকেল, তাম্র, স্বর্ণ, উলফ্রাম, লবণ ও অ্যান্টিমনি পাওয়া যায়।

শ্রমশিল্প (Industries)—বহুদিন পরাধীন থাকিবার ফলে এই দেশ শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কয়লার অভাবে এই দেশে বৃহদায়তনের শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। চাউলের কল, করাত কল ও তৈল-শোধনাগার এই দেশের প্রধান শিল্প। ইহাদের আরও উন্নতিসাধন সম্ভব। শান রাজ্যের নামতু অঞ্চলে রূপা গলাইবার কারখানা আছে। স্বাধীনতার পরে যায়েটমাইওতে একটি সিমেণ্ট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। চিনিশিল্প স্থাপিত হওয়ার পর এই দেশ চিনি-উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইয়াছে। বর্তমানে পাকিস্তানের পাটের সাহায্যে একটি পাটকল স্থাপিত হইয়াছে। পাকিস্তান নিকটবর্তী বলিয়া কাঁচা পাট আমদানি করিয়া পাটবয়ন-শিল্পের আরও উন্নতিসাধন সম্ভব। ইহা ছাড়া ছোটখাটো লৌহের কারখানা, ঔষধের কারখানা, কাপড়ের কল ও চুরুটের কারখানা এই দেশে দেখা যায়। কারুশিল্প এই দেশে কুটীরশিল্প হিসাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে; বাঁশ ও কাঠের উপর নানাবিধ কারুকার্যখচিত জিনিসপত্র এখানে পাওয়া যায়।

পরিবহণ-ব্যবস্থা (Communications)—ব্রহ্মদেশের নদীসমূহ পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ। ইরাবতী ব্রহ্মদেশের প্রধান **জলপথ**। ইরাবতী

নদীর মোহনায় অবস্থিত রেঙ্গুন হইতে ভামো পর্যন্ত প্রায় ১,৪৫০ কিলো-মিটার সুনাব্য। এই নদী হইতে কয়েকটি খাল কাটিয়া নৌ-চলাচলের সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইরাবতী-চিন্দুইন নদীর সঙ্গমস্থল হইতে চিন্দুইন নদী উত্তরে প্রায় ৬৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত নাব্য। সালউইন নদী মোহনা হইতে মাত্র ১৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত নাব্য। (২৬৯ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য।) আকিয়াব বন্দর হইতে প্রসারিত মায়ু নদী ৮০ কিলোমিটার এবং কালাদান নদী ১৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত নাব্য। সিটাং নদী বালুচরের জন্য নাব্য নহে। মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় ইহার কোন কোন অংশে নৌ-চলাচল হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশের নাব্য নদীসমূহ সারাবৎসর জলে পূর্ণ থাকায় সর্বদাই গভীর ও নাব্য।

এই দেশের রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য মাত্র ৪,৩০০ কিলোমিটার। প্রধান রেলপথটি রেঙ্গুন হইতে সিটাং-উপত্যকা ধরিয়া পেগু হইয়া উত্তরে মান্দালয় পর্যন্ত গিয়াছে। অন্য একটি **রেলপথ** রেঙ্গুন হইতে ইরাবতী-উপত্যকা ধরিয়া উত্তরে প্রোম পর্যন্ত গিয়াছে। এই দুইটি প্রধান রেলপথ হইতে কয়েকটি শাখা লাইন মৌলমীন, লাসিও, মিটকিইনা, বেসিন প্রভৃতি শহরে গিয়াছে।

ব্রহ্মদেশের মোট **রাজপথ** মাত্র ১৬,১০০ কিলোমিটার; ইহার মধ্যে মাত্র ৬,০০০ কিলোমিটার মোটর-গাড়ী-চলাচলের উপযোগী। এই দেশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজপথ লাসিও-কুনমিং পথ বা **বার্মা রোড**। চীনের সহিত ব্রহ্মদেশকে এই পথ যুক্ত করিয়াছে। এই পথটি চীনের কুনমিং হইতে লাসিও পর্যন্ত আসিয়াছে; ইহার পরেও পথটি মান্দালয় ও পেগু হইয়া রেঙ্গুন পর্যন্ত গিয়াছে। আসামের লেডো হইতে **স্টীলওয়েল রোড** মিটকিইনা হইয়া ভামো পর্যন্ত আসিয়াছে; পরে ইহা লাসিওর উত্তরে বার্মা রোডের সহিত মিশিয়াছে। এই দুইটি রাজপথ প্রধানতঃ সামরিক প্রয়োজনে নির্মিত হইলেও সারাবৎসর বরফমুক্ত থাকায় ইহা বিশেষ উপকারী। ব্রহ্মদেশ হইতে ভারত ও পাকিস্তানে সমুদ্রপথে যাতায়াত করা অনেক কম ব্যয়সাধ্য বলিয়া এই দুইটি দেশের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের স্থলপথে পরিবহণ-ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করে নাই। এই কারণে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারত ও পাকিস্তানে যাইবার ভালো রাজপথ নির্মিত হয় নাই।

ব্রহ্মদেশের অবস্থান অস্ট্রেলিয়া এবং পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের মধ্যস্থলে হওয়ায় আকাশপথে ও সমুদ্রপথে এখানকার বিমানবন্দর ও বন্দরসমূহের বিশেষ উন্নতি

হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত ব্রহ্মদেশ আকাশপথে যুক্ত। স্থানীয় 'ইউনিয়ন অব বার্মা এয়ারওয়েজ' এই দেশের বিমানপথ পরিচালনা করে।

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)—ব্রহ্মদেশের প্রধান সম্পদ চাউল, সেগুন কাঠ ও খনিজ তৈল। এই তিনটি দ্রব্যই এই দেশের প্রধান **রপ্তানি**-দ্রব্য। ইহা ছাড়া তুলা, রত্ন, রাং, সীসা, চুরুট, রৌপ্য প্রভৃতিও এই দেশ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। আমদানি-দ্রব্যের মধ্যে ভারত, বৃটেন ও জাপানের কার্পাস-বস্ত্র, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যন্ত্রপাতি ও মোটর-গাড়ী, পাকিস্তানের পাট, চীন ও জাপানের রেশম-বস্ত্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দেশের অধিকাংশ বাণিজ্য চীন, ভারত ও বৃটেনের সঙ্গে হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, জাপান, মালয় প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও বাণিজ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। এই দেশের শতকরা ৩০ ভাগ রপ্তানি-দ্রব্য ভারতে প্রেরিত হয়। ভারতে চাউল ও খনিজ তৈলের অভাব, ব্রহ্মদেশ ও ভারতের বন্দরসমূহের নৈকট্য এবং বহুদিন যাবৎ ভারতীয়গণ কর্তৃক ব্রহ্মদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর প্রভাব থাকায় ভারতের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের সর্বাপেক্ষা বেশী বাণিজ্য হইয়া থাকে। এই দেশের বাৎসরিক আমদানি-দ্রব্যের মূল্য প্রায় ৩০ কোটি কায়াত এবং রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্য প্রায় ২২ কোটি কায়াত।

শহর ও বন্দর (Cities & Ports)—রেঙ্গুন নদীর তীরে অবস্থিত **রেঙ্গুন** ব্রহ্মদেশের রাজধানী, সর্বপ্রধান বন্দর ও শহর। এই দেশের শতকরা ৯০ ভাগ আমদানি-রপ্তানি এই বন্দর মারফত সম্পন্ন হয়। রেলপথে রেঙ্গুন এই দেশের অধিকাংশ শহরের সহিত যুক্ত। **মৌলমীন** মার্তাবান উপসাগরের তীরে অবস্থিত ব্রহ্মদেশের দ্বিতীয় প্রধান বন্দর। রেলপথে এই বন্দর রেঙ্গুনের সহিত যুক্ত। কাঠ ও রাং এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। সালুইন নদীতে কাঠ ভাসাইয়া রপ্তানির জন্য এই বন্দরে আনা হয়। **ট্যাভয়** বন্দর রাং ও উল্‌ফ্রাম রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। রেঙ্গুন হইতে ৬৫০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত **মান্দালয়** ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত; ইহা ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশের শ্রেষ্ঠ শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। চাউল ও রেশমের ব্যবসায়ের জন্য এই শহর বিখ্যাত। পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত **আকিয়াব** চাউল রপ্তানির জন্য বিখ্যাত।

পাকিস্তান (Pakistan)

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ভারতের অন্তর্গত ছিল; ঐ বৎসর বৃটিশ সরকার ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার সময় 'শেষ দান' হিসাবে ভারতকে দুই অংশে (ভারত ও পাকিস্তান) বিভক্ত করিয়া বৃটেনের চিরাচরিত 'বিভক্তীকরণ ও শাসন' (Divide & Rule) নীতির শেষ চিহ্ন পাকা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ১৯৫৬ সালে মার্চ মাসে পাকিস্তান একটি ঐস্লামিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। এই দেশ কমন্‌ওয়েল্‌থের সদস্য। পাকিস্তান দুইটি অংশে বিভক্ত—পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। নূতনভাবে এই দুইটি অংশের শাসনতান্ত্রিক অঞ্চলসমূহ পুনর্গঠিত হইয়াছে :

পশ্চিম পাকিস্তান—পেশোয়ার, ডেরা ইস্‌মাইল খান, রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর, মুলতান, ভাওয়ালপুর, খয়েরপুর, হায়দারাবাদ, কোয়েটা ও কালাত এই ১০টি বিভাগ লইয়া গঠিত।

পূর্ব পাকিস্তান—ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী এই ৩টি বিভাগ লইয়া গঠিত।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যস্থলে ভারত অবস্থিত বলিয়া স্থলপথে এই দুই অংশের দূরত্ব প্রায় ১,৪৫০ কিলোমিটার। পাকিস্তানের মোট আয়তন ৯,৪৪,৭০০ বর্গ-কিলোমিটার।

লোকবসতি (Population)—পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন ৮,০৩,৫০০ বর্গ-কিলোমিটার এবং পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন ১,৪১,২০০ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনে পূর্ব পাকিস্তান অনেক কম হইলেও, এই অংশে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন লোক বাস করে; পশ্চিম পাকিস্তানে বাস করে মাত্র শতকরা ৪৪ জন লোক। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ স্থান মরুভূমি বলিয়া এখানকার লোকবসতি প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে মাত্র ৪১ জন; এখানকার অধিকাংশ লোক সিন্ধুনদের উপত্যকায় বাস করে। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ স্থান সমতলভূমি বলিয়া এবং নদী-উপত্যকায় অবস্থিত হওয়ায় কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতিসাধন হইয়াছে; সেইজন্য এখানকার লোকবসতি প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ৩০৬ জন; চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া প্রায় সর্বত্রই ঘনবসতি বিদ্যমান। ১৯৬১ সালে পাকিস্তানের মোট লোকসংখ্যা ছিল ৯ কোটি ৪৬ লক্ষ। লোকসংখ্যায় এই দেশ পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করে; চীন, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের পরেই ইহার স্থান।

সমগ্র পাকিস্তানে গড় লোকবসতি প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে মাত্র ১০০ জন। এই দেশের শতকরা ৮৬ জন লোক মুসলমান। পাকিস্তানের শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে; কারণ এই দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী।

ভূ-প্রকৃতি (Physical Features)—পাকিস্তানের দুই অংশে বিভিন্ন প্রকার ভূ-প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের ভূ-প্রকৃতিকে মোটামুটি তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়—পশ্চিমাংশের পর্বতশ্রেণী, বালুচিস্তানের মালভূমি এবং সিন্ধু-উপত্যকার সমতলভূমি। (ক) **পশ্চিমাংশের পর্বতশ্রেণী** পামীর গ্রন্থি হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে; এই পর্বতশ্রেণীর বিভিন্ন অংশ পীর পাঞ্জাল, হিন্দুকুশ, সুলেমান ও খিরথর নামে পরিচিত। ইহার উচ্চতা প্রায় ৩,০০০ মিটার। ইহার মধ্যদিয়া সিন্ধুনদের শাখা কাবুল নদী প্রবাহিত হইয়া হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে; ইহার ফলে এই দুইটি পর্বতের মধ্যদিয়া গিরিপথের সৃষ্টি হইয়াছে। এইভাবে গোমাল ও বোলান গিরিপথেরও সৃষ্টি হইয়াছে এই পর্বতশ্রেণীর অধিকাংশ অংশ পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের স্বাভাবিক সীমারেখা হিসাবে কাজ করে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ বিদ্যমান; তন্মধ্যে খনিজ তৈল, লবণ, লিগ্‌নাইট, জিপ্‌সাম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (খ) **বালুচিস্তানের মালভূমি** পশ্চিমাংশের পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমে অবস্থিত। এই মালভূমি পারস্য পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তরাংশের উচ্চতা প্রায় ৫০০ মিটার এবং দক্ষিণাংশের উচ্চতা প্রায় ১০০০ মিটার। বৃষ্টিপাতের অভাবে এই মালভূমির অধিকাংশ স্থানে মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। এই মালভূমির কোন কোন স্থানে 'কারেজ' জলসেচের সাহায্যে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। এখানে অল্পবিস্তর খনিজ সম্পদও পাওয়া যায়। (গ) **সিন্ধু উপত্যকার সমতলভূমি** পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ অঞ্চল। সিন্ধু ও ইহার উপনদীসমূহ (শতদ্রু, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা) এই অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার ফলে নদী-উপত্যকার মৃত্তিকা উর্বর হইয়াছে। এই সকল নদী দ্বারা জলসেচের সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সেইজন্য এই অঞ্চল কৃষিকার্যে উন্নতি লাভ করিয়াছে; এই দেশের অধিকাংশ গম এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয় পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ লোক এই অঞ্চলে বাস করে।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রধানতঃ দুইপ্রকার ভূ-প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়—যমুনা-মেঘনা-পদ্মা-বিধৌত সমতলভূমি এবং চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল।

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ স্থান সমতলভূমি। যমুনা, মেঘনা ও

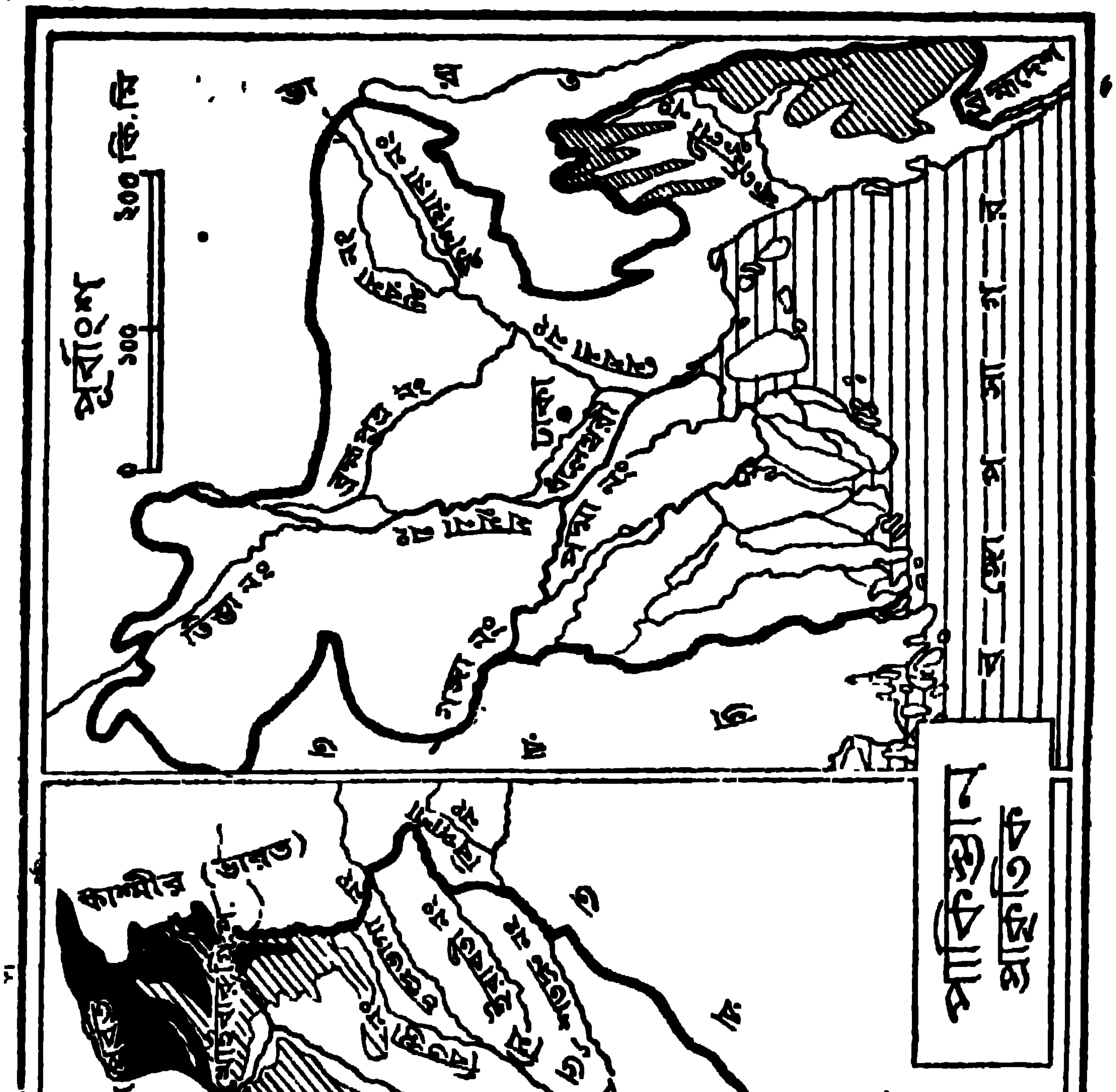

পদ্মা নদী এবং ইহাদের উপনদীসমূহ এই সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় এখানকার মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে; এই অঞ্চলের

বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বেশী। এইজন্য পূর্ব পাকিস্তানের এই সমতলভূমি কৃষিকার্যে অত্যন্ত উন্নত। পাট ও ধান উৎপাদনের জন্য এই অঞ্চল জগদ্বিখ্যাত। এখানকার নদীসমূহে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। (খ) পূর্ব পাকিস্তানের পূর্বাংশে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের **পাহাড়** অবস্থিত। এখানকার পাহাড়ের উচ্চতা ৬০০ মিটারের বেশী নহে। এই সকল পাহাড় হিমালয় পর্বত হইতে নির্গত পর্বতের শেষাংশ। এখানকার লোকবসতি অপেক্ষাকৃত কম।

জলবায়ু—পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের জলবায়ু সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের। **পূর্ব পাকিস্তান** মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেশী ২০০-১৫০ সে: মি:; কর্কটক্রান্তি ইহার উপর দিয়া গিয়াছে বলিয়া এই অংশে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। পদ্মা নদীর দক্ষিণাংশে সমুদ্রোপকূলে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে অরণ্যাঞ্চল ও লবণাক্ত মৃত্তিকাযুক্ত ব-দ্বীপ দেখা যায়। এখানকার অধিক বৃষ্টিপাত কৃষিকার্যের, বিশেষতঃ ধান ও পাট চাষের বিশেষ উপযোগী। এই অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা বেশী এবং শীতকালীন তাপমাত্রা মৃদু।

পশ্চিম পাকিস্তানে সাধারণতঃ মরুদেশীয় জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা অত্যধিক (৩৫°-৪০° সে:)। এখানকার জাকোবাবাদে পৃথিবীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (৫৫° সে) পরিলক্ষিত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত কম। পূর্বাংশ হইতে পশ্চিমাংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশঃই কমিতে থাকে। পাঞ্জাবের বৃষ্টিপাত ৬৫ সে: মি: হইলে বালুচিস্তান ও পেশোয়ার অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ১০ সে: মি:। পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন অংশ (বালুচিস্তান,-হায়দারাবাদ প্রভৃতি) বৃষ্টিপাতের অভাবে মরুভূমির আকার ধারণ করে। এখানকার জলবায়ু গম, ইক্ষু, তুলা, তামাক প্রভৃতি চাষের উপযোগী। জলের অভাবে অধিকাংশ কৃষিকার্য নদী-উপত্যকা ও জলসেচযুক্ত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। শীতকালে কোন কোন অংশে, বিশেষতঃ বালুচিস্তানে তাপমাত্রা হিমাঙ্ক পর্যন্ত নামিয়া আসে। সাধারণতঃ এই দেশে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না; কিন্তু লাহোর ও পেশোয়ার অঞ্চলের কোন অংশে ভূমধ্যসাগর হইতে আগত বায়ুর প্রভাবে অল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। শীতকালীন বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে বিভিন্ন ফল জন্মে; এই কারণে পেশোয়ারের ফল বিখ্যাত।

বনভূমি (Forest)—পশ্চিম পাকিস্তানের বহুস্থান মরু-প্রকৃতির হওয়ায়

বনজ সম্পদে এই দেশ বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। মোট ভূভাগের শতকরা মাত্র ৩ ভাগ বনভূমি; মোট বনভূমির শতকরা ৪৫ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে এবং ৫৫ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। পশ্চিম পাকিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি পরিলক্ষিত হয়; এখানে কোন কোন স্থানে পাইন বৃক্ষ জন্মে। এই পার্বত্য অঞ্চলের পূর্বে ও দক্ষিণে শুষ্ক বালুকাময় অঞ্চলে স্তাভানা তৃণভূমি দেখা যায়। এখানে বাবুল ও কাঁটাগাছ জন্মে। সিন্ধুনদের অববাহিকার সমতলভূমির কোন কোন অংশে ক্ষুদ্রকায় তৃণ ও গুল্ম জন্মে।

পূর্ব পাকিস্তানের ব-দ্বীপ অঞ্চলে ও চট্টগ্রামের পাহাড়ে বনভূমি বিদ্যমান। দক্ষিণাংশের সুন্দরবনের সুন্দরী কাঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া দিনাজপুরের জঙ্গল ও ঢাকার মধুপুরের জঙ্গলেও বিভিন্ন মূল্যবান্ কাঠ পাওয়া যায়। ওখানকার গর্জন ও গামারী কাঠ নৌকা-নির্মাণ ও বাক্স প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর বাঁশ জন্মে। গৃহনির্মাণে, কারুকার্যখচিত দ্রব্যাদি প্রস্তুতে এই বাঁশ ব্যবহৃত হয়। নরম কাঠের অভাবে এই দেশ কাগজশিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। বনজ সম্পদের উন্নতির জন্য সম্প্রতি চট্টগ্রামে একটি বনবিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।

জলসেচ (Irrigation)—পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষিকার্যের উন্নতির মূলে রহিয়াছে এখানকার জলসেচ-ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি। বৃটিশ আমলেই অধিকাংশ জলসেচ-ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। স্বাধীনতার পরেও কয়েকটি জলসেচ-পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। সিন্ধু ও ইহার শাখানদীসমূহের জল হইতে এখানে জলসেচের সুবন্দোবস্ত করিয়া বহু মরুপ্রায় জমিকেও কৃষিকার্যের আওতায় আনা হইয়াছে। খালের মাধ্যমে জলসেচনে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পশ্চিম পাকিস্তানে বৃষ্টিপাতের অপ্রতুলতা এখানকার জলসেচের উন্নতিতে অনুপ্রেরণা দিয়াছে। পাকিস্তানে প্রায় ১ কোটি ৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা আছে। সিন্ধুনদ এবং ইহার শাখা শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী হাতের পাঁচটি আঙুলের মতো ছড়াইয়া আছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের লায়ালপুর ও মণ্টগোমারী জেলা মরুপ্রায় অঞ্চলে অবস্থিত; কিন্তু জলসেচের সাহায্যে এখানে প্রচুর কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। নদী হইতে খাল কাটিয়া এখানে

প্রায় ৬৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচন করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের খালসমূহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৭,০০০ কিলোমিটার। এখানকার নদীসমূহের উৎপত্তিস্থল ভারতে অবস্থিত হওয়ায় খালের জলের পরিমাণ বহুলাংশে ভারতের সদাশয়তার উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে চুক্তির মারফত খালের জল নিয়ন্ত্রিত করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন নদীর মধ্যবর্তী. প্রধানতঃ চারিটি দোয়াব বিদ্যমান : বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী জেক দোয়াব, চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী রেচনা দোয়াব, ইরাবতী ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী বারি দোয়াব এবং সিন্ধু ও চন্দ্রভাগা-বিতস্তা নদীর মধ্যবর্তী সিন্ধুসাগর দোয়াব। এই সকল দোয়াবের মধ্যদিয়া বিভিন্ন খাল প্রবাহিত হইয়া ইহার জমিকে শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিয়াছে।

পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রধানতঃ **পাঁচটি খাল** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) **উচ্চ চন্দ্রভাগা খাল** (Upper Chenub Canal) কাশ্মীরের মারালার নিকট চন্দ্রভাগা নদী হইতে কাটিয়া নেওয়া হইয়াছে। ইহা শেষপর্যন্ত বালোকির নিকট ইরাবতী নদীর সহিত মিশিয়াছে। ১৯১২ সালে এই খাল নির্মিত হয়। শিয়ালকোট, গুজরাণওয়ালা ও শেখপুরা জেলায় এই খালের মারফত জলসেচ হয়। (২) **নিম্ন চন্দ্রভাগা খাল** (Lower Chenub Canal) খামকীর নিকট চন্দ্রভাগা নদী হইতে বাহির হইয়াছে; ইহা দ্বারা লায়ালপুর জেলায় জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯০ সালে এই খাল নির্মিত হয়। ইহা পাকিস্তানের দীর্ঘতম খাল; ইহার দৈর্ঘ্য ৩,৯২৩ কিলোমিটার। এই খাল খননের পূর্বে লায়ালপুরের লোকবসতি ছিল প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে মাত্র ৪ জন; কিন্তু খাল উন্মুক্ত হইবার পরে লায়ালপুরে উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং ইহার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ১১৬ জন হয়। (৩) **উচ্চ বিতস্তা খাল** (Upper Jhelum Canal) কাশ্মীরের মঙ্গলার নিকট বিতস্তা নদী হইতে কাটিয়া নেওয়া হইয়াছে। ১৯১৫ সালে এই খাল খনন করা হয়। গুজরাট ও শাহ্‌পুর জেলায় এই খালের সাহায্যে জলসেচ করা হয়। (৪) **নিম্ন বিতস্তা খাল** (Lower Jhelum Canal) কাশ্মীর সীমান্তে অবস্থিত রসুলের নিকট বিতস্তা নদী হইতে কাটিয়া নেওয়া হইয়াছে। এই খালের সাহায্যে শাহ্‌পুর জেলায় প্রায় ৩,৩৪,০০০ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। এই খাল খননের ফলে শাহ্‌পুরে উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। (৫) **নিম্ন বারি দোয়াব খাল** (Lower Bari Doab

Canal) লাহোরের নিকট ইরাবতী নদী হইতে কাটিয়া নেওয়া হইয়াছে। ভারতের উচ্চ বারি দোয়াব খালের শেষ প্রান্ত হইতেও এই দেশের লাহোর ও মন্টগোমারী জেলায় জলসেচ হইয়া থাকে।

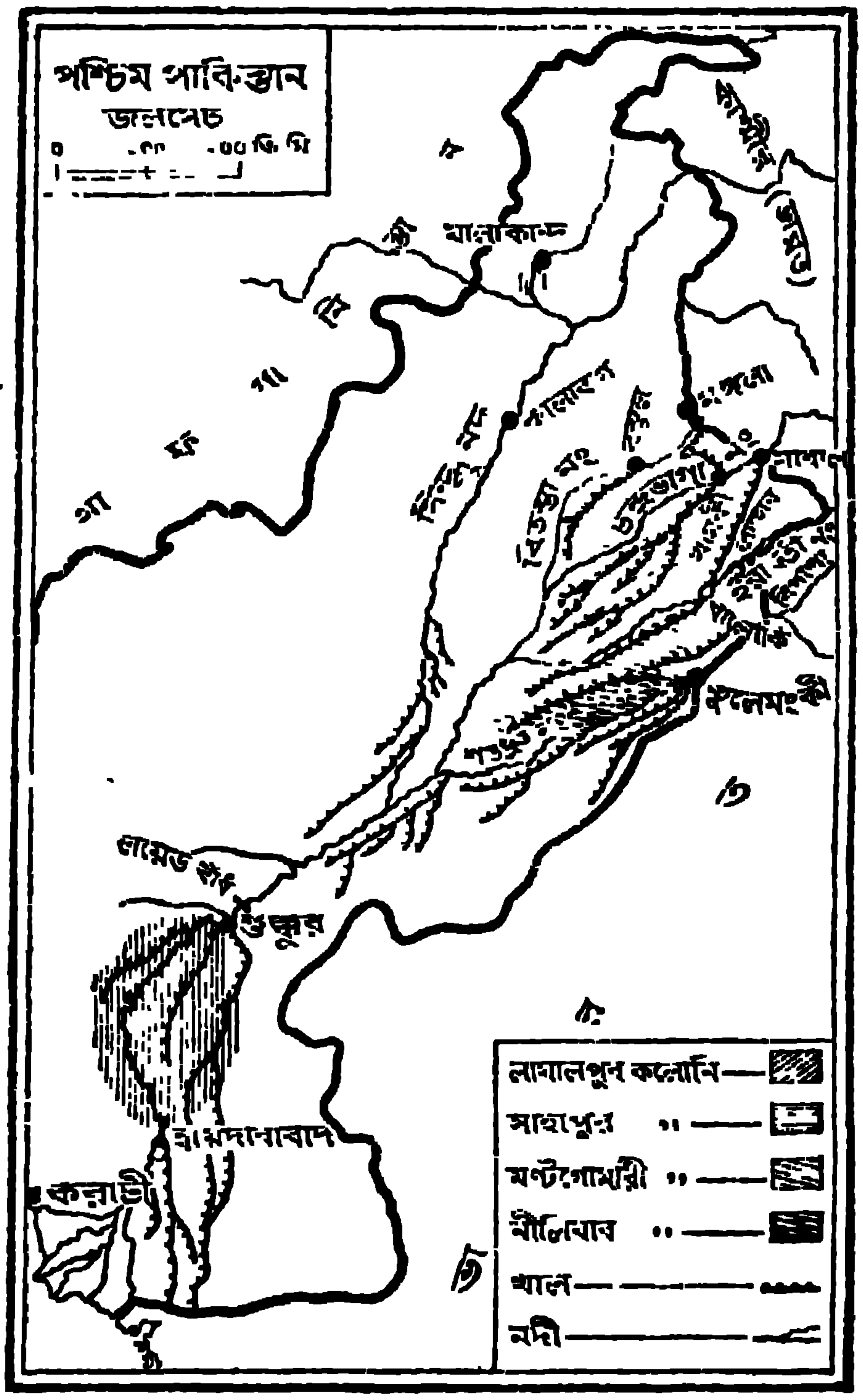

পশ্চিম পাকিস্তানের **ত্রয়ী পরিকল্পনা (Triple Project)** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পরিকল্পনা উচ্চস্তরের সেচব্যবস্থার অদ্ভুত নিদর্শন। ১৯৩৩ সালে ইহার কাজ শেষ হয়। নদীর উচ্চাংশের খালসমূহ নদী হইতে অধিকাংশ জল লইয়া যাওয়ার ফলে নিম্নাংশের খালসমূহে জলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সেইজন্য নিম্ন বারি দোয়াব খালকে উচ্চ চন্দ্রভাগা খালের সহিত বালোকিতে এবং উচ্চ বিতস্তা খালকে নিম্ন চন্দ্রভাগা খালের সহিত খাকিতে যুক্ত করিয়া এই সকল খালে জলের সমতা রক্ষা করা হইয়াছে। বারি দোয়াব অঞ্চলের মধ্যবর্তী অংশে মন্টগোমারী উপনিবেশ এবং দক্ষিণাংশে নীলিবার উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। শতদ্রু নদী হইতে গাণ্ডসিংওয়ালার নিকট **শতদ্রু খাল** এবং সুলেমান্‌কির নিকট **দিপালপুর খাল** কাটিয়া নেওয়া হইয়াছে। শতদ্রু খাল লাহোর অঞ্চলে এবং দিপালপুর খাল নীলিবার উপনিবেশে জলসেচের সহায়তা করে। হায়দারাবাদ অঞ্চলে (প্রাক্তন সিন্ধুপ্রদেশ) সিন্ধুনদের উপর সুক্কুর নামক স্থানে **লয়েড বাঁধ** নির্মাণ করিয়া বিরাট জলাধারে জল সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়। এই জলাধার হইতে বহু খাল কাটিয়া জলসেচের বন্দোবস্ত করা হয়। এই বাঁধের সাহায্যে প্রায় ৩৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে

জলসেচ করিয়া প্রচুর গম ও তুলা উৎপন্ন হয়। সিন্ধুসাগর দোয়াব অঞ্চলে 'থল পরিকল্পনার' সাহায্যে এবং জেক ও রেচনা দোয়াব অঞ্চলে 'রসুল পরিকল্পনার' সাহায্যে নলকূপ বসাইয়া জলসেচের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। বালুচিস্তানে 'কারেজ' প্রথায় জলসেচের বন্দোবস্ত করা হয়। বর্তমানে সিন্ধু-নদের উচ্চ অংশে ও নিম্ন অংশে খাল কাটিয়া আরও জলসেচের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। পেশোয়ার অঞ্চলে সোয়াত পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রায় ১,৬০,০০০ হেক্টর জমিতে জলসেচ হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া এই অঞ্চলে ওয়ারসাক, কোহাট, খেস্‌কি, কুমারগাহ্‌রি, রোহ্‌ড়কোহি নামক পরিকল্পনাসমূহের সাহায্যে প্রায় ৮৪,০০০ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইতেছে।

পূর্ব পাকিস্তানে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হওয়ায় কৃত্রিম জলসেচের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। বর্তমানে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে গঙ্গা-কোবাদক পরিকল্পনার মারফত ৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে এবং তিস্তা বাঁধের সাহায্যে ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

কৃষিকার্য (Agriculture)—পাকিস্তান কৃষিকার্যের উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল। এখানকার শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিজীবী। অনুকূল জলবায়ু ও উর্বর মৃত্তিকা এই দেশের কৃষিকার্যের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। সমতলভূমির অধিকাংশ স্থানে উর্বর পলিমাটি বিদ্যমান; পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন নদী-উপত্যকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধুনদ ও শাখানদীসমূহের উপত্যকায় এই পলিমাটি দেখা যায়। এই দেশের মোট কৃষি-জমির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ১২ লক্ষ হেক্টর; অর্থাৎ মোট ভূমিভাগের শতকরা ৪০ ভাগ। কোন কোন স্থানে, বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানে জমিতে বৎসরে একাধিকবার চাষ হয়। পাকিস্তানের কৃষি-পদ্ধতি সাধারণতঃ অনুন্নত। বর্তমানে এফ্‌. এ. ও.-র মাধ্যমে কৃষি-পদ্ধতির কিছু কিছু উন্নতি সাধন করা হইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ব-দ্বীপ অঞ্চলে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের খাল অঞ্চলে যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতি প্রচলিত হইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রধানতঃ মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সাহায্যে কৃষিকার্য হইয়া থাকে; কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষিকার্য প্রধানতঃ জলসেচনের উপর নির্ভরশীল।

কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন (১৯৬৪-৬৫)

(লক্ষ মেঃ টন)

ধান	১৭৭	ইক্ষু	১৫৭
গম	৪১	তূলা	৩·৪৫
পাট	১১·৫	চা	·২৪

পাকিস্তানের কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যশস্যই প্রধান। দেশের মোট কৃষি-জমির শতকরা ৮৬ ভাগ জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। বৃষ্টিপাত অনুকূল হইলে এই দেশ খাদ্যশস্য রপ্তানিও করিতে পারে; কিন্তু কোন বৎসর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হইলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমিয়া যায় এবং খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হয়। দেশের সরকারের মুহুর্মুহু পরিবর্তন এবং সামরিক একনায়কত্বের দরুন স্বাধীনতার পরেও এই দেশে কৃষিকার্যের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই।

ধান পাকিস্তানের সর্বপ্রধান ফসল। ধান-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। পূর্ব পকিস্তানে ইহা প্রধানতঃ উৎপন্ন হয় এবং এই অংশের মানুষের চাউল প্রধান খাদ্য। মোট এক কোটি হেক্টর ধানের কৃষি-জমির মধ্যে প্রায় ৮৮ লক্ষ হেক্টর জমি পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্রই ধান উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে বরিশাল, ময়মনসিংহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ার অঞ্চলে ধান উৎপন্ন হয়। **গম** পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান খাদ্য। ইহা প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের নদী-উপত্যকায়. উৎপন্ন হয় এবং এই অংশে মানুষের গম প্রধান খাদ্য। সিন্ধু ও ইহার উপনদীসমূহ ও ইহাদের খালসমূহের নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং পোশায়ারে গম উৎপন্ন হয়। মজঃফরপুর, আটক, ঝিলাম ও শিয়ালকোট গম উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। পূর্ব পাকিস্তানে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য গম উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ৪১,০০০ মেঃ টন। খাল-সন্নিহিত উপনিবেশ এবং পেশোয়ার অঞ্চলে অল্পবিস্তর যব উৎপন্ন হয়। ইহার পরিমাণ মাত্র ১,৬১,০০০ মেঃ টন। পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি, আটক, ঝিলাম ও গুজরাট অঞ্চলে প্রায় ৫ লক্ষ মেঃ টন ভুট্টা উৎপন্ন হয়। শেখপুরা, শিয়ালকোট, গুজরাণওয়ালা, সুক্কুর ও হায়দারাবাদ অঞ্চলেও

অল্পবিস্তর ভুট্টা উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে জোয়ার, বাজরা,

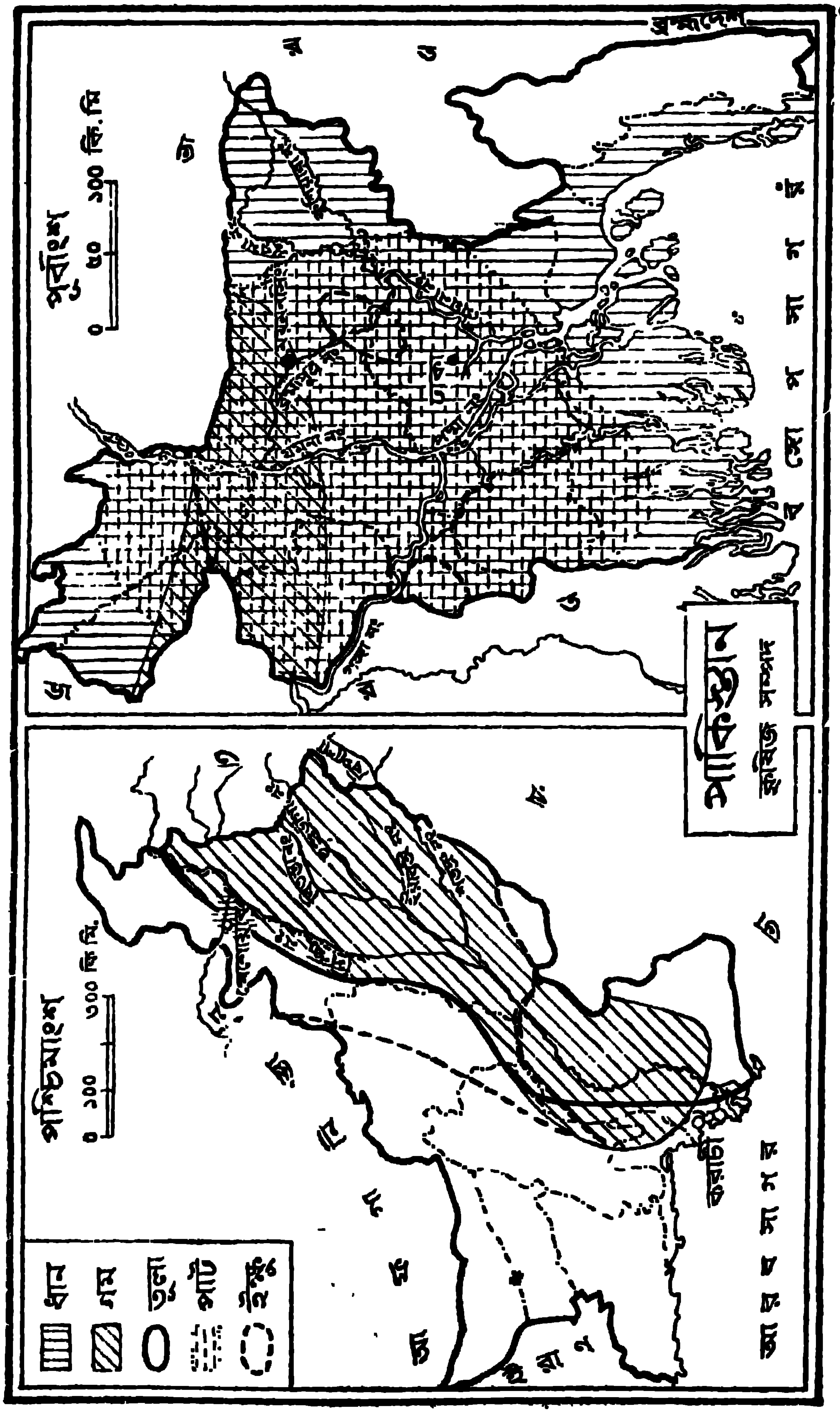

ছোলা ও অড়হর ডাল এবং পূর্ব পাকিস্তানে মুগ, মসুর ও মটর ডাল উৎপন্ন হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে এবং শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলায় অধিকাংশ **চা** উৎপন্ন হয়। চট্টগ্রাম বন্দর মারফত প্রতিবৎসর প্রায় ১১,০০০ মেঃ টন চা প্রধানতঃ বৃটেনে রপ্তানি হইয়া থাকে। পাকিস্তানের রংপুর, দিনাজপুর ও চট্টগ্রামে এই দেশের অধিকাংশ **তামাক** উৎপন্ন নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের হায়দারাবাদ ও পেশোয়ার অঞ্চলেও অল্পবিস্তর তামাক জন্মে। এই দেশের বাৎসরিক তামাক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ মেঃ টন। **ইক্ষু**-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ার, হায়দারাবাদ, মণ্টগোমারী, লায়ালপুর, ও শিয়ালকোট অঞ্চলে এবং পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর, রংপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহে অধিকাংশ ইক্ষু উৎপন্ন হয়।

তুলা-উৎপাদনে পাকিস্তান পৃথিবীতে অষ্টম স্থান অধিকার করে। এখানকার তুলা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। পশ্চিম পাকিস্তানের মণ্টগোমারী, লায়ালপুর মুলতান, শাহ্পুর, লাহোর, শেখপুরা ও ঝাং জেলায় মোট উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ তুলা উৎপন্ন হয়। পূর্ব পাকিস্তানে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে ও ত্রিপুরা জেলায় অল্পবিস্তর তুলা উৎপন্ন হয়। তুলা-রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ তুলা প্রধানতঃ বৃটেন, জাপান, হংকং ও পশ্চিম জার্মানীতে রপ্তানি হয়। **পাট**-উৎপাদনে পাকিস্তান পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। রং ও দৈর্ঘ্যে এখানকার **পাট** অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। এই দেশের হেক্টর-প্রতি পাটের উৎপাদনও অনেক বেশী—প্রায় ২০০ কিলোগ্রাম। পাট-চাষ পূর্ব পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ ; এখানকার জলবায়ু ও মৃত্তিকা পাট-চাষের বিশেষ উপযোগী। জলাশয়ের অভাব না থাকায় পাট ভিজাইবার কোন অসুবিধা হয় না। উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা, নদীর চরের পলিমাটি এবং ব-দ্বীপ অঞ্চলের নিম্নভূমিতে উৎকৃষ্ট পাট উৎপন্ন হয়। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা পাটের উপর নির্ভরশীল। পাটের উৎপাদন কম হইলে কৃষকের ঘরে হাহাকার পড়িয়া যায়। খাদ্যোৎপাদনের জন্য পাটের উৎপাদন বর্তমানে কিছুটা কমিয়া গিয়াছে। ময়মনসিংহ জেলায় এই দেশের শতকরা ৭০ ভাগ পাট উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া ঢাকা, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, রাজসাহী ও দিনাজপুরেও প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে বহু পাটের কল স্থাপিত হওয়ায় উৎপন্ন পাটের কিয়দংশ এই সকল কলে নিয়োজিত হয়।

বাকী অংশ চট্টগ্রাম বন্দর মারফত বিদেশে রপ্তানি হয়; এখানকার বাৎসরিক রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৯ লক্ষ মেঃ টন। পাট-চাষের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য ১৯৫০ সালে এই দেশে 'পাকিস্তান জুট কমিটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর বাজারে পরিবর্ত-সামগ্রীর সহিত প্রতিযোগিতার জন্য এই প্রতিষ্ঠান পাটের মূল্য কমাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা ছাড়া এই দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানে তিল, বাদাম, সরিষা, তিসি, রেড়ী প্রভৃতি **তৈলবীজ** উৎপন্ন হয়। পেশোয়ার অঞ্চলে বিভিন্ন **ফলের** চাষ হয়।

গবাদি **পশুপালনে** পাকিস্তান পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। এই দেশে ১৯৬০ সালে প্রায় ১৯৩ লক্ষ গরু ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্বাংশে অধিকাংশ গরু, পেশোয়ার ও হারদারাবাদ অঞ্চলে অধিকাংশ মেষ এবং বালুচিস্তান ও হায়দারবাদ অঞ্চলে উট পালিত হয়। দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, পশম ও চর্ম উৎপাদনে এই দেশ ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিতেছে। পশুপালন-শিল্পের উন্নতির জন্য ১৯৪৯ সালে পেশোয়ারে একটি গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ জলভাগে প্রচুর পরিমাণে স্বাদুজলের **মৎস্য** পাওয়া যায়। ইহা প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে রপ্তানি করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে মৎস্য-উত্তোলনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নহে। সমুদ্রোপকূলে অল্পবিস্তর সামুদ্রিক মৎস্য পাওয়া যায়।

খনিজ সম্পদ (Minerals)—খনিজ সম্পদে পাকিস্তান বিশেষ উন্নত নহে। কিন্তু নূতন খনি আবিষ্কারের প্রচুর সম্ভাবনা এই দেশে বিদ্যমান। সরকারের অকর্মণ্যতায় খনিজ দ্রব্যের উত্তোলনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। বর্তমানে কলম্বো পরিকল্পনার মারফত প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যে কিছু কিছু খনি-অনুসন্ধানের কাজ চলিতেছে। পাকিস্তানের **কয়লা**-উৎপাদন অত্যন্ত কম। ১৯৬৪ সালে এই দেশে মাত্র ৮'৫ লক্ষ মেঃ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে; এই উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ কয়লা বালুচিস্তানে পাওয়া যায়। শাহ্‌পুর, ঝিলাম ও মিয়ালওয়ালি জেলায় অল্পবিস্তর কয়লা পাওয়া যায়। এই দেশে প্রায় ৩৬,৬০০ কোটি মেঃ টন সঞ্চিত কয়লা আছে বলিয়া অনেকে মনে করে। ইহার তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম। পূর্ব পাকিস্তানে কয়লা পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, চীন, বৃটেন, ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ড হইতে এই দেশে কয়লা আমদানি করা হয়। **খনিজ তৈল** পাকিস্তানের প্রধান খনিজ সম্পদ। ১৯৬৪ সালে এই দেশে ৩,২৮,৩০০ মেঃ টন

খনিজ তৈল উৎপন্ন হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের আটকের নিকট ঢুলিয়ান ও খাঁউরে অধিকাংশ তৈলখনি অবস্থিত; ইহা ছাড়া বালকাসার ও জয়া ময়ের তৈলখনিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল তৈলখনি হইতে রাওয়ালপিণ্ডিতে নলযোগে তৈল আনীত হয় ও পরিশোধিত হয়। করাচীতে একটি নূতন তৈল-শোধনাগার স্থাপিত হইতেছে। এই দেশের সঞ্চিত তৈলের পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। বালুচিস্তানের সুই অঞ্চলে ১৯৫৩ সালে **প্রাকৃতিক গ্যাসের** একটি বিরাট সম্ভার আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে প্রতিদিন ১০ কোটি ঘনফুট গ্যাস (১৬ লক্ষ মেঃ টন কয়লার তাপোৎপাদন-ক্ষমতার সমান) উত্তোলিত হইবে। ১৯৬৪ সালে এই দেশে প্রায় ১,২০০ কোটি ঘনফুট গ্যাস উত্তোলিত হইয়াছে। ইহার ফলে ৪'৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়া গিয়াছে। সুই হইতে নলযোগে করাচী ও মুলতানে এই গ্যাস আনীত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের শ্রীহট্টেও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গিয়াছে।

পাকিস্তানে **জলবিদ্যুৎ** উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা বিদ্যমান। বর্তমানে এই দেশ কয়েকটি পরিকল্পনা অনুসারে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে। উচ্চ ও নিম্ন বিতস্তা খালের জলের সাহায্যে রসুল পরিকল্পনার কাজ ১৯৫২ সালে শেষ হইয়াছে; ইহার ফলে ২২,০০০ কিলোওয়াট্ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। পেশোয়ার অঞ্চলের মালাকান্দ দরগাই পরিকল্পনার সাহায্যে ৪০,০০০ কিলোওয়াট্ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে; কাবুলের উপনদী সোয়াতের জলের সাহায্যে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে। কর্ণফুলী পরিকল্পনা অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানের কর্ণফুলী নদীর জলের সাহায্যে ১,৬০,০০০ কিলোওয়াট্ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে; ইহাদ্বারা এখানকার কয়লার অভাবের কিয়দংশ মেটানো যাইবে। কাবুল নদের জলের সাহায্যে ওয়ারসাক পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। ইহা কার্যকরী হইলে ১,৬০,০০০ কিলোওয়াট্ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। সমতলভূমি বলিয়া পূর্ব পাকিস্তানের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা কম হইলেও, পশ্চিম পাকিস্তানের সম্ভাব্য জলবিদ্যুতের পরিমাণ প্রায় ৯ কোটি কিলোওয়াট্।

অতি অল্প পরিমাণে **লৌহ আকরিক** এই দেশে পাওয়া যায় বলিয়া লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে এই দেশ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। চিত্রল, আটক ও সারগোধা জেলায় এবং পেশোয়ারে অল্পবিস্তর লৌহ আকরিক

পাওয়া যায়। বালুচিস্তানের হিন্দুবাগ অঞ্চলে অধিকাংশ ক্রোমাইট পাওয়া

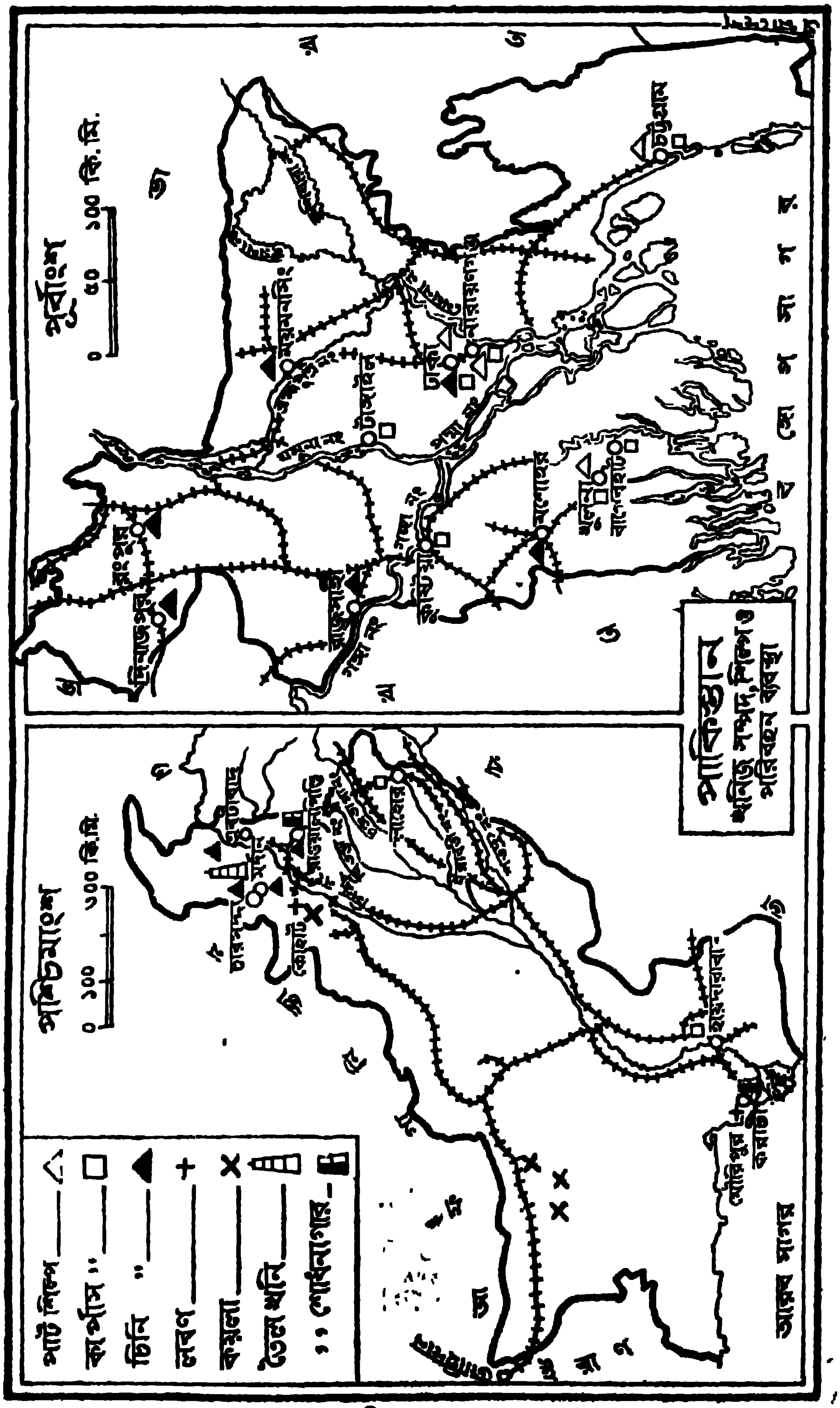

যায়। বালুচিস্তানের রাস্‌কো ও চাগাই অঞ্চলেও ক্রোমাইট পাওয়া যায়।

লাসবেলা ও কালাত অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। এই দেশের মৌরিপুর ও কোহাটে প্রচুর লবণ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, তাম্র, জিপ্‌সাম্, চুনাপাথব, অ্যান্টিমনি, গ্রানাইট, শোবা, গন্ধক প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যও এই দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলে অল্পবিস্তব পাওযা যায়।

শ্রমশিল্প (Industries)—পাকিস্তান শিল্পোৎপাদনে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। বহুদিন এই দেশ বৃটিশেব অধীনে ছিল। সেইসময় বৃটিশ সবকার এই দেশ হইতে কাঁচামাল আমদানি কবিয়া নিজেদেব শিল্পেব শ্রীবৃদ্ধি সাধন কবিত। স্বাধীনতাব পবেও দেশে বাজনৈতিক অবাজকতা ও সামবিক একনায়কত্বেব দরুন সুষ্ঠুভাবে শিল্পেব উন্নতিসাধন সম্ভবপব হয় নাই। ইহা ছাডা, এই দেশ মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রেব তাঁবেদাব বাষ্ট্রে পবিণত হওয়ায় ইহাব অর্থনৈতিক উন্নতি আবও ব্যাহত হইয়াছে। এই দেশে প্রচুব পবিমাণে শিল্পেব কাঁচামাল পাওয়া যায়। পাট-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকাব কবে; উৎকৃষ্ট শ্রেণীব তূলা এই দেশে প্রচুব পবিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহা ছাডা, চর্ম, ইক্ষু, তামাক, পশম প্রভৃতিও এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু কয়েকটি কাবণে এই দেশ শিল্পে উন্নতি লাভ কবিতে পাবে নাই। প্রথমতঃ, কয়লা ও লৌহেব উৎপাদন কম বলিয়া ইস্পাতশিল্প উন্নতি লাভ কবে নাই। কয়লা কম থাকায় শক্তি-সম্পদেব অভাব পবিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতাব পূর্বে অধিকাংশ শিল্প ভারতেব কয়লাখনি বা জলবিদ্যুৎ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। সেই সকল শিল্প এখন ভাবতেব অংশে পডিয়াছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চল বলিয়া স্বাধীনতার পূর্বেও পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প স্থাপিত হয় নাই। তৃতীয়তঃ, এই দেশেব বাজনৈতিক অবাজকতা ও সামবিক একনায়কত্ব শিল্পেব উন্নতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি কবিয়াছে। চতুর্থতঃ, এই দেশেব বহুস্থান মরুপ্রায় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় বহু অঞ্চলে পবিবহণ-ব্যবস্থাব বিশেষ উন্নতি হয় নাই। পঞ্চমতঃ, পূর্ব পাকিস্তানে কৃষিকার্যে উন্নতি লাভ করায় শিল্পেব উন্নতিব দিকে কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই।

স্বাধীনতাব পব স্থানীয় উৎকৃষ্ট শ্রেণীব পাটেব সাহায্যে কয়েকটি পাটেব কল এই দেশে স্থাপিত হইয়াছে; কাপডেব কলের সংখ্যাও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫২ সাল হইতে সবকাব 'পাকিস্তান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের মাবফত পাট, কাগজ, যন্ত্রপাতি ও জাহাজনির্মাণ-শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখানকার

ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পে কিছু মূলধন নিয়োগ করিতেছে। আশা করা যায়, এইভাবে পাকিস্তানের ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পের কিছুটা উন্নতি হইবে। কয়লা ও লৌহের অভাব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শিল্পদ্রব্যের বাজার রক্ষার জন্য এই দেশে ভারী শিল্প-প্রতিষ্ঠা হওয়া সুদূরপরাহত।

কার্পাসবয়ন-শিল্প—স্বাধীনতার সময় পাকিস্তানে ১৪টি কাপড়ের কল ছিল; বর্তমানে ইহার সংখ্যা ১০৫টি; ইহার মধ্যে ৮৪টি পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ২১টি পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত। স্থানীয় উৎকৃষ্টশ্রেণীর তূলার সাহায্যে এই শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। বর্তমানে মোটা ও মাঝারি ধরনের বস্ত্র-উৎপাদনে পাকিস্তান মোটামুটি স্বাবলম্বী; শুধু কিছু পরিমাণে মিহি কাপড় জাপান ও বৃটেন হইতে আমদানি করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের নারায়ণগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ঢাকা, বাগেরহাট, খুলনা ও চট্টগ্রাম এবং পশ্চিম পাকিস্তানের হায়দারাবাদ ও লাহোর অঞ্চলে অধিকাংশ কাপড়ের কল অবস্থিত। ১৯৬০ সালে এই দেশে ৭১,০০০ মেঃ টন বস্ত্র উৎপন্ন হয়।

পাটশিল্প—১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সময় এই দেশে কোন পাট-কল ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের পাট পূর্বে কলিকাতার পাটশিল্পে ব্যবহৃত হইত এবং কলিকাতা বন্দর মারফত রপ্তানি হইত। বঙ্গবিভাগের পর আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানে ১৫টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১টি পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে। অধিকাংশ পাটের কল পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা ও চট্টগ্রামে অবস্থিত। পশ্চিম পাকিস্তানের পাটের কলটি কোত্রি (হায়দারাবাদ) নামক স্থানে অবস্থিত। এখানকার অধিকাংশ পাটজাত দ্রব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে রপ্তানি হইয়া থাকে। এই দেশে পাটশিল্পের উন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা বিদ্যমান। পূর্ব পাকিস্তানে কয়লা পাওয়া না গেলেও, উৎকৃষ্ট পাটশিল্প আরও উন্নতি লাভ করিবে। আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে এখানকার পাটশিল্প চালিত হয় বলিয়া এবং স্থানীয় পাট অত্যন্ত সস্তা বলিয়া এখানকার পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন-খরচ ভারত অপেক্ষা অনেক কম; সেইজন্য পৃথিবীর বাজারে ভারতের সহিত পাকিস্তান সহজেই প্রতিযোগিতা করিতে পারে। কয়লার আমদানি বজায় রাখিতে পারিলে এই দেশ পাটশিল্পে আরও উন্নত হইবে। সম্প্রতি চৌমোহিনী, খুলনা, ঘোড়াসাল, নরসিংদি, চাঁদপুর, ভৈরব ও চট্টগ্রামে আরও ১২টি নূতন পাটকল স্থাপিত হইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানে

আরও একটি পাটের কল লায়ালপুর জিলার জারানওয়ালা নামক স্থানে স্থাপিত হইতেছে।

পাটশিল্পের উৎপাদনের গতি (হাজার মেঃ টন)

১৯৪৭	০	১৯৫৪	৪৭
১৯৫১	'৬	১৯৬৪	৩০৩

পশমবয়ন-শিল্পে পাকিস্তান ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। বর্তমানে এই দেশের ১৫টি কলে পশম-বস্ত্র, গালিচা, কম্বল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। করাচী ও লায়ালপুরে এই দেশের **রেশমবয়ন** ও **রেয়ন-শিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি চট্টগ্রামে একটি রেশমবয়ন-শিল্প স্থাপিত হইয়াছে।

স্থানীয় ইক্ষুর সাহায্যে পাকিস্তানে **চিনিশিল্প** উন্নতি লাভ করিয়াছে। এশিয়ার বৃহত্তম চিনির কল পেশোয়ার অঞ্চলের মর্দানে অবস্থিত। ইহা ছাড়া, পশ্চিম পাকিস্তানের চারসাদ্দা, রাওয়ালপিণ্ডি, অ্যাবটাবাদ, জৌহরাবাদ ও পূর্ব পাকিস্তানের রাজসাহী, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, যশোহর ও রংপুরে চিনিশিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। এখানকার চিনির কলে সুরাসারও প্রস্তুত হয়। এই দেশের মোট ১৪টি চিনির কলের মধ্যে ৮টি পূর্ব পাকিস্তানে এবং ৬টি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। পাকিস্তান এখনও চিনি-উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই।

পাকিস্তানের বাঁশের সাহায্যে চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনা নামক স্থানে একটি **কাগজের কল** স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, পশ্চিম পাকিস্তানে দুইটি কাগজের বোর্ড প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে পাকিস্তানে পাঁচটি **সিমেণ্টের** কল আছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ওয়া, রোহ্‌রি, ডাণ্ডট ও করাচীতে এবং পূর্ব পাকিস্তানের শ্রীহট্টে সিমেণ্টের কারখানাসমূহ অবস্থিত। ১৯৬৪ সালে এই দেশে ১২,৫০,০০০ মেঃ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হইয়াছে। প্রায় অর্ধেক সিমেণ্ট বিদেশে রপ্তানি হয়। পশ্চিম পাকিস্তান ক্রমশঃ **রাসায়নিক শিল্পে** উন্নতি লাভ করিতেছে। এখানকার খেওরা নামক স্থানে এই দেশের বৃহত্তম রাসায়নিক কারখানা অবস্থিত। ইহা ছাড়া, দিয়াশলাই ও কাচশিল্পেও এই দেশ ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে।

পরিবহণ-ব্যবস্থা—পাকিস্তানের রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ১১,৩৪৪ কিলোমিটার। বৃটিশ রাজত্বে পাকিস্তানের **রেলপথ** নির্মিত হইয়াছিল সামরিক

প্রয়োজনে ও কৃষিজ দ্রব্য বন্দরে লইয়া যাইবার জন্য। যেমন, পূর্ববঙ্গ হইতে কলিকাতা পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হইয়াছিল প্রধানতঃ পাট রপ্তানির জন্য। এইজন্য বর্তমানে রেলপথের কিছু বিন্যাস প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। উত্তর-পশ্চিম রেলপথ এখানকার দীর্ঘতম রেলপথ (৮,৬০০ কিলোমিটার)। ইহা লাহোর হইতে পেশোয়ার, শিয়ালকোট, করাচী ও চমন পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি রেলপথ ইরাণ সীমান্তের জাহিদান পর্যন্ত গিয়াছে। পূর্ববঙ্গে রেলপথের দৈর্ঘ্য ২,৭০০ কিলোমিটার। এখানকার মিটার-গেজের রেলপথ চট্টগ্রাম হইতে শ্রীহট্ট, চাঁদপুর, বাহাদুরাবাদ ও ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ব্রড-গেজের রেলপথ পোড়াদহ হইতে সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী হইয়া ফরিদপুর, এবং ঈশ্বরদী হইয়া ডোমার পর্যন্ত বিস্তৃত। খুলনা ও গোয়ালন্দ হইতে দুইটি লাইন কলিকাতা পর্যন্ত গিয়াছে।

পাকিস্তানে ১,১২,৭০০ কিলোমিটার **রাজপথ** আছে; তন্মধ্যে ৪২,০০০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা। নদীবহুল পূর্ব পাকিস্তানে পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য মাত্র ২,৫৭৬ কিলোমিটার। পাকিস্তানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য **সীমান্ত পথ** রহিয়াছে; এই পথে ইরাণ, আফগানিস্তান, চীন ও ব্রহ্মদেশে যাওয়া যায়। (১) বালুচিস্তানের চমন হইতে খোজাক গিরিপথ দিয়া কান্দাহার ও হিরাট পর্যন্ত যাওয়া যায়; এই পথে রাশিয়ার কুস্ক পর্যন্ত যাওয়া যায়। (২) পেশোয়ার হইতে খাইবার গিরিপথ দিয়া কাবুল ও জালালাবাদে যাওয়া যায়। কাবুল হইতে বামিয়ান গিরিপথ দিয়া রাশিয়ার তেরমেজ পর্যন্ত যাওয়া যায়। খাইবার পথে প্রাচীনকালে আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিজ খান, নাদির শাহ প্রভৃতি আক্রমণকারিগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। কাবুল নদীর পাশ দিয়া বরাবর খাইবার গিরিপথ চলিয়া গিয়াছে। পাকিস্তানের ওয়ারসাক পরিকল্পনায় কাবুল নদীকে নাব্য করিয়া তোলা হইবে এবং কাবুল নদীর মারফত জলপথে আফগানিস্তানে যাওয়া যাইবে। (৩) ডেরা ইস্মাইল খান শহর হইতে গোমাল গিরিপথ দিয়া কাল্লাত ও কান্দাহার পর্যন্ত যাওয়া যায়। (৪) কোয়েটা হইতে রেলপথে ইরাণ-পাকিস্তান সীমান্তের জাহিদান পর্যন্ত যাওয়া যায়; সেখান হইতে বাম, কারম্যান, আর্দিস্তান ও কাসান হইয়া মোটরপথে তেহেরাণ যাওয়া যায়। (৫) আটক হইতে চিত্রল ও হিন্দুকুশ হইয়া চীনের কাশগড়ে যাওয়া যায়। ১২ দিনে এই পথে গিলগিট যাওয়া যায়। পেশোয়ার হইতে বাবুসার গিরিপথের (৪,১৭৭ মিটার উচ্চ) মধ্য

দিয়া গিলগিট যাওয়া যায়। (৬) চট্টগ্রাম হইতে বুথিডং হইয়া ব্রহ্মদেশের আকিয়াব পর্যন্ত যাওয়া যায়। এই সকল সামান্ত-পথের মারফত পাকিস্তানের কিছু কিছু বহির্বাণিজ্য সংঘটিত হইয়া থাকে।

জলপথে পাকিস্তান মোটামুটি উন্নত। এদেশে প্রায় ৮,০৫০ কিলোমিটার জলপথ আছে। সিন্ধুনদ ১,৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত সুনাব্য হইলেও ইহার উপত্যকায় রেলপথের বিস্তার হওয়ায় ইহার জলপথের গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে। সিন্ধুনদের ডানদিকের উপনদীসমূহ (কাবুল, গোমাল, গিলগিট ও শায়োক) পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বলিয়া নাব্য নহে; কিন্তু বামদিকের উপনদীসমূহ (শতদ্রু, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা) সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া সুনাব্য। পূর্ব পাকিস্তান নদীমাতৃক দেশ। এখানে প্রায় ৪,৮৩০ কিলোমিটার জলপথ বিদ্যমান। জলপথ এখানকার প্রধান পরিবহণ-ব্যবস্থা। গঙ্গানদী পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়া পদ্মা নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদ রংপুরের নিকট পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়া ফরিদপুরের নিকট পদ্মার সহিত মিশিয়াছে। মেঘনা নদী চাঁদপুরের নিকট পদ্মার সহিত মিশিয়াছে; শ্রীহট্টে এই নদী সুরমা নামে পরিচিত। পূর্ব পাকিস্তানে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে স্টীমার অথবা নৌকাযোগে যাতায়াত করা যায়।

পাকিস্তান **আকাশপথে** ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। এই দেশের দুইটি অংশ বহু দূরে দূরে অবস্থিত; পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা রাখিতে হইলে আকাশপথের উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। করাচী এই দেশের সর্বপ্রধান এবং ঢাকা দ্বিতীয় প্রধান বিমানবন্দর। করাচী ও ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের সহিত পাকিস্তান আকাশপথে যুক্ত। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত 'পাকিস্তান ইণ্টারন্যাশন্যাল এয়ারলাইনস্ করপোরেশন' এই দেশের আন্তর্জাতিক বিমান-চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর বিমানপথে যুক্ত।

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)—বর্তমান সভ্যজগতের প্রয়োজনীয় বহু জিনিস পাকিস্তানে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় না; তন্মধ্যে কয়লা, যন্ত্রপাতি, রবার, লৌহ ও ইস্পাত, মোটর-গাড়ী, রেল-ইঞ্জিন, বিমানপোত, অস্ত্রশস্ত্র, কাগজ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রধান। সেইজন্য এই সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাকিস্তান আমদানি করে। ইহা ছাড়া, কার্পাস-

বস্ত্র, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি সামগ্রীও এই দেশ আমদানি করে। পাকিস্তান এখনও শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে না পারায় বহু কাঁচামাল **রপ্তানি** করিতে বাধ্য হয়। ইহার মধ্যে পাট ও তুলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, পশম, জিপ্‌সাম, চর্ম, খাদ্যশস্য, চা, ফল, মৎস্য প্রভৃতি দ্রব্যও এই দেশ রপ্তানি করিয়া থাকে। মোট আমদানি (২০৯ কোটি টাকা) মোট রপ্তানি (১০৬ কোটি টাকা) অপেক্ষা অনেক বেশী। যদিও পূর্বে বাণিজ্যিক উদ্‌বৃত্ত পাকিস্তানের অনুকূলে ছিল, কিন্তু বর্তমানে বাণিজ্যিক উদ্‌বৃত্ত প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছে। পাকিস্তানে ভারী শিল্প স্থাপিত না হওয়ায় এই বাণিজ্যিক ঋণ শোধ করা এই দেশের পক্ষে কঠিন হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত এই দেশের বাণিজ্য বর্তমানে সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র। এই দেশের মোট আমদানির শতকরা ৩০ ভাগ এবং মোট রপ্তানির শতকরা ২৫ ভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংঘটিত হইয়া থাকে। পূর্বে ভারতের সহিত পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা অধিক বাণিজ্য হইত; কিন্তু ভারতের সহিত এই দেশের মন-কষাকষির জন্য বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে; এই সুযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে। চীন, জাপান, বৃটেন, ইটালি, ইরাণ, সিংহল প্রভৃতি দেশের সহিতও পাকিস্তানের বহির্বাণিজ্য হইয়া থাকে।

শহর ও বন্দর (Cities & Ports)—**রাওয়ালপিণ্ডি** পাকিস্তানের বর্তমান রাজধানী। এখানে একটি সেনানিবাস আছে। ইহা শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র এবং বড় রেল-জংশন ও বিমানবন্দর। **লাহোর** পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর কার্পাসবয়ন-শিল্প, চর্মশিল্প, চিনিশিল্প ও ময়দার কলের জন্য বিখ্যাত। **করাচী** পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ বন্দর। এখানে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে। বহুদিন এই শহর পাকিস্তানের রাজধানী ছিল; সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। রেলপথে করাচী ইহার পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত যুক্ত। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সমস্ত আমদানি-রপ্তানি দ্রব্য এই বন্দর মারফত যাতায়াত করে। এই শহর ময়দার কলের জন্য বিখ্যাত। **পেশোয়ার** উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত একটি বড় শহর ও বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানে একটি সেনানিবাস আছে। **চট্টগ্রাম** পাকিস্তানের দ্বিতীয়

এবং পূর্ব পাকিস্তানের সর্বপ্রধান বন্দর। সমুদ্র হইতে ১৮ কিলোমিটার দূরে কর্ণফুলী নদীর তীরে এই বন্দর অবস্থিত। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। রেলপথে এই বন্দর পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত যুক্ত; পাট রপ্তানির জন্য এই বন্দর জগদ্বিখ্যাত। **ঢাকা** পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ও প্রধান শহর। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর একটি বড় রেল-স্টেশন ও বিমানবন্দর। ইহা অলঙ্কার-নির্মাণ, পাট, তাঁত প্রভৃতি শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। শীতলক্ষা নদীর তীরে অবস্থিত **নারায়ণগঞ্জ** একটি উৎকৃষ্ট নদী-বন্দর; ইহা পাটের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। মেঘনা ও পদ্মা নদীর সঙ্গমস্থলের নিকট অবস্থিত **চাঁদপুর** এবং পদ্মা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত **গোয়ালন্দ** উল্লেখযোগ্য নদী-বন্দর এবং পাট ও মৎস্য ব্যবসায়ের কেন্দ্র। খুলনা জেলার পুসোর নদীর তীরে অবস্থিত **চালনা** বন্দর পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয় প্রধান বন্দর। পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র ব-দ্বীপ অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। পাট, বাঁশ, নারিকেল, সুপারি ও মৎস্য ইহার প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য।

প্রশ্নাবলী

জাপান

1. "In the course of thirty years Japan has made great progress in the matter of industrial development." State briefly how it has been possible for her to do so. [C. U. Inter. 1951]

উ: জাপানের 'অর্থ নৈতিক উন্নতির কারণ' (২৩৮ পৃ:—২৩৯ পৃ:) লিখ।

2. 'Japan is often described as the Britain of the East.' Justify this statement in the light of what you have read about the economic geography of these two countries.

উ: জাপানের 'প্রাচ্যের বৃটেন' (২৩৭ পৃ:—২৩৮ পৃ:) অনুসারে লিখ।

3. Write a balanced geographical account of sericulture and silk industry of Japan. Indicate the chief centres of the industries, the areas producing the raw materials and the present position of the industry.

[C. U. B. Com., 1956]

উ-স: জাপানের 'কৃষিকার্য' হইতে রেশম (২৪৩পৃ:) সম্বন্ধে এবং 'শ্রমশিল্প' হইতে রেশমবয়ন-শিল্প (২৪৯ পৃ:) সম্বন্ধে লিখ। প্রথম খণ্ডের 'কৃষিজ সম্পদ' অধ্যায় ও 'শ্রমশিল্প' অধ্যায় হইতে জাপানের রেশম ও রেশমবয়ন-শিল্প সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া লিখ। রেয়নের সঙ্গে প্রতিযোগিতার দরুন রেশমের উৎপাদনের তুলনায় রেশমবয়ন-শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেশমবয়ন-শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা যোগান দিতে এই দেশের অধিকাংশ রেশম রপ্তানি হয়—এই সম্বন্ধেও উত্তরে আলোচনা করিতে হইবে।

4. Account for the industrial development of Japan and write short accounts of two of the most important industries of the country.

[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উ: 'শ্রমশিল্প' (২৪৬ পৃ:—২৪৭ পৃ:), 'লৌহ ও ইস্পাতশিল্প' এবং 'কার্পাসবয়ন-শিল্প' (২৪৮ পৃ:—২৫১ পৃ:) লিখ।

5. Examine the advantages and disadvantages of industiral development of Japan and give a brief review of the two most important manufacturing industries of the country in regard to sources of raw material, items of manufacture and market.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উ: 'শ্রমশিল্প' (২৪৬ পৃ:—২৪৭ পৃ:), 'লৌহ ও ইস্পাতশিল্প' এবং 'কার্পাসবয়ন-শিল্প' (২৪৮ পৃ:— ২৫১ পৃ:) লিখ।

6. Give an account of the methods of cultivation and the crops cultivated in Japan, as related to the geographical condition of the country.

[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1963]

উ: 'কৃষিকার্য' (২৪১ পৃ:—২৪৩ পৃ:) লিখ।

7. How is it that the cotton textile industry has grown up both in the U. K. and in Japan when both depend on other countries for raw cotton and market ? [B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1965]

উ: বৃটেন ও জাপানের শ্রমশিল্প (৭৭ পৃ:—৮১ পৃ: ও ২৪৬-২৫১ পৃ:) হইতে লিখ।

চীন

8. Estimate and locate the mineral wealth of China. Discuss how it has been possible for this country to become one of the most important producers of mineral wealth within a period of about 10 years.

উ: চীনের 'খনিজ সম্পদ' (২৬১ পৃ:—২৬২ পৃ:) লিখ।

9. Estimate the influence of rivers in the development of agriculture and communications in China. [C. U. Inter. 1955]

উ: চীনের 'কৃষিকার্য' (২৫৯ পৃ:—২৬০ পৃ:) এবং 'নদী' (২৫৭ পৃ:—২৫৮ পৃ:) হইতে লিখ।

10. Give the account of the characteristic features of agriculture in China, and indicate the regions of the country where rice, wheat, cotton and tea are cultivated. [C. U. B. Com. 1960]

উ: চীনের 'কৃষিকার্য' (২৫৯ পৃ:—২৬০ পৃ:) হইতে লিখ।

11. Account for the rapid industrial development of China and describe the industries developed in this country.

উ: চীনের 'শ্রমশিল্প' (২৬৩ পৃ:—২৬৫ পৃ:) হইতে লিখ।

ব্রহ্মদেশ

12. Give an idea of the economic resources of Burma and suggest the industries which she can develop.

[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1963]

উ: কৃষিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদের বর্ণনা করিয়া ব্রহ্মদেশের 'শ্রমশিল্প' (২৭০ পৃ:—২৭২ পৃ:) লিখ।

পাকিস্তান

13. Describe how canal irrigation has been responsible for the agricultural development of West Pakistan.

উ: পাকিস্তানের 'জলসেচ' (২৭৯ পৃ:—২৮২ পৃ:) বর্ণনা কর এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনের সঙ্গে জলসেচের সম্পর্ক বুঝাইয়া দাও।

14. Describe the distribution of jute, cotton and wheat in Pakistan and relate their distribution to the geographical causes.

উ: পাকিস্তানের 'কৃষিকার্য' (২৮২ পৃ:—২৮৬ পৃ:) হইতে পাট, তুলা ও গমের উৎপাদক অঞ্চল বর্ণনা কর এবং এই সকল কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনের ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া দেখাও যে, পাকিস্তানে ইহা বিদ্যমান। তুলা ও গম-চাষের সঙ্গে জলসেচের সম্পর্কও বর্ণনা কর।

15. Examine the present position and future prospects of the sugar, cotton textile and jute industries of Pakistan.

উ: পাকিস্তানের 'শ্রমশিল্প' (২৮৯ পৃ:—২৯১ পৃ:) হইতে লিখ।

সপ্তম অধ্যায়

ভারত (India)

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অবস্থিত ভাবত প্রাচীন সভ্যতাব বাহক। প্রাচীনকালে ভাবতীয় সভ্যতা পৃথিবীব মানুষকে অনুপ্রাণিত কবিয়াছিল। সেই প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভাবতেব মানুষ এখনও বহন কবিয়া

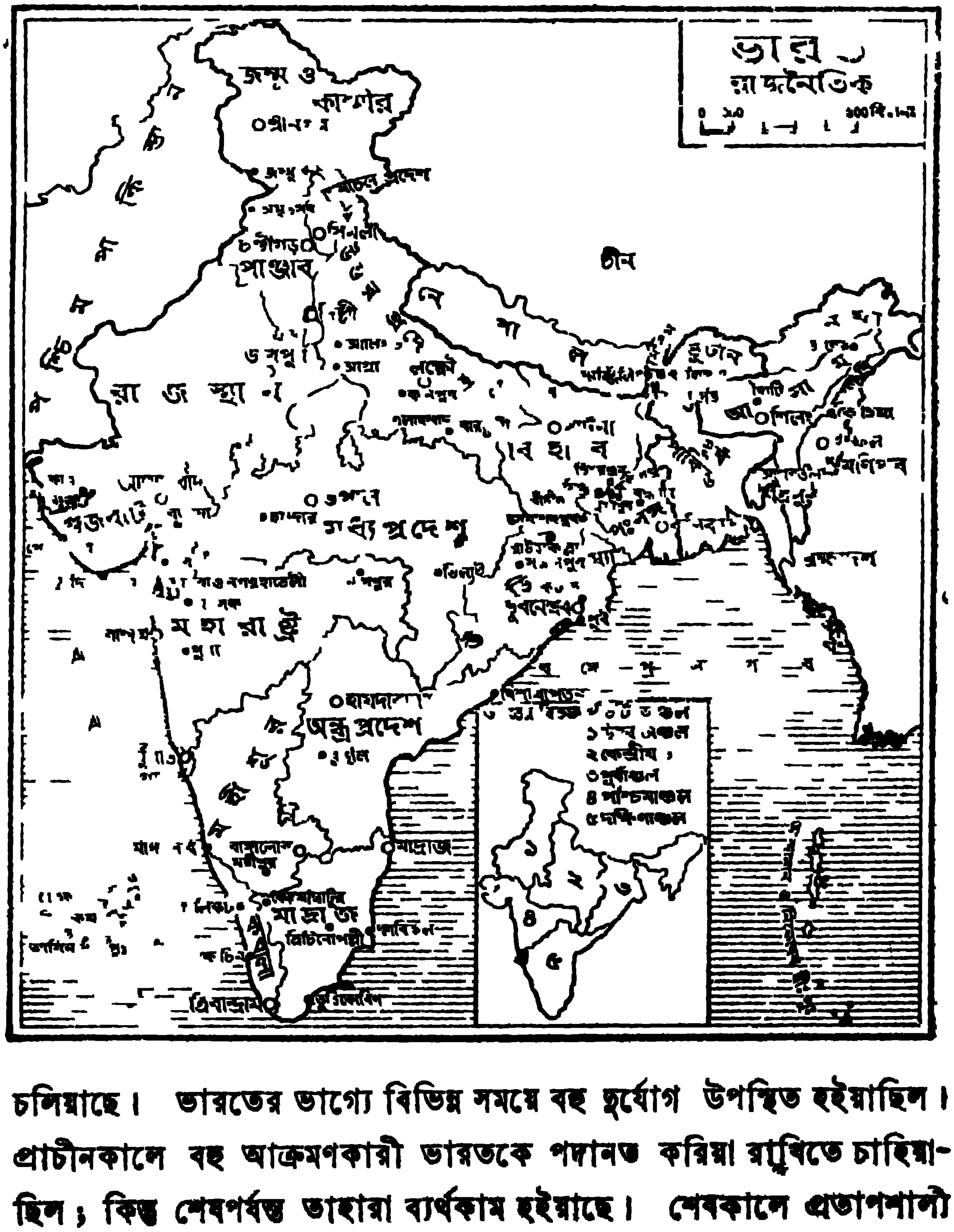

চলিয়াছে। ভারতের ভাগ্যে বিভিন্ন সময়ে বহু দুর্যোগ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালে বহু আক্রমণকারী ভারতকে পদানত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু শেষপর্যন্ত তাহারা ব্যর্থকাম হইয়াছে। শেষকালে প্রতাপশালী

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদিগণ বণিকের বেশে এদেশে আসিয়া ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিল। প্রায় ২০০ বৎসরের পরাধীনতা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিতে প্রভূত বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের অর্থনীতি চলিত বৃটিশের স্বার্থে; ভারতকে বৃটেনের শিল্পের কাঁচামাল-সরবরাহকারী হিসাবে কাজে লাগানো হইত। ১৯৪৭ সালে ইংরেজগণ ভারত ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু শেষ অস্ত্র হিসাবে ভারতকে দুই অংশে (ভারত ও পাকিস্তান) বিভক্ত করিয়া ইংরেজগণ তাহাদের 'বিভক্তীকরণ ও শাসন' (Divide & Rule) নীতির শেষ চিহ্ন পাকা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতীয় প্রজাতন্ত্র (The Republic of India) গঠিত হইয়াছে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের পর বর্তমানে (ক) ১৬টি রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য এবং (খ) ১০টি কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত অঞ্চল লইয়া ভারতীয় প্রজাতন্ত্র গঠিত হইয়াছে।

ক। রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্যসমূহ	রাজধানী
১। অন্ধ্র	হায়দারাবাদ
২। আসাম	শিলং
৩। উত্তরপ্রদেশ	লক্ষ্ণৌ
৪। উড়িষ্যা	ভুবনেশ্বর
৫। কেরালা	ত্রিবান্দ্রাম্
৬। গুজরাট	আমেদাবাদ
৭। জম্মু ও কাশ্মীর	শ্রীনগর
৮। পশ্চিমবঙ্গ	কলিকাতা
৯। পাঞ্জাব	চণ্ডীগড়
১০। বিহার	পাটনা
১১। মধ্যপ্রদেশ	ভুপাল
১২। মহারাষ্ট্র	বোম্বাই
১৩। মহীশূর	বাঙ্গালোর
১৪। মাদ্রাজ	মাদ্রাজ
১৫। রাজস্থান	জয়পুর
১৬। নাগাভূমি	কোহিমা

খ। কেন্দ্রীয় সরকার-শাসিত অঞ্চলসমূহ

১। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

২। লাক্ষা, মিনিকয় ও আমিন দ্বীপপুঞ্জ

৩। দিল্লী

৪। হিমাচলপ্রদেশ

৫। ত্রিপুরা

৬। মণিপুর

৭। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি (নেফা)

৮। দাদরা ও নগর হাভেলী

৯। গোয়া, দমন, দিউ

১০। পণ্ডিচেরী

ভাষার ভিত্তিতে এই সকল রাজ্য পুনর্গঠিত হইলেও জাতীয় ঐক্যবোধ জাগ্রত করিবার জন্য এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ভারতকে পাঁচটি **আঞ্চলিক পরিষদে** বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা, উত্তরাঞ্চল (দিল্লী, পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং রাজস্থান), দক্ষিণাঞ্চল (কেরালা, মহীশূর, মাদ্রাজ ও অন্ধ্র), পূর্বাঞ্চল (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, মণিপুর, নেফা ও নাগাভূমি), পশ্চিমাঞ্চল (মহারাষ্ট্র ও গুজরাট) এবং মধ্যাঞ্চল (উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ)। আঞ্চলিক পরিষদ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও শাসনকার্যে উপদেষ্টার কাজ করিবে।

আয়তনে ভারত পৃথিবীতে সপ্তম স্থান অধিকার করে; রাশিয়া, চীন, কানাডা, ব্রেজিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার পরেই ভারতের স্থান। ভারতের আয়তন ২৯,১৯,৮২০ বর্গ-কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৪৩ কোটি ৬৪ লক্ষ। উত্তর হইতে দক্ষিণে এই দেশ প্রায় ৩,২০০ কিলোমিটার লম্বা এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,০০০ কিলোমিটার। ভারতের সৈকত-রেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫,৬৯০ কিলোমিটার; অর্থাৎ প্রতি ৫১৩ বর্গ-কিলোমিটারে ১ কিলোমিটার সৈকতরেখা এই দেশে বিদ্যমান। এই দেশের সৈকতরেখা বিশেষ ভগ্ন নহে এবং সমুদ্রোপকূল অগভীর। সেইজন্য দেশের আয়তনের তুলনায় বন্দরের সংখ্যা খুব কম।

ভারতের **অবস্থান** বাণিজ্যের সহায়ক। ৮° উঃ অক্ষাংশ হইতে ৩৭° উঃ অক্ষাংশের মধ্যে ভারত অবস্থিত এবং ৯৮° পূঃ দ্রাঘিমাংশ হইতে

৬৮° পূঃ দ্রাঘিমাংশ দ্বারা আবদ্ধ এই দেশ প্রাচ্য জগতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের যোগসূত্র হিসাবেও এই দেশ ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে পারে। কর্কটক্রান্তি এই দেশকে সমদ্বিখণ্ডিত করায় ইহার উত্তরাংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এবং দক্ষিণাংশ গ্রীষ্মমণ্ডলে পড়িয়াছে। ৮২½° পূঃ দ্রাঘিমাংশ এই দেশকে উত্তর-দক্ষিণে সমদ্বিখণ্ডিত করায় ইহার সময়কে ভারতের স্ট্যাণ্ডার্ড সময় বলিয়া ধরা হয়। ভারতের স্বাভাবিক সীমা বিদ্যমান। উত্তর ও পূর্বে হিমালয় পর্বতশ্রেণী ও ইহার শাখা-প্রশাখা চীন ও ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। দক্ষিণে ও পশ্চিমে ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর ইহার স্বাভাবিক সীমা হিসাবে বিদ্যমান। পাকিস্তানের সঙ্গে এই দেশের কোন স্বাভাবিক সীমারেখা নাই। আরব ও ভারত মহাসাগর এই দেশের বহির্বাণিজ্যের অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছে। প্রাচীনকালেও এই সকল সমুদ্রপথে ভারতের বহির্বাণিজ্য সংঘটিত হইত। পুনরায় ভারত এই সমুদ্রপথে বাণিজ্য বিস্তার করিতেছে।

'প্রাচ্যজগতের কেন্দ্রস্থলে ভারত'

প্রাকৃতিক অঞ্চল (Natural Regions)—বিশাল আয়তনের এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের ভূ-প্রকৃতি থাকা স্বাভাবিক। ভারতের উত্তরাংশে বিশালকায় হিমালয় পর্বতশ্রেণী, মধ্যভাগে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকার সমতলভূমি, দক্ষিণে বিস্তীর্ণ মালভূমি এবং উপকূলভাগে সংকীর্ণ সমভূমি বিদ্যমান। দেশের বিভিন্ন অংশে এইরূপ বিভিন্ন ভূ-প্রকৃতি থাকায় দেশের বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু, রীতি-নীতি, কৃষিজ দ্রব্য ও অর্থনৈতিক উন্নতির তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারতকে মোটামুটি পাঁচটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়:—(ক) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, (খ) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমতলভূমি, (গ) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, (ঘ) উপকূলের সমতলভূমি এবং (ঙ) মরুভূমি অঞ্চল।

ক। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল

ভারতের উত্তরে সুবৃহৎ হিমালয় পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান। কাশ্মীরের পামীর গ্রন্থি হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্বতশ্রেণী ভারতের উত্তরাংশের উপর দিয়া ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া শেষপর্যন্ত আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছে। কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,২০০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ প্রায় ৩২০ কিলোমিটার। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট (৮,৮৪২ মিটার) এই পর্বতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। হিমালয় পর্বতশ্রেণীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত। পশ্চিম হিমালয়ের নিম্নাংশ শিবালিক নামে, আসামে ও নাগা অঞ্চলে গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, নাগা, চীন ও লুসাই নামে এবং ব্রহ্মদেশে আরাকান নামে এই পর্বতশ্রেণী পরিচিত।

হিমালয় পর্বতশ্রেণী ভারতের স্বাভাবিক সীমারেখা হিসাবে কাজ করে। ইহা ছাড়া, এই পর্বতশ্রেণীতে মৌসুমী বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া ভারতে বৃষ্টিপাত হয়। হিমালয় পর্বত না থাকিলে হয়তো ভারত বৃষ্টির অভাবে মরুভূমি হইয়া যাইত। মধ্য এশিয়া হইতে যে শীতল বায়ু ভারতের দিকে আসে তাহা হিমালয় পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া ভারত শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পায়। হিমালয়ের নিম্নাংশের সুন্দর দৃশ্যাবলী বহুলোককে আকৃষ্ট করে। কাশ্মীর, মিসৌরী, নৈনিতাল, রানীক্ষেত, সিমলা প্রভৃতি স্থানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে বহুলোক বেড়াইতে আসে। ইহাতে ভারতের প্রচুর অর্থাগম হয়। এই সকল শহরে হোটেল-শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

হিমালয়ের বিভিন্ন অংশের উচ্চতা, জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ ও বৃষ্টিপাতের ভিত্তিতে এই পার্বত্য অঞ্চলকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—পূর্ব হিমালয় ও পশ্চিম হিমালয়।

পূর্ব হিমালয়—গঙ্গানদীর উৎস (হরিদ্বার) হইতে আসামের নামচা বারওয়া শৃঙ্গ পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। পূর্ব হিমালয়ের অপেক্ষাকৃত কম উচ্চ অংশের নাম **তরাই অঞ্চল**। এই অঞ্চলের উচ্চতা প্রায় ১,৫০০ মিটার; ইহা প্রকৃতপক্ষে হিমালয়ের প্রবেশদ্বার। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমির উত্তরে তরাই অঞ্চল অবস্থিত। এই স্থান সাধারণতঃ অস্বাস্থ্যকর ও স্যাঁতসেঁতে; এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। নিম্ন অংশে চিরহরিৎ বৃক্ষ ও উচ্চ অংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। সেইজন্য

এই অঞ্চল কাষ্ঠসম্পদে পরিপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। কৃষিজ সম্পদের মধ্যে ধান, পাট, ইক্ষু ও ফলমূল প্রধান। তরাই অঞ্চলের পশ্চিমাংশে বাঘ, ভল্লুক, চিতাবাঘ প্রভৃতি জীবজন্তু দেখা যায়। পার্বত্য অঞ্চল বলিয়া এখানকার রাস্তাঘাট ও রেলপথের উন্নতি অপেক্ষাকৃত

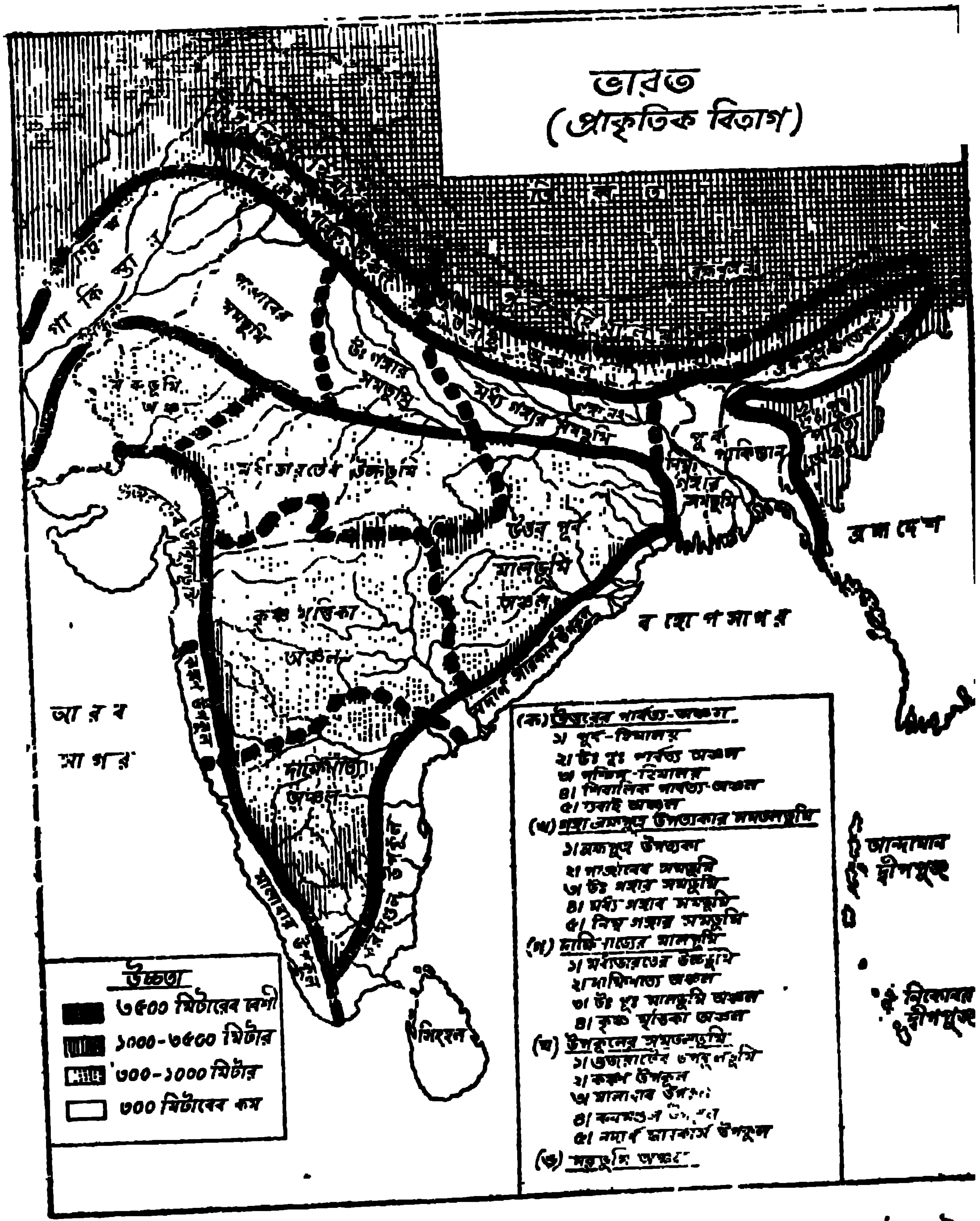

কম। উৎকৃষ্ট কয়লার অভাবে এখানে বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া ওঠে নাই। তরাই অঞ্চলের জেলেপ লা ও নাথু লা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া তিব্বতের রাজধানী লাসা যাওয়া যায়।

পূর্ব হিমালয়ের অন্তর্গত **উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের** উচ্চতা প্রায় ১,৮০০ মিটার হইতে ৩,০০০ মিটার পর্যন্ত। আসাম, মণিপুর প্রভৃতি স্থানের পাতকাই, নাগা, লুসাই, খাসিয়া, গারো ও জয়ন্তিয়া পর্বত এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সেইজন্য এই অঞ্চলে চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য দেখা যায় এবং প্রচুর কাষ্ঠ পাওয়া যায়। চা এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহা ছাড়া, ধান, তুলা ও ফলমূল এখানে উৎপন্ন হয়। তুঁতগাছের কীট হইতে রেশম প্রস্তুত হয়। জীবজন্তুর মধ্যে হাতী ও বাঘ প্রধান। উৎকৃষ্ট কয়লার অভাবে বৃহদাকার শিল্পের উন্নতি না হইলেও এই অঞ্চলে ভারতের অধিকাংশ খনিজ তৈল পাওয়া যায়। এখানে যানবাহনের বিশেষ উন্নতি হয় নাই।

পূর্ব হিমালয়ের উত্তরাংশে **প্রধান হিমালয়ের** উচ্চতা ৫,৫০০ মিটারের বেশী। এই অঞ্চলে উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ দেখা যায়। ইহার বহুস্থানে বরফ জমিয়া থাকে। সেইজন্য মনুষ্যবাসের পক্ষে এই অঞ্চল উপযুক্ত নহে।

পশ্চিম হিমালয়—এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম—প্রায় ৭৫ হইতে ১০০ সেন্টিমিটার। উচ্চতা অনুসারে এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

পশ্চিম হিমালয়ের নিম্নাংশের নাম **শিবালিক** পার্বত্য অঞ্চল। এখানে মৌসুমী অঞ্চলের অরণ্য দেখা যায়। বাঁশ এবং গুল্মভূমিও এখানে পরিলক্ষিত হয়। সেচকার্যের ফলে এই অঞ্চলে গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হয়। এখানকার লোকবসতি অপেক্ষাকৃত ঘন। গঙ্গাতীরে হরিদ্বার এই অঞ্চলের একটি প্রধান শহর। শিবালিক পার্বত্য অঞ্চলের উত্তরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ অংশের নাম **নিম্ন-হিমালয়** অঞ্চল। এখানকার পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি হইতে মূল্যবান্ কাঠ সংগৃহীত হয়। এই অঞ্চলের উচ্চতা ১,৫০০ মিটারের অধিক। নৈনিতাল, মুসৌরী, শ্রীনগর, সিমলা প্রভৃতি শহর এই অঞ্চলে অবস্থিত। এইস্থানে ধান, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, গম প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চল পশমশিল্পের জন্য বিখ্যাত। নিম্ন-হিমালয় অঞ্চলের উত্তরে ৫,৫০০ মিটারের বেশী উচ্চে **প্রধান-হিমালয়** অঞ্চল অবস্থিত।

খ। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমতলভূমি

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুনদের শাখাসমূহের উপত্যকা ইহাঁর অন্তর্ভুক্ত। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত এবং পশ্চিমে পাঞ্জাব

হইতে পূর্বে আসামের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা ইহার অন্তর্গত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ গড়ে প্রায় ২৮০ কিলোমিটার। নদীবাহিত পলিমাটি থাকায় এই অঞ্চলে কৃষিকার্যের উন্নতি হইয়াছে। এই অঞ্চলকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায় :

(১) **পাঞ্জাবের সমভূমি**—সিন্ধুনদের উপনদীসমূহের উপত্যকায় ইহা অবস্থিত। পলিমাটি থাকায় কৃষির উন্নতি হইয়াছে। বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম—প্রায় ৫০ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ পর্যন্ত। সেইজন্য জলসেচের সাহায্যে গম, যব, জোয়ার, বাজরা, তুলা, তৈলবীজ, তামাক, ইক্ষু, ভুট্টা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এখানকার বনভূমি অঞ্চলে দেবদারু গাছ দেখা যায়। এই অঞ্চল পশম, রেশম, বস্ত্র ও চর্মশিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। লুধিয়ানা, অমৃতসর, আম্বালা প্রভৃতি শহর এই অঞ্চলে অবস্থিত।

(২) **উত্তরগঙ্গার সমভূমি**—দিল্লী হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ইহার অন্তর্গত। এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৬০ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত। জলবায়ু শুষ্ক। এখানেও সেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। গম, ইক্ষু, জোয়ার, বাজরা, ধান, ভুট্টা, তুলা, তৈলবীজ এখানকার প্রধান কৃষিজ সম্পদ। এখানকার লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। চিনি, বস্ত্রশিল্প, কাগজ, দিয়াশলাই, রাসায়নিক দ্রব্য ও চর্মশিল্প এখানকার উল্লেখযোগ্য শ্রমশিল্প। এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, মথুরা প্রভৃতি শহর এই সমভূমির শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত।

(৩) **মধ্যগঙ্গার সমভূমি**—এলাহাবাদ হইতে পূর্বদিকে বিহারের সমগ্র অংশ লইয়া গঠিত অঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০০ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ পর্যন্ত। জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন। উত্তরাংশে সেচ-ব্যবস্থা বিদ্যমান। কৃষিকার্য এখানকার মানুষের প্রধান উপজীবিকা। গম, ধান, যব, জোয়ার, বাজরা, রাই, তিসি, ইক্ষু ও তৈলবীজ এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। এখানকার লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানকার রেশম ও চিনিশিল্প বিখ্যাত। বারাণসী, ভাগলপুর, মির্জাপুর, মজঃফরপুর প্রভৃতি এখানকার বিখ্যাত শহর।

(৪) **নিম্নগঙ্গার সমভূমি**—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকার নিম্নাংশ ইহার অন্তর্গত। প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার

মৃত্তিকা উর্বর হওয়ায় এবং অধিক বৃষ্টিপাতের (১৫০ হইতে ২০০ সেঃ মিঃ) ফলে কৃষিকার্য ভালো হয়। পাট, ধান, গম, তৈলবীজ, ইক্ষু প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কৃষিজ সম্পদ। রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে প্রচুর কয়লা থাকায় এই অঞ্চল শিল্পে খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছে। পাট, লৌহ ও ইস্পাত, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পের জন্য এই অঞ্চল বিখ্যাত। কলিকাতা, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, দুর্গাপুর এই সমভূমির বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র।

(৫) **ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা**—ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকায় আসামের উত্তরাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে প্রায় ২৫০ সেঃ মিঃ-এর বেশী বৃষ্টিপাত হয়। ধান, চা, তৈলবীজ, পাট, লেবু প্রভৃতি এখানকার প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। খনিজ তৈল এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ। বনভূমি হইতে উৎকৃষ্ট কাঠ সংগ্রহ করা হয়। গৌহাটি এখানকার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

গ। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি

উত্তর ভারতের দক্ষিণাংশে বিন্ধ্যপর্বত হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। ইহার অধিকাংশই মালভূমি; ইহা দেখিতে একটি ত্রিভুজের মতো। এই মালভূমিটি কঠিন আগ্নেয় শিলা দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চলের পূর্বাংশে পূর্বঘাট (গড় উচ্চতা ৫০০ মিটার) এবং পশ্চিমাংশে পশ্চিমঘাট পর্বত (গড় উচ্চতা ১০০০ মিটার) অবস্থিত। এই অঞ্চলকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়:—

(১) **মধ্যভারতের মালভূমি**—বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে মধ্যভারত এবং রাজস্থানের মালভূমি অঞ্চল ইহার অন্তর্গত। এখানকার বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত। তুলা, তৈলবীজ, জোয়ার, বাজরা, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি এখানে জন্মে। পূর্বদিকের জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন; কিন্তু রাজস্থান অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক। এখানকার লোকবসতি অপেক্ষাকৃত কম। পশুপালন এখানকার লোকের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। ঝাঁসী, জব্বলপুর, আজমীর, জয়পুর প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শহর। (২) **উত্তর-পূর্ব মালভূমি অঞ্চল**—মহানদী ও গোদাবরী-উপত্যকা এবং ছোটনাগপুরের মালভূমি ইহার অন্তর্গত। এখানকার বৃষ্টিপাত প্রায় ১০০ সেঃ মিঃ হইতে ১৫০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত; সেইজন্য পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়া কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন করা হয়। কৃষিজ সম্পদের মধ্যে ধান, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা ও তৈলবীজ প্রধান। কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র প্রভৃতি খনিজ সম্পদ এখানে পাওয়া

যায়। (৩) **কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল**—দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে পূর্ব গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, অন্ধ্র ও মহীশূরের কিয়দংশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত লাভা দ্বারা এখানকার মৃত্তিকা গঠিত। সেইজন্য এখানে বৃষ্টির জল তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায় না। এই মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণের। ইহা তুলা-চাষের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। সেইজন্য অনেকে এই অঞ্চলকে কৃষ্ণ-তুলা-মৃত্তিকা (Black Cotton Soil) অঞ্চল বলে। ইহা ছাড়া, এখানে গম ও বাজরা উৎপন্ন হয়। তুলা-চাষের জন্য ভারতের শ্রেষ্ঠ বস্ত্রশিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। (৪) **দাক্ষিণাত্য অঞ্চল**—মহীশূর রাজ্যের দক্ষিণাংশ এবং অন্ধ্র ও মাদ্রাজের মধ্যবর্তী অঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত। বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত। সেইজন্য পুষ্করিণীর সাহায্যে জলসেচ হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের উত্তরাংশ বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া কৃষিকার্যের ক্ষতি হয়। সেইজন্য ইহা দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল। দক্ষিণাংশে অপেক্ষাকৃত অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, তুলা, ইক্ষু, কফি, চা, রবার, কাজুবাদাম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তৃণভূমি অঞ্চলে পশুপালন হইয়া থাকে। এখানকার শ্রমশিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প, সিমেণ্ট, বিমানপোত, সাবান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মহীশূর, বাঙ্গালোর, হায়দারাবাদ প্রভৃতি এখানকার প্রধান শহর।

ঘ। উপকূলের সমতলভূমি

ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি বিদ্যমান। পূর্ব উপকূলের পশ্চাতে পূর্বঘাট পর্বতমালা এবং পশ্চিম উপকূলের পশ্চাতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা দাঁড়াইয়া আছে। উভয় উপকূলেই মৌসুমী বায়ুরপ্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিমউপকূলে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এই উপকূলভূমিকে সাধারণতঃ পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়; যথা:

(১) **গুজরাটের উপকূলভূমি**—এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া এবং ভূমি অনুর্বর হওয়ায় কৃষির উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। কোন কোন স্থানে গম, জোয়ার, বাজরা ও তুলা জন্মে। এখানে লোকবসতিও কম। চুনাপাথর ও লবণ এখানকার প্রধান খনিজ সম্পদ। কাণ্ডলা এই উপকূলভূমির একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর। এই অঞ্চলের আমেদাবাদে ভারতের শ্রেষ্ঠ বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (২) **কঙ্কণ উপকূল**—পশ্চিম উপকূলে গোয়া হইতে বোম্বাই পর্যন্ত বিস্তৃত অংশের নাম কঙ্কণ উপকূল। এখানকার বৃষ্টিপাত ২০০ সেঃ মিঃ

হইতে ২৫০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত। সেইজন্য এখানে সেগুন, শাল ও আবলুস্ বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। এখানে নারিকেল, সুপারি, ধান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কয়লার অভাবে জলবিদ্যুতের সাহায্যে শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। বস্ত্র-শিল্পে আমেদাবাদের পরেই এখানকার বোম্বাই-এর স্থান। (৩) **মালাবার উপকূল**—পশ্চিম উপকূলে গোয়া হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশের নাম মালাবার উপকূল। এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থা কঙ্কণ উপকূলের মতো। আদা, মরিচ, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি এখানকার কৃষিজ সম্পদ। উচ্চস্থানে সেগুন, চন্দন, আবলুস্ বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। এখানকার দড়ি, রবার ও সাবান শিল্প উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। কোচিন, ত্রিবান্দ্রাম, কোঝিকোড, কুইলন ইত্যাদি এখানকার প্রধান শহর। (৪) **করমণ্ডল উপকূল** বা **কর্ণাট অঞ্চল**—পূর্ব উপকূলে কুমারিকা অন্তরীপ হইতে কৃষ্ণা নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলে বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত হয়। মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী নহে। সেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে ধান, জোয়ার, বাজরা, তূলা, ইক্ষু, চা, নারিকেল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বনভূমি অঞ্চলে আবলুস্, সেগুন ও সিঙ্কোনা গাছ জন্মে। এখানকার লোকবসতি ঘন। মাদ্রাজে বস্ত্রশিল্প শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। মাদ্রাজ, তুতিকোরিণ, পণ্ডিচেরী, মাদুরাই, ত্রিচিনাপল্লী প্রভৃতি এখানকার বিখ্যাত শহর। (৫) **নর্দার্ণ সারকার্স উপকূল**—অন্ধ্র ও উড়িষ্যার উপকূলে মহানদীর মোহনা হইতে কৃষ্ণা নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ইহার অন্তর্গত। এখানকার মৃত্তিকা উর্বর; সেইজন্য এখানে ধান, জোয়ার, বাজরা, মসলা, নারিকেল, ইক্ষু প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। বনভূমিতে শাল, সেগুন প্রভৃতি কাঠ পাওয়া যায়। এখানে বিশাখাপতনমে ভারতের বিখ্যাত জাহাজ-নির্মাণশিল্প অবস্থিত। কটক, পুরী প্রভৃতি এখানকার বিখ্যাত শহর।

৬। মরুভূমি অঞ্চল

রাজস্থানের পশ্চিমাংশে থর মরুভূমি অবস্থিত। মৌসুমী বায়ু যখন এখানে আসিয়া পৌঁছায় তখন ইহাতে জলকণা থাকে না বলিয়া এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না। এই মরু অঞ্চলে স্বভাবতঃই লোকবসতি অত্যন্ত বিরল। মরূদ্যান অঞ্চলে জোয়ার ও বাজরা উৎপন্ন হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন কোন স্থানে কৃষিকার্য হইতেছে। বিকানীর এখানকার উল্লেখযোগ্য শহর।

ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ

ভারত

- উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল
  - পূর্ব হিমালয়
  - পশ্চিম হিমালয়
  - উঃ পূঃ পার্বত্য অঞ্চল
- গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমতলভূমি
  - পাঞ্জাবের সমভূমি
  - উঃ গঙ্গার সমভূমি
  - মধ্যগঙ্গার সমভূমি
  - নিম্নগঙ্গার সমভূমি
  - ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা
- দাক্ষিণাত্যের মালভূমি
  - মধ্যভারতের মালভূমি
  - উত্তর-পূর্ব মালভূমি
  - দাক্ষিণাত্য অঞ্চল
  - কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল
- উপকূলভূমি
  - গুজরাট উপকূল
  - কঙ্কণ উপকূল
  - মালাবার উপকূল
  - করমণ্ডল উপকূল
  - নর্দার্ণ-সারকাস উপকূল
- মরু অঞ্চল

জলবায়ু (Climate)

জলবায়ু বলিতে সাধারণতঃ কোন একস্থানের বায়ুপ্রবাহের তাপ ও বেগ, বৃষ্টিপাত, সূর্যকিরণের প্রখরতা প্রভৃতির গড় অবস্থাকে বুঝায়। ভারতের জলবায়ু সর্বত্র এক নহে। বিশাল আয়তনের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়। কর্কটক্রান্তি ভারতকে সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। সুতরাং এই দেশের উত্তরাংশে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এবং দক্ষিণাংশে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ু থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বত প্রাচীরের মতো দাঁড়াইয়া থাকায় উত্তর হইতে শীতল বায়ু এই দেশে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার ফলে ভারতের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে অধিক তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। কর্কটক্রান্তি হইতে যতই উত্তরে যাওয়া যায় তাপমাত্রা ততই বাড়িতে থাকে ; এমনকি অত্যধিক তাপমাত্রার জন্য রাজস্থানে মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। উত্তরের শীতল বায়ু প্রবেশ করিতে না পারায় শীতকালে এই দেশে শীতের তীব্রতা পরিলক্ষিত হয় না। বিভিন্ন স্থানের উচ্চতাও স্থানীয় তাপমাত্রার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের দক্ষিণাংশ গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত হইলেও মালভূমি থাকায় এবং সমুদ্রসান্নিধ্য-হেতু এখানকার তাপমাত্রা অত্যধিক নহে। উপকূলভাগ সমতলভূমি বলিয়া অধিকতর তাপমাত্রা পাইয়া থাকে। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের প্রভাবেও কোন কোন অঞ্চলের তাপমাত্রা মৃদুভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

ভারত **মৌসুমী** অঞ্চলে অবস্থিত। 'মৌসুমী' শব্দের অর্থ ঋতু। মৌসুমী অঞ্চলের ঋতুসমূহ স্পষ্টভাবে বিভক্ত। এক ঋতুর সহিত অন্য ঋতুর পার্থক্য সহজেই অনুভব করা যায়। ভারতেও ঋতু অনুসারে জলবায়ুর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের উপর এখানকার বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা অনুসারে ভারতে প্রধানতঃ চারিটি ঋতু লক্ষ্য করা যায়—শীতকাল, গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল, শরৎ-হেমন্তকাল। বিভিন্ন ঋতুতে জলবায়ুর পার্থক্য পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করা যায়।

(ক) **শীতকাল** (ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত)—শীতকালে সূর্য মকরক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় বলিয়া উত্তর গোলার্ধের মধ্য এশিয়ায় উচ্চ-চাপবলয়ের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে তখন অত্যধিক উত্তাপের জন্য নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে মধ্য এশিয়া হইতে বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। উত্তর-পূর্বদিক হইতে

আসে বলিয়া এই বায়ুপ্রবাহের নাম **উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু**। হিমমণ্ডল হইতে নির্গত হওয়ায় এবং স্থলভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় এই বায়ু শুষ্ক ও শীতল। হিমালয় পর্বতের নিম্নাংশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় তুষারকণা হইতে অল্পপরিমাণে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে বলিয়া উত্তর ভারতের কোন কোন অংশে শীতকালে সামান্য **বৃষ্টিপাত** হইয়া থাকে।

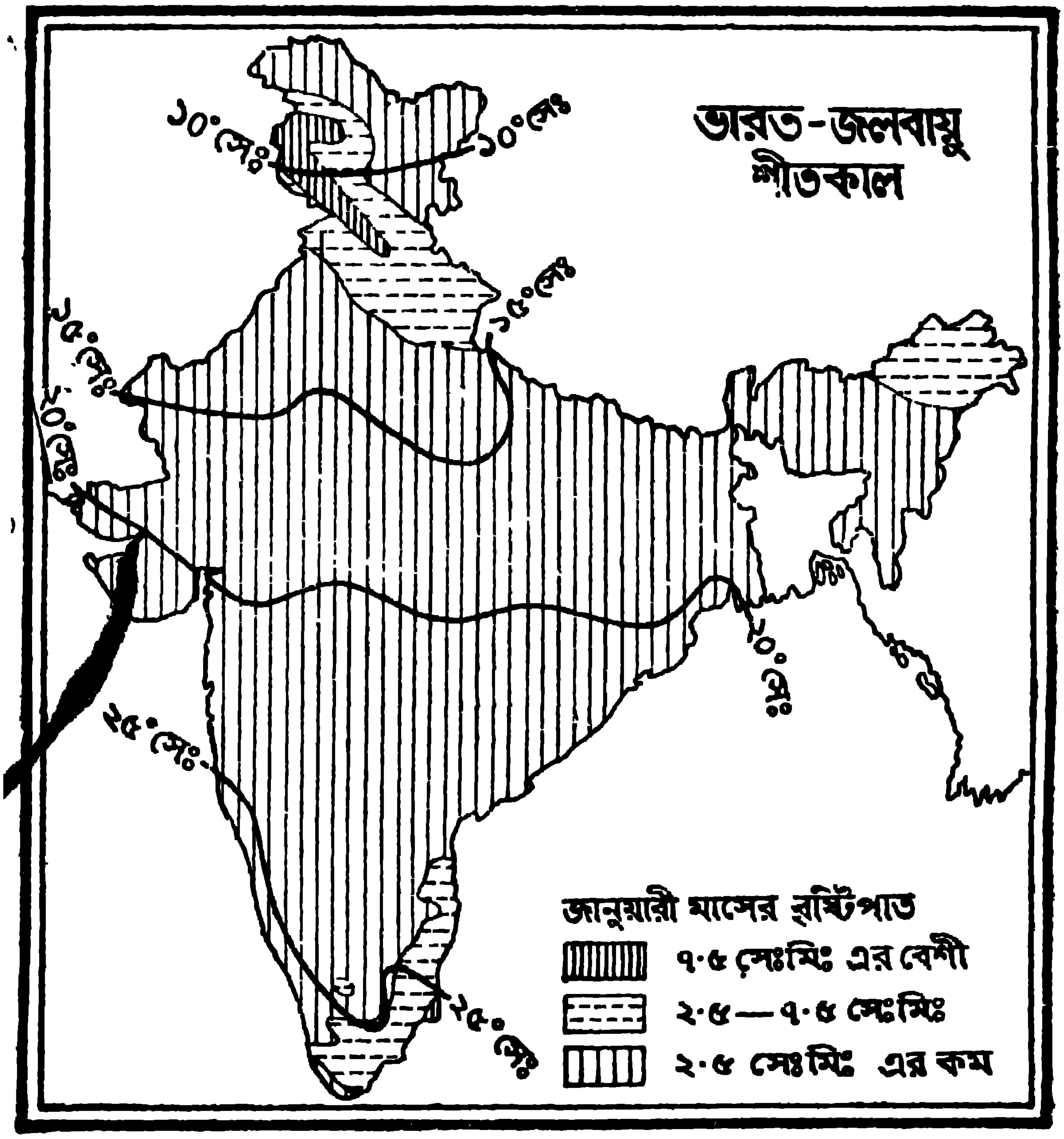

শীতকালে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে ছোট ছোট বায়ুতরঙ্গ ইরাণের মালভূমি অতিক্রম করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ার অঞ্চলে এবং ভারতের কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশে সামান্য ঘূর্ণিবৃষ্টির সৃষ্টি করে। এই বায়ুপ্রবাহ ক্রমশঃ পূর্বদিকে অগ্রসর হইলেও জলীয় বাষ্পের অভাবে পূর্ব ভারতে ইহার ফলে বিশেষ বৃষ্টিপাত হয় না। শীতকালে জানুয়ারী

মাসে পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশে ৭'৫-১২'৫ সেঃ মিঃ, উত্তর-পূর্বাংশে এবং মাদ্রাজ ও কেরেলার উপকূলে ২'৫ সেঃ মিঃ হইতে ৭'৫ সেঃ মিঃ এবং অন্যান্য স্থানে ২'৫ সেঃ মিঃ-এর চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালীন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হইলেও গম, যব প্রভৃতি রবিশস্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজন। শীতকালে **তাপমাত্রা** ১০° সেঃ হইতে ২৫° সেঃ পর্যন্ত হইয়া থাকে। উত্তরাংশে তাপমাত্রা সর্বাপেক্ষা কম। যতই দক্ষিণে যাওয়া যায়, ততই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

গ্রীষ্মকাল (মার্চ হইতে মে মাস পর্যন্ত)—মার্চ মাস হইতে সূর্য ক্রমশঃই মকরক্রান্তি হইতে কর্কটক্রান্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সুতরাং এইসময় ভারতের **তাপমাত্রা** ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময় গঙ্গানদীর উপত্যকায় গড়ে ২৭° সে তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়; যতই উত্তরে যাওয়া যায়, ক্রমশঃ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এইসময় ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের তাপমাত্রা ৪৯° সেঃ পর্যন্ত ওঠে। মে মাসে কলিকাতা শহরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৩° সেঃ পর্যন্ত উঠিলেও গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ২৭° সেঃ-এর বেশী হয় না। দাক্ষিণাত্যে এইসময় সূর্যের অধিকতর নিকটবর্তী হইলেও সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে উত্তর ভারত অপেক্ষা কম তাপমাত্রা উপভোগ করে। এইসময় উত্তর হইতে যতই দক্ষিণে যাওয়া যায় ততই তাপমাত্রা কমিতে থাকে। উত্তরাংশের অত্যধিক তাপমাত্রার দরুন নিম্ন-চাপবলয়ের সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন স্থান হইতে বায়ুপ্রবাহ ঐ দিকে ধাবিত হওয়ায় ঝড়ের সৃষ্টি হয়। কোন কোন বায়ুপ্রবাহে জলীয় বাষ্প থাকায় এই ঝড়ের সহিত সামান্য **বৃষ্টিপাত**ও হইয়া থাকে। এইসময় পশ্চিমবঙ্গে কালবৈশাখী (Norwesters) এবং আসামে 'ধান্যবর্ষণ' নামক ঝড়বৃষ্টি অপরাহ্নের দিকে আসে। আউস ধানের পক্ষে এই বৃষ্টি খুবই উপকারী। পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশেও এইসময় ঝড় হয়; কিন্তু ইহাতে জলীয় বাষ্প না থাকায় বৃষ্টিহীন ধূলিঝড় হইয়া থাকে; এই ধূলিঝড়কে 'আঁধি' বলা হয়। দাক্ষিণাত্যেও এইসময় ঝড়বৃষ্টি হয়; আম ও কফি চাষের পক্ষে ইহা খুবই উপকারী বলিয়া ইহাকে 'আমবর্ষণ' বা 'কফিবর্ষণ' বলা হয়। ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ১০ ভাগ বৃষ্টিপাত এই ঋতুতে হইয়া থাকে।

(গ) **বর্ষাকাল** (জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত)—গ্রীষ্মকালে সূর্য কর্কটক্রান্তির উপর অবস্থান করায় ভারতের উত্তরাংশের তাপমাত্রা

৩২'৫° সেঃ-এর উপরে উঠে। দক্ষিণে ক্রমশঃ তাপমাত্রা কমিতে কমিতে শেষপর্যন্ত ২৭'৫° সেঃ-এর নীচে নামিয়া যায়। ইহাতে উত্তরাংশে নিম্নচাপবলয়ের সৃষ্টি হয়। সেইজন্য ভারতের পশ্চিমে ও দক্ষিণে অবস্থিত আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর হইতে উত্থিত বায়ুরাশি উত্তর-পূর্বদিকে ধাবিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ হইতে আসে বলিয়া এই বায়ুপ্রবাহকে **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু** বলে। সমুদ্র হইতে আসে বলিয়া এই বায়ুপ্রবাহ জলীয় বাষ্পে পূর্ণ থাকে।

আরব সাগর হইতে আগত বায়ু প্রথমে পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় কঙ্কণ ও মালাবার উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫০ সেঃ মিঃ-এর অধিক। পশ্চিমঘাট পর্বত অতিক্রমকালে এই বায়ুপ্রবাহে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়া যায়। এইজন্য পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বদিকের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে (মহারাষ্ট্র রাজ্যের পূর্বাংশ, অন্ধ্র, মহীশূর ও মাদ্রাজের দক্ষিণাংশ) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ৫০ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ। আরব সাগর হইতে আগত বায়ুপ্রবাহের অপর একটি শাখা রাজস্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় আরাবল্লী পর্বতে বিশেষ কোন বাধা পায় না, কারণ এই পর্বত উত্তর-দক্ষিণে অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহের সমান্তরাল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এইজন্য রাজস্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নগণ্য। এই বায়ুপ্রবাহের অন্য একটি শাখা বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নর্মদা ও তাপ্তী নদীর উপত্যকায় বৃষ্টিপাত ঘটায়। আরব সাগরের এই বায়ুপ্রবাহ শেষপর্যন্ত মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরীয় মৌসুমী বায়ুর সহিত মিলিত হয়।

বঙ্গোপসাগর হইতে আগত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আসামে প্রচুর বৃষ্টিপাতের সঞ্চার করে। খাসিয়া পর্বতের নিকটস্থ চেরাপুঞ্জী অঞ্চলে বৎসরে ১,২৫০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। খাসিয়া পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে অবস্থিত শিলং ও গৌহাটির বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প। এই বায়ুপ্রবাহের একটি শাখা বঙ্গদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া হিমালয় পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বঙ্গদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে। আসাম ও বঙ্গদেশ হইতে আগত এই দুইটি বায়ুরাশি একসঙ্গে মিলিত হইয়া গঙ্গানদীর উপত্যকা ধরিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমশঃই এই বায়ুপ্রবাহে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমিতে থাকে এবং সেইজন্য পূর্ব হইতে পশ্চিমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ

ক্রমশঃ কমিতে থাকে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই বায়ুপ্রবাহ যখন রাজস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ইহাতে জলকণা মোটেই থাকে না। সেইজন্য রাজস্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নগণ্য।

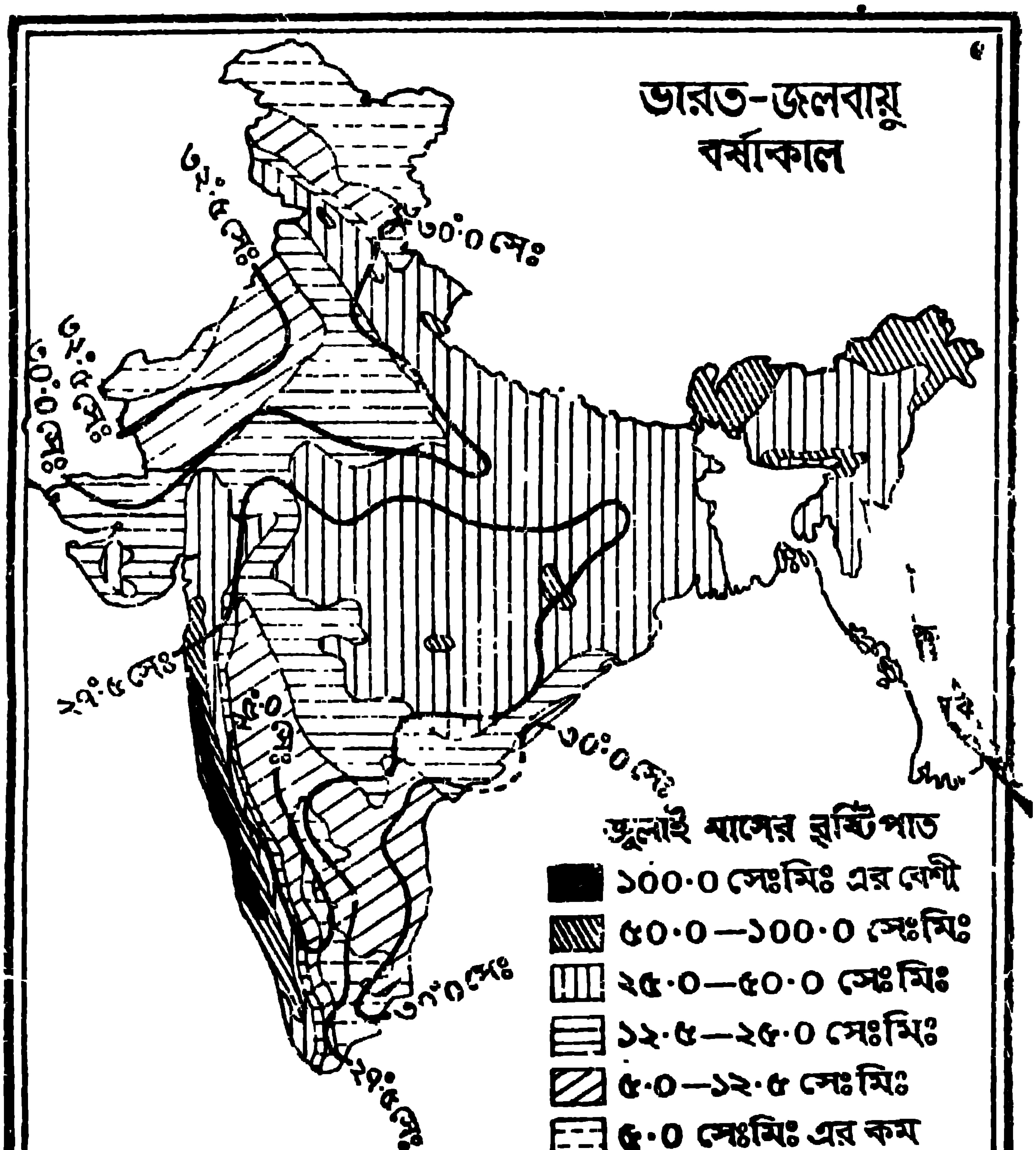

বর্ষাকালে জুলাই মাসে সর্বাপেক্ষা বেশী বৃষ্টিপাত হয়। এই মাসে উত্তর-পূর্ব আসামে ও পশ্চিম উপকূলে ১০০ সেঃ মিঃ-এর বেশী এবং পূর্ব কাশ্মীর, রাজস্থান ও মহীশূরের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে ৫ সেঃ মিঃ-এর কম বৃষ্টিপাত হয়। ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৭৫ ভাগ আসে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী

বৃষ্টিপাত হইতে। এই বৃষ্টিপাত ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই দেশের অধিকাংশ কৃষিকার্য দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সাহায্যে হইয়া থাকে। খারিফ শস্যের পক্ষে এই বৃষ্টিপাত বিশেষ কার্যকরী।

(ঘ) **শরৎ ও হেমন্তকাল** (অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত)—দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাইবার পর উত্তর ভারতে উচ্চ-চাপবলয়ের সৃষ্টি হয়; এইসময় সূর্যের মকরক্রান্তি অভিমুখে প্রত্যাগমন এই উচ্চ-চাপবলয় সৃষ্টির অন্যতম কারণ। সেইজন্য দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু পিছনের দিকে গতি ঘুরাইয়া লয়। এইসময় উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুও প্রসার লাভ করে। এই সকল বায়ুপ্রবাহ বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় ঘূর্ণিবাতের সৃষ্টি করে। পরে জলীয় বাষ্প-সমৃদ্ধ এই ঘূর্ণিবাত মাদ্রাজ ও কেরালায় প্রচুর বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে। অনেকসময় এই ঘূর্ণিবাত উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অঞ্চলেও বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে। পশ্চিমবঙ্গে ইহাকে 'আশ্বিনে ঝড' বলে। এই ঋতুতে উত্তর ভারতে বৃষ্টিপাত বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। এইসময়ে সমগ্র দেশে তাপমাত্রা ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ১৩ ভাগ এই ঋতুতে হইয়া থাকে।

ভারতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব (Effects of Indian Monsoons)

—ভারতের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১০৫ সেঃ মিঃ। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সকল বৎসরে সমান হয় না; কোন কোন বৎসরে ইহার পরিমাণ কমিয়া ৭৭ সেঃ মিঃ পর্যন্ত নামিয়া আসে এবং কোন কোন বৎসরে ইহা বাড়িয়া ১৩৫ সেঃ মিঃ পর্যন্ত উঠে। ইহা ছাড়া, ভারতের সর্বত্র সম-পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় না। ভূ-প্রকৃতির উপর এখানকার বৃষ্টিপাত বহুলাংশে নির্ভরশীল; কারণ পাহাড়-পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত না হইলে সাধারণতঃ বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি হয় না। অনেকসময় মৌসুমী বৃষ্টিপাত নির্দিষ্ট সময়ে আসে না। ইহার ফলে কৃষি-কার্যের অসুবিধা হয়। সময়মতো বৃষ্টিপাত না হওয়া, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা অনেক পরে বৃষ্টিপাতের অন্তর্ধান, এবং স্বাভাবিক গড় বৃষ্টিপাত হইতে কম বা বেশী বৃষ্টিপাত হওয়ার জন্য ভারতে অনেকসময় দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এক নহে।

ভারতের মৌসুমী বায়ুর অপরিসীম প্রভাব বিদ্যমান। জলবায়ু সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও ভারতের মতো

মৌসুমী বায়ুর এত সুদূর-প্রসারী প্রভাব অন্য কোথাও দেখা যায় বলিয়া মনে হয় না। ভারতের কৃষিকার্যের উন্নতির মূলে রহিয়াছে এখানকার মৌসুমী বায়ু; কৃষিকার্যের উন্নতি হওয়ায় প্রাচীনকাল হইতে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। অন্যদিকে মৌসুমী বায়ুর পরিমাণ বেশী হওয়ায় অথবা নির্দিষ্ট সময়মতো না আসায় দুর্ভিক্ষ ভারতের ইতিহাসের বহুপৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। ভারতের বনভূমি মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য আসাম ও হিমালয়ের পাদদেশে বিস্তীর্ণ বনভূমির সৃষ্টি হইয়াছে।

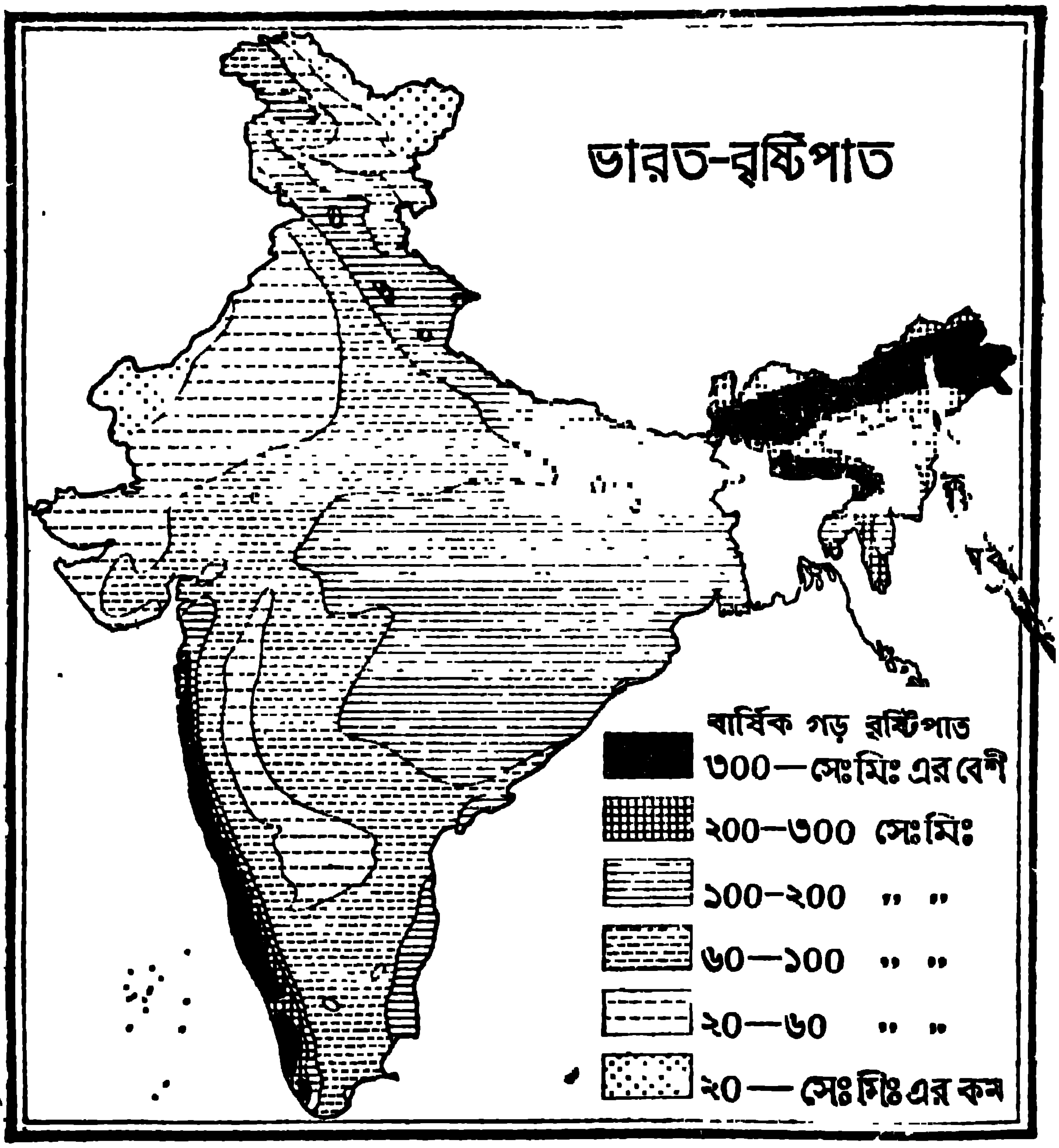

অন্যদিকে বৃষ্টিপাতের অভাবে রাজস্থানের কোন কোন স্থানে মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন স্থানে নানারকমের কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। উত্তরাংশের কম বৃষ্টিপাত-অঞ্চলের গম ও ইক্ষু, আসাম ও

পশ্চিমবঙ্গের অত্যধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলের ধান, পাট ও চা পশ্চিমাংশের মাঝারি বৃষ্টিপাত-অঞ্চলের তূলা ভারতের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। এইভাবে দেখা যাইবে যে, ভারতের কৃষিকার্য সম্পূর্ণভাবে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। কোন বৎসর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও বৃষ্টিপাতের আগমন-সময় জানিলেই বোঝা যায় যে, সেই বৎসর ভারতে কি পরিমাণ কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হইবে। ভারতের শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং মৌসুমী বৃষ্টিপাত এই সকল লোকের অদৃষ্ট লইয়া খেলা করিতে পারে। কৃষিপ্রধান এই দেশের বাৎসরিক সরকারী বাজেটও মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে; কারণ কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন ব্যাহত হইলে সরকারী আয়ও কমিয়া যায়। তূলা, ইক্ষু, পাট প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্যের উপর এখানকার কার্পাসবয়ন, চিনি ও পাটশিল্প নির্ভরশীল। সুতরাং এই সকল কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন ব্যাহত হইলে শিল্পের উন্নতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ফলে রপ্তানি-বাণিজ্যেরও ক্ষতি হয়। স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের উপর ভারতের কৃষকগণ এতটা নির্ভরশীল বলিয়া ইহারা অত্যন্ত অদৃষ্টবাদী ও ভগবানে বিশ্বাসী হইয়া থাকে। ইহাদের ধারণা মৌসুমী বৃষ্টিপাত ভগবানের সৃষ্টি। এমনকি, বহুস্থানে বৃষ্টির জন্য ভগবানকে পূজা করা হয়।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ

রাজ্য ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ

(ক) আসামের দক্ষিণাংশ, কঙ্কণ ও মালাবার উপকূল, নেফা—৩০০ সেঃ মিঃ-এর বেশী,

(খ) নাগাল্যাণ্ড, আসামের পূর্বাংশ, দার্জিলিং—২০০-৩০০ সেঃ মিঃ;

(গ) পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ, মাদ্রাজের পূর্ব উপকূল, অন্ধ্রের পূর্বাংশ—১০০-২০০ সেঃ মিঃ;

রাজ্য ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ

(ঘ) মাদ্রাজের দক্ষিণাংশ, অন্ধ্রের পশ্চিমাংশ, রাজস্থানের পূর্বাংশ, গুজরাটের পূর্বাংশ, পাঞ্জাবের পূর্বাংশ, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, মহারাষ্ট্র ৬০-১০০ সেঃ মিঃ;

(ঙ) মহীশূর, রাজস্থানের অধিকাংশ, পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ—২০-৬০ সেঃ মিঃ;

(চ) রাজস্থানের মরু-অঞ্চল—২০ সেঃ মিঃ-এর কম;

মৃত্তিকা (Soil)

কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য মৃত্তিকার উর্বরতা একান্ত প্রয়োজন। মৃত্তিকা হইতে গাছপালা খাদ্য সংগ্রহ করায় মৃত্তিকার খাদ্য-সরবরাহের ক্ষমতার উপর কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে। ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকার উর্বরতা কমিয়া যায়। সেইজন্য কৃত্রিম সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। শুষ্ক মৃত্তিকায় জলসেচের সাহায্যে কৃষিকার্য চালাইতে হয়। স্বাভাবিক উদ্ভিদ্-প্রাণ-সমন্বিত মৃত্তিকার চাষ-আবাদ করা অত্যন্ত কম ব্যয়সাধ্য। এই-জাতীয় মৃত্তিকার আধিক্যের উপর দেশের কৃষিকার্যের উন্নতি নির্ভর করে।

মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ—ভারতের মতো বিশাল আয়তনের দেশে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা থাকা স্বাভাবিক। এখানকার মৃত্তিকা কোনস্থানে উর্বর, আবার কোন কোন স্থানে অনুর্বর। ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগের উপর ভিত্তি করিয়া মৃত্তিকাকে সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায় :—

(ক) পার্বত্য অঞ্চলের মৃত্তিকা—হিমালয় অঞ্চলে এইপ্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়; ইহা অত্যন্ত অনুর্বর। উচ্চ হিমালয় হইতে হিমবাহ দ্বারা আনীত কাঁকর-মিশ্রিত মাটি এখানে দেখা যায়। ইহার নীচে যেখানে হিমবাহ শেষ হইয়া আসে, সেখানে প্রস্তর-মিশ্রিত কাদামাটি পাওয়া যায়। ইহার নীচে অনুর্বর **'পডসল'**-জাতীয় (Podzols) মৃত্তিকা দেখা যায়। এই মৃত্তিকায় কিছু পরিমাণে লৌহ-চূর্ণ পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকা আলু চাষের পক্ষে উপযোগী। এই অঞ্চলের কোন কোন স্থানে নদী-উপত্যকায় পলিবহুল মৃত্তিকা দেখা যায়; ইহা চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা সাধারণতঃ অনুর্বর হইলেও দার্জিলিং ও আসামের মৃত্তিকা চাষের বিশেষ উপযোগী। অবশ্য এইসব জমিতে প্রচুর সার দেওয়া হয়। কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে এইপ্রকার মৃত্তিকায় আপেল, নেসপাতি প্রভৃতি জন্মে।

(খ) গাঙ্গেয় সমভূমির মৃত্তিকা—উত্তর ভারতের নদীবহুল স্থানে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। গঙ্গা ও তাহার শাখানদী, সিন্ধুর শাখানদী এবং এই অঞ্চলের অসংখ্য উপনদী প্রচুর পলিমাটি বহন করিয়া আনে। এই পলিগঠিত মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর এবং চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী। এইপ্রকার মৃত্তিকা সাধারণতঃ দুই প্রকার—প্রাচীন পলিমাটি বা ভাঙ্গর (Old Alluvium) এবং নূতন পলিমাটি বা খদ্দর (New Alluvium)। দুই নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকায় প্রাচীন পলিমাটি দেখা যায়; ইহা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ও প্রাচীন।

উত্তর বিহার, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের মৃত্তিকা সাধারণতঃ এই প্রকার। এখানে আলু, গম, ভুট্টা প্রভৃতির চাষ হয়। নূতন পলিমাটিতে গম, ধান, তুলা ও ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণাংশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে এইপ্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত উর্বর এবং কৃষির উপযোগী। . নদীর ব-দ্বীপে এইপ্রকার মৃত্তিকায় ধান, সুপারি, নারিকেল ও পাট খুব ভালো জন্মে। এই মৃত্তিকা তিন প্রকার :—

(১) বালুকা-প্রধান নূতন পলিমাটিকে **বেলেমাটি** (Sandy soil) বলে। গঙ্গা ও সিন্ধুনদের গোড়ার দিকের উপত্যকায় ইহা দেখা যায়; ইহা জলধারণের অনুপযোগী। সেইজন্য যে সকল শস্যে প্রচুর জল দরকার হয়, তাহা এইপ্রকার মৃত্তিকায় জন্মে না; এইজন্য এখানে আলুর চাষ হয়। (২) যে সকল নূতন পলিমাটিতে কর্দমের প্রাধান্য দেখা যায় তাহাকে **এঁটেল মাটি** (Clayey soil) বলে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে এইপ্রকার মৃত্তিকা বিদ্যমান। ইহা অত্যন্ত উর্বর বলিয়া এখানে পাট, ধান, ইক্ষু, গম ইত্যাদি শস্য উৎপন্ন হয়। (৩) নূতন পলিমাটির এক অংশ কর্দম, বালুকা ও পলির সংমিশ্রণে গঠিত হয়। ইহাকে **দো-আঁশ মাটি** (Loamy soil) বলে। ইহার জলধারণের ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী বলিয়া খুবই উর্বর। সেইজন্য এখানে গম, যব, ইক্ষু, তুলা ইত্যাদি শস্য উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশে ও বিহারে এইপ্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়।

(গ) দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মৃত্তিকা—দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। বর্ণ ও অন্যান্য গুণাগুণ অনুসারে এই অঞ্চলের মৃত্তিকাকে সাধারণতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায় :—

(১) **কৃষ্ণমৃত্তিকা** (Black soil) গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ও মধ্যপ্রদেশে বিদ্যমান। ইহা লাভাযুক্ত বলিয়া ইহার রং কালো। পটাশ, লবণ ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান থাকায় ইহা খুবই উর্বর। গম ও তুলা ইহার প্রধান শস্য। তুলা-চাষের সঙ্গে ইহা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলিয়া অনেকে ইহাকে 'কৃষ্ণ-তুলা-মৃত্তিকা' (Black Cotton soil) বলে। (২) **লাল দো-আঁশ মৃত্তিকা** (Red loams) দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি ও আনামালাই পর্বতের নিকটবর্তী স্থানে দেখা যায়। জলধারণের ক্ষমতা কম বলিয়া ইহা অনুর্বর। এখানে জলসেচ দ্বারা ইক্ষু, তুলা ও তামাক উৎপন্ন হয়। (৩) **কঙ্করময় মৃত্তিকা** (Laterite soil) অম্লজান-জারিত লৌহের

সংমিশ্রণে অত্যন্ত লাল হয়। অন্ধ্র, কেরালা, মাদ্রাজ ও মহীশূরে ইহা দেখা যায়। ছিদ্রযুক্ত বলিয়া ইহা জলধারণের অনুপযোগী এবং অনুর্বর। এখানে কৃষিকার্য সাফল্য লাভ করে না। এইপ্রকার মৃত্তিকা রাস্তা-নির্মাণের পক্ষে উপযোগী। ছোটনাগপুর অঞ্চলেও ইহা দেখা যায়। (গ) **দাক্ষিণাত্যের পলিমাটি** (Alluvial soil) মহানদী, কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর উপত্যকায় দেখা যায়। বালুকা অথবা কর্দমযুক্ত অবস্থায় এইপ্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায়। এখানে তৈলবীজ, ইক্ষু ও ধান উৎপন্ন হয়।

(ঘ) তটভাগের পলিমাটি (Coastal Alluvium)—সমুদ্রতীরের মৃত্তিকা সাধারণতঃ বালুকা এবং লবণযুক্ত থাকে। এইপ্রকার মৃত্তিকায় নারিকেল ও সুপারি ভালো জন্মে।

ভারতে এই কয়েক প্রকার মৃত্তিকা ছাড়া রাজস্থানে মরুদেশীয় বালুকাময় মৃত্তিকা দেখা যায়। এখানে কাঁটাগাছ ভালো জন্মে।

ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকা-সংরক্ষণ (Soil-erosion & Conservation of soil)—ভূ-ত্বকের উপরের স্তর কৃষিকার্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই স্তর সাধারণতঃ উর্বর। বিভিন্ন কারণে ভূমির উপরিভাগের এই উর্বর অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, জলস্রোত ইত্যাদি দ্বারা এই ক্ষয়সাধন হইয়া থাকে। ভূমিক্ষয়ের ফলে জমি অনুর্বর হয়; সুতরাং ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমিতে কৃষিকার্য করা সম্ভব হয় না। উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্বত-সংলগ্ন অঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যে ভূমিক্ষয় ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে। উত্তর বিহার ও উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন অঞ্চলে সম-পরিমাণ ক্ষয় (Sheet erosion), বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের বহু অঞ্চলে প্রণালী ক্ষয় (Gully erosion) এবং পাঞ্জাব ও রাজস্থানে বায়ুতাড়িত ভূমিক্ষয়ের (Wind erosion) আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ভূমিক্ষয় ভারতে একটি বিরাট সমস্যা। ইহার ফলে প্রায় ৮০ লক্ষ হেক্টর জমি কৃষিকার্যের অনুপযোগী হইয়াছে এবং ৪ কোটি হেক্টর জমি কৃষির জন্য পুনঃসংস্কার করিতে হইয়াছে। ভূমিক্ষয়ের বিভিন্ন **কারণ** ও ভূমি-সংরক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল:

(ক) **বনোৎপাটন** ভূমিক্ষয়ের একটি প্রধান কারণ। গাছপালা থাকিবার ফলে বৃষ্টির ফোঁটা ডাল ও পাতায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সজোরে মাটিতে পড়িতে পারে না। ইহার ফলে বৃষ্টিপাতের জল মৃত্তিকার উপরিভাগকে বাইরে লইয়া যাইতে পারেনা। গাছের তলায় যে আগাছার সৃষ্টি হয়,

তাহাও বৃষ্টিপাতের জলের গতিতে বাধা সৃষ্টি করে ; ফলে ভূমিক্ষয় রোধ হয়। ইহা ছাড়া, গাছপালার শিকড় ও বনভূমির ঘাস মাটি আঁকড়াইয়া থাকে বলিয়া সহজে ভূমিক্ষয় হইতে পারে না। এজন্য বনভূমির সংরক্ষণ করিয়া, ঘাস-উৎপাটন নিয়ন্ত্রিত করিয়া এবং নূতন বনভূমির সৃষ্টি করিয়া ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। ভারতে ১৮৭৮ সালে বনভূমি আইন (Forest Act) বিধিবদ্ধ করিয়া বনভূমি-সংরক্ষণের প্রথম বন্দোবস্ত করা হয়।

(খ) **পশুচারণ** ভূমিক্ষয়ের অন্যতম কারণ। বিভিন্ন পশু মাঠের ঘাস তুলিয়া খাইলে মাটি আলগা হইয়া যায় এবং বৃষ্টির জলে এই মাটি ধুইয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। পশুচারণের জমি নির্দিষ্ট করিয়া এবং পশুচারণ-ক্ষেত্র হইতে পশুর মল সরাইয়া লওয়া বন্ধ করিয়া মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ কিয়দংশে বন্ধ করা যায়।

(গ) **ঝুম-চাষের** ফলে ভূমিক্ষয় সাধিত হয়। আসাম, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয়গণ বনভূমির কতকাংশ পরিষ্কার করিয়া স্থানীয় কাঠের সাহায্যে প্রথমে জমিকে অগ্নিদগ্ধ করে এবং পরে এই জমিতে চাষ করে। বনভূমি পরিষ্কার করিবার ফলে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এই জমিতে দুই-এক বৎসর চাষ করিয়া ঝুমিয়ারা অন্যত্র চলিয়া যায়। উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা এইপ্রকার কৃষি-পদ্ধতি বন্ধ করিয়া ভূমিক্ষয় রোধ করা প্রয়োজন।

(ঘ) **অবৈজ্ঞানিক চাষের** জন্যও ভূমিক্ষয় হইয়া থাকে। চাষ করিবার সময় কৃষিক্ষেত্রে নালা কাটিয়া দেওয়ায় এই নালার সাহায্যে মৃত্তিকার উপরিভাগ অন্যত্র চলিয়া যায়। চাষ করিয়া জমি ফেলিয়া রাখিলেও বৃষ্টির জলে ভূমিক্ষয় হইতে পারে। পাহাড়ের গায়ে বা ঢালু জমিতে যেদিকে জমি ঢালু, সেইদিকে লাঙ্গল চালাইলে বৃষ্টির জল সহজেই জমি হইতে মৃত্তিকা বাহিরে লইয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় ঢালু জমির সমকোণে লাঙ্গল চালাইলে (Contour Farming) এইপ্রকার ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। জমির কিনারায় আইল দিয়াও কৃষি-জমির ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়।

(ঙ) **বাতাসের** প্রকোপেও ভূমিক্ষয় হইয়া থাকে। বায়ুতাড়িত ভূমিক্ষয় বন্ধ করিতে হইলে যেদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেইদিকে বনের সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

(চ) জমির উপরের অংশ কাটিয়া **রাস্তা নির্মাণ** করিলেও ভূমিক্ষয় হয়। রাস্তা নির্মাণের জন্য অন্য ব্যবস্থা করিয়া মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ করা যায়। ইহা

ছাড়া, বাঁধের সাহায্যে বন্যা নিবারণ করিয়া, শস্যানুবর্তন করিয়া এবং উদ্ভিদের দ্বারা ভূমি ঢাকিয়া রাখিয়াও ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়।

ভারত সরকার স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। **প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার** কার্যকালে ১৯৫৩ সালে একটি 'কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষণ সংস্থা' (Central Soil Conservation Board) গঠিত হইয়াছে। প্রতিটি রাজ্যেও অনুরূপ একটি করিয়া সংস্থা গঠিত হইয়াছে। ভূমিক্ষয়-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ, গবেষণা ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা এই সংস্থার প্রধান কাজ। দেরাদুন, কোটা, হাজারিবাগ, বেলারী ও উতকামন্দে পাঁচটি মৃত্তিকা সংরক্ষণের গবেষণাকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। রাজস্থানের মরু-মৃত্তিকার ভূমিক্ষয়, মরু অঞ্চলে অরণ্য-রচনা প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ১৯৫২ সালে UNESCO-র সাহায্যে যোধপুরে একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে মৃত্তিকা-সংরক্ষণ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন এবং অভিজ্ঞ লোকের শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত হইতেছে। প্রথম পরিকল্পনায় বাঁধ ও খাল নির্মাণ, প্রণালী-পূরণ, ধাপ-সৃজন প্রভৃতির সাহায্যে ১·৬ কোটি টাকা ব্যয়ে মাদ্রাজ ও মহারাষ্ট্রে প্রায় ২·৮ লক্ষ হেক্টর পরিমিত জমিতে ভূমিক্ষয়-রোধের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ১২ লক্ষ হেক্টর জমিতে ভূমিক্ষয়রোধের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় পশ্চিম মধ্যভারতে বালিয়াড়ি অপসারণ করিয়া, পূর্ব ভারতের নদী-উপত্যকায় নূতন অরণ্য রচনা করিয়া, দাবাগ্নি রোধ ও সমোন্নত বাঁধ প্রস্তুত করিয়া, কেরালায় প্রাচীরের সাহায্যে সামুদ্রিক বন্যার হাত হইতে ভূমিকে রক্ষা করিয়া মৃত্তিকার ক্ষয়রোধের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬১-৬৬) মৃত্তিকা-সংরক্ষণ ব্যবস্থাদির জন্য ৭২ কোটি টাকা খরচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কৃষি-জমির চতুর্দিকে বাঁধ দিয়া ও শুষ্ক চাষের সাহায্যে প্রায় ১·৩ কোটি হেক্টর জমিতে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। এই পরিকল্পনায় দামোদর, হীরাকুদ, ভাকরা-নাঙ্গাল প্রভৃতি বহুমুখী পরিকল্পনার অন্তর্গত জলাধারসমূহের নিকটস্থ ৪০ লক্ষ হেক্টর পরিমিত স্থানের ভূমি-সংরক্ষণের জন্য ১১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৬,০০০ হেক্টর কৃষিযোগ্য জমির নদীগর্ভে যাওয়া রোধের জন্য,

৪০,০০০ হেক্টর পরিমিত মরুভূমিতে এবং ২'৮ লক্ষ হেক্টর পরিমিত পার্বত্য জমিতে ভূমি-সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের ভূমিক্ষয় রোধ করিবার জন্য গবেষণা ও শিক্ষার বন্দোবস্ত এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ভূমিক্ষয়রোধের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন ৯টি রাজ্যে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং আরও ৫টি রাজ্যে এইজাতীয় আইন প্রণয়নের বন্দোবস্ত হইতেছে।

বনভূমি ও বনজ সম্পদ
(Forest and Forest Products)

অরণ্য-সম্পদে ভারত সমৃদ্ধ। এই দেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ২১'৮ ভাগ বনভূমি। জলবায়ু ও মৃত্তিকা অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ পরিলক্ষিত হয়। ভারতের বনভূমির মোট আয়তন প্রায় ৫.২ কোটি হেক্টর। এই দেশে প্রায় ৫,০০০ রকমের গাছপালা থাকিলেও, ইহার অর্ধেক লতা ও গুল্ম এবং বাকী অর্ধেক হইতে কাঠ প্রস্তুত করা যায়। বনভূমি-সংরক্ষণের ভিত্তিতে ভারতের বনভূমিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, **খাস বনে** (Reserve Forest) সরকারী বনরক্ষকের অনুমতি ব্যতীত কেহ কাঠ কাটিতে বা পশুচারণ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, **রক্ষিত বনে** (Protected Forest) স্থানীয় লোকের পশুচারণ, জ্বালানি কাঠ ও পশুখাদ্য সংগ্রহ করিবার অধিকার থাকে। বনরক্ষক এই সকল বনের তদারক করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, **অশ্রেণীভুক্ত বনে** (Unclassified Forest) বনজ সম্পদ সংগ্রহের কোন বাধা-নিষেধ নাই এবং ইহার তত্ত্বাবধানেরও কোন বন্দোবস্ত নাই; সরকার এই সকল বনভূমির মালিক। ইহা ছাড়া, বে-সরকারী মালিকানায় বা তত্ত্বাবধানেও ভারতে বহু বনভূমি রহিয়াছে; কিন্তু বর্তমানে ভারতের অধিকাংশ বনভূমি সরকারী মালিকানার অধীন।

বনভূমির বণ্টন (Distribution of Forests)—অরণ্য সম্পদে ভারতের সকল স্থান সমানভাবে সমৃদ্ধ নহে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় বনভূমির আয়তন অপেক্ষাকৃত কম হইলেও, এই দেশের রাজস্থানের মরুভূমি হইতে আসামের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ

পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় সকল স্থানেই কম-বেশী বনভূমি বিদ্যমান। এই দেশের অধিকাংশ বনভূমি ক্রান্তীয় শ্রেণীভুক্ত। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, উত্তাপ ও উচ্চতার উপর বনভূমির বিস্তার নির্ভরশীল। মোটামুটি ২০০ সেঃ মিঃ-এর অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি, ১০০-২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে মৌসুমী পর্ণমোচী অঞ্চলের বনভূমি, ৫০-১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে লতা-গুল্ম ও তৃণভূমি এবং ৫০ সেঃ মিঃ-এর কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে মরু অঞ্চলের গাছপালা দেখা যায়। পার্বত্য অঞ্চলে উচ্চতা অনুসারে কোথাও সরলবর্গীয় বৃক্ষ, কোথাও পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে। এইজন্য হিমালয় ও আসামের পার্বত্য অঞ্চলে এইজাতীয় বৃক্ষাদি দেখা যায়। জলবায়ু ও মৃত্তিকা অনুসারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বনভূমিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়:

(ক) **চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি**—অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূল, পূর্ব হিমালয় ও আসামে এইজাতীয় বনভূমি বিদ্যমান।

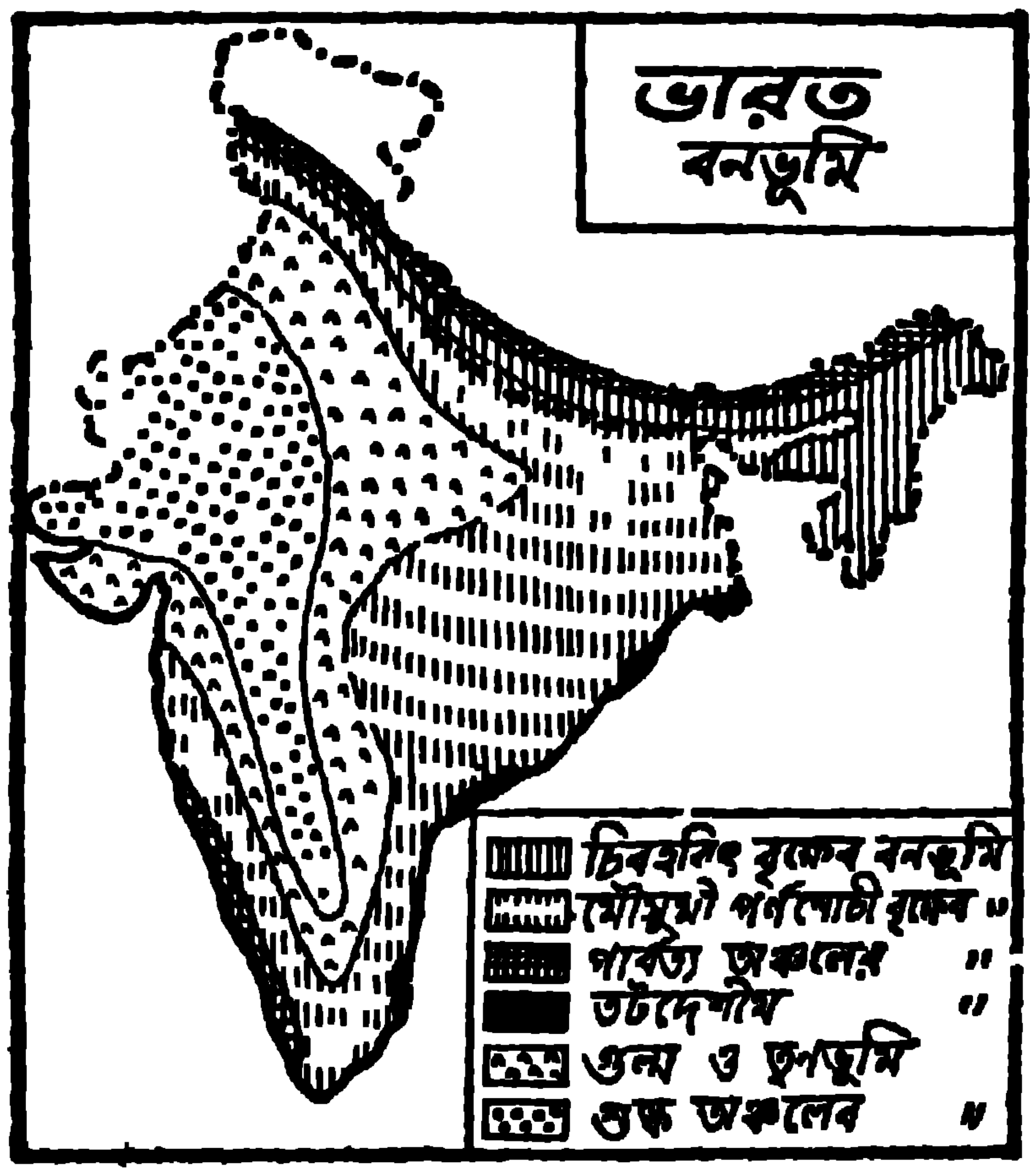

মোটামুটি ২০০ সেঃ মিঃ-এর বেশী বৃষ্টিপাত ও ২৭° সেঃ উত্তাপ এই বনভূমি-সৃষ্টির সহায়ক। যানবাহনের অসুবিধা, নিবিড় জঙ্গল এবং একই স্থানে এক ধরনের বৃক্ষাদির অভাবে এই অঞ্চলের বনভূমির বনজ সম্পদ মানুষের প্রয়োজনে বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। এখানকার বৃক্ষাদির মধ্যে চাপলাশ, চিকরাশি, গোলাপ, শিশু, গর্জন, তেলসুর, নাহার, পুন, তুন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, বাঁশ, জাম, শিশু এবং রবার গাছও এখানে জন্মে।

(খ) **মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি**—মাঝারি বৃষ্টিপাত (১০০-২০০ সেঃ মিঃ) অঞ্চলে এইজাতীয় বনভূমির সৃষ্টি হয়। হিমালয়ের নিম্নদেশে এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে এইজাতীয় বনভূমি বিদ্যমান। কোন কোন

অঞ্চলে এই সকল বনভূমি পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্যের আওতায় আনা হইয়াছে। এখানকার মূল্যবান্ বৃক্ষসমূহের মধ্যে শাল, সেগুন, অর্জুন, জারুল, বহেড়া, গামারি, তুঁত, আবলুস্, খয়ের, শিরিষ, শিমুল, হরীতকী, মহুয়া, পলাশ, কুসুম, অঞ্জন, বাঁশ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(গ) **পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমি**—বৃষ্টিপাত ও উচ্চতা অনুসারে এই বনভূমি বিভিন্ন আকার ধারণ করে। হিমালয়ের পাদদেশে বাঁশ, শাল ও সেগুন গাছ জন্মে। পূর্ব হিমালয় ও আসাম অঞ্চলে ১,০০০ মিটার হইতে ৩,০০০ মিটার পর্যন্ত উঁচু পর্বতে ওক্, ম্যাপ্‌ল প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ এবং ৩,০০০ মিটারের অধিক উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমাংশে পাইন, স্প্রুস্, ফার, সীডার, দেবদারু প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে।

(ঘ) **তটদেশীয় বনভূমি**—নদীর ব-দ্বীপ ও সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে লোনাজল প্রবাহিত হওয়ায় জলাভূমির অরণ্য (Mangrove) পরিলক্ষিত হয়। তাল ও নারিকেল এবং সুন্দরী ও পুসুর গাছ এখানে প্রচুর জন্মে। নৌকা ও গৃহাদি নির্মাণে এবং জ্বালানি হিসাবে এখানকার গাছের কাঠ ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) **গুল্ম ও তৃণভূমি**—অল্প বৃষ্টিপাত (৫০-১০০ সেঃ মিঃ) এবং চরম জলবায়ুতে গুল্ম ও তৃণভূমির সৃষ্টি হয়। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে গুল্ম লতা এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মালভূমিতে, পার্বত্য অরণ্যের মধ্যভাগে ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোন কোন অঞ্চলে 'সাভানা' তৃণভূমি দেখা যায় এই সকল তৃণভূমিতে সাবাই ঘাস জন্মে, ইহা কাগজশিল্পে ও দড়ি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

(চ) **শুষ্ক অঞ্চলের বনভূমি**—পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যের ৫০ সেঃ মিঃ-এর কম বৃষ্টিপাতযুক্ত শুষ্ক অঞ্চলে কাঁটা ও শাঁসালো ডাঁটাযুক্ত গাছ দেখা যায়। এই অঞ্চলের বাবুল, ফণীমনসা, তেশিরা প্রভৃতি গাছ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এইজাতীয় বৃক্ষ হইতে গঁদ প্রস্তুত হয়, ইহাদের বাকল রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

ভারতের প্রায় সকল রাজ্যেই কমবেশী বনভূমি বিদ্যমান। ইহার মধ্যে মধ্যপ্রদেশে বনভূমির আয়তন সর্বাপেক্ষা বেশী।

বনভূমির মোট আয়তন—৫১২ লক্ষ হেক্টর

(লক্ষ হেক্টর)

মধ্যপ্রদেশ	১৩৪	উড়িষ্যা	৪১	মাদ্রাজ	১৯
আসাম	৬৩	বিহার	৩৫	রাজস্থান	১৩
মহারাষ্ট্র	৬২	উত্তরপ্রদেশ	৩৪	কেরালা	১০
অন্ধ্র	৪৯	মহীশূর	২৬	পশ্চিমবঙ্গ	৮

বনভূমির ব্যবহার (Utilisation of Forests)—বনভূমির বিভিন্ন সম্পদ আহরণ করিয়া ভারতে প্রায় ১০ লক্ষ লোক জীবিকা নির্বাহ করে। ইহাদের মধ্যে কাঠ চেরাই করার মিস্ত্রী, গাড়োয়ান প্রভৃতি প্রধান। ভারতের বনভূমি জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন; কারণ ইহা বৃষ্টিপাতের সহায়ক। গাছপালাসমূহ শিকড় দ্বারা জমির মাটি আঁকড়াইয়া বনভূমির ভূমিক্ষয় রোধ করে। ভারতের বনভূমি হইতে আহৃত সম্পদকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—কাষ্ঠসম্পদ ও উপজাত দ্রব্য।

(ক) **কাষ্ঠসম্পদ**—বনভূমি হইতে যে সকল বৃক্ষাদি সংগ্রহ করা হয়, তাহা চেরাই-কাঠ হিসাবে বিভিন্ন কার্যে এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

চেরাই-কাঠের ব্যবহার (হাজার মেঃ টন)

রেলওয়ের পাটাতন	৩৪০	দিয়াশলাই	১২০
রেলগাড়ীর কামরা	৮০	প্যাকিং বাক্স	৫
সামরিক কার্য, জাহাজ ও বিমানপোত নির্মাণ এবং অন্যান্য সরকারী কার্য	১৬০	প্লাইউড	৬৫
		চায়ের বাক্স	৪০
		আসবাবপত্র ও গৃহাদি নির্মাণ	৮৬০
		অন্যান্য	৪০
শিল্প	৩৩৫	মোট	২,১১০

খেলাধুলার সামগ্রী-প্রস্তুতে, ভদ্রাবতী ইস্পাত-কারখানায় ইস্পাত গলাইতে, বিদ্যুৎ-পরিবহণের তার খাটাইতেও কাঠ ব্যবহৃত হয়। ভারতে চেরাই-কাঠ প্রস্তুত হয় সাধারণতঃ সেগুন, শাল, চিকরাশ, তুন, বার্চ, শিরিষ, আবলুস্, গামারি, পুন, জারুল, চাপলাশ, বহেড়া, শিমুল, পাইন, স্প্রুস্, ফার, দেবদারু, পুস্কর, সুন্দরী, প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে। চেরাই-কাট ছাড়া বনভূমি হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ৫৭ লক্ষ মেঃ টন জ্বালানি কাঠ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে বনভূমি হইতে

কাষ্ঠসংগ্রহে বাধা-বিঘ্ন দেখা যায়। ভারতের বনভূমির অধিকাংশ স্থান দুর্গম। কাষ্ঠ আহরণ করিবার উপযোগী যানবাহনের অভাবে বনভূমি হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। একজাতীয় বহু বৃক্ষ একই স্থানে পাওয়া যায় না বলিয়া একজাতীয় কাষ্ঠসংগ্রহ অনেক পরিশ্রম ও ব্যয়সাধ্য। কাগজ প্রস্তুতের উপযোগী মূল্যবান্ নরম কাষ্ঠ কোন কোন অঞ্চলে পাওয়া গেলেও ইহা সংগ্রহ করা কঠিন। রীতিমতো যত্নের অভাবে, দাবানল বা অন্যান্য কারণে বহু গাছ-পালা নষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃক্ষাদি কর্তন করা হয় না। অধিক মূল্য দিলেই যে-কোন গাছ কাটা যায়। ইহা বনভূমি-সংরক্ষণের সহায়ক নহে।

ভারতে সঞ্চিত কাষ্ঠসম্পদের **পরিমাণ** প্রায় ২৮৬ কোটি কিউবিক মিটার; ইহার মধ্যে ২২৮ কোটি কিউবিক মিটার শক্ত কাঠ এবং ৫৮ কোটি কিউবিক মিটার নরম সরলবর্গীয় বৃক্ষের কাঠ। বর্তমানে প্রতিবৎসর প্রায় ১৫ লক্ষ কিউবিক মিটার কাঠ বনভূমি হইতে সংগৃহীত হয়; ইহার মোট মূল্য প্রায় ২৪৫ কোটি টাকা। ভারতের জনপ্রতি চেরাই-কাঠের উৎপাদন মাত্র ·০৪ কিউবিক মিটার, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহার পরিমাণ ১·৭ কিউবিক মিটার। দেশের শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাঠের চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন উপায়ে কাষ্ঠ-সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বনভূমি অঞ্চলে পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া, কাষ্ঠ-সংগ্রহে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া, কাষ্ঠের নূতন নূতন ব্যবহার আবিষ্কার করিয়া বর্তমানে এই দেশে কাষ্ঠশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইতেছে।

(খ) **উপজাত দ্রব্য**—ভারতের বনভূমিতে বিভিন্ন ধরনের উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়; কিন্তু বনজ সম্পদ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া থাকে বলিয়া উপজাত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। পলাশ, পিপুল, কুসুম প্রভৃতি গাছের পাতা খাইয়া লাক্ষা-কীট বাঁচিয়া থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশে এইজাতীয় বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। এইজন্য এই তিনটি রাজ্যে ভারতের শতকরা ৯০ ভাগ **লাক্ষা** পাওয়া যায়। উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও আসামের বনভূমিতেও অল্পবিস্তর লাক্ষা পাওয়া যায়। লাক্ষা-উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। বার্নিশ, ছাপার কাজ, বিদ্যুৎ-রোধক পদার্থ নির্মাণ ও গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য অধিকাংশ লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ লাক্ষা বিদেশে রপ্তানি করিয়া প্রায় ২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। অধিকাংশ

লাক্ষা কলিকাতা বন্দর মারফত যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও জার্মানীতে রপ্তানি হইয়া থাকে। বর্তমানে থাইল্যাণ্ডের সুলভ লাক্ষার সঙ্গে ভারতকে প্রতিযোগিতা করিতে হয় বলিয়া লাক্ষার রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে।

চির্‌পাইন গাছ হইতে ধূনা (Resin) সংগ্রহ করা যায়। ইহা হইতে **তার্পিন** তৈলও পাওয়া যায়। হিমালয় ও আসামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রধানতঃ ধূনা পাওয়া যায়। কাচের সহিত মিশাইতে, কাগজশিল্পে, সাবান, ঔষধ ও বার্নিশ প্রস্তুতে ধূনা ব্যবহৃত হয়; মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে **হরীতকী** পাওয়া যায়। চামড়া পাকা করিতে এবং ঔষধ ও রঞ্জনদ্রব্য প্রস্তুতে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। আসামে এণ্ডি ও মুগা রেশম রং করিতেও হরীতকী ব্যবহৃত হয়। প্রচুর পরিমাণে হরীতকী ভারত হইতে বৃটেন, জার্মানী, বেলজিয়াম, চীন, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। নীলগিরি ও দার্জিলিং-এর বৃষ্টিবহুল উচ্চভূমিতে **সিঙ্কোনা** বৃক্ষের চাষ হয়; ইহার বা৷ ল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়। মালাবার উপকূলে ও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে প্রচুর **সুপারি** জন্মে। পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের **তাল** গাছ হইতে তাল স, গুড় প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। মরু অঞ্চলের **খেজুর** গাছ হইতে খেজুর পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে খেজুর গাছের রস হইতে গুড়, চিনি ও তাড়ি প্রস্তুত হয়। উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর **বাঁশ** জন্মে। বাঁশ হইতে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করা হয়। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন অঞ্চলের বনভূমি হইতে চন্দন, নানাবিধ তৈল ও ভেষজ দ্রব্য, বেত, খস, হোগলা, শোলা, মাদুর-কাঠি, মধু, সাবাই ঘাস প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়া থাকে। ভারতে বনজ সম্পদকে ঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য, ইহার অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য, শিল্পে ইহার প্রয়োগ-বৃদ্ধির জন্য দেরাদুনে ভারতীয় বনবিজ্ঞান গবেষণাগার (Forest Research Institute) বিভিন্ন গবেষণা-কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

বনভূমি সংরক্ষণ (Conservation of Forests)—বনজ সম্পদ প্রকৃতির দান। পরিকল্পিত উপায়ে ইহা ব্যবহৃত হইলে যুগ যুগ ধরিয়া এই সম্পদ মানুষ ভোগ করিতে পারে; কারণ বনভূমি প্রবহমান সম্পদ। ভারতে বৃষ্টিপাতের সমতা-রক্ষার জন্য, ভূমিক্ষয় রোধ করিবার জন্য, বন্যা-নিরোধের জন্য বনভূমির সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। বনভূমি হইতে বৃক্ষাদি কর্তন নিয়ন্ত্রণ করিয়া অপরিণত বৃক্ষাদি বাড়িতে দেওয়া দরকার। বনমহোৎসবের মাধ্যমে

প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষাদি রোপণ করিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমি কম থাকায় ভারতে প্রতিবৎসর বনমহোৎসবের বন্দোবস্ত হইয়াছে; ইহার ফলে বনভূমিহীন অঞ্চলে নূতন নূতন বৃক্ষাদি রোপণ করা হইতেছে। বৃক্ষাদি কাটিবার সময় যাহাতে অন্যান্য ছোটখাটো গাছ নষ্ট না হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃক্ষাদি কাটা প্রয়োজন।

ভারতে বর্তমানে মোট ভূমিভাগের শতকরা মাত্র ২১'৮ ভাগ বনভূমি। কিন্তু কমপক্ষে এই দেশের এক-তৃতীয়াংশ জমিতে বনভূমি থাকা একান্ত দরকার। ভারত সরকার বনভূমির সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফতে এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। **প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়** ৩০,০০০ হেক্টর জমিতে নূতন অরণ্য রচনা করা হইয়াছে, ৪,৮০০ কিলোমিটার রাস্তা বিভিন্ন অরণ্য অঞ্চলে নির্মাণ করা হইয়াছে, ৮০ লক্ষ হেক্টর পরিমিত বনভূমিকে বে-সরকারী পরিচালনা হইতে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হইয়াছে, দিয়াশলাই-শিল্পের উপযোগী কাষ্ঠের আবাদ প্রতিবৎসর ১,২০০ হেক্টর করিয়া বাড়াইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, বন্যজীব সংরক্ষণের জন্য ১৯৫২ সালে 'বন্যজীবের জন্য ভারতীয় সংস্থা' (Indian Board for Wild Life) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে; এই পরিকল্পনায় প্রায় ৯.৫ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১'৫ লক্ষ হেক্টর পরিমিত বনভূমির উন্নতিসাধন, নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চলে বনভূমির বিস্তার, ২০ হাজার হেক্টর পরিমিত জমিতে মূল্যবান্ শাল প্রভৃতি বৃক্ষরোপণ, ২০ হাজার হেক্টর জমিতে দিয়াশলাই-কাষ্ঠের এবং ৫,২০০ হেক্টর জমিতে কাগজ ও রেয়ন শিল্পের উপযোগী বৃক্ষের উৎপাদন, বনভূমি অঞ্চলে ৯,৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা-নির্মাণ, কাষ্ঠ-সংরক্ষণ ও সহনশীল-করণের কারখানা স্থাপন, বিভিন্ন স্থানে বনজ সম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা ও ইহার উন্নতিসাধন প্রভৃতি কার্যের জন্য ১৯'৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬১-৬৬) বনভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ৫১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় ৮৪,০০০ হেক্টর পরিমিত বনভূমিতে সেগুন গাছ, ১৬,০০০ হেক্টর পরিমিত স্থানে বাঁশ, ২৪,০০০ হেক্টর পরিমিত স্থানে দিয়াশলাই-কাষ্ঠের গাছ, ৮,৮০০ হেক্টর পরিমিত জমিতে ওয়াট্‌ল্ গাছ, ১২,৪০০ হেক্টর পরিমিত স্থানে জালানি কাষ্ঠের গাছ এবং

১,৩০,০০০ হেক্টর পরিমিত স্থানে অন্যান্য গাছপালা নূতন করিয়া সৃষ্টির ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে যাহাতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জালানি কাঠের বৃক্ষাদি রোপণ করা হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রেলপথ, বড় রাস্তা, খাল প্রভৃতির উভয় পার্শ্বে বৃক্ষাদি রোপণের ব্যবস্থা হইয়াছে। উন্নত ধরনের কাষ্ঠসংগ্রহের ও অরণ্য অঞ্চলে ২৪,১৫০ কিলোমিটার রাস্তা-নির্মাণের বন্দোবস্ত এই পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, কাষ্ঠ সহনশীল করিবার জন্য, বনভূমির পরিমাপের জন্য, বনজ সম্পদ-সম্পর্কীয় গবেষণার জন্য, কর্মীদের বনবিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য, বনভূমির শ্রমিকের অভাব-অভিযোগ মিটাইবার জন্য এই পরিকল্পনায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

জলসেচ (Irrigation)

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। সুতরাং কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা এই দেশে থাকা একান্ত প্রয়োজন। মৃত্তিকা উর্বর হইলেও জলের অভাবে কৃষিকার্যের উন্নতি হয় না। সময়মতো পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হইলেই জলসেচের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ভারতে বৃষ্টিপাতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, ভারতের সর্বত্র সম-পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় না ; কোথাও অত্যন্ত বেশী, কোথাও মাঝারি এবং কোথাও অত্যন্ত কম বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে (৩১৭ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। ইহার ফলে মাঝারি ও কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে জলসেচের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই দেশে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালে অধিকাংশ বৃষ্টিপাত হয় ; অন্যান্য ঋতুতে বৃষ্টিপাতের অভাবে জলাভাব দেখা যায় ; শীতকালে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বলিলেই হয়। ফলে রবিশস্য উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম জলসেচ-ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, ভারতে বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা দেখা যায় ; কোন কোন বৎসরে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয় বা অসময়ে বৃষ্টিপাত হয় এবং কোন কোন বৎসরে অত্যন্ত কম বৃষ্টিপাত হয়। প্রয়োজনের সময় পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হইলেই জলসেচের প্রয়োজন হয়। চতুর্থতঃ, জলসেচের মাধ্যমে পরিমিত জলের সাহায্যে চাষ-আবাদ করিলে শস্যের উৎপাদনের হার ও গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়। যেমন, পাঞ্জাবে জলসেচের সাহায্যে তুলা-চাষ হয় বলিয়া এই রাজ্যে হেক্টর-প্রতি তুলার উৎপাদন অনেক বেশী এবং এখানকার তুলা মোটামুটি

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। এই সকল কারণে ভারতে জলসেচ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা একান্ত প্রয়োজন।

ভারতে জলসেচ-ব্যবস্থার **ভৌগোলিক সুবিধা** বিদ্যমান থাকায় ইহার উন্নতিসাধন সহজসাধ্য। প্রথমতঃ, উত্তর ভারতের নদীসমূহ গলিত তুষার ও বৃষ্টিপাতের জলে পুষ্ট হওয়ায় প্রায় সারাবৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকে। এই সকল নদী হইতে সর্বদাই জলসেচনের জল পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের সমভূমি অঞ্চল সামান্য ঢালু হওয়ায় খাল খনন করা কম ব্যয়সাধ্য। তৃতীয়তঃ, ভূত্বক্ পলিগঠিত হওয়ায় বৃষ্টিপাতের জল সমভূমি অঞ্চলের পলিস্তর চুয়াইয়া অভ্যন্তরস্থ কর্দমাক্ত স্তরে জমিতে থাকে। ইহার ফলে কূপ খনন করিয়া সঞ্চিত জলরাশি জলসেচের জন্য ব্যবহার করা সহজসাধ্য। এই সকল কারণে কৃত্রিম জলসেচ-ব্যবস্থায় পৃথিবীতে ভারতের স্থান অদ্বিতীয়।

জলসেচ-পদ্ধতি (Irrigation Systems)—ভারতে বৃষ্টিপাত, ভূ-প্রকৃতি প্রভৃতির পার্থক্য হেতু বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধানতঃ তিনপ্রকার জলসেচ-পদ্ধতি দেখা যায়—কূপ, জলাশয় ও খাল।

(ক) কূপ (Wells)—নলকূপ ও সাধারণ কূপের সাহায্যে ভারতের বহুস্থানে বিশেষতঃ উত্তর ভারতে জলসেচ হইয়া থাকে। অন্যান্য সেচ-ব্যবস্থা অপেক্ষা কূপ-খনন অনেক কম ব্যয়সাধ্য। উত্তর ভারতের ভূত্বকের অভ্যন্তরস্থ কর্দমাক্ত স্তরে সঞ্চিত জলের পরিমাণ অনেক বেশী। ইহা ছাড়া, এখানকার ভূমি নরম এবং সহজে ধ্বসিয়া পড়ে না। ভূগর্ভের সামান্য নীচেই জল পাওয়া যায়। এইজন্য ভারতের মোট নলকূপের শতকরা ৯০ ভাগ উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। রাজস্থান, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রেও বহু নলকূপ আছে। জলবিদ্যুতের সাহায্যে নলকূপ হইতে জল তুলিয়া জলসেচের বন্দোবস্ত করা হয়। বহুস্থানে এখনও পুরাতন প্রথায় কূপ হইতে জল তোলা হয়; কপিকলের সাহায্যে, গো-বাহিত যন্ত্রে ও পারসিক চক্রে পুরাতন পদ্ধতিতে কূপ হইতে জল তুলিয়া জলসেচের বন্দোবস্ত করিবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কূপের সাহায্যে জলসেচের কয়েকটি অসুবিধাও পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, কূপের জলে লবণের পরিমাণ বেশী হইলে শস্যের ক্ষতি হয়। দ্বিতীয়তঃ, গ্রীষ্মকালে বহু অগভীর কূপ শুকাইয়া যায়। তৃতীয়তঃ, একই কূপ হইতে একসঙ্গে বহুক্ষণ জল তুলিলে কূপে জলাভাব দেখা যায়। চতুর্থতঃ,

কূপের জল বহুদূরে লইয়া জলসেচন করা কঠিন। বর্তমানে প্রায় ৬৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে কূপের সাহায্যে জলসেচ করা হয়।

(খ) **জলাশয়**—প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম জলাধারে বর্ষাকালে জল সঞ্চয় করিয়া প্রয়োজনমতো জলসেচের বন্দোবস্ত করা হয়। নদীর উপর বাঁধ দিয়া বৃহদাকার জলাশয়েও জল রাখা হয়; এইজাতীয় জলাধারকে সঞ্চিত জলাধার

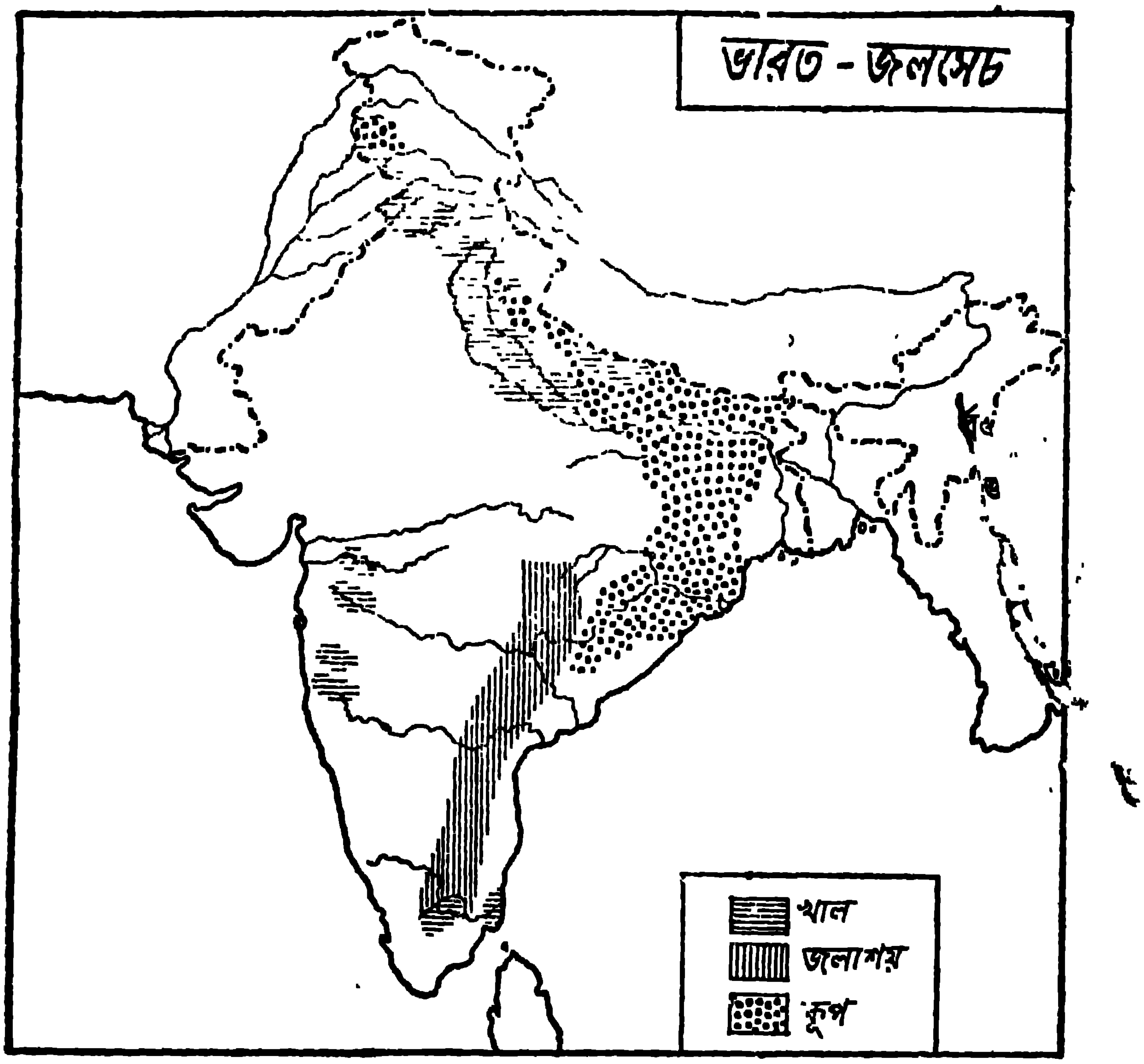

(Storage Tank) বলে। দক্ষিণ ভারতে জমি অসমতল বলিয়া খালের সাহায্যে সেচকার্য করা কঠিন। এইজন্য মাদ্রাজ, অন্ধ্র, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যে এইজাতীয় জলসেচ-ব্যবস্থা অধিক পরিলক্ষিত হয়। উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যেও বর্তমানে জলাশয়ের সাহায্যে জলসেচ হইয়া থাকে। এই পদ্ধতিতে প্রতিবৎসর প্রায় ৪৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ হইয়া থাকে। এইজাতীয় জলসেচের প্রধান অসুবিধা এই যে, শীতকালে বা

অনাবৃষ্টির সময় জলাশয় শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে এবং প্রতিবৎসর এই জলাশয়ের সংস্কার-সাধন প্রয়োজন হয়।

(গ) **খাল (Canal)**—নদী বা জলাধার হইতে খাল কাটিয়া জলসেচের বন্দোবস্ত করা ভারতে সর্বাধিক প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে প্রতিবৎসর প্রায় ৯২ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ হইয়া থাকে। সমতলভূমিতে খালের সাহায্যে জলসেচ করা সহজসাধ্য বলিয়া অধিকাংশ সেচ-খাল উত্তর ভারতে অবস্থিত। খাল সাধারণতঃ দুইপ্রকার—নিত্যবহ খাল (Perennial Canal) ও প্লাবন খাল (Inundation Canal)। **নিত্যবহ খালে** বৎসরের সকল সময় জল থাকে। নদীর উপর বাঁধ দিয়া জল উঁচু করিয়া রাখিবার ফলে এই সকল খালে সর্বদাই জল পাওয়া যায় এবং এই জল জলসেচের জন্য নিয়োজিত হয়। উত্তরপ্রদেশের পূর্ব যমুনা, গঙ্গা, সারদা ও আগ্রা খাল, পাঞ্জাবের শিরহিন্দ, উচ্চ বারি দোয়াব ও পশ্চিম যমুনা খাল, পশ্চিমবঙ্গের দামোদর ও ময়ূরাক্ষীর খাল, উড়িষ্যার মহানদীর খাল, দাক্ষিণাত্যের পেরিয়ার, বাকিংহাম, মেতুর ও কাবেরী খাল নিত্যবহ খালের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। উত্তর ভারতে খালের সংখ্যা অনেক বেশী; এখানে প্রধানতঃ নদী হইতে খাল কাটিয়া লওয়া হয়। দাক্ষিণাত্যে ও মধ্যপ্রদেশে অধিকাংশ খাল সঞ্চিত জলাধার হইতে কাটিয়া লওয়া হয়।

প্লাবন খালে বৎসরের সকল সময় জল থাকে না; কারণ যে নদী হইতে খালে জল আসে সেই নদীর জল গ্রীষ্মকালে নীচে নামিয়া যায় বা শুকাইয়া যায়। নদীতে জল বাড়িলে বা প্লাবন হইলে এই সকল খালে জল আসে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণে এইজাতীয় খাল বিশেষ উপযোগী। খালের সাহায্যে জলসেচ-ব্যবস্থার প্রধান অসুবিধা এই যে, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের কোন কোন স্থানে ভূত্বকের নিম্নস্থিত লবণাক্ত জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া জমিকে লবণাক্ত করিয়া অনুর্বর করে; ইহা ছাড়া, অশিক্ষিত কৃষকদের অসাবধানতায় খালের জল বহুস্থানে আটকাইয়া যায় এবং জমিকে কৃষিকার্যের অযোগ্য করিয়া তোলে। এই সকল অসুবিধা এই জলসেচ-পদ্ধতির সুবিধার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য বলিয়া বর্তমান ভারতে ইহাই শ্রেষ্ঠ জলসেচ-পদ্ধতি।

ভারতের উল্লেখযোগ্য সেচ-খাল—পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হওয়ায় জলসেচের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। এইজন্য এই দুইটি রাজ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী সেচ-খাল পরিলক্ষিত হয়। এই সকল

সেচ-খালের সাহায্যে পাঞ্জাবের প্রায়-বৃষ্টিহীন অঞ্চলও শস্যশ্যামল বিস্তীর্ণ কৃষি-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যেও সেচ-খালের সংখ্যা কম নহে।

(ক) পাঞ্জাব রাজ্যে নিম্নলিখিত খালসমূহ বহুদিন পূর্বেই খনন করা হইয়াছিল :—(১) **শিরহিন্দ খাল** রূপারের নিকটবর্তী স্থানে শতদ্রু নদী হইতে ১৮৮৬ সালে খনন করা হয়; ইহার দৈর্ঘ্য ২,৬১৫ কিলোমিটার। ইহার সাহায্যে লুধিয়ানা, ফিরোজপুর, হিসার ও নাভা জিলার ৫'৬ লক্ষ হেক্টর কৃষি-জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। (২) **পশ্চিম যমুনা খাল** দিল্লীর নিকট যমুনা নদী হইতে ১৮৮৬ সালে খনন করা হয়; ইহার দৈর্ঘ্য ৩,০৬০ কিলোমিটার। এই খালের সাহায্যে রোটক, হিসার, পাতিয়ালা ও ঝিন্দ অঞ্চলের প্রায় ৩'৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। (৩) **উচ্চ বারি দোয়াব খাল** খনন করা হয় ১৮৭৯ সালে। ইরাবতী নদী হইতে মধুপুরের নিকট এই খাল কাটিয়া গুরুদাসপুর ও অমৃতসর অঞ্চলের ৩'৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়। স্বাধীনতার পর ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা অনুসারে নাঙ্গালের নিকট শতদ্রু নদী হইতে **নাঙ্গাল খাল** খনন করা হয়।

সিন্ধু ও উহার শাখানদীসমূহের জল লইয়া স্বাধীনতার পর হইতেই ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে ঝগড়া চলিতেছিল। কারণ সিন্ধুর শাখানদী-সমূহের উৎপত্তিস্থান অধিকাংশই ভারতে অবস্থিত। সুতরাং ভারতের সদাশয়তার উপর পশ্চিম পাকিস্তানের জল-সরবরাহ তথা কৃষিকার্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ১৩ বৎসর ঝগড়া চলিবার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নদী ও খালের জল সম্বন্ধে ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় ১৯৬০ সালে **সিন্ধু জলচুক্তি (Indus Water Treaty)** সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তির ফলে ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রু নদীর জলসমূহ মোটামুটি ভারতের অংশে পড়িয়াছে; প্রথম ১০ বৎসর পাকিস্তানকে কিছু সুবিধা দিতে হইবে। ভারত এই সকল নদীর জল পাকিস্তানকে চুক্তিতে বর্ণিত হারে সরবরাহ করিবে। সিন্ধু, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর জল পাকিস্তান ভোগ করিবে। ভারত এই তিনটি নদীর জলের গতিতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। কিন্তু নদীর উচ্চ অংশে ভারত ইহার জল ব্যবহার করিতে পারিবে। পাকিস্তান পূর্বে ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রু নদী হইতে বিভিন্ন খালের জন্য যে জল পাইত, তাহা এই দেশকে ১০ বৎসরের মধ্যে সিন্ধু, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদী হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহার জন্য পাকিস্তানের যে

অতিরিক্ত খরচ হইবে, তাহার জন্য ভারত পাকিস্তানকে ১৭.৪ কোটি ডলার সাহায্য দিবে। এই চুক্তির ফলে ভারতকে বিপাশা নদীর উপর একটি বাঁধ দিয়া ১৬ লক্ষ হেক্টর মিটার জলধারণক্ষম একটি জলাধার নির্মাণ করিতে হইবে। এইজন্য ভারত ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক হইতে ২.৩ কোটি ডলার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৩.৩ কোটি ডলার ঋণ পাইবে।

(খ) **উত্তরপ্রদেশ** কৃষিসমৃদ্ধ রাজ্য। ইহার কৃষিকার্যের উন্নতির মূলে রহিয়াছে জলসেচ-ব্যবস্থার উন্নতি। সেচ-খালের দৈর্ঘ্যে এই রাজ্য ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করে। উত্তরপ্রদেশের নিম্নলিখিত সেচ-খালসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—(১) **উচ্চ গঙ্গা খাল** হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা নদী হইতে ১৮৯১ সালে খনন করা হয়। ইহার সাহায্যে সাহারাণপুর, মজঃফরপুর, মীরাট, বুলন্দশহর, আলিগড়, মথুরা ও এটাওয়া জেলার প্রায় ৪.৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়। শাখা-প্রশাখা সমেত এই খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫,৬০০ কিলোমিটার। (২) **নিম্ন গঙ্গা খাল** বুলন্দশহর জেলার নরোরার

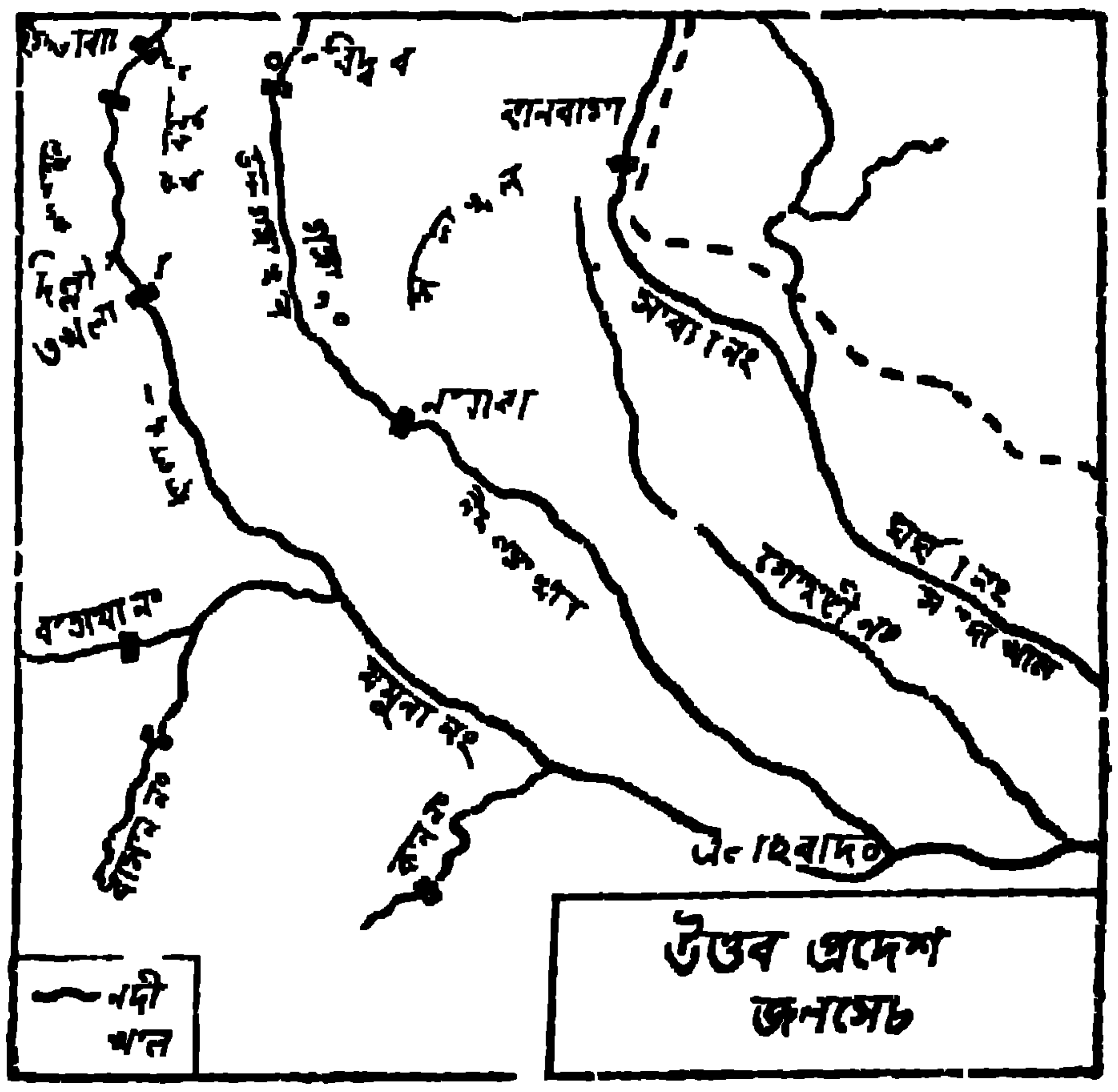

নিকট গঙ্গা নদী হইতে ১৮৯১ সালে খনন করা হইয়াছে। শাখা-প্রশাখা সমেত এই খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৪,৮৩০ কিলোমিটার। ইহার সাহায্যে আলিগড়, এটা, মেনপুরী, এটাওয়া, কানপুর ও ফতেপুর জেলায় প্রায় ৪.৮ লক্ষ হেক্টর কৃষি-জমিতে জলসেচ করা হয়। (৩) **সারদা খাল** নেপাল সীমান্তে অবস্থিত বানবাসার নিকট সারদা নদী হইতে কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। শাখা-প্রশাখা সমেত এই খালের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬,৮৬০ কিলোমিটার। ১০ বৎসর কাজ করিবার পর ১৯৩০ সালে এই খালের খননকার্য শেষ হয়। এই খালের সাহায্যে হরদোই, পিলিভিত, এলাহাবাদ, সাজাহানপুর, খেরি, সীতাপুর প্রভৃতি জেলায় প্রায় ৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়। (৪) **পূর্ব যমুনা খাল**

ফৈজাবাদের নিকট যমুনা নদী হইতে কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। শাহ্‌জাহানের রাজত্বে এই খাল প্রথম খনন করা হইলেও, ১৮৩০ সালে ইহাকে পুনরুদ্ধার করিয়া কার্যকরী করা হয়। শাখা-প্রশাখা সমেত ইহার দৈর্ঘ্য ৫,৬০০ কিলোমিটার। সাহারাণপুর, মজঃফরপুর ও মীরাট জেলায় এই খালের সাহায্যে প্রায় ১'২ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়। (৫) **আগ্রা খাল** দিল্লীর নিকটস্থ ওখলায় যমুনা নদী হইতে ১৮৯১ সালে কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১,৪৩০ কিলোমিটার। ইহার সাহায্যে দিল্লী, পাঞ্জাবের গুরগাঁও এবং উত্তরপ্রদেশের মথুরা ও আগ্রা জেলায় ১'৮ লক্ষ হেক্টর কৃষি-জমিতে জলসেচ হইয়া থাকে। এই পাঁচটি প্রধান খাল ছাড়াও উত্তরপ্রদেশে যমুনার বিভিন্ন শাখানদী হইতে বেতোয়া খাল, কান খাল ও ধাসান খাল কাটিয়া লওয়া হইয়াছে।

(গ) দাক্ষিণাত্যে প্রধানতঃ সঞ্চিত জলাশয় হইতে কৃষিক্ষেত্রে জলসরবরাহের জন্য খাল খনন করা হয়। দাক্ষিণাত্যে নিম্নলিখিত খালসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—(১) **পেরিয়ার খাল** কার্ডামম পর্বতের পাদদেশে পেরিয়ার নদীতে বাঁধ দিয়া কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। ১৮৯৭ সালে এই খাল খনন করা হয়। একটি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া এই খাল মাদুরার শুষ্ক অঞ্চলে জলসেচের জন্য লইয়া যাওয়া হয়। (২) কাবেরী নদীর উপর মেতুরে বাঁধ নির্মাণ করিয়া **কাবেরী ব-দ্বীপ খাল** কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। ১৯৩৪ সালে এই খাল খনন করা হয়। শাখা-প্রশাখা সমেত এই খালটির সাহায্যে ৪ লক্ষ হেক্টর পরিমিত কৃষি-জমিতে জলসেচন করিয়া প্রধানতঃ ধানের চাষ হইয়া থাকে। মেতুর বাঁধ পৃথিবীর মনুষ্যনির্মিত অন্যতম বৃহত্তম বাঁধ। ইহার দৈর্ঘ্য ১,৬১৬ মিটার এবং উচ্চতা ৫৪ মিটার। (৩) **কৃষ্ণা ব-দ্বীপ খালটি** বেজওয়াদা শহরের নিকট কৃষ্ণা নদীর উপর বাঁধ দিয়া কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার সাহায্যে কৃষ্ণা, গুণ্টুর ও নেলোর জেলায় প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। (৪) **গোদাবরী ব-দ্বীপ খাল** প্রধানতঃ শ্রীকাকুলম, বিশাখাপতনম, পশ্চিম ও পূর্ব গোদাবরী জেলায় ৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে। গোদাবরী নদীর দুইটি শাখা গৌতমী ও বশিষ্ঠ হইতে এই খালটি জল সংগ্রহ করে। ইহা ছাড়া, পেনের তুঙ্গভদ্রা নদীর সংযোগকারী কুর্নুল-কুডাপ্পা খাল, আর্কট শহরের দক্ষিণস্থ পৈনী-পালার ও সৈয়াব খাল, কৃষ্ণা নদীর বাকিংহাম খাল প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের উল্লেখযোগ্য সেচ-খাল।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও জলসেচ—স্বাধীনতার পর ভারত সরকার কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে জলসেচ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে। **প্রথম পরিকল্পনার** পূর্বে ভারতে জলসেচযুক্ত কৃষি-জমির আয়তন ছিল ২·০৬ কোটি হেক্টর ; ইহা মোট কৃষি-জমির শতকরা ১৭·৫ ভাগ মাত্র। এই পরিকল্পনায় বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত করা হয় ; ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচকার্যের মাধ্যমে আরও ৪০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জল সরবরাহের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এইভাবে প্রথম পরিকল্পনার শেষে ভারতে মোট কৃষি-জমির শতকরা ২০ ভাগ জলসেচের আওতায় আসে। ইহার জন্য এই পরিকল্পনায় ব্যয় হয় মোট ৩০০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অতিরিক্ত ৮৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩০·৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্র সেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং ২৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা ও মাঝারি পরিকল্পনার মাধ্যমে জলসেচন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে নূতন ১৯৫টি সেচ-পরিকল্পনার কাজ সুরু হইয়াছে, ইহার কার্য শেষ হইলে আরও ৬০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। এই পরিকল্পনায় ৩,৫৮১টি নলকূপের সাহায্যে অতিরিক্ত ৩·৬৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় জলসেচের জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে ৩৭০ কোটি টাকা।

তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬১-৬৬) জলসিঞ্চিত কৃষি-জমির পরিমাণ ৪৬ লক্ষ হেক্টর বৃদ্ধি পাইবে। ইহার জন্য খরচ হইবে মোট ৬০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত, কিন্তু অসমাপ্ত সেচ-পরিকল্পনার জন্য খরচ হইবে ৪৩৬ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত নূতন জলসেচ-ব্যবস্থার জন্য খরচ হইবে ১৬৪ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার নূতন কর্মসূচীর মধ্যে আছে, ৯৫টি নূতন ও মাঝারি সেচ-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা, ১৯৬০ সালের 'সিন্ধু জলচুক্তি' অনুযায়ী বিপাশা নদীর উপর জলাধার নির্মাণ করা ও বহুমুখী পরিকল্পনার জলসেচ অংশের কার্যসূচী সমাপ্ত করা। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

জলবিদ্যুৎ (Hydro-electricity)

ভারতে সঞ্চিত কয়লা ও খনিজ তৈলের পরিমাণ খুব বেশী নহে। ক্রমক্ষীয়মাণ এই সকল শক্তিসম্পদের সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ভারতে দ্রুত শিল্পোন্নতির জন্য শক্তিসম্পদের চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। গ্রামাঞ্চলে কুটীরশিল্পের জন্য এবং শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের জন্যও সুলভ শক্তি-সম্পদের প্রয়োজন। এই সকল কারণে ভারতে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বৃষ্টিপাতের কোন অভাব এই দেশে নাই; বন্ধুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের এই সকল অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা ভারতে বিদ্যমান। অবশ্য বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা ও জলপ্রবাহ সুনিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় এই দেশে কৃত্রিম জলাধার সৃষ্টি করিয়া অধিকাংশ স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে হয়।

ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ আমলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিশেষ কোন প্রচেষ্টা হয় নাই।

এদেশ হইতে কাঁচামাল রপ্তানি করা এবং বৃটেন হইতে শিল্পজাত দ্রব্য এদেশে আমদানি করাই ছিল বৃটিশ রাজত্বের মূলনীতি। জলবিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করিয়া বৃটেনে লইয়া যাওয়া সম্ভব নয় বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে বৃটিশ সরকার চিরকাল উদাসীন ছিল। জনমতের চাপে ১৯১৮ সালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইল। কিন্তু অনুসন্ধানের ফল জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে ইহার কাজ চাপা পড়িয়া গেল। টাটা কোম্পানীর প্রচেষ্টায় মহারাষ্ট্রে ১৯১৫ সালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সুরু হয়। স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্বে দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি উৎপাদন-কেন্দ্র এবং টাটা কোম্পানীর জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলি ছাড়া অন্য কোনস্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। উত্তর ভারতে ছোটখাটো কয়েকটি উৎপাদন-কেন্দ্র বহুদিন পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছিল। বৃটিশ সরকার কোলার স্বর্ণখনি হইতে স্বর্ণ আহরণের তাগিদে ১৯০২ সালে শিবসমুদ্রমে প্রথম জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল।

ভারতে প্রচ্ছন্ন জলশক্তির পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ কিলোওয়াট্। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে নদীর উপর বাঁধ দিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। কয়লার ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা ও খনিজ তৈলের অভাবের জন্য এখানে

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হইতেছে। গ্রামাঞ্চলে কুটীরশিল্পের উন্নতি, জলসেচের বন্দোবস্ত ও রেলগাড়ী-চলাচলের জন্যও জলবিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন তাহা ভারত সরকার সরবরাহ করিতেছে। বহু ইঞ্জিনিয়ার বিদেশ হইতে আনা হইতেছে। ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা বিদ্যমান। সুতরাং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশেষ কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে না।

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Producing areas)—কয়লা ও খনিজ তৈলের অভাবের জন্য দক্ষিণ ভারতে প্রথম জলবিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ ভারতের খরস্রোতা নদী ও জলপ্রপাত, পশ্চিমঘাটের অত্যধিক বৃষ্টিপাত, উন্নতশীল শিল্পাঞ্চলের চাহিদা এখানকার জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তা করিয়াছে। দক্ষিণ ভারতে মোট ৫ লক্ষ ২৮ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। জলবিদ্যুতের সাহায্যে এই অঞ্চলে কূপ হইতে জলসেচের জন্য জল তোলা হয়। বিভিন্ন শিল্পেও এই জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়।

মহারাষ্ট্র রাজ্যে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে নির্গত নদীগুলির জলস্রোত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। লোনাভলার হ্রদে বৃষ্টির জল সঞ্চিত করিয়া খোপলিতে, অন্ধ্র নদীতে বাঁধ দিয়া কৃত্রিম হ্রদে জল সঞ্চয় করিয়া ভীবপুরিতে এবং নিলামুলা নদীর জলস্রোত হইতে ভীরাতে টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক এজেন্সী ২'৪৫ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। ১৯১৫ সালে ইহার কাজ সুরু হয়। এই বিদ্যুৎ দ্বারা ট্রাম, রেল ও বিভিন্ন শিল্প চালিত হয়। সম্প্রতি বোম্বাই শহরের নিকট কল্যাণে একটি বড় জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

মহীশূর রাজ্যে কাবেরী নদীর জলপ্রপাত হইতে **শিবসমুদ্রমে** জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া কোলার স্বর্ণখনিতে সরবরাহ করা হয়। ইহাই ভারতের প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র। ইহার কাজ ১৯০২ সালে আরম্ভ হয়। ইহা ছাড়া এই রাজ্যে **সীমুসা** ও **যোগ** জলপ্রপাত অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই কেন্দ্র হইতে মহারাষ্ট্র এবং মাদ্রাজেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

মাদ্রাজ রাজ্যের নীলগিরি জেলায় **পাইকারা** নদীর জলপ্রপাত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। এই নদীর জলের সাহায্যে ময়ার জলবিদ্যুৎ

উৎপাদন-কেন্দ্রটি পরিচালিত হয়। কাবেরী নদীর উপর মেতুরে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বাঁধ স্থাপন করা হইয়াছে। মেতুরে উৎপন্ন জলবিদ্যুৎ

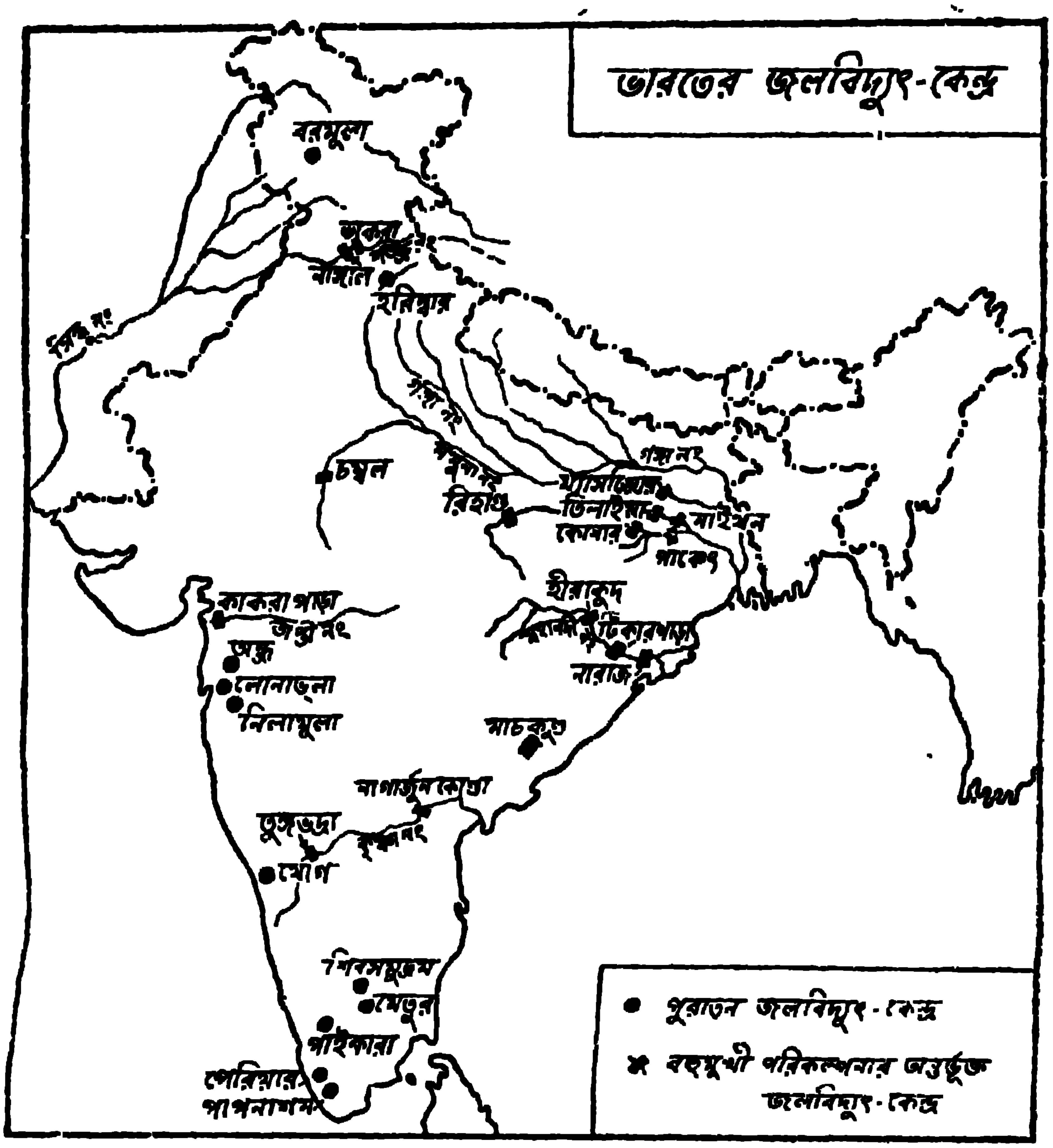

এখানকার বিভিন্ন শিল্পে সরবরাহ করা হয়। তাম্রপর্ণী নদীর জলপ্রপাত হইতে পাপনাশমে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

কেরালা রাজ্যে মুদীরপুঝা নদীর জলপ্রপাত হইতে **পল্লীভাসালে** জলবিদ্যুত উৎপন্ন করিয়া এখানকার অ্যালুমিনিয়াম-শিল্পে সুলভে সরবরাহ করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় **সেঙ্গুলামে** একটি জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

উত্তর ভারতের নদীগুলিতে বৎসরের প্রায় সকল সময় জল থাকে। কিন্তু স্বাভাবিক জলপ্রপাত না থাকায় কৃত্রিম হ্রদে জল সঞ্চয় করিয়া বিদ্যুৎ

উৎপন্ন করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। কিন্তু এই অঞ্চলে যন্ত্রশিল্পের প্রসার হওয়ায় এখানে বিদ্যুতের চাহিদা অত্যন্ত বেশী।

ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্রগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্বেকার পুরাতন কেন্দ্রসমূহ। দ্বিতীয়তঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার মারফত সৃষ্ট কেন্দ্রসমূহ। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত উত্তর ভারতের কেন্দ্রসমূহের মধ্যে **কাশ্মীরের** ঝিলাম নদীর জলস্রোত হইতে বরমুলার নিকট অবস্থিত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **পাঞ্জাবের** উল নদীর জলস্রোত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া বিভিন্ন শহরে (লুধিয়ানা ও অমৃতসর) বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। যোগীন্দ্রনগর বিদ্যুৎকেন্দ্র হইতে ১২,০০০ কিলোওয়াট্ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। **উত্তরপ্রদেশে** গঙ্গা নদীর বিভিন্ন খালের জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। এখানে বাহাদুরাবাদ, হরিদ্বার, ভোলা, মোহম্মদপুর, সালাওয়া, পালরা, সুমেরু প্রভৃতি স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি অবস্থিত।

স্বাধীনতার পর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়। ইহার বিস্তারিত আলোচনা এখন করা হইতেছে।

বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার সংযোগ-সাধন (Interconnection of power plants and power system) সম্পর্কে প্রথম খণ্ডের 'শক্তিসম্পদ' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা
(Multi-purpose River Projects)

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, ভারতে এখনও পর্যাপ্ত জলসেচের বন্দোবস্ত করা হয় নাই। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেও ভারতের স্থান অনেক নীচে। স্বাধীনতা পাইবার পর দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ আরম্ভ হয়। এই পরিকল্পনার মধ্যে বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা অন্যতম। নদীর উপর বাঁধ দিয়া বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য সাধনের বন্দোবস্ত করাই এই পরিকল্পনার প্রধান কাজ।

নদীর উপর কংক্রীটের বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া একটি জলাশয় বা কৃত্রিম

হ্রদ সৃষ্টি করা হয়। এই জলাশয় হইতে খাল কাটিয়া **জলসেচের** ব্যবস্থা করা হয়। জলাশয় হইতে সুড়ঙ্গের মাধ্যমে জল ছাড়িয়া জলের গতিবেগে টারবাইন ঘুরাইয়া **জলবিদ্যুৎ** উৎপন্ন করা হয়। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী সকল অবস্থা ভারতে বিদ্যমান। ইহা ছাড়া কৃত্রিম হ্রদে **মৎস্য চাষ** করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। বাঁধ দেওয়ার ফলে নদীর জলের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহাতে **বন্যা-নিবারণ** সহজসাধ্য হয় বাঁধ-নির্মাণ ও অন্যান্য কাজে এখানে বহুলোক আসিয়া জড় হয় এবং এই সকল অঞ্চল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। ইহার ফলে **ম্যালেরিয়া নিবারণ** হইয়া থাকে। পার্বত্য অঞ্চলেই নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করা হইয়া থাকে। এই সকল স্থান খুব সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। বাঁধ-নির্মাণের ফলে এখানে জনবসতি স্থাপিত হয়। বহুলোক অবসর বিনোদনের জন্য এবং **স্বাস্থ্যের উন্নতির** জন্য এখানে আসিয়া অস্থায়িভাবে বাস করে। এখানে **বৃক্ষাদিরোপণ, পথনির্মাণ** ইত্যাদি কাজও হইয়া থাকে। বৃক্ষাদিরোপণের ফলে **ভূমিক্ষয়** নিবারিত হয়। নদীর উপর বাঁধ দিয়া এইভাবে বহু উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এইজন্য এই সকল পরিকল্পনাকে **বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা** বলে। পূর্বে মানুষ কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই যে, নদী হইতে এত উপকার সাধিত হইতে পারে। অবশ্য এই সকল পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে বহু কোটি টাকা ও সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন। এই সকল পরিকল্পনার জন্য বিদেশ হইতে বহু ইঞ্জিনিয়ার আনা হইয়াছে এবং সরকার এই সকল পরিকল্পনার যাবতীয় ব্যয় বহন করিতেছে। নিম্নে ভারতের প্রধান প্রধান বহুমুখী নদী-পরিকল্পনাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল:

দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনা (Damodar Valley Project)—চীনের হোয়াংহো নদীর মতো দামোদরকে সকলে 'দুঃখের নদী' বলিয়া জানিত। ইহার বন্যার স্রোতে বহুলোকের জীবনহানি ঘটিয়াছে, বহু সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে এবং পল্লীবাংলার বহু ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। দামোদর নদের উপর বাঁধ দিয়া বিদ্যুৎ-উৎপাদন, জলসেচ, বন্যারোধ, মৎস্য-চাষ ও নৌ-চলাচলের বন্দোবস্ত করিবার জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ সালে দামোদর-উপত্যকা কর্পোরেশন (Damodar Valley Corporation বা D. V. C.) নামে একটি সংস্থা তৈয়ার করিয়া তাহার উপর এই পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

দামোদর নদ ৫৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ; বিহারের ছোটনাগপুরের নিকটস্থ পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া বিহারের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া ২৯০ কিলোমিটার

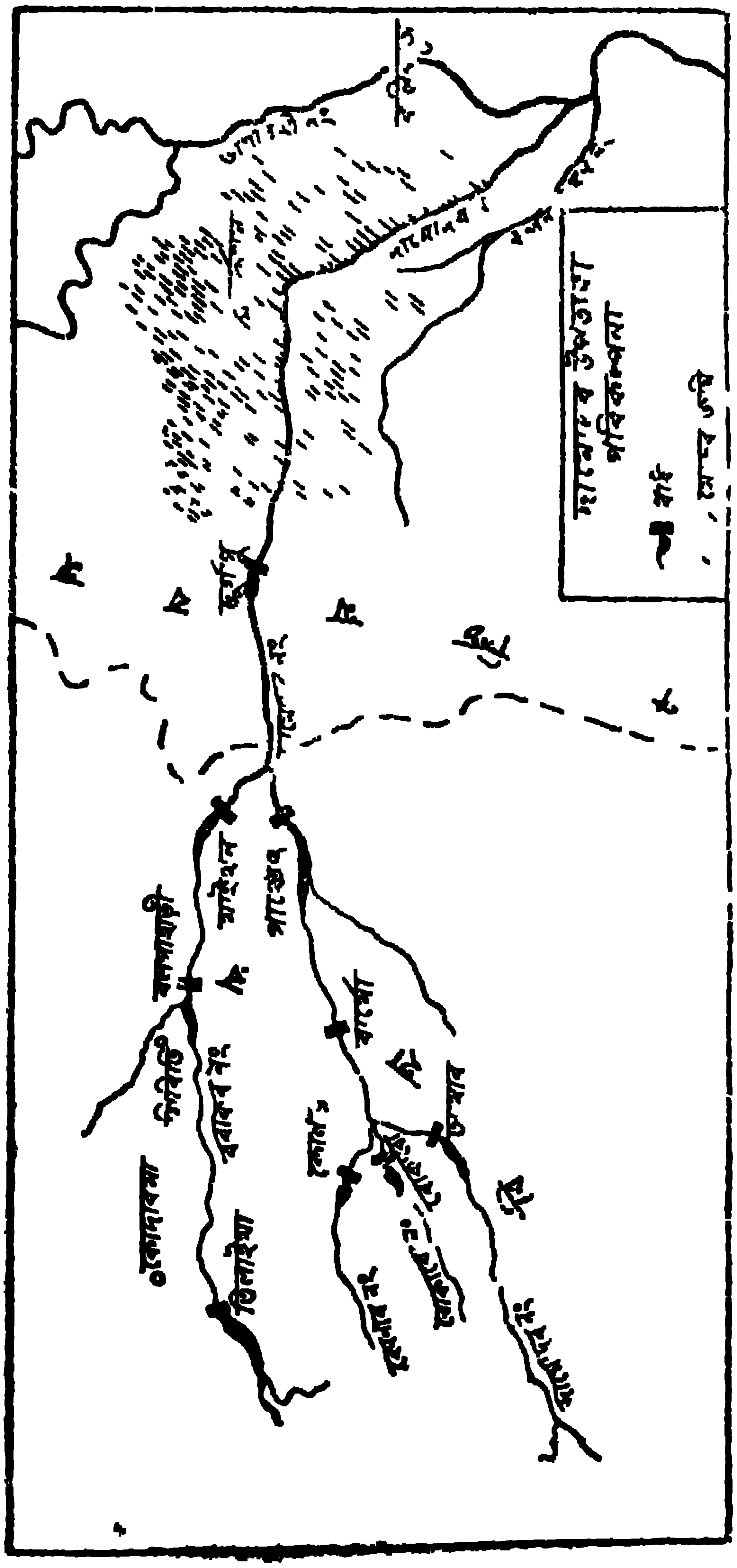

দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি সবই বিহারে অবস্থিত এবং সেচের জন্য খালগুলি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।

পথ প্রবাহিত হইয়া এই নদ পশ্চিমবঙ্গের হুগলী নদীর সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে। বিহারের হাজারিবাগ, পালামৌ, রাঁচি, মানভূম এবং সাঁওতাল পরগনা

জেলা দামোদরের উচ্চ অংশের দুই তীরে অবস্থিত। এই নদের নিম্নাংশে পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমির কৃষিপ্রধান অঞ্চল ও বিখ্যাত দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল অবস্থিত। এই শিল্পাঞ্চলে ভারতের বিখ্যাত দুইটি ইস্পাত শিল্প, একটি রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণ শিল্প, একটি অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, সাবের ও সিমেন্টের কারখানা অবস্থিত। উচ্চ দামোদরের তীরে প্রচুর কাঠ, লাক্ষা, কয়লাখনি, বক্সাইট প্রভৃতি পাওয়া যায়।

এই পরিকল্পনা অনুসারে দামোদরের তিনটি শাখানদীর (বরাকর, বোকারো ও কোনার) উপর বাঁধ (Dam) দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইতিমধ্যে বরাকর নদীর উপর তিলাইয়া ও মাইথন বাঁধ, কোনার নদীর উপর কোনার বাঁধ এবং দামোদর নদের উপর পাঞ্চেৎ বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। বোকারো, দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরায় যে তিনটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে তাহাও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। দামোদর নদের উপর আয়ার ও বার্মো বাঁধ, বোকারো নদীর উপর বোকারো বাঁধ এবং বরাকর নদীর উপর বলপাহাড়ী বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব হইয়া ছল, ইহাদের কাজ আপাততঃ স্থগিত আছে।

তিলায়া বাঁধ নির্মিত হয় ১৯৫৩ সালে; ইহার দৈর্ঘ্য ৩৬৬ মিটার এবং উচ্চতা ৩৪ মিটার। এই বাঁধের জল হইতে ৪০,০০০ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহার ফলে ৪ লক্ষ মেঃ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। **কোনার** বাঁধের দৈর্ঘ্য ৩,৯২১ মিটার এবং উচ্চতা ৬০ মিটার। ১৯৫৪ সালে ইহার নির্মাণকার্য শেষ হয়। এই বাঁধের জলের সাহায্যে ৪০,০০০ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং বৎসরে ইহার জলশক্তি দ্বারা ১৯·১ কোটি কিলোওয়াট্-ঘণ্টা পরিমিত জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। **মাইথন** বাঁধ নির্মাণের ফলে বৎসরে ১৬·৪ কোটি কিলোওয়াট্-ঘণ্টা পরিমিত জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে এবং ১·০৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ হইবে। এই বাঁধের দৈর্ঘ্য ৩,৫৯০ মিটার এবং উচ্চতা ৪৮ মিটার। **পাঞ্চেৎ** বাঁধের নির্মাণকার্য সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। ইহার সাহায্যে প্রায় ৪০ ০০০ কিলোওয়াট্ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। এই সকল বাঁধ বিহারে অবস্থিত। ইহা হইতে মোট ২ লক্ষ ৪৫ হাজার কিলোওয়াট্ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে দামোদর নদের উপর একটি সেচ-বাঁধ (Barrage) নির্মাণ করা হইয়াছে। ১৯৫৫ সালে ইহার কাজ শেষ হইয়াছে। এই

সেচ-বাঁধটি ৬৯২ মিটার দিঘা এবং ১২ মিটার উঁচু; ইহার পিছনদিক হইতে নদীর দুইদিকে খাল কাটিয়া প্রায় ৩'৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া ও হুগলী জেলা এই জলসেচের সুবিধা পাইবে। এই স্থান হইতে ১৪৫ কিলোমিটার লম্বা একটি খাল কাটিয়া হুগলী নদীর সঙ্গে মিশানো হইয়াছে। এই খাল দ্বারা জলসেচন ও পরিবহণ এই উভয় কাজই সাধিত হইতে পারে। এই খাল দিয়া জলপথে কয়লাখনি অঞ্চল ও কলিকাতার মধ্যে কয়লা ও শিল্পজাত দ্রব্য চলাচলের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

দামোদর পরিকল্পনার অন্তর্গত **বোকারো** তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই কেন্দ্র হইতে ১,৫০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাইতেছে। স্থানীয় নিকৃষ্ট ধরনের কয়লা পোড়াইয়া এই তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

এই পরিকল্পনার প্রথম স্তরে ১০৫ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। ইহার ফলে প্রায় ৪৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে; ফলে ৩'৫ লক্ষ মেঃ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য এবং ৩৬ কোটি টাকা মূল্যের অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইতেছে। এই পরিকল্পনায় মোট ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে, ইহার মধ্যে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার কিঃ জলবিদ্যুৎ এবং ২ লক্ষ ২৫ হাজার কিঃ তাপবিদ্যুৎ। বিভিন্ন শিল্পে ও বাসস্থানে এই বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইতেছে। সিন্ধির সারের কারখানা, আসানসোলের অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন কারখানা এই বিদ্যুৎ সুলভে পাইতেছে। এই পরিকল্পনার ফলে দামোদর উপত্যকায় অবস্থিত স্থানগুলির আরও উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা (The Bhakra-Nangal Project)—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহাই পাঞ্জাবের একমাত্র বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার ফলে পাঞ্জাবের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই রাজ্যে কয়লা বা খনিজ তৈলের অভাবে জলবিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় এখানে জলসেচের চাহিদা প্রচুর। এইজন্য এই রাজ্যের এইরূপ একটি নদী-পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল। ১৯০৮ সালে ইহা প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন পাঞ্জাবের তদানীন্তন গভর্নর স্যার লুই ডেন (Sir Louis Dane)। তিনি বর্তমান পরিকল্পনার মতো একটি প্রস্তাব তদানিন্তন পাঞ্জাব সরকারকে দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪০ সালের পূর্বে তাঁহার এই প্রস্তাব কার্যকরী করিবার কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। এই সময় আবার তদানীন্তন সিন্ধু সরকারের বাধাদানের ফলে কাজ বন্ধ হইয়া

যায়। দেশ স্বাধীন হইবার পর ১৯৪৮ সালে আবার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৫১ সালে ইহার কাজ আরম্ভ হয়।

এই পরিকল্পনা অনুসারে শতদ্রু নদীর উপর দুইটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। এই নদী যেখানে পাহাড়-পর্বত হইতে সমতলভূমিতে পড়িয়াছে, সেখানে ভাকরা নামক স্থানে একটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। রূপার হইতে এই স্থান ৮০ কিঃ মিঃ উত্তরে অবস্থিত। **ভাকরা বাঁধ** ৫১৮ মিটার দীর্ঘ, ৩০৫ মিটার প্রস্থ এবং ২২৬ মিটার উচ্চ। ইহা পৃথিবীর **সর্বোচ্চ বাঁধ**। এতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুভার বাঁধ সর্বাপেক্ষা উচ্চ বাঁধ ছিল (২২০ মিটার), কিন্তু বর্তমানে ভাকরা সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। ভাকরা বাঁধের পিছনে ১৬০ বর্গ-কিলোমিটার আয়তনের একটি জলাধার সৃষ্টি করা হইয়াছে। জলসেচের জন্য এই জল ব্যবহার করা হয়। ভাকরা বাঁধের সম্পূর্ণ কাজ সম্প্রতি শেষ হইয়াছে।

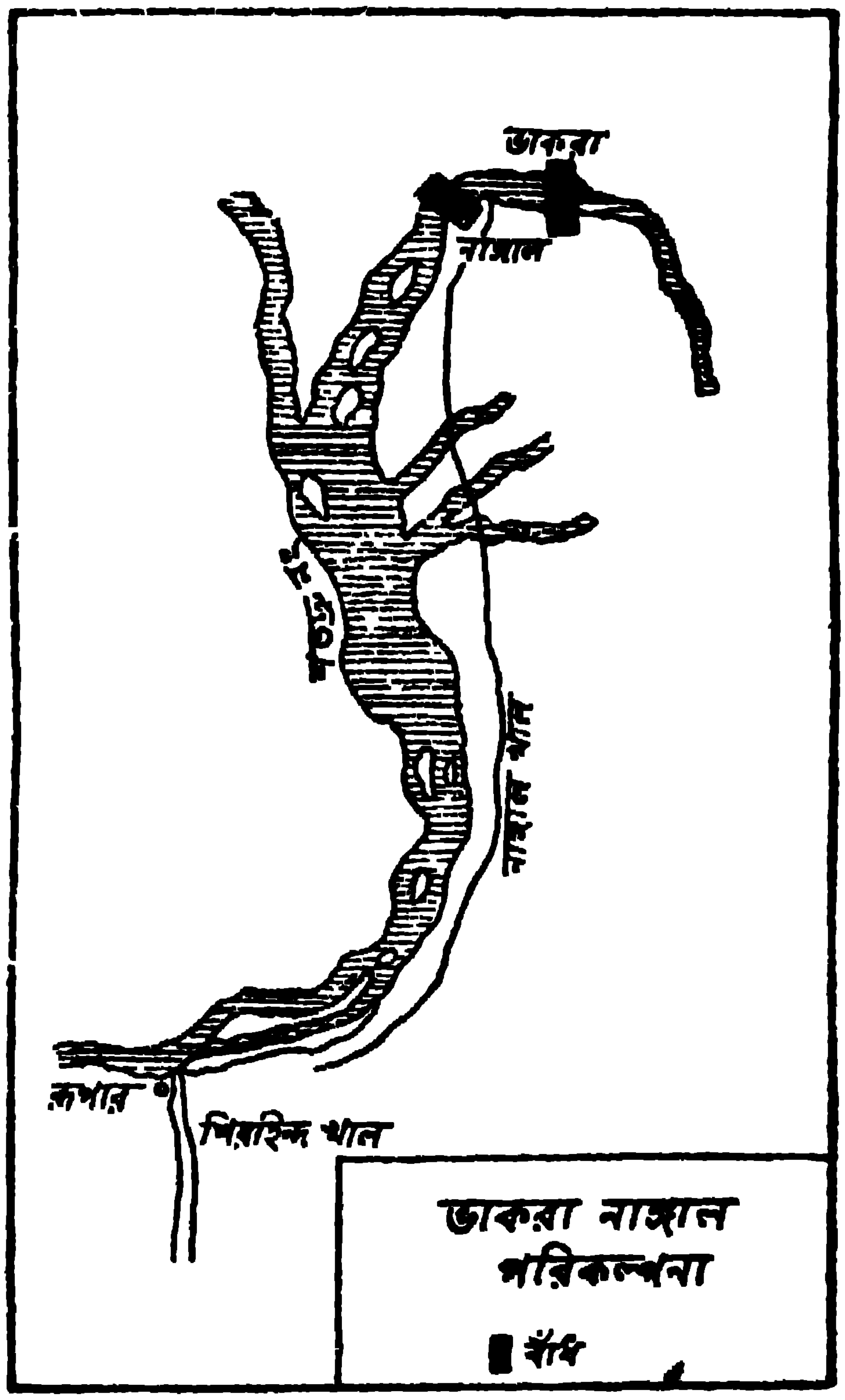

ভাকরা বাঁধের ১৩ কিলোমিটার দক্ষিণে শতদ্রু নদীর উপর নাঙ্গাল নামক স্থানে আরও একটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৩১৪ মিটার, প্রস্থ ১২২ মিটার। এই বাঁধের কাজ শেষ হইয়াছে। **নাঙ্গাল বাঁধের** পিছনের দিক হইতে একটি খাল কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। এই খালের জল দ্বারা জলসেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে এবং জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। এই খালের নাম **নাঙ্গাল খাল**।

এই পরিকল্পনা হইতে পাঞ্জাব ও রাজস্থানের প্রভূত উপকার হইয়াছে। যদিও প্রায় ১৭৪ কোটি টাকা খরচ করিয়া এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে, ইহার তুলনায় উপকারও যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে। এই পরিকল্পনায় মোট ২৬৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহার ফলে ১৩ লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশস্য, ৮ লক্ষ মেঃ টন তুলা, ৫ লক্ষ মেঃ টন ইক্ষু এবং ১ লক্ষ মেঃ টন তৈলবীজ অতিরিক্ত উৎপন্ন হইতেছে। এই অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের মূল্য প্রায় ৯০ কোটি টাকা। পৃথিবীতে অন্য কোন পরিকল্পনায় এত অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় নাই। এই পরিকল্পনায় প্রায় ৪ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে। এই বিদ্যুৎ বিভিন্ন শিল্পে এবং প্রায় ১২৮টি শহরে সরবরাহ করা হইবে। এই জলবিদ্যুতের সাহায্যে নলকূপ হইতে জল তুলিয়া জলসেচের ব্যবস্থাও করা হইতেছে।

মহানদী পরিকল্পনা (The Mahanadi Project)—উড়িষ্যার বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নতিতে এই পরিকল্পনা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। উড়িষ্যায়

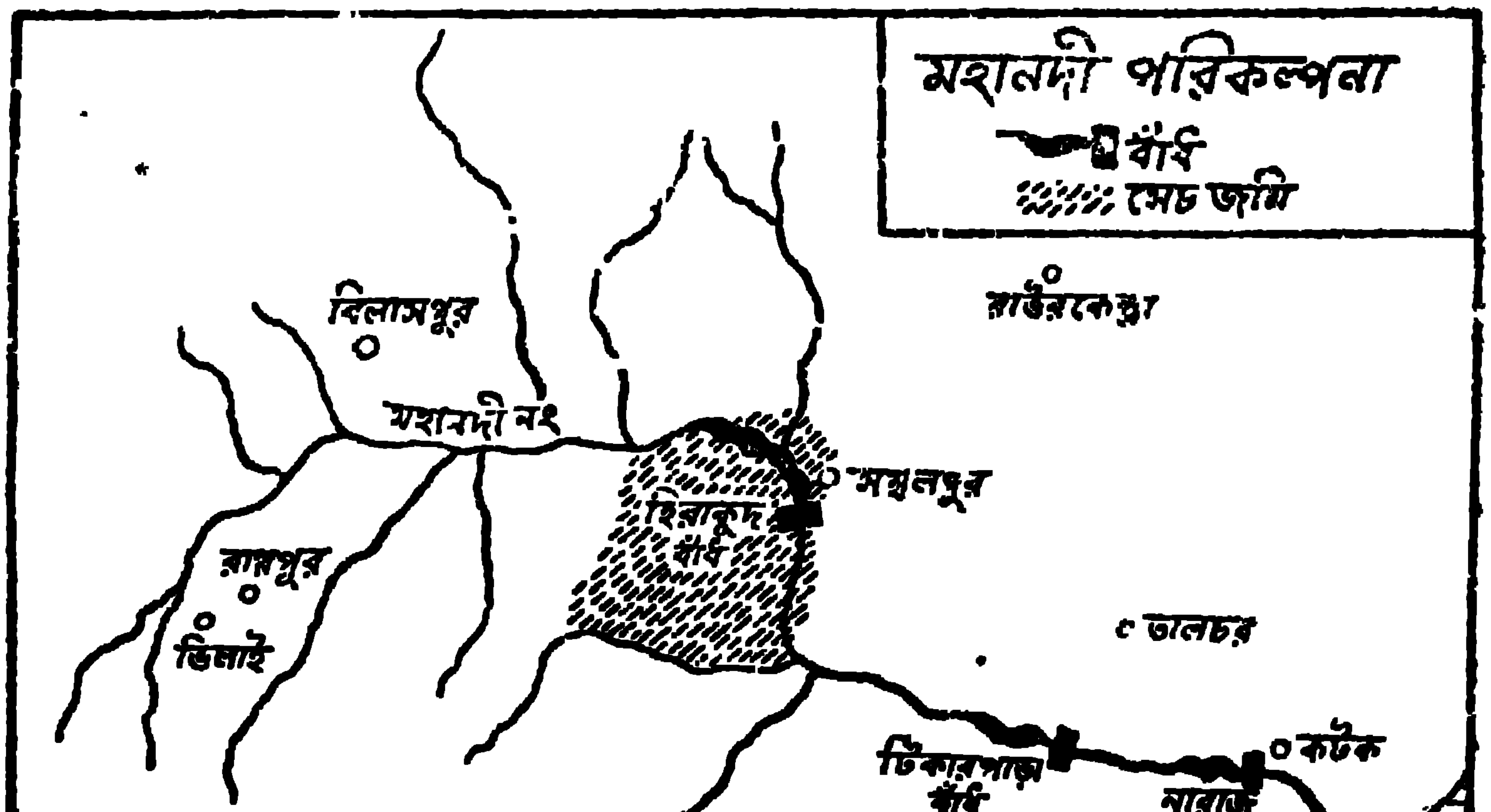

মহানদী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নদী। পূর্বে এই নদীর বন্যায় বহু সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে মহানদীর উপর তিনটি বাঁধ দেওয়া হইবে। হীরাকুদ, টিকারপাড়া ও নারাজে এই বাঁধ নির্মিত হইবে। ইহার

ফলে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে, জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে এবং বন্যা-নিয়ন্ত্রণ সহজসাধ্য হইবে।

সম্বলপুরের ১৪ কিলোমিটার পশ্চিমে **হীরাকুদ বাঁধ** ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪'৮ কিলোমিটার ; ইহার পশ্চাতে একটি বৃহদাকার কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। ১৯৫৭ সালে হীরাকুদ বাঁধের কাজ শেষ হইয়াছে। এই বাঁধ হইতে প্রায় ২'৬৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে **জলসেচের** বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহার ফলে প্রতিবৎসর ৩'৫ লক্ষ মেঃ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য এবং ২'৪ লক্ষ মেঃ টন অতিরিক্ত অন্যান্য শস্য উৎপন্ন হইতেছে। হীরাকুদ বাঁধের ফলে ইতিমধ্যে চাউলের উৎপাদন অনেক বাড়িয়াছে এবং উড়িষ্যা এখন পশ্চিমবঙ্গে চাউল সরবরাহ করিতেছে। এই বাঁধ হইতে বর্তমানে ১'১৮ লক্ষ কিলোওয়াট্ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। রাউরকেলায় ইস্পাত-শিল্পে ও হীরাকুদের নূতন অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় এই বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে। হীরাকুদ বাঁধ নির্মাণ করিতে ৭০ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

মহানদীর উপর আরও দুইটি বাঁধ দেওয়া হইবে। ঢেনকানল জেলার **টিকারপাড়ায়** এবং কটকের নিকট **নারাজে** এই বাঁধ নির্মাণ করা হইবে। এই বাঁধগুলির প্রধান উদ্দেশ্য জলসেচের ব্যবস্থা করা এবং বন্যা-নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা। মহানদী পরিকল্পনার তিনটি বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ হইলে প্রায় ১১ লক্ষ হেক্টর জমিতে **জলসেচের** বন্দোবস্ত হইবে এবং ৩'৫ লক্ষ কিলোওয়াট্ **জলবিদ্যুৎ** উৎপন্ন হইবে। এই পরিকল্পনার ফলে নৌ-চলাচলের সুবন্দোবস্ত হইবে।

উড়িষ্যায় প্রচুর খনিজ সম্পদ বিদ্যমান। এখানে লৌহ, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। ইহার সঙ্গে জলবিদ্যুৎ-শক্তির সংযোগ হওয়ায় উড়িষ্যা শীঘ্রই শিল্পসমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। ইতিমধ্যে রাউরকেলায় ইস্পাত-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং আরও বহু নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা হইতেছে।

গঙ্গা-বাঁধ পরিকল্পনা (The Ganga-Barrage Project)—বর্তমানে ভাগীরথী নদী খুবই সরু হইয়া গিয়াছে। ৪০০ বৎসর পূর্বে হঠাৎ ভৌগোলিক কোন কারণে গঙ্গা নদীর প্রধান স্রোত ভাগীরথী নদী হইতে পদ্মা নদীর দিকে সরিয়া যায়। ইহার ফলে পদ্মানদী গঙ্গার প্রধান জলস্রোতে পরিণত হয় এবং ভাগীরথীর স্রোতের বেগ কমিয়া যায়। এইজন্য কলিকাতা বন্দরে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃই ভাগীরথী সরু হওয়ায় ভাগীরথী-হুগলী

নদীতে ক্রমাগত পলিসঞ্চয় সুরু হয়। অজয়, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদী বালি, কাদা প্রভৃতি হুগলী নদীতে আনিয়া ফেলে। স্রোতের জোর কম থাকায় হুগলী নদীর পক্ষে এইগুলি সরাইয়া ফেলা কঠিন। ফলে, কলিকাতা বন্দরে জাহাজ আসা দুঃসাধ্য হইল। এখন এই পলিমাটি ড্রেজার যন্ত্রের সাহায্যে সরাইয়া ফেলা হয় এবং পাইলটের (পথিপ্রদর্শক) সাহায্যে সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দরে লইয়া আসিতে হয়। ড্রেজার ও পাইলটের (Pilot) বন্দোবস্ত করিবার জন্য কলিকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠানকে (Calcutta Port Commissioners) কোটি কোটি টাকা খরচ করিতে হয়। নদীতে জলাভাবের জন্য উত্তর ভারতের সহিত কলিকাতার নৌ-চলাচলের অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। জলের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় নদীর জলে লবণের অনুপাত বাড়িয়া গিয়াছে। সেইজন্য কলিকাতার পানীয় জল লবণাক্ত হইয়া যায়। ফলে নানাবিধ রোগ দেখা যায়। এই জল পরিস্রুত করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন বহু অর্থব্যয়ে যে সকল মূল্যবান্ যন্ত্রপাতি কিনিয়া আনে, সেইগুলি লবণাক্ত জলের জন্য তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যায়।

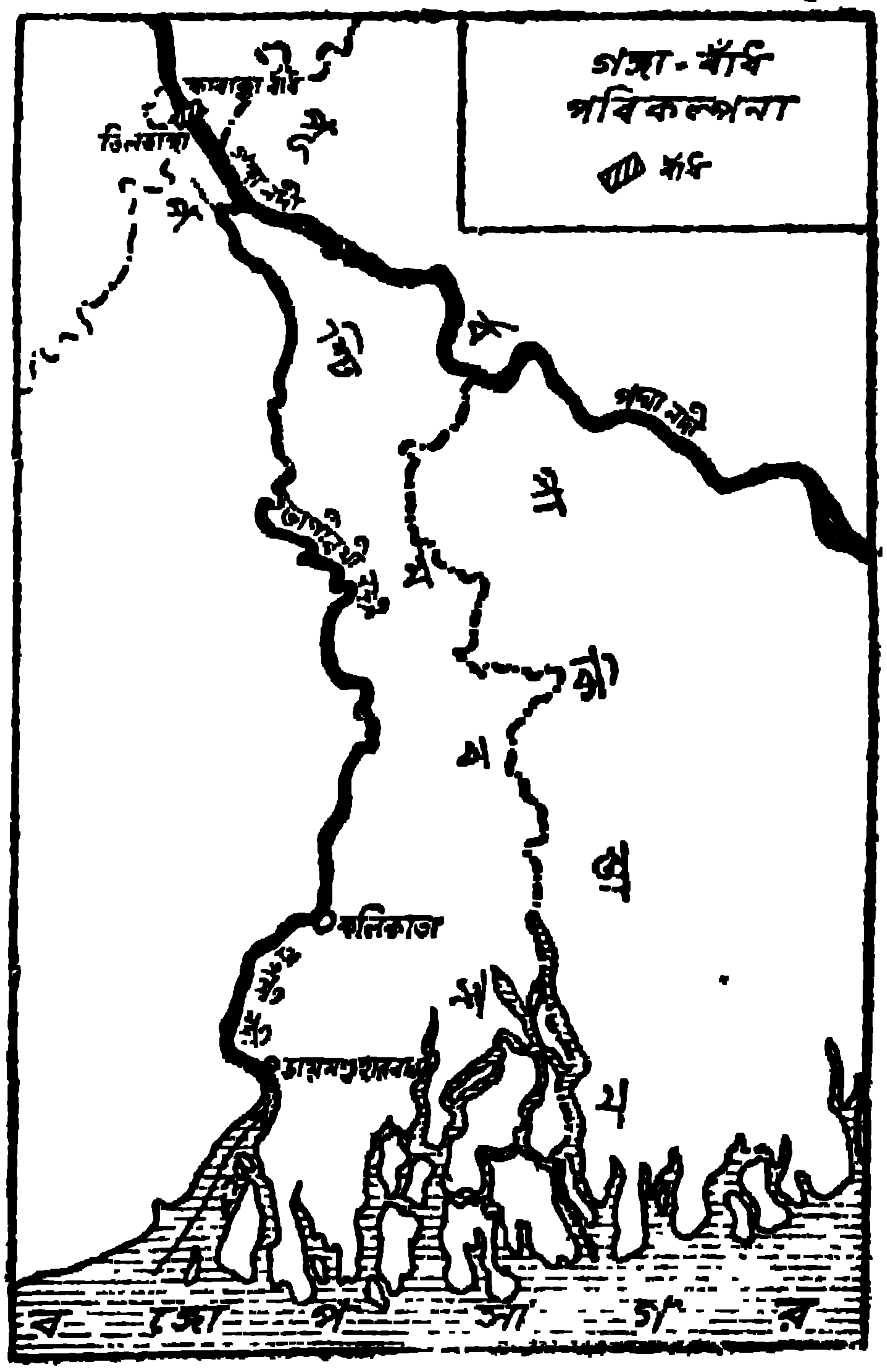

এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য ৪৫ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা ভারত সরকারের নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে

মুর্শিদাবাদ জেলায় ধুলিয়ানের নিকট তিলডাঙ্গা নামক স্থানে গঙ্গার উপর একটি বাঁধ নির্মিত হইবে। এই বাঁধের নাম হইবে **ফারাক্কা বাঁধ (Farakka Barrage)**। এই বাঁধের পিছনদিক হইতে একটি খাল কাটিয়া ভাগীরথী নদীর সহিত সংযুক্ত করা হইবে। ফলে গঙ্গা নদীর প্রধান স্রোত ভাগীরথী নদীতে ফিরিয়া আসিবে এবং ভাগীরথী-হুগলী নদীতে পুনরায় জলবৃদ্ধি হইবে। জলাভাবের দরুন উপরে বর্ণিত যে সকল **অসুবিধা** সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা **দূর** হইবে। ভাগীরথীর জলবৃদ্ধির দরুন পলিমাটি ও বালুচর ধুইয়া সাগরে চলিয়া যাইবে। কলিকাতা বন্দরে ড্রেজার ও পাইলটের প্রয়োজন কমিয়া যাইবে এবং অনেক খরচ বাঁচিয়া যাইবে। কলিকাতার পানীয় জল লবণাক্ত হইবে না; তজ্জনিত রোগ কমিয়া যাইবে এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের জলপরিশোধনের যন্ত্রপাতি সহজে নষ্ট হইবে না। কলিকাতা হইতে উত্তর-ভারতে যাইবার নৌ-চলাচলের সুবিধা হইবে।

বর্তমানে কলিকাতা হইতে রেলপথে বা স্থলপথে সরাসরি উত্তরবঙ্গে যাইবার কোন রাস্তা নেই। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে বাঁধের উপর দিয়া রাস্তা নির্মিত হইবে, **দক্ষিণবঙ্গের সহিত উত্তরবঙ্গের যোগসূত্র** স্থাপিত হইবে এবং কলিকাতা হইতে রেলপথে ও স্থলপথে সরাসরি উত্তরবঙ্গে যাওয়া যাইবে। ভাগীরথী-হুগলী নদীতে জলবৃদ্ধি হইলে **জলসেচের** বন্দোবস্তও করা যাইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বিশেষ প্রয়োজন। এইজন্য ভারত সরকার এই পরিকল্পনাকে তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

কুশী পরিকল্পনা (The Kosi Project)—হিমালয় পর্বতে উৎপন্ন হইয়া নেপাল ও বিহারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কুশী নদী গঙ্গানদীতে পড়িয়াছে। এই নদীকে **বিহারের দুঃখ** বলা হয়। এই নদীর বন্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে; কারণ, নদীর গতিপথ সচরাচর পরিবর্তিত হয়। প্রবল বৃষ্টিপাতে ও বরফ-গলা জলের স্রোতে হঠাৎ বন্যা আসিয়া বহু জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট করে; বন্যাপীড়িত স্থান বালিতে ঢাকিয়া যায় এবং অনুর্বর হয়। বিহারে প্রায় ৭,৬৮০ বর্গ-কিলোমিটার জমি এইভাবে অনুর্বর হইয়াছে।

প্রধানতঃ বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলসেচের ব্যবস্থা এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কুশী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কুশী

নদীর উপর বিহার-নেপাল সীমান্তে হনুমাননগরে একটি সেচ-বাঁধ দেওয়া হইবে। ইহার দুইপার্শ্বে দুইটি খাল কাটিয়া উত্তর বিহারে প্রায় ৫.৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত করা হইবে। পশ্চিম খাল দ্বারা নেপালেরও প্রায় ১১.৭ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। এই বাঁধের সাহায্যে প্রথমাবস্থায় প্রায় ২১,০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

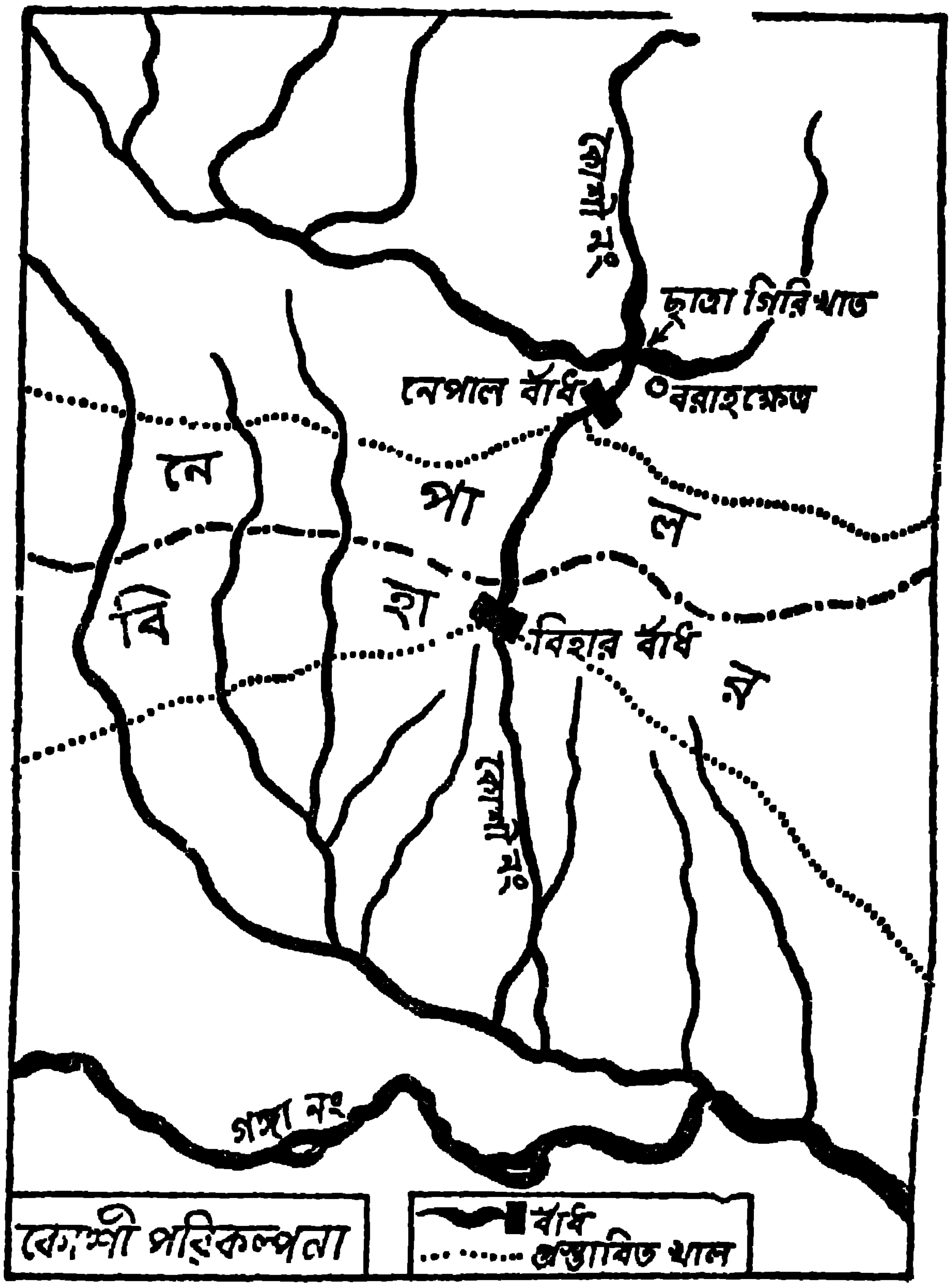

নেপালে ছাত্রা গিরিখাতের নিকট কুশী নদীর উপর ১ ৯ মিটার উচ্চ একটি বাঁধ দেওয়া হইবে। এই বাঁধের দুইদিকে দুইটি খাল কাটিয়া প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত করা হইবে। এই পরিকল্পনায় ১৮ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

এই পরিকল্পনায় মোট ১৭৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। পরিকল্পনাটি অত্যন্ত

বড় বলিয়া ইহাকে সাতটি স্তরে ভাগ করা হইয়াছে ; প্রথম স্তরের কাজের জন্য ৭৬ কোটি টাকা খরচ হইবে। ভারত সরকার প্রথম স্তরের পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা (The Mor Project)—বিহারের দেওঘরের নিকট ত্রিকূট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ময়ূরাক্ষী নদী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়া ভাগীরথী নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিহারের

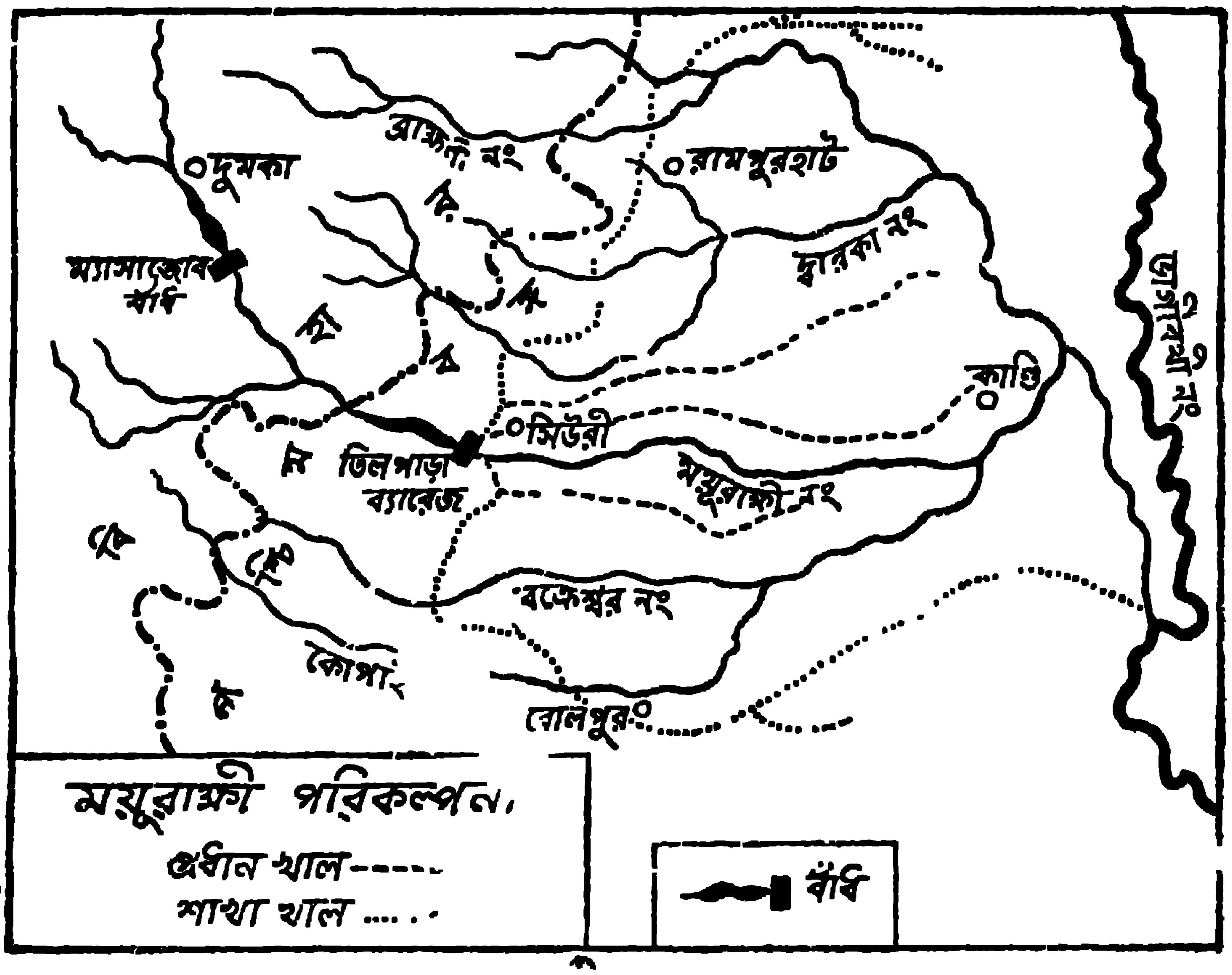

ম্যাসাঞ্জোরে ময়ূবরাক্ষী নদীর উপর একটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। কানাডা সরকারের সহায়তায় এই বাঁধ নির্মিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম কানাডা বাঁধ রাখা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় ৪,০০০ কিলোওয়াট্ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। ইহার ফলে বিহারের দুমকা অঞ্চল বিশেষভাবে উপকৃত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলায় **তিলপাড়ায়** অপর একটি সেচ-বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহার দুইদিকে খাল কাটিয়া বীরভূম জেলায় প্রায় ২·৯১ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহার ফলে প্রতিবৎসর ৩ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে। এই খাদ্যশস্যের মূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক

হইয়াছে, কিন্তু তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির জন্য ব্যয়ের পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস করা হইয়াছে।

ভারতে কৃষি-জমির পরিমাণ ১৩০৮ কোটি হেক্টর—মোট ভূভাগের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ। ভূভাগের অন্যান্য অংশের মধ্যে শতকরা ২২ ভাগ বনভূমি, ১৫ ভাগ পতিত জমি এবং ১৮৫ ভাগ অনাবাদী জমি।

উৎপাদনের সময় অনুসারে ভারতের কৃষিজ দ্রব্যকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—খারিফ ও রবিশস্য। বর্ষাকালের প্রারম্ভে বীজ বপন করিয়া হেমন্তকালে যে শস্য পাওয়া যায়, তাহাকে **খারিফ শস্য** বলে ; যথা, ধান, পাট, তুলা, ইক্ষু, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, তামাক, বাদাম, রেড়ি, তিল প্রভৃতি। শীতকালের শুরুতে বীজ বপন করিয়া যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে **রবিশস্য** বলে ; যথা, গম, যব, মটর, ছোলা, সরিষা, শণ প্রভৃতি।

বিশাল আয়তনের এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু, মৃত্তিকা, লোকবসতি বিদ্যমান থাকায় নানারকমের কৃষি-পদ্ধতি এই দেশে পরিলক্ষিত হয়। অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত (২০০ সেঃ মিঃ-এর অধিক) অঞ্চলে **আর্দ্র কৃষি**-পদ্ধতি অনুসারে ধান, পাট, চা, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ হয়। মাঝারি বৃষ্টিপাতযুক্ত (১০০-২০০ সেঃ মিঃ) অঞ্চলে **স্বল্পার্দ্র কৃষি**-পদ্ধতিতে গম, ভুট্টা, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতির চাষ হয়। অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত (৫০-১০০ সেঃ মিঃ) অঞ্চলে **সেচ কৃষি**-প্রথায় গম, তুলা, ইক্ষু ও ভুট্টার চাষ হইতে পারে। প্রায় বৃষ্টিহীন (৫০ সেঃ মিঃ-এর কম) অঞ্চলে **শুষ্ক কৃষি**-প্রথায় জোয়ার, বাজরা, ডাল প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। মৃত্তিকা ও জলবায়ুর তারতম্যের জন্য সকল অঞ্চলে সমানভাবে কৃষিকার্যের উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই। পূর্ব মহারাষ্ট্রে এবং মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশে কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য স্থানের মৃত্তিকা অনুর্বর বলিয়া কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। আসামের পার্বত্য অঞ্চল ও বনভূমিতে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য এই রাজ্যের অন্যান্য কয়েকটি জেলায় চা-এর আবাদ ব্যতীত কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। রাজস্থানের শুষ্ক অঞ্চলে জলাভাবে কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন করা কঠিন। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে সুসংগঠিতভাবে কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন করা কষ্টকর।

ভারতের কৃষি-সমস্যা ও ইহার সমাধান (India's Agricultural Problem and its Solution)—ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও এখানকার

কৃষি-পদ্ধতি এখনও অত্যন্ত প্রাচীন। ইহার ফলে ভারত এখনও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। ভারতের বিভিন্ন শিল্প কৃষিজ দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল ; যথা, পাটশিল্প, চিনিশিল্প, কার্পাসবয়ন-শিল্প প্রভৃতি। এই সকল শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইলে কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। রপ্তানি-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতে হইলেও কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ; কারণ ভারত প্রচুর কৃষিজ দ্রব্য বা এই সকল জিনিসের উপর নির্ভরশীল শিল্পদ্রব্য রপ্তানি করে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিকার্যের ভূমিকা এতটা গুরুত্বপূর্ণ হইলেও এখনও এই দেশ কৃষি-ব্যবস্থায় অত্যন্ত অনগ্রসর। মোট জমির অনুপাতে এখানকার কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন অত্যন্ত কম। ভারতের কৃষিকার্যে আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত **কারণসমূহ** প্রধানতঃ দায়ী :

(ক) ভারতের কৃষিকার্যের প্রধান সমস্যা এই যে, এখানে কৃষিজ দ্রব্যের **হেক্টর-প্রতি উৎপাদন** অত্যন্ত কম। সময়মতো পর্যাপ্ত জলের অভাব, জমির উর্বরাশক্তির অভাব এবং সারের অপ্রতুলতা, উৎকৃষ্ট বীজের সরবরাহে সুবন্দোবস্তের অভাব, কৃষিজমি-বণ্টনে অব্যবস্থা এবং কৃষকের শিক্ষার অভাব ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা প্রভৃতির জন্য এই দেশের কৃষির উন্নতি আশানুরূপ হয় নাই। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণের ফলে সম্প্রতি ভারতের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন কিছুটা বাড়িয়াছে।

বিভিন্ন দেশে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন (সহস্র কিলোগ্রাম)

	গম	ধান	তুলা		গম	ধান	তুলা
রাশিয়া	১'২	—	'৭০	চীন	১'২	২০'৭	'১১
ফ্রান্স	২'৫	—	—	জাপান	২'৫	৪'৮	—
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	১'৭	৩'৮	'৫০	বৃটেন	৩'৫	—	—
পঃ জার্মানী	৩'৬	—	—	ভারত	'৮	১'৫	'১৩

হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বাড়াইতে হইলে উন্নত ধরনের কৃষি-ব্যবস্থা এবং চাষীর সহযোগিতা ও আন্তরিকতা একান্ত প্রয়োজন। চাষীর সহযোগিতা পাইতে হইলে ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা দরকার। এখনও অধিকাংশ চাষী অন্যের জমিতে দিন-মজুর হিসাবে কাজ করে। দিনের শেষে তাহার প্রাপ্য মজুরি পাইয়া সে বিদায় লয়। স্বভাবতঃই কৃষির হেক্টর-প্রতি উৎপাদন-বৃদ্ধিতে চাষীর স্বার্থ থাকে না। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে,

সর্বক্ষেত্রে চাষের জমি চাষীকে দিতে হইবে। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন নীতিগতভাবে এই কথা স্বীকার করিলেও অধিকাংশ স্থানে এখনও এই নীতি কার্যে পরিণত হয় নাই। যতদিন চাষী জমি না পাইবে, যতদিন চাষী না জানিবে যে জমির উৎপাদিত ফসলের মালিক সে ছাড়া আর কেউ নয়, ততদিন আশানুরূপ হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বাড়ানো অসম্ভব। হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বাড়াইতে হইলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে সার-প্রয়োগের ও জলসেচের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট ধরনের বীজ কৃষককে সরবরাহ করিবার এবং বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতিতে কৃষককে শিক্ষিত করিবার দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। এইসব ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিলেই অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও হেক্টর-প্রতি উৎপাদন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজ দ্রব্যের মোট উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে।

(খ) ভারতে জনপ্রতি কৃষি-জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম—মাত্র ·৪২ হেক্টর; এই দেশের পরিবার-প্রতি কৃষি-জমির পরিমাণ মাত্র ৩ হেক্টর। কিন্তু অন্যান্য দেশে ইহার পরিমাণ অনেক বেশী। প্রতি পরিবারে কৃষি-জমির পরিমাণ নিউজিল্যাণ্ডে ১৯৬ হেক্টর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮৬ হেক্টর, বৃটেনে ২৬ হেক্টর এবং ডেনমার্কে ১৫ হেক্টর। উত্তরাধিকার-প্রথা অনুসারে ভারতে **কৃষি-জমির আয়তন** ক্রমশঃই কমিয়া যায়। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উন্নত ধরনের চাষ করিতে হইলে কৃষি-জমির আয়তন বড় হওয়া প্রয়োজন। কৃষি-জমির আয়তন ক্রমশঃ কমিয়া যাওয়ায় কৃষকদের পক্ষে ক্ষুদ্র আয়তনের জমি চাষ করিয়া সংসার চালানো কঠিন। ফলে বহু কৃষক গ্রাম ছাড়িয়া শহরাঞ্চলের কারখানায় চলিয়া আসিয়াছে। এইজন্য ভূমির একত্রীকরণ একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে সমবায় প্রথায় চাষের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। **সমবায়-কৃষি (Co-operative Farming)** দেশে প্রবর্তিত হইলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। সমবায়ের মাধ্যমে শুধু যে জমির একত্রীকরণ সম্ভব হইবে তাহাই নহে, এই ব্যবস্থায় উৎকৃষ্ট বীজ ও সার সংগ্রহে সুবিধা হইবে, গরীব চাষীকে অত্যধিক হারের সুদে টাকা ধার করিতে হইবে না এবং সমবায়ের মারফত বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ-আবাদ করিয়া হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইবে। বর্তমানে কৃষিজ দ্রব্য বাজারে অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় হইলেও ইহার অল্প অংশই কৃষকের হাতে আসে; কারণ মজুতদার ও ব্যবসায়িগণ বিভিন্ন কৌশলে

অল্পমূল্যে কৃষকের নিকট হইতে কৃষিজ পণ্য ক্রয় করিয়া গুদামজাত করে। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকগণ ন্যায্যমূল্যে শস্যাদি বিক্রয় করিতে পারে।

(গ) ভারতে **ভূমিক্ষয়ের** দরুন বহু জমি পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ভূমির উপরের অংশ উর্বর। বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি ভূমির উপরের অংশ অন্যত্র সরাইয়া লয়। ইহাতে ভূমি অনুর্বর হয়। ভারতের প্রায় ১'২ কোটি হেক্টর জমি এইভাবে কৃষির অযোগ্য হইয়া পড়িয়া আছে। এই ভূমিক্ষয়ের প্রতিকার না করিলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে না। বৃক্ষ-রোপণ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ, কৃষি-জমিতে পশুচারণ নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে ভূমিক্ষয় রোধ করা যাইতে পারে।

(ঘ) **প্রাকৃতিক কারণে** (বন্যা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির জন্য) কৃষির উৎপাদন ব্যাহত হয়। এইজন্য বন্যা-নিয়ন্ত্রণের ও জলসেচের বন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, যথা—দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনা, মহানদী পরিকল্পনা, ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা ইত্যাদি। এই সকল পরিকল্পনায় জলসেচ, বিদ্যুৎ-উৎপাদন ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ভারতের জলসেচের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা নগণ্য। কারণ, ইহাতে মোট কৃষি-জমির মাত্র এক-পঞ্চমাংশ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। সুতরাং জলসেচের পরিকল্পনা যাহাতে আরও কার্যকর করা যায় তাহার বন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

(ঙ) ভারতের **চাষীরা** অধিকাংশই **অশিক্ষিত**। ইহারা দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে শিখে নাই। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের প্রথা সম্বন্ধে ইহাদের এখনও সম্যক্ ধারণা নাই। সুতরাং চাষীর শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে ইহা কৃষির উন্নতির সহায়ক হইবে।

এই সকল কারণে ভারতে কৃষিকার্যের আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ায় এই দেশে খাদ্যসমস্যা সর্বদাই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। খাদ্যসমস্যা ভারতের একটি প্রাচীন সমস্যা; স্বাধীনতার পূর্বেও (দেশ বিভক্ত হইবার পূর্বে) এই সমস্যা বিদ্যমান ছিল। এখনও ভারতের শতকরা ১২ জন লোকের খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। দেশের শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-শস্যের চাহিদাও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার জন্যও কৃষিকার্যের উন্নতি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। অনেক অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন যে, ভারতের কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি (ট্রাক্টর, হারভেস্টার প্রভৃতি) ব্যবহার করিয়া উৎপাদন

বৃদ্ধি করা দরকার। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ভারতে জনসংখ্যা প্রচুর এবং এখানে লোকাভাবে কৃষির উন্নতি ব্যাহত হয় না। **কৃষি-যন্ত্রপাতি** ব্যবহারে হেক্টর-প্রতি উৎপাদনও বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কম লোক দ্বারা কৃষিকার্য করা সম্ভব এবং ইহাদ্বারা জনপ্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, হেক্টর-প্রতি নহে। রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশে শিল্পে লোকের যোগান দিবার জন্য কৃষিক্ষেত্র হইতে লোক সরাইবার পন্থা হিসাবে কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। ভারত ও চীনের মতো অত্যধিক ঘনবসতিযুক্ত অঞ্চলে কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা মোটেই সমীচীন নহে। এইজন্য চীনে কৃষি-যন্ত্রপাতির ব্যবহার নাই বলিলেই চলে। অবশ্য পতিত জমি উদ্ধারের জন্য, বা জনহীন অঞ্চলে চাষের উন্নতির জন্য কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা উচিত।

ভারতীয় কৃষি ও খাদ্যসমস্যা (Indian Agriculture and Food Problems)—ভারত একটি কৃষি-সমৃদ্ধ দেশ হইলেও এবং ইহার শতকরা ৮৬ ভাগ কৃষি-জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইলেও ভারত এখনও খাদ্যে স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই। এখনও প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হইয়া থাকে। ১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে পৃথক হইবার পর হইতেই খাদ্যে ঘাটতি আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় খাদ্যসমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে এবং বহুস্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির চেষ্টা হইলেও, ইহা সর্বদা বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জনপ্রতি ·৫৪ কিলোগ্রাম বা ২,৪৫৯ ক্যালরি পরিমিত খাদ্য হিসাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য উৎপাদন-লক্ষ্য ছিল ৮·০৫ কোটি টন; কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছে ৭·৬০ কোটি টন। জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যসমস্যা আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে ১৯৫০-৫১ সালে **খাদ্যশস্যের উৎপাদন** ছিল ৫·২২ কোটি টন; ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫-৫৬ সালে ৬·৫৮ কোটি টন এবং ১৯৬০-৬১ সালে ৭·৬৬ কোটি টনে দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ উৎপাদন দশ বৎসরে শতকরা ৪৬ ভাগ বাড়িয়াছে। কিন্তু জনসংখ্যা প্রায় সমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যসমস্যার সমাধান হয় নাই। সেইজন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য করা হইয়াছে ১০ কোটি টন; ইহার মধ্যে চাউল ৪·৫ কোটি টন, গম ১·৫ কোটি টন, ডাল ১·৭ কোটি টন

এবং ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, যব প্রভৃতি ২'৩ কোটি টন। ১৯৬০-৬১ সালে জনপ্রতি দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ ছিল '৪৫ কিলোগ্রাম; তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহা বাড়াইয়া করা হইবে '৫০ কিলোগ্রাম। ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও বৃদ্ধির হার মাত্র বৎসরে ৩'২%। ইহা জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হারের তুলনায় যথেষ্ট নহে। খাদ্যশস্য-বৃদ্ধির হার না বাড়াইলে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষেও ভারতকে বৎসরে ১ কোটি টন খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইতে পারে।

ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (কোটি টন) *

১৯৪৯-৫০	৫'৭৬	১৯৫৭-৫৮	৬'২৫	১৯৬৩-৬৪	৭'৯৪
১৯৫০-৫১	৫'২২	১৯৫৮-৫৯	৭'৫৫	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	১০
১৯৫৫-৫৬	৬'৫৮	১৯৫৯-৬০	৭'১৭		
১৯৫৬-৫৭	৬'৮৮	১৯৬০-৬১	৭'৬০		

ভারতের খাদ্যসমস্যা পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে সমাধান করা খুবই কঠিন বলিয়া মনে হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করা হইয়াছে (৩৫৫ পৃঃ)। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারের খাদ্যনীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে ; ফলে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য ভারতকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হইতেছে। ভারতে খাদ্যশস্য আমদানী হয় প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ব্রহ্মদেশ হইতে।

খাদ্যশস্যের আমদানি (লক্ষ টন)

১৯৫১	৪৭'২৫	১৯৫৫	৭	১৯৫৮	৩১'৭৮
১৯৫৩	২০'০৩	১৯৫৭	৩৫'৮	১৯৫৯	৩৮'০৭

ভারতে খাদ্যসমস্যার **সমাধান** করিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন :

(ক) ভারতে প্রায় ২'১৭ কোটি বর্গ কিলোমিটার কর্ষণযোগ্য পতিত জমি আছে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও এই পরিমাণ জমি অনাবাদী থাকা জাতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক। যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতি প্রচলন করিয়া এবং জলসেচ, উন্নত ধরনের বীজ ও সারের সাহায্যে এই সকল পতিত জমিতে নিশ্চয়ই খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা যায়। বহু পতিত জমি ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য অনাবাদী থাকে। ধান এবং মশা-সৃষ্টির প্রাকৃতিক পরিবেশ একই প্রকার। সুতরাং যেখানে মশা বেশী, সেখানেই ধান

* Source—Third Five-Year Plan.

উৎপন্ন হইতে পারে। রোগে মানুষের স্বাস্থ্য খারাপ হয়, জমির নহে। সুতরাং মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত করিলেই এই সকল পতিত জমিতে চাষ-আবাদ করা যায়। (খ) বহু অঞ্চলে জলাভাবে কৃষিকার্যের উন্নতি হইতেছে না। জলসেচের মাধ্যমে জল সরবরাহ করিলে এই সকল স্থানে অধিক শস্য উৎপন্ন করা যায়। (গ) হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিলেও খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে। হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন (৩৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। (ঘ) খাদ্যের পরিবর্ত-সামগ্রীর প্রচলন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আলু, টপিয়োকা, বাদাম প্রভৃতির মধ্যেও খাদ্যপ্রাণ বিদ্যমান। খাদ্যের এইসব পরিবর্ত-সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করিলেও খাদ্যশস্যের অভাব কিছুটা মিটানো যায়।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ, উৎকৃষ্ট বীজের সরবরাহ, কৃষি-সরঞ্জামের উৎপাদন, সারের উৎপাদন, জলসেচের বন্দোবস্ত প্রভৃতি পন্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভারতের কৃষি ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Indian Agriculture and Five-Year Plans)—ভারত কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন সর্বদাই কৃষিকার্যের উন্নতির দিকে নজর রাখিয়াছে। বিশেষতঃ কৃষিকার্যের উন্নতির মাধ্যমে খাদ্যশস্যে স্বাবলম্বী হওয়া পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। **প্রথম পরিকল্পনায়** (১৯৫১-৫৬) খাদ্যশস্য ও শিল্প-শস্য উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য এই পরিকল্পনায় ১৯৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য, রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ ২·৭৫ লক্ষ টন হইতে বাড়াইয়া ৬·১ লক্ষ টন করিবার জন্য, ট্রাক্টরের সাহায্যে ৯·৬ লক্ষ হেক্টর পরিমিত জমির পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের জন্য, কৃষি-জমির আয়তন বৃদ্ধি করিবার জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৫·২২ কোটি হইতে ৬·৫৮ কোটি টনে, তৈলবীজ ৫১ লক্ষ টন হইতে ৫৬ লক্ষ টনে, ইক্ষু (গুড়) ৫৬ লক্ষ টন হইতে ৬০ লক্ষ টনে, তুলা ২৯ লক্ষ গাঁট হইতে ৪০ লক্ষ গাঁটে এবং পাট ৩৩ লক্ষ গাঁট হইতে ৪২ লক্ষ গাঁটে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৬-৬১) কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ৮·০৫ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করিয়া

খাদ্যে স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যবস্থা হইলেও ১৯৬০-৬১ সালে প্রকৃত উৎপাদন হয় ৭·৬ কোটি টন। শিল্প-শস্যের উৎপাদনের উপরও অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই পরিকল্পনায় কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য খরচ হইয়াছে ২৯০ কোটি টাকা, কিন্তু এই পরিকল্পনায় প্রায় কোন ক্ষেত্রেই উৎপাদন-লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভবপর হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ রাজ্য সরকারসমূহের অকর্মণ্যতা, বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে সার-উৎপাদনে ব্যাঘাত-সৃষ্টি এবং কৃষকের হাতে জমি ছাড়িয়া দিতে বিলম্ব প্রভৃতি।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন (লক্ষ টন)

	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১ লক্ষ্য	১৯৬০-৬১ উৎপাদন		১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১ লক্ষ্য	১৯৬০-৬১ উৎপাদন
খাদ্যশস্য	৬৫৮	৮০৫	৭৬০	পাট (লক্ষ গাঁট)	৪২	৫৫	৪০
তৈলবীজ	৫৬	৭৬	৭১	তূলা (,,)	৪০	৬০	৫৪
ইক্ষু (গুড়)	৬০	৭৮	৮০	চা (সহস্র মেঃ টন)	২৯০	৩১৭	৩১৭

এই পরিকল্পনায় ৬৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ৮০ লক্ষ হেক্টর জমির মৃত্তিকা সংরক্ষণ করা হইয়াছে, ৫·৮ লক্ষ হেক্টর পতিত জমি উদ্ধার করা হইয়াছে এবং ৩ লক্ষ টন রাসায়নিক সার (N ও P_2O_5) কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সারের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া, কৃষি-বিভাগসমূহের কার্যকারিতা ও সংগঠন এবং সমবায় আন্দোলন শক্তিশালী করিয়া, সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের মাধ্যমে কৃষককে সাহায্য দিয়া, জলসেচ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য এই পরিকল্পনায় বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে ১,২৮১ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে জলসেচের জন্য ৭৭৬ কোটি টাকা, কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য ২২৬ কোটি টাকা, মৃত্তিকা-সংরক্ষণের জন্য ৭৩ কোটি টাকা, সমবায় আন্দোলনের জন্য ৮০ কোটি টাকা এবং সমষ্টি উন্নয়নের জন্য ১২৬ কোটি টাকা খরচ হইবে। এই পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ৩০% এবং অন্যান্য শস্য ৩১%।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকার্যের উন্নতির লক্ষ্য (১৯৬৫-৬৬)*

জলসেচ	১·০২ কোটি হেক্টর	খাদ্যশস্য	১০ কোটি টন
মৃত্তিকা-সংরক্ষণ		তৈলবীজ	৯৮ লক্ষ টন
ও জমি-উদ্ধার	১·৪৭ কোটি হেক্টর	ইক্ষু (গুড়)	১ কোটি টন
সার ব্যবহার (N)	১০ লক্ষ টন	তূলা	৭০ লক্ষ গাঁট
সার ব্যবহার		পাট (**)	৬২ লক্ষ গাঁট
(P_2O_5)	৪ লক্ষ টন	তামাক	৩·২ লক্ষ টন
সবুজ সার	১·৬৪ কোটি হেক্টর	চা	৯০ কোটি পাউণ্ড
		কফি	৮০ হাজার টন
		রবার	৪৫ হাজার টন

তৃতীয় পরিকল্পনায় হেক্টর-প্রতি উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য জলসেচ-ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজের সরবরাহ এবং সার-প্রয়োগের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে এই পরিকল্পনার শেষে ১৯৬৫-৬৬ সালে বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্যের **হেক্টর-প্রতি উৎপাদন** এইরূপ দাঁড়াইবার কথা ছিল (কিলোগ্রামে):—

চাউল	১,১৬৮	ইক্ষু (গুড়)	৪,৩০৫	তূলা	১২৩
গম	৯০৩	তৈলবীজ	৫৭০	পাট	১,৩৬৪

তৃতীয় পরিকল্পনায় জনপ্রতি খাদ্যশস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে জনপ্রতি খাদ্যের পরিমাণ ছিল ·৪৫ কিলোগ্রাম; ১৯৬৫-৬৬ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ·৫০ কিলোগ্রামে দাঁড়াইবে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি ছাড়াও, আবাদী-চাষের (চা, কফি, রবার) উন্নতির জন্য, রেশমের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য পরিবর্ত-খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্য, কৃষিজ দ্রব্য বিক্রয়ের ও মজুতের সুব্যবস্থার জন্য, কৃষি-বিদ্যা ও কৃষি-গবেষণার উন্নতি সাধনের জন্য, সরকারী খামার প্রতিষ্ঠার জন্য, কৃষিজ দ্রব্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

* Source—Third Five-Year Plan.

** ১৩ লক্ষ গাঁট মেস্তা ব্যতীত।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম চার বৎসরে সরকারের খাদ্য-পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। ধান উৎপাদনের পরিমাণ খুবই নগণ্য। ৪ বৎসরে শতকরা ৭ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র শতকরা এক ভাগ। অবশ্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় ১৯৬৩-৬৪ সালের উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও, মজুতদারদের জন্য জনসাধারণ তাহা ভোগ করিতে পারে নাই। গমের ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্রমশঃ কমিয়া চলিয়াছে, হেক্টর-প্রতি উৎপাদনও কমিতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শুরুতে গমের যে উৎপাদন হইত, ১৯৬৩-৬৪ সালে তাহা অপেক্ষা শতকরা ১৮ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। হেক্টর-প্রতি উৎপাদনও শতকরা ৮ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ইহা আমাদের দেশের পক্ষে লজ্জার কথা, ইহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রেও প্রায় একই বক্তব্য বলা যায়।

খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে উৎপাদন প্রচুর হইলেও দেশে খাদ্যাভাব দেখা যায়। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৬৩-৬৪ সালে ধান ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও আমদানি বেশী হইলেও দেশের অর্থপিশাচ ব্যবসায়িগণ খাদ্যশস্য মজুত করিয়া কৃত্রিম খাদ্য-সমস্যার সৃষ্টি করিয়া এবং খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি করিয়া প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠনের চেষ্টা করে। সরকার যদিও কঠোর হস্তে ইহাদের দমন করে নাই, তবুও জনসাধারণকে ইহাদের হাত হইতে কিছুটা বাঁচাইবার জন্য ১৯৬৪ সালে Food Corporation Act পাস করিয়া নিজেই খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করিবার জন্য ব্রতী হয়। অবশ্য মুনাফাখোরদের চাপে সরকার প্রকৃতপক্ষে এব্যাপারে কতটা অগ্রসর হইতে পারিবেন, তাহা সন্দেহজনক।

ধান (Rice)

খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ সালের পূর্বেও ভারতে ধান-চাষের প্রচলন ছিল বলিয়া অথর্ববেদে উল্লেখ আছে। ধান উৎপাদনের উপযোগী সকল প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থা (প্রথম খণ্ডের 'কৃষিজ সম্পদ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ভারতে বিদ্যমান। এইজন্য ধান উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে; চীনের পরেই ভারতের স্থান। ভারতের পার্বত্য অঞ্চলেও ধান উৎপন্ন হয়। পার্বত্য ধানই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এখানকার সমতলভূমির ধান অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হইলেও ইহার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী; পার্বত্য ধানের

পরিমাণ নগণ্য। দেরাদুন ও কাঙরা অঞ্চলে এই ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতের সমতলভূমিতে তিনপ্রকার ধান উৎপন্ন হয়; যথা—আউশ, আমন ও বোরো। বিভিন্ন জলবায়ুতে বিভিন্ন প্রকার ধান উৎপন্ন হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে কম বৃষ্টিপাত হইলে **আউশ** ধান এবং বসন্তকালে বেশী বৃষ্টিপাত হইলে **আমন** ধানের চাষ করা হয়। আমন ধান উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং আউশ ধান অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। **বোরো** ধান আরও নিকৃষ্ট শ্রেণীর। শীতকালে অনুর্বর জমিতেও ইহার চাষ হয়।

ভারতে প্রধানতঃ দুইভাবে ধানের চাষ হইয়া থাকে—বপন প্রথায় ও রোপণ প্রথায়। **বপন** প্রথায় বর্ষাকালে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। বর্ষার শেষে গাছ পুষ্ট হইলে ধানগাছের পরিপক্ক শীষ কাটিয়া লওয়া হয়। **রোপণ** প্রথায় প্রথমে অল্প একখণ্ড জমিতে বীজ বপন করিয়া ধানগাছের চারা সৃষ্টি করা হয়। বৃষ্টিপাতের পরে এই চারা তুলিয়া বিস্তীর্ণ কর্দমাক্ত কৃষিক্ষেত্রে হাতে রোপণ করিতে হয়। ইহাতে প্রচুর কৃষি-মজুরের প্রয়োজন হয়। ভারতের কৃষি-মজুরের অভাব না থাকায় এইজাতীয় ধান-চাষ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভারতে প্রচুর ধান হয় বলিয়া কোন বৎসরে অসময়ে বা অপরিমিত বৃষ্টিপাত হইলে, ধান-চাষ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দাক্ষিণাত্য ও পূর্ব-ভারতে চাউল মানুষের প্রধান খাদ্য। ধান উৎপাদনের উপযোগী জলবায়ুও এই অঞ্চলে বিদ্যমান। ভারত মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া ধান-চাষের প্রাকৃতিক অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেও বিভিন্ন **সমস্যা** থাকায় ধান উৎপাদনের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। সেইজন্য ভারত এখনও ধান উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই। ধান-চাষের প্রধান সমস্যা এই যে, এখানে **হেক্টর-প্রতি উৎপাদন** অত্যন্ত কম। চীনে হেক্টর-প্রতি ২,৭০০ কিলোগ্রাম ধান উৎপন্ন হয়; কিন্তু ভারতে উৎপন্ন হয় মাত্র ১০২৯ কিলোগ্রাম। পূর্বে ভারতে হেক্টর-প্রতি ধান উৎপাদনের পরিমাণ আরও কম ছিল। ১৯৫৩ সালে ধান-চাষে **জাপানী পদ্ধতি** প্রবর্তনের ফলে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বর্তমানে কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রথায় প্রতি বর্গমিটার জমিতে প্রায় ·৫ কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়া সাল্‌ফেট ও সুপার ফস্‌ফেট নামক রাসায়নিক সার দিয়া চারা গাছ সারিবদ্ধভাবে লাগাইতে হয়। দুইটি গাছের দূরত্ব সর্বদা সমান রাখিতে হয়। প্রথমে ১·৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে এই পদ্ধতি

প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে প্রায় ৪০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জাপানী প্রথায় চাষ হওয়ায় অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ মেঃ টন ধান উৎপন্ন হইতেছে।

ধান-চাষের দ্বিতীয় সমস্যাটি হইতেছে কৃষকের ধান-বিক্রয়ের অসুবিধা। ধান পাকিবার পূর্বেই কৃষক মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার করে। পরে মহাজনকে অত্যন্ত অল্পমূল্যে ধান বিক্রয় করিতে হয়। ইহার ফলে ধান চাষ করিয়া কৃষকের বিশেষ লাভ হয় না এবং ধান-চাষে সে বিশেষ উৎসাহিত হয় না। সমবায় প্রথার মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার এবং ন্যায্যমূল্যে ধান বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে এই সমস্যার সমাধান করা যায়।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই কমবেশী ধান-উৎপাদন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, উড়িষ্যা ও কেরালা রাজ্যে-ধান উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশী। ভারতে মোট ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান-চাষ হয়।

ভারতে চাউল-উৎপাদন (১৯৬৪-৬৫) ৩৬৬ লক্ষ মেঃ টন

	লক্ষ হেক্টর	লক্ষ মেঃ টন		লক্ষ হেক্টর	লক্ষ মেঃ টন
পশ্চিমবঙ্গ	৪৫	৫৩	অন্ধ্র	২৭	৪২
বিহার	৫৪	৪৭	মধ্যপ্রদেশ	৪০	৩১
উড়িষ্যা	৩৭	৪২	উত্তরপ্রদেশ	৪১	৩০
মাদ্রাজ	২৪	৩৬	আসাম	১৭	১৮

পশ্চিমবঙ্গের পাললিক মৃত্তিকা ও প্রচুর বৃষ্টিপাত ধান-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া এই রাজ্য ধান-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। এখানকার বর্ধমান, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব দিনাজপুর, নদীয়া ও কুচবিহার জেলায় অধিকাংশ ধান উৎপন্ন হয়। **উড়িষ্যার** কটক, পুরী ও সম্বলপুর জেলায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। **দাক্ষিণাত্যে** পশ্চিম গোদাবরী, চিংলিপুট, তাঞ্জোর ও কানাড়া জেলায় প্রচুর ধান পাওয়া যায়। পূর্বে দেশের পূর্বাংশে ও দক্ষিণাংশে অধিকাংশ ধান উৎপন্ন হইত। কিন্তু উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, দেশের উত্তরাংশে, মধ্যমাংশে এবং পশ্চিমাংশেও প্রচুর ধান উৎপন্ন হইতেছে।

বাণিজ্য—পশ্চিমবঙ্গে সর্বাপেক্ষা বেশী চাউল উৎপন্ন হইলেও স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত বেশী বলিয়া এই রাজ্য পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যা ও অন্যান্য রাজ্য

হইতে প্রচুব চাউল আমদানি কবে। মাদ্রাজ, বিহাব, মহাবাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশে আটা ও ময়দা ব্যবহৃত হয় বলিয়া চাউলের ঘাটতি দেখা যায় না। অধিকাংশ ধান স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয় হয় বলিয়া বাণিজ্যেব জন্য প্রাপ্ত চাউলের

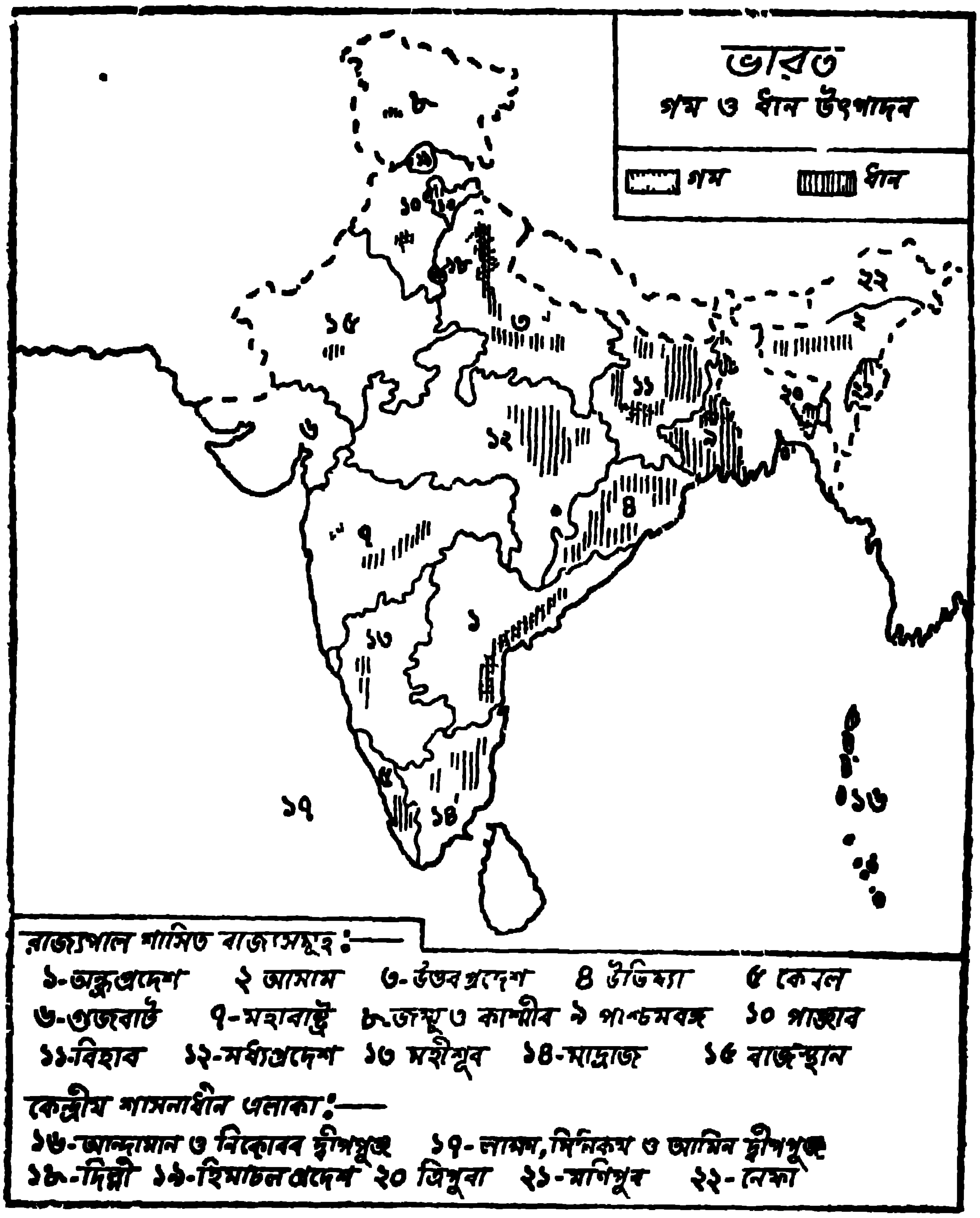

পবিমাণ খুব কম। উড়িষ্যা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশ অতিবিক্ত চাউল উৎপন্ন কবে বলিয়া ইহাবা অন্যান্য বাজ্যে, প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে চাউল প্রেবণ কবে।

ভাবতে আভ্যন্তবীণ চাউল-ব্যবসায়েব প্রধান সমস্যা এই যে, মজুতদাবগণ বিভিন্ন কৌশলে কৃষকদেব নিকট হইতে চাউল ক্রয় কবিয়া গুদামজাত কবে এবং অস্বাভাবিকভাবে চাউলের মূল্য বাড়াইয়া দেয়। সেইজন্য ১৯৫৯ সালে

ধান-উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশী হইলেও পশ্চিমবঙ্গে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং চাউল-ব্যবসায়িগণ মানুষকে প্রায় দুর্ভিক্ষের কিনারায় লইয়া যায়। সরকার মাঝে মাঝে চাউল-ব্যবসায় কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করিলেও মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য সম্বন্ধে অসাধু ব্যবসায়িগণকে কখনই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে নাই। ইহার একমাত্র সমাধান চাউলের ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে সরকার-নিয়ন্ত্রিত 'স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনে'র হাতে ছাড়িয়া দেওয়া।

ভারতে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও চাহিদার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য এখনও ভারতকে প্রায় ১০ লক্ষ টন চাউল ব্রহ্মদেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ড হইতে আমদানি করিতে হয়। ধানের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে যে জলসেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা দ্বারা চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ, দামোদর, কুশী, ময়ূরাক্ষী ও হীরাকুদ পরিকল্পনার ধান-চাষের উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর। আশা করা যায়, শীঘ্রই হয়তো ভারতের প্রধান খাদ্যশস্যের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধান-চাষের উন্নতির জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং চাউলের উৎপাদন-লক্ষ্য নির্ধারিত হইয়াছে ৪৫০ লক্ষ টন।

চাউল উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (লক্ষ টন)

১৯৫০-৫১	২০৯	১৯৬০-৬১	৩৫০
১৯৫৫-৫৬	২৭১	১৯৬৪-৬৫	৩৬৫
		১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	৪৫০

গম (Wheat)

মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতার ইতিহাসে ভারতের গম-চাষের নিদর্শন পাওয়া যায়। গম উৎপাদনের উপযোগী সকল প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থা (প্রথম খণ্ডের 'কৃষিজ সম্পদ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান। ভারতে দুইপ্রকার গম উৎপাদিত হয়—সাধারণ রুটির উপযুক্ত গম এবং ম্যাকারোণি গম। এঁটেল মাটিতে জলসেচের সাহায্যে পাঞ্জাব ও উত্তর-প্রদেশে রুটির উপযোগী গম প্রচুর জন্মে। মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ এবং অন্ধ্রের পশ্চিমাংশের কৃষ্ণমৃত্তিকায় বৃষ্টিপাতের জলের সাহায্যে ম্যাকারোণি গম

উৎপন্ন হয়। ভারতে প্রধানতঃ দুইটি ঋতুতে গম উৎপন্ন হয়—শীতকালে ও বসন্তকালে। শীতকালীন গমের প্রথমাবস্থায় কম উত্তাপ ও পাকিবার সময় অধিক উত্তাপ প্রয়োজন হয়। এইজন্য নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ইহার চাষ হয় এবং মার্চ-এপ্রিল মাসে শস্য কাটা হয়। ভারতের অধিকাংশ গম এইভাবে চাষ হইয়া থাকে। বাসন্তিক গম-চাষ হয় এপ্রিল মাসে এবং শস্য তোলা হয় আগস্ট মাসে। এই দেশে ৪ মাস হইতে ৬ মাসের মধ্যে গম পাওয়া যায়। গম-চাষের জন্য প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন। কারণ ভূমিকর্ষণ, বপন, শস্য-তোলা প্রভৃতি সকল কাজই মানুষের সাহায্যে হইয়া থাকে। ঘনবসতিযুক্ত অঞ্চলে গমের চাহিদা বেশী এবং শ্রমিকেরও কোন অভাব নাই; এইজন্য উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের মাঝারি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে অধিক গম-চাষ পরিলক্ষিত হয়।

ভারতে গম চাষের প্রধান সমস্যা এই যে, এখানে হেক্টর-প্রতি গম উৎপাদন (৭৩০ কিলোগ্রাম) অত্যন্ত কম। অন্যান্য গম-উৎপাদক দেশে গমের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বেশী (৩৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন পরিকল্পনায় জলসেচ ও সারের বন্দোবস্ত করায় ক্রমশঃ গম-চাষের কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালের শেষে ১৯৬৫-৬৬ সালে গমের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৯০৩ কিলোগ্রামে দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু পরিকল্পনার ব্যর্থতার জন্য উহা ক্রমশঃ কমিয়া ১৯৬৩-৬৪ সালে ৭৩০ কিলোগ্রামে দাঁড়াইয়াছে। পুষার 'কেন্দ্রীয় গম গবেষণাগার' গমের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন গবেষণাকার্য চালাইয়া যাইতেছে। জনপ্রতি গমের কৃষি-জমির পরিমাণ ভারতে অত্যন্ত কম। এখানে প্রতি ২৫ জন লোকের জন্য এক হেক্টর গমের কৃষি-জমি নিয়োজিত হয়; কিন্তু অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার জনপ্রতি ১ হেক্টর, ইটালি ও ফ্রান্সে প্রতি ৭ জনে এক হেক্টর গম-চাষের জমি বিদ্যমান।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে মোট ১ কোটি ৩৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে গম-চাষ হয়। উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে গম উৎপাদনের আদর্শ প্রাকৃতিক অবস্থা বিদ্যমান বলিয়া এই দুইটি রাজ্য প্রচুর গম উৎপাদন করে। অত্যধিক বৃষ্টিপাত গম-চাষের পক্ষে অনুপযোগী বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রোপকূলে গম উৎপাদনের পরিমাণ নগণ্য। পরিমিত জলের ব্যবহার গম-চাষের পক্ষে উপযোগী বলিয়া জলসেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে

গম-চাষ সহজসাধ্য। এইজন্য পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে জলসেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে গমের চাষ হইয়া থাকে (৩৬৭ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

ভারতের গম উৎপাদন (১৯৬৪-৬৫)—৯৭ লক্ষ টন

	লক্ষ হেক্টর	লক্ষ মেঃ টন		লক্ষ হেক্টর	লক্ষ মেঃ টন
উত্তরপ্রদেশ	৪০	৩৩	মহারাষ্ট্র	১৩.৮	৫.৯
পাঞ্জাব	২.০৫	২৪	বিহার	৭.৩	১.৭
মধ্যপ্রদেশ	২৯.৯	১৬	রাজস্থান	১৩	১৪

উত্তরপ্রদেশ গম উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই রাজ্যের দেরাদুন, সাহারাণপুর, মজঃফরপুর, মীরাট, মোরাদাবাদ, এটাওয়া, বুদাউন, শাহজাহানপুর, নৈনিতাল ও গোরক্ষপুর জেলায় অধিকাংশ গম উৎপন্ন হয়। গম উৎপাদনে পাঞ্জাব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। মধ্যপ্রদেশের নর্মদা উপত্যকায় প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় অল্পবিস্তর গম চাষ হইয়া থাকে।

বাণিজ্য—ভারতের মোট উৎপন্ন গমের শতকরা ৪৫ ভাগ উৎপাদক অঞ্চলেই ব্যয়িত হয়; বাকী ৫৫ ভাগ বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসে। গমের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যা অত্যধিক হারে বাড়িয়া যাওয়ায় ভারতকে এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ মেঃ টন গম আমদানি করিতে হয়। খাদ্যে স্বাবলম্বী হইবার জন্য ভারতের বিভিন্ন পরিকল্পনায় গম-উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য নানাপ্রকার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ইহাতে গমের উৎপাদন কিছুটা বাড়িয়াছে। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালের শেষে (১৯৬৫-৬৬) ভারত উৎপাদন-লক্ষ্যে (১৫০ লক্ষ টন) পৌঁছিতে পারিবে না; কারণ খাদ্যশস্যের ব্যাপারে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে।

ভারতে গম উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (লক্ষ টন)

১৯৫০-৫১	৬৬	১৯৬৩-৬৪	৯৭
১৯৫৫-৫৬	৮৬	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	১৫০
১৯৬০-৬১	১০৩		

ইক্ষু (Sugarcane)

খ্রীস্টপূর্ব ৫,০০০ সালে ভারতে রচিত অথর্ববেদে ইক্ষুর উল্লেখ আছে। সুতরাং সেই সময়েও যে এই দেশে ইক্ষুর চাষ হইত ইহাতে সন্দেহ নাই। এখানকার ইক্ষুগাছ সাধারণতঃ ২½ মিটার হইতে ৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ইক্ষুগাছের রসের সহিত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া চিনি প্রস্তুত হয়। ভারতে ইক্ষু হইতে গুড় ও চিনি উভয়ই প্রস্তুত হয়।

ইক্ষু-চাষের সকল প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থা (প্রথম খণ্ডের 'কৃষিজ-সম্পদ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ভারতে বিদ্যমান থাকায় এই দেশ ইক্ষু উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৬৪-৬৫ সালে এই দেশের মোট ৯ কোটি ৮০ লক্ষ মেঃ টন ইক্ষু উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই দেশের ইক্ষু-চাষে বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান থাকায় চিনি উৎপাদনে ও ইক্ষুর হেক্টর-প্রতি উৎপাদনে এই দেশ এখনও অনেক পিছনে পড়িয়া আছে।

ইক্ষুর হেক্টর-প্রতি উৎপাদন (মেঃ টন)

হাওয়াই	১৫৫	পোর্টো রিকো	৬০	কিউবা	৪৩
জাভা (ইন্দোনেশিয়া)	১৪০	অস্ট্রেলিয়া	৫৩	ভারত	৩৭

ইক্ষু-চাষের অনুন্নতির মূলে রহিয়াছে ভূমি-ব্যবস্থার কুফল, জলসেচন ও সারের অপ্রতুলতা এবং পুরাতন প্রথায় চাষ। ভারতের উত্তরাংশে অধিকাংশ (৭০%) ইক্ষু উৎপন্ন হইলেও দক্ষিণ ভারতে ইক্ষু-চাষের আদর্শ জলবায়ু থাকায় এখানকার হেক্টর-প্রতি উৎপাদন উত্তর ভারত অপেক্ষা ৩।৪ গুণ বেশী। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের মৃত্তিকা ইক্ষু-চাষের বিশেষ উপযোগী না হওয়ায় শুধু খালসমূহের নিকটেই ইক্ষু-চাষ সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। অধিকাংশ খালের জল খাদ্যশস্যে নিয়োজিত হওয়ায় ইক্ষু-চাষের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নহে। ইহার ফলে দাক্ষিণাত্যের মোট ইক্ষু উৎপাদন অনেক কম। ভারতের ইক্ষু চাষের অন্যতম সমস্যা এই যে, এখানকার মানুষ গরীব বলিয়া অত্যধিক দামে চিনি কিনিতে পারে না। সেইজন্য অধিকাংশ ইক্ষু গুড়-উৎপাদনে নিয়োজিত হয়। মাত্র এক-চতুর্থাংশ ইক্ষু চিনির কলে প্রেরিত হয়। ইহার ফলে চাষীর পক্ষে ইক্ষুর উপযুক্ত মূল্য পাওয়া কঠিন। ভারতের ইক্ষু-রসে চিনির অংশ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক কম। সেইজন্য প্রচুর ইক্ষু হওয়া সত্ত্বেও চিনি-উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। জাভায় অনুসৃত

পন্থা অবলম্বন করিলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। এইজন্য 'ভারতীয় কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটি' (Indian Central Sugarcane Committee) ইক্ষু-চাষের উন্নতির জন্য এবং ইক্ষু-রসে চিনির অংশ-বৃদ্ধির জন্য গবেষণা চালাইয়া যাইতেছে।

ভারতের কৃষকগণ **অশিক্ষিত** বলিয়া ইক্ষুর ছোবড়া অধিকাংশই জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহাদ্বারা বোর্ড প্রস্তুত করিলে চাষী ছোবড়া বিক্রয় করিয়া অধিক মূল্য পাইতে পারে। গুড় প্রস্তুত করিবার সময় সুরাসার উৎপাদনের সুবন্দোবস্ত না থাকায় চাষী ইহা হইতেও বঞ্চিত হয়। সমবায়ের মাধ্যমে চাষীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ইক্ষু-চাষের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত জলসেচ, সার প্রভৃতির ব্যবস্থা করায় ক্রমশঃ ইক্ষুর হেক্টর-প্রতি উৎপাদন কিছুটা বাড়িতেছে। হেক্টর-প্রতি উৎপাদন-বৃদ্ধির সাহায্যে **তৃতীয় পরিকল্পনায়** ইক্ষুর উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে ১০ কোটি টন; ইহার শতকরা ৩৫ ভাগ চিনির কলে নিয়োজিত হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় গুড় উৎপাদনের লক্ষ্য ১ কোটি টন এবং চিনি উৎপাদনের লক্ষ্য ৩৩ লক্ষ টন।

যদিও তৃতীয় পরিকল্পনায় চিনি-উৎপাদনের লক্ষ্য পূর্ণ হইবে না, কিন্তু গুড়ের উৎপাদন ১৯৬৩-৪৪ সালে (অর্থাৎ পরিকল্পনার প্রথম ৩ বৎসরের মধ্যেই) ১ কোটি ২ লক্ষ মেঃ টনে পৌঁছিয়াছে; অর্থাৎ উৎপাদন-লক্ষ্য অতিক্রম করিয়াছে। অন্যদিকে ১৯৬৩-৬৪ সালে চিনির উৎপাদন কমিয়া ২৫.৬ লক্ষ মেঃ টনে দাঁড়াইয়াছে। কারণ চিনির কলে ইক্ষু না দিয়া গুড় উৎপাদন করিলে কৃষকগণ অধিক লাভ পাইয়া থাকে।

উৎপাদক অঞ্চল—মোট উৎপাদনের শতকরা ৩৫ ভাগ উৎপন্ন করিয়া উত্তরপ্রদেশ ইক্ষু-উৎপাদনে ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করে। সাহারাণপুর, শাহ্জাহানপুর, ফৈজাবাদ, গোরক্ষপুর, আজমগড়, বালিয়া, জৌনপুর, বারাণসী ও বুলন্দশর জেলায় অধিকাংশ ইক্ষু উৎপন্ন হয়। বিহারের সারাণ, চম্পারণ, দারভাঙ্গা ও মজঃফরপুর জেলায় অধিকাংশ ইক্ষু উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাবের অমৃতসর, জলন্ধর ও রোহ্টক জেলায় ইক্ষু-চাষ প্রধানতঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান ও নদীয়া জেলায় ইক্ষুর চাষ সীমাবদ্ধ, অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য এখানকার ইক্ষুতে চিনির অংশ অনেক কম।

ভারতের ইক্ষু-চিনি উৎপাদন (১৯৬৪-৬৫)—৩০·৯৫ লক্ষ টন

(লক্ষ মেঃ টন)

উত্তরপ্রদেশ	১৫·৩	বিহার	৩৯	পাঞ্জাব	১·২	মাদ্রাজ	১·৪
মহারাষ্ট্র	৫·৬	অন্ধ্র	১·৯	মহীশূর	১·২	পঃ বঙ্গ	·১৭

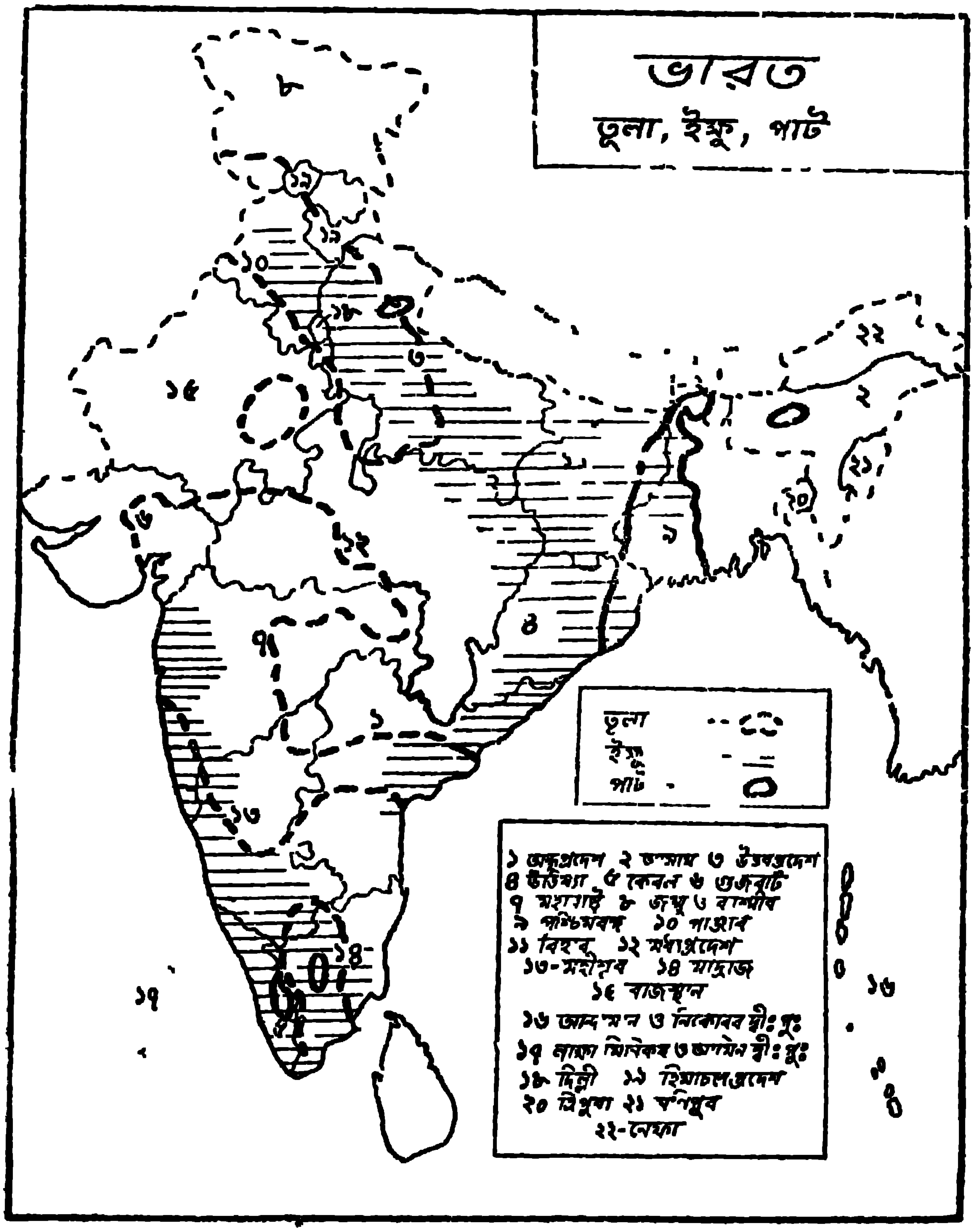

বাণিজ্য—ইক্ষু একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণ করা কঠিন। কারণ ইক্ষু কাটিয়া কিছুদিন রাখিয়া দিলে ইহার রস শুকাইয়া যায়। সেইজন্য অধিকাংশ ইক্ষু সন্নিকটস্থ চিনির কলে প্রেরিত হয় বা উৎপাদন-স্থলের নিকটেই

ইহাদ্বারা গুড় প্রস্তুত হয়। সেইজন্য ইক্ষুর বাণিজ্য সাধারণতঃ স্থানীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। ইক্ষু-ব্যবসায়ের প্রধান সমস্যা ইহার মূল্য-নির্ধারণ। চিনির কলের মালিকগণ বিভিন্নভাবে অত্যন্ত কমমূল্যে ইক্ষুক্রয়ের চেষ্টা করে। ইহাতে কৃষকগণ ইক্ষু বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান হয় না বলিয়া ইক্ষু-উৎপাদনে ইহারা কিছুটা নিরুৎসাহ হয়। ইক্ষুর উচিত মূল্য নির্ধারণের জন্য সরকারকে বহুবার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

পাট (Jute)

ভারতের অর্থনীতিতে পাট যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান, ভারত ও চীন একত্রে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৯৪ ভাগ পাট উৎপন্ন করিয়াছিল; তন্মধ্যে ভারতের অংশ শতকরা ৩৭ ভাগ। পাট উৎপাদনের উপযোগী আদর্শ জলবায়ু ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে বিদ্যমান। এখানকার অত্যধিক বৃষ্টিপাত, সুলভ শ্রমিক, পলল মাটি পাট-চাষের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতে পাটগাছ সাধারণতঃ ১½ হইতে ৩½ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। নদী-উপত্যকার পললমাটি পাট-চাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী বলিয়া গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়পাট-চাষপ্রায়সীমাবদ্ধ। জমি উর্বর বলিয়া সারের প্রয়োগ বিশেষ প্রয়োজন হয় না। মার্চ হইতে মে মাসের মধ্যে ইহার চাষ শুরু হয় এবং জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাসে ফসল কাটা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এপ্রিল মে মাসের মধ্যে ফসল কাটা হইয়া যায়। পাট কাটিবার পর ডোবা, পুকুর প্রভৃতিতে ভিজাইয়া ইহা পচাইতে হয়। সেইজন্য ফসল কাটিবার সময় ডোবা বা পুকুরে স্বচ্ছ জল থাকা প্রয়োজন। পাট পচিবার পর ডাঁটা হইতে বাকল ছাড়াইয়া লওয়া হয়; পাটগাছের বাকল ধুইয়া শুকাইয়া পাট প্রস্তুত হয়।

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের অধিকাংশ পাট উৎপন্ন হইত পূর্ববঙ্গে; এখানকার পাট অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। এই পাট সোজা কলিকাতায় পাটের কলে চলিয়া আসিত; কারণ ভারতের প্রায় সকল পাটকল কলিকাতার নিকটে অবস্থিত ছিল। দেশ বিভক্ত হওয়ায় ভারতের পাট-সরবরাহের এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। পাকিস্তান ক্রমশঃ পাট রপ্তানির উপর শুল্ক-হার বৃদ্ধি করায় এবং ভারত ১৯৪৮ সালে মুদ্রামূল্য হ্রাস করায় পাকিস্তান হইতে পাট আমদানি প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। ইহার ফলে ১৯৪৯ সালে পাটকলগুলি

কিছুদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। ভারতের পাটকলগুলিতে প্রতিবৎসর প্রায় ১২.২ লক্ষ মেঃ টন পাট প্রয়োজন ; কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের সময় ভারতে ২.৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট উৎপাদন মাত্র ৩.১ লক্ষ মেঃ টন। এইজন্য ভারত-সরকার পাট-উৎপাদনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাজ্যে পাট-চাষ ছড়াইয়া দিয়া পাটের উৎপাদন বাড়াইবার বন্দোবস্ত করা হইল। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের নিকটবর্তী রাজ্যসমূহে পাটের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইল। পাটের পরিবর্ত-সামগ্রী হিসাবে মেস্তার উৎপাদনও বাড়ানো হইল। তৃতীয় পরিকল্পনায় পাট ও মেস্তা উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারিত হইয়াছে যথাক্রমে ১১.৩ লক্ষ মেঃ টন এবং ২.৪ লক্ষ মেঃ টন।

পাট উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (লক্ষ মেঃ টন)

১৯৪৭-৪৮	৩.১	১৯৫৫-৫৬	৭.৬	১৯৬০-৬১	৭.৩
১৯৪৯-৫০	৫.৬	১৯৫৮-৫৯	৯.৪	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	১১.৩

ভারতে পাট ও ও মেস্তার মতো কোন কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন এতটা বৃদ্ধি পায় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার শুরুর তুলনায় উহার প্রথম চার বৎসরে পাট ও মেস্তার উৎপাদন শতকরা প্রায় ৪৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদন ছিল ৭.৩ লক্ষ মেঃ টন। ১৯৬৩-৬৪ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১০.৭ লক্ষ মেঃ টনে পৌঁছিয়াছে, ইহা ছাড়া ১.৮ লক্ষ মেঃ টন মেস্তা এই বৎসর উৎপন্ন হইয়াছে। এইভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য পূর্ণ হইবে আশা করা যায়। বর্তমানে ৮.৫১ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট এবং ৩.৭৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে মেস্তা চাষ করা হয়।

এখনও পাটের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কিছুটা কম। এইজন্য বিভিন্ন অঞ্চলে মেস্তার উৎপাদন-বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। মহারাষ্ট্রে 'আমবাদী' নামে, অন্ধ্রে 'বিমৃলি' নামে, হায়দারাবাদে 'দাক্ষিণাত্যের শণ' নামে, বিহারে 'পুষার শণ' নামে এবং পশ্চিমবঙ্গে 'মেস্তা' নামে ইহা পরিচিত। পাট-চাষের অনুপযুক্ত জমিতেও অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাতে মেস্তা উৎপন্ন হইতে পারে। পাট অপেক্ষা মেস্তা অধিকতর নিকৃষ্টশ্রেণীর তন্তু। থলিয়া প্রস্তুতের জন্য ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে প্রায় ১.৮ লক্ষ মেঃ টন মেস্তা ভারতে

উৎপন্ন হয়। পাটের অভাবমোচনে মেস্তা প্রভৃত সাহায্য করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র ও বিহারে অধিকাংশ মেস্তার চাষ হইয়া থাকে।

ভারতের পাট-চাষে বিভিন্ন **সমস্যা** বিদ্যমান থাকায় সরকারের চেষ্টা সত্ত্বেও চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেক কম। প্রথমতঃ, উৎকৃষ্টশ্রেণীর পাট-চাষের জন্য প্রয়োজন স্রোতবর্জিত স্বচ্ছ জল, যাহাতে পাট ভিজাইয়া রাখা যায়। পূর্ববঙ্গে প্রতিবৎসর বর্ষাকালে বন্যায় নূতন জল আসিয়া ডোবা ও খাল ভর্তি করে; সেইজন্য এখানকার পাট অত্যন্ত উৎকৃষ্টশ্রেণীর। পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের খাল-বিলে এইজাতীয় জলের অভাব থাকায় উৎকৃষ্টশ্রেণীর পাট-উৎপাদন করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, ভারতে খাদ্যশস্যের অভাব থাকায় বহুস্থানে কৃষকগণ পাট-চাষ না করিয়া খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে। তৃতীয়তঃ, পাটকলের মালিকগণ কৃত্রিম উপায়ে পাটের দাম কমাইয়া রাখে। ফড়িয়াগণও মধ্যপথে পাট-চাষীকে ঠকাইয়া প্রচুর মুনাফা করে। এই সকল কারণে পাট-চাষে কৃষকগণ বিশেষ উৎসাহিত হয় না। চতুর্থতঃ, ভারতে পাটের হেক্টর প্রতি উৎপাদন অনেক কম—১,১৯০ কিলোগ্রাম। বিভিন্ন রাজ্যেব হেক্টর-প্রতি উৎপাদন সমান নহে। প্রতি হেক্টর জমিতে আসামে ১,৪৭০ কিলোগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গে ১,১৮৪ কিলোগ্রাম, উত্তরপ্রদেশে ১,১৪১ কিলোগ্রাম, ত্রিপুরায় ১০৯১ কিলোগ্রাম এবং বিহারে ৯৯০ কিলোগ্রাম পাট উৎপন্ন হয়। হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য, উন্নত ধরনের পাট উৎপন্ন করিবার জন্য এবং পাট-চাষের খরচ কমাইবার জন্য ভারতের 'কৃষি গবেষণা-প্রতিষ্ঠান' (Indian Agricultural Research Institute) বিভিন্ন ভাবে গবেষণা চালাইতেছে। এই গবেষণার ফলে সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগাইয়া পাট-চাষের নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার ফলে যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষেত পরিষ্কার করা যাইবে এবং চাষের খরচ কিয়দংশে কমিয়া যাইবে।

উৎপাদক অঞ্চল—স্বাধীনতার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ পাট-চাষ হইত। কিন্তু পাটের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য অসাম, বিহার, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে পাট-চাষের বিস্তার হয়। দেখা গিয়াছে যে, এই সকল রাজ্যেও ভালোভাবে পাট-চাষ করা সম্ভবপর।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল জেলায় কমবেশী পাট উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বর্ধমান, ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী, মালদহ, কুচবিহার ও মেদিনীপুর জেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **আসামের** গোয়ালপাড়া, কামরূপ,

নওগাঁ ও তেজপুর পাট-চাষের জন্য বিখ্যাত। আসামে পাট-উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়ানো সম্ভবপর ; কারণ এখানে পাট-চাষের আদর্শ জলবায়ু ও মৃত্তিকা বিদ্যমান। উত্তরপ্রদেশের অবহিমালয় সন্নিহিত সরযু, ঘর্ঘরা ও চওকা নদীর উপত্যকা পাট-চাষের বিশেষ উপযোগী। পাট উৎপাদনের খরচ কিছু বেশী হইলেও মহারাষ্ট্র রাজ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট-উৎপাদন সম্ভবপর। উড়িষ্যার কটক জেলায় এই রাজ্যের অধিকাংশ (৯২%) পাট উৎপাদন হইয়া থাকে। ত্রিপুরা রাজ্যও পাট-উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। বিহারের মোট উৎপন্ন পাটের শতকরা ৯০ ভাগ আসে পূর্ণিয়া জেলা হইতে। বর্তমানে 'ভারতের কেন্দ্রীয় পাট কমিটি' (Indian Central Jute Committee) ভারতে পাট-চাষের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালাইতেছে।

বাণিজ্য—ভারতে উৎপন্ন অধিকাংশ পাট কলিকাতার সন্নিকটস্থ পাটকলে বিক্রয় হয়। অন্যান্য অঞ্চলের পাটকলে স্থানীয় পাট নিয়োজিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পাটের চাহিদা মিটায় পাকিস্তান। ভারতে পাটের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম বলিয়া, এই দেশের পক্ষে রপ্তানি-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নহে; অবশ্য ভারত নিকৃষ্ট শ্রেণীর কিছু পাট কলিকাতা বন্দর মারফত রপ্তানি করে। বর্তমানে ভারত পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ২ লক্ষ মেঃ টন পাট আমদানি করে। ১৯৫১ সালে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের পাট-আমদানি সম্পর্কে প্রথম চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে পাকিস্তান ভারতকে প্রতিবৎসর ৫·৪৫ মেঃ টন পাট রপ্তানি করিতে রাজী হয়। ইহার পরে এই চুক্তি পরিবর্তিত হয় এবং ক্রমশঃ ভারতে পাট-আমদানির পরিমাণ হ্রাস পায়। পূর্ববঙ্গে পাট-শিল্পের উন্নতি ইহার অন্যতম কারণ। ইহার ফলে ভারতের পাটকলসমূহকে প্রায়ই পাটের অভাব অনুভব করিতে হয়।

অন্যান্য তন্তুজাতীয় ফসল (Bast Fibres)—পাট ছাড়াও ভারতে তন্তুজাতীয় আরও কয়েকটি শস্য উৎপন্ন হয়, যথা—মেস্তা, শণ প্রভৃতি। পাট উৎপাদনের উপযোগী অবস্থায় মেস্তাও উৎপন্ন হয়। সুতরাং যেখানেই পাট উৎপন্ন হয়, সেখানেই মেস্তাও উৎপন্ন হয়।

শণ গাছ সাধারণতঃ ৪০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত, ১৩° সেঃ উত্তাপমাত্রায় ভালো জন্মে। কাদাযুক্ত দো-আঁশ মাটিতে শণ ভালো জন্মে। এই ভৌগোলিক অবস্থা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান থাকায় মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র ও মাদ্রাজে প্রচুর পরিমাণে শণ-গাছের চাষ হয়। সিমলা, কাশ্মীর, কুমায়ুন,

কাঙ্গরা প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে গাঁজা-গাছের বহিরাবরণ হইতে ভারতীয় শণ প্রস্তুত হয়। মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিশল গাছের বহিরাবরণ হইতে শিশল শণ উৎপন্ন হয়।

তুলা (Cotton)

প্রচীন যুগে লিখিত বেদশাস্ত্রে তুলা-চাষের উল্লেখ আছে। মহেঞ্জো-দড়োতেও ৫,০০০ বৎসর পূর্বেকার তুলা-চাষের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারত যে প্রাচীনকালেও তুলা-চাষে উন্নতি লাভ করিয়াছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বর্তমান যুগেও ভারত তুলা উৎপাদনে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরেই ভারতের স্থান। ভারতের অর্থপ্রসূ শস্যের মধ্যে তুলার স্থান সকলের উপরে।

ভারতে তুলা-চাষের সকল প্রকার উপযোগী অবস্থা (প্রথম খণ্ডের 'কৃষিজ সম্পদ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) বিদ্যমান থাকিলেও বিভিন্ন **সমস্যা** বিদ্যমান থাকায় তুলার উৎপাদনে আশানুরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তুলা উৎপাদনের লক্ষ্য ১১'৭৬ লক্ষ মেঃ টন নির্ধারিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন হইয়াছে মাত্র ৯'০৯ লক্ষ মেঃ টন। তৃতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ১২'৫ লক্ষ মেঃ টন; কিন্তু ১৯৬৪-৬৫ সালে উৎপাদন হইয়াছে মাত্র ৯'১৮ লক্ষ মেঃ টন। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে হেক্টর-প্রতি তুলার উৎপাদন অনেক কম—মাত্র ১২৩ কিলোগ্রাম; পূর্বে ইহার পরিমাণ ছিল ১১০ কিলোগ্রাম। পরিমিত জলের অভাবে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন কমিয়া যায়। বর্তমানে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে জলসেচ-ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় ক্রমশঃ হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। তুলা-উৎপাদনের আদর্শ জলবায়ু থাকায় এবং জলসেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিমিত জল ব্যবহার করায় পাঞ্জাবে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশী—প্রায় ২৮০ কিলোগ্রাম। ভারতে তুলা-উৎপাদনের পরিমাণ বেশী হইলেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলার উৎপাদন অত্যন্ত কম। ভারতে প্রধানতঃ **তিনপ্রকার** তুলা উৎপন্ন হয়—দীর্ঘ আঁশযুক্ত, মাঝারি আঁশযুক্ত ও ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা। দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা ২'৯ সেঃ মিঃ হইতে দীর্ঘ; ইহার সাহায্যে সূক্ষ্ম কাপড় প্রস্তুত হয়, মাঝারি আঁশযুক্ত তুলা ২'২-২'৯ সেঃ মিঃ দীর্ঘ এবং ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা ২'২ সেঃ মিঃ হইতেও ছোট। ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলার সাহায্যে কর্কশ ও

মোটা কাপড় প্রস্তুত হয়। ভারতের অধিকাংশ (৬৬%) তুলা ক্ষুদ্র ও মাঝারি আঁশযুক্ত। এইজন্য পরিমাণের দিক হইতে তুলার ব্যাপারে ভারত স্বাবলম্বী হইলেও দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা ভারতকে আমদানি করিতে হয়। বিভিন্ন পরিকল্পনার মারফত বর্তমানে ভারতে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। পাঞ্জাবের ভাকরা ও নাঙ্গাল বাঁধের জলসেচের সাহায্যে প্রায় ৮ লক্ষ মে: টন দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদন হইবে। গুজরাট রাজ্যের কাকরাপাড়া বাঁধ এবং রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের চম্বল বাঁধের জলসেচ-ব্যবস্থা এই সকল রাজ্যে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদনে সাহায্য করিবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় মহীশূর ও কেরালায় জলসেচের সাহায্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাগরদ্বীপীয় দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হইবে। আশা করা যায়, এই-ভাবে ভারত শীঘ্রই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলা উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইবে। ভারতে তুলা-চাষের অন্যতম সমস্যা বল্ উইভিল্ ও অন্যান্য পোকার উপদ্রব। ইহারা প্রচুর পরিমাণে তুলা নষ্ট করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার তুলাগাছে নানাপ্রকার কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেছে। বর্তমানে 'ভারতে কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি' (Indian Central Cotton Committee) নানাবিধ গবেষণা দ্বারা তুলা-চাষের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু ও মৃত্তিকায় তুলার চাষ হইয়া থাকে। উত্তরে পাঞ্জাব হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণে মাদ্রাজের ত্রিনেভেলি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বহুস্থানে তুলা উৎপন্ন হইলেও দাক্ষিণাত্যে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশী। শুষ্ক ও মাঝারি বৃষ্টিপাত যুক্ত (১০০ সেঃ মিঃ-এর কম) অঞ্চলে এবং কৃষ্ণমৃত্তিকায় তুলার চাষ ভালো হয়। জলসেচের মাধ্যমে পরিমিত জল দিলে তুলার হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তুলা-চাষের আদর্শ জলবায়ু ও মৃত্তিকা মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর ও পাঞ্জাবে বিদ্যমান। এইজন্য এই চারিটি রাজ্যে তুলার উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশী। অন্যান্য রাজ্যেও কমবেশী তুলার চাষ হয়।

ভারতের তুলা-উৎপাদন (১৯৬৪-৬৫) ৫১ লক্ষ গাঁট*

	লক্ষ হেক্টর	লক্ষ গাঁট		লক্ষ হেক্টর	লক্ষ গাঁট
মহারাষ্ট্র	২৫	১৭	মধ্যপ্রদেশ	৭'৭	৫
গুজরাট	১৭	১৫	মাদ্রাজ	৪'৫	৪'২৫
পাঞ্জাব	৫'৩	৮	মহীশূর	১০	৪

বাণিজ্য—পরিমাণের দিক হইতে ভারত তুলা-উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইলেও, সূক্ষ্ম কাপড় প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অনেক কম। এইজন্য ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, সুদান, টাঙ্গানাইকা, কেনিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে ১৯৬৪-৬৫ সালে প্রায় ৬ লক্ষ গাঁট তুলা আমদানি করে। অন্যদিকে এই দেশ ঐ বৎসর নিকৃষ্টশ্রেণীর ২·৬৭ লক্ষ গাঁট তুলা জাপান, পশ্চিম জার্মানী, বৃটেন প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করে। আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ প্রায় এক হইলেও নীট মূল্য হিসাবে ভারতকে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। ১৯৬১-৬২ সালে উৎপাদন কম হওয়ায় আমদানির পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতের অভ্যন্তরে তুলার প্রধান ক্রেতা বস্ত্রশিল্পের মালিকগণ। কৃষকগণ এক্ষেত্রেও ন্যায্যমূল্যে তুলা বিক্রয় করিতে পারে না।

ভারতের বিভিন্ন পরিকল্পনায় তুলা-চাষের উন্নতির জন্য চেষ্টা হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় তুলা-উৎপাদনের পরিমাণ ধার্য হইয়াছে ১২·৫ লক্ষ মেঃ টন।

ভারতে তুলা-উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (লক্ষ গাঁট) *

১৯৪৮-৪৯	১৭·৬	১৯৬০-৬১	৫৩·৯
১৯৫০-৫১	২৯·৩	১৯৬৪-৬৫	৫১
১৯৫৫-৫৬	৪০·০	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	৭০·০

চা (Tea)

বাণিজ্যিক হারে চায়ের চাষ ভারতের পূর্বেও শুরু হয় চীনদেশে। চীনদেশের চায়ের বাজারের উপর বৃটেনের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বিদ্যমান ছিল; কিন্তু ১৮২৩ সালে বৃটেন এই কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলে। তখন তাহারা ভারতে চা উৎপাদনের চেষ্টা চালাইতে থাকে। ইতিমধ্যে বার্মা-যুদ্ধের পর ১৮২৫ সালে ব্রুস (Bruce) ভ্রাতৃদ্বয় ভারতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সিংফু অঞ্চল হইতে চায়ের বীজ আনিয়া আসামের সাদিয়া অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে চা-বাগান শুরু করে। এদিকে ১৮২৪ সালে চীন হইতে বীজ, চারাগাছ, এমনকি চীনা কৃষকও ভারতে আমদানি করিয়া আসাম ও দার্জিলিং অঞ্চলে এবং দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি ও পশ্চিমঘাট অঞ্চলে চা-বাগান শুরু করা হয়। কিন্তু

* ১ গাঁট—১৮০ কিলোগ্রাম।

ক্রমশঃই স্থানীয় বীজের ব্যবহার বাড়িতে থাকে এবং চীনের বীজের ব্যবহার কমিতে থাকে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রথম ব্যবহারযোগ্য চা উৎপন্ন হয় ১৮৩৬ সালে এবং বৃটেনে প্রথম রপ্তানী হয় ১৮৩৮ সালে। ক্রমশঃ চায়ের উৎপাদন ও বাণিজ্য এত লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয় যে বহু বৃটিশ ব্যবসায়ী লণ্ডনে ও কলিকাতায় বহু চা কোম্পানী স্থাপন করেন এবং আসামে ও দার্জিলিং-এ চায়ের উৎপাদন শুরু করেন।*

চা উৎপাদন ও রপ্তানিতে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। চা-চাষের উপযোগী সকল প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থা ('কৃষিজ সম্পদ' অধ্যায়ে 'চা' দ্রষ্টব্য) এই দেশের উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে বিদ্যমান। এই সকল অঞ্চলের অত্যধিক বৃষ্টিপাত (২০০ সেঃ মিঃ-এর অধিক), উর্বর ঢালু জমি এবং ২৭° সেঃ পরিমিত উত্তাপ চা-উৎপাদনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। চা ভারতের অর্থনীতিতে, বিশেষতঃ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। চা-শিল্পে প্রায় ১০ লক্ষ লোক কাজ করে। চা-আবাদের ফলে ভারতের বহুস্থানে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে, অস্বাস্থ্যকর স্থান বাসযোগ্য হইয়াছে এবং ভূমিক্ষয় কিয়দংশে বন্ধ হইয়াছে।

চা উৎপাদনে এই দেশকে বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করিতে না হইলেও বিক্রয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন **সমস্যা** বিদ্যমান। উৎপাদনের সমস্যার মধ্যে অনুন্নত পদ্ধতিতে আবাদ, শ্রমিকের কর্মদক্ষতার অভাব এবং চা-এর বাক্সের (Tea chest) সরবরাহে অনিশ্চয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে সময়মতো চারা গাছ ছাঁটিয়া এবং সার প্রয়োগ করিয়া চা-উৎপাদনের খরচ কমাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। ভারতে হেক্টর-প্রতি চা-এর উৎপাদন সর্বত্র সমান নহে। মাদ্রাজে হেক্টর-প্রতি চা-উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশী—প্রায় ১,১৪০ কিলোগ্রাম; প্রতি হেক্টর জমিতে পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে ১,০৮৩ কিলোগ্রাম এবং পাঞ্জাবে ৩০৩ কিলোগ্রাম চা উৎপন্ন হয়।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতের চা-উৎপাদনে প্রধানতঃ দুইটি অঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে—উত্তর-পূর্ব-পার্বত্য অঞ্চল (আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ) এবং দাক্ষিণাত্যের কেরালা ও মাদ্রাজ। ইহা ছাড়া পাঞ্জাবের

---

* **Source—Amrita Bazar Patrika, Tea Industry & Trade Supplement, 22nd April, 1964.**

কাঙড়া উপত্যকায়, উত্তরপ্রদেশের কুমায়ুন পাহাড়ে এবং বিহারের রাঁচী, পূর্ণিয়া ও হাজারিবাগে, ত্রিপুরায়, মহারাষ্ট্রে ও মহীশূরে অল্পবিস্তর চা উৎপন্ন হয়। **আসামের** চা-উৎপাদনকারী জেলাসমূহের মধ্যে দারাং, শিবসাগর, লক্ষীমপুর ও কাছাড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোট উৎপাদনের অর্ধেকের বেশী উৎপন্ন করিয়া এই রাজ্য চা-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। রেলপথে ও ব্রহ্মপুত্রের জলপথে এখানকার চা কলিকাতা বন্দরে রপ্তানির জন্য লইয়া যাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে। চা-উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে **পশ্চিমবঙ্গ**। এই রাজ্যের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার চা স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। ভারতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ চা এই রাজ্যে উৎপন্ন হয়। দাক্ষিণাত্যের **কেরালা** রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়; ইহার মধ্যে কানন দেভন্স্ ও ওয়েনাদ অঞ্চল চা-উৎপাদনে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। **মাদ্রাজের** নীলগিরি ও আনামালাই অঞ্চল চা-উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

ভারতের চা উৎপাদন—৩'৪৫ লক্ষ মেঃ টন (১৯৬৩-৬৪)

(সহস্র মেঃ টন)

আসাম	১৭৪	মাদ্রাজ	৩৭
পশ্চিমবঙ্গ	৮৮	ত্রিপুরা	২
কেরালা	৩৯	মহীশূর	১'৫

বাণিজ্য—ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যে চা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। চা রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় মোট উৎপাদনের শতকরা ৬১ ভাগ চা বিদেশে **রপ্তানী** হয়। ইহার ফলে প্রতিবৎসর প্রায় ১৩২ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। বৃটেন ভারতীয় চা-এর প্রধান ক্রেতা; ইহার পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। ইহা ছাড়া, মিশর, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও পশ্চিম জার্মানী ভারত হইতে চা আমদানি করে। ভারতের চা-শিল্পের প্রধান **সমস্যা** এই যে, এই শিল্প প্রায় সম্পূর্ণভাবে রপ্তানি-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগীর আবির্ভাব হইলে বা শুল্ক-ব্যবস্থার পরিবর্তন হইলে চা-শিল্প সর্বনাশের সম্মুখীন হইবে। সম্প্রতি বৃটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে **(European Common Market)** যোগ দেওয়ার চেষ্টা করায় ভারতের

চা-শিল্প এক অস্বাভাবিক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিল। কারণ শুল্কের ব্যাপারে ভারত আর কমন্‌ওয়েল্‌থের সুবিধা ভোগ করিতে পারিত না এবং বৃটেনে চা-রপ্তানি বহুলাংশে কমিয়া যাইত। বর্তমানে ভারতীয় রপ্তানিযোগ্য চা-এর শতকরা ৬৬ ভাগ একা বৃটেন আমদানি করে। সুখের বিষয় বৃটেন

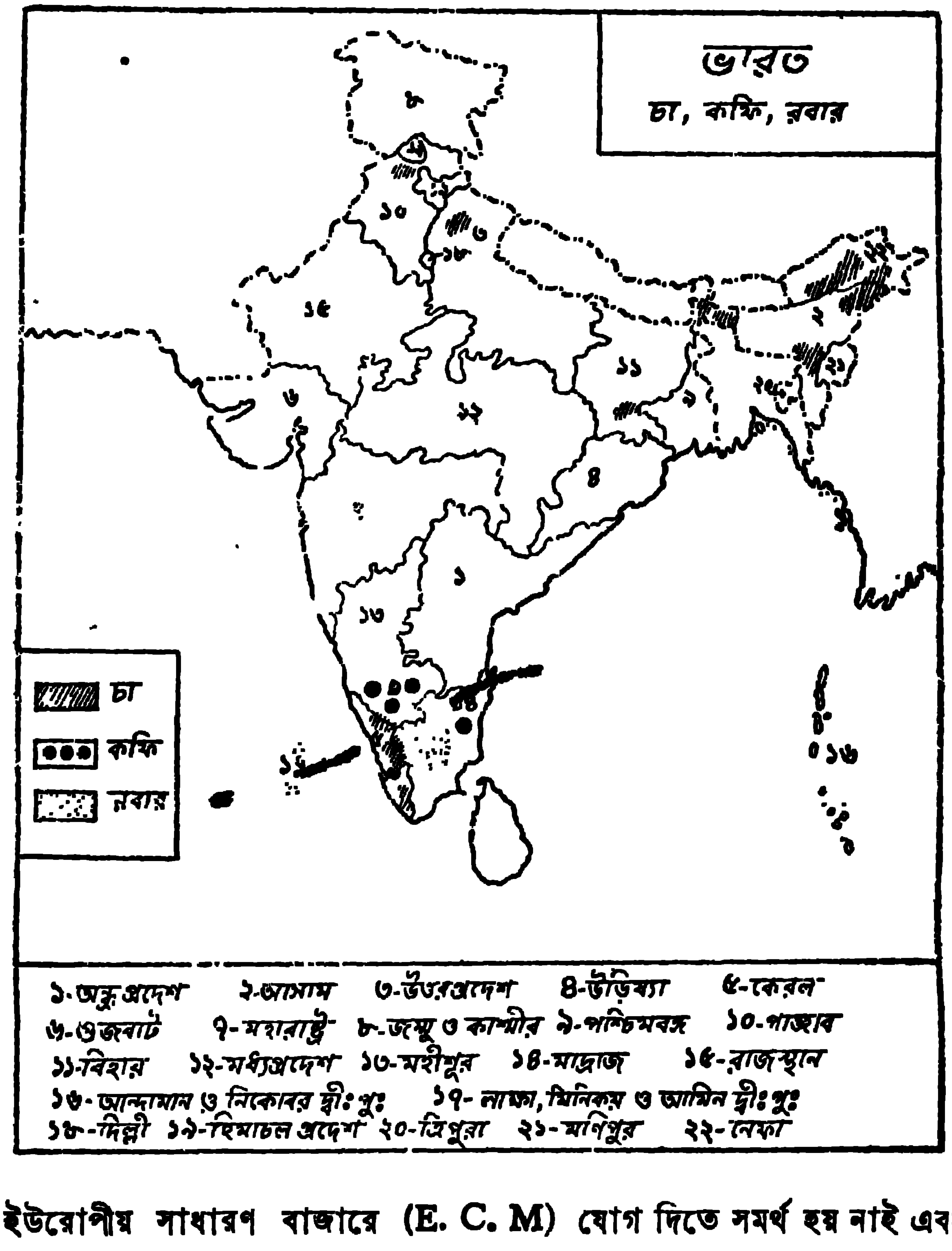

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে (E. C. M) যোগ দিতে সমর্থ হয় নাই এবং ১৯৬৪ সালের শুরু হইতেই E. C. M. কর্তৃপক্ষ তাহাদের দেশগুলিতে চা-আমদানির উপর শুল্ক হ্রাস করিয়াছে। ইহার ফলে ভারতের পক্ষে ইউরোপীয় দেশসমূহে চা-রপ্তানি বৃদ্ধি করা সহজসাধ্য হইবে। পৃথিবীর

বিভিন্ন দেশে সিংহলের রপ্তানি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সিংহলের রপ্তানির পরিমাণ ভারতীয় রপ্তানির পরিমাণ অপেক্ষা মাত্র ৭,৭০০ মেঃ টন কম। হয়তো শীঘ্রই সিংহল চা-রপ্তানিতে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিবে। ইঁহা ছাড়া চীন বৃটেনের বাজারে প্রচুর চা রপ্তানি করিতেছে। এই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইলে ভারতীয় চা-এর উৎপাদন-খরচ আরও কমাইতে হইবে এবং উন্নততর পন্থায় চা উৎপন্ন করিতে হইবে। চা-এর বাণিজ্যের অন্যতম সমস্যা ভারতে **আভ্যন্তরীণ চাহিদার** অভাব। ভারতে চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি করিতে না পারিলে সর্বদা সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা যে-কোন শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। বর্তমানে ভারত সরকার চা-শিল্পের উন্নতির ভার **'চা বোর্ড' (Tea Board)** নামক একটি আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে। এই সংস্থা চা-রপ্তানি ও আভ্যন্তরীণ চাহিদা-বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা চালাইতেছে। দেশ-বিদেশে চা-এর উপকারিতা ও সুলভতা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের প্রচারের সাহায্যে এই সংস্থা চা-এর চাহিদা-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। সার সরবরাহের বন্দোবস্ত করিয়া এবং চা-বাগানসমূহকে নানা-ভাবে সাহায্য করিয়া চা-এর উৎপাদন-খরচ কমাইবার জন্যও এই সংস্থা চেষ্টা করিতেছে। চা-এর উৎপাদন-খরচ কমাইতে পারিলে বিদেশে প্রতিযোগিতা করা সহজসাধ্য হয়। চা বোর্ডের প্রচেষ্টায় আভ্যন্তরীণ চাহিদা গত দশবৎসরে প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

চা উৎপাদন ও রপ্তানির গতি ও লক্ষ্য (লক্ষ মেঃ টন)

	উৎপাদন	রপ্তানি		উৎপাদন	রপ্তানি
১৯৫০-৫১	২'৮৪	২'০৬	১৯৬০-৬১	৩'১৭	১'৯৪
১৯৫৫-৫৬	৩'০৩	২ ২৬	১৯৬৫-৬৬(লক্ষ্য)	৪'০৯	২'৫০

তৃতীয় পরিকল্পনায় চা উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে। এই পরিকল্পনায় উৎপাদন ও রপ্তানির লক্ষ্য নির্ধারিত হইয়াছে যথাক্রমে ৪'০৯ ও ২'৫০ লক্ষ মেঃ টন। চা-বাগানসমূহকে অর্থসাহায্য দেওয়ার বন্দোবস্ত এই পরিকল্পনায় করা হইয়াছে।

ভারতে চা-শিল্পের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত পন্থা গ্রহণ করিলে উৎপাদন-খরচ কমিয়া যাইবে এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে :—(১) চা-এর **উৎপাদন-খরচ**

কমাইবার জন্য হেক্টর-প্রতি উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। সার সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করা প্রয়োজন; যন্ত্রপাতির সাহায্যে চা তুলিবার বন্দোবস্ত করিলে অনেক খরচ বাঁচে। চা-বাগানের অব্যবহৃত জমিতে বিভিন্ন ফলের গাছ সৃষ্টি করিয়া কিছু অর্থ উপার্জন কবিলে চা-এর নীট উৎপাদন-খরচ কিছু কমে। (২) চা-রপ্তানির সুবন্দোবস্তের জন্য বিদেশীয় জাহাজ ব্যবহার করিলে বেশী ভাড়া দিতে হয় এবং সময়মতো চা বিদেশের বাজাবে পৌঁছায় না। সেইজন্য ভারতীয় জাহাজেব সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। (৩) চা-বাক্স প্রধানতঃ প্রস্তুত হয় প্লাইউড কাঠের সাহায্যে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চা-বাক্স প্রস্তুতের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন যাহাতে বাহিরের বাষ্প ঢুকিয়া চা-এর রং ও স্বাদ নষ্ট করিতে না পারে। (৪) আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করিয়া এবং বিদেশের বাজারে প্রচারের সুবন্দোবস্ত করিয়া ভারতীয় চা-এর মোট চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে চুক্তির মারফত চা-রপ্তানি বৃদ্ধি করা সহজ। এইভাবে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলে, আশা করা যায় তৃতীয় পরিকল্পনায় ধার্য লক্ষ্য পূরণ হইবে।

কফি (Coffee)

ভাবতে প্রথম কফির চাষ আরম্ভ হয় ১৮৩০ সালে। কফি-চাষের উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা ('কৃষিজ সম্পদ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) দক্ষিণাত্যের আনামালাই, নীলগিরি ও কার্ডামম পাহাড়ে বিদ্যমান। কফি-চাষের উপযোগী উচ্চতা (৬০০-১২০০ মিটার), জলনিকাশা লৌহমিশ্রিত জমি, আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু এই অঞ্চলে বিদ্যমান। ভারতে প্রধানতঃ দুইপ্রকার কফিগাছ বিদ্যমান—আরবীয় ও রোবাস্তীয়। আরবীয় কফি অল্প বৃষ্টিপাতেও ভালো জন্মে। সেইজন্য মহীশূরের পার্বত্য ঢালে বৃষ্টিবিরল অঞ্চলেও ইহার চাষ হয়। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে পাহাড়ের নীচে জন্মে রোবাস্তীয় কফি। আরবীয় কফি স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয় এবং ভারতে ইহার উৎপাদনই বেশী। ভারতে হেক্টর প্রতি কফি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৭১৫ কিলোগ্রাম। বর্ষাকালেই এই দেশে কফির চারা রোপণ করা হয়। চারাগাছ রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না বলিয়া আচ্ছাদনের জন্য কলাগাছ বা অন্য কোন গাছ লাগাইতে হয়। কফি চারা বড় হইতে ৩।৪ বৎসর লাগে; কিন্তু ফল দিতে আরম্ভ করিলে ৩০ বৎসর পর্যন্ত ফল দেয়। অক্টোবর হইতে জানুয়ারী মাসের মধ্যে কফি-ফল

গাছ হইতে তুলিয়া, শুকাইয়া ও ভাজিয়া কফি প্রস্তুত করা হয়। মহীশূরের যে-কোন বাগানের কফি স্বাদে ও গন্ধে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতের অধিকাংশ (৭০%) কফি উৎপন্ন হয় **মহিশূর** রাজ্যে। এই দেশের মোট ৭,০০০ কফি বাগানের মধ্যে ৬,০০০ বাগান মহীশূর রাজ্যে অবস্থিত। এই রাজ্যের মালনাদ অঞ্চলের কাডুর, শিমোগা ও হাসানে অধিকাংশ কফি বাগান অবস্থিত। ও কেরালা রাজ্যেও কফির চাষ হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রের সাতারা অঞ্চলে অল্পবিস্তর কফির চাষ হয়। ১৯৬৪ সালে ভারতে ৬৮,৫০০ মে: টন কফি উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে ৪০,২৫০ মে: টন আরবায় কফি এবং ২৮,২৫০ মে: টন রোবাস্তীয় কফি।

বাণিজ্য—ভারতের অধিকাংশ কফি বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহা প্রধানতঃ মাঙ্গালোর, কোচিন, কালিকট ও মাদ্রাজ বন্দর মারফত রপ্তানি হয়। অধিকাংশ কফি বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী, ইরাক, অস্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে প্রেরিত হয়। মোট রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৩৫,০০০ মে: টন এবং ইহা দ্বারা প্রতিবৎসর প্রায় ১০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হ[illegible]।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতের শতক[illegible] ৬০ ভাগ কফি বিদেশে রপ্তানি হইত। যুদ্ধের সময় বৈদেশিক বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হ[illegible] আভ্যন্তরীণ চাহিদা-বৃদ্ধির জন্য 'ভারতীয় কফি বোর্ড' (Indian Coffee Board) [illegible]ঠিত হয়। এই সংস্থা ভারতের বিভিন্ন শহরে 'কফি' হাউস' প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং প্রচার-কার্য চালাইয়া ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সংস্থা বিভিন্ন কফি-বাগানে সার সরবরাহ করিয়া, অধিক জমিতে কফি-চাষের সুব্যবস্থা করিয়া, কফি সংস্কারের বন্দোবস্ত করিয়া এবং কফির উপজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়া কফি-চাষের উন্নতিসাধন করিয়াছে; ইহাতে হেক্টর-প্রতি উৎপাদনও কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে কফির চাহিদা বেশী; উত্তর-ভারতের অধিকাংশ লোক চা পান করে।

ভারতে কফির চাহিদা-বৃদ্ধির প্রধান সমস্যা এই যে, ভারতীয়গণ অত্যন্ত গরীব বলিয়া চা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ কফি ক্রয় করিতে পারে না। ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ চাহিদার আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। তবে পূর্বের তুলনায় এখন আভ্যন্তরীণ চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনায় কফি-চাষের উন্নতির জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে বর্তমানে কফির উৎপাদন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কফি উৎপাদনেব ও রপ্তানির লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে যথাক্রমে ৮০ ও ৩৪ হাজার টন

ভারতে কফি-চাষ ও রপ্তানির গতি ও লক্ষ্য (সহস্র টন)

	উৎপাদন	রপ্তানি		উৎপাদন	রপ্তানি
১৯৫০-৫১	১৮	২'৭	১৯৬০-৬১	৬৭ ৫	১৬'৪
১৯৫৫-৫৬	৩৪	১০	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	৮০	৩৪'০

বর্তমানে ভারতীয় কফি বোর্ড বিদেশে কফি-রপ্তানি-বৃদ্ধিব জন্য বৃটেন ও অন্যান্য দেশে প্রচার চালাইতেছে; কিন্তু বৈদেশিক বাজারে ব্রেজিলের সস্তা কফিব সঙ্গে আঁটিয়া ওঠা ভারতের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতে ব্যবহৃত ও রপ্তানিযোগ্য কফির উপর কর ধার্য করিয়া কফি বোর্ডের খরচ মিটানো হয়।

রবার (Rubber)

ভারতে প্রথম রবারেব চাষ হয় ১৯০২ সালে কেরালায় পেরিয়ার নদীর উপত্যকায়। দক্ষিণ আমেরিকার প্যারা রবারের বীজ বৃটেন হইতে আনিয়া এখানে আবাদী রবার উৎপাদন করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতে রবার উৎপাদনের পবিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়। ভারতের দক্ষিণাংশে রবার উৎপাদনের উপযোগী অবস্থা বিদ্যমান। নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী বলিয়া এখানকার উত্তাপ ২৭° সেঃ অপেক্ষা বেশী এবং বৃষ্টিপাতও প্রচুর (২০০ সেঃ মিঃ-এর বেশী)। ইহা ছাড়া এখানকার জলবায়ুর সহিত অন্যতম উল্লেখযোগ্য রবার-উৎপাদক সিংহলের জলবায়ুর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এই সকল কারণে ভারতের কেরালা, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে রবারের উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভারতে রবারের **হেক্টর-প্রতি উৎপাদন** সন্তোষজনক নহে। মালয়ে হেক্টর-প্রতি গড় উৎপাদন ৫১০ কিলোগ্রাম, সিংহলে ৪০০ কিলোগ্রাম, কিন্তু ভারতে সর্বোচ্চ উৎপাদন মাত্র ৩৬৩ কিলোগ্রাম। এই দেশে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বাড়াইতে হইলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চারাগাছের সাহায্যে ইহা করিতে হইবে। ভারতে রবার-চষের আর একটি **সমস্যা হইল** এই যে, এখানকার

উৎপাদন-খরচ অপেক্ষাকৃত বেশী। শ্রমিকের অধিকতর মজুরি ও কর্মক্ষমতার অভাব ইহার প্রধান কারণ। ইহা ছাড়া রবারের মূল্যের স্থায়িত্ব না থাকায় রবার-চাষে আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য **তৃতীয় পরিকল্পনায়** রবার-বাগানের উন্নতির জন্য সরকার অর্থ-সাহায্যের বরাদ্দ করিয়াছে এবং নূতন জমিতে রবার-চাষের বন্দোবস্ত করিতেছে। ইহার ফলে এই পরিকল্পনার কার্যকালের শেষে ১৯৬৫-৬৬ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫,০০০ টনে দাঁড়াইবে; নূতন আবাদ হইতে অতিরিক্ত ১৫,০০০ টন রবার পাওয়া যাইবে। ইহা দ্বারাও ক্রমবর্ধমান রবার-শিল্পের চাহিদা মিটানো যাইবে না বলিয়া এই পরিকল্পনায় ৫০,০০০ টন কৃত্রিম রবার উৎপাদনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশের বেরিলিতে একটি কৃত্রিম রবারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতে রবারের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চাহিদা মিটাইবার ভার দেওয়া হইয়াছে **'ভারতীয় রবার বোর্ডের' (Indian Rubber Board)** উপর; ইহার প্রধান কার্যালয় কোট্টিয়ামে। রবার-শিল্পের উন্নতি, রবারের আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য-নির্ধারণ এই সংস্থার প্রধান কাজ। সম্প্রতি এই সংস্থা রবার উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য নূতন নূতন জমি রবার-চাষের আওতায় আনিতেছে। আশা করা যায় শীঘ্রই ভারত রবার উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইবে।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে ১৯৬৪ সালে [illegible].৫০০ মেঃ টন রবার উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে কেরালা রাজ্যে উৎপন্ন হয় শতকরা ৯৬ [illegible]। ইহা ছাড়া মহীশূর ও মাদ্রাজে অল্পবিস্তর রবারের চাষ হয়।

বাণিজ্য—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতে উৎপন্ন রবারের দুই-তৃতীয়াংশ বিদেশে রপ্তানি হইত। কিন্তু স্বাধীনতার পর রবার-শিল্পের উন্নতি হওয়ায় আভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং রবার আমদানি সুরু হয়। এইজন্য ভারতের রবার উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলেও রবার-শিল্পের উন্নতি হওয়ায় এই দেশে রবারের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে রবার আমদানির পরিমাণও বাড়িয়া যাইতেছে।

রবারের উৎপাদন ও আমদানির গতি ও লক্ষ্য (সহস্র টন)

	উৎপাদন	আমদানি		উৎপাদন	আমদানি
১৯৫০-৫১	১৫.৬	১.১	১৯৬০-৬১	২৬.৪	১১.৯
১৯৫৫-৫৬	২২.৫	৩.৮	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	৪৫.০	০

তৈলবীজ (Oil-seeds)

ভারতে বিভিন্ন রকমের তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। ইহা এই দেশের অন্যতম প্রধান অর্থপ্রসূ ফসল। তৈলবীজ উৎপাদনে ও রপ্তানিতে ভারত পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। এখানকার তৈলবীজ হইতে তৈল, সার্লাড, খাদ্যদ্রব্য, রং, গন্ধদ্রব্য, বার্নিশ, মোমবাতি, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

ভারতের তৈলবীজ-উৎপাদন (১৯৬৩-৬৪)

	উৎপাদন (লক্ষ মে:টন)	পৃথিবীতে ভারতের স্থান		উৎপাদন (লক্ষ মে: টন)	পৃথিবীতে ভারতের স্থান
চীনাবাদাম	৫২.৯১	প্রথম	রেড়ি	১.০১	দ্বিতীয়
সরিষা	৯.০৯	প্রথম	তিসি	৩.৮৫	চতুর্থ
তিল	৪.১০	দ্বিতীয়	মোট	৭.১০	

ভারতে দুইপ্রকার তৈলবীজ উৎপন্ন হয়—ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য। ভক্ষ্য (Edible) তৈলবীজের মধ্যে চীনাবাদাম, সরিষা, তিল, কার্পাস বীজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অভক্ষ্য (Non-Edible) তৈলবীজের মধ্যে তিসি ও রেড়িই প্রধান। পূর্বে অধিকাংশ তৈলবীজ বীজ আকারেই বিদেশে রপ্তানি হইত, বর্তমানে বহুলাংশে তৈলবীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের পর, তৈল রপ্তানি হয়; ইহার ফলে যে খইল পাওয়া যায়, তাহা গবাদি পশুর খাদ্য ও সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ভারতে তৈলবীজ উৎপাদনের জন্য প্রায় ১২ কোটি হেক্টর পরিমিত জমি নিয়োজিত হয়; মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৬৬ লক্ষ মে: টন। ভারতে তৈলবীজ উৎপাদনের প্রধান **সমস্যা** এই যে, উৎপাদক অঞ্চলে এখনও ভালোভাবে তৈল-নিষ্কাশন ও উপজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের সুবন্দোবস্ত হয় নাই। ইহার ফলে চাষী তৈলবীজের উপযুক্ত মূল্য পায় না। ১৯৪৬ সালে 'ভারতীয় কেন্দ্রীয় তৈলবীজ কমিটি' (Indian Central Oil-seeds Committee) গঠিত হয়। এই সংস্থা তৈলবীজের উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য চেষ্টা করিতেছে। হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া, উন্নততর বীজ সরবরাহ করিয়া, তৈলবীজে পোকা ধ্বংসের ব্যবস্থা করিয়া এই সংস্থা তৈল-বীজের উৎপাদন-বৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তৈলবীজ উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৭০ লক্ষ টন; কিন্তু উৎপাদন হইয়াছে ৬৬ লক্ষ টন।

তৃতীয় পরিকল্পনায় তৈলবীজ উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে ৯৮ লক্ষ টন। ভারতে তৈলবীজের উৎপাদন ও রপ্তানি-বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। বর্তমানে রপ্তানির প্রধান **সমস্যা** এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, আর্জেন্টিনা ও ব্রেজিল হইতে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার সম্মুখে ভারতকে তৈলবীজ রপ্তানি করিতে হইতেছে। অন্যতম সমস্যা ভারতের তৈলবীজের অধিকতর উৎপাদন-খরচ। ইহাতে বৈদেশিক বাজারে রপ্তানির পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। ভারতে অভক্ষ্য তৈলবীজ হইতে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুতের চেষ্টা হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কার্পাস বীজ হইতে তৈল-নিষ্কাশনের জন্য এবং মহুয়া, নিম প্রভৃতি তৈলবীজ শিল্পে নিয়োগের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী জমিতে অবসর সময়ে তৈলবীজের চাষ করিয়া এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনের অনুপযোগী জমিতে তৈলবীজ উৎপাদন করিয়া ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার ও রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনার মারফত করা হইতেছে।

চীনাবাদাম (Ground-nut)—পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৩৩ ভাগ উৎপন্ন করিয়া ভারত চীনাবাদাম উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। বনস্পতি তৈল, কেশতৈ[illegible] ও সাবান প্রস্তুতে, রন্ধনকার্যে প্রধানতঃ ইহা ব্যবহৃত হয়। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, মা[illegible] মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর-প্রদেশে ভারতের অধিকাংশ চীনাবাদাম উৎপন্ন [illegible] ইহা প্রধানতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলের ফসল বলিয়া দাক্ষিণাত্যে ইহার চাষ প্রায় সীমাবদ্ধ [illegible] ও উত্তরপ্রদেশের পরিমাণ অত্যন্ত কম। বোম্বাই ও মাদ্রাজ বন্দর মারফত ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বৃটেন ও ইটালিতে প্রচুর পরিমাণে চীনাবাদাম রপ্তানি হয়।

বিভিন্ন রাজ্যে চীনাবাদাম উৎপাদন (১৯৬৩-৬৪)

(সহস্র টন)

গুজরাট	১,১২৫	মহারাষ্ট্র	৭৬৮	মহীশূর	৪৩০
মাদ্রাজ	৯৯৭	অন্ধ্র	৫০৫	মধ্যপ্রদেশ	৩০৩

সরিষা (Mustard and Rape-seed)—পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৩৫ ভাগ উৎপন্ন করিয়া ভারত সরিষা উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রধানতঃ গমের সহিত ইহার চাষ হইয়া থাকে। রন্ধনকার্যে,

গাত্র-মর্দনে ও সাবান প্রস্তুতে সরিষার তৈল ব্যবহৃত হয়। উত্তর ভারতে অধিকাংশ সরিষা উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যায় অধিকাংশ সরিষা উৎপন্ন হয়। ভারতের প্রায় অর্ধেক সরিষা আসে উত্তরপ্রদেশ হইতে। কানপুর ও কলিকাতা সরিষার তৈল উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। কলিকাতা বন্দর মারফত অল্প পরিমাণে সরিষা বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালি প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

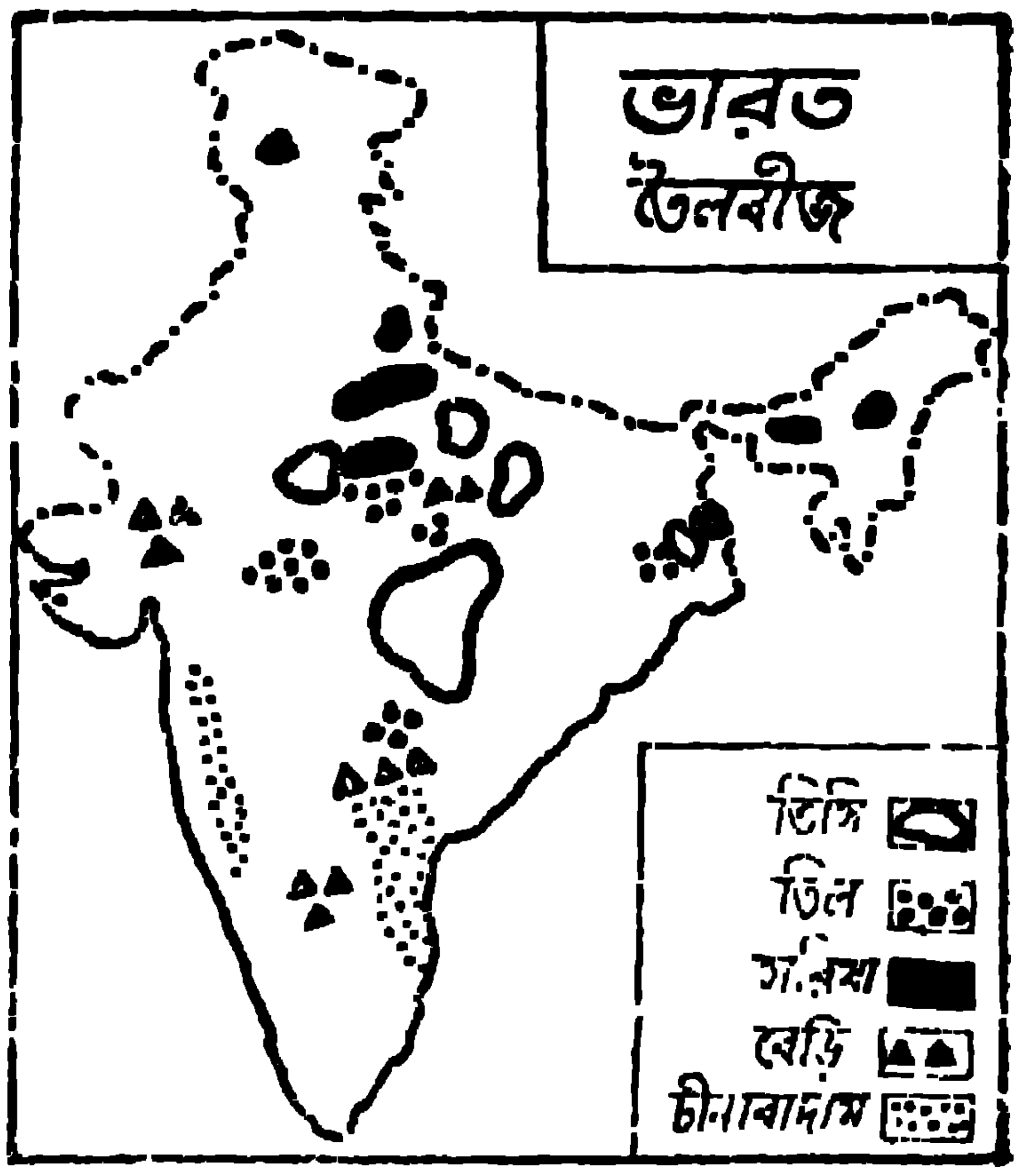

তিল (Sesame Seed)—পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ২১ ভাগ উৎপন্ন করিয়া ভারত তিল-উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ; চীনের পরেই ভারতের স্থান। কেশ-তৈল প্রস্তুতে ও রন্ধনকার্যে তিলতৈল ব্যবহৃত হয়। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র ও গুজরাটে অধিকাংশ তিল উৎপন্ন হয়। বোম্বাই বন্দর মারফত অধিকাংশ রপ্তানিযোগ্য তিল বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী, ইটালি, মিশর প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়।

রেড়ি (Castor Seed)—পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ উৎপন্ন করিয়া ভারত রেড়ি উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ; ব্রেজিলের পরেই ভারতের স্থান। রেড়ির তৈল হইতে ঔষধ, সাবান, কেশ-তৈল, পিচ্ছিলকারক তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ভুট্টা অঞ্চলেই অধিকাংশ রেড়ি উৎপন্ন হয় ; যথা মাদ্রাজ, মহীশূর, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি। মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দর মারফত অধিকাংশ রেড়ির তৈল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বৃটেন, বেলজিয়াম, ইটালি, জার্মানী ও স্পেনে রপ্তানি হইয়া থাকে।

তিসি (Linseed)—পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ১৩ ভাগ উৎপন্ন করিয়া ভারত তিসি উৎপাদনে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ভারতে ইহা প্রধানতঃ বীজের জন্য চাষ করা হয়। তিসির তৈল হইতে উৎকৃষ্ট রং, বার্নিশ, 'অয়েল ক্লথ' প্রস্তুত হয়। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান,

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ তিসি উৎপন্ন হয়; ইহার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মধ্যপ্রদেশ এবং এক-চতুর্থাংশ উত্তরপ্রদেশে উৎপন্ন হয়। বোম্বাই বন্দর মারফত অধিকাংশ তিসি রপ্তানি হয়। বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও ইটালি ভারতীয় তিসির প্রধান আমদানিকারক।

কার্পাস বীজ (Cotton seed)—কার্পাস বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়; ইহা রন্ধনকার্যে ব্যবহার করা যায়। জলপাই তৈলের পরিবর্তেও ইহা ব্যবহৃত হয়। কার্পাস বীজের খইল পশুখাদ্য হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। ভারত কার্পাস বীজ উৎপাদনে পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ১৯৬৪ সালে প্রায় ১৯ লক্ষ মেঃ টন কার্পাস বীজ এই দেশে উৎপাদন করা হয়। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর ও মাদ্রাজে অধিকাংশ কার্পাস বীজ উৎপন্ন হয়। বোম্বাই বন্দর মারফত অল্প পরিমাণে কার্পাস বীজ বিদেশে রপ্তানি হয়।

ভারতে **নারিকেল** হইতেও তৈল প্রস্তুত হয়। নারিকেলের ছোবড়া দড়ি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। মাদ্রাজ, অন্ধ্র, কেরালা, মহিশূর ও পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ নারিকেল জন্মে। নারিকেলের তৈল, শুষ্ক শাঁস, ছোবড়া, দড়ি, পাপোশ ইত্যাদি বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়। ঐ সকল দেশে নারিকেলের শুষ্ক শাঁস হইতে মার্গারেন প্রস্তুত হয়। কোচিন নারিকেল-জাত দ্রব্যাদি রপ্তানির প্রধান বন্দর।

তামাক (Tobacco)

১৫০৮ সালে দক্ষিণ আমেরিকা হইতে বীজ আনিয়া পর্তুগীজগণ ভারতে প্রথম তামাক চাষের উদ্বোধন করে। অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা বিদ্যমান থাকায় বর্তমানে এই দেশ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তামাক-উৎপাদক দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরেই ভারতের স্থান। ভারতে প্রধানতঃ দুই-শ্রেণীর তামাক উৎপন্ন হয়—'নিকোটিনা ট্যাবুকাম' এবং 'নিকোটিনা রাস্টিকা'। ইহার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ প্রথমোক্ত শ্রেণীর তামাক। ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ অতি উচ্চশ্রেণীর ভার্জিনিয়া শ্রেণীর তামাক; বৈদেশিক বাজারে ইহার চাহিদা অত্যন্ত বেশী। ভারতে তামাক প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় সিগারেট, চুরুট, বিড়ি ও নস্য প্রস্তুতে, চিবাইয়া খাইবার জন্য এবং হুঁকায় টানিবার জন্য। তামাকের চাষ হয় প্রধানতঃ জুন হইতে

আগস্ট মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ে। ফসল তোলা হয় ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে।

তামাক গাছের জন্য প্রয়োজন অত্যধিক উত্তাপ ও মাঝারি বৃষ্টিপাত। জমির উর্বরতা ও পরিমিত বৃষ্টিপাতের উপর তামাকের গুণ, গন্ধ এবং হেক্টর-প্রতি উৎপাদন নির্ভর করে। মাদ্রাজে **হেক্টর-প্রতি উৎপাদন** প্রায় ১৩৭০ কিলোগ্রাম, অন্ধ্রে ৯০০ কিলোগ্রাম এবং মহীশূরে ৪২৫ কিলোগ্রাম। ভারতের হেক্টর-প্রতি গড় উৎপাদন প্রায় ৮০০ কিলোগ্রাম। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হেক্টর-প্রতি তামাক উৎপন্ন হয় ১৯০০ কিলোগ্রাম এবং চীনে ২২৭০ কিলোগ্রাম। ভারতের তামাক-চাষের উন্নতিতে ইহা একটি প্রধান সমস্যা। ইহা ছাড়া ভারতের অধিকাংশ তামাকের রং কালো, পাতা পুরু, স্বাদ কড়া এবং এইজন্য সিগারেট উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী নহে। শুধু অন্ধ্রের ভার্জিনিয়া-জাতীয় তামাক সিগারেট প্রস্তুতের উপযোগী। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিহার ও অন্ধ্রে এইজাতীয় তামাকের উৎপাদন-বৃদ্ধির বন্দোবস্ত হইতেছে। ইহার ফলে ১৯৬৫-৬৬ সালে এইজাতীয় তামাকের অংশ মোট উৎপাদনের ১৫% হইতে বাড়িয়া ২৫% হইবে। তামাক-চাষের বিভিন্ন অসুবিধা দূর করিবার দায়িত্ব ভারত সরকার 'ভারতীয় কেন্দ্রীয় তামাক কমিটি' (Indian Central Tobacco Committee) নামে একটি প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করিয়াছে। এই কমিটি সিগারেট শিল্পে অধিকতর ভারতীয় তামাক ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণার জন্য রাজমুন্দ্রীতে (অন্ধ্র) একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছে। মাদ্রাজের ভেদাসনদাস, বিহারের পুষা এবং পশ্চিমবঙ্গের দিনহাটায় আঞ্চলিক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। মনে হয়, কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে, ভারতে রপ্তানিযোগ্য উচ্চশ্রেণীর তামাক উৎপাদন সম্ভবপর। ভারতের তামাক-শিল্পে একটি প্রধান সমস্যা এই যে, এই শিল্পের শতকরা ৯০ ভাগ উৎপাদন এখনও বিদেশীয়গণের অধীন। এইজন্য এই শিল্পে অধিকতর পরিমাণে ভারতীয় তামাক নিয়োগ করা সম্ভবপর নহে।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতের প্রায় সকল অংশেই কমবেশী তামাক উৎপন্ন হইলেও প্রধানতঃ দুইটি অঞ্চলে ইহার উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশী—বিহার ও উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ লইয়া গঠিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর ও গুজরাট লইয়া গঠিত দক্ষিণাঞ্চল।

ভারতের তামাক উৎপাদন (১৯৬৩-৬৪)—৩·৬৭ লক্ষ মেঃ টন

	সহস্র হেক্টর	সহস্র মেঃ টন		সহস্র হেক্টর	সহস্র মেঃ টন
অন্ধ্র	৫৯	১১৯	মহীশূর	১৬	২৫
গুজরাট	৪৪	৬৪	উত্তরপ্রদেশ	৮	১৭
মাদ্রাজ	৭	২৮	পশ্চিমবঙ্গ	৭	২৬

ভারতে মোট ৪ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে তামাকের চাষ হয়। **অন্ধ্র** রাজ্যে ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ তামাক উৎপন্ন হয়। গুণ্টুর, বিশাখাপতনম্ ও পূর্ব গোদাবরী জেলায় অধিকাংশ তামাক পাওয়া যায়; ইহার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ তামাক পাওয়া যায় গুণ্টুর জেলা হইতে। এখানকার তামাক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং সিগারেট, চুরুট, নস্য প্রভৃতি প্রস্তুতের উপযুক্ত। **গুজরাট** রাজ্যের বরোদা ও কৈরা জেলায় অধিকাংশ তামাক পাওয়া যায়। **মাদ্রাজের** ডিণ্ডিগাল, মাদুরাই, ত্রিচিনাপল্লী ও কোয়েম্বাটুর তামাক উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এখানকার তামাক প্রধানতঃ চুরুট ও বিড়ি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। **মহীশূর** রাজ্যের নদী-উপত্যকায়, অন্ধ্রের সামান্তবর্তী এলাকায় অধিকাংশ তামাক উৎপন্ন হয়। **বিহারের** মজঃফরপুর, দারভাঙ্গা, মুঙ্গের ও পূর্ণিয়া জেলায় রাজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ তামাক উৎপন্ন হয়। **পশ্চিমবঙ্গে** জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর ও হুগলী জেলায় অধিকাংশ তামাক পাওয়া যায়। এখানকার তামাক প্রধানতঃ সিগারেট, বিড়ি ও হুঁকার তামাক প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া পাঞ্জাবের জলন্ধর, হোসিয়ারপুর ও গুরদাসপুর জেলায় মহারাষ্ট্রের নিশানি অঞ্চলে, উত্তর-প্রদেশের মৈনপুরী, এটাও, বারাণসী জেলায়, আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় অল্পবিস্তর তামাক উৎপন্ন হয়।

ব্যবসায়-বাণিজ্য—ভারতের মোট উৎপন্ন তামাকের শতকরা ১৮ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। অন্ধ্রের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ভার্জিনিয়া তামাক অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হয়। মোট রপ্তানির শতকরা ৬০ ভাগ তামাক মাদ্রাজ বন্দর মারফত প্রেরিত হয়। ভারত তামাক রপ্তানি করিয়া প্রতি বৎসর প্রায় ১৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। তৃতীয় পরিকল্পনায় তামাকের রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ভারতে তামাকের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারও প্রচুর। সুতরাং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর

তামাকের উৎপাদন বাড়াইতে পারিলে ভারতে তামাক-চাষের ও তামাক-শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। তামাকের রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে 'তামাক রপ্তানি-উন্নয়ন সংস্থা' (Tobacco Export Promotion Council) গঠন করিয়াছে। এই সংস্থা নূতন নূতন বৈদেশিক বাজার অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে। বর্তমানে বৃটেন, রাশিয়া, জাপান, এডেন, সিংহল, মিশর, ইন্দোনেশিয়া ও হল্যাণ্ডে ভারতীয় তামাক রপ্তানি হয়। পশ্চিম জার্মানী, মধ্যপ্রাচ্য ও রাশিয়ায় তামাকের রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য সরকার বিশেষ সচেষ্ট আছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্রস্থল **গুণ্টুর**। এই সহরে প্রচুর তামাক বেচাকেনা হয় এবং এই স্থান হইতে রপ্তানিযোগ্য তামাক মাদ্রাজ ও বিশাখাপত্তনম্ বন্দরে প্রেরিত হয়।

খনিজসম্পদ

(Minerals)

প্রকৃতি ভারতকে প্রচুর খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে খনি হইতে এই সম্পদ আহরণের পরিমাণ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য ছিল। ইহা ছাড়া সেই সময় খনিজ সম্পদ [illegible] হইত প্রধানতঃ বৃটেনের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে শিল্পোন্নতি আরম্ভ হওয়ায় খনিজ সম্পদের চাহিদা প্রচুর বাড়িয়া গেল। সেইজন্য খনিজ সম্পদ আহরণের পরিমাণও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারত সরকার স্বাধীনতা লাভের পর 'জাতীয় খনিজ নীতি' (National Mineral Policy) গ্রহণ করে। খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান, আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদন, প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার সম্বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য কয়েকটি জাতীয় সংস্থা স্থাপিত হয়। ইহার মধ্যে 'ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা' (Geological Survey of India), 'তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন' (Oil & Natural Gas Commission) এবং ভারতীয় খনি সংস্থা (Indian Bureau of Mines) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল

সংস্থার কার্যকলাপ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনায় প্রচুর ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়। এই সকল সংস্থার সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নূতনভাবে সঞ্চিত খনিজ সম্পদের পরিমাপ করা হয় এবং নূতন খনি আবিষ্কারের বন্দোবস্ত হয়। ইহার ফলে বহু নূতন খনি বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সিঙ্গরাউলি (মধ্যপ্রদেশ) অঞ্চলের কয়লাখনি, কিরিবুরু (উড়িষ্যা) অঞ্চলের লৌহখনি, ক্ষেত্রী (রাজস্থান) ও সিকিমের তাম্রখনি এবং ক্যাম্বে-অ্যাংকেলেশ্বর (গুজরাট), নাহারকাটিয়া ও শিবসাগর (আসাম) অঞ্চলের তৈলখনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল আবিষ্কারের ফলে ভারতের খনিজ সম্পদের মানচিত্র বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়** খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের জন্য নানাবিধ পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। **প্রথম পরিকল্পনায়** খনিজ সম্পদের গুণাগুণ ও পরিমাণ নির্ধারণের জন্য এবং ইহার যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্য প্রায় ২'৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়। বিভিন্ন খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে গবেষণার বন্দোবস্ত করা হয়। কয়লা, লৌহ আকরিক প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্যও এই পরিকল্পনায় বন্দোবস্ত করা হয়। **দ্বিতীয় পরিকল্পনায়** ভারতে শিল্পগঠনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সেইজন্য শিল্পে প্রয়োজনীয় [illegible] দ্রব্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। [illegible] কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র, জিপ্‌সাম, সীসা, [illegible] চুনাপাথর প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পরিমাপের ভার 'ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা', 'ভারতীয় খনি সংস্থা' এবং 'তৈল ও স্বাভাবিক গ্যাস কমিশনে'র উপর ন্যস্ত করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন, অনুসন্ধান, গবেষণা প্রভৃতির জন্য প্রায় ৭৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের আরও প্রসার হইবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য রপ্তানিও বৃদ্ধি করিতে হইবে। এইজন্য খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার নানাবিধ ব্যবস্থা এই পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হইয়াছে। কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ৯'৭ কোটি টন এবং লৌহ আকরিকের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ৩ কোটি টনে পরিণত করা হইবে। ইহার মধ্যে এক কোটি টন লৌহ আকরিক বিদেশে রপ্তানি করা হইবে। এই পরিকল্পনায় খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য, সঞ্চিত খনিজ সম্পদের

সঠিক পরিমাপের জন্য, খনিজ দ্রব্য সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য, খনিজ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সরকারী ও বে-সরকারী খাতে মোট খরচ হইবে ৫৩৮ কোটি টাকা। আমদানীকৃত খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও উৎপাদন, রপ্তানিযোগ্য খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের নূতন খনি আবিষ্কারের জন্য এই পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। সঞ্চিত খনিজ সম্পদের পরিমাপ, অনুসন্ধান প্রভৃতির জন্য 'ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষাকে' ১০ কোটি টাকা এবং 'ভারতীয় খনি সংস্থাকে' ৫ কোটি টাকা দেওয়া হইবে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান কয়লা, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমাইট, বক্সাইট, চুনাপাথর, তাম্র প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের অনুসন্ধান, পরিমাপ প্রভৃতি কার্য এই পরিকল্পনার কার্যকালে চালাইয়া যাইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের লক্ষ্য অতি উচ্চে স্থাপিত হইলেও, খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। ১৯৬৪ সালে, মূল্যের দিক হইতে বিচার করিলে, ভারতে খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন তৎ-পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৩ ভাগ কম হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়লার উৎপাদন কমিয়াছে শতকরা ৫ ভাগ।

ভারতের খনিজ দ্রব্য আহরণে বর্তমানে প্রায় ৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে; তন্মধ্যে ৩·৯ লক্ষ লোক কয়লাখনিতে এবং ·৬ লক্ষ লোক লৌহখনিতে কাজ করে। ভারতে বিভিন্ন প্রকারের খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত হইলেও সকলের গুরুত্ব সমান নহে। কয়েকটি খনিজ সম্পদে ভারতের স্থান অনেক ঊর্ধ্বে; যেমন, অভ্র, ইল্‌মেনাইট, মোনাজাইট, জিরকন ও অভ্র উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে প্রথম। ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ভারত দ্বিতীয়, লৌহ আকরিকে নবম, কয়লায় অষ্টম, লবণে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। কয়েকটি খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনে ভারত স্বাবলম্বী হইলেও, এখনও এই দেশকে অনেক খনিজ দ্রব্য আমদানি করিতে হয়। নির্ভরশীলতা অনুসারে এই দেশের খনিজ দ্রব্য-সমূহকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—

(ক) যে সকল খনিজ সম্পদে ভারত স্বাবলম্বী—কয়লা, স্বর্ণ, জিপ্‌সাম, ক্রোমিয়াম, চুনাপাথর, ডোলোমাইট, পাইরাইট, নাইট্রেট, ফস্‌ফেট, জিরকন, ভ্যানাডিয়াম, তাম্র, গৃহাদি নির্মাণের দ্রব্যাদি, সোহাগা ইত্যাদি।

(খ) যে সকল খনিজ সম্পদে ভারত শুধু স্বাবলম্বী নহে, রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্তও প্রচুর—লৌহ আকরিক, টাইটানিয়াম, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ,

ম্যাগ্‌নেসাইট, বক্সাইট, সিলিকা, মোনাজাইট, কারাণ্ডাম, বেরোলিয়াম প্রভৃতি।

(গ) যে সকল খনিজ সম্পদের জন্য ভারতকে বহুলাংশে আমদানির উপর নির্ভর করিতে হয়—রৌপ্য, নিকেল, খনিজ তৈল, গন্ধক, সীসা, দস্তা, রাং, পারদ, টাংস্টেন, মলিবডেনাম, গ্রাফাইট, প্লাটিনাম, পটাশ, অ্যাসফাল্ট প্রভৃতি।

ভারতে খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (লক্ষ টন)

	১৯৫০	১৯৫৫	১৯৬০	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)
কয়লা	৩২৩	৩৮২	৫২৭	৯৭০
খনিজ তৈল	২.৬	৩.৬	৪.৫	৩৫
লৌহ আকরিক	২৯.৭	৪৬.৮	১০৫.২	৩০০
ম্যাঙ্গানিজ	৮.৮	১৫.৮	১১.৮	২০
চুনাপাথর	২৯.২	৭৩.৭	১২৫.৩	২৯৮
বক্সাইট (সহস্র টন)	৬৪	৯০	৩৮৩	৪৫০
তাম্র "	৬.৬	৭.৫	৮.০	২০

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ভারত কয়েকটি প্রধান প্রধান খনিজ দ্রব্য উত্তোলনে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে লৌহ আকরিক ও কয়লা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত দশ বৎসরে [illegible] আকরিকের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে সাড়ে তিন গুণ এবং কয়লা প্রায় দ্বিগুণ। [illegible] ভারতীয় ইস্পাত শিল্পের উন্নতির ফলেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।

ভারতের খনিজ দ্রব্য উত্তোলনে বিভিন্ন **সমস্যার** সম্মুখীন হইতে হয়। লৌহ, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ রপ্তানি করিয়া তাড়াতাড়ি প্রচুর মুনাফা করিবার লোভে বহু ব্যবসায়ী ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করিয়া এই সকল খনিজ সম্পদ অধিকমাত্রায় উত্তোলন করে। সুতরাং এই সকল দ্রব্যের উৎপাদন সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ না করিলে, পরে ইহার অভাব দেখা দিতে পারে। ভারতের অধিকাংশ মূল্যবান্ খনিজ সম্পদ উত্তর-পূর্ব ভারতে বিশেষতঃ বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে পাওয়া যায়। ভারতের মোট খনিজ সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগ বিহারে পাওয়া যায়। কয়লা, লৌহ আকরিক, তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, বক্সাইট প্রভৃতির উৎপাদন প্রায় এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। সেইজন্য দেশের

অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পোন্নয়নে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ভারত এখনও শিল্পে আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া খনিজ দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম। এইজন্য অনেক খনিজ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিতে হয়। খনিজ সম্পদ আহরণে ভারতে এখনও বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হয় নাই। গরম দেশ বলিয়া শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতাও কিছুটা কম; সেইজন্য এখানে খনিজ দ্রব্যের মাথাপিছু উৎপাদন অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী দেশ অপেক্ষা অনেক কম। ভারতে যানবাহনের অসুবিধা থাকায় এখানে খনিজ দ্রব্য আহরণে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বহু খনিজ পদার্থ হইতে অনেক উপজাত-দ্রব্য পাওয়া যায়। এই সকল উপজাত-দ্রব্যের উৎপাদনের প্রতি অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টি না দেওয়ায় খনিজ দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যায়। আশা করা যায়, দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল অসুবিধা দূর হইবে।

কয়লা (Coal)

ভারতে কয়লা উত্তোলন প্রথম আরম্ভ হয় ১৭৭৪ সালে রাণীগঞ্জের সীতারামপুর অঞ্চলে। সেই সময় যানবাহনের অভাবে কয়লা উত্তোলনের অসুবিধা হইত। পরে 'পূর্ব ভারত রেলপথ' (East India Railway) কোম্পানী কয়লাখনি-অঞ্চলে রেলপথ স্থাপন করায় কয়লা উত্তোলন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কয়লা ভারতের সর্বপ্রধান খনিজ দ্রব্য। পৃথিবীর মোট উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৩ ভাগ কয়লা উৎপন্ন করিয়া ভারত কয়লা উৎপাদনে পৃথিবীর অষ্টম স্থান অধিকার করে। ভারতের কয়লাখনিসমূহে মোট চার লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। ভারতের খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্য; কারণ এই দেশের মোট খনিজ দ্রব্যের মূল্যের শতকরা ৭৫ ভাগ শুধুমাত্র কয়লা হইতে আসে।

কয়লা উৎপাদনে এই দেশকে বিভিন্ন **সমস্যার** সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ, ভারতীয় কয়লা সাধারণতঃ **নিকৃষ্ট শ্রেণীর**। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশসমূহের কয়লা হইতে এখানকার কয়লার তাপজনন-শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। কয়লায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অত্যধিক বেশী থাকায় এখানকার কয়লা হইতে প্রচুর ধোঁয়া বাহির হয়। এখানে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বিটুমিনাস্-জাতীয় কোক-কয়লার পরিমাণ অত্যন্ত কম। ইহার উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে আগামী ৮০ বৎসরে ইহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, **যানবাহনের** সুবন্দোবস্ত না থাকায় ভারতে কয়লার উত্তোলন বৃদ্ধি পায় না। জলপথের সুবিধা না থাকায় এবং সমুদ্রতীর নিকটবর্তী না হওয়ায় কয়লা-পরিবহণের জন্য একমাত্র রেলপথের উপর নির্ভর করিতে হয়। রেলপথের মাসুল অত্যধিক হওয়ায় কয়লার দাম বাড়িয়া যায়। তৃতীয়তঃ, ভারতের কয়লাখনিসমূহ একটি অঞ্চলে **কেন্দ্রীভূত**। রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া অঞ্চলেই ভারতের অধিকাংশ কয়লা পাওয়া যায়। ফলে, অন্যত্র কয়লা পাঠাইতে প্রচুর মাসুল দিতে হয়। দক্ষিণ-ভারতে কয়লার উৎপাদন নগণ্য বলিয়া এখানকার শিল্পোন্নতি ব্যাহত হয়। চতুর্থতঃ, গরম দেশ বলিয়া ভারতীয় শ্রমিকগণ অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের মতো কর্মক্ষম না হওয়ায় এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে এখানে **মাথাপিছু উৎপাদন** অনেক কম। যন্ত্রপাতির অভাবে অনেক কয়লা ভূগর্ভে থাকিয়া যায়। কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকিবার জন্য অনেক শ্রমিক বৎসরের সবসময় খনিতে কাজ করিতে পারে না। পঞ্চমতঃ, কয়লা হইতে **উপজাত-দ্রব্য** (By-Products) প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থার উন্নতিসাধন না হওয়ায় এখানে কয়লার দাম বাড়িয়া যায়।

বর্তমানে ভারতে **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার** মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় কোন কোন সমস্যার সমাধান হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন কয়লা-সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন কার্যকরী করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। বিভিন্ন পরিকল্পনায় কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির বন্দোবস্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল ৬ কোটি টন; প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছে ৫'৪৬ কোটি টন। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে ৯'৭ কোটি টন। এই লক্ষ্য পরে ১০'৫ কোটি টনে বাড়ানো হইলেও, আবার উহাকে ৮ কোটি টনে নামানো হয়। দুঃখের বিষয় চাহিদার অভাব, ও পরিবহণের অব্যবস্থার জন্য এই লক্ষ্যও পূর্ণ হয় নাই। দেশে শিল্পের উন্নতির জন্যই কয়লার উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে 'জাতীয় কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশন' (National Coal Development Corporation)-এর মাধ্যমে সরকার স্বয়ং বহু খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করিতেছে। কিন্তু এখনও বে-সরকারী খনির সংখ্যা অনেক বেশী; এই সকল খনির মালিকগণ সর্বদা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করায় এবং রেলপথ সর্বদা কয়লা-বহনে

অক্ষম হওয়ায় পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়লার উত্তোলন করা হয় না। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্য পূরণ না হওয়ার ইহাই প্রধান কারণ। যতক্ষণ কয়লা-শিল্পকে **জাতীয়করণ** করা না হইবে, ততক্ষণ এই শিল্পের আশানুরূপ উন্নতি হইবে না। অন্যদিকে দেশের শিল্পোন্নয়ন নির্ভর করে বহুলাংশে কয়লার উৎপাদনের উপর। সেইজন্য এই শিল্পের শীঘ্রই জাতীয়করণ করা একান্ত প্রয়োজন। কয়লা শিল্পের নানাবিধ উন্নতির জন্য ধানবাদে 'ইন্ধন গবেষণা প্রতিষ্ঠান' (Fuel Research Institute) বিভিন্ন গবেষণা-কার্য চালাইতেছে। কয়লাখনি-সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য 'কয়লা বোর্ড' (Coal Board) গঠিত হইয়াছে।

ভারতের কয়লা উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (লক্ষ টন)

১৯৪৮	২৪৮	১৯৫৫-৫৬	৩৮৪
১৯৫০-৫১	৩২৩	১৯৬০-৬১	৫৪৬

১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য) ৯৭০ (পরিবর্তিত লক্ষ্য ৮০০)

তৃতীয় পরিকল্পনায় কোক-কয়লা সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। কারণ ভারতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সঞ্চিত কোক-কয়লার পরিমাণ অত্যন্ত কম। এই পরিকল্পনায় কয়লা শিল্পের উন্নতির জন্য কয়লা-পরিবহণের সুবন্দোবস্ত, কয়লা-শোধনাগার প্রতিষ্ঠা, নূতন খনির উদ্বোধন, কারিগরী [illegible] বন্দোবস্ত প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ভারতে কয়লার **ব্যবহার** এইভাবে হইয়া থাকে—রেল-ইঞ্জিনে শতকরা ৩৩ ভাগ, শিল্প-কারখানায় ২৯ ভাগ, কয়লাখনিতে ও কোক উৎপাদনে ১১ ভাগ, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৮ ভাগ, গৃহস্থের জ্বালানি হিসাবে ৮ ভাগ, রপ্তানি-বাণিজ্য ও জাহাজে ৫ ভাগ এবং অন্যান্য কার্যে ৬ ভাগ। বর্তমানে নূতন নূতন তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় তাপ উৎপাদনের কার্যে কয়লার চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৬,০০০ কোটি টন। এই দেশে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর কয়লাখনি আছে—গণ্ডোয়ানা ও টার্শিয়ারী। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যের খনিসমূহ গণ্ডোয়ানা শ্রেণীভুক্ত। আসাম, রাজস্থান, মাদ্রাজ, কাশ্মীর

প্রভৃতি রাজ্যের কয়লাখনি টার্শিয়ারী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬৪ সালে ভারতে মোট কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ মেঃ টন। মোট উৎপাদনের শতকরা ৯৮ ভাগ গণ্ডোয়ানা কয়লা এবং ২ ভাগ টার্শিয়ারী কয়লা। ভারতের নিম্নলিখিত খনিসমূহে অধিকাংশ কয়লা উত্তোলিত হয় :—

রাজ্য	কয়লাখনি	উৎপাদন (১৯৬০-৬১) (লক্ষ টন)	উৎপাদন-লক্ষ্য (১৯৬৫-৬৬) (লক্ষ টন)
বিহার	ঝরিয়া	১৬০·৯	২১৯·৩
	কারাণপুরা	৪৪·৭	৪৮·৯
	বোকারো	৩৭·৫	৬২·৬
	গিরিডি	৪·৬	৪·৬
	রামগড়	—	১৫·০
পশ্চিমবঙ্গ	রাণীগঞ্জ	১৮০·৮	২৮৭·১
	দার্জিলিং	·৪	·৪
মধ্যপ্রদেশ	কোর্‌বা	৫·৭	২০·৭
	পেঞ্চ-কানহান	—	৩৪·৩
	বিস্‌রামপুর	—	২৫·০
	চর্চা-ঝিলিমিলি	—	১০·০
	সিঙ্গরাউলি	-	২৫·০
মহারাষ্ট্র	চিন্দোয়ারা ও চান্দা	৩০·৬	৩০·৬
	কাম্পতি	—	[illegible]·০
উড়িষ্যা	তালচের, রামপুর	৮·৮	২৮·৮
অন্ধ্র	সিঙ্গারেণী	২৫·২	৫৫·২
আসাম	মাকুম, নাজিরা	৬·৮	৬·৮
রাজস্থান	বিকানীর	·৫	·৫
অন্যান্য		৩৯·৭	৮০·২
	মোট	৫৪৬·২	৯৭০·০

(পরিবর্তিত লক্ষ্য—৮০০)

ভারতের মোট ৮০০ কয়লা-খনির মধ্যে অধিকাংশই ভারতের পূর্বাংশে অবস্থিত। ইহার মধ্যে **বিহারের** স্থান সকলের উর্ধ্বে। ভারতের মোট উৎপন্ন কয়লার প্রায় অর্ধেক আসে এই রাজ্য হইতে। এই রাজ্যের খনিসমূহের মধ্যে ঝরিয়া অঞ্চলেই অধিকাংশ কয়লা পাওয়া যায়। বিহারের কয়লাখনিসমূহের উপর এখানকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, সারের কারখানা, চিনি শিল্প, কাগজ

শিল্প, সিমেণ্ট শিল্প প্রভৃতি নির্ভরশীল। বিহারের অন্যান্য কয়লাখনিসমূহের মধ্যে কারাণপুরা, গিরিডি, ডাল্টনগঞ্জ, বোকারো প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাণীগঞ্জ **পশ্চিমবঙ্গের** উল্লেখযোগ্য খনি অঞ্চল। এখানকার কয়লা অত্যন্ত

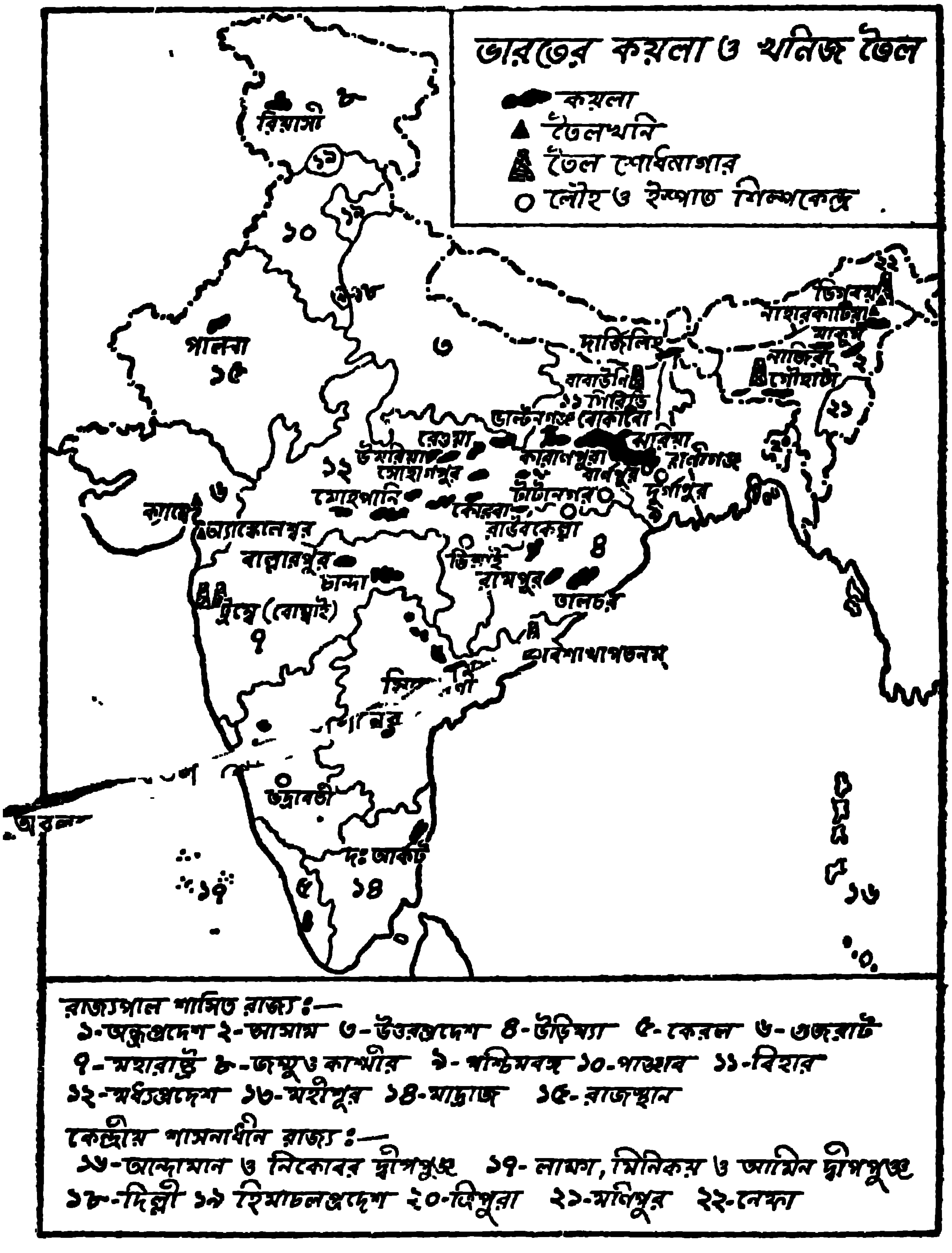

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। এই কয়লাখনির নিকটেই বিখ্যাত দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল অবস্থিত। এখানকার কয়লাখনির উপর পশ্চিমবঙ্গের দুইটি লৌহ ও ইস্পাত

শিল্প, রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণ শিল্প, অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, কাগজ শিল্প, পাট শিল্প, কার্পাসবয়ন শিল্প প্রভৃতি প্রধানতঃ নির্ভরশীল। দুর্গাপুর অঞ্চল রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লার সাহায্যে এতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে যে, দুর্গাপুরকে বর্তমানে 'ভারতের রুর' (Ruhr of India) বলা হয়।

মধ্যপ্রদেশের ভিলাইতে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হওয়ায় স্থানীয় খনিসমূহ হইতে কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং N.C.D.C. নূতন নূতন খনিতে কাজ সুরু করিয়াছে। তন্মধ্যে পেঞ্চ-কানহান, বিস্রামপুর, কোর্বা, সিঙ্গরাউলি, চর্চা-ঝিলিমিলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যপ্রদেশের পুরাতন খনিসমূহের মধ্যে উমারিয়া, সোহাগপুর ও মোহপানী উল্লেখযোগ্য। **উড়িষ্যা** রাজ্যের তালচের খনি হইতে কয়লা প্রধানতঃ প্রেরিত হয় রাউরকেলার লৌহ ও ইস্পাত কারখানায়। ১৯৬২ সালে তালচের অঞ্চলে একটি কয়লাখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সঞ্চিত কয়লাক্ষেত্র বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ও মাদ্রাজে প্রয়োজনের তুলনায় কয়লার উৎপাদন খুব কম। **মহারাষ্ট্রের** কাম্পতি ও **অন্ধ্রের** সিঙ্গারেণীতে কয়লাখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় এই দুইটি খনি হইতে যথাক্রমে ১৫ লক্ষ টন এবং ৩০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হইবে। মহারাষ্ট্রের পুরাতন খনিসমূহের মধ্যে চান্দা ও বল্লারপুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাদ্রাজের দক্ষিণ আর্কটে নূতন লিগ্নাইট কয়লাখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় এখানকার নেভেলিতে এই লিগ্নাইট হইতে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে এবং লিগ্নাইটের গুঁড়া হইতে কয়লার ইট (Briquets) প্রস্তুত হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় দক্ষিণ আর্কটের লিগ্নাইট উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে ৪৮ লক্ষ টন। মাদ্রাজ ভিন্ন জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি, আসামের নাজিরা ও মাকুম, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও রাজস্থানের পালনা অঞ্চলে টার্শিয়ারী কয়লা পাওয়া যায়।

বাণিজ্য—ভারত প্রতিবৎসর প্রায় ১৮ লক্ষ টন কয়লা বিদেশে রপ্তানি করে। মোট রপ্তানির দুই-তৃতীয়াংশ পাঠানো হয় পাকিস্তানে। বাকি অংশ সিংহল, হংকং, ফিলিপাইন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে; ভারতের কয়লাখনিসমূহ সমগ্র দেশে বিস্তৃত নহে। দেশের পূর্বাংশে অধিকাংশ কয়লাখনি অবস্থিত। সেইজন্য দেশের এই অংশ হইতে চতুর্দিকে কয়লা প্রেরিত হয়। ক্রমবর্ধমান শিল্পোন্নতির জন্য ভারতে কয়লার

চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। উৎপাদনের পরিমাণ মোটামুটি সন্তোষজনক হইলেও যানবাহনের অভাবে দূরবর্তী স্থানে রেলপথে কয়লা প্রেরণে অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে ; এইজন্য বর্তমানে কয়লাখনির নিকটবর্তী অঞ্চলে স্থলপথে কয়লা প্রেরিত হইতেছে। দাক্ষিণাত্যের কয়লা বহুলাংশে কলিকাতা বন্দর মারফত সমুদ্রপথে প্রেরিত হইতেছে। দক্ষিণ আর্কটের লিগ্নাইট কয়লাকে কার্যকরী করিতে পারিলে মাদ্রাজ অঞ্চলের কয়লার চাহিদা কিয়দংশে হ্রাস পাইবে।

খনিজ তৈল (Petroleum)

বর্তমান যুগে শিল্পোন্নতির অন্যতম সোপান খনিজ তৈল। কিন্তু ভারতের তৈল-উৎপাদন পৃথিবীর মোট উৎপাদনের তুলনায় নগণ্য। আসামের মাকুম অঞ্চলে ১৮৬৭ সালে প্রথম তৈলখনি আবিষ্কৃত হয়। এই অঞ্চলের ডিগবয় ভারতের প্রথম তৈল উৎপাদন-কেন্দ্র ও শোধনাগার। আসাম অয়েল কোম্পানী নামক একটি ইংরেজ প্রতিষ্ঠান ইহার মালিক। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র ডিগবয় হইতেই সম্পূর্ণ তৈল পাওয়া যাইত। কিন্তু ডিগবয়ের তৈল চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম ছিল বলিয়া ভারতকে অধিকাংশ তৈল বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইত।

স্বাধীনতার পর পরিকল্পনা কমিশন তৈল সরবরাহের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারতে তৈল উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার এবং আমদানীকৃত ও [illegible] তৈল শোধনের জন্য শোধনাগার প্রতিষ্ঠার জন্য নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে **নূতন তৈলখনি আবিষ্কার** করিবার জন্য 'তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন' (Oil & Natural Gas Commission) বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করে। রুমানিয়া ও রাশিয়া এই বিষয়ে ভারত সরকারকে কারিগরী ও আর্থিক সাহায্য দিতে আগাইয়া আসে ; ইহাদের প্রচেষ্টায় আবিষ্কার হইল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন নূতন তৈলখনি। রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় গুজরাটের ক্যাম্বে, অ্যাঙ্কলেশ্বর ও কালোলে মূল্যবান্ তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হিমাচলপ্রদেশের জ্বালামুখী অঞ্চলে তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আসামের নাহারকাটিয়া অঞ্চলে বার্মা শেল কোম্পানীর সহযোগিতায় একটি তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে ; এই খনি হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ২৭'৫ লক্ষ টন তৈল উত্তোলিত হইবে। 'স্ট্যানভ্যাক' নামক একটি মার্কিনী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে

তৈল অনুসন্ধানের কাজ চলে; কিন্তু ইহা ব্যর্থ হইয়াছে। রাজস্থানের জয়সলমীর অঞ্চলে তৈল-অনুসন্ধানের কাজ চলিতেছে। ত্রিপুরা ও কাশ্মীরে তৈলখনি আছে বলিয়া তৈল-বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন।

অপরিস্রুত তৈল (Crude oil) আমদানি করিয়া ভারতে পরিশোধনের ব্যবস্থা করিলে নানাবিধ উপজাত দ্রব্য ইহা হইতে পাওয়া যায় এবং ইহার ফলে তৈলের উৎপাদন-খরচ কমিয়া যায়। এইজন্য ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় এই দেশের বিভিন্ন স্থানে **শোধনাগার** প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'স্ট্যানভ্যাক' অয়েল কোম্পানী (বর্তমান নাম ESSO) এবং বৃটেনের বার্মা শেল অয়েল কোম্পানী বোম্বাই শহরের নিকট **ট্রম্বে** নামক স্থানে দুইটি তৈল-শোধনাগার স্থাপন করিয়াছে; ইহাদের তৈল-পরিশোধনের ক্ষমতা ৩২ লক্ষ টন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালটেক্স কোম্পানীও **বিশাখাপতনমে** একটি শোধনাগার স্থাপন করিয়াছে; ইহার পরিশোধনের ক্ষমতা প্রায় ৫ লক্ষ টন; আমদানীকৃত অপরিস্রুত তৈল এই সকল শোধনাগারে পরিস্রুত হইবার পর দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়। তৈল-শিল্পে বিদেশী একচেটিয়া ব্যবসায়িগণের আধিপত্যের ফলে ভারতে তৈল-শিল্পের বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় ভারত সরকার স্বীয় প্রচেষ্টায় তৈল-শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করে। রাশিয়া ও রুমানিয়া হইতে অত্যন্ত কমমূল্যে তৈল আমদানি হওয়ায় এবং সকল তৈল বৃটিশ ও মার্কিন কোম্পানীসমূহ শোধন করিতে অস্বীকার করায় ভারত সরকার 'ভারতীয় শোধনাগার লিঃ' (Indian Refineries Ltd.) নামে একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে। এই প্রতিষ্ঠান রুমানিয়ার কারীগরী ও অর্থসাহায্যে আসামের **নূনমাটিতে** (গৌহাটির নিকট) এবং রাশিয়ার সাহায্যে বিহারের **বারাউনিতে** দুইটি বিশালকায় শোধনাগার প্রতিষ্ঠা করে। নূনমাটি শোধনাগারে প্রতিবৎসর ৭.৫ লক্ষ টন এবং বারাউনি শোধনাগারে ২০ লক্ষ টন তৈল পরিশোধিত হইতে পারে। নাহারকাটিয়া হইতে একটি নল (Bipe line) নূনমাটি হইয়া বারাউনি শোধনাগার পর্যন্ত গিয়াছে; এই নলটির দৈর্ঘ্য ১,১৬০ কিলোমিটার। নাহারকাটিয়ার তৈল এবং রাশিয়া ও রুমানিয়া হইতে আমদানিকৃত তৈল এই দুইটি শোধনাগারে পরিশোধিত হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় গুজরাটের তৈলখনিসমূহের তৈল-পরিশোধনের জন্য এই রাজ্যের **কয়ালিতে** একটি নূতন শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। এই শোধনাগারে প্রতিবৎসর ২০ লক্ষ

টন তৈল শোধিত হইবে। ইহা ছাড়া **কোচিনে** একটি নূতন তৈল-শোধনাগার স্থাপিত হইতেছে। মার্কিন ও বৃটিশ একচেটিয়া ব্যবসায়িগণের হাত হইতে ভারতের তৈল-শিল্পকে মুক্ত করিবার এই বৈপ্লবিক কার্যক্রমের জন্য ভারতের খনি ও জালানি মন্ত্রী শ্রী কে. ডি. মালবিয়ার নাম ভারতের তৈল-শিল্পের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও তৈল-শিল্প—প্রথম পরিকল্পনার কার্যকালে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অঞ্চল, গুজরাটের ক্যাম্বে অঞ্চল এবং রাজস্থানের জয়সলমীরে অনুসন্ধানকার্যের বন্দোবস্ত করে। এইজন্য 'তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের' সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জয়সলমীর, ক্যাম্বে ও হিমাচলপ্রদেশের জ্বালামুখী অঞ্চলে অধিকতর তৈল অনুসন্ধানের জন্য, বার্মা অয়েল কোম্পানীর সহায়তায় আসামে তৈলখনি আবিষ্কারের জন্য এবং নূনমাটি ও বারাউনিতে শোধনাগার স্থাপনের জন্য প্রায় ২৬ কোটি টাকা খরচ হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় তৈলসম্পদ সম্বন্ধে অধিকতর কার্যকরী পন্থা অনুসরণের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আসামের খনি হইতে 'অয়েল ইণ্ডিয়ার' মারফত অধিকতর তৈল-উত্তোলনের জন্য 'তৈল ও প্রাকৃতিকগ্যাস কমিশনের' মাধ্যমে আরও নূতন খনি আবিষ্কারের জন্য, নূনমাটি ও বারাউনি শোধনাগারের নির্মাণ-প্রশস্ত করিবার জন্য, গুজরাটে একটি নূতন শোধনাগার স্থাপনের জন্য, তৈল-পরিবহণের নল বসাইবার জন্য, 'ভারতীয় তৈল কোম্পানীর' মারফত তৈল-ব্যবসায় অধিকতর কার্যকরী করিবার জন্য এই পরিকল্পনায় ১১৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে ভারতের খনিজ তৈল ও তৈলজাত দ্রব্যাদির চাহিদা হইবে ১১৭'২৩ লক্ষ টন। ইহার মধ্যে ৫৬'৪১ লক্ষ টন বে-সরকারী শোধনাগার হইতে এবং ৭২'৮২ লক্ষ টন (গুজরাটের শোধনাগারের ২০ লক্ষ টন সমেত) সরকারী শোধনাগার হইতে পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া ৪ বৎসরের মেয়াদী এক চুক্তির মারফত রাশিয়া হইতে ১০ লক্ষ টন কেরোসিন ও ডিজেল তৈল প্রতিবৎসর আমদানি হইবে। এইভাবে মোট চাহিদা-পূরণের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় পরিস্রুত তৈল উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে ৬৫ লক্ষ টন। বারাউনি শোধনাগার হইতে কলিকাতা শহরে ও বারাউনির পশ্চিমে তৈল সরবরাহের

জন্য দুইটি নলস্থাপনের প্রাথমিক কার্য এই পরিকল্পনার কার্যকালে চালানো হইবে।

উৎপাদক অঞ্চল—রাশিয়ার তৈলবিশেষজ্ঞগণ সম্প্রতি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে ভারতে সঞ্চিত খনিজ তৈলের পরিমাণ ৫০০ কোটি মেঃ টন। বর্তমানে ভারতের সর্বাধিক তৈল উৎপন্ন হয় আসামের ডিগবয় অঞ্চল হইতে। এখনও **ডিগবয়** ভারতের শ্রেষ্ঠ তৈলকেন্দ্র। লক্ষীমপুর জেলার ডিগবয়, বাপ্পাপুং ও হান্‌সাপুং নামক তিনটি স্থানে প্রধানতঃ ডিগবয়ের তৈল উত্তোলিত হয়; ডিগবয় অঞ্চলের বাৎসরিক তৈল-উত্তোলনের পরিমাণ ৪ লক্ষ টন। সুরমা উপত্যকায় বদরপুর মাসিমপুর ও পাথারিয়া অঞ্চলেও অল্পবিস্তর নিকৃষ্ট শ্রেণীর তৈল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের তৈলে মোমের আধিক্য থাকায় ডিগবয় শোধনাগার হইতে কলিকাতা বন্দর মারফত প্রায় ৩ কোটি টাকার মোমজাতীয় দ্রব্যাদি রপ্তানি হয়। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈলখনি **নাহারকাটিয়া** অঞ্চলে অবস্থিত। 'অয়েল ইণ্ডিয়া লিমিটেড' নামক একটি আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফত এখানে তৈল-উত্তোলনের বন্দোবস্ত হইয়াছে! 'অয়েল ইণ্ডিয়ায়' ভারত সরকার ও বার্মা অয়েল কোম্পানীর সমান অংশ আছে; এখানে প্রতিবৎর প্রায় ২৭'৫ লক্ষ টন তৈল উত্তোলিত হইবে। এই তৈল-খনি নলযোগে নূনমাটি ও [illegible] সহিত সংযুক্ত। আসামের **রুদ্রসাগরে** অন্যতম তৈলখনি অবস্থিত।

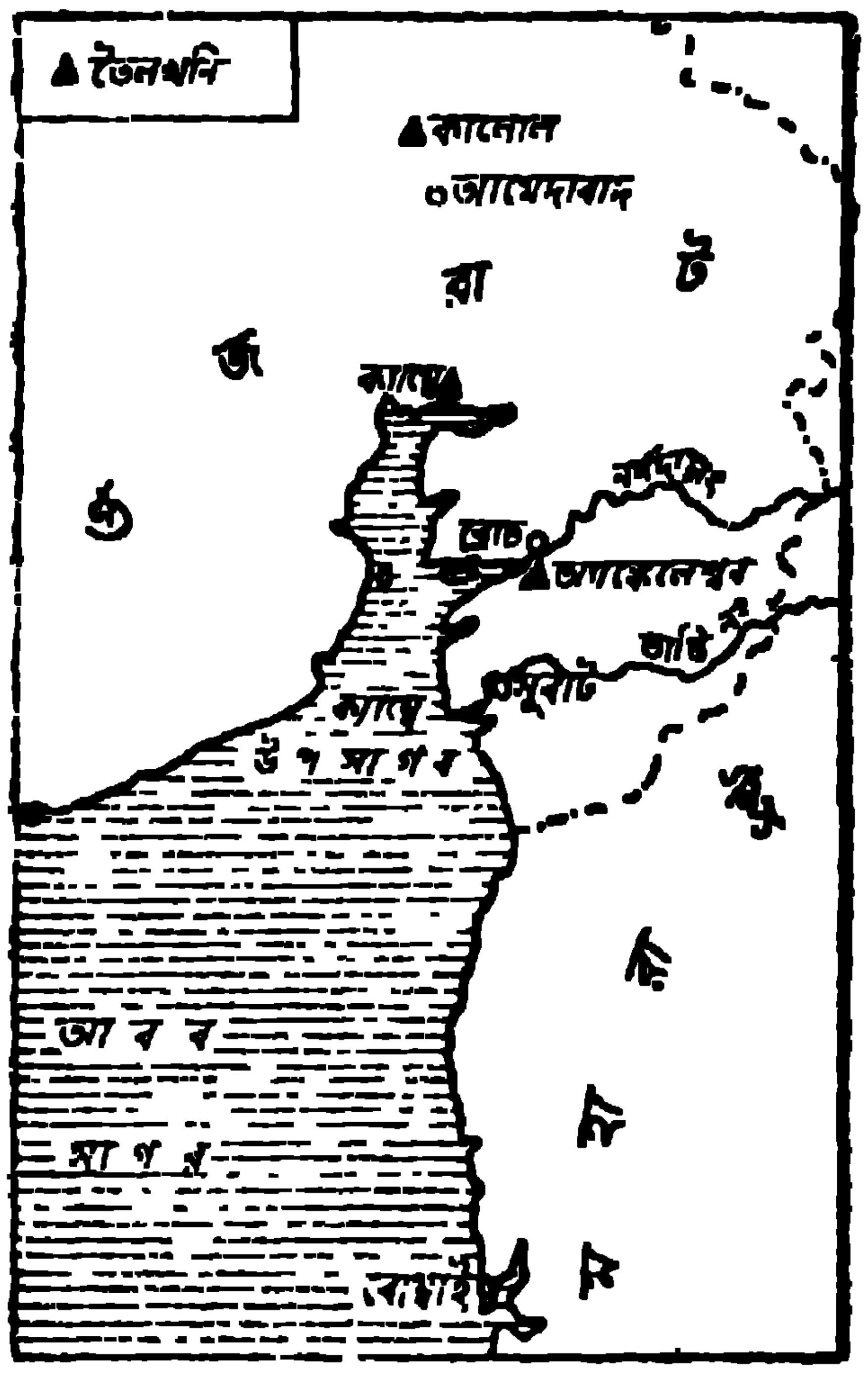

গুজরাটের **অ্যাঙ্কলেশ্বর** তৈলখনি হইতে তৈল-উত্তোলন আরম্ভ হইয়াছে। এখানে বাৎসরিক তৈল উৎপাদনের ক্ষমতা হইবে ২০ হইতে ২৫ লক্ষ টন। গুজরাটের **কালোলে** একটি বৃহদাকার তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আসামের শিবসাগর তৈলখনি হইতেও শীঘ্রই তৈল-উত্তোলন আরম্ভ হইবে।

বাণিজ্য—ভারত চিরকাল তৈলের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তৈলের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইয়া

৫৭ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহার তুলনায় ১৯৬০ সালে উৎপাদন হইয়াছে মাত্র ৪.৫ লক্ষ টন। স্বাধীনতার পূর্বে পরিস্রুত (Refined) তৈল ও উপজাত দ্রব্য ভারত আমদানি করিত বলিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অধিক ব্যয় হইত। বর্তমানে দেশে শোধনাগার স্থাপিত হওয়ায় সুলভে অপরিস্রুত তৈল আমদানি হয়। ইহা ছাড়া রাশিয়া ও রুমানিয়া হইতে অত্যন্ত কমমূল্যে তৈল আমদানি হওয়ায় মার্কিন ও বৃটিশ একচেটিয়া তৈল কোম্পানীগুলিও তৈলের মূল্য বহুলাংশে কমাইতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়া গিয়াছে। বর্তমানে রাশিয়া, রুমানিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ইরাণ, বেহ্‌রিণ, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে ভারত তৈল আমদানি করে। রাশিয়া ও রুমানিয়ার তৈল, নাহারকাটিয়ার তৈল এবং বারাউনি ও নূনমাটি হইতে পরিস্রুত তৈল ও উপজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের ভার ন্যস্ত হইয়াছে সরকার-নিয়ন্ত্রিত 'ভারতীয় তৈল কোম্পানী'র (Indian Oil Company) উপর। এখনও ভারতের তৈল-ব্যবসায়ে মার্কিন ও বৃটিশ তৈল কোম্পানীসমূহের কর্তৃত্ব বহুলাংশে বিদ্যমান।

ভারতের তৈল হইতে পেট্রোল, জ্বালানি তৈল, কেরোসিন ও পিচ্ছিল তৈল প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইহা প্রধানত: ব্যবহৃত হয় জাহাজে, রেল-ইঞ্জিনে, বিভিন্ন শিল্পে ও গৃহস্থ পরিবারে বাতি জ্বালাইতে।

ভারতের তৈল-উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম বলিয়া এই দেশে কৃত্রিম তৈল (Synthetic fuel oil) প্রস্তুতের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইক্ষুর গুড় প্রস্তুতের সময় সুরাসার (Alcohol) পাওয়া যায়; বর্তমানে এই দেশে প্রায় ৫ কোটি লিটার সুরাসার প্রস্তুত হইতেছে। পেট্রোলের সহিত ইহা মিশ্রিত করিয়া মোটর-গাড়ীতে ব্যবহার করা যায়। মাদ্রাজের দক্ষিণ আর্কটে প্রচুর লিগ্‌নাইট পাওয়া যায়। এই লিগ্‌নাইট হইতে কৃত্রিম তৈল প্রস্তুত করা যায়। এই সকল উপায়ে কৃত্রিম তৈলের উৎপাদন বাড়াইলে ভারতে খনিজ তৈলের আমদানির পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইবে এবং খনিজ তৈলের সমস্যার কিছুটা সমাধান হইবে।

লৌহ আকরিক (Iron Ore)

বর্তমান যুগে লৌহ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধাতু। বর্তমান শিল্পপ্রধান সভ্যতার মূলে রহিয়াছে এই ধাতু। যন্ত্রপাতির উৎপাদন, পরিবহণ-ব্যবস্থার

উন্নতি, যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ সকলই লৌহের সাহায্যে সংগঠিত হইয়াছে। ভারতে সঞ্চিত লৌহভাণ্ডারের পরিমাণ ২১,০০০ কোটি মেঃ টন (পৃথিবীর মোট লৌহভাণ্ডারের শতকরা ২৫ ভাগ); কিন্তু উৎপাদনে এখনও ভারত পৃথিবীতে অষ্টম স্থানে বসিয়া আছে। এখানকার লৌহ আকরিক অধিকাংশই উৎকৃষ্টশ্রেণীর হেমাটাইট-জাতীয় এবং ইহাতে লৌহের পরিমাণ কোন কোন স্থানে শতকরা ৬৫ ভাগের অধিক। কিন্তু ইউরোপের দেশসমূহে আকরিক লৌহের পরিমাণ শতকরা মাত্র ৪০ ভাগ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ ভাগ। ভারতের লৌহখনির নিকট কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর ও ডোলোমাইট পাওয়া যায়। সেইজন্য লৌহ আকরিক হইতে কাঁচা লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত করিতে কোন অসুবিধা হয় না। এই কারণে এখানকার লৌহখনির নিকটবর্তী স্থানে বড় বড় ইস্পাত কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতের লৌহশিল্পের উন্নতির জন্য অনুকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ রাজত্বকালে লৌহ বা ইস্পাত উৎপাদনের দিকে কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। কারণ, কমমূল্যে লৌহ আকরিক বৃটেনে লইয়া যাওয়া এবং উচ্চমূল্যে লৌহদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি বৃটেন হইতে এদেশে আমদানি করাই ছিল বৃটিশ রাজত্বের মূল-নীতি। সেইজন্য বৃটেনের চাহিদার অতিরিক্ত লৌহ আকরিক উৎপাদন করার দিকে সরকারের বিশেষ ঝোঁক ছিল না। স্বাধীনতার পর প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে লৌহের উৎপাদন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

ভারতে লৌহ আকরিক উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (লক্ষ টন)

১৯৪৭	২৪	১৯৫৯	৭৯
১৯৫০	৩০	১৯৬৪	২১৯
১৯৫৫	৪৭	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	৩০০

ভারতের লৌহ আকরিক উৎপাদনের প্রধান সমস্যা এই যে, যান্ত্রিকী-করণের অভাবে উৎপাদনের পরিমাণ সঞ্চিত আকরিকের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক কম; তাছাড়া মোট উৎপন্ন লৌহ আকরিক ব্যবহার করিবার মতো শিল্প এখনও এদেশে গড়িয়া ওঠে নাই। কিছুদিন পূর্বে ভিলাই, রাউরকেলা ও দুর্গাপুরে আরও তিনটি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল কারখানার চাহিদা মিটাইয়া এখনও প্রচুর লৌহ আকরিক বিদেশে

রপ্তানি হইতেছে। যথেষ্ট পরিমাণে কোক-কয়লা এখনও এদেশে পাওয়া যায় না। কোক-কয়লার অভাবে অধিক পরিমাণে লৌহ আকরিক গলানো সম্ভব নহে। সেইজন্য লৌহ আকরিক রপ্তানি করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে অধিকাংশ লৌহ আকরিক উড়িষ্যা, বিহার, গোয়া, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রে পাওয়া যায়।

ভারতের লৌহ আকরিক উৎপাদন (১৯৬৪)
১ কোটি ৪৯ লক্ষ মেঃ টন

উড়িষ্যা	৩৭'৩৬ লক্ষ মেঃ টন	মধ্যপ্রদেশ	১৪'৪৮ লক্ষ মেঃটন
বিহার	২৮'৪৭ „	অন্ধ্র	৬'২৩ „
মহীশূর	১৮'৭২ „	মহারাষ্ট্র	৩'২০ „

গোয়া ৭ লক্ষ মেঃ টন

উড়িষ্যা—ভারতের লৌহ আকরিক উৎপাদনে উড়িষ্যা প্রথম স্থান অধিকার করে। এই রাজ্যের উৎপাদন ভারতের মোট লৌহ আকরিক উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ। এই রাজ্যে কেওনঝাড় জেলার অন্তর্গত বাগিয়াবুরু অঞ্চলে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। ইহার নিকটেই ম্যাঙ্গানিজ পাথরের খনি বিদ্যমান। ময়ূরভঞ্জ জেলার গুরুমহিশানি, সুলাইপাত ও বদমপাহাড় অঞ্চলে এবং বোনাই পাহাড় অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। সম্প্রতি এই রাজ্যের কিরিবুরু অঞ্চলে ১৭'৩ কোটি টনের এক লৌহভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে। জাপানের সহায়তায় এই খনি হইতে লৌহ উত্তোলিত হইতেছে এবং বিশাখাপতনম্ বন্দর মারফত জাপানে রপ্তানি হইতেছে। উড়িষ্যার খনিসমূহের সহিত টাটানগর, বার্ণপুর ও রাউরকেলার ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রগুলি দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা যুক্ত। উড়িষ্যা হইতে প্রচুর লৌহ আকরিক এই রেলপথে বিভিন্ন ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্রে প্রেরিত হয়।

বিহার—ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা ২৬ ভাগ লৌহ আকরিক উৎপন্ন করিয়া বিহার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই রাজ্যের সিংহভূম জেলার অন্তর্গত নোয়ামুণ্ডি, গুয়া, বুদাবুরু ও পানশিরাবুরু অঞ্চলের লৌহখনিসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে উৎকৃষ্ট হেমাটাইট-জাতীয় লৌহ আকরিক

পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের লৌহ টাটানগর ও অন্যান্য ইস্পাত-শিল্পকেন্দ্রে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মারফত প্রেরিত হয়।

মহীশূরের বাবাবুদান পর্বত, সাঁন্দুর ও বেলারী অঞ্চলে প্রচুর হেমাটাইট-জাতীয় লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। কয়লার অভাবে এখানে কাঠকয়লা

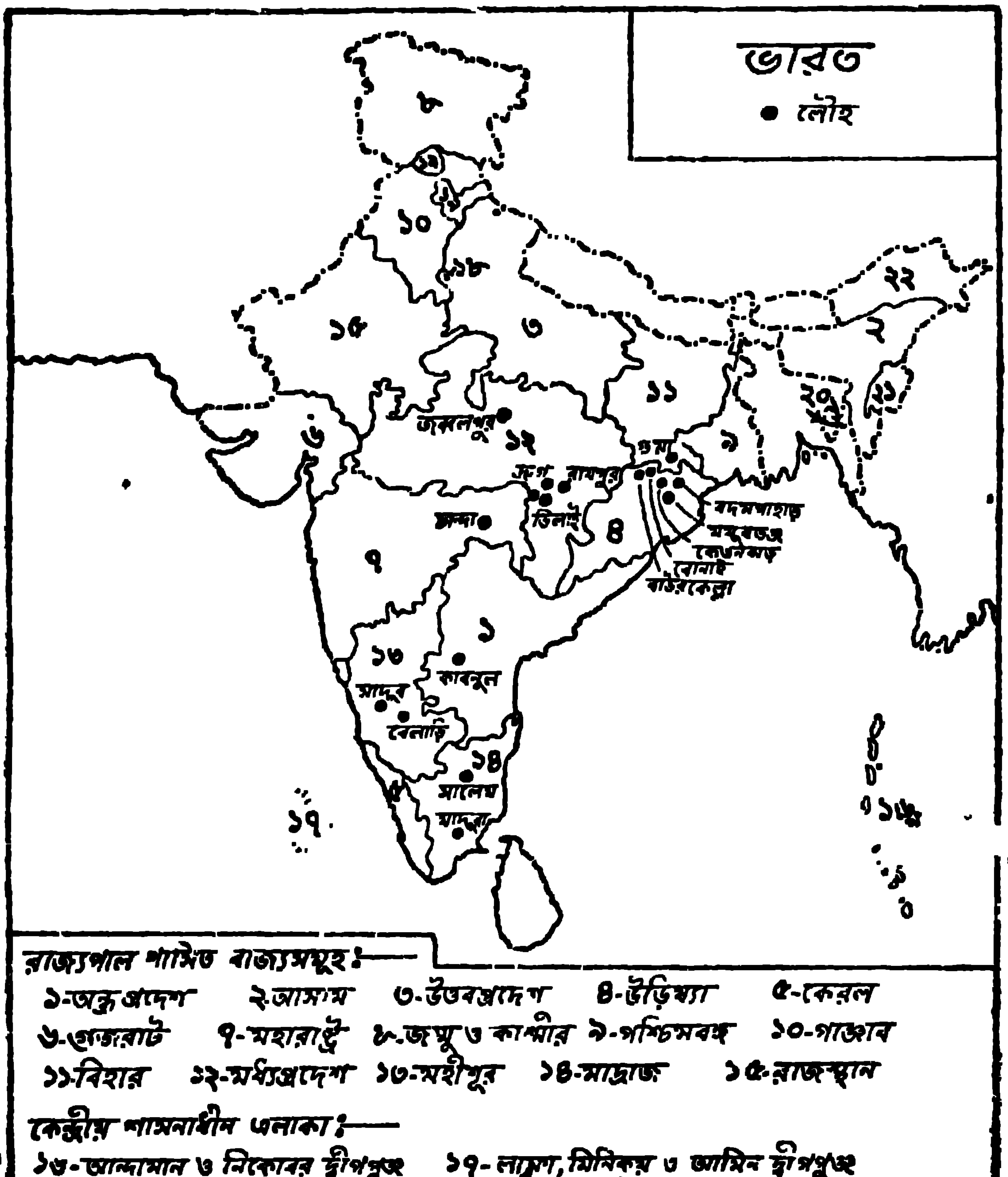

দ্বারা লৌহ গলানো হয়। এই লৌহ ভদ্রাবতী ইস্পাত কারখানায় প্রেরিত হয়। **মধ্যপ্রদেশের** দ্রুগ জেলায় প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। বাস্তার অঞ্চলেও লৌহখনি বিদ্যমান। ডালি ও রাজহারা পর্বতে প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এই রাজ্যের অধিকাংশ লৌহ ভিলাই ইস্পাত

কারখানায় প্রেরিত হয়। **অন্ধ্ররাজ্যের** নেলোর, কুডাপ্পা ও কুর্ণুল অঞ্চলে, মাদ্রাজের ত্রিচিনাপল্লী ও সালেম জেলায় এবং **মহারাষ্ট্রের** রত্নগিরি ও চান্দা জেলায় লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। **গোয়া** অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চল ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই দেশের লৌহ আকরিকের উৎপাদন কিয়দংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গে অল্পবিস্তর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

বাণিজ্য—শিল্পে উন্নত না হওয়ায় পূর্বে ভারতের লৌহের আভ্যন্তরীণ চাহিদা অত্যন্ত কম ছিল। ইস্পাত শিল্পের প্রতিষ্ঠার পূর্বে এখানকার অধিকাংশ লৌহ বিদেশে রপ্তানি হইত। টাটানগর ও বার্ণপুরে ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবার পর রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া যায়। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতি হওয়ায় এবং এই দেশ শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ায় লৌহের চাহিদা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতে বর্তমানে ৬টি ইস্পাতের কারখানা আছে এবং আরও একটি নির্মিত হইতেছে। বর্তমানে এইসকল ইস্পাত কারখানার জন্য ১১·৬ লক্ষ টন লৌহ আকরিকের প্রয়োজন। ভারতে লৌহ আকরিকের উৎপাদন ১৯৪৯ সালের তুলনায় সাতগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই চাহিদা মিটাইয়াও রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিভিন্ন খনির সহিত বন্দরের সরাসরি যোগসাধন করিয়া লৌহ আকরিকের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বন্দরের উন্নতিসাধনের বন্দোবস্ত হইয়াছে; যথা—

খনি—বন্দর	রপ্তানির পরিমাণ (লক্ষ্য)
কিরিবুরু—	
বিশাখাপতনম্	২০ লক্ষ মেঃ টন
হস্পেট—মাদ্রাজ	২০ " "
দাইতেরী—পরাদীপ	২০ " "
বৈলাডিলা—	
বিশাখাপতনম্	৪০ " "

খনি—বন্দর	রপ্তানির পরিমাণ (লক্ষ্য)
উড়িষ্যার খনি—	
হলদিয়া	২০ মেঃ টন
মহীশূরের খনি—	
ম্যাঙ্গালোর	২০ " "
হাসান—ম্যাঙ্গালোর	২০ " "

ভারতের মোট রপ্তানির শতকরা ৫৮ ভাগ লৌহ আকরিক জাপানে প্রেরিত হয়। বাকি অংশ পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, ইটালি ও পূর্ব জার্মানীতে রপ্তানি হইয়া থাকে। অধিকাংশ লৌহ আকরিক কলিকাতা ও উড়িষ্যার পরাদীপ বন্দর মারফত রপ্তানি হইয়া থাকে। লৌহের রপ্তানি বৃদ্ধি

করিবার ভার বর্তমানে 'স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন' (State Trading Corporation) নামক একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। ভারতের সকল লৌহ-রপ্তানি ইহার মাধ্যমে সংগঠিত হয়।

লৌহ আকরিক রপ্তানির গতি ও লক্ষ্য (লক্ষ টন)

১৯৫০-৫১	৮৪	১৯৬০-৬১	২০
১৯৫৫-৫৬	২২·০০	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	১০০

তৃতীয় পরিকল্পনায় লৌহ আকরিক উত্তোলনের উন্নতিসাধন ও রপ্তানি-বৃদ্ধির বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার কার্যকালের শেষে ভারতে লৌহ আকরিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটি টনে দাঁড়াইবে। উড়িষ্যার কিরিবুরু খনি হইতে ২০ লক্ষ টন এবং মধ্যপ্রদেশের বৈলাডিলা হইতে ৪০ লক্ষ টন লৌহ আকরিক জাপানে রপ্তানি করিবার জন্য জাপানের সঙ্গে ভারতের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে; অন্যান্য দেশে আরও ৪০ লক্ষ টন রপ্তানি হইবে। এইভাবে ১৯৬৫-৬৬ সালে মোট রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১ কোটি টন। এই সকল কারণে তৃতীয় পরিকল্পনায় লৌহ আকরিক উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে ৩ কোটি টন। এই পরিকল্পনায় জাপানের সাহায্যে কিরিবুরু ও বৈলাডিলা খনির কাজ ত্বরান্বিত করা হইবে এবং এই দুইটি খনি হইতে বোকারো ও দুর্গাপুর ইস্পাত-কারখানায়ও লৌহ প্রেরিত হইবে। বৈলাডিলা খনির উৎপাদন-ক্ষমতা ধার্য হইয়াছে ৬০ লক্ষ টন। ইহা ছাড়া মহারাষ্ট্রের রেডি অঞ্চলে ৫ লক্ষ টন, উড়িষ্যার সুকিণ্ডা-দাইতেরী অঞ্চলে ৫ লক্ষ টন, মহীশূরের বেলারী-হস্‌পেট অঞ্চলে ১০ লক্ষ টন লৌহ আকরিক উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে। দুঃখের বিষয় অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় লৌহ আকরিক-উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রেও তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই।

তাম্র (Copper)

প্রাচীন কাল (খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০০ সাল) হইতে ভারতে তাম্রের ব্যবহার প্রচলিত আছে। পূর্বে এখানকার তাম্র দেশীয় প্রথায় নিষ্কাষিত হইত এবং ইহা দ্বারা দেবপূজায় ব্যবহৃত বাসনপত্র প্রস্তুত হইত। বিদ্যুৎ-উৎপাদন আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে তাম্র প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ-পরিবহণের তার ও যন্ত্রপাতি নির্মাণে। ইহা ছাড়া এই দেশে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তারের জন্য

এবং রেল-ইঞ্জিন ও জাহাজ নির্মাণের জন্যও তাম্র ব্যবহৃত হয়; ভারতের শিল্পোন্নতির সঙ্গে এই সকল দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় তাম্রের চাহিদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে পিতলের দ্রব্যাদি ও মুদ্রা প্রস্তুত করিতেও তাম্র ব্যবহৃত হয়। ভারতে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জলবিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রপাতির চাহিদা

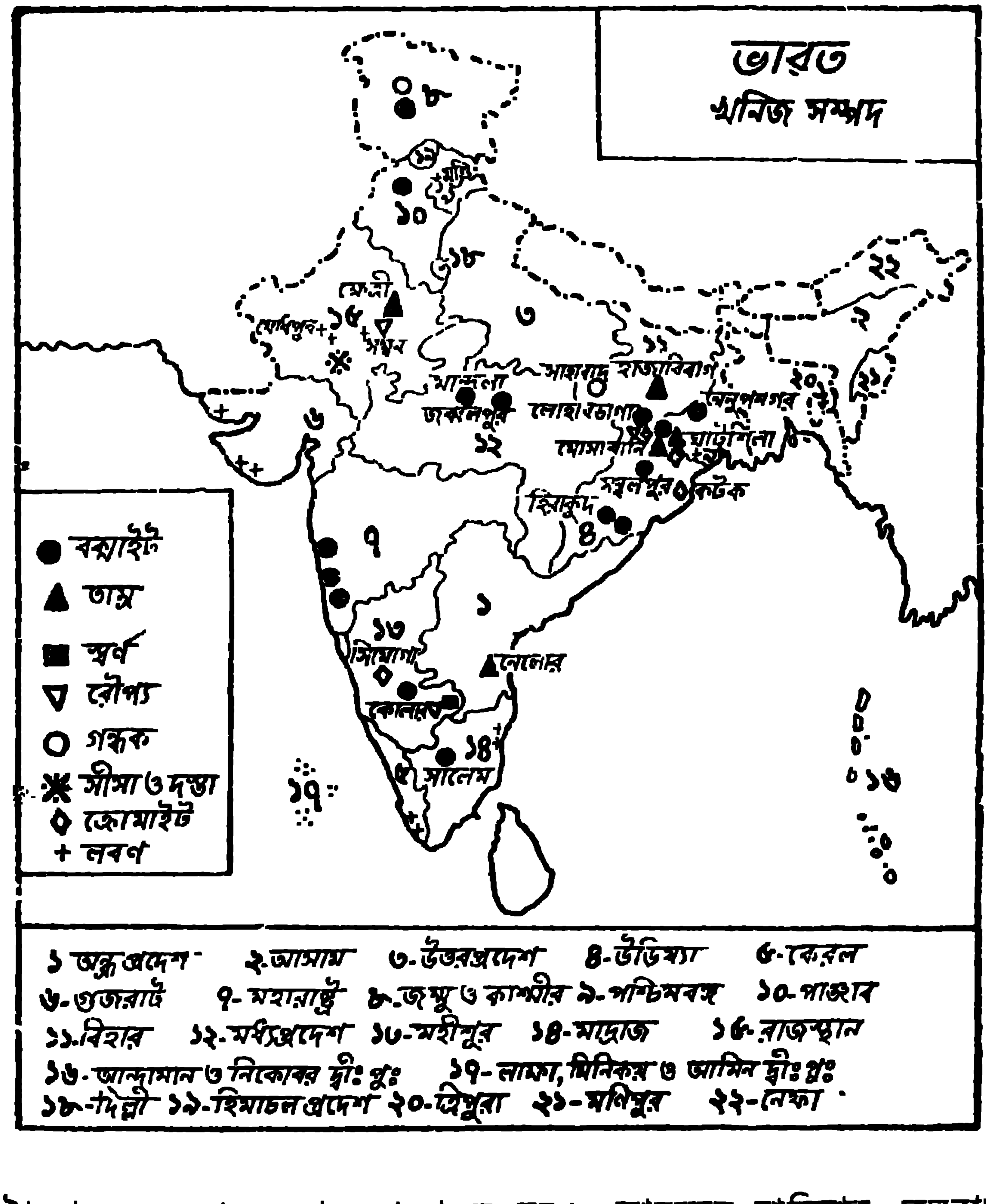

মিটানোর জন্য প্রচুর তাম্র প্রয়োজন হয়। ভারতের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন খুবই কম। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের তুলনায় ভারতের তাম্র-উৎপাদন নগণ্য—মাত্র ৬%। অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় ভারতে তাম্রের চাহিদা এখনও অনেক কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রতি ৮ কিলোগ্রাম

এবং বৃটেনে ৭ কিলোগ্রাম তাম্র ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ভারতে ব্যবহৃত হয় জনপ্রতি মাত্র '১১ কিলোগ্রাম। ভারতে তাম্রশিল্পের প্রধান সমস্যা এই যে, এখানকার খনিজ তাম্র হইতে তিন শতাংশের বেশী ধাতব তাম্র পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া ভারতীয় তাম্রের সহিত নিকেল মিশ্রিত থাকায়, অধিকাংশ তাম্র হইতে বৈদ্যুতিক তার নির্মাণ করা কষ্টকর।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে তাম্রের উৎপাদন প্রায় একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ—বিহারের সিংভূম অঞ্চলে। প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্বে এখানে তাম্র উত্তোলিত হইলেও, রাজনৈতিক কারণে ইহার উত্তোলন বন্ধ হইয়া যায়। বর্তমান যুগে ১৮৩৯ সালে William Jones পুনরায় এই খনিটি আবিষ্কার করেন। এখানে '২৭ বর্গ-কিলোমিটার স্থান ব্যাপিয়া ১৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটা তাম্রখনি বিদ্যমান। মোসাবনি, ঘাটশিলা ও ধোবানি এই অঞ্চলের প্রধান তাম্রখনি-কেন্দ্র। Indian Copper Corporation Ltd. নামে একটি বৃটিশ কোম্পানী এই সকল তাম্রখনির মালিক। ঘাটশিলার নিকট মহুভাণ্ডারে এই কোম্পানীর একটি তাম্র গলাইবার কারখানা আছে। এই অঞ্চলে ১৯৬০ সালে ৪'৪৮ লক্ষ টন খনিজ তাম্র উৎপন্ন হয়; ইহা হইতে ধাতব তাম্র পাওয়া যায় ৮,০০০ টন। ভারতের অন্যান্য স্থানে অতি সামান্য পরিমাণে খনিজ তাম্র পাওয়া যায়; ইহার মধ্যে বিহারের হাজারিবাগ ও রোম সিদেশ্বর, মহীশূরের চিতলদ্রুগ, অন্ধ্র রাজ্যের নেলোর জেলা, উত্তর-প্রদেশের গাড়োয়াল জেলা, রাজস্থানের ক্ষেত্রী ও দারিবো ও পাঞ্জাবের কুলু উপত্যকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্ষেত্রা অঞ্চলের সঞ্চিত তাম্রের পরিমাণ ২'৮ কোটি মেঃ টন।

সম্প্রতি সিংভূমের নিকট রোম সিদেশ্বরে একটি খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে; এখানকার সঞ্চিত তাম্রের পরিমাণ প্রায় ১'৮ কোটি মেঃ টন।

বাণিজ্য—ভারতে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অত্যন্ত কম। ১৯৬৪ সালে এই দেশে মাত্র ৯,৬০০ টন ধাতব তাম্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এখানকার বর্তমান চাহিদা প্রায় ১২৫,০০০ টন। সেইজন্য প্রতিবৎসর প্রায় ৬৬,০০০ টন তাম্র আমদানি করিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মোট রপ্তানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আমদানি করা হইয়া থাকে; বাকি অংশ আসে বৃটেন, কানাডা, চিলি ও বেলজিয়াম হইতে।

ভারতে তাম্র-আমদানির গতি*

বৎসর	পরিমাণ (মঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)
১৯৫৯	৪৩,১৫৭	১৪ ৫৫
১৯৬০	৫২,১৮৩	১৭ ৯৬
১৯৬১	৬৭,৬৩০	১৯ ৭০
১৯৬২	৬৮,০০০	২২ ০০
১৯৬৩	৬৬,০০০	২১ ০০

*Source—Commerce, Annual, 1964

ভারতে তাম্র আমদানির পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিকল্পনা কমিশন এই দেশে তাম্র উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে রাজস্থানের ক্ষেত্রী অঞ্চলে এবং সিকিমের রাংপু অঞ্চলে তাম্রখনি অনুসন্ধানের কার্য চালানো হয়। ইহার ফলে এই দুই অঞ্চলে প্রচুর সঞ্চিত তামের সন্ধান পাওয়া যায়। ক্ষেত্রী-দারিবো অঞ্চলে সঞ্চিত তাম্রের পরিমাণ প্রায় ২·৮০ কোটি টন এবং রাংপু অঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ৩·৫ লক্ষ টন। প্রথমোক্ত স্থানের খনিজ তাম্রে ধাতব তাম্রের পরিমাণ শতকরা ·৮ ভাগ এবং শেষোক্ত স্থানে শতকরা ৬·২৪ ভাগ। তৃতীয় পরিকল্পনায় ক্ষেত্রী অঞ্চলে প্রতিবৎসর ১১,৫০০ টন ধাতব তাম্র উৎপাদনের জন্য একটি তাম্র গলাইবার কারখানা স্থাপনের ও খনি হইতে তাম্র উত্তোলনের বন্দোবস্ত করা হয়। ইহাতে মোট খরচ হইবে প্রায় ১২·৫ কোটি টাকা। রাংপু অঞ্চল হইতে খনিজ তাম্র আনিয়া ভারতীয় কারখানায় গলাইবার বন্দোবস্ত করা হইবে। ভারত সরকার ও সিকিম দরবারের যুক্ত প্রতিষ্ঠান 'সিকিম মাইনিং কর্পোরেশন' রাংপু খনি হইতে তাম্র উত্তোলন করিয়া ভারতীয় কারখানায় প্রেরণের জন্য ২·৫ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এইভাবে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতে প্রতিবৎসর ২০,০০০ টন ধাতব তাম্র উৎপন্ন হইবে। কিন্তু এই সময় চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াইবে ১·৫ লক্ষ টন। সুতরাং এই পরিকল্পনায়ও ভারতে তাম্র-আমদানির পরিমাণ হ্রাস করিবার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত হইল না। তৃতীয় পরিকল্পনায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন তাম্রখনি আবিষ্কারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)

লৌহ ও ইস্পাত শক্ত করিবার জন্ম ম্যাঙ্গানিজ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া এনামেল, ব্লিচিং পাউডার, কাচ ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার জন্যও ম্যাঙ্গানিজ প্রয়োজন। ইস্পাত প্রস্তুতে ম্যাঙ্গানিজ অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া সকল শিল্পোন্নত দেশেই ইহার চাহিদা অত্যন্ত বেশী। ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় ম্যাঙ্গানিজের চাহিদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুখের বিষয় ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে; রাশিয়ার পরেই ভারতের স্থান। স্বাধীনতার পর ইস্পাতের উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে।

ভারতে ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনের গতি (লক্ষ টন)

১৯৪৭	৪'৫১	১৯৫৭	১৭'০০
১৯৫০	৮'৮৩	১৯৬৪	১৩'০৭

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে সঞ্চিত ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ প্রায় ৩১'২ কোটি টন; ইহার মধ্যে ২০ কোটি টন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ও সঙ্কর-ইস্পাত উৎপাদনের উপযোগী এবং ১১'২ কোটি টন নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ভারতের ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে প্রায় ৮০,০০০ শ্রমিক নিযুক্ত আছে।

ভারতের ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদন—১৩'০০ লক্ষ টন (১৯৬৪)

উড়িষ্যা	৩'৪৩ লক্ষ টন	মহারাষ্ট্র	১'৮৬ লক্ষ টন
মহীশূর	২'৯৩ „	গুজরাট	'৭৭ „
মধ্যপ্রদেশ	২'১৮ „	অন্ধ্র	'৪০ „

বর্তমানে **উড়িষ্যা** রাজ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ম্যাঙ্গানিজ উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যের গাঙ্গপুর, বোনাই, কেওনঝাড়, ও সুন্দরগড় অঞ্চলে অধিকাংশ ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। **মধ্যপ্রদেশে** ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদন হয় প্রধানতঃ বালাঘাট, জব্বলপুর, ছিন্দওয়ারা ও ঝাবুয়া অঞ্চলে। **মহারাষ্ট্রের** নাগপুর, পাঞ্চমহল, ছোট উদয়পুর ও ভাণ্ডারা অঞ্চলে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হয়। অন্ধ্র রাজ্যের শ্রীকাকুলম ও বিশাখাপত্তনম্ অঞ্চলে, মহীশূরের বেলারি, শিমোগা ও চিতলদ্রুগ জেলায় এবং বিহারের কালাহান, সিংভূম ও চাইবাসা

অঞ্চলে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। বিশাখাপত্তনমে বন্দর স্থাপিত হওয়ায় মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্ররাজ্যের উৎপাদন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ এই বন্দর মারফত কম রেলভাড়ায় বিদেশে ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি করা সহজসাধ্য।

বাণিজ্য—ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানিতে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের প্রধান ক্রেতা। অস্ত্রশস্ত্র-

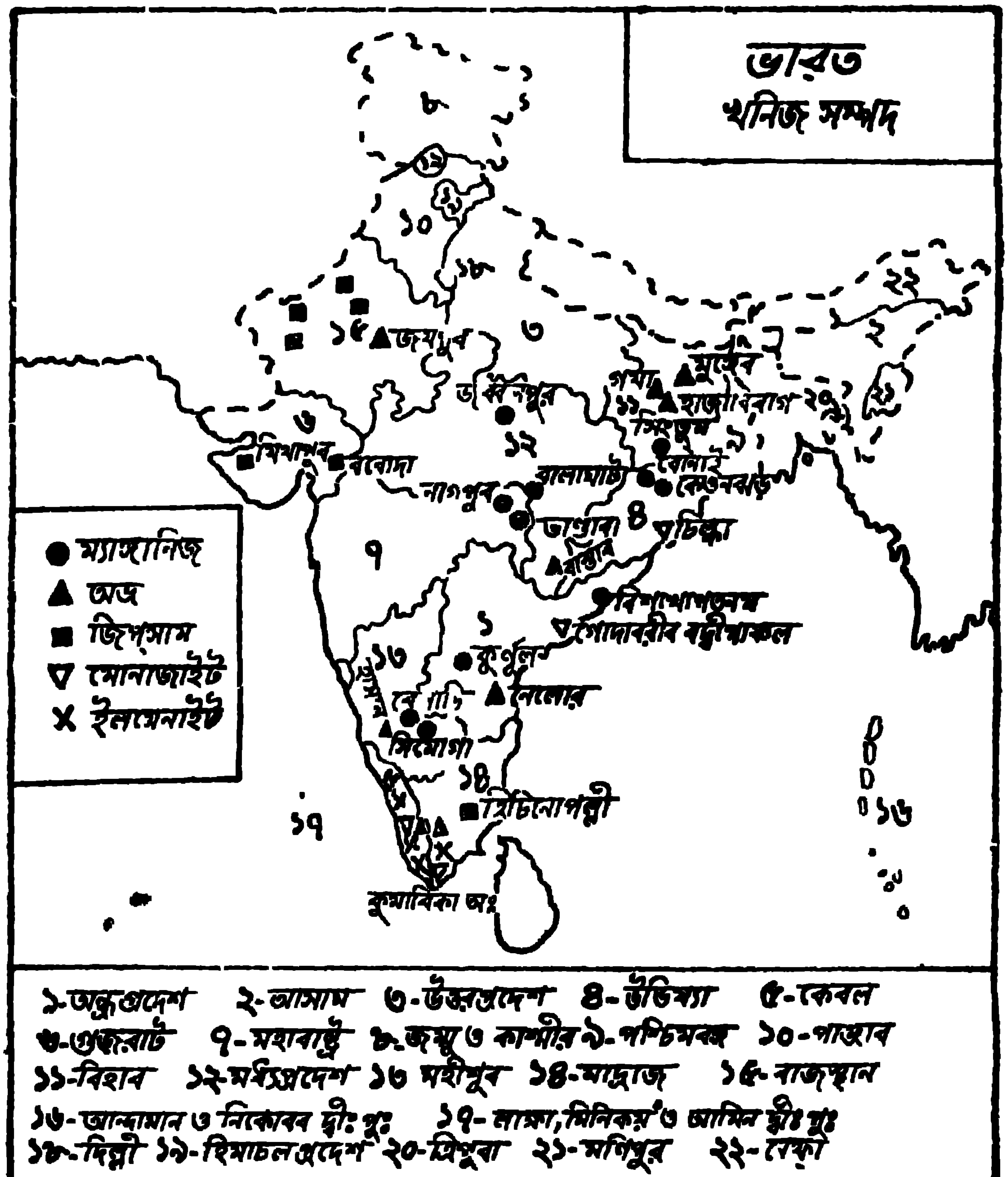

উৎপাদনে ম্যাঙ্গানিজ প্রয়োজন বলিয়া ভারতের ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি বহুলাংশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ও মজুতের উপর নির্ভর করে। ১৯৫৮ সাল হইতে এই দেশ ম্যাঙ্গানিজ মজুতের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়ার ফলে ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের রপ্তানি এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বহুলাংশে

কমিয়া যায়। বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইটালি, জাপান ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের অন্যান্য আমদানিকারক। এই সকল দেশেও ব্রেজিল, ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের প্রতিযোগিতার ফলে ম্যাঙ্গানিজ-রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া যায়। ইহার ফলে ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি হইতে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জন ৩২ কোটি হইতে কমিয়া ১৫ কোটিতে দাঁড়ায়।

ম্যাঙ্গানিজ-রপ্তানির গতি (লক্ষ টন)

১৯৫০	৮·০৯	১৯৫৭	১৭·১৫
১৯৫৫	১২·৮২	১৯৬৩	৯·১৭

উৎপাদনের তুলনায় ভারতে ম্যাঙ্গানিজের চাহিদা অত্যন্ত কম—মাত্র ৯০,০০০ টন। সেইজন্য ম্যাঙ্গানিজ-শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে রপ্তানি-বাণিজ্যের উন্নতির উপর। ভারতে ম্যাঙ্গানিজের উৎপাদন-খরচ না কমাইতে পারিলে বিদেশে সাফল্যের সহিত রপ্তানি বৃদ্ধি করা এই দেশের পক্ষে সম্ভব নহে। এইজন্য ভারতের খনি মালিকদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতের অধিকাংশ ম্যাঙ্গানিজ বিশাখাপত্তনম বন্দর মারফত রপ্তানি হইয়া থাকে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মর্মুগাও বন্দরও কিছু পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি করে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনের ও ব্যবহারের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল যথাক্রমে ২০ লক্ষ টন এবং ১·২৬ লক্ষ টন। বাকি অংশ রপ্তানি করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্র মজুতের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় ১৯৫৮ সালে অর্ধেক রপ্তানি কমিয়া যায়। ইহার ফলে এই শিল্পে এক সংকট সৃষ্টি হয় এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার উৎপাদন ও রপ্তানির লক্ষ্য পূরণ সম্ভবপর হয় না। ভারতের অধিকাংশ ম্যাঙ্গানিজ নিকৃষ্টশ্রেণীর। এই সকল ম্যাঙ্গানিজকে কার্যোপযোগী করিবার জন্য **তৃতীয় পরিকল্পনায়** ৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও রপ্তানির পরিমাণ ধার্য হইয়াছে যথাক্রমে ৫ লক্ষ টন ও ২৫ লক্ষ টন। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে মহারাষ্ট্রের পাঞ্চমহল এবং মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও রাজস্থানের খনি অঞ্চলে আরও ম্যাঙ্গানিজ-খনি আবিষ্কারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)

বর্তমান যুগে অ্যালুমিনিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। বিমানপোত নির্মাণে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বাসস্থান, মোটর-গাড়ী ও বাসনপত্র প্রস্তুত করিতেও অ্যালুমিনিয়াম প্রয়োজন। খাদ্য-সংরক্ষণে ও ফটোগ্রাফিতেও ইহা একান্ত প্রয়োজন। তাম্র, নিকেল, দস্তা প্রভৃতির সহিত ইহা মিশাইয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। ভারতে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হয় প্রধানতঃ **বক্সাইট**, করাণ্ডাম ও **কায়ানাইট** হইতে। ইহার মধ্যে বক্সাইটের উৎপাদন ও ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী। অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে প্রচুর সুলভ বিদ্যুৎ (সাধারণতঃ জলবিদ্যুৎ) প্রয়োজন বলিয়া এবং বৃটিশ রাজত্বকালে জলবিদ্যুৎতের উৎপাদন কম থাকায় এই শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। সেইজন্য অধিকাংশ বক্সাইট বিদেশে রপ্তানি হইত। বর্তমানে জলবিদ্যুতের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় বক্সাইট হইতে অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে সঞ্চিত বক্সাইটের পরিমাণ প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ মেঃ টন। চাহিদার উপর বক্সাইটের উৎপাদন নির্ভরশীল। ভারতে অ্যালুমিনিয়াম শিল্পের উন্নতির সঙ্গে বক্সাইটের উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে।

বক্সাইট-উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (সহস্র মেঃ টন)

১৯৪০	৫৪	১৯৬৪	৩৯১
১৯৫৫	৯০	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	৪৫০

গুজরাটের কৈরা ও জামনগরে, বিহারের লোহারডাঙ্গা (রাঁচী) অঞ্চলে, উড়িষ্যার সম্বলপুর জেলায়, মাদ্রাজের সালেম অঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, মান্দলা ও জব্বলপুরে, মহীশূরের বাবাবুদান পাহাড়ে, মহারাষ্ট্রের থানা অঞ্চলে এবং কাশ্মীরে অধিকাংশ বক্সাইট পাওয়া যায় (৪১৫ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য।)

ভারতের বক্সাইট উৎপাদন (১৯৬৪)

(সহস্র মেঃ টন)

গুজরাট	২১৮	মহারাষ্ট্র	৭
বিহার	১০৮	মহীশূর	২
মধ্যপ্রদেশ	৪৮		

বাণিজ্য—ভারতে জলবিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় বক্সাইটের চাহিদা পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদিও পূর্বে এই দেশ হইতে বক্সাইট বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হইত, কিন্তু বর্তমানে রপ্তানি হয় না বলিলেও হয়। আসানসোল, আলোয়ে, বেলুড়, মুরী, কালোয়া, মেতুর, সম্বলপুর প্রভৃতি স্থানে অ্যালুমিনিয়াম শিল্প উন্নতিলাভ করায় বক্সাইটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'শ্রমশিল্পের' অন্তর্গত 'অ্যালুমিনিয়াম শিল্প' সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বক্সাইটের উৎপাদন-লক্ষ্য নির্ধারিত হইয়াছে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন। ইহা সম্পূর্ণতঃই স্থানীয় শিল্পে ব্যয় করা হইবে। সুতরাং রপ্তানির কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। এই পরিকল্পনার কার্যকালে গুজরাটের কৈরা ও জামনগর জেলা; মহারাষ্ট্রের কোলাপুর, মহীশূরের বেলগম, মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টক এবং বিহারের রাঁচী ও পালামৌ জেলার বক্সাইট খনিসমূহের কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইবে।

স্বর্ণ (Gold)

ভারতে খনিজ প্রস্তরখণ্ডের মধ্যেই অধিকাংশ স্বর্ণ মিশ্রিত থাকে। নদী-উপত্যকায় বা নদীগর্ভে বালুকণার মধ্যেও অল্প পরিমাণে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। এই দেশে অলঙ্কার ও মুদ্রা প্রস্তুতে অধিকাংশ স্বর্ণ ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন শিল্পে ও ঔষধ প্রস্তুতেও সামান্য পরিমাণে স্বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উৎপাদক অঞ্চল—পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা মাত্র দুই ভাগ স্বর্ণ ভারতে পাওয়া যায়। এই দেশে ১৯৬৪ সালে স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪,৬০৩ কিলোগ্রাম; ইহার মূল্য প্রায় ৬ কোটি টাকা। ভারতে স্বর্ণ-উত্তোলনের পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। এই দেশের অধিকাংশ (৯৯%) স্বর্ণ পাওয়া যায় মহীশূরের **কোলার**-স্বর্ণখনিতে। (৪১৫ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। এই খনিতে প্রস্তরের মধ্যে স্বর্ণ লুক্কায়িত থাকে। কোলার স্বর্ণখনি বাঙ্গালোর হইতে প্রায় ৬৪ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৩০ মিটার উচ্চে অবস্থিত। এই খনি প্রায় ৬·৫ কিলোমিটার লম্বা। কোলারের অন্তর্গত দুইটি খনি (চ্যাম্পিয়ান রীফ ও ওরেগাম) অত্যন্ত গভীর, প্রায় ২,৭৫০ মিটার। এই সকল খনিতে প্রায় ২৩,০০০ শ্রমিক নিযুক্ত আছে; ইহার এক-চতুর্থাংশ স্থানীয়; অন্যান্য শ্রমিক পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে আসে।

মহীশূরের বেলাড়ী খনি হইতে মহীশূর সরকার স্বর্ণ-উত্তোলনের বন্দোবস্ত করিতেছে। এই রাজ্যের রাইচুর ও ধারওয়ার জেলায় পূর্বে স্বর্ণ পাওয়া গেলেও, বর্তমানে ইহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মহীশূরের হুট্টি হইতে শীঘ্রই স্বর্ণ উত্তোলিত হইবে। অন্ধ্রের অনন্তপুরে দীর্ঘ স্বর্ণখনি বিদ্যমান থাকিলেও, এখনও উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম। মাদ্রাজের সালেম ও চিত্তোর জেলায় অল্পবিস্তর স্বর্ণ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ভারতের বহুস্থানে নদীর পলিমাটির সহিত স্বর্ণ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে উড়িষ্যার সিংভূম, পাঞ্জাবের আম্বালা, উত্তরপ্রদেশের বিজ্‌নোর এবং আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতে স্বর্ণ-উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম। এখানকার বাৎসরিক চাহিদা প্রায় ৬,২০০ কিলোগ্রাম। উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা বেশী বলিয়া এই দেশকে কিছু পরিমাণ স্বর্ণ আমদানি করিতে হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় কোলার হইতে স্বর্ণ উত্তোলনের পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হইবে। হুট্টি খনি হইতে যাহাতে শীঘ্রই স্বর্ণ-উত্তোলন আরম্ভ হয়, এই পরিকল্পনায় সেইরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

অভ্র (Mica)

ভারত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভ্র উৎপাদক দেশ। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অভ্র এই দেশে উৎপন্ন হয়। প্রাচীন কালে ভারতে ঔষধ-প্রস্তুতে ও সাজসজ্জার জন্য অভ্র ব্যবহৃত হইত। বর্তমান যুগে অভ্র প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় বৈদ্যুতিক শিল্পে। বেতার, বিমানপোত ও মোটর-গাড়ী-নির্মাণ শিল্পে ইহা একান্ত প্রয়োজন। তাপের বিকিরণ রোধ করিতে অভ্র একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়া প্রতিমার সাজ ও অলঙ্কার-প্রস্তুতে, চুল্লীর জানালা-নির্মাণে ও তাপরক্ষক প্রলেপ-নির্মাণে, রং-প্রস্তুতে অভ্র ব্যবহৃত হয়। এইজন্য অভ্রের চাহিদা সর্বত্র বিদ্যমান; বিশেষতঃ শিল্পোন্নত দেশে প্রচুর পরিমাণ অভ্র প্রয়োজন। ভারতে অভ্র-শিল্পে প্রায় ২ লক্ষ লোক কাজ করে।

উৎপাদক অঞ্চল—প্রধানতঃ দুইটি রাজ্যে অভ্র পাওয়া যায়—বিহার ও অন্ধ্র। বিহার রাজ্যের হাজারিবাগ, গয়া, মুঙ্গের ও মানভূম জেলায় ৯৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ২৩ কিলোমিটার প্রস্থ অভ্রখনি বিদ্যমান। ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ অভ্র বিহারের এই অঞ্চল

হইতে পাওয়া যায়। এখানকার অভ্র অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর রুবী-জাতীয় বলিয়া জগদ্বিখ্যাত। অন্ধ্র প্রদেশের নেলোর জেলায় গুড়ুর, কাভালী, আত্মাকুর ও রাজপুরে ৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ১৬ কিলোমিটার প্রস্থ অভ্রখনি বিদ্যমান। এখানকার অভ্র ঈষৎ হরিদ্রাভ এবং বিহারের অভ্র অপেক্ষা নিকৃষ্টশ্রেণীর। রাজস্থানের আজমীঢ় ও জয়পুর অঞ্চলে প্রচুর অভ্র পাওয়া যায়; এই অঞ্চলের অভ্র রপ্তানিযোগ্য করিবার জন্য বিহারে প্রেরিত হয়। ইহা ছাড়া মাদ্রাজের নীলগিরি অঞ্চলে, মহীশূরের হাসান জেলায় এবং কেরালার ইরানিয়াল অঞ্চলে অল্পবিস্তর অভ্র পাওয়া যায় (৪১৫ পৃষ্ঠায় মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

ভারতের অভ্র উৎপাদন—২২ হাজার মেঃ টন (১৯৬৪)

বিহার	১২,৩৩৮ মেঃ টন	অন্ধ্র	৩,৮৫৫ মেঃ টন
রাজস্থান	৫,১৮৬ „	মাদ্রাজ	১৭৭ „

বাণিজ্য—উৎপাদনের অনুপাতে ভারতে অভ্রের চাহিদা অত্যন্ত কম। সেইজন্য অধিকাংশ অভ্র বিদেশে রপ্তানি করিতে হয়। আমদানিকারক দেশসমূহে সম্প্রতি কৃত্রিম অভ্র প্রস্তুতের চেষ্টা হইতেছে। সুতরাং ভারতের অভ্রের উৎপাদন খরচ কৃত্রিম অভ্রের উৎপাদন-খরচ অপেক্ষা কম রাখিতে হইবে। ইহা ছাড়া ভারতে বৈদ্যুতিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারাও অভ্রের স্থানীয় চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সম্প্রতি ঝুমরী-তিলায়া অঞ্চলে একটি অভ্র-সংক্রান্ত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; সরকারী আওতায় ভুপালেও একটি কারখানা স্থাপিত হইবে।

ভারতের অভ্র-রপ্তানি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪,৩০০ টন	জাপান	৭০৮ টন
বৃটেন	১,৪৮০ „	ফ্রান্স	৩৯১ „
পশ্চিম জার্মানী	১,১৬৩ „	মোট	৯,১০০ টন

এই সকল দেশ ছাড়াও হল্যাণ্ড, ইটালি, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া ভারত হইতে অভ্র আমদানি করে। অভ্র আমদানি করিয়া ভারত প্রতিবৎসর প্রায় ৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। সম্প্রতি কানাডা ও ব্রেজিল হইতে বৃটেন কিছু পরিমাণ অভ্র আমদানি করায় ভারতীয় রপ্তানির পরিমাণ কিছুটা কমিয়া গিয়াছে। যে সকল কৃত্রিম অভ্রের সঙ্গে ভারতকে প্রতিযোগিতা করিতে হয়, তন্মধ্যে পার্টিনাক্স, ব্যাকেলাইট, প্যাক্সোলিন ও ফরমেলাইট

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইলেও এখনও অধিকতর সস্তায় এই সকল কৃত্রিম অভ্র প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই। যতদিন অভ্রের দাম কৃত্রিম অভ্র অপেক্ষা সুলভ হইবে, ততদিন ভারতীয় অভ্র-শিল্পকে বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়িতে হইবে না। ভারতীয় অভ্র-শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য এবং রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে 'অভ্র রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা' (Mica Export Promotion Council) গঠন করে। ভারতের অধিকাংশ অভ্র (৮৫%) কলিকাতা বন্দর মারফত রপ্তানি হয়। ইহা ছাড়া মাদ্রাজ (১৪%) ও বোম্বাই বন্দরও (১%) অভ্র রপ্তানি করে।

চুনাপাথর (Limestone)

লৌহ গলাইতে চুনাপাথর একান্ত প্রয়োজন। সিমেন্ট প্রস্তুত করিতে এবং খনিজ সীসা গলাইতে ও পাকাবাড়ী নির্মাণ করিতেও চুনাপাথরের দরকার হয়। বর্তমানে ভারতে চুনাপাথরের উৎপাদন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৪ সালে ৬২ লক্ষ টন, ১৯৫৬ সালে ৮২ লক্ষ টন এবং ১৯৬৪ সালে ১৬৯ লক্ষ টন চুনাপাথর এই দেশে উৎপন্ন হইয়াছে।

বিহারের সাহাবাদ, হাজারিবাগ, সিংভূম ও পালামৌ জেলায়, মধ্যপ্রদেশের দ্রুগ, বিলাসপুর ও ইয়োটমল জেলায়, রাজস্থানের বুঁদি, যোধপুর ও উদয়পুর জেলায়, উড়িষ্যার সুন্দরগড়, সম্বলপুর ও কোরাপুট জেলায়, অন্ধ্রের কুর্নুল জেলায়, মাদ্রাজের সালেম জেলায়, মহীশূরের শিমোগা জেলায় অধিকাংশ চুনাপাথর পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া উত্তর প্রদেশ, আসাম, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র রাজ্যে চুনাপাথরের খনি বিদ্যমান। চুনাপাথর স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয় হয় বলিয়া ইহার আমদানি-রপ্তানি হয় না বলিলেই হয়।

ভারতের চুনাপাথর উৎপাদন
১ কোটি ৬৯ লক্ষ মেঃ টন (১৯৬৪)

বিহার	২০ লক্ষ ৫১ হাজার মেঃ টন	রাজস্থান	১৫ লক্ষ ৯১ হাজার মেঃ টন
মধ্যপ্রদেশ	১৯ „ ৯০ „ „	মহীশূর	১০ „ ৩৬ „ „
উড়িষ্যা	১৭ „ ৬৭ „ „	অন্ধ্র	৯ „ ২০ „ „
মাদ্রাজ	১৬ „ ১৩ „ „	গুজরাট	৬ „ ৮৪ „ „

শ্রমশিল্প

(Industries)

প্রাচীন যুগে মানুষ কৃষিকার্যের সাফল্য অনুসারে দেশের উন্নতির বিচার করিত। সেই যুগে চীন ও ভারত পৃথিবীর সভ্যসমাজে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিত। প্রকৃতির দান কৃষিজ সম্পদের সাহায্যে জীবন ধারণ করিয়া এখানকার মানুষ তখন জগতে ধর্ম ও শিক্ষাদান করিয়া জগতের মন জয় করিত। শিল্প-বিপ্লবের পর যান্ত্রিক সভ্যতা প্রচলিত হওয়ায় শিল্পোন্নত দেশসমূহ জগতে উচ্চস্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করে, খনিজ সম্পদ ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন অনুসারে বর্তমানে দেশের উন্নতির বিচার করা হয়। সেইজন্য আজ শিল্পোন্নত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা পৃথিবীর দরবারে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। খনিজ সম্পদের আবিষ্কার ও উত্তোলন এবং শিল্প-ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান যুগে শিল্পের উন্নতি সাধন হয়। ভারতে পূর্বে পেশীশক্তি বা পশুশক্তির সাহায্যে কুটীরশিল্পের উন্নতি হইলেও, আধুনিক যান্ত্রিক শিল্পে এই দেশ বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ বিদেশীয়গণ কর্তৃক এই দেশের সম্পদ-লুণ্ঠন। শিল্প-বিপ্লবের যুগে যখন পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে যন্ত্রশিল্পের উন্নতি হইতেছিল, সেই সময় ভারত ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ পরাধীনতার তীব্র গ্লানি ভোগ করিতেছিল। সেই সময় ইংরেজগণ ভারতকে পরাধীন রাখিয়া এখানকার কাঁচামাল লইয়া নিজদেশের শিল্পের উন্নতি সাধন করিত এবং বৃটেন হইতে শিল্পজাত ভোগ্য-দ্রব্য এখানে আনিয়া বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠন করিত। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় পর্যন্ত প্রায় এই অবস্থাই বিদ্যমান ছিল; শুধু দুই এক স্থানে স্বীয় প্রয়োজনে ইংরেজগণ এই দেশে কিছু কিছু শিল্প স্থাপনের অনুমতি দিয়াছিল।

ভারতের শিল্পোন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় স্বাধীনতার পর বিভিন্ন **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার** মারফত। পরাধীনতার বন্ধনমুক্ত হওয়ায় ভারত দেশের প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে পারিল। শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের (কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্য) উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল; শক্তির চাহিদা মিটাইবার জন্য জলবিদ্যুৎ ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল; চাহিদা-বৃদ্ধির জন্য মানুষের অর্থনৈতিক মান উন্নত করিবার বন্দোবস্ত হইল। এইভাবে ভারতে 'শিল্প-বিপ্লবের' যুগ আরম্ভ হইল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রধানতঃ কৃষির উপর জোর দেওয়া হইলেও শিল্পোন্নতির সূচনা হয় এই পরিকল্পনায়। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে শিল্পে নিযুক্ত ছিল ২৪ লক্ষ লোক অর্থাৎ সমগ্র লোকসংখ্যার মাত্র শতকরা ২ জন; জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ৬·৬ অংশ আসিত শিল্প হইতে। ইহা দ্বারা ভারতের শিল্পে অনুন্নতির পরিমাণ কিছুটা ধারণা করা যায়। প্রথম পরিকল্পনায় ভোগ্যদ্রব্যের বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন কিছুটা বাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু কোন নূতন ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় নাই কিংবা সরকারী আওতায় শিল্পের উন্নতির চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোন কোন শিল্পে সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হয়; যেমন, কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, জাহাজ-নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি। এই পরিকল্পনায় সরকারী ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৯৪ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয় শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য; ইহার মধ্যে ভারী শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ভারতের 'শিল্প-বিপ্লব' প্রকৃতপক্ষে এই দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলেই সম্ভব হইয়াছে। ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনক্ষম তিনটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা-স্থাপন এই পরিকল্পনায় কার্যকরী করা হয়। পুরাতন তিনটি ইস্পাত কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতা-বৃদ্ধিও এই পরিকল্পনার ফল। ইহা ছাড়া ভারী যন্ত্রপাতি, গুরু রসায়ন দ্রব্য প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনায় কার্যকরী করা হয়। কারণ ভারী শিল্পের উন্নতির উপর দেশের সর্বাঙ্গীণ শিল্পোন্নতি নির্ভরশীল; যেমন, কার্পাসবয়ন যন্ত্র উৎপাদিত না হইলে কার্পাস-বয়ন শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর নহে। এই পরিকল্পনার কার্যকালের শেষে ভারতের সংগঠিত শিল্পের উৎপাদন ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় দ্বিগুণ হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কোন কোন শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হইলেও, বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই (৪৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট ইহার অন্যতম প্রধান কারণ। ইহা ছাড়া বহুক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ অনুমিত খরচ অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। যেমন, তিনটি ইস্পাত কারখানার জন্য প্রথমে ৪২৫ কোটি টাকা ধার্য হইলেও, শেষপর্যন্ত খরচ হইয়াছে ৬২০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল শিল্পের **বিকেন্দ্রীকরণ**। এই উদ্দেশ্যে ভিলাইতে ও রাউরকেলায় ইস্পাত কারখানা, ভূপালে ভারী

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানা, রাঁচীতে ভারী যন্ত্রপাতির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বে-সরকারী শিল্পস্থাপনের অনুমতি দিবার সময়ও সরকার এই নীতি মানিয়া চলিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প-খাতে অর্থ-লগ্নী হইয়াছে সরকারী অংশে (Public Sector) ৭৭০ কোটি টাকা এবং বে-সরকারী অংশে (Private Sector) ৮৫০ কোটি টাকা ; ইহার মধ্যে রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ হইতে ধার করা অর্থও ধরা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প-খাতে অর্থলগ্নী (কোটি টাকা)

ধাতু-শিল্প (লৌহ ও ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি)	৭৭০	রাসায়নিক শিল্প	১৪০	কাগজশিল্প	৪০
যন্ত্রপাতি নির্মাণ	১৭৫	সিমেণ্ট ও চীনামাটি শিল্প	৬০	তৈল-শোধনাগার	৩০
শিল্পের আধুনিকীকরণ	১৫০	চিনিশিল্প	৫৬	অন্যান্য	১৪৯
		বয়নশিল্প	৫০	মোট	১,৬২০

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল ভারত সরকার **নূতন শিল্পনীতি** ঘোষণা করেন। দেশের শিল্পোন্নতি ত্বরান্বিত করিবার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের জন্য এই নীতি কার্যকরী করা হয়। এই নীতি অনুযায়ী ‘ক’-তালিকাভুক্ত নূতন শিল্পসমূহ সম্পূর্ণভাবে সরকারী আওতায় (Public Sector) আসিবে এবং ‘খ’-তালিকাভুক্ত শিল্পসমূহ সরকারী আয়ত্তে থাকিলেও ইহাতে বে-সরকারী মূলধন থাকিতে পারিবে। ‘ক’ ও ‘খ’ তালিকার বহির্ভূত শিল্পসমূহ বে-সরকারী আওতায় (Private Sector) থাকিবে।

‘ক’-তালিকাভুক্ত শিল্পসমূহ

অস্ত্রশস্ত্র, আণবিক শক্তি, লৌহ ও ইস্পাত এবং যন্ত্রপাতি শিল্প ; কয়লা, খনিজ তৈল, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, জিপ্‌সাম, গন্ধক, স্বর্ণ, হীরক, তাম্র, দস্তা, সীসা প্রভৃতি খনিজ শিল্প ; আণবিক শক্তি উদ্ধারের ধাতু ; বিমানপোত, রেল-ইঞ্জিন, জাহাজ ও টেলিফোন-নির্মাণ শিল্প ; বিদ্যুৎ-শিল্প।

‘খ’-তালিকাভুক্ত শিল্পসমূহ

অ্যালুমিনিয়াম ও অলৌহবর্গীয় অন্যান্য ধাতুশিল্প, লৌহ-সঙ্কর, রসায়ন-সামগ্রী, ঔষধ, সার, কৃত্রিম রবার, কয়লার উপজাত দ্রব্যাদি, কাষ্ঠমণ্ড, রাজ-পথ-নির্মাণ, জলপথ, ‘ক’-তালিকায় অনুল্লেখিত খনিজ-শিল্প প্রভৃতি।

সরকারী আওতায় (Public Sector) উল্লেখযোগ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ*

	সরকারী কোম্পানীর নাম	কারখানার স্থান	প্রতিষ্ঠার বৎসর
১।	হিন্দুস্থান স্টীল লি:	দুর্গাপুর, রাউরকেলা, ভিলাই, বোকারো	১৯৫৩
২।	হিন্দুস্থান মেশিন টুলস্ লি:	বাঙ্গালোর, পাঞ্জাব (†), রাঁচী	১৯৫৩
৩।	হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন লি:	রাঁচী	১৯৫৮
৪।	হিন্দুস্থান অ্যান্টি-বায়োটিক্স্ লি:	পিম্প্রি, হৃষীকেশ	১৯৫৪
৫।	হিন্দুস্থান কেব্‌লস্ লি:	রূপনারায়ণপুর (প: বঙ্গ)	১৯৫২
৬।	হিন্দুস্থান ইনসেক্টিসাইড্‌স্ লি:	দিল্লী	১৯৫৪
৭।	হিন্দুস্থান অর্গানিক কেমিক্যালস্ লি:	দুর্গাপুর	১৯৬০
৮।	হিন্দুস্থান সল্ট কোম্পানী লি:	সম্বর ও দিদোয়ানা (রাজস্থান), খারাঘোড়া (মহারাষ্ট্র)	১৯৫৮
৯।	নাহান ফাউণ্ড্রি		১৯৫২
১০।	হিন্দুস্থান কেমিক্যাল্‌স অ্যাণ্ড ফার্টিলাইজারস্ লি:	রাউরকেলা, ট্রম্বে, নিভেলী, নাহারকাটিয়া, গোরক্ষপুর, নাঙ্গাল	১৯৫৬
১১।	ন্যাশন্যাল ইনস্ট্রুমেণ্টস্ লি:	কলিকাতা	১৯৫৭
১২।	ন্যাশন্যাল নিউজপ্রিণ্ট অ্যাণ্ড পেপার মিলস্ লি:	নেপানগর	১৯৪৭
১৩।	সিন্ধ্রী ফার্টিলাইজারস্ অ্যাণ্ড কেমিক্যালস্ লি:	সিন্ধ্রী	১৯৫১
১৪।	প্রাগা টুল্‌স্ করপোরেশন লি:	সেকেন্দ্রাবাদ (অন্ধ্র)	১৯৪৩
১৫।	হিন্দুস্থান ফটো ফিল্ম ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লি:	উতকামন্দ	১৯৬০
১৬।	হেভি ইলেক্ট্রিক্যাল্‌স্ লি:	ভূপাল	১৯৫৬
১৭।	ইণ্ডিয়ান ড্রাগস্ অ্যাণ্ড ফার্মাসিওটিক্যালস্ লি:	সনটনগর (অন্ধ্র), মুম্নার (কেরালা)	১৯৬১
১৮।	ভারত ইলেক্ট্রোনিকস লি:	বাঙ্গালোর	১৯৫৪
১৯।	প্রোটোটাইপ মেসিন টুল ফ্যাক্টরী	অম্বরনাথ	১৯৫৩
২০।	হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স্ লি:	বাঙ্গালোর	১৯৪০
২১।	ইণ্ডিয়ান রেয়ার আর্থ লি:		১৯৫০
২২।	সিল্‌ভার রিফাইনারী	কলিকাতা	১৯৫২

*Source—Third Five Year Plan.

† নির্দিষ্ট স্থান এখনও নির্ধারিত হয় নাই।

	সরকারী কোম্পানীর নাম	কারখানার স্থান	প্রতিষ্ঠার বৎসর
২৩।	চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্	চিত্তরঞ্জন	১৯৪৮
২৪।	ইন্টিগ্রেল কোচ ফ্যাক্টরী	বাঙ্গালোর	১৯৫২
২৫।	ইণ্ডিয়ান রিফাইনারিজ্ লি:	বারাউনি, নুনমাটি, গুজরাট*	১৯৫৮
২৬।	ন্যাশন্যাল কোল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লি:	—	১৯৫৬
২৭।	ন্যাশন্যাল মিনারেল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লি:	—	১৯৫৮
২৮।	নিভেলী লিগ্‌নাইট কর্পো:	নিভেলী (মাদ্রাজ)	১৯৫৬
২৯।	সিঙ্গারেণী কোলিয়ারিজ কোং লি:	সিঙ্গারেণী	১৯২০
৩০।	অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারেল গ্যাস কমিশন	অ্যাংকলেশ্বর, শিবসাগর, জ্বালামুখী	১৯৫৬
৩১।	ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রিজ লি:	বাঙ্গালোর	১৯৪৮
৩২।	হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লি:	বিশাখাপতনম, কোচিন	১৯৫২
৩৩।	হিন্দুস্থান টেলিপ্রিণ্টার্স লি:		১৯৬০
৩৪।	হিন্দুস্থান হাউসিং ফ্যাক্টরী লি:		১৯৫৩

তৃতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উপর আরও জোর দেওয়া হইয়াছে। ভারী শিল্পের উৎপাদনের লক্ষ্য বহুলাংশে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদন-বৃদ্ধির দিকেও দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। শক্তিসম্পদের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য কয়লা ও জলবিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রেলপথের উন্নতিসাধন করিয়া শিল্পের কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির সুষ্ঠুভাবে পরিবহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। রপ্তানির উপযুক্ত শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। তৃতীয় পরিকল্পনায় শ্রমশিল্প ও খনিজ শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য মোট ২,৯৯৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বে-সরকারী খাতে ১,১৮৫ কোটি টাকা এবং সরকারী খাতে ১,৮০৮ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় **ভারী শিল্পের** উন্নতিসাধন। ইস্পাত ও গুরু রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদন, তৈল-শোধানাগার স্থাপন এবং ভারী ও লঘু যন্ত্রপাতি-নির্মাণের উপর এতটা জোর দেওয়া হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনার লক্ষ্য সাধিত হইলে, তৃতীয় পরিকল্পনা ভারতের শিল্পের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই পরিকল্পনায়

*নির্দিষ্ট স্থান এখনও নির্ধারিত হয় নাই।

শিল্পোন্নতির সূচক ধার্য হইয়াছে (১৯৫০-৫১ সালের তুলনায়) ৩২৯ ; কিন্তু প্রথম পরিকল্পনায় এই সূচক ধার্য হইয়াছিল ১৩৯ এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৯৪।

তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের পথে কয়েকটি বাধা-বিঘ্ন দেখা গিয়াছে। পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থার উপর বৈদেশিক ঋণ নির্ভরশীল বলিয়া বৈদেশিক সাহায্য অত্যন্ত অনিশ্চিত। ইহা ছাড়া শিল্প-কারখানার পরিকল্পনা রচনা করিবার, যন্ত্রপাতি বসাইবার এবং নিখুঁতভাবে খরচের খসড়া প্রস্তুতের উপযোগী ইঞ্জিনিয়ারের অভাবে ঠিকমতো সকল কার্য নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা যায় না। আশা করা যায়, শীঘ্রই এই সকল অসুবিধা দূর হইবে, পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করিবে এবং সরকারী আওতায় শিল্প প্রসারের দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে' ভারত পুনর্গঠিত হইবে।*

ভারতের শিল্প-উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (লক্ষ টন) †

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১ (লক্ষ্য)	১৯৬০-৬১ (প্রকৃত উৎপাদন)	১৯৬৫-৬৬ ‡ উৎপাদন-ক্ষমতা (লক্ষ্য)	১৯৬৫-৬৬ ‡ উৎপাদন-লক্ষ্য
ইস্পাত	১৪	১৭	৪৩	৩৫	১০২	৯২
ঢালাই লৌহ	১'৫	৩'৮	৯	৯	১৫	১৫
সার (N)	'০৯	'০৮	২'৯	১'১	১০	৮
সার (P_2O_5)	'০৯	'১২	১'২	'৫৫	৫	৪
অ্যালুমিনিয়াম (সহস্র টন)	৩'৭	৭'৩	২৫	১৮'৫	৮৭'৫	৮০
সোডা অ্যাশ	'৪৫	'৮১	২'৩	১'৫৫	৫'৩	৪'৫
কস্টিক সোডা	'১১	'৩৫	১'৩৫	১	৪	৩'৪
সিমেন্ট	২৭	৪৬	১৩০	৮৫	১২০	১৩০
সালফিউরিক অ্যাসিড	'৯৯	১'৬৪	৪'৭	৩'৬৩	১৭'৫	১৫
কাগজ ও নিউজপ্রিণ্ট	১'১৪	১'৯১	৪'১২	৩'৭৫	৯'৭২	৮'২২
তৈল-শোধন	০	৩৬	৬০'২	৫৬'৭	১০৭'৭	৯৮'৬
রেল-ইঞ্জিন (সংখ্যা)	৭	১৭৯	৪০০	২৯৫	N.A.	৩৬৮
মোটর-গাড়ী (হাজার)	১৬'৫	২৫'৩	৫৭	৫৩'৫	১০০	১০০
জাহাজ-নির্মাণ (000 GRT)	০	১০	—	২০	৫০/৬০	৫০/৬০
কার্পাস-বস্ত্র (মিলজাত) (কোটি গজ)	৩৭২	৫১০	৫৩০	৫১৩	৫৮০	৫৮০
পাটজাত দ্রব্য	৮'৯২	১১'৫	১২	১০'৬৫	১২	১১
চিনি	১১'২	১৮'৬	২২'৫	৩০	৩৫	৩৫

* "The rapid growth of Public Sector investment and output will considerably further the objectives of a Socialistic pattern of society."—*Third Five-Year Plan.*

† Source—*Third Five-Year Plan.*

‡ তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলেও এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলেও এখনও এই দেশে ৫টি **শিল্পাঞ্চলে** অধিকাংশ শিল্প কেন্দ্রীভূত—(১) কলিকাতার নিকটস্থ হুগলী উপত্যকা, (২) বোম্বাই-আমেদাবাদ কার্পাস শিল্পাঞ্চল, (৩) দামোদর-উপত্যকা, ছোটনাগপুর জামসেদপুর অঞ্চল, (৪) মাদ্রাজের নীলগিরি অঞ্চল এবং (৫) কানপুর। হুগলী-উপত্যকায় প্রধানতঃ পাট, কার্পাস-বয়ন, কাগজ, চর্মদ্রব্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলে কার্পাসবয়ন, তৈল-পরিশোধন, রাসায়নিক প্রভৃতি শিল্পের একদেশীভবন হইয়াছে। মাদ্রাজের নীলগিরি অঞ্চলে কার্পাসবয়ন শিল্পের এবং কানপুরে পশমবয়ন, কার্পাসবয়ন ও চর্মশিল্পের উন্নতি হইয়াছে। ইহা ছাড়া জামসেদপুর, রাউরকেলা, ভিলাই, রাঁচী, ভূপাল প্রভৃতি অঞ্চলও ভারীশিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প
(Iron and Steel Industries)

প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে লৌহশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। দিল্লীর কুতুব মিনারের নিকটস্থ ৭ মিটার অর্ধসমাপ্ত লৌহস্তম্ভ ইহার নিদর্শন। ১,৫০০ বৎসর পূর্বে এই স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল। সেই সময় পৃথিবীর বহু দেশেই এই শিল্পের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া ভারত অতিক্রম করায় এবং বিদেশী শক্তির প্রভাবে, এই শিল্প বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আশার কথা, ভারত পুনরায় এই শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ভারতে ১৭৭৯ সাল হইতে বিভিন্ন লোক লৌহের কারখানা-স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিল। যতদূর জানা যায় শিল্প-বিপ্লবের পর ১৭৭৯ সালে মট্টি ও ফার্কার (Mottee & Farquhar) ভারতে সর্বপ্রথম আধুনিক লৌহ-কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁহারা বীরভূমে লৌহখনিসমূহের ইজারা লইয়াছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। ইহার পর ১৮৩০ সালে হীথ (Josiah Marshall Heath) নামে একজন ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আর্থিক সহায়তায় আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্প স্থাপনের চেষ্টা করেন। ইহার ফলে দক্ষিণ আর্কটের পোর্টো নোভো অঞ্চলে লৌহ-উৎপাদন আরম্ভ

হয়। কিন্তু শক্তিসম্পদ ও যন্ত্রপাতির অভাবে এবং হীথ মারা যাওয়ায় শেষ-পর্যন্ত এই কারখানা ১৮৭৪ সালে বন্ধ হইয়া যায়। ঐ বৎসর আবার ঝরিয়া কয়লাখনির সাহায্যে কুলটীতে 'বরাকর আয়রন ফাউন্‌ড্রী' নামে একটি লৌহ-কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯০০ সালে এই কারখানা হইতে প্রায় ৩৫,০০০ টন লৌহ উৎপন্ন হইয়াছিল। পরে এই কারখানা বর্তমান ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোং লিঃ-এর অঙ্গীভূত হয়। কিন্তু ইস্পাতশিল্পের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয় ১৯০৯ সালে। সেই বৎসর বিহারের সাকৃচীতে জে. এন. টাটা নামক বোম্বাই-এর জনৈক পার্শী ব্যবসায়ী একটি বড় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপন করে। সাকৃচীর বর্তমান নাম জামসেদপুর। ক্রমশঃ বার্নপুরে ও ভদ্রাবতীতেও লৌহ ও ইস্পাত-কারখানা স্থাপিত হইল। ভারতে এইভাবে ইস্পাতশিল্পের পুনরুত্থান আরম্ভ হয়।

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির প্রচুর সুবিধা রহিয়াছে। বিহারের ঝরিয়া ও বোকারো, পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ, মধ্যপ্রদেশের কোরবা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। বিহারের সিংভূম, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও কেওনঝাড়, মহীশূরের বাবাবুদান, মধ্যপ্রদেশের দ্রুগ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায় (৪০৩ ও ৪১২ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং উড়িষ্যায় প্রচুর ডোলোমাইট, চুনাপাথর ও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। সুতরাং এদেশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য **কাঁচামাল** ও **শক্তিসম্পদের** কোন অভাব নাই। দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব রেলপথ এই সকল খনি-অঞ্চলকে শিল্পকেন্দ্র ও বন্দরসমূহের সহিত যুক্ত করিয়াছে। সুতরাং **পরিবহণের** সুবন্দোবস্তের বিশেষ কোন অভাব নাই। ভারত শিল্পে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে এবং বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। শিল্পের চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রচুর যন্ত্রপাতি, কাঁচালৌহ ও ইস্পাত প্রয়োজন। বর্তমানে প্রতিবৎসর প্রায় ১৪৭ কোটি টাকা মূল্যের ইস্পাত-দ্রব্য আমদানি করিতে হয়; সুতরাং ভারতে লৌহ ও ইস্পাতের **চাহিদার** কোন অভাব নাই। ইহা ছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এই শিল্পের বিশেষ কোন উন্নতি না হওয়ায় রপ্তানি-বাণিজ্যের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। ভারতে সুলভ **শ্রমিকের** কোন অভাব নাই। বিশেষতঃ বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে এই শিল্পের উপযোগী প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায়। এই শিল্প সরকারী আওতায় পড়ে বলিয়া সরকার

এই শিল্পের জন্য **মূলধন** যোগাড় করিতেছে। সুতরাং আশা করা যায় যে, এই সকল কারণে ভারতে এই শিল্পের আরও **উন্নতি** হইবে।

ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (লক্ষ টন)

১৯৫০-৫১	১৪	১৯৬০-৬১	৩৫
১৯৫৫-৫৬	১৭	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	৯২

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে ইস্পাত-উৎপাদন আরম্ভ হইলেও বৃটেন হইতে ইস্পাত দ্রব্যের আমদানি বজায় রাখিবার জন্য এই দেশে ইস্পাত-উৎপাদনের পরিমাণ ছিল অতি অল্প। ইস্পাতের অভাবে এই দেশে শিল্পোন্নয়নের ব্যাঘাত ঘটে। স্বাধীনতার পর প্রথম **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়** লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির জন্য সক্রিয় চেষ্টা করা না হইলেও, বে-সরকারী ইস্পাতশিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা হয় এবং সরকারী আওতায় নূতন ইস্পাত-কারখানা সুরু করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয় এবং সরকার স্বয়ং তিনটি ইস্পাত-কারখানায় (ভিলাই, রাউরকেলা ও দুর্গাপুর) লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন সুরু করে। এই পরিকল্পনায় ইস্পাত-উৎপাদনের ক্ষমতা ধার্য করা হয় ৬২ লক্ষ টন এবং প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ ধার্য হয় ৪৩ লক্ষ টন। অবশ্য এই পরিকল্পনার কার্যকালের শেষে (১৯৬০-৬১) প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ আশানুরূপ হয় নাই। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** (১৯৬১-৬৬) এইজন্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির উপর আরও জোর দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনায় ইস্পাত-কারখানাসমূহের উৎপাদন-ক্ষমতা ধার্য হয় ১'০২ কোটি টন এবং প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ ৯২ লক্ষ টন ধার্য হয়। এই পরিকল্পনায় পুরাতন কারখানাসমূহের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইবার এবং বোকারোতে একটি নূতন কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। মাদ্রাজের দক্ষিণ আর্কটের নিভেলীতে লিগ্‌নাইট কয়লার সাহায্যে ঢালাই-লৌহ উৎপাদনের বন্দোবস্ত করা হয়। এখানে ৫ লক্ষ টন ইস্পাত-উৎপাদনক্ষম একটি ইস্পাত-কারখানা-স্থাপন সম্বন্ধে অনুসন্ধানও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ইস্পাত শিল্পের উন্নতির জন্য কয়লা ও লৌহের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা করা হইয়াছে। ঢালি-রাজহারা ও বারসুয়া অঞ্চলে লৌহ উৎপাদনের জন্য, নন্দিনী অঞ্চলে চুনাপাথর উত্তোলনের জন্য, বোকারোতে

নূতন ইস্পাত-কারখানা তৈয়ারীর জন্য, ভিলাই, রাউরকেলা ও দুর্গাপুর কারখানাসমূহের সম্প্রসারণের জন্য এবং মাদ্রাজে ঢালাই-লৌহের কারখানা স্থাপনের জন্য এই পরিকল্পনায় ৫২৫ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া এই পরিকল্পনায় দুর্গাপুরে **সঙ্কর-ইস্পাত** ও বিশেষ ধরনের ইস্পাত উৎপাদনের জন্য একটি কারখানা স্থাপিত হইতেছে। দুর্গাপুর কারখানায় এই ধরনের ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতা হইবে ৪৮,০০০ টন। ইহাতে মোট খরচ হইবে ৫০ কোটি টাকা। দেশরক্ষা বিভাগের কাশীপুর ও কানপুর কারখানায়ও ৫০,০০০ টন সঙ্কর-ইস্পাত প্রস্তুতের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য যে পূরণ করা সম্ভব হইবে না, তাহা নিশ্চিত। বোকারো কারখানা-স্থাপনে সরকারের মনস্থিরতার অভাবের জন্যই এই লক্ষ্য পূরণ হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি পালন না করিবার ফলেই বোকারো প্রকল্পের বিলম্ব ঘটে, পরিকল্পনার তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও ইস্পাতের উৎপাদন উহার লক্ষ্যের অর্ধেক পর্যন্তও পৌঁছাইতে পারে নাই। ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। ১৯৬৪ সালে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬১ লক্ষ মেঃ টন।

ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের **সমস্যা**সমূহের মধ্যে মূলধন ও যন্ত্রপাতির অভাব এবং ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত কোক-কয়লার অপ্রাচুর্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা কমিশন বৈদেশিক মূলধন, যন্ত্রপাতি ও কারিগরী সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ভারতে বর্তমানে কোক-কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু এই দেশে সঞ্চিত কোক-কয়লার পরিমাণ খুব যথেষ্ট নহে। সেইজন্য এই দেশকে বহু লৌহ আকরিক বিদেশে রপ্তানি করিতে হয়।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে বর্তমানে ছয়টি কারখানায় ইস্পাত উৎপন্ন হইতেছে। তন্মধ্যে ভিলাই, রাউরকেলা, দুর্গাপুর ও ভদ্রাবতী কারখানা সরকারী আওতায় (Public Sector) এবং জামসেদপুর ও বার্নপুর বে-সরকারী আওতায় (Private Sector) চালিত হইতেছে। ইহা ছাড়া ১৯৬৬ সালের মধ্যে বোকারোতে একটি ইস্পাত-কারখানা এবং নিভেলীতে একটি ঢালাই-লৌহ উৎপাদনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভিলাই, রাউরকেলা, দুর্গাপুর

ও বোকারোর কারখানাসমূহ 'হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড' নামক একটি সরকারী কোম্পানীর অঙ্গীভূত।

ভারতের ৬টি ইস্পাতশিল্পকেন্দ্রের মধ্যে ৫টি কেন্দ্র এই দেশের উত্তর-পূর্বাংশের খনি অঞ্চলে অবস্থিত। কোনটি কয়লা খনির নিকটে, কোনটি লৌহখনির নিকটে, আবার কোনটি উভয় খনির মধ্যবর্তী রেলপথে অবস্থিত। বার্নপুর ও দুর্গাপুরের শিল্পগুলি রাণীগঞ্জ কয়লাখনির উপরেই অবস্থিত, কিন্তু জামসেদপুর, রাউরকেলা ও ভিলাই লৌহ খনি ও কয়লা খনির মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এই শেষোক্ত তিনটি কেন্দ্র কয়লা খনি হইতে কম দূরে অবস্থিত। এই সকল শিল্পকেন্দ্র বিভিন্ন খনির সঙ্গে রেলপথে যুক্ত।

লৌহ ও ইস্পাত কারখানাসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা

(লক্ষ টন)

	১৯৬০-৬১ (উৎপাদন-ক্ষমতা)	১৯৬৫-৬৬ (উৎপাদন-ক্ষমতা)	
	ইস্পাত	ইস্পাত	ঢালাই-লৌহ
ভিলাই	১০	২৫	৩
দুর্গাপুর	১০	১৬	৩
রাউরকেলা	১০	১৮	—
জামসেদপুর	২০	৩২ (জামসেদপুর ও বার্নপুর)	৩ (জামসেদপুর ও বার্নপুর)
বার্নপুর	১১		
ভদ্রাবতী	১	১	৩'৫
বোকারো	×	১০	
নিভেলী (মাদ্রাজ)		—	অনির্ধারিত
মোট	৬২	১০২	১৫

ভিলাই—মধ্যপ্রদেশের দ্রুগ জেলায় রাশিয়ার আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যে এই স্থানে একটি বৃহদাকার ইস্পাত-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। দ্রুগ জেলার ঢালি-রাজহারা অঞ্চলের উৎকৃষ্ট লৌহ, কোরবা অঞ্চলের কয়লা, তাণ্ডুলা খালের জল, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, চিন্দোয়ানা ও জব্বলপুরের

ম্যাঙ্গানিজ এবং কারখানার সংলগ্ন অঞ্চলের চুনাপাথরের সাহায্যে এখানে ভারতের শ্রেষ্ঠ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলের ইস্পাতের চাহিদা এই স্থান হইতে মিটানো সহজসাধ্য হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে এই কারখানা স্থাপিত হয়। ভিলাই ভারতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সুতরাং দেশের সকল শিল্পেই এই শিল্প হইতে ইস্পাত সরবরাহ করা যাইবে। বিশাখাপতনমের জাহাজ-নির্মাণ শিল্প এবং বোম্বাই-এর শিল্পাঞ্চল এই কারখানা হইতে প্রভূত সাহায্য পাইবে। বর্তমানে এই কারখানায় ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতা ১০ লক্ষ টন। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই কারখানা সম্প্রসারিত করিবার পর ইহার ইস্পাত-উৎপাদন-ক্ষমতা হইবে ২৫ লক্ষ টন এবং ঢালাই লৌহ উৎপাদনের ক্ষমতা হইবে ৩ লক্ষ টন। ১৯৬৬ সালে ভিলাই ভারতের শ্রেষ্ঠ লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় পরিণত হইবে।

দুর্গাপুর—'ইস্কন' নামক একটি বৃটিশ কোম্পানার সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় এই কারখানা দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে স্থাপিত হইয়াছে। রাণীগঞ্জের উৎকৃষ্ট কয়লা সিংভূম ও উড়িষ্যার লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ, স্থানীয় নিপুণ শ্রমিক, দামোদর নদের জল এখানকার ইস্পাত কারখানা স্থাপনে সাহায্য করিয়াছে। নিকটবর্তী কলিকাতা বন্দর মারফত লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য রপ্তানি করা সহজসাধ্য হইবে। কলিকাতা বন্দর এই শিল্পকেন্দ্র হইতে ১৭০ কিলোমিটার। রেলপথে এই বন্দর দুর্গাপুরের সঙ্গে যুক্ত আছে। ইহা ছাড়া সম্প্রতি দুর্গাপুর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত নৌবহনযোগ্য একটি খাল কাটা হইয়াছে; ইহাতেও সুলভ পরিবহণের সুবিধা হইয়াছে। দুর্গাপুর অঞ্চলেও বর্তমানে নানাবিধ শিল্প স্থাপিত হওয়ায় ইস্পাতের স্থানীয় চাহিদাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আধুনিক জগতে সুসংগঠিত শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর রুঢ় অঞ্চলের নাম অত্যধিক জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পের বিশেষতঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ বিদ্যমান। ভারতে দামোদর উপত্যকায় অবস্থিত এই দুর্গাপুর অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ শিল্পবিকাশের সুযোগ বিদ্যমান। রুঢ় অঞ্চলে যেমন প্রচুর উৎকৃষ্টশ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়, দুর্গাপুরেও রাণীগঞ্জের উৎকৃষ্ট কয়লা বিদ্যমান। রুঢ় উপত্যকার সঙ্গে দামোদর উপত্যকার তুলনা চলে। রুঢ় অঞ্চলে যেমন ইস্পাত শিল্পের উপর

নির্ভর বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, দুর্গাপুরের নিকটেও সেইরূপ গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে ইহার ইস্পাত-উৎপাদন-ক্ষমতা প্রায় ১০ লক্ষ টন। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই কারখানার ইস্পাত-উৎপাদনের ক্ষমতা হইবে ১৬ লক্ষ টন এবং ঢালাই-লৌহ উৎপাদনের ক্ষমতা হইবে ৩ লক্ষ টন।

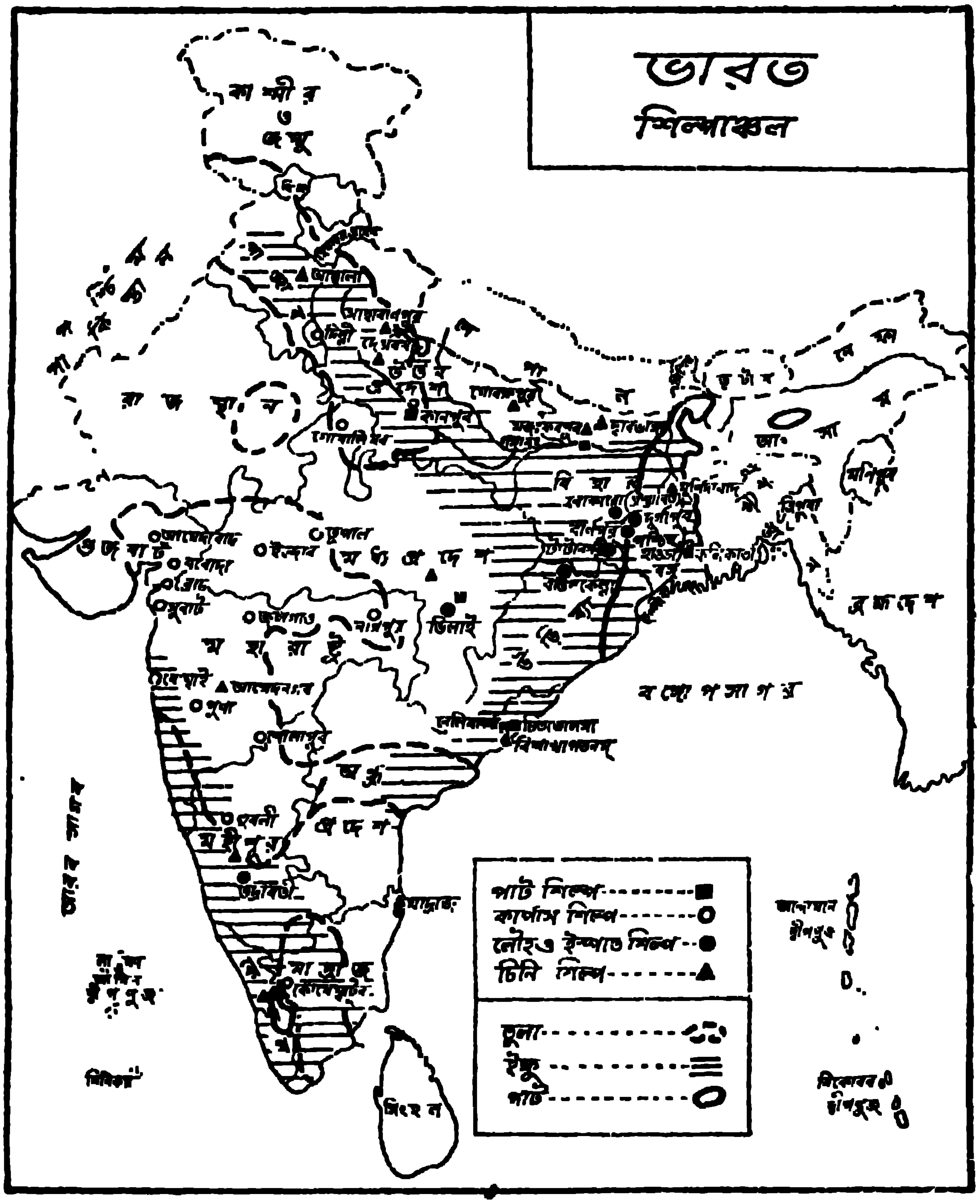

চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন শিল্প, রূপনারায়ণের তারের কারখানা, আসানসোলের অ্যালুমিনিয়াম ও সাইকেলের কারখানা, সিন্ধ্রির সারের কারখানা এবং স্থানীয় কার্পাসবয়ন, সিমেন্ট, কাগজ ও অন্যান্য নানাবিধ কারখানা, ইহারই নিকট অবস্থিত বার্নপুর ইস্পাত কারখানা এবং আরও উত্তরে স্থাপিত

হইতেছে বোকারোর ইস্পাত কারখানা। এইভাবে দেখা যায় যে দামোদর উপত্যকায় অবস্থিত এই শিল্পাঞ্চলকে ভবিষ্যতে রুঢ় শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করা যাইবে, এবং ইহাই হইবে **'ভারতের রুঢ়' (The Ruhr of India)**।

রাউরকেলা—উড়িষ্যা রাজ্যের লৌহখনি অঞ্চলের সন্নিকটে অবস্থিত রাউরকেলায় জার্মানীর ক্রুপ্‌স্‌-দেমাগ নামক একটি কোম্পানীর সহায়তায় একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে এই কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার বর্তমান ইস্পাত-উৎপাদনের ক্ষমতা প্রায় ১০ লক্ষ টন। নিকটবর্তী বোনাই অঞ্চলের লৌহ, রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া ও তালচের অঞ্চলের কয়লা, হীরাকুদের জলবিদ্যুৎ, স্থানীয় ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর ও ডোলোমাইট ও উড়িষ্যার সুলভ শ্রমিক এই কারখানা-স্থাপনে সহায়তা করিতেছে। যে গাড়ীতে এই অঞ্চল হইতে লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর ও ডোলোমাইট লইয়া যায়, সেই গাড়ীতেই রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া হইতে কয়লা আনা হয়। ইহাতে পরিবহণ খরচ বাঁচিয়া যায়। নিকটবর্তী বাহ্মণী নদী হইতে প্রচুর জল পাওয়া যায়। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালের শেষে ইহার ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ১৬ লক্ষ টন করা হইবে।

বোকারো—তৃতীয় পরিকল্পনায় এখানে একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি অনুসারে সাহায্য না দেওয়ায়, বর্তমানে রাশিয়ার সাহায্যে ইহা চতুর্থ পরিকল্পনায় স্থাপিত হইবে। প্রথমাবস্থায় এই কারখানার ১০ লক্ষ টন ইস্পাত ও ৩৫ লক্ষ টন ঢালাই-লৌহ উৎপাদনের ক্ষমতা থাকিবে; কিন্তু পরে প্রয়োজনমতো ইহার ইস্পাত-উৎপাদনের ক্ষমতা ৪০ লক্ষ টন পর্যন্ত বাড়ানো যাইবে। স্থানীয় কয়লা, সিংভুমের লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ও চুনাপাথর, দামোদর নদের জল, পূর্ব রেলপথের পরিবহণ-ব্যবস্থার সাহায্যে এখানে ঢালাই-লৌহ ও ইস্পাত-উৎপাদন সহজসাধ্য হইবে।

ভদ্রাবতী—মহীশূরে অবস্থিত এই কারখানাটি অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট। পশ্চিম মহীশূরের বনভূমি অঞ্চলে ভদ্রা নদীর তীরে এই কারখানাটি অবস্থিত। এখানে বর্তমানে মাত্র ২৫,০০০ টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই কারখানার ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতা হইবে ১ লক্ষ টন। কয়লার অভাবে শিমোগা ও কাডুরের বনভূমি হইতে সংগৃহীত কাঠ-কয়লা

এবং যোগ অঞ্চলের জলবিদ্যুতের সাহায্যে এই কারখানা চালানো হয়। এই রাজ্যের বাবাবুদান পর্বতের কেমান্‌গুণ্ডি খনির লৌহ, শিমোগা ও চিতলদ্রাগ অঞ্চলের ম্যাঙ্গানিজ এবং ভাণ্ডিগুড্ডার চুনাপাথর এই কারখানায় ব্যবহৃত হয়। এই কারখানায় সঙ্কর-ইস্পাত উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে।

জামসেদপুর—ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতিতে জামসেদ-পুরের দান অসামান্য। এখানে এই শিল্প গড়িয়া উঠার প্রধান কারণ এই যে, ইহার উত্তরে ঝরিয়া ও বোকারোর কয়লাখনি এবং দক্ষিণে সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ ও কেওনঝাড়ের লৌহখনি এবং গাঙ্গপুরের ম্যাঙ্গানিজ খনি

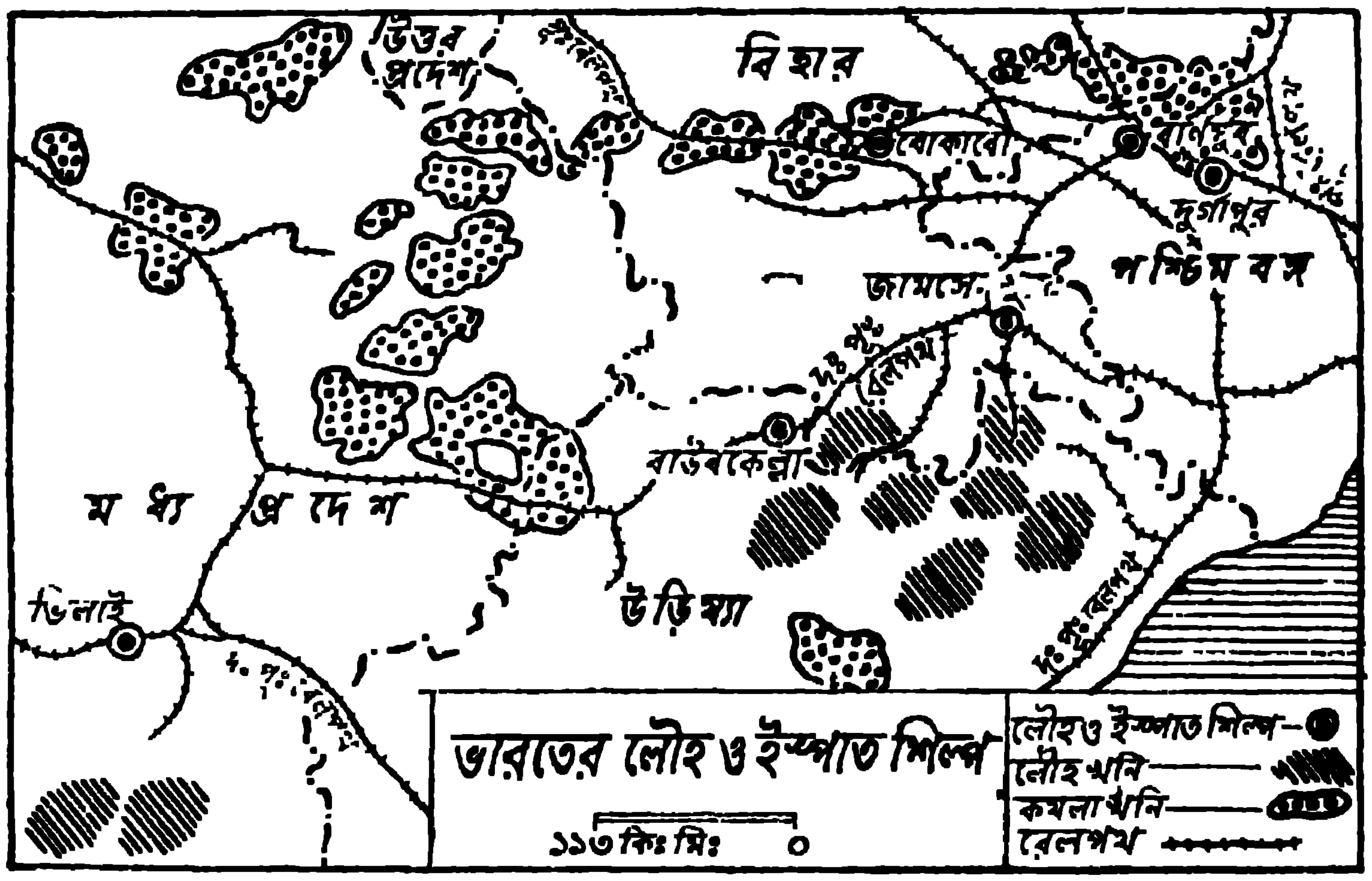

অবস্থিত। উড়িষ্যার গাঙ্গপুর অঞ্চলের চুনাপাথর ও ডোলামাইট এখানে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা বিভিন্ন খনি অঞ্চলের সহিত জামসেদপুর যুক্ত। সুবর্ণরেখা নদী এই স্থানের পাশ দিয়া গিয়াছে বলিয়া জলের কোন অভাব হয় না। মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুরের সুলভ শ্রমিক এবং ভারতে ইস্পাতের প্রচুর চাহিদা এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। কলিকাতা বন্দর এই স্থান হইতে মাত্র ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ইহার ফলে কাঁচালৌহ রপ্তানি সহজসাধ্য হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে এই কারখানার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া এখানকার ইস্পাত-উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়াইয়া ২০ লক্ষ টন করা হইয়াছে।

বার্নপুর—রাণীগঞ্জের কয়লা, সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জের লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মারফত এখানে আনা হয়। স্থানীয় শ্রমিক এই শিল্পে নিপুণতার পরিচয় দেয়। বিহার ও উড়িষ্যা হইতেও প্রচুর সুলভ শ্রমিক এখানে আসে। এই সকল কারণে বার্নপুরের নিকট কুলটি ও হীরাপুরে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

মাদ্রাজের নিভেলাতে লিগনাইট কয়লার সাহায্যে ঢালাই-লৌহের উৎপাদন এবং ইস্পাত-উৎপাদন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা তৃতীয় পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। সালেম ও ত্রিচিনাপল্লীতে প্রচুর পরিমাণে চুনাপাথর ও ডোলোমাইট পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া এই অঞ্চলে সঞ্চিত লৌহভাণ্ডারের পরিমাণ প্রায় ৩০ কোটি টন। সুতরাং এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠা খুবই সম্ভব। আশা করা যায়, চতুর্থ পরিকল্পনায় এখানেও ইস্পাত-কারখানা স্থাপনের বন্দোবস্ত হইবে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় পঞ্চম সরকারী ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য চেষ্টা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে গোয়া-হস্‌পেট, সালেম, বৈলাডিলা-বিশাখাপত্তনম্‌ প্রভৃতি স্থানের মধ্যে একটি স্থানে এই কারখানা স্থাপিত হইবে।

বাণিজ্য—ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। লৌহ আকরিক, কয়লা, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ ও ডোলামাইটের অপর্যাপ্ত সম্ভার এই দেশে বিদ্যমান। পরিকল্পনা কমিশন এই শিল্পের উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বিদেশ হইতে মূলধন ও কারিগরী সাহায্যের কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় না; এইজন্য ক্রমশঃ লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া তিনগুণ হইয়াছে। কিন্তু ভারতে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে ইস্পাতের চাহিদা অসম্ভব হারে বাড়িয়া গিয়াছে; এখনও উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা অত্যন্ত বেশী। আমদানি করিয়া এই চাহিদা মিটাইতে হইতেছে। ভারতে বর্তমানে ইস্পাতের মোট চাহিদা প্রায় ৪০ লক্ষ টন—জনপ্রতি মাত্র ১০ কিলোগ্রাম; কিন্তু ইহার পরিমাণ বৃটেনে জনপ্রতি ২৯০ কিলোগ্রাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫৬০ কিলোগ্রাম এবং রাশিয়ায় ৩১০ কিলোগ্রাম।

ইস্পাতদ্রব্য-উৎপাদন ও আমদানি (সহস্র টন).

	১৯৫৬	১৯৫৮	১৯৫৯	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)
উৎপাদন	১৩৫৫	১৩৯১	১৭৫৯	৬৮০০
আমদানি	১৮৫৪	১১৭৩	৭৯৬	৫০০
	৩২০৯	২৫৬৪	২৫৫৫	৭৩০০*

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় নূতন নূতন যন্ত্রপাতি-শিল্প স্থাপিত হওয়ায় লৌহ ও ইস্পাতের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে ইস্পাত-উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও আমদানি কমিয়া আসিতেছে। বৈদেশিক মুদ্রার অভাব ইহার প্রধান কারণ। ভারতে ঢালাই-লৌহের উৎপাদন অবশ্য চাহিদার তুলনায় বেশী। এইজন্য বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে ঢালাই-লৌহ রপ্তানি হয়। ইহা ছাড়া লৌহ ও ইস্পাতের টুকরা বৃটেন ও জাপানে রপ্তানি করা হয়। ভারতে ইস্পাত-দ্রব্য আমদানি হয় প্রধানতঃ বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ হইতে। ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প যে হারে উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয় শীঘ্রই এই দেশ নিকটবর্তী দেশসমূহে (ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ইন্দোচীন, সিংহল প্রভৃতি) উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ইস্পাত-দ্রব্য রপ্তানি করিতে সমর্থ হইবে। এই সকল দেশে কয়লার অভাবে ইস্পাত শিল্পের উন্নতি-সাধন খুব কঠিন। সুতরাং ভারতীয় ইস্পাতের উৎপাদন-খরচ বর্তমানের মতো কম রাখিতে পারিলে এই সকল বাজার দখল করা মোটই কঠিন হইবে না। এইভাবে দেখা যায় যে, ভারতের ইস্পাত-রপ্তানির ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল।

কার্পাসবয়ন শিল্প
(Cotton Textile Industry)

প্রাচীনকাল হইতেই ভারত কার্পাসবয়ন শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তকলী দ্বারা সূতা প্রস্তুত করিয়া তাঁতে কাপড় প্রস্তুত করা হইত। কোন কোন কাপড় এত সূক্ষ্ম হইত যে, বর্তমান যুগের কাপড়ের কলেও এত ভালো কাপড় প্রস্তুত হয় না। এক সময়ে কালিকটের 'ক্যালিকো' এবং ঢাকার

* ইস্পাত-দ্রব্য

'মস্‌লিনের' কথা পৃথিবীর সকলেই জানিত। ভারতের তাঁতশিল্প এত উন্নত যে, এই যান্ত্রিক যুগেও ইহা ভারতের কার্পাসবয়ন শিল্পে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রাদি এদেশে বিক্রয় করিবার জন্য বৃটিশ সরকার ভারতের তাঁতশিল্পের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহারা শেষপর্যন্ত সফলকাম হয় নাই।

১৮১৮ সালে কলিকাতার নিকট ঘুষুড়ী নামক স্থানে ভারতে প্রথম আধুনিক ধরনের কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। কিন্তু নিকটবর্তী অঞ্চলে যথেষ্ট তুলা না পাওয়ায় ১৮৫১ সালের পূর্বে ভারতে কাপড়ের কলসমূহের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। ঐ সময় জলবিদ্যুতের সাহায্যে আমেদাবাদ ও বোম্বাই শহরে কাপড়ের কল স্থাপিত হওয়ার পর ইহার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এদেশের কার্পাস-শিল্প প্রভূত উন্নতি সাধন করে। ১৯২৭ সালে সংরক্ষণ-শুল্ক বসাইবার পর এই শিল্পের দ্রুত প্রসার হয়। বর্তমানে কার্পাস-বয়ন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প। প্রায় ৮·৩ লক্ষ লোক এই শিল্পে নিযুক্ত আছে। ভারত কার্পাস-বস্ত্র উৎপাদনে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান এবং রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

এখানে কাপড়ের কলে ও তাঁতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। কাপড়ের কলগুলি তিন প্রকারের হইয়া থাকে: সূতা-কল (Spinning Mills), বয়ন-কল (Weaving Mills), সূতা ও বয়ন-কল (Composite Mills)। তাঁতগুলি মিলের সূতা বা হাতে-কাটা সূতা ব্যবহার করে। লোকসংখ্যা বেশী হওয়ায় ভারতে বস্ত্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রচুর; নিকটবর্তী দেশসমূহে এখনও এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় রপ্তানি-বাণিজ্যে ভারত আরও উন্নতি লাভ করিতে পারে। কাঁচা তুলা, শক্তিসম্পদ এবং শ্রমিকের কোন অভাব এদেশে নাই। সুতরাং এই শিল্পকে সঠিক পথে চালিত করিলে ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অবশ্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলা মিশর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ হইতে এখনও কিছু পরিমাণে আমদানি করিতে হয়। ভারতে আধুনিক কাপড়ের কলে বস্ত্র-উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও, হস্তচালিত তাঁতশিল্প এখনও এই দেশের কার্পাসবয়ন শিল্পে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

ভারতের কার্পাসবয়ন শিল্পে বর্তমানে কয়েকটি সমস্যা বিদ্যমান থাকায় বৈদেশিক বাজারে জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই দেশ দাঁড়াইতে

পারিতেছে না। প্রথমতঃ, এই দেশের তুলার অধিকাংশ মাঝারি ও ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা। ইহার ফলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার জন্য দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয় এবং এই আমদানীকৃত তুলার মূল্য অধিক হওয়ায় উৎপাদন-খরচ বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, বহু কারখানায় এখনও পুরাতন যন্ত্রপাতি থাকায় উৎপাদন-খরচ বৃদ্ধি পায়। স্বয়ংচালিত যন্ত্রপাতি বসাইয়া শ্রমিকের খরচ বাঁচানো প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, শ্রমিক ও মালিকের সহিত শিল্প-বিরোধ থাকিবার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। চতুর্থতঃ, সুলভ যন্ত্রপাতি ও জলবিদ্যুতের অভাবে শক্তিচালিত তাঁতশিল্প (Power-looms) আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য দেশে জলসেচের সাহায্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলা-উৎপাদনের বন্দোবস্ত করিতেছেন, সমবায়ের মাধ্যমে শক্তিচালিত তাঁতশিল্পের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন এবং সরকার শিল্পবিরোধ মিটাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে বাৎসরিক প্রায় ২০ কোটি টাকা মূল্যের কার্পাসবয়ন যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্তমানে এই দেশে প্রায় ৯ কোটি টাকা মূল্যের বয়ন-যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হয়।

কার্পাস-বস্ত্র উৎপাদনে তুলার ব্যবহার (সহস্র গাঁট)*

	ভারতীয়	আমদানীকৃত	মোট
১৯৫০	২,৪২১	১,০৭১	৩,৪৯২
১৯৫২	৩,২৩৪	১,০২৫	৪,২৫৯
১৯৫৬	৪,৩৭২	৬২৯	৪,৯৯১
১৯৫৮	৪,৪৪০	৫২৪	৪,৯৬৪
১৯৬০	৪,৫১২	১,০৪৪	৫,৫৫৬
১৯৬৩	৫,১২৪	৭১০	৫,৮৩৪

হস্তচালিত ও শক্তিচালিত **তাঁতশিল্প** ভারতের কার্পাসবয়ন শিল্পে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ বস্ত্র তাঁতশিল্প হইতে আসে। সুতরাং ভারতের কার্পাসবয়ন শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে তাঁতশিল্পের উন্নতির দিকে নজর রাখিতে হইবে। প্রাচীনকালে এই তাঁতশিল্প

* ১ গাঁট—১৭৭.৮ কিলোগ্রাম।

জগতে ভারতের সুনাম অর্জন করিয়াছিল। সেইজন্য স্বাধীনতার পর পরিকল্পনা কমিশন ইহার উন্নতির জন্য নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কৃষকের আয়ের দ্বিতীয় পন্থা হিসাবে তাঁতশিল্পের প্রসার হইলে শুধু যে কৃষকই উপকৃত হইবে তাহা নহে, তাঁতশিল্পে বস্ত্রের উৎপাদন-খরচও বহুলাংশে হ্রাস পাইবে। তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য সরকার লুঙ্গী, তোয়ালে, গামছা, জরি ও মুগার কাপড়, রঙ্গীন সাড়ী প্রভৃতির উৎপাদন শুধু তাঁত শিল্পের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। সমবায়ের মারফত শক্তিচালিত তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য সরকার অর্থসাহায্য করিতেছেন। ইহার ফলে এই দেশের তাঁতশিল্প ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। বিভিন্ন পরিকল্পনায় মিলজাত কাপড়ের তুলনায় তাঁতের কাপড় উৎপাদনের উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। ফলে, ১৯৫১ ৬১—এই দশ বৎসরে যেখানে মিলজাত কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৩৫ ভাগ, সেখানে তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১৫০ ভাগ। বর্তমানে তাঁতশিল্পে প্রায় ১২.৬ লক্ষ লোক কাজ করে।

১৯৬৪ সালে তাঁতবস্ত্র অনুসন্ধান কমিটি (Powerloom Enquiry Committee) তাঁতবস্ত্র শিল্পের উন্নতির জন্য কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছেন। মিলের উৎপাদন না বাড়াইয়া বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার দায়িত্ব তাঁতবস্ত্রশিল্পকে দিবার এবং রঙ্গীন সাড়ী উৎপাদনের ভার শুধুমাত্র তাঁতবস্ত্রশিল্পকে দিবার জন্য এই কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন।

তাঁত-বস্ত্র উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (কোটি মিটার)

১৯৫০-৫১	৮১	১৯৬০-৬১	২১৫
১৯৫৫-৫৬	১৬১	১৯৬৩	২৮৭
		১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	৩২০

ভারতে কার্পাসবয়ন শিল্প স্বাধীনতার পূর্বেই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার** মাধ্যমে এই শিল্পের আরও উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফলে তাঁত ও মিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, উৎপাদনের উৎকর্ষ লাভ হইয়াছে, মোট উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কার্পাস-বস্ত্র উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (কোটি মিটার)

	বস্ত্র (কোটি মিটার)	সূতা (লক্ষ মে: টন)		বস্ত্র (কোটি মিটার)	সূতা (লক্ষ মে: টন)
১৯৫০-৫১	৪২০	৫'৩৫	১৯৬৩	৭২৯	৮'৯২
১৯৫৫-৫৬	৬২৮	৭'৪৪	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	৮৫০	১০'২১
১৯৬০-৬১	৬৮৩	৭'৯৩			

কার্পাসবয়ন শিল্পের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা কমিশন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তূলার উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। জলসেচের বন্দোবস্ত করিয়া এই-জাতীয় তূলার উৎপাদন বাড়ানো হইতেছে। তাঁত-শিল্পকে আর্থিক সাহায্য দিয়া ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া ইহার উন্নতি-সাধনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। মিলের সহিত তাঁত-শিল্পের সমন্বয়-সাধনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কার্পাস-বস্ত্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও রপ্তানি-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইবে। বর্তমান ভারতে জনপ্রতি বৎসরে মাত্র ১৪.৩৩ মিটার কাপড় ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহা অত্যন্ত কম, আশা করা যায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পাইবে এবং উৎপাদনও বাড়িবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য (কোটি মিটার)

আভ্যন্তরীণ চাহিদা	৭৭২	মিলজাত বস্ত্র	৫৩০
রপ্তানি	৭৮	তাঁত বস্ত্র	৩২০
উৎপাদন	৮৫০	উৎপাদন	৮৫০
	সুতা-উৎপাদন	১০'২১ লক্ষ মে: টন	

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যসাধনের জন্য কাপড়ের মিলসমূহে ২৫,০০০ নূতন তাঁত বসানো হইবে এবং সূতা-উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য টাকুর সংখ্যা ১২৭ লক্ষ হইতে বাড়াইয়া ১৬৫ লক্ষ করা হইবে।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতে বর্তমানে প্রায় ৫৪৮টি আধুনিক ধরনের কাপড়ের কল আছে। ইহার মধ্যে মহারাষ্ট্রে ৯৯, গুজরাটে ১১২টি, মাদ্রাজে ১৪৫টি, পশ্চিমবঙ্গে ৪১টি, উত্তরপ্রদেশে ৩০টি, মধ্যপ্রদেশে ২১টি, মহীশূরে ২২টি, কেরালায় ১৫টি, অন্ধ্রে ১৭টি, রাজস্থানে ১৫টি, পাঞ্জাবে ১০টি, দিল্লীতে ৮টি, বিহারে ৩টি, উড়িষ্যায় ৬টি, পণ্ডিচেরীতে ৩টি এবং আসামে ১টি কাপড়ের

কল আছে। ইহা ছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষতঃ মাদ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩ লক্ষ তাঁতে প্রচুর তাঁত-বস্ত্র উৎপাদিত হয়। যদিও প্রথমাবস্থায় এই শিল্প বোম্বাই বন্দরের নিকটে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই শিল্প দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে।

মহারাষ্ট্র ও গুজরাট—এই দুইটি রাজ্যে প্রধানতঃ এই শিল্পের একদেশী-ভবন হইয়াছে। (৪৩৮ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য) মহারাষ্ট্র রাজ্যের **বোম্বাই** অঞ্চলে ৬২টি এবং গুজরাট রাজ্যের **আমেদাবাদে** ৭২টি কাপড়ের কল আছে। ইহা ছাড়া মহারাষ্ট্র রাজ্যের শোলাপুর, পুনা, হুবলী ও জলগাঁও অঞ্চলে ৩৭টি এবং গুজরাট রাজ্যের সুরাট, ব্রোচ ও বরোদা অঞ্চলে ৪০টি কাপড়ের কল আছে। এই অঞ্চলের মিলসমূহে প্রায় ৪·৫ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। বিভিন্ন কারণে এই অঞ্চলের কার্পাসবয়ন-শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। যথা—(ক) কৃষ্ণমৃত্তিকার জন্য এই অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী তূলা-উৎপাদন হয়। (খ) এখানকার আর্দ্র জলবায়ু সূক্ষ্ম সূতা-উৎপাদনের সহায়ক। (গ) জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের সুবন্দোবস্ত থাকায় এই সকল কাপড়ের কলে সুলভে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। (ঘ) স্থানীয় শ্রমিক এবং দাক্ষিণাত্য ও রাজস্থানের সুলভ শ্রমিক এই শিল্পে নিয়োজিত হয়। (ঙ) বোম্বাই ও আমেদাবাদের পার্শী ও ভাটিয়া ধনিক গোষ্ঠী এই শিল্পের মূলধন যোগাইয়াছে এবং স্থানীয় ব্যাঙ্কসমূহ হইতে এই শিল্পের জন্য প্রচুর ঋণ পাওয়া যায়। (চ) বোম্বাই বন্দরের মারফত তূলা ও যন্ত্রপাতি আমদানি করা ও বস্ত্রাদি রপ্তানি করা সহজ। (ছ) এই অঞ্চলে রেলপথের সুবন্দোবস্ত থাকায় তূলা আনিবার ও বস্ত্রাদি পাঠাইবার কোন অসুবিধা হয় না। পূর্ব-মহারাষ্ট্রে অবস্থিত নাগপুর ও আকোলা শহরেও বহু কাপড়ের কল আছে; তূলা-অঞ্চলের মধ্যে এই স্থানগুলি অবস্থিত এবং এখানে প্রচুর সুলভ হরিজন শ্রমিক পাওয়া যায়; কয়লাখনিও ইহার নিকটেই অবস্থিত।

মাদ্রাজ—এই রাজ্যে আধুনিক কাপড়ের কল ও তাঁতশিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা-অঞ্চলের তূলা, জলবিদ্যুৎ-শক্তির উন্নতি, আর্দ্র জলবায়ু, সুলভ শ্রমিক, রাস্তা ও রেলপথের প্রসার এই রাজ্যের কার্পাস-শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে। এখানকার অধিকাংশ মিলে শুধু সূতা প্রস্তুত হয় এবং এই সূতার বেশীর ভাগ তাঁত-শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এখানকার তাঁত-শিল্পের উন্নতিতে সূতা-কলগুলি যথেষ্ট সহায়তা

করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহে তাঁত শিল্পে প্রায় ৭ লক্ষ লোক এবং মিলসমূহের প্রায় ১'০৩ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। মাদ্রাজ রাজ্যে বর্তমানে ১৪৫টি কাপড়ের কল আছে। **কোয়েম্বাটুর** এই রাজ্যের বৃহত্তম কার্পাস-শিল্পকেন্দ্র। পাইকারা জলবিদ্যুতের সাহায্যে এই শহরের মিলগুলি চালিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ—সর্বপ্রথম কাপড়ের কল এই রাজ্যে স্থাপিত হইলেও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বস্ত্র-উৎপাদনে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। তূলা একটি ওজন-হ্রাসপ্রাপ্ত খাঁটি কাঁচামাল বলিয়া কাঁচামালের প্রাপ্তিস্থান হইতে বহুদূরে বাজারের নিকট পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার অধিকাংশ মিল হুগলী নদীর তীরে কলিকাতার নিকটবর্তী হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা জেলায় অবস্থিত। বর্তমানে আসানসোল শিল্পাঞ্চলেও কয়েকটি কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে মোটেই তূলা উৎপন্ন হয় না; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কয়েকটি কারণে এই রাজ্যে আধুনিক কার্পাসবয়ন-শিল্পের ও তাঁত-শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাঁত-শিল্পে মাদ্রাজের পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। প্রথমতঃ, কলিকাতা বন্দরের মারফত তূলা-আমদানি ও বস্ত্র-রপ্তানি সহজসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, নিকটবর্তী রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লার সাহায্যে এখানে শিল্পস্থাপন করা সহজ। তৃতীয়তঃ, পূর্ব-ভারতের ঘনবসতি-পূর্ণ অঞ্চলের বস্ত্রের বিরাট চাহিদা মিটানো এই রাজ্যের পক্ষে সহজ; কারণ পূর্ব-ভারতে বস্ত্র প্রেরণ করিতে বোম্বাই অঞ্চল অপেক্ষা এখানকার রেলভাড়া কম লাগে। ইহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্রের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। স্থানীয় মিলসমূহ এই চাহিদা মিটাইতে না পারায় বোম্বাই অঞ্চল হইতেও এখানে বস্ত্রাদি আমদানি করিতে হয়। চতুর্থতঃ, এই রাজ্যের পরিবহণ-ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। পঞ্চমতঃ, পশ্চিমবঙ্গে এবং ইহার নিকটবর্তী বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য হইতে সুলভ শ্রমিক পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র অন্তরায় তূলার অভাব। তূলা-সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকিলে এই রাজ্যের পক্ষে কার্পাসবয়ন শিল্পে উন্নতি লাভ করা সহজ। বর্তমানে এই রাজ্যে ৪১টি কাপড়ের কল আছে। এই রাজ্যের মিলসমূহে প্রায় ৪৬ হাজার শ্রমিক কাজ করে।

উত্তরপ্রদেশে কানপুর কার্পাস-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। কয়লাখনি কিছুটা দূরে থাকিলেও পাঞ্জাবের তূলা, স্থানীয় সুলভ শ্রমিক, রেলপথের

সুবন্দোবস্ত, স্থানীয় বাজারের প্রচুর চাহিদা এই শিল্পের উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। কানপুরে ১০টি কাপড়ের কল আছে।

মধ্যপ্রদেশ—গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ভূপাল প্রভৃতি স্থানে অধিকাংশ কাপড়ের কল অবস্থিত। মহীশূর, কেরালা, অন্ধ্র, পাঞ্জাব ও দিল্লী অঞ্চলেও কার্পাস-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

বাণিজ্য—বস্ত্র-রপ্তানিতে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। গত মহাযুদ্ধের সময় এই দেশ বস্ত্র-রপ্তানিতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। কারণ, সেই সময় জাপান ও জার্মানীর রপ্তানি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বর্তমানে রপ্তানি-বাণিজ্যে জাপানের পরেই ভারতের স্থান। প্রায় ৮২ হাজার টন কাপড় বর্তমানে বৃটেন, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সিংহল, আফগানিস্তান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়। রপ্তানি-বাণিজ্যে ভারতকে জাপান, চীন, হংকং, পাকিস্তান, পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। সুতরাং উৎপাদন-খরচ না কমাইলে ভারতের পক্ষে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করা কষ্টকর। এইজন্য অনেক মিলের পুরাতন যন্ত্রপাতি পাল্টাইয়া নূতন যন্ত্রপাতি বসানো প্রয়োজন। কলিকাতার নিকট 'টেক্সম্যাকো'-তে এখন বস্ত্রশিল্পের আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইতেছে। ১৯৬৩ সালে ভারতে প্রায় ১৮'৫ কোটি টাকা মূল্যের বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইয়াছে; তবুও এখন প্রায় ২৩'৭ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় স্বয়ংক্রিয় বয়ন-যন্ত্রপাতির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইবে। সুতরাং আশা করা যায়, ভারত কার্পাস-বস্ত্রের রপ্তানি-বাণিজ্যে আরও উন্নতি লাভ করিবে। বর্তমানে এই দেশ বস্ত্র ও সূতা দুই-ই রপ্তানি করে। পৃথিবীর নিম্নলিখিত পাঁচটি দেশ বর্তমানে মোট কার্পাস-বস্ত্র রপ্তানির শতকরা ৮০ ভাগ সরবরাহ করে। ইহাদের সঙ্গে ভারতের তুলনামূলক অবস্থা এখানে দেখানো হইল :

কার্পাস-বস্ত্র রপ্তানির গতি (সহস্র টন)

	১৯৫৭	১৯৫৮	১৯৫৯	১৯৬৩
জাপান	১৪৭	১২৮	১২৮	১৫০
ভারত	১০০	৬৯	৭২	৮২
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৬৯	৬৩	৫৯	৫৫
বৃটেন	৫৭	৪৮	৪২	৪১
ফ্রান্স	৩৩	৩৩	৪২	৫৩

এই পরিসংখ্যান হইতে দেখা যাইতেছে যে, জাপানের সঙ্গে ভারত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। সেইজন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। উৎপাদন-খরচ এবং বস্ত্রের উৎকর্ষ-বৃদ্ধির দ্বারাই জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব। সেইজন্য কাপড়ের মিলসমূহের যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণ করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এখনও বহু মিল আছে যাহাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় নহে, ইহাদের উৎপাদন-খরচ অত্যন্ত বেশী। কার্পাসবয়ন শিল্পের উন্নতির জন্য 'জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন' (National Industrial Development Corporation) মিলসমূহকে আর্থিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করিতেছে।

ইহা ছাড়া, ভারত সরকার কার্পাস-বস্ত্রের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কার্পাস-বস্ত্র রপ্তানি-উন্নয়ন সংঘ (Cotton Textile Export Promotion Council বা Texprocil) নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। ইহার ফলে রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

পাটশিল্প (The Jute Industry)

পাট-শিল্প ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প। অর্থপ্রসূ শিল্প হিসাবে ভারতে ইহার স্থান অদ্বিতীয়। বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জনেও এই শিল্প অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। প্রাচীনকালে কুটীরশিল্পে টাকুর সাহায্যে পাটের সুতা কাটা হইত এবং দড়ি, থলে প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। আধুনিক পাট-শিল্প প্রতিষ্ঠার পূর্বেও এই দেশ হইতে বৃটেন, ফ্রান্স, ব্রহ্মদেশ, উত্তর আমেরিকা, জার্মানী ও জাভা প্রভৃতি দেশে পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হইত। ১৮৫০-৫১ সালে মোট ৪৪ লক্ষ টাকার থলে, চট প্রভৃতি এই সকল দেশে রপ্তানি হইয়াছিল। বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব হইতেই ইংরেজগণ পাটের সাহায্যে একটি ব্যবসায় গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় ছিল। এই বিষয়ে তাহারা শীঘ্রই সাফল্য লাভ করে। ১৮৩২ সালের পর ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডি শহরে পাট পাঠাইয়া গবেষণা দ্বারা আবিষ্কার করিল যে, শণের পরিবর্তে সুলভ পাট ব্যবহার করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডাণ্ডিতে পাট-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইল। কয়েক বৎসর পরে ইংরেজ ব্যবসায়িগণ বুঝিতে পারিল যে, কাঁচা-

পাট ভারত হইতে বহুদূরে ডাণ্ডিতে না লইয়া, ভারতেই পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রপ্তানি করিলে অধিক লাভ হইবে। কারণ পাটজাত দ্রব্যের ওজন কাঁচা-পাট অপেক্ষা কম। সেইজন্য ১৮৫৫ সালে একজন বৃটিশ জর্জ অক্‌ল্যাণ্ড, বিশ্বম্ভর সেন (Bysumber Sen) নামক জনৈক বাঙালী ব্যবসায়ীর সহায়তায় রিষড়াতে ভারতের সর্বপ্রথম পাটকল স্থাপন করে। ইহার পরে বরানগরে বিদ্যুৎ-চালিত পাটকল স্থাপিত হয়। এই ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক প্রতিপন্ন হওয়ায় বৃটিশ বণিকগণ কলিকাতার নিকট হুগলী নদীর উভয় তীরে বহু পাটকল স্থাপন করে।

উৎপাদক অঞ্চল—বর্তমানে ভারতে ১১৯টি পাটকল আছে। তন্মধ্যে ১০২টি পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। ইহা ছাড়া, অন্ধ্রে ৪টি, বিহারে ৩টি, উত্তরপ্রদেশে ৩টি এবং মধ্যপ্রদেশে ১টি পাটকল অবস্থিত।

কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলেই পাট-শিল্পের **একদেশীভবন** (Localisation) হইয়াছে। বিভিন্ন কারণে ইহা সম্ভব হইয়াছে। যথা—(ক) পূর্ববঙ্গ হইতে কাঁচা-পাট আনিয়া কলিকাতায় পাটশিল্প আরম্ভ হয়। পূর্ববঙ্গ এবং আসামের কাঁচা-পাট সহজেই অল্পখরচে জলপথে কলিকাতায় আনা যায়। পশ্চিমবঙ্গের কাঁচা-পাটও সহজে রেলপথ ও জলপথে কলিকাতায় আনিবার সুবন্দোবস্ত আছে। (খ) অধিকাংশ পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। নিকটবর্তী কলিকাতা বন্দর মারফত পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি এবং যন্ত্রপাতি আমদানি সহজসাধ্য

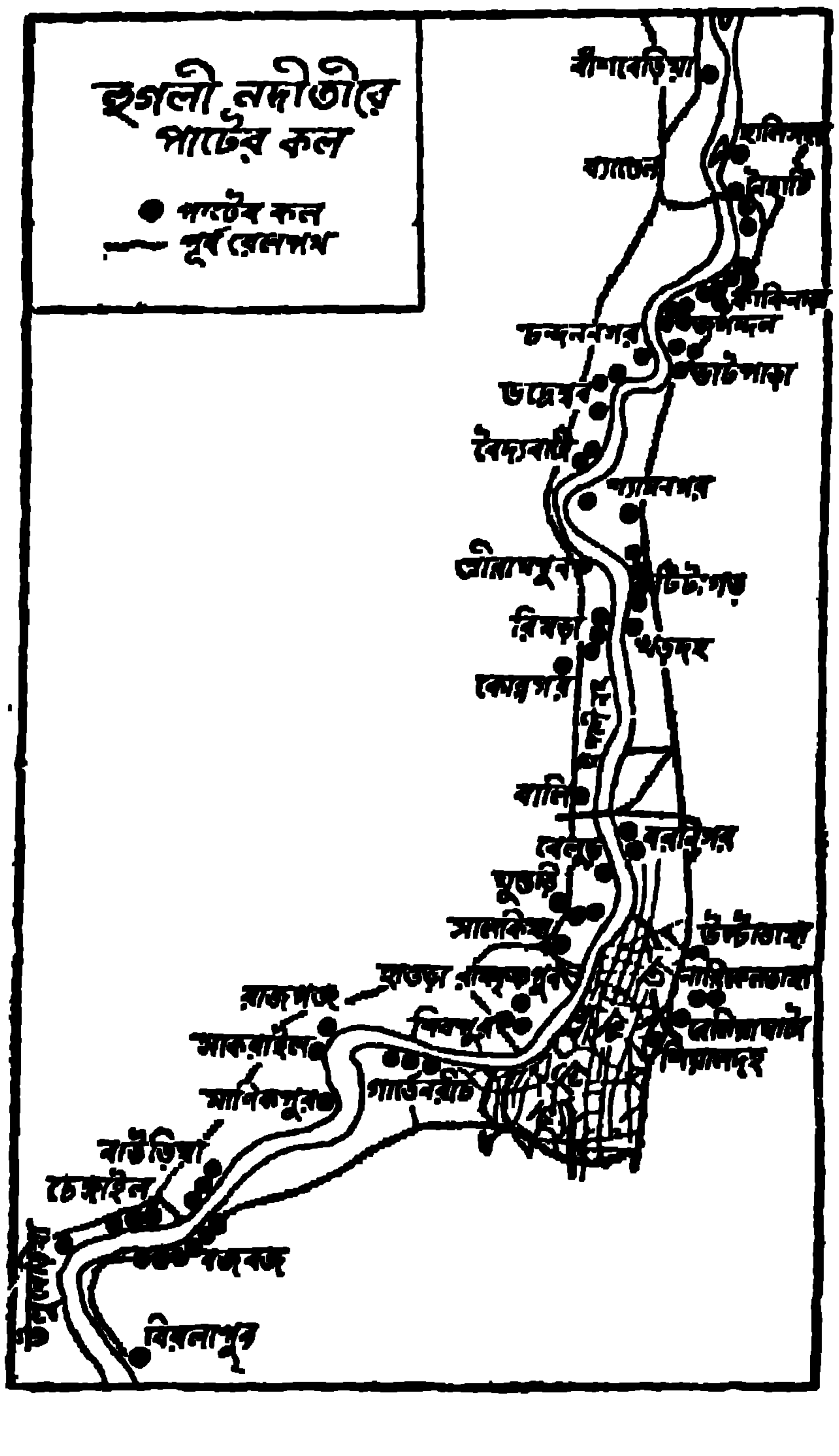

হইয়াছে। (গ) এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা সহজেই রেলপথে ও জল-

পথে রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া হইতে আনা যায়। (ঘ) পশ্চিমবঙ্গ ও ইহার নিকটবর্তী বিহার ও উড়িষ্যায় প্রচুর সুলভ শ্রমিক পাওয়া যায়। ইহারা পাটকলের কাজে অভ্যস্ত ও সুনিপুণ। (ঙ) পাট-শিল্পের প্রথমাবস্থায় কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল বলিয়া বহু ইংরেজ বণিক এখানে বাস করিত এবং তাহারা কলিকাতার নিকট নানাবিধ শিল্প-স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিল। স্থানীয় ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের ঋণ লইবার কোন অসুবিধা হইত না। এই সকল কারণে হুগলী নদীর উভয় তীরে, উত্তরে বাঁশবেড়িয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে বিড়লাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় (প্রধানতঃ নৈহাটী, কাঁকিনাড়া, শ্যামনগর, টিটাগড়, আগড়পাড়া, বজবজ, বাউড়িয়া, শিবপুর, শালকিয়া, রিষড়া, শ্রীরামপুর, কোন্নগর প্রভৃতি স্থানে) বহু পাটকল স্থাপিত হইয়াছে।

অন্ধ্রের ৪টি পাটকলের মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে একটি বিশাখাপতনম্ জেলার চিতাভাল্সা নামক স্থানে এবং অপরটি ঐ জেলার নেলিমারলায় অবস্থিত। **উত্তরপ্রদেশের** কানপুরে দুইটি এবং সাজা-ওয়া নামক স্থানে একটি পাটকল আছে। (৪৪০ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য।)

পাট-শিল্পের সমস্যা—স্বাধীনতা পাইবার পূর্বে এই দেশের পাট-শিল্পের বিশেষ কোন সমস্যা ছিল না। ১৯৪৭ সালে বঙ্গ-বিভাগের পর এই শিল্প নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। যথা—(১) বঙ্গ বিভাগের সময় শতকরা ৭৩ ভাগ পাট পূর্ববঙ্গে উৎপন্ন হইত; অথচ পাটকলগুলি সবই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। ইহা ছাড়া উৎকৃষ্ট পাট শুধু পূর্ববঙ্গেই পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতের পাট-শিল্প পূর্ব পাকিস্তানের পাট-সরবরাহের উপর নির্ভরশীল হইল। পাকিস্তান সরকারের নূতন করপ্রথা, স্টার্লিং মুদ্রার মূল্যমান-হ্রাস প্রভৃতি কারণে পূর্ববঙ্গ হইতে পাট আমদানি ব্যাহত হয়। সেইজন্য **কাঁচা-পাটের অভাবে** ১৯৪৯ সালে এখানকার পাটকলগুলি কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল (২) পূর্ব পাকিস্তানে এখন আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাটকল স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৬৪ সালে এই দেশে ৩৩০,৯৬২ মেঃ টন পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে উৎকৃষ্ট পাট দ্বারা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কম খরচায় পাটজাত দ্রব্য তৈয়ার হইতেছে। সুতরাং বৈদেশিক বাজারে ভারতকে **পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়** অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। (৩) স্থানীয় পাটের দাম বেশী বলিয়া

উৎপাদন-খরচ বাড়িয়া যায়। (৪) এখানকার বহু **যন্ত্রপাতি এখনও পুরাতন** ধরনের। (৫) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বর্তমানে পাটজাত দ্রব্যের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা নিরাপদ মনে করে না। সেইজন্য চীন ও রাশিয়ায় পাট-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। চীনে বর্তমানে ৪'২ লক্ষ টন পাট উৎপন্ন হয়। সেখানে পাট-শিল্পেরও উন্নতি হইয়াছে। ইহা ছাড়া পাকিস্তানের পাটের সাহায্যে পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, মিশর, ব্রেজিল, ফিলিপাইন, ব্রহ্মদেশ, ইরান ও থাইল্যাণ্ডে নূতন পাটকল স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন দেশ পাটের **প্রতিযোগী সামগ্রী** ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। রাশিয়া ও আর্জেন্টিনার 'তিসির বাকল', কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার কাপড় ও কাগজের থলে, জাভার 'রোজেলা', মাঞ্চুরিয়ার 'কেনাফ', ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের 'ম্যানিলা হেম্প', ইন্দোচীনের 'পলম্পন' বর্তমানে পাটের থলের প্রতিযোগী সামগ্রী। কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া কোনরকম থলে ব্যবহার না করিয়াই জাহাজে করিয়া গম রপ্তানি করিতেছে।

ভারতে পাট-শিল্পের এই সকল **সমস্যার সমাধানের** জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে। প্রথমতঃ, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাটের **উৎপাদন বৃদ্ধি** করা হইতেছে। পাটের উৎপাদন ১৯৪৭-৪৮ সালে ১৬ লক্ষ গাঁট হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৩-৬৪ সালে ৬০ লক্ষ গাঁটে দাঁড়ায়। ইহা ছাড়া প্রায় ১৮ লক্ষ গাঁট মেস্তা উৎপন্ন হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় পাট ও মেস্তা উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে যথাক্রমে ৬২ লক্ষ ও ১৩ লক্ষ গাঁট। সুতরাং উৎকৃষ্ট পাট ভিন্ন অন্যান্য পাটের জন্য ভারতকে পূর্ব পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, পাটশিল্পের পুরাতন যন্ত্রপাতি পাল্টাইয়া **নূতন যন্ত্রপাতি-স্থাপনের** বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। বর্তমানে অধিকাংশ পাটকলে ইহা করা হইয়াছে। ইহার ফলে পাটজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্যের সমতা রক্ষা করা যাইবে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না। দেশের মধ্যে এই সকল যন্ত্রপাতি-উৎপাদনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, বিশেষ প্রচারকার্য দ্বারা পাটজাত দ্রব্যের **চাহিদা বৃদ্ধি** করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে পাটের যে সকল প্রতিযোগী সামগ্রী বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার মূল্য পাটজাত দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। এমনকি বস্তাবন্দী না করিয়া জাহাজে

গম পাঠাইবার খরচও পাটের থলের খরচের চেয়ে অনেক বেশী। কারণ, থলে ব্যবহার না করিবার জন্য যে পরিমাণ গম জাহাজের তলায় পচিয়া যায় তাহার মূল্য থলের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহা ছাড়া পাটের থলে অনেকবার ব্যবহার করা যায়। অবশ্য এই সকল প্রতিযোগী সামগ্রীর জন্য পাটের চাহিদা কিছুটা কমিবেই। সেইজন্য এখন ভারতে বিভিন্ন গবেষণা-কার্য দ্বারা পাটের নূতন নূতন ব্যবহার আবিষ্কৃত হইতেছে। সুন্দর কার্পেট এবং কাপড়-জামা পাট হইতে প্রস্তুত হইতেছে। এইরূপ চলিতে থাকিলে পাট-শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আনন্দের বিষয় ১৯৬৪ সালে পাট-শিল্প উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে। উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কাঁচামালের যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্তমানে বিভিন্ন **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার** মাধ্যমে পাট-শিল্পের উন্নতির বন্দোবস্ত হইতেছে। পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিয়া মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায় বলিয়া ইহার রপ্তানি-বৃদ্ধির উপর দেশের সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনের ও রপ্তানির লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল যথাক্রমে ১১ লক্ষ টন ও ৯ লক্ষ টন; ইহা বহুলাংশে সাফল্য লাভ করিয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে ১৩ লক্ষ মেঃ টন। ১৯৬৪ সালে ভারতে ১২'৭০ লক্ষ মেঃ টন পাটজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়। পাকিস্তানেও এই সময় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৩'৩০ লক্ষ মেঃ টনে দাঁড়ায়। পাটের অভাবে এবং বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতার দরুন তৃতীয় পরিকল্পনায় পাটজাত সামগ্রী উৎপাদন-বৃদ্ধির দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাই। কিন্তু পাট উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইবার জন্য এই পরিকল্পনায় চেষ্টা করা হইবে। পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্তানির উন্নতিসাধনও এই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য।

বাণিজ্য—পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্তানিতে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৬৪ সালে এই দেশ হইতে প্রায় ৯'৩ লক্ষ মেঃ টন পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়। ইহার মূল্য প্রায় ১৭০ কোটি টাকা। ভারতের মোট রপ্তানি-মূল্যের শতকরা ২১ ভাগ পাটজাত দ্রব্য। পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিয়া মোট রপ্তানি-মূল্যের এক-পঞ্চমাংশ পাওয়া যায়। এই দেশে উৎপন্ন অধিকাংশ (৭৪%) পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

এইজন্য আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর পাট-শিল্প বহুলাংশে নির্ভরশীল। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পাট আমদানি করিয়া বিভিন্ন দেশে পাট-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স ও ব্রেজিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখন এই সকল দেশে ভারতের পক্ষে পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করা কঠিন। ইহা ছাড়া পাকিস্তানের সুলভ পাটজাত সামগ্রীর সঙ্গে ভারত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। পাকিস্তানের উৎপাদনের পরিমাণ কম বলিয়া এখনও ভারতের রপ্তানি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। পাটের পরিবর্ত-সামগ্রীও ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যকে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে (৪৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কাঁচা পাটের অভাব পাট শিল্পের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এখনও অন্তত: ১০ লক্ষ গাঁট কাঁচা পাট আমদানি করিতে পারিলে, পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি আরও বাড়ানো যায়। এই সকল **সমস্যার** সমাধান করিতে হইলে পাট-শিল্পকে পুনর্গঠিত করিয়া ইহার উৎপাদন-খরচ কমাইতে হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পাটজাত সামগ্রীর শ্রেষ্ঠ আমদানিকারক; মোট উৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ পাটজাত দ্রব্য এই দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে; ইহার পরেই বৃটেনের স্থান। ভারতের মোট রপ্তানির শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ পাটজাত দ্রব্য বৃটেনে রপ্তানি হয়। আর্জেন্টিনা আমদানি করে মোট রপ্তানির শতকরা ১০ ভাগ। ইহা ছাড়া মিশর এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশ, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে প্রচুর পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হইয়া থাকে।

কাগজ-শিল্প (The Paper Industry)

প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে হাতে কাগজ প্রস্তুত হইত। ১৭১৬ সালে ডা: উইলিয়াম কেরী নামক জনৈক ইংরেজ তাঞ্জোরের অন্তর্গত ট্রাঙ্কুবর নামক স্থানে সর্বপ্রথম কাগজের কল স্থাপন করে। এই কলটি বেশীদিন চলে নাই। ইহার পর ১৮৬৭ সালে হাওড়া জেলার বালি নামক স্থানে 'রয়্যাল পেপার মিল' নামে একটি আধুনিক ধরনের কাগজের কল স্থাপিত হয়। এই কলে বাদামী রঙের ডিমাই কাগজ প্রথমত: প্রস্তুত হইত। সেইজন্য এখনও যে-কোনও মিলের বাদামী রঙের ডিমাই কাগজ বাজারে 'বালির কাগজ' বলিয়া পরিচিত। কাগজ-শিল্পের উপযোগী উপাদান ভারতে

বিদ্যমান থাকায় ইহার পর হইতে এই দেশ ক্রমশঃ এই শিল্পে উন্নতি লাভ করিতেছে।

সমস্যা—বর্তমানে ভারতের কাগজ-শিল্প নানাবিধ সমস্যার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইতেছে। এই দেশে কাগজের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলেও উৎপাদন সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে না। কাগজ-শিল্পের সমস্যাসমূহের মধ্যে কাঁচামাল ও রাসায়নিক দ্রব্যের সমস্যাই প্রধান। এই শিল্পের জন্য প্রয়োজন বাঁশ, সাবাই ঘাস, সরলবর্গীয় বৃক্ষের কাষ্ঠমণ্ড প্রভৃতি **কাঁচামাল**। ইহা ছাড়া ভারতে শণ, পাট, তুলা, পুরাতন কাগজ, ইক্ষুর ছোবড়া, ছেঁড়া কাপড় প্রভৃতি দ্বারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ প্রস্তুত হয়। সরলবর্গীয় স্প্রুস্, পাইন ও ফার প্রভৃতি গাছ হিমালয় অঞ্চলে জন্মিলেও যানবাহনের অভাবে ইহার সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। ফলে কানাডা, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে কাষ্ঠমণ্ড আমদানি করিতে হয়। ভারতে বাঁশ ও সাবাই ঘাসের সাহায্যে অধিকাংশ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই দুইটি প্রধান কাঁচামাল সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে এই দেশের কাগজের উৎপাদন ব্যাহত হয়। বাঁশের সাহায্যে ভারতের শতকরা ৭০ ভাগ কাগজ উৎপন্ন হইলেও বাঁশবনের সংরক্ষণ ও **বাঁশ** উৎপাদনের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট সরকারী নীতি প্রচলিত নাই। উত্তর ভারতে বিশেষতঃ উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে প্রচুর **সাবাই ঘাস** উৎপন্ন হয়। ইহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিলে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর। বাঁশ উৎপাদনের সুবিধা এই যে প্রতি ৪ বৎসর অন্তর ইহা কাটিয়া কাগজ-শিল্পে নিয়োজিত করা যায়। কিন্তু সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মাইতে সময় লাগে অন্ততঃ ৬০ বৎসর। সুতরাং এই দেশে বাঁশ ও সাবাই ঘাস উপযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে এই শিল্পের আরও উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর। এইজন্য পরিকল্পনা কমিশন কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পন্থা গ্রহণের সুপারিস করিয়াছেন। যথা, (ক) কাগজ-শিল্পের জন্য কয়েকটি বন নির্দিষ্ট থাকিবে; (খ) বাঁশ ও সাবাই ঘাসের একটি সর্ব-ভারতীয় মূল্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে; (গ) বনভূমি অঞ্চলে যানবাহন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। এই সকল পন্থা অবলম্বিত হইলে আশা করা যায়, কাগজ-শিল্পে কাঁচামালের অভাব দূর হইবে। সুখের কথা, দেরাদুনে ভারতের বন-গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Forest Research Institute) কাগজ প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন রকমের কাঁচামালের সন্ধানে

গবেষণা চালাইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ইক্ষুর ছোবড়া (Bagasse) হইতে কাগজ উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে; চিনি ও গুড় উৎপাদনের জন্য অন্যপ্রকার জ্বালানির বন্দোবস্ত করিয়া ইক্ষুর ছোবড়া যাহাতে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব কাগজ-শিল্পের অন্যতম সমস্যা। কস্টিক সোডা, ব্লিচিং-পাউডার, সোডা অ্যাশ, ক্লোরিন, গন্ধক, সোডিয়াম সাল্‌ফেট অ্যালুমিনিয়াম সাল্‌ফেট প্রভৃতি **রাসায়নিক দ্রব্য** এই শিল্পের জন্য প্রয়োজন। এই সকল দ্রব্যের উৎপাদনে ভারত এখনও স্বাবলম্বী না হওয়ায় বিদেশ হইতে উচ্চমূল্যে ইহা আমদানি করিয়া কাগজ-শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলে কাগজের উৎপাদন-খরচ বাড়িয়া যায়। রাসায়নিক দ্রব্যের সরবরাহের অনিশ্চয়তার দরুন কাগজ-শিল্প অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাগজ-শিল্পের অন্যতম সমস্যা **শক্তিসম্পদের** কেন্দ্রীভবন। ভারতের অধিকাংশ কয়লাখনি দেশের পূর্বাংশে অবস্থিত হওয়ায় উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতে কয়লা আনিবার জন্য অনেক বেশী রেলভাড়া দিতে হয়; ইহাতেও উৎপাদন-খরচ বৃদ্ধি পায়।

কাগজের শ্রেণীবিভাগ—ভারতে বিভিন্ন রকমের কাগজ প্রস্তুত হয়; লিখিবার ও ছাপিবার সাদা কাগজ (White printing), শক্ত মলাটের কাগজ (Paper Board), প্যাকিং করিবার কাগজ (Kraft paper), দলিলের কাগজ (Bond paper), সিগারেটের কাগজ (Cigarette paper), টিস্যু কাগজ (Tissue paper), সংবাদপত্রের কাগজ (News-print) ইত্যাদি। বিভিন্ন রকম কাগজ-প্রস্তুতের জন্য নানারকমের কাগজের কল আছে। যথা, সাধারণ কাগজের কল, কার্ডবোর্ড ও স্ট্রবোর্ডের কল, সংবাদপত্রের কাগজের কল ইত্যাদি।

বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজ উৎপাদন (১৯৬৩)

(সহস্র মেঃ টন)

লিখিবার ও ছাপিবার সাদা কাগজ	৩২৬	বিশেষ ধরনের কাগজ (নিউজপ্রিন্ট, সিগারেট, টিস্যু ইত্যাদি)	১১
শক্ত মলাটের কাগজ	৬৬		
প্যাকিং কাগজ	৫৭	মোট	৪৬০

উৎপাদক অঞ্চল—১৯৬৩ সালে ভারতে ২৬টি কাগজের কল ছিল। ইহা ছাড়া ২০টি কারখানায় কার্ডবোর্ড প্রস্তুত হয়। কাগজ-কলগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৬টি, মহারাষ্ট্রে ৪টি, উত্তরপ্রদেশে ২টি, অন্ধ্রে ৩টি, উড়িষ্যায় ২টি,

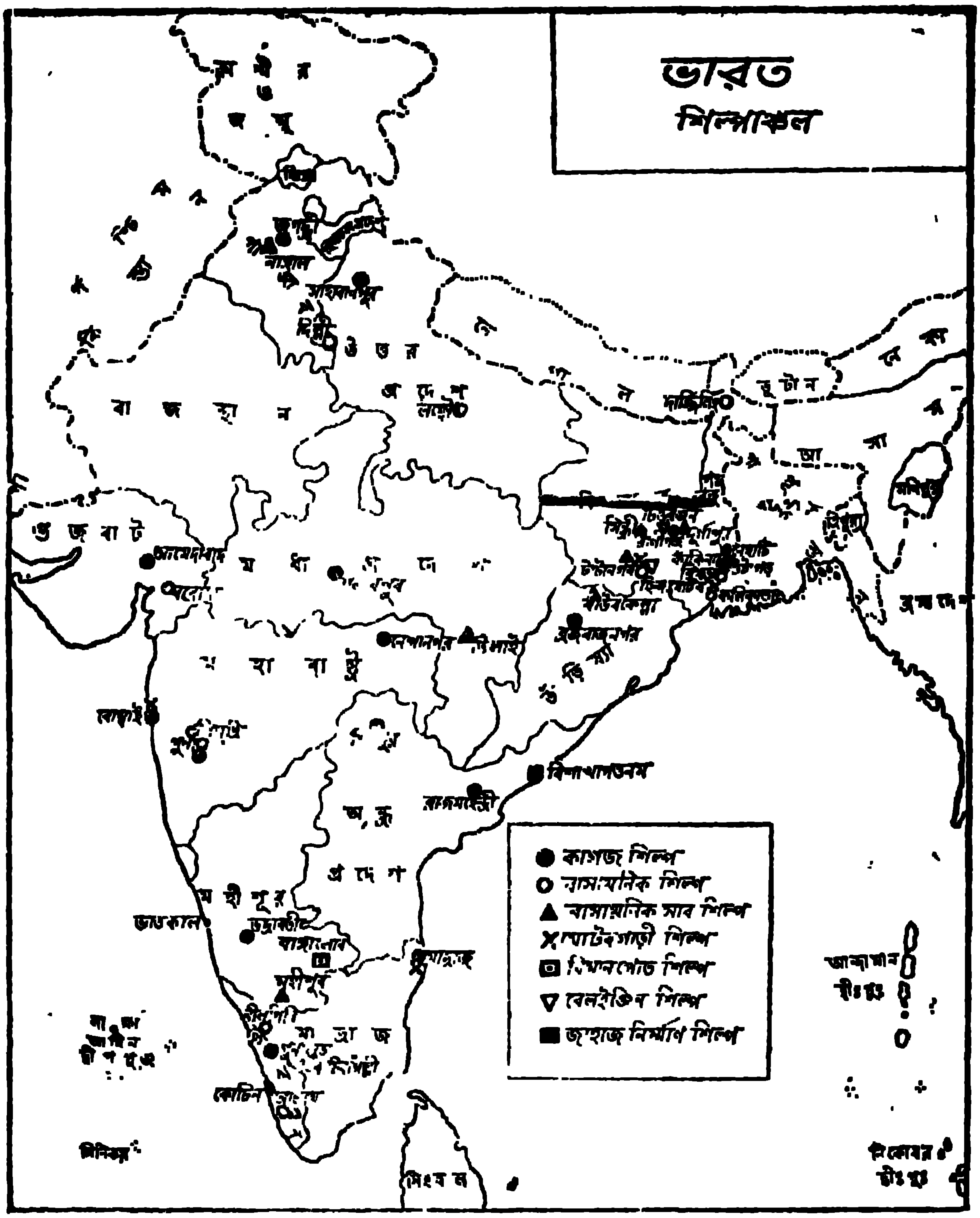

পাঞ্জাবে ২টি, মহীশূরে ৩টি, কেরালা, গুজরাট, ও মধ্যপ্রদেশে একটি করিয়া কাগজের কল আছে। ইহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, আসাম ও মধ্যপ্রদেশে আরও একটি করিয়া কাগজের কল স্থাপিত হইতেছে।

বহুদিন পর্যন্ত হুগলী নদীর তীরেই এই শিল্প কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু

বর্তমানে এই শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ হইয়াছে। কিন্তু উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, এখনও **পশ্চিমবঙ্গে** সর্বাপেক্ষা বেশী কাগজের কল রহিয়াছে। টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, রাণীগঞ্জ, হালিসহর, নৈহাটি ও ত্রিবেণীতে কাগজের কলগুলি অবস্থিত। বর্তমানে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বাঁশ, মধ্যপ্রদেশের সাবাই ঘাস ও অন্যান্য জিনিস হইতে এখানে কাগজ প্রস্তুত হয়। রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লা, কলিকাতা বন্দরের মারফত আমদানীকৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি, স্থানীয় নিপুণ শ্রমিক এবং শিক্ষার প্রসারের জন্য কাগজের চাহিদা-বৃদ্ধি এই রাজ্যের কাগজ-শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতের অধিকাংশ কাগজ এখানে উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের ত্রিবেণীতে টিস্যু কাগজ উৎপাদনের একটি কারখানা আছে। **মহারাষ্ট্রের** কাগজের কলসমূহ বোম্বাই ও পুনায় অবস্থিত। আমদানীকৃত কাষ্ঠমণ্ড, ছেঁড়া কাপড় ও সুলভ জলবিদ্যুতের সাহায্যে এখানে কাগজ-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **উত্তরপ্রদেশে** লক্ষ্ণৌ ও সাহারাণপুরে কাগজের কলগুলি অবস্থিত। এই রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের ঘাস এই শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। **বিহারের** ডালমিয়ানগরের মিলটিতে সাবাই ঘাস দ্বারা প্রচুর কাগজ উৎপন্ন হয়। **পাঞ্জাবের** জগদ্ধ্রীতে নেপাল অঞ্চলের ঘাস হইতে স্থানীয় জল-বিদ্যুতের সাহায্যে কাগজ উৎপন্ন হয়। **গুজরাটের** আমেদাবাদে ছেঁড়া কাপড় হইতে অধিকাংশ কাগজ প্রস্তুত হয়। মহীশূরের ভদ্রাবতীতে, কেরালার পুনালুরে, অন্ধ্রের রাজমহেন্দ্রী ও সিরপুরে, উড়িষ্যার ব্রজরাজনগরে, মধ্যপ্রদেশের বালারপুরে এবং মাদ্রাজ শহরে কাগজের কল আছে। ১৯৬৩ সালে ভারতে কাগজের উৎপাদন হইয়াছে ৪.৬ লক্ষ মেঃ টন।

মধ্যপ্রদেশের **নেপানগরে** ১৯৫৫ সালে একটি সংবাদপত্রের কাগজ (Newsprint) উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। সরকারী আওতায় এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনের ইহাই ভারতের একমাত্র কারখানা। এখানকার কাগজ এখনও বিদেশী নিউজপ্রিন্টের সমকক্ষ হইতে পারে নাই এবং এখানকার উৎপাদন-খরচও অপেক্ষাকৃত বেশী। প্রথমে কারখানার উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল ৩০,০০০ টন; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা ধার্য হইয়াছিল ৬০,০০০ টন। তৃতীয় পরিকল্পনায় নেপা-নগরের উৎপাদন-ক্ষমতা ধার্য হইয়াছে ৭৫,০০০ টন। নিকটস্থ স্প্রুস্ গাছের কাষ্ঠমণ্ড হইতে এখানে নিউজপ্রিন্ট উৎপন্ন হয়। ১৯৬৪ সালে এই মিলে

২৮,৮৫০ মেঃ টন নিউজপ্রিন্ট উৎপন্ন হয়। হোসঙ্গাবাদে ভারত সরকার উচ্চশ্রেণীর নোটের কাগজ প্রস্তুতের জন্য 'সিকিউরিটি পেপার মিল' নামে একটি কাগজের কল প্রতিষ্ঠা করিয়া তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে এইজাতীয় ১,২০০ টন কাগজ উৎপাদন করিবে।

বাণিজ্য—ভারতে কাগজ-শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইলেও এখনও চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম। স্বাধীনতার পর হইতে এই দেশে একদিকে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্যদিকে শিক্ষা-বিস্তার ও শিল্পোন্নতির জন্য কাগজের চাহিদা অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়া চলিয়াছে।

ভারতে কাগজ উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (লক্ষ টন)

১৯৫০-৫১	১'১৪	১৯৬১-৬২	৩'৬০
১৯৫৫-৫৬	১'৮৭	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	৭'০০

উৎপাদনের এই গতি চলিতে থাকিলেও, অন্যদিকে শিক্ষার বিস্তার অভূতপূর্ব হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে কাগজের চাহিদাও বাড়িতেছে। ১৯৫১ সালে ভারতে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল মোট লোকসংখ্যার শতকরা ১৬'৬ ভাগ; ১৯৬১ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ২৩'৭ ভাগে দাঁড়াইয়াছে।

এই দেশে বর্তমানে কাগজের মোট বাৎসরিক **চাহিদা** প্রায় ৩'৯১ লক্ষ টন; অর্থাৎ জনপ্রতি ১ কিলোগ্রামের কম। অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনও ভারতের জনপ্রতি কাগজের চাহিদা অনেক কম। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাগজের চাহিদা জনপ্রতি ১৮০ কিলোগ্রাম এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে প্রায় ৯০ কিলোগ্রাম। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা-বিস্তারের বন্দোবস্ত হওয়ায় আশা করা যায় ভারতেও জনপ্রতি কাগজের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হওয়ায় এখনও কিছু পরিমাণে কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ড বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। কানাডা, নরওয়ে, রাশিয়া, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে ইহা **আমদানি** হইয়া থাকে। বর্তমানে আমদানির পরিমাণ প্রায় '৪০ লক্ষ টন। কাগজ-উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইবার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় কাগজ-উৎপাদন বাড়াইয়া ৭ লক্ষ টন এবং নিউজপ্রিন্ট ১'২ লক্ষ টন করা হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার এই লক্ষ্য

সাফল্যমণ্ডিত হইলে ভারতের পক্ষে কাগজ রপ্তানি করা সম্ভবপর হইবে। ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয়, পূর্ব আফ্রিকার দেশসমূহ ও মধ্যপ্রাচ্যে ভারতের পক্ষে কাগজ রপ্তানি করা খুবই সম্ভব। কারণ এই সকল দেশে কাগজ শিল্প বিশেষ গড়িয়া ওঠে নাই।

সিমেণ্ট-শিল্প (The Cement Industry)

বর্তমানে সিমেণ্ট একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। বাসগৃহ, শিল্প-কারখানা, রাস্তা, সেতু, বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণে সিমেণ্ট একান্ত প্রয়োজন। ভারতে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সিমেণ্টের চাহিদা অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়া চলিয়াছে। এই দেশে সিমেণ্ট-উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ১ টন সিমেণ্ট তৈয়ারী করিতে ১.৬ টন চুনাপাথর ও এঁটেল মাটি, .২ টন হইতে .৫ টন কয়লা, .০৩৫ টন জিপ্‌সাম কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতে এই সকল উপাদানের কোন অভাব নাই। সেইজন্য এই দেশে সিমেণ্ট-শিল্প ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতেছে।

১৯০৪ সালে মাদ্রাজে প্রথম সিমেণ্টের কারখানা স্থাপিত হইলেও, ইহা শেষপর্যন্ত বেশীদিন চলে নাই। দ্বিতীয় কারখানা স্থাপিত হয় পোরবন্দরে এবং তৃতীয়টি স্থাপিত হয় কাট্নিতে (মধ্যপ্রদেশ)। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতে সিমেণ্টের কারখানা ছিল মাত্র তিনটি। কারণ ইংরেজগণ এই দেশে সিমেণ্ট রপ্তানি করিয়া প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠন করিত বলিয়া এই শিল্পের উন্নতির জন্য তাহারা মোটেই আগ্রহান্বিত ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের শিক্ষা হইতে তাহারা বুঝিল যে, সর্বদা ভারতে সিমেণ্ট পাঠানো সম্ভব নহে। ইহার পরেই ক্রমশঃ সিমেণ্টের কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কারখানার সংখ্যা বাড়িয়া ২৩টি হইল। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত এই শিল্পের আরও উন্নতি হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের তুলনায় উৎপাদন বর্তমানে প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; ৫৫,০০০ শ্রমিক এই শিল্পে নিযুক্ত আছে; এই শিল্পে ভারতের মোট কয়লা-উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগ ব্যবহৃত হয়; সিমেণ্ট শিল্প সরকারকে প্রতি বৎসর প্রায় ২৮ কোটি টাকা আবকারি শুল্ক এবং ১৪ কোটি টাকা রেল-মাশুল দেয়। ১৯৬৪ সালে ১ কোটি মেঃ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতে সিমেণ্ট-শিল্পের উৎপাদনের প্রাচুর্য অনুসারে যে পরিমাণে উৎপাদন

বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল তাহা এখনও হয় নাই। এই শিল্পে কয়েকটি **সমস্যা** বিদ্যমান থাকায় ইহা সম্ভবপর হয় নাই। প্রথমতঃ, প্রায় ৮টি পুরাতন কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতা এখনও এক লক্ষ টনের কম। ইহার ফলে এই সকল কারখানার উৎপাদন-খরচ বেশী। দ্বিতীয়তঃ, দূরবর্তী স্থান হইতে চুনাপাথর ও কয়লা আনিবার জন্য পরিবহণ-ব্যয় বেশী হয়; ইহার ফলে উৎপাদন-খরচ বাড়িয়া যায়। এই সকল সমস্যা **সমাধানের** জন্য পরিকল্পনা কমিশন কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছেন। প্রথমতঃ, বর্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইয়া উৎপাদন-খরচ কমাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আঞ্চলিক চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন সিমেন্ট-কারখানা স্থাপন করিতে হইবে; ইহাতে পরিবহণের খরচ কমিয়া যাইবে। তৃতীয়তঃ, যন্ত্রপাতির সংস্কার ও পরিবর্তন দ্বারা উৎপাদন-খরচ কমাইতে হইবে। চতুর্থতঃ, সিমেন্ট কোম্পানীসমূহ যাহাতে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে চুনাপাথরের কারখানার ইজারা পায়, ইহার ব্যবস্থা করিবার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এইসব ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে সিমেন্টের উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

ভারতে সিমেন্ট উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (লক্ষ টন)

১৯৫০-৫১	২৭	১৯৬০-৬১	৮৫
১৯৫৫-৫৬	৪৬	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	১৩০

উৎপাদক অঞ্চল—বর্তমানে এই দেশে ৩২টি সিমেন্টের কারখানা আছে। ইহা ছাড়া আরও ৯টি নূতন কারখানা নির্মিত হইতেছে; ইহার মধ্যে মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজে ২টি করিয়া এবং মহীশূর, অন্ধ্র, পণ্ডিচেরী, আসাম ও কাশ্মীরে একটি করিয়া কারখানা স্থাপিত হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই শিল্প ছড়াইয়া থাকিলেও, যে সকল অঞ্চলে সহজে চুনাপাথর ও শক্তিসম্পদ পাওয়া যায়, সেই সকল অঞ্চলে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশী।

বিভিন্ন রাজ্যে সিমেন্টের উৎপাদন—১ কোটি মেঃ টন (১৯৬৪)

(লক্ষ মেঃ টন)

বিহার	১৪·২২	গুজরাট	৯·৮২	মহীশূর	৭·৫৭
মাদ্রাজ	১১·৮৬	মধ্যপ্রদেশ	৭·৮৬	পাঞ্জাব	৬·৩৯
রাজস্থান	১০·৯০	অন্ধ্র	৭·৩৬	উড়িষ্যা	৬·৭২

বিহারে অপর্যাপ্ত চুনাপাথর ও কয়লা পাওয়া যায় বলিয়া এই রাজ্য সিমেন্ট উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। পূর্ব ভারতের বিরাট চাহিদা এই রাজ্যের কারখানা হইতে বহুলাংশে মিটানো হয়। সিমেন্ট-শিল্পের আদিভূমি **মাদ্রাজে** প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া যায় বলিয়া এই রাজ্য সিমেন্ট উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ভারতের সিমেন্ট-শিল্পের ইতিহাসে **গুজরাটের** নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানেও চুনাপাথর পাওয়া যায়। **রাজস্থানে** প্রচুর জিপ্‌সাম ও চুনাপাথর পাওয়া যায় বলিয়া এই রাজ্য সিমেন্ট উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। **উড়িষ্যা** রাজ্যে প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া যায়। কয়লার কোন অভাব এখানে বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। সেইজন্য এই রাজ্যও সিমেন্ট উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ-নীতি অনুসারে এখন অধিকাংশ রাজ্যেই কমবেশী সিমেন্ট উৎপন্ন হয়।

ভারতের সিমেন্ট কারখানাসমূহের অবস্থান

রাজ্য	শিল্পের অবস্থান	কারখানা-সংখ্যা
বিহার	ডালমিয়ানগর, খেলারি, চাইবাসা, সিন্ধ্রি, খালারি (রাঁচী), কল্যাণপুর ও শোণ ভ্যালি	৭
গুজরাট	ওখামণ্ডল (পোরবন্দর), সেভালিয়া	৪
মাদ্রাজ	মধুকারাই (কোয়েম্বাটুর), ডালমিয়াপুরম (ত্রিচিনাপল্লী), মঙ্গলাগিরি (কৃষ্ণা)	৩
পাঞ্জাব	ভূপেন্দ্র, ডালমিয়া, দাদরী	৩
মধ্যপ্রদেশ	জব্বলপুর, গোয়ালিয়র	২
মহীশূর	বাঙ্গালোর	২
রাজস্থান	সাওয়াই মাধোপুর, লাখেরী	২
অন্ধ্র	বেজওয়াদা, হায়দরাবাদ	২
উত্তরপ্রদেশ	এলাহাবাদ	১
কেরালা	কোট্টায়াম	১
উড়িষ্যা	রাজগাঙ্গপুর	১

বাণিজ্য—ভারতে সিমেন্টের চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে এই দেশের মোট চাহিদা উৎপাদন অপেক্ষা বেশী। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নূতন নূতন শিল্প-স্থাপন ও বাঁধ নির্মাণের জন্য সিমেন্টের চাহিদা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু এখনও জনপ্রতি চাহিদা অন্যান্য

শিল্পোন্নত দেশ অপেক্ষা অনেক কম। বৃটেনে জনপ্রতি সিমেন্টের চাহিদা ১৮১ কিলোগ্রাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৩৩ কিলোগ্রাম, সুইডেনে ৩৩৫ কিলোগ্রাম, বেলজিয়ামে ৩২৫ কিলোগ্রাম, কিন্তু ভারতে মাত্র ১৮ কিলোগ্রাম। চাহিদা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে সিমেন্টের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও এখনও এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সিমেন্টের অভাবে বহু কাজ অসমাপ্ত থাকে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এইজন্য সিমেন্টের উৎপাদন-লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন এবং উৎপাদন ক্ষমতার লক্ষ্য নির্ধারিত হইয়াছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন।

ভারতে সিমেন্টের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে এই দেশের পক্ষে রপ্তানি-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করা সহজসাধ্য। ১৯৬৪ সালে এই দেশ প্রায় ২.৫ লক্ষ টন সিমেন্ট রপ্তানি করিয়াছিল। নিকটবর্তী ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ইন্দোচীন এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে ভারত অনায়াসে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে সিমেন্ট রপ্তানি করিতে পারে। উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য কোন কোন অঞ্চলে চুনাপাথরের পরিবর্তে 'শেল' (Shale), ব্লাস্টচুল্লীর 'গাদ' (Slag) প্রভৃতির সাহায্যে সিমেন্ট উৎপাদনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভাকরা বাঁধের নিকট 'শেলের' সাহায্যে 'পজলন' (Pazzolon) সিমেন্ট উৎপন্ন হইতেছে।

ভারতের সিমেন্টের ব্যবসায়ে **মূল্য-নির্ধারণ** করে সরকার। কয়েকজন শিল্পপতি মনে করে যে, সিমেন্টের এই মূল্য-নির্ধারণ এত কমের দিকে হয় যে, ইহাতে বেশী লাভ থাকে না এবং ইহার ফলে অনেকে এই শিল্পের প্রসারে অগ্রসর হয় না। কিন্তু সরকার মনে করে, এই মূল্যে যথাসম্ভব লাভের পরিমাণ নির্ধারিত থাকে। এইজন্য এখন কোন কোন স্থানে সরকার নিজেই সিমেন্ট-কারখানা স্থাপনে অগ্রসর হইতেছে। মূল্য-নিধারণ ছাড়া এই দেশের সিমেন্ট-ব্যবসায়ের অন্যতম সমস্যা **একচেটিয়া** ব্যবসায়িগণের দৌরাত্ম্য। The Associated Cement Companies Ltd. এবং ডালমিয়া গ্রুপ ভারতের অধিকাংশ সিমেন্ট-কারখানার মালিক। ইহাদের একচেটিয়া ব্যবসায় বজায় রাখিবার জন্য ইহারা এই শিল্পের প্রসারে উৎসাহী হয় না। সেইজন্যই সরকারকে নূতন সিমেন্ট-কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইতে হইয়াছে।

রাসায়নিক শিল্প (The Chemical Industry)

কোন দেশ রাসায়নিক শিল্পে উন্নতি লাভ না করিলে অন্যান্য শিল্পে বা কৃষিকার্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য

শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কৃষির উন্নতির জন্যও রাসায়নিক সার প্রয়োজন। ভারত কৃষি প্রধান দেশ। সুতরাং এই দেশে রাসায়নিক সারের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। ভারত এখনও রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদনে আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই শিল্পের বিকাশ সুরু হইলেও প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয় স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত। বর্তমানে এই দেশে প্রায় ২৫০টি রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। রাসায়নিক শিল্পে মোট শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০। এই শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল বিভিন্ন রাজ্যে পাওয়া গেলেও কয়লা ভারতের পূর্বাংশে সীমাবদ্ধ হওয়ায়, এই শিল্প-স্থাপনে শক্তিসম্পদের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে জলবিদ্যুতের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে।

ভারতে উৎপাদিত রাসায়নিক দ্রব্যসমূহকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—গুরু রাসায়নিক দ্রব্য এবং লঘু রাসায়নিক দ্রব্য।

(ক) গুরু রাসায়নিক দ্রব্য (Heavy Chemicals)—গুরু রাসায়নিক দ্রব্যাদি সাধারণতঃ একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহার উৎপাদন-খরচ অত্যন্ত কম। এই সকল দ্রব্যাদি অন্যান্য শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়; যেমন, সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড, কস্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ক্যাল্‌সিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি। কৃষিকার্যে যে সকল রাসায়নিক সার (অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট, সুপার ফস্‌ফেট প্রভৃতি) ব্যবহৃত হয়, ইহাও গুরু রাসায়নিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। গুরু রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রধানতঃ প্রয়োজন লবণ, চুনাপাথর, জিপ্‌সাম বক্সাইট, জিরকন্‌, ইল্‌মেনাইট, মোনাজাইট, কেওলিন প্রভৃতি। এই সকল কাঁচামাল ভারতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও বৃটিশ রাজত্বে এই শিল্পের উন্নতিসাধনের বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। কারণ ইংরেজগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উহাদের দেশের রাসায়নিক দ্রব্য ভারতে রপ্তানি করা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটেন হইতে এই সকল দ্রব্যের আমদানি বন্ধ হওয়ায় কোন কোন স্থানে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পরিকল্পনায় এই শিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধন হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, দিল্লী, মাদ্রাজ, কেরালা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে গুরু রাসায়নিক শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের রিষড়া

নামক স্থানে ক্লোরিন, কস্টিক লিকার, ব্লিচিং-পাউডার, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে। বিভিন্ন ইস্পাত কারখানায় কয়লার উপজাত দ্রব্যের সাহায্যে বহু রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কাগজ, কার্পাসবয়ন ও চর্মশিল্পের উন্নতি বহুলাংশে রাসায়নিক শিল্পের উপর নির্ভরশীল বলিয়া সরকার ইহার উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

গুরু রাসায়নিক দ্রব্যাদির মধ্যে **সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড (Sulphuric Acid)** সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন শিল্পে ইহার প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে, ইহার উৎপাদনকে শিল্পোন্নতির মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়। বর্তমানে এই দেশে ৪৪টি কারখানায় প্রায় ৩·৬৩ লক্ষ টন সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এই সকল কারখানার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৩টি এবং মহারাষ্ট্রে ১২টি কারখানা অবস্থিত। সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের প্রধান সমস্যা এই যে, ইহা প্রধানতঃ আমদানীকৃত গন্ধকের (Sulphur) উপর নির্ভরশীল। **কস্টিক সোডা** অন্যতম গুরু রাসায়নিক দ্রব্য। পশ্চিমবঙ্গের রিষড়া, মাদ্রাজের মেতুর এবং আমেদাবাদ, মিঠপুর, দিল্লী, ডেহ্‌রী-অন্‌-শোণ প্রভৃতি শহরে কস্টিক সোডা উৎপন্ন হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। গন্ধকের উপর উৎপাদন যাহাতে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল না হয়, সেইজন্য বিভিন্ন খনিজ ধাতব পদার্থ হইতে ধাতু নিষ্কাশনের সময় গন্ধকের অংশ বাহির করিয়া এইজাতীয় অ্যাসিড উৎপাদনের বন্দোবস্ত এই পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় পাইরাইটস্‌ হইতে গন্ধক নিষ্কাশন করিয়া সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে; ইহার মধ্যে সার উৎপাদনের জন্য ১০·৯ লক্ষ টন এবং রেয়ন-শিল্পের জন্য ১·৩৫ লক্ষ টন প্রয়োজন হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এইজন্য সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের উৎপাদন-লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে ১৫ লক্ষ টন।

রাসায়নিক সার (Chemical Fertilizers) উৎপাদনে ভারত ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতেছে। কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া সার উৎপাদনের উপর পরিকল্পনা কমিশন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। পূর্বে এদেশে পুরানো প্রথায় জমিতে সার দেওয়া হইত এবং গোবর, মনুষ্য-পুরীষ, জীবজন্তুর হাড় প্রভৃতি সারের কাজে ব্যবহৃত হইত। এই সকল অকৃত্রিম সারের

যোগানের নিশ্চয়তা না থাকায় কৃত্রিম বা রাসায়নিক সারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এদেশে সর্বপ্রথম সারের কারখানা স্থাপিত হয় কেরালার অন্তর্গত আলয়ে নামক স্থানে (৪৫৮ পৃষ্ঠায় মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। মাদ্রাজের ত্রিচিনাপল্লী নামক স্থান হইতে জিপ্‌সাম আনাইয়া এখানে অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। ইহার পর ১৯৫১ সালে সিন্ধ্রিতে এশিয়ার বৃহত্তম সারের কারখানা স্থাপিত হয়। রাজস্থান হইতে আনীত জিপ্‌সামের সাহায্যে এখানে সার প্রস্তুত হয়। বর্তমানে এই কারখানায় দৈনিক ১,০০০ মেঃ টনের বেশী 'অ্যামোনিয়াম সালফেট' সার উৎপন্ন হইতেছে। মহীশূরেও একটি সারের কারখানা আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পাঞ্জাবের নাঙ্গালে এবং মাদ্রাজের নিভেলীতে দুইটি সারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের ইস্পাত-শিল্পের উপজাত-দ্রব্য হিসাবে প্রচুর অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হইতেছে। ভারতে বর্তমানে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ মেঃ টন সার উৎপন্ন হইতেছে। ভারতে কৃষির উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। সুতরাং সারের চাহিদা প্রচুর বাড়িয়া যাইতেছে। স্থানীয় উৎপাদন হইতে এই চাহিদা সম্পূর্ণ মিটানো যায় না বলিয়া কিছু পরিমাণে রাসায়নিক সার এখনও বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় রাসায়নিক সার উৎপাদনের উপর আরও জোর দেওয়া হইয়াছে। এই পরিকল্পনার কার্যকালে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে (৪৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই পরিকল্পনায় বহু নূতন সারের কারখানা স্থাপিত হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালের শেষে বিভিন্ন সারের কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতা এইরূপ দাঁড়াইবে :—

সরকারী আওতায়	উৎপাদন-ক্ষমতা	বে-সরকারী আওতায়	উৎপাদন-ক্ষমতা
রাউরকেলা	১২০ হাজার টন (N)	বারাণসী	২০ হাজার টন (N)
নিভেলী	৭০ „ „	মধ্যপ্রদেশ (স্থান অনির্দিষ্ট)	৫০ „ „
ট্রম্বে	৯০ „ „	বিশাখাপত্তনম্	৮০ „ „
নাহারকাটিয়া	৩২.৫ „ „	কোথাগুডিয়াম (অন্ধ্র)	৮০ „ „
গোরক্ষপুর	৮০ „ „		

সরকারী আওতায়	উৎপাদন-ক্ষমতা	বে-সরকারী আওতায়	উৎপাদন-ক্ষমতা
স্থান অনির্দিষ্ট	৮০ হাজার টন	রাজস্থান (স্থান অনির্দিষ্ট)	৮০ হাজার টন
সিন্ধ্রি, নাঙ্গাল, আলয়ে	২৫৭ „ „	দুর্গাপুর*	৫৮ „ „
মোট	৭২৯·৫ „ „	মোট	৩৬৮ „ „

ইহা ছাড়া তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে গুজরাট ও মহীশূরে দুইটি সারের কারখানা-স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে।

(খ) লঘু রাসায়নিক দ্রব্য (Fine Chemicals)—ঔষধপত্র, রং, বার্নিশ, ফটোগ্রাফ-সংক্রান্ত রাসায়নিক দ্রব্য, আলকাতরা-জাত দ্রব্যাদি প্রভৃতি লঘু রাসায়নিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতার পর এইজাতীয় রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বিভিন্ন ইস্পাত-কারখানায় **আলকাতরা-জাত** বিভিন্ন দ্রব্যাদি (বেনজিন, ন্যাপথালিন, গ্লিসারিন, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, অ্যালকোহল প্রভৃতি) উৎপাদিত হইতেছে। ইহা ছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কুইনাইন, ভিটামিন, গ্লুকোনেট, ক্যাফিন, অ্যান্টি-বায়োটিকস্ প্রভৃতি ঔষধ, এবং রং, বার্নিশ প্রভৃতি এই দেশে প্রস্তুত হইতেছে। মহারাষ্ট্রের পিম্প্রিতে ভারত সরকার একটি স্ট্রেপ্টোমাইসিন ও পেনিসিলিন প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিয়াছে। কেরালা ও দিল্লীতে ডি. ডি. টি. প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। দার্জিলিং ও নীলগিরি অঞ্চলে কুইনাইন প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ছাড়া এই দেশে প্রায় ২৮টি রঞ্জন-দ্রব্যের কারখানা আছে। গুজরাটের উপকূলে লবণ-জাত বিভিন্ন রসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। বোম্বাই, কলিকাতা ও বরোদায় বহু ঔষধের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিহারের গোমিয়া নামক স্থানে একটি বৃহদাকার বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানা হইতে কয়লাখনিতে বিস্ফোরক (Explosives) দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়।

ভারতে সম্প্রতি **বিদ্যুৎ-জাত রাসায়নিক** দ্রব্য উৎপাদনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ক্যাল্সিয়াম কারবাইড, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম এবং ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি এইজাতীয় রাসায়নিক দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহা

* পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহার অংশীদার।

প্রস্তুত করিতে প্রচুর সুলভ বিদ্যুৎ প্রয়োজন বলিয়া জলবিদ্যুতের উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় লঘু রাসায়নিক শিল্পের উন্নতির জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রের পানভেল অঞ্চলে Basic Chemicals and Intesmediates নামক সরকারী প্রতিষ্ঠান যে কারখানা স্থাপন করিয়াছে, তাহার সাহায্যে অন্ধ্রের সনটনগরে একটি ঔষধের কারখানা স্থাপিত হইবে। ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তরপ্রদেশের হৃষীকেশে একটি 'অ্যান্টি-বায়োটিক্‌স' কারখানা-স্থাপনও তৃতীয় পরিকল্পনার অঙ্গীভূত। ইহা ছাড়া কেরালায় একটি 'উদ্ভিজ্জ-রাসায়নিক' (Phyto-chemical) কারখানা এই পরিকল্পনার কার্যকালে স্থাপিত হইবে।

রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য*

(সহস্র টন)

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)
সালফিউরিক অ্যাসিড	৯৯	১৬৪	৩৬৩	১,৫০০
কস্টিক সোডা	১১	৩৫	১০০	৩৪০
সোডা অ্যাশ	৪৫	৮১	১৪৫	৪৫০
রাসায়নিক সার (N)		৭৯	১১০	৮০০
রাসায়নিক সার (P_2O_5)		১২	৫৫	৪০০
সাল্‌ফা ড্রাগ (টন)		৮৩	১৫০	১,০০০
পেনিসিলিন (লক্ষ্য মেগা)		৬৮		১২০
ডি. ডি. টি.		২৮৪	২,৮০	২,৮০০

বাণিজ্য—ভারত চিরকাল রাসায়নিক দ্রব্যাদির জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। স্বাধীনতার পূর্বে এই নির্ভরশীলতা ছিল চরম; কিন্তু স্বাধীনতার পর এই নির্ভরশীলতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। বর্তমানে একদিকে যেমন রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্যদিকে শিল্প ও কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার পরিমাণও অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়া যাইতেছে। বর্তমানে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যে ভারত স্বাবলম্বী; যথা, পটাসিয়াম ব্রোমাইড, ক্যাল্‌সিয়াম ক্লোরাইড, ব্লিচিং-পাউডার, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, ক্লোরিন প্রভৃতি। অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য

* Source—Third Five-Year Plan.

এখনও বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। প্রতিবৎসর প্রায় ১৫ কোটি টাকা মূল্যের রাসায়নিক দ্রব্য বর্তমানে এই দেশে আমদানি হইতেছে; রপ্তানিকারক দেশসমূহের মধ্যে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী, ইটালি প্রভৃতি দেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে বৃটেন মোট আমদানির শতকরা ৬০ ভাগ সরবরাহ করে। আমদানীকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের যৌগিক পদার্থ, সোডিয়াম কার্বোনেট কস্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ, গন্ধক-দ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্ত-শিল্প (The Engineering Industry)

দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এদেশে পূর্ত-শিল্পের প্রসার মোটেই হয় নাই। ইংরেজগণ সেই সময় এদেশে জাহাজ, মোটর-গাড়ী, বিমানপোত, রেল-ইঞ্জিন ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প-দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায় করিত। ভারতে বর্তমানে পূর্ত-শিল্পের উন্নতি হইতেছে। উল্লেখযোগ্য বৃহদাকার পূর্ত-শিল্পের মধ্যে জাহাজ, রেল-ইঞ্জিন, মোটর-গাড়ী, বিমানপোত-নির্মাণ শিল্প প্রধান। ইহা ছাড়া ডিজেল-ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বাই-সাইকেল, সেলাইকল, স্ক্রু, বল্টু, বিদ্যুৎ-রোধক যন্ত্র রেডিও প্রভৃতি নির্মাণের কারখানা পূর্ত-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

কলিকাতা ও হাওড়া ছোটখাটো ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ইহার পর মহারাষ্ট্রের স্থান। কানপুর, অমৃতসর, জামসেদপুর, ভদ্রাবতী, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানেও এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারত সরকার রাশিয়ার ইঞ্জিনিয়ারগণের সহায়তায় রাঁচীতে একটি ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতেছে। বৃহদাকার শিল্পের, এমনকি ইস্পাতশিল্পের যন্ত্রপাতিও এখানে প্রস্তুত হইবে। ভূপালেও এইরূপ একটি ভারী যন্ত্রপাতির কারখানা স্থাপিত হইতেছে। বৃহদাকার পূর্ত শিল্পসমূহ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল:

মোটর-গাড়ী-নির্মাণ শিল্প (The Automobile Industry)

স্বাধীনতার পূর্বে বৃটেন হইতে ভারতে অধিকাংশ মোটর-গাড়ী আমদানি করা হইত বলিয়া এদেশে ইংরেজগণ মোটর-গাড়ী-নির্মাণ শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মোটর-গাড়ী আমদানি প্রায় বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ১৯৪১ সালে বোম্বাই-এ 'প্রিমিয়ার অটোমোবাইলস্

লিমিটেড' নামক একটি প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে মোটর-গাড়ী তৈয়ারী আরম্ভ করে। ইহার পর ১৯৪৪ সালে কলিকাতার হিন্দ্ মোটরসে (উত্তরপাড়া) বৃহত্তম মোটর-গাড়ী-নির্মাণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কারখানার মালিক বিড়লা-গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রিত 'হিন্দুস্থান মোটরস্ লিঃ'। ভারতে মোটর-গাড়ীর চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় মাদ্রাজ, জামসেদপুর ও অন্যান্য স্থানে আরও কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে এদেশে ১২টি মোটর-গাড়ী-নির্মাণের কারখানা আছে।

ভারতের মোটর-গাড়ী-নির্মাণ শিল্পের **ভবিষ্যৎ** উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। এই শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল (ইস্পাত, কাঠ, রবার প্রভৃতি) বর্তমানে এখানে পাওয়া যায়। এই শিল্পের উপযোগী দক্ষ কারিগরের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা অনেক বেশী। সরকার মোটর-গাড়ীর আমদানি বন্ধ করায় ভারতে মোটর-গাড়ীর একচেটিয়া ব্যবসায় চলিতেছে। পরিবহণ-ব্যবস্থার কোন অসুবিধা বর্তমানে এই শিল্পকে ভোগ করিতে হয় না। বিভিন্ন **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার** মারফত এই শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার সচেষ্ট আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোটর-গাড়ী উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল ৫৮,০০০; কিন্তু পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ না হইতেই উৎপাদন হইয়াছিল ৪১,৭২০। **তৃতীয় পরিকল্পনার** কার্যকালে মোটর-গাড়ী উৎপাদনের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে এই দেশে মোটর-গাড়ী-নির্মাণের শতকরা ৬৫ ভাগ যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়; কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় শতকরা ৮৫ ভাগ যন্ত্রপাতি ভারতে প্রস্তুতের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই শিল্পের উন্নতির জন্য ৮৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে।

উৎপাদক অঞ্চল—ভারতের তিনটি কেন্দ্রে এই শিল্প প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। **কলিকাতার** নিকটস্থ হিন্দুস্থান মোটরস্ কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ট্রাক, যাত্রীবাহী গাড়ী প্রস্তুতের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই শিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতি অধিকাংশই এই কারখানায় প্রস্তুত হয়। বৃটেনের Morris Motors এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Studebaker Export Corporation-এর সহায়তায় এই কারখানা নির্মিত হইয়াছে। সাহাপুরের ডানলপ কোম্পানীর রবার, দুর্গাপুর ও বার্নপুরের ইস্পাত এই কারখানায় ব্যবহৃত হয়। বাঙালী শ্রমিক এই শিল্পে অত্যন্ত নিপুণতার

পরিচয় দেয়। এই সকল কারণে হিন্দুস্থান মোটরস্ ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। **বোম্বাই** অঞ্চলে ইটালির Fiat প্রতিষ্ঠান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Crysler Group-এর সাহায্যে প্রিমিয়ার অটোমোবাইল্সের কারখানা স্থাপিত হয়। এই কারখানায়ও ইঞ্জিন-নির্মাণের বন্দোবস্ত হইয়াছে। **মাদ্রাজ** অঞ্চলে Austin Motor Company Ltd-এর সহায়তায় অশোক লিল্যাণ্ডস্ লিঃ-এর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীর একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। মহীন্দ্র ও মহীন্দ্র কোম্পানী মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গে জীপ-গাড়ী নির্মাণ করিতেছে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে স্কুটার-নির্মাণ-শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

ভারত সরকার সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতার উপযোগী 'জনসাধারণের গাড়ী' (People's-Car) নির্মাণের বন্দোবস্ত করিতেছে। ইহার মূল্য হইবে ৫০০০।৬০০০ টাকা। এইভাবে সুলভে গাড়ী পাওয়া গেলে, ইহার চাহিদা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে ভারতে ৯০০ জন লোকের জন্য, ১ খানা গাড়ী নির্মিত হয়; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি চারিজন লোকের জন্য, বৃটেনে প্রতি ১৮ জন লোকের জন্য, কানাডায় প্রতি ৮ জন লোকের জন্য, একখানা গাড়ী আছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ভারতের মোটর-গাড়ীর উৎপাদন বাড়িয়া দ্বিগুণ হইবে এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতে প্রতি ৪৫০ জন লোকের জন্য একখানা গাড়ী হইবে।

মোটর-গাড়ী উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (হাজার)

	১৯৫০-৫১	১৯৫৯	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)
যাত্রিবাহী গাড়ী	৮'৩	১১ ৯	২০	৩০
মালবাহী	৮'৭	১৯ ১	২৮	৬০
জীপ ও স্টেশন ওয়াগন	'৩	৫'৩	৫'৫	১০
স্কুটার ও মোটর সাইকেল	—	১'৫	১৮	৫০
মোট	১৭'৩	৩৭'৮	৭১'৫	১৫'০

পূর্বে ভারতে বৃটেন ও অন্যান্য দেশ হইতে প্রায় ১৪ কোটি টাকার মোটর-গাড়ী আমদানি হইত; কিন্তু বর্তমানে সরকার আমদানি প্রায় বন্ধ করিয়া দেওয়ায় দেশীয় শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে।

রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণ শিল্প (The Locomotive Industry)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতের প্রয়োজনীয় রেল-ইঞ্জিন অধিকাংশই বৃটেন হইতে আমদানি করা হইত। সেই সময় এই দেশে প্রায় ৭,০০০ ইঞ্জিনের প্রয়োজন হইত। যুদ্ধের সময় ইঞ্জিন আমদানি বন্ধ হওয়ায় ইংরেজ সরকার এই দেশে রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের অনুমতি দেয়। ১৯৪৩ সালে **জামসেদপুরে** টাটা কোম্পানী সর্বপ্রথম রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা স্থাপন করে। ১৯৫০ সালে **চিত্তরঞ্জনে** সরকারের রেল-বিভাগ নিজস্ব রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা স্থাপন করে। ইহা ছাড়া **বারাণসীতে** একটি নূতন রেল-ইঞ্জিন কারখানা নির্মিত হইতেছে। এখানে প্রধানতঃ ডিজেল ইঞ্জিন তৈয়ার করা হইবে। (৪৫৮ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লা, বার্নপুর ও জামসেদপুরের ইস্পাত, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের কাঠ, স্থানীয় সুলভ শ্রমিক জামসেদপুর ও চিত্তরঞ্জনে এই শিল্প গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। চিত্তরঞ্জনে বর্তমানে বৎসরে প্রায় ৩০০ খানা বৃহদাকার ইঞ্জিন নির্মিত হইতে পারে। জামসেদপুরের উৎপাদন-ক্ষমতা প্রায় ১০০ খানা ইঞ্জিন। চিত্তরঞ্জনে প্রায় ৫,০০০ শ্রমিক এই শিল্পে নিযুক্ত আছে। প্রথমে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হইলেও, বর্তমানে এই শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অধিকাংশই ভারতে প্রস্তুত হয়।

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত রেল ইঞ্জিন-নির্মাণ শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** শুধু যে কারখানাসমূহের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানো হইবে তাহাই নহে, ভারতে বৈদ্যুতিক ও ডিজেল ইঞ্জিন-নির্মাণেরও সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। বর্তমানে চিত্তরঞ্জনে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন নির্মিত হইতেছে। আশা করা যায়, ভারতে এই শিল্প ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিবে এবং সকল প্রকার রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণে ভারত স্বাবলম্বী হইবে।

রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণের গতি ও লক্ষ্য

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)
বাষ্পীয় ইঞ্জিন	৭	১৭৯	২৯৫	২৩৫
ডিজেল ইঞ্জিন	—	—	—	৮৭
বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন	—	—	—	৪৬
মোট	৭	১৭৯	২৯৫	৩৬৮

জাহাজ-নির্মাণ শিল্প (The Ship-building Industry)

প্রাচীনকালে ভারত জাহাজ-নির্মাণ শিল্পে অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় জাহাজে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য হইত। সেই সময় কাষ্ঠনির্মিত জাহাজ পালের সাহায্যে চলিত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও ভারতীয় জাহাজে করিয়া ভারতীয় মালপত্র বৃটেনে লইয়া যাইত। কিন্তু ক্রমশঃ ইংরেজগণ বুঝিল যে, তাহাদের নিজেদের জাহাজে মালপত্র প্রেরণ না করিলে একদিকে তাহাদের বাণিজ্য ভারতীয়গণের উপর নির্ভরশীল হইবে, অন্যদিকে তাহাদের জাহাজ কোম্পানীগুলি মুনাফা লুণ্ঠন করিতে পারিবে না। ইহা ছাড়া বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হওয়ায় পাল-চালিত কাঠের জাহাজ প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিল না। এই সময় ইংরেজগণ কঠোর আইনের সাহায্যে ভারতীয় জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের ধ্বংস সাধন করিয়া বৃটিশ জাহাজের সাহায্যে বাণিজ্য আরম্ভ করিল। সেই সময় হইতে এখনও বৃটিশ জাহাজের উপর ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বহুলাংশে নির্ভরশীল।

বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নতির জন্য নিজস্ব জাহাজ থাকা একান্ত প্রয়োজন। ভারত বর্তমানে রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এখনও এই দেশ রপ্তানির জন্য বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজের উপর নির্ভরশীল বলিয়া রপ্তানি-বৃদ্ধির চেষ্টা সফল হইতেছে না। কারণ এই সকল দেশের জাহাজ কোম্পানীসমূহ নিজেদের বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ব্যস্ত— ভারতের জন্য নহে। এই সকল কারণে বর্তমানে ভারত সরকার জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের উন্নতির জন্য সচেষ্ট আছে।

ভারতে আধুনিক জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪১ সালে, যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে বৃটিশ সরকার ভারতে জাহাজ-নির্মাণের অনুমতি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই সুযোগে ঐ বৎসর বোম্বাই-এর বিখ্যাত শিল্পপতি ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ বিশাখাপত্তনমে জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের উদ্বোধন করেন। তাঁহার জাহাজ কোম্পানীর নাম সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী লিমিটেড। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে এই শিল্পের প্রথম জাহাজ 'জল-উষা' (৮,০০০ টন) জলে ভাসে। ক্রমশঃ বিশাখাপত্তনমে আরও জাহাজ নির্মিত হইতে থাকে। এই শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সরকার এই শিল্পের অংশীদার হইল। ১৯৫২ সালে হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিঃ (Hindusthan Shipyard Ltd.) নামে যে নূতন কোম্পানী বিশাখাপত্তনমের

জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের মালিক হইল, ভারত সরকার সেই কোম্পানীর দুই-তৃতীয়াংশের এবং সিন্ধিয়া কোং এক-তৃতীয়াংশের মালিক হইল। সরকারী সাহায্য ও সমর্থনে ক্রমশঃই এই শিল্পের উন্নতি হইতে থাকে। প্রথমে আমদানীকৃত যন্ত্রাদির সাহায্যে জাহাজ নির্মিত হইলেও, ক্রমশঃ যন্ত্রপাতি-নির্মাণের ব্যাপারে বিশাখাপতনম স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের উন্নতির জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোচিনে দ্বিতীয় জাহাজ-নির্মাণের কারখানা-স্থাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোচিনে নূতন কারখানা স্থাপনের জন্য এবং বিশাখাপতনমে ড্রাই ডক নির্মাণ ও কারখানার সম্প্রসারণের জন্য এই পরিকল্পনায় ৩২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোচিনের কারখানার জন্য ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে ২০ কোটি টাকা।

জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের গতি ও লক্ষ্য (লক্ষ GRT)

১৯৫০-৫১	০	১৯৬০-৬১	২০
১৯৫৫ ৫৬	১০	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)	৫০-৬০

উৎপাদক অঞ্চল—বিশাখাপতনমে ভারতের একমাত্র জাহাজ-নির্মাণের কারখানা অবস্থিত। বিভিন্ন কারণে **বিশাখাপতনম্** জাহাজ-নির্মাণ শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। (১) এখানকার পোতাশ্রয়টি স্বাভাবিক ও সুগভীর এবং ডল্‌ফিন নাসিকাকৃতি অন্তরীপ দ্বারা সামুদ্রিক ঝড় হইতে সুরক্ষিত। (২) জাহাজ-নির্মাণের স্থানটি বন্দরের সহিত যুক্ত এবং বন্দরের পয়ঃ-প্রণালীতে ১৪ হাজার টন পরিমিত জাহাজ থাকিবার উপযুক্ত জল আছে। (৩) জামসেদপুর হইতে এবং বর্তমানে ভিলাই হইতে লৌহ ও ইস্পাত এখানে আনিবার বন্দোবস্ত করা সহজ। (৪) জাহাজ-নির্মাণের উপযোগী কাষ্ঠ বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের বনভূমি হইতে সংগ্রহ করা সহজ। (৫) ঝরিয়া ও মধ্যপ্রদেশের কয়লা এখানকার শিল্পে ব্যবহার করা যায়। (৬) বিশাখা-পতনমের পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত এই বন্দর রেলপথে যুক্ত। (৭) স্থানীয় সুলভ শ্রমিক এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। এই সকল সুবিধা থাকায় এবং ফ্রান্সের A.C.L. কোম্পানীর কারিগরী সাহায্যে এই শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কোচিনে জাহাজ-নির্মাণের স্থান-নির্বাচন অন্যান্য

বিবেচনার সহিত করা হইয়াছে। বিভিন্ন কারণে এখানে জাহাজ-নির্মাণ-শিল্পের উন্নতি হওয়া সম্ভবপর। প্রথমতঃ, মহীশূরের বনভূমি হইতে জাহাজের প্রয়োজনীয় কাঠ পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, ভদ্রাবতী ইস্পাত কারখানা হইতে এবং প্রয়োজন হইলে ভিলাই কারখানা হইতে সহজেই কোচিনে ইস্পাত আনা যাইবে। তৃতীয়তঃ, স্থানীয় নিপুণ ও সুলভ শ্রমিক এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিবে। চতুর্থতঃ, কোচিন বন্দরে জাহাজ-নির্মাণের উপযোগী পোতাশ্রয় ও জলের গভীরতা বিদ্যমান। পঞ্চমতঃ, কোচিন বন্দর পাশ্চাত্য দেশসমূহের নিকটবর্তী বলিয়া যন্ত্রপাতি আমদানি করা সহজসাধ্য হইবে। আশা করা যায়, এই সকল কারণে কোচিনে জাহাজ-নির্মাণ শিল্প সাফল্য লাভ করিবে।

বিমানপোত-নির্মাণ শিল্প (The Aircraft Industry)

বর্তমান স্পুটনিকের যুগে বিমানপোত মানুষের সাধারণ যাতায়াত-ব্যবস্থায় কাজ করে, কি সামরিক প্রয়োজনে, কি যাত্রী-পরিবহণে, কি দ্রুত মালপত্র-প্রেরণে, বিমানপোত একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এই দেশে বিমানপোতের ব্যবহার অত্যন্ত কম ছিল; কিন্তু বর্তমানে ইহার চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। সামরিক প্রয়োজন ছাড়াও, যাত্রী ও মাল-পরিবহণে বহু বিমানপোত প্রয়োজন হয়। ভারতে বর্তমানে ৪০টি বিমানপথ রহিয়াছে; ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২২,৪০০ কিলোমিটার।

১৯৩৯ সালে সিন্ধিয়া কোম্পানী এই দেশে বিমানপোত-নির্মাণের প্রথম কারখানা স্থাপনের জন্য সরকারের অনুমতি চাহিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকার নিজেদের শিল্পের স্বার্থে এই আবেদন অগ্রাহ্য করে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরেই যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইতে বৃটিশ সরকার এই দেশে বিমানপোত-নির্মাণের কারখানা স্থাপন করিতে বাধ্য হয়।

১৯৪০ সালে ভারতের একমাত্র বিমানপোত-নির্মাণ শিল্প স্থাপিত হয় বাঙ্গালোরে। এই কারখানার নাম Hindusthan Aircraft Factory। বিভিন্ন কারণে **বাঙ্গালোর** এই শিল্পের উপযোগী স্থান। পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এখানকার জলবায়ু শুষ্ক ও সমুদ্রের লবণাক্ত বায়ুর প্রভাবমুক্ত। এইরূপ জলবায়ু বিমানপোতের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। শিবসমুদ্রমের জলবিদ্যুৎ, ভদ্রাবতীর ইস্পাত, মহীশূরের বনভূমির কাঠ, কেরালার অ্যালুমিনিয়াম কারখানার

অ্যালুমিনিয়াম-পাত, স্থানীয় দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ বাঙ্গালোরে অবস্থিত হওয়ায় বৈজ্ঞানিক উপদেশ দ্বারা এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিতে পারে। পূর্বে বিমানপোতের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। বর্তমানে এই কারখানায় বিমানপোত-নির্মাণের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইতেছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ কারখানায় পরিণত হইবে এবং কোনপ্রকার যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানি করিবার প্রয়োজন হইবে না।

কয়েক বৎসর পূর্বে ভারত সরকার লণ্ডনের Percival Prentice Trainers Company-র নিকট হইতে এই শর্তে ৫০ খানা বিমানপোত ক্রয় করেন যে, উক্ত কোম্পানী লণ্ডনে এবং বাঙ্গালোরে এই সকল বিমানপোত নির্মাণ করিবে এবং ভারতীয় শিক্ষানবিশগণকে এই শিল্পে উপযুক্ত শিক্ষা দিবে। আশা করা যায়, এই ব্যবস্থার ফলে বহু ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার বিমানপোত নির্মাণে দক্ষতা অর্জন করিবে এবং ভারতীয় শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিবে। উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারের অভাব না হইলে ভারত এই শিল্পে উন্নতি লাভ করিবে সন্দেহ নাই। কারণ বিমানপোত-নির্মাণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভারতে বিদ্যমান। ভারত সরকার দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই শিল্পের উন্নতির জন্য ৩০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে।

অ্যালুমিনিয়াম শিল্প (The Aluminium Industry)

আধুনিক যান্ত্রিক যুগে অ্যালুমিনিয়াম একান্ত প্রয়োজন। এই ধাতু হাল্কা; ইহাতে মরিচা ধরে না; বিদ্যুৎ-পরিবহণে ইহা একান্ত প্রয়োজন। অ্যালুমিনিয়াম-পাতকে সহজেই বাঁকানো যায়। বিমানপোত-নির্মাণ সম্পূর্ণভাবে ইহার উপর নির্ভরশীল। ভারতে শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রধানতঃ বক্সাইট হইতে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হয় (৪২১ পৃষ্ঠা)। এক টন অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করিতে ৪ টন বক্সাইট, $\frac{1}{10}$ টন ক্র্যায়োলাইট, $\frac{1}{10}$ টন কস্টিক সোডা এবং ২৪,০০০ কিলোওয়াট্-ঘন্টা বিদ্যুৎ প্রয়োজন। ভারতে ক্র্যায়োলাইট পাওয়া না গেলেও ইহা গ্রীনল্যাণ্ড হইতে আমদানি করা হয়। ভারতে বক্সাইট পাওয়া যায় বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে।

অ্যালুমিনিয়াম শিল্পের উন্নতিতে সুলভ বিদ্যুৎ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। কারণ বক্সাইট হইতে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করিতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। সেইজন্য একমাত্র সুলভ জলবিদ্যুতের সাহায্যেই এই শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর। মোট উৎপাদন-খরচের এক-পঞ্চমাংশ বিদ্যুতের জন্য ব্যয় হয়।

ভারতে বিভিন্ন **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার** মারফত জলবিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে অ্যালুমিনিয়াম শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং নূতন নূতন কারখানা স্থাপিত হইতেছে। পরিকল্পনা কমিশন এই শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বিভিন্ন পরিকল্পনায় ইহার উন্নতির জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** উৎপাদন-ক্ষমতার লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে ৮৭,৫০০ টন। এই পরিকল্পনার কার্যকালে হীরাকুদ, আলয়ে এবং আসানসোল কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানো হইবে। ইহা ছাড়া রিহাণ্ড, কয়না ও সালেমে তিনটি নূতন কারখানা স্থাপন করা হইবে। এইভাবে তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালের শেষে অ্যালুমিনিয়াম-শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। ১৯৬৭ সালে ভারতে মোট ৫৩,৩৮৬ মেঃ টন অ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হয়।

অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের গতি ও লক্ষ্য (সহস্র টন)

১৯৫০-৫১	৩.৭	১৯৬০-৬১	১৮
১৯৫৫-৫৬	৭.৩	১৯৬৫-৬৬	৮০

উৎপাদক অঞ্চল—১৯৪৩ সালে কেরালার **আলয়ে** নামক স্থানে ভারতের প্রথম অ্যালুমিনিয়াম-কারখানা স্থাপিত হয়। পল্লীভাসালের সুলভ জলবিদ্যুৎ এই শিল্পের উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। প্রথমে কানাডা হইতে অ্যালুমিনা আনিয়া এই স্থানে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হইত। বর্তমানে, বিহারের মুরীতে প্রথমে বক্সাইট হইতে অ্যালুমিনা প্রস্তুত হইয়া আলয়ে প্রেরিত হয়; সেখানে অ্যালুমিনিয়াম-পিণ্ড প্রস্তুত হইয়া পুনরায় বেলুড়ে প্রেরিত হয়। বেলুড়ে অ্যালুমিনিয়াম-পাত হইতে নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে যায়। এই তিনটি কারখানার মালিক **ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম কোং লিঃ।** তিনবার মালপত্র আনা-নেওয়ার ফলে পরিবহণ-খরচ কিছুটা বেশী হইলেও আলয় অঞ্চলে সুলভ বিদ্যুৎ পাওয়া যায়

বসিয়া এই খরচ পোষাইয়া যায়। মহারাষ্ট্রের কালোয়া নামক স্থানে এই কোম্পানী একটি নূতন কারখানা স্থাপন করিয়াছে।

ভারতে দ্বিতীয় অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদক **অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ**। ইহার প্রধান কারখানা **আসানসোলের** নিকটবর্তী জে. কে. নগরে (অনুপনগর)। এখানে বক্সাইট হইতে অ্যালুমিনিয়াম-পিণ্ড, পাত ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়; এই শিল্পের অন্তর্গত সকল স্তরের কাজই এখানে হইয়া থাকে। সম্প্রতি এই কোম্পানীটি সম্বলপুরের নিকট **হীরাকুদে** ১০,০০০ টন উৎপাদনক্ষম একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছে; তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা হইবে ২০,০০০ টন। আসানসোলের কারখানায় D. V. C. হইতে এবং হীরাকুদের কারখানায় হীরাকুদ বাঁধ হইতে সুলভ জলবিদ্যুৎ পাওয়ায় এই দুইটি কারখানা প্রভূত উন্নতি লাভ করিতেছে।

বাণিজ্য—বিভিন্ন পরিকল্পনার ফলে ভারতে একদিকে যেমন অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্যদিকে শিল্পায়নের ফলে ইহার চাহিদা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫১ সালে ভারতে অ্যালুমিনিয়ামের চাহিদা ছিল মাত্র ১৫,০০০ টন; কিন্তু ১৯৬১ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] টনে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ঐ সালে এই দেশের মোট উৎপাদন ছিল মাত্র ১৮,০০০ টন। ইহার ফলে এখনও এই দেশকে অ্যালুমিনিয়াম আমদানি করিতে হইতেছে। চাহিদা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই আমদানির পরিমাণও বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৫১ সালে অ্যালুমিনিয়াম আমদানি হইয়াছিল ১০,৫০০ টন; ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৯ সালে ১৯,২০০ টনে দাঁড়ায়। তৃতীয় পরিকল্পনার উৎপাদন-লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিলে হয়তো ভারত অ্যালুমিনিয়াম শিল্পে স্বাবলম্বী হইবে। বর্তমানে কানাডা, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে প্রভৃতি দেশ হইতে অ্যালুমিনিয়ামের আমদানি করা হয়। সুলভ বিদ্যুতের উপর অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদন নির্ভরশীল বলিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সাফল্য লাভ করিলে ভারতে এই শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

কুটীরশিল্প (Cottage Industries)

প্রাচীনকালে ভারত কুটীরশিল্পে জগতে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ২০০ সালেও যে ভারতের উৎকৃষ্টশ্রেণীর বস্ত্র বিদেশে

রপ্তানি হইত তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। ভারতের 'কেলিকো' ও 'মসলিন' কাপড়ের কথা জগতের কে না জানে? এই সকল বস্ত্র ও অন্যান্য বহু দ্রব্য সেই যুগে কুটীরশিল্পেই প্রস্তুত হইত।

গতিশীল জগতে কুটীরশিল্পের সংজ্ঞা ক্রমশঃই পরিবর্তিত হইতেছে। কোন গৃহস্থ পরিবারে এক বা একাধিক ব্যক্তি দ্বারা কোনপ্রকার জড়শক্তির সাহায্য ছাড়া যে শিল্প সৃষ্টি হইত, তাহাকেই পূর্বে কুটীরশিল্প বলা হইত। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে জড়শক্তি কুটীরশিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিতেছে। জাপানের অধিকাংশ কুটীরশিল্প বিদ্যুতের সাহায্যে চালানো হয়। ভারতের শক্তিচালিত তাঁতশিল্প কুটীরশিল্প হইলেও বিদ্যুতের সাহায্যে ইহা চালিত হয়। সুতরাং আধুনিক যুগে অল্প কয়েকজন লোক মিলিয়া যদি ছোটখাটো শক্তিচালিত যন্ত্রের সাহায্যে কোন জিনিস প্রস্তুত করে, তাহাকেও কুটীরশিল্প বলা হইবে।

প্রাচীনকালে ভারত কুটীরশিল্পে উন্নতি লাভ করিলেও বৃটিশশাসনে এই শিল্পের পতন আরম্ভ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজগণ এই দেশে বৃটেনের শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের চেষ্টা করে এবং সেইজন্য ভারতীয় কুটীর-শিল্পের ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করে।

কিন্তু ভারতের কুটীরশিল্পকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা ইংরেজগণের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। এখনও ভারতের কুটীরশিল্পে প্রায় ২ কোটি লোক নিযুক্ত আছে। ভারতের মোট কার্পাস-বস্ত্র উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ এখনও কুটীরশিল্পে উৎপন্ন হয়। ভারতের কুটীরশিল্পে নানাবিধ জিনিস প্রস্তুত হয়। এক একটি রাজ্য কোন কোন বিশেষ কুটীরশিল্পের জন্য বিখ্যাত। যেমন,

রাজ্য	উল্লেখযোগ্য কুটীরশিল্প
আসাম	তাঁত (কার্পাস ও রেশম), বাক্স
অন্ধ্র	কার্পেট, তাঁতশিল্প, হস্তশিল্প
বিহার	তাঁত (কার্পাস ও রেশম)
উত্তরপ্রদেশ	গুড়, খাণ্ডসারী, তাঁত, উদ্ভিজ্জ তৈল, কার্পেট ও হস্তশিল্প
কেরালা	নারিকেলের দড়ি, তাঁত ও সুতা-বয়ন
মাদ্রাজ	তাঁত (কার্পাস ও রেশম), বিড়ি
রাজস্থান	বাসন, পাথর, তাঁত (কার্পাস), হস্তশিল্প
উড়িষ্যা	তাঁত ও হস্তশিল্প
পাঞ্জাব	তাঁত (পশম), খেলাধূলার সামগ্রী, ঘি

রাজ্য	উল্লেখযোগ্য কুটীরশিল্প
পশ্চিমবঙ্গ	তাঁত (কার্পাস ও রেশম) ; চাউল-প্রস্তুত, হস্তশিল্প, বিড়ি
মধ্যপ্রদেশ	তাঁত (কার্পাস ও রেশম)
মহারাষ্ট্র	চর্মশিল্প, খাণ্ডসারী, তাঁত ও হস্তশিল্প
গুজরাট	ঘি, লবণ, হস্তশিল্প, তাঁতশিল্প

ইহা ছাড়া পাটের দড়ি, বাঁশের জিনিসপত্র, বেতের জিনিসপত্র, মৃৎপাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া চাষীরা ও কৃষিশ্রমিকগণ তাহাদের অবসর সময়ে কিছু উপার্জন করে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। শতকরা ৭০ জন লোক কৃষক। ইহারা বৎসরের কয়েক মাস কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকে। বাকি কয়েক মাস ইহাদের কোন কাজ থাকে না। সেই সময় ইহারা বিভিন্ন কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিলে ইহাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন হয় এবং এইজন্য দ্রব্যাদির উৎপাদন-খরচও কম পড়ে।

সমস্যা—ভারতে কুটীরশিল্পের প্রভূত উন্নতির সম্ভাবনা আছে কিন্তু কয়েকটি সমস্যা বিদ্যমান থাকায় এই শিল্প আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ, কুটীরশিল্পের দ্রব্যাদি বিক্রয়ের কোন সুবন্দোবস্ত নাই; ইহার ফলে কর্মিগণ দ্রব্যের বাজার সম্বন্ধে সন্দিহান হয় এবং চাহিদা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকায় উৎপাদন ব্যাহত হয়। দ্বিতীয়তঃ, কুটীর-শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইলে জাপানের মতো গ্রামাঞ্চলে সুলভ বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু এখনও ভারতের অধিকাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে নাই। তৃতীয়তঃ, কুটীরশিল্পে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব দেখা যায়। ফলে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়। চতুর্থতঃ, শিল্প-কারখানায় কাজ করিলে যেমন মাসে মাসে মাহিনা পাওয়া যায়, কুটীরশিল্পে সেরূপ কোন আশ্বাস নাই বলিয়া বহু কর্মী এই শিল্প পরিত্যাগ করিয়া কারখানায় কাজ লইয়াছে। পঞ্চমতঃ, অবসর সময়ে কাজ করিয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুতের সাংগঠনিক কোন কর্মসূচী না থাকায়, কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন-খরচ বেশী হইয়া থাকে এবং ইহার ফলে আধুনিক শিল্পজাত দ্রব্যাদির সঙ্গে কুটীরশিল্প প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না। ষষ্ঠতঃ, এই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সর্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় না।

স্বাধীনতার পরে এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করে। প্রথমতঃ, কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য সরকার তিনটি বোর্ড গঠন করে—সর্ব-ভারতীয় তাঁতশিল্প বোর্ড (All-India Handloom Board), সর্ব-ভারতীয় খাদি ও গ্রামোদ্যোগ বোর্ড (All-India Khadi and Village Industries Board) এবং সর্ব-ভারতীয় হস্তশিল্প বোর্ড (All-India Handicrafts Board)। তাঁতশিল্প সম্বন্ধে সরকারকে উপদেশ দেওয়ার জন্য এবং তাঁতশিল্পের উন্নতির পরিকল্পনা করিবার জন্য ১৯৫২ সালে তাঁতশিল্প বোর্ড গঠিত হয়। তাঁতবস্ত্র বিক্রয় ও রপ্তানি বৃদ্ধির বন্দোবস্তও এই বোর্ড করিয়া থাকে। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ বোর্ডের সৃষ্টি হয় ১৯৫৩ সালে। খাদি ও গ্রাম্য-শিল্পের উন্নতি এবং খাদি-বস্ত্রের বিক্রয় বাড়ানো এই বোর্ডের প্রধান কাজ। হস্তশিল্প বোর্ডের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫২ সালে। জুতা, চর্মদ্রব্য, চর্মসংস্কার প্রভৃতি ১০টি হস্তশিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য এই বোর্ডের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, সরকার সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে কুটীরশিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। সমবায় সংস্থাসমূহকে এই শিল্পের উন্নতির জন্যই যথেষ্ট অর্থ সাহায্য ও কারিগরী সাহায্য দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এইজন্য সরকার সৃষ্টি করিয়াছে National Small Industries Corporation। এই সংস্থা কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্পের নানাবিধ দ্রব্যাদি দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বিক্রয়ের জন্য চেষ্টা করে। প্রদর্শনী খুলিয়া ইহার মাধ্যমে কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রচার করা হয়। তৃতীয়তঃ, কয়েকটি দ্রব্যের ব্যাপারে কুটীরশিল্পকে একচেটিয়া উৎপাদন-ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। যেমন, নির্দিষ্ট কয়েক প্রকারের বস্ত্র আধুনিক কাপড়ের কলে প্রস্তুত হইতে পারে না—শুধু তাঁতশিল্পের জন্য ইহা সংরক্ষিত আছে। চতুর্থতঃ, বিভিন্ন বহুমুখী পরিকল্পনায় যে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে তাহা যাহাতে সুদূর গ্রামাঞ্চলে পৌঁছিতে পারে তাহার চেষ্টা হইতেছে। পঞ্চমতঃ, ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 'শিল্প-তালুক' (Industrial estates) সৃষ্টি করা হইয়াছে। এখানে সরকার শিল্পের জন্য ঘর, বিদ্যুৎ, জল, পরিবহণ-ব্যবস্থা প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করিয়া থাকে। ধারে বা কিস্তিতে যন্ত্রপাতি কিনিবার ব্যবস্থা করে National Small Industries Corporation। ষষ্ঠতঃ, শিল্পজাত দ্রব্যাদির উপর সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে ছাড় (Rebate) দেওয়ায় বিক্রয়ের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মারফত সরকার কুটীরশিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথম পরিকল্পনায় এই শিল্পের উন্নতির জন্য ৪৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এই পরিকল্পনায় পূর্বে বর্ণিত (৪৮২ পৃষ্ঠা) তিনটি বোর্ড স্থাপন করিয়া কুটীরশিল্পের উন্নতির চেষ্টা করা হয়; এই পরিকল্পনার ফলে কুটীরশিল্পে নিযুক্ত সমবায়ের সংখ্যা ৭,১০৫ হইতে বাড়িয়া ১৫,৩০০ হয়। এই সকল সমবায়ের অধিকাংশ তাঁত, তালগুড়, চর্ম, রেশম প্রভৃতি শিল্পে নিযুক্ত। তাঁতশিল্প সম্বন্ধে ৪৪৭ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হয়। গ্রাম্যশিল্প, রেশমশিল্প, দড়িশিল্প, হস্তশিল্প প্রভৃতির উন্নতির জন্য, কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের জন্য এবং National Small Industries Corporation-এর মারফত আর্থিক সাহায্যের জন্য এই পরিকল্পনার প্রায় ১৭৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য নানাবিধ পন্থা অবলম্বনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ব্যয়বরাদ্দ ধার্য হইয়াছে ৩৬৪ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে খাদি ও গ্রাম্য শিল্পের জন্য ৯২'৪ কোটি টাকা, তাঁতশিল্পের জন্য ৩৪ কোটি টাকা, ক্ষুদ্র শিল্পের (Small Scale Industries) জন্য ৮৪'৬ কোটি টাকা এবং শিল্প তালুকের জন্য ৩০'২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই শিল্পের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করা হইয়াছে:—(১) কারিগরী সাহায্য দিয়া কর্মীদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হইবে। (২) ঋণ দিবার এবং কিস্তিতে যন্ত্রপাতি দেওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হইবে। (৩) অর্থসাহায্য (Subsidy) ও ছাড়ের (Rebate) পরিমাণ কমাইয়া শিল্পকে স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টা হইবে। (৪) গ্রামাঞ্চলে ও ছোট শহরে শিল্প প্রসারের বন্দোবস্ত করা হইবে। (৫) বৃহদাকার শিল্পের সাহায্যকারী হিসাবে কুটীরশিল্পের প্রসার করা হইবে। (৬) শিল্প-সমবায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। (৭) ৩০০টি শিল্প তালুক খোলা হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এইসব ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে অতিরিক্ত ৮০ লক্ষ লোক অবসর সময়ের কাজ পাইবে এবং ৯ লক্ষ লোক পুরা সময়ের কাজ পাইবে। এই পরিকল্পনায় দড়ি, জুতা, তাঁত-বস্ত্র, হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিয়া প্রতিবৎসর ২১ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

পরিবহণ-ব্যবস্থা
(Transport System)

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পরিবহণ-ব্যবস্থা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। একস্থান হইতে অন্যস্থানে দ্রুত যাতায়াতের জন্য এবং দ্রুত পণ্যদ্রব্য ও ডাক পরিবহণের জন্য পরিবহণ-ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। বৃটিশ রাজত্বে পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হইয়াছিল দেশ-শাসনের সুবিধার জন্য, ভারত হইতে কাঁচামাল বৃটেনে লইয়া যাইবার জন্য এবং বৃটেন হইতে এদেশে শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানির জন্য। কিন্তু স্বাধীনতার পর এই দেশ শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হইতেছে। সাধারণ মানুষ যাহাতে সহজে একস্থান হইতে অন্যস্থানে ভালোভাবে যাইতে পারে, যাহাতে দ্রুত মালপত্র প্রেরণ করিয়া শিল্পের অগ্রগতিতে সাহায্য করা যায়, ইহাই বর্তমান সরকারের প্রধান পরিবহণ-নীতি। সেইজন্য নূতন নূতন রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মিত হইতেছে, সমুদ্রপথে যাতায়াতের জন্য জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, রেল-ইঞ্জিন ও বিমানপোত নির্মাণের সুবন্দোবস্ত হইতেছে, রেলপথের পুনর্বিন্যাস হইতেছে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হইতেছে; পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ৪৭৬ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১,২৪১ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে; তৃতীয় পরিকল্পনায় এইজন্য ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে ১,৩৯৫ কোটি টাকা।

ভারতে প্রধানতঃ চার শ্রেণীর পরিবহণ-ব্যবস্থা বিদ্যমান :—রাজপথ, রেলপথ, জলপথ ও বিমানপথ। রাজপথে মোটর-গাড়ী, ট্রামগাড়ী, গরু-মহিষাদির গাড়ী প্রভৃতির সাহায্যে মানুষ ও পণ্যদ্রব্য পরিবাহিত হইয়া থাকে। জলপথকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—আভ্যন্তরীণ জলপথ ও সামুদ্রিক জলপথ। সকল প্রকারের পরিবহণ-ব্যবস্থারই দোষ ও গুণ উভয়ই বিদ্যমান। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। বিভিন্ন পরিবহণ-ব্যবস্থার খরচের উপরও ইহার ব্যবহার বহুলাংশে নির্ভরশীল।

ভারতে রেলপথের প্রধান সমস্যা এই যে, ইহার ভাড়া অত্যন্ত বেশী; আভ্যন্তরীণ জলপথের ভাড়া ইহার তুলনায় অনেক কম। এমনকি কোন

কোন ক্ষেত্রে মোটর-পথে রেলপথ অপেক্ষাও ভাড়া কম। বর্তমানে প্রচুর পারমাণে কয়লা অল্পদূরের স্থানসমূহে মোটর-পথে প্রেরিত হইতেছে। রেলপথ-সমূহকে দেশের অভ্যন্তরে লওয়া যায় না; কারণ ইহাতে রেলপথ-নির্মাণের খরচ সবসময় পোষায় না। সেইজন্য অভ্যন্তরস্থ গ্রাম্য অঞ্চলের পরিবহণ-ব্যবস্থায় মোটর-গাড়ী, নৌকা ও স্টীমার ব্যবহৃত হওয়া উচিত। রেলগাড়ী নির্দিষ্ট পথে ও সময়ে চলে; কিন্তু মোটর-গাড়ী যে-কোন সময়ে যে-কোন রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতে পারে। গুরুভার দ্রব্যাদির পরিবহণে জলপথ সর্বাপেক্ষা কার্যকরী; কারণ ধীরগামী হইলেও জলপথে ভাড়া সর্বাপেক্ষা কম। দ্রুত পরিবহণের জন্য বিমানপথ, মোটরপথ ও রেলপথের সাহায্য লইতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যধিক ভাড়ার জন্য বিমানপথের সুযোগ লওয়া সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য ভারতে মোটরপথ ও রেলপথ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবহণ-ব্যবস্থা। লঘু ভার এবং দ্রুত পচনশীল দ্রব্যাদির পক্ষে রেলপথ ও মোটরপথই শ্রেষ্ঠ পরিবহণ-ব্যবস্থা। কিন্তু ভারতে চাহিদার তুলনায় রেলপথের সম্প্রসারণ হয় নাই। সেইজন্য দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য আভ্যন্তরীণ নদী ও খালপথ এবং মোটরপথের উন্নতি সাধন করাও একান্ত প্রয়োজন।

রাজপথ (Roadways)

ভারতের সভ্যতা অত্যন্ত প্রাচীন। সভ্যতার নিত্যসঙ্গী রাস্তাঘাট ও যাতায়াতের সুব্যবস্থা; সুতরাং ভারতে যে প্রাচীনকাল হইতেই রাস্তাঘাট বিদ্যমান ছিল, ভারতের বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। মোগল ও পাঠান রাজত্বের সময়ও ভারতের রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়। বৃটিশ রাজত্বকালে রাস্তাঘাট নূতনভাবে বিশেষ কিছু নির্মিত হয় নাই, শুধু ইহার সংস্কার ও পরিবর্ধন হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে নাগপুরে ভারতের রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য একটি পরামর্শ সভা হয়। নাগপুরের এই সভায় যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তাহা শেষপর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই। স্বাধীনতার সময় এই দেশের রাস্তাঘাটের পরিমাণ দেশের আয়তনের তুলনায় নগণ্য ছিল।

নূতনভাবে রাস্তাঘাটের নির্মাণ পুনরায় আরম্ভ হয় স্বাধীনতার পর বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে। এই সকল পরিকল্পনায় 'নাগপুর পরিকল্পনাকে' ভিত্তি করিয়া রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধনের চেষ্টা হয়। ইহা ছাড়া পুরাতন রাস্তাঘাটের সংস্কার ও বহু সেতুনির্মাণও এই সকল পরিকল্পনার

অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় ৩৩টি বৃহদায়তনের সেতু নির্মিত হয়, এবং বহু নূতন রাস্তা নির্মিত হয়। ইহার জন্য মোট ব্যয় হয় ১৪৭ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বহু নূতন রাস্তা ও ৬০টি বৃহদায়তনের সেতু নির্মিত হয় এবং ২,৭০০ কিলোমিটার রাস্তার সংস্কার সাধন করা হয়। ইহার জন্য মোট খরচ হইয়াছে ২২৪ কোটি টাকা। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের রাজপথে ১,৬৯৬ কোটি টন-কিলোমিটার পরিমিত মালপত্র এবং ৪,৮০০ কিলোমিটার যাত্রী পরিবাহিত হয়। বর্তমানে ভারতে পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য ২,৩১,৮০০ কিলোমিটার এবং কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য ৪,০২,৫০০ কিলোমিটার। ইহার মধ্যে জাতীয় রাজপথের (National Highways) দৈর্ঘ্য ২৪,০০০ কিলোমিটার।

তৃতীয় পরিকল্পনায় রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য ৩২৪ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার কার্যকালে নূতন ৪০,০০০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্মিত হইবে। জাতীয় রাজপথসমূহের উন্নতি[illegible]নও এই পরিকল্পনার অঙ্গীভূত।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। সুতরাং গ্রামাঞ্চলের সহিত বাণিজ্যকেন্দ্রের সংযোগ সাধন থাকা প্রয়োজন। ইহা একমাত্র রাস্তার উন্নতিসাধনের দ্বারাই সম্ভব। শিল্পের উন্নতির জন্যও রাস্তাঘাটের প্রয়োজ[illegible]াঞ্চল হইতে কাঁচামাল আনিতে এবং গ্রামাঞ্চলে শিল্পজাত দ্রব্যাদি পৌঁছাইয়া দিতে রাস্তাঘাটের প্রয়োজন।

ভারতের রাস্তাসমূহকে প্রধানতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত করা যায়—জাতীয় রাজপথ, প্রাদেশিক রাজপথ, জেলাপথ ও গ্রাম্যপথ। জাতীয় রাজপথসমূহ পাকা রাস্তা এবং দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রাজপথ কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে থাকে। প্রাদেশিক রাজপথ রাজ্যের বিভিন্ন শহর ও জাতীয় রাজপথের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। এই রাজপথ রাজ্যের এক জেলা হইতে অন্য জেলা পর্যন্ত গিয়া থাকে। জেলাপথসমূহ জেলার অভ্যন্তরে বা অন্য জেলার সহিত যোগাযোগের জন্য নির্মিত হয়, ইহা জেলাবোর্ডের অধীন। গ্রাম্য রাস্তাসমূহ প্রধানতঃ গ্রামের মধ্যে চলাচলের জন্য ও গ্রামের চারিদিকের গন্তব্যস্থানে যাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ভারতে প্রধানতঃ **পাঁচটি জাতীয় রাজপথ** বিদ্যমান। প্রথমটি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড; ইহা কলিকাতা হইতে বারাণসী, এলাহাবাদ, দিল্লী ও

পাকিস্তানের পেশোয়ার হইয়া খাইবার গিরিপথ পর্যন্ত গিয়াছে। দ্বিতীয়টি কলিকাতা-মাদ্রাজ রাজপথ; ইহা কলিকাতা হইতে কটক, বিশাখাপতনম্, বেজোয়াদা ও নেলোর হইয়া মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়াছে। তৃতীয়টি মাদ্রাজ-বোম্বাই রাজপথ; ইহা মাদ্রাজ হইতে বাঙ্গালোর, হুবলী ও পুনা হইয়া বোম্বাই শহর পর্যন্ত গিয়াছে। চতুর্থটি বোম্বাই-দিল্লী রাজপথ; ইহা বোম্বাই শহর হইতে ইন্দোর, ঝান্সী ও আগ্রা হইয়া দিল্লী পর্যন্ত গিয়াছে। পঞ্চমটি কলিকাতা হইতে নাগপুর হইয়া বোম্বাই পর্যন্ত গিয়াছে। ভারতের জাতীয় রাজপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪,০০০ কিলোমিটার। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রায় ১,১০০ কিলোমিটার নূতন জাতীয় রাজপথ নির্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে জম্মু-শ্রীনগর রাজপথ ও জহর-সুড়ঙ্গ এবং রায়গঞ্জ (পশ্চিমবঙ্গ) হইতে ডালখোলা (বিহার) পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাতীয় রাজপথ অপেক্ষা ভারতের প্রাদেশিক রাজপথ ও গ্রাম্য রাস্তার দৈর্ঘ্য অনেক বেশী।

ভারতে প্রাচীনকাল হইতেই **সীমান্ত পথের** (Frontier Routes) মারফত বাণিজ্য চলিতেছে। বর্তমানে সীমান্ত পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪,৮০০ কিলোমিটার। ভারত হইতে উত্তর বা পূর্ব সীমান্তের দেশসমূহে যাইবার জন্য কোন রেলপথ নাই। সেইজন্য সীমান্ত পথের মাধ্যমেই যাতায়াত করিতে হয়। চমরী গাই, [illegible] ঘোড়া, উষ্ট্র প্রভৃতিতে চড়িয়া এই পথ অতিক্রম করিতে হয়। কাশ্মীরের লেহ্ হইতে একটি সীমান্ত পথ চীনের তিব্বত ও সিংকিয়াং পর্যন্ত গিয়াছে। প্রায় ৫,৫০০ মিটার উচ্চ কারাকোরাম গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া এই পথ চলিয়া গিয়াছে। দার্জিলিং, নৈনিতাল ও চেতিয়া হইতে তিব্বতে যাইবার সীমান্ত পথ আছে। এই সকল পথের মাধ্যমে বাণিজ্য সংঘটিত হয়। আসামের লেডো হইতে স্টিলওয়েল রোড (লেডো-বার্মা রোড) ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া চীনের কুনমিং পর্যন্ত গিয়াছে। লেডো হইতে এই পথের মাধ্যমে কুনমিং-এর দূরত্ব প্রায় ১,৬৮০ কিলোমিটার। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রেলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য সংঘটিত হইয়া থাকে।

ভারতে আয়তন ও প্রয়োজনের তুলনায় এখনও রাস্তাঘাটের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। এখনও প্রতি ১ লক্ষ লোকের জন্য এই দেশে মাত্র ৫ কিলোমিটার রাস্তা আছে; কিন্তু প্রতি ১ লক্ষ লোকের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪,০০০ কিলোমিটার; ফ্রান্সে ১,৫০০ কিলোমিটার এবং বৃটেনে ৬৪০ কিলোমিটার রাস্তা আছে। এই দেশের অধিকাংশ রাস্তায় বহু ত্রুটি দেখা

যায়। পার্বত্য অঞ্চলে প্রশস্ত রাস্তা নাই বলিলেই চলে। অধিকাংশ রাস্তাই অতি সংকীর্ণ। বহু রাস্তার অন্তর্বর্তী নদীর উপর এখনও সেতু নির্মিত না হওয়ায় রাস্তাসমূহ বিশেষ কার্যকরী হয় না। বহুক্ষেত্রে রাস্তাসমূহ সংস্কারের অভাবে অকেজো হইয়া যায়।

রাজপথ প্রকৃতপক্ষে রেলপথের প্রতিযোগী নহে; উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। রেলপথ প্রধানত: দীর্ঘ পথ অতিক্রমণের সহায়ক। রাজপথ-সমূহ গ্রামাঞ্চল হইতে রেলপথ পর্যন্ত যোগাযোগ-ব্যবস্থা বজায় রাখে। অল্প দূরত্বের ব্যাপারে রাজপথ অধিকতর কার্যকরী। সুতরাং ভারতের পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে রেলপথ ও রাজপথ উভয়েরই উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন।

রেলপথ (Railways)

আধুনিক যুগে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। বৃটিশ রাজত্বের পূর্বে এই দেশে কোন রেলপথ ছিল না। দেশ-শাসনের সুবিধার জন্য, বিদ্রোহ দমনের জন্য, এই দেশের কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানির জন্য, বন্দরে লইয়া যাইবার জন্য বৃটিশ সরকার এদেশে ১৮৫৩ সালে প্রথম রেলপথ স্থাপন করেন; বোম্বাই হইতে থানা পর্যন্ত প্রথমে ৩২ কিলোমিটার রেল-লাইন স্থাপিত হয়। রেলপথের অভাবে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিতে বৃটিশ সরকারকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সেইজন্য ১৯৫৭ সালের পর সরকার রেলপথের উন্নতির জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেন। ক্রমে ক্রমে বৃটেন হইতে বিভিন্ন রেলকোম্পানীর আগমন হইল। যথা, E. I. Railway Co., B. N. Railway Co., M. S. M. Railway Co. ইত্যাদি। এই সকল রেল কোম্পানী এদেশ হইতে প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠন করিয়া বৃটেনে লইয়া যাইত। পরে বৃটিশ সরকার দুই-একটি করিয়া রেলপথের জাতীয়করণ করিতে সুরু করেন।

দেশ স্বাধীন হইবার পর সকল বড় রেলপথসমূহের জাতীয়করণ হয়। জাতীয়করণের পর ১৯৫১-৫২ সালে ভারত সরকার **রেলপথসমূহের পুনর্বিন্যাস (Re-grouping of Railways)** সাধন করে এবং সমগ্র রেলপথকে ৮টি রেলপথে বিভক্ত করে। ইহার পর ১৯৬৫ সালে পুনরায় দক্ষিণ ও মধ্য রেলপথকে পুনর্বিন্যাস করিয়া আরও একটি রেলপথের সৃষ্টি

হয়।* এই পুনর্বিন্যাসের ফলে অনেক সুবিধা দেখা গিয়াছে। বর্তমানে প্রতিটি রেলপথ-অঞ্চল এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এলাকা। ইহার ফলে পরিচালনার ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে, এবং রেলপথের দক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'গেজ' হিসাবে রেলপথকে ভাগ করিলে দেখা যাইবে যে, একটি রেলপথে সাধারণতঃ একপ্রকার গেজের আধিক্য বেশী। পূব, দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ-মধ্য ও মধ্য রেলপথে ব্রড গেজের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব রেলপথে মিটার গেজের পথ বেশী।

ভারতের অধিকাংশ রেলপথের জাতীয়করণ হইলেও, বর্তমানে ৭২৮ কিলোমিটার রেলপথ বে-সরকারী মালিকানায় ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। সরকারী রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৭,০০০ কিলোমিটার। ভারতের রেলপথে সাধারণতঃ তিনপ্রকার গেজ দেখা যায়—ব্রড গেজ, মিটার গেজ ও ন্যারো গেজ। রেলপথের পুনর্বিন্যাসের ফলে বর্তমানে ৯টি রেলপথের সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নে ইহাদের বিবরণ দেওয়া হইল:

(১) **পূর্ব রেলপথ** (Eastern Railway)—এই রেলপথটির দৈর্ঘ্য ৩,৭১৪ কিলোমিটার; ইহার সদর দপ্তর **কলিকাতা**। হাওড়া-বর্ধমান-মোগলসরাই, হাওড়া-কিউল, শিয়ালদহ-লালগোলাঘাট, শিয়ালদহ-পূর্ব-পাকিস্তান-সীমান্ত, শিয়ালদহ-ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি এই রেলপথের অন্তর্ভুক্ত। ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লাখনি, বিহারের অভ্রখনি চিত্তরঞ্জনের রেল-কারখানা, সিন্ধ্রির সার-কারখানা, বার্নপুর ও দুর্গাপুরের ইস্পাত-কারখানা, কলিকাতা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি ও কলিকাতার নিকটবর্তী কাগজ, বস্ত্র, পাট, মোটর-গাড়ী, চর্মদ্রব্য, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি শিল্প এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল।

(২) **দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ** (South Eastern Railway)—এই রেলপথটির দৈর্ঘ্য ৫,৪৭৭ কিলোমিটার; সদর দপ্তর **কলিকাতা**। হাওড়া-টাটানগর (জামসেদপুর)-রাউরকেলা-ভিলাই-নাগপুর, হাওড়া-কটক-পুরী-ওয়ালটেয়ার, হাওড়া-গোমো এবং টাটানগর-আদ্রা-আসানসোল প্রভৃতি এই রেলপথের উল্লেখযোগ্য লাইন। কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ, চুনাপাথর প্রভৃতি খনি অঞ্চল হইতে তিনটি ইস্পাত-কারখানায় (ভিলাই, রাউরকেলা ও টাটানগর) লইয়া যাওয়া এই রেলপথের অন্যতম প্রধান কাজ। পশ্চিমবঙ্গ,

* Ref. Amrita Bazar Patrika dated 24. 12. 1964.

উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ এই রেলপথের অন্তর্ভুক্ত। উড়িষ্যার কাগজ, সিমেণ্ট ও অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, কলিকাতা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি, অভ্র ও লৌহ-রপ্তানি প্রভৃতি এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল।

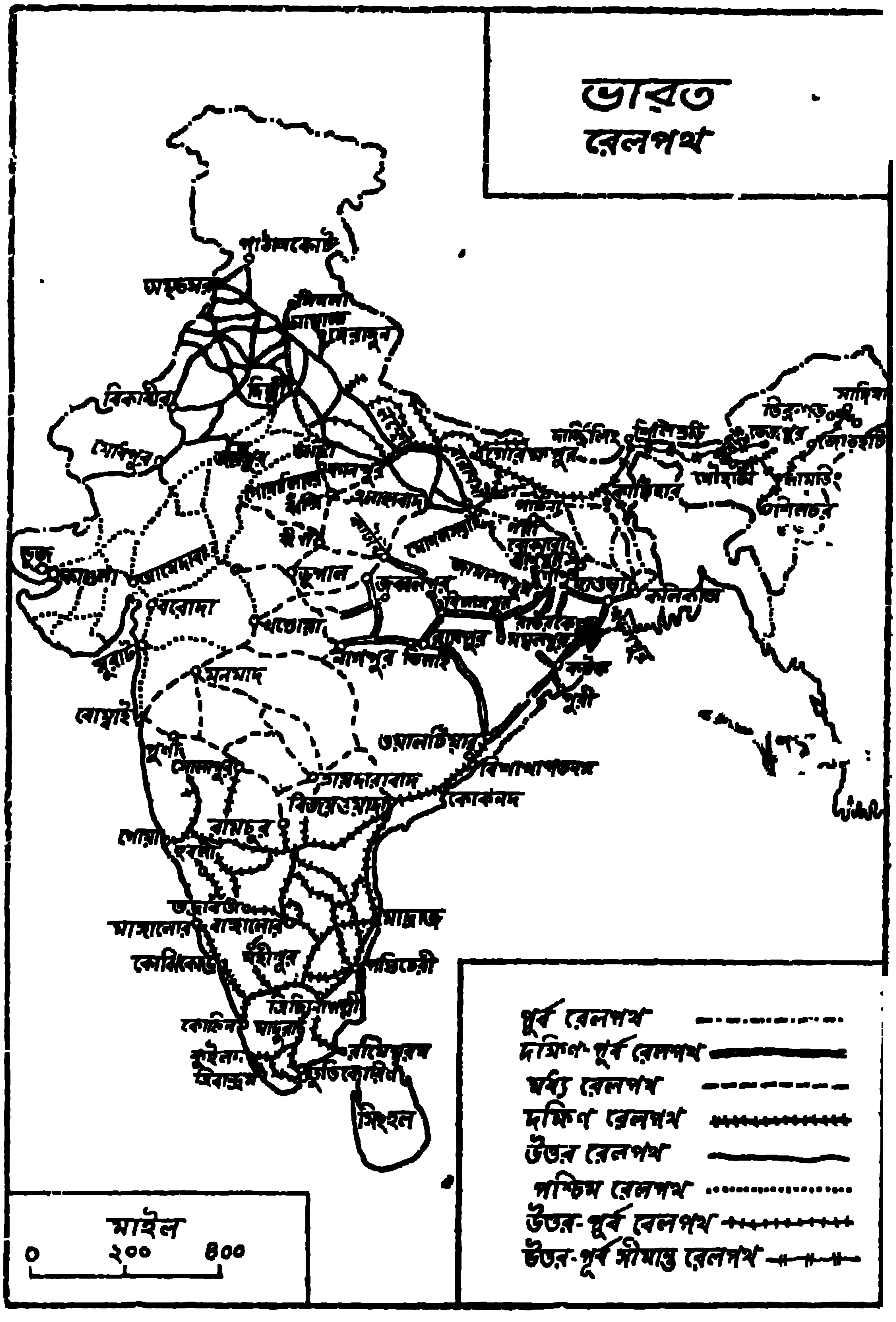

সম্প্রতি 'দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ' নামে একটি নূতন রেলপথ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

(৩) **উত্তর রেলপথ (Northern Railway)**—এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ১০,১৪১ কিলোমিটার; ইহার সদর দপ্তর দিল্লী। পাঞ্জাব, হিমাচল-

প্রদেশ, দিল্লী এবং রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের কিয়দংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রধান লাইনসমূহ: দিল্লী-আম্বালা-অমৃতসর, দিল্লী-সিমলা, দিল্লী-এলাহাবাদ-মোগলসরাই, দিল্লী-ভাটিণ্ডা-ফিরোজপুর, দিল্লী-যোধপুর-পশ্চিম পাকিস্তান প্রভৃতি। গম, তুলা, পশম, তৈলবীজ, চর্ম, চিনি প্রভৃতি এই রেলপথ পরিবহণ করিয়া থাকে। দিল্লী ও কানপুরের কার্পাসবয়ন শিল্প, কানপুরের চর্ম-শিল্প ও পশমশিল্প এবং উত্তরপ্রদেশের চিনিশিল্প এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল।

(৪) **উত্তর-পূর্ব রেলপথ (North Eastern Railway)**—ইহার দৈর্ঘ্য ৪,৮৯৬ কিলোমিটার; সদর দপ্তর **গোরক্ষপুর**। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের উত্তরাংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। গোরক্ষপুর-বারাণসী-এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর-কাটিহার, গোরক্ষপুর-লক্ষ্ণৌ-কানপুর প্রভৃতি এই রেলপথের উল্লেখযোগ্য লাইন। এই রেলপথ এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও বারাণসীতে উত্তর রেলপথের সহিত এবং কাটিহারে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইক্ষু, চিনি, পাট, চাউল, ফল, সিমেণ্ট, কাষ্ঠ প্রভৃতি এই রেলপথ পরিবহণ করিয়া থাকে। এই অঞ্চলের শ্রমশিল্পের মধ্যে চিনিশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৫) **উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ (North-Eastern Frontier Railway)**—ইহার দৈর্ঘ্য ২,৭৮১ কিলোমিটার; সদর দপ্তর **পাণ্ডু**। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এই রেলপথের অন্তর্গত। মনিহারিঘাট হইতে ইহার প্রধান লাইন কাটিহার, শিলিগুড়ি, আলিপুর দুয়ার, পাণ্ডু ও তিনসুকিয়া হইয়া সাইখোয়াঘাট পর্যন্ত গিয়াছে। একটি লাইন লামডিং হইতে শিলচর পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরবঙ্গ ও আসামের চা এবং ডিগবয়ের খনিজ তৈল এই রেলপথের প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য। ইহা ছাড়া পাট, ফল, ইক্ষু, ধান, কাঠ প্রভৃতি এই রেলপথে পরিবাহিত হয়। হাওড়া (কলিকাতা) হইতে উত্তরবঙ্গ হইয়া আসামে যাইতে হইলে প্রথমে পূর্ব রেলপথে সাহেবগঞ্জ হইয়া সকরিগলিঘাটে যাইতে হইবে। পরে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া মনিহারিঘাট হইতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথে উত্তরবঙ্গ বা আসামে যাওয়া যায়। মনিহারিঘাট হইতে পাণ্ডু পর্যন্ত এই রেলপথকে **আসাম লিঙ্ক (Assam link)** বলা হয়।

(৬) **পশ্চিম রেলপথ (Western Railway)**—ইহার দৈর্ঘ্য ৯,৬২১ কিলোমিটার; সদর দপ্তর **বোম্বাই**। গুজরাট, উত্তর মহারাষ্ট্র,

রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ এই রেলপথের অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রধান লাইনসমূহ : বোম্বাই-আমেদাবাদ-ভিরমগাম, বোম্বাই-বরোদা-আগ্রা, বোম্বাই-আমেদাবাদ-জয়পুর-দিল্লী, দিশা-গান্ধীগ্রাম-কাণ্ডলা ইত্যাদি। বোম্বাই, আমেদাবাদ ও বরোদার কার্পাসবয়ন শিল্পে এই রেলপথের দান অসামান্য। গুজরাটের লবণ ও রাসায়নিক শিল্প, বোম্বাই ও কাণ্ডলা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল।

(৭) **মধ্য রেলপথ (Central Railway)**—এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ৮,৪৭৩ কিলোমিটার ; সদর দপ্তর **বোম্বাই**। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, মহীশূর ও মাদ্রাজের কিয়দংশ এই রেলপথের অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রধান লাইনসমূহ : বোম্বাই-ভূপাল-ঝাঁসী-দিল্লী, বোম্বাই-পুনা-রায়চুর, বোম্বাই-নাগপুর ইত্যাদি। তুলা, ম্যাঙ্গানিজ, কাষ্ঠ, তৈলবীজ, গম, চিনি, চর্মদ্রব্য প্রভৃতি এই রেলপথ পরিবহণ করে। বোম্বাই বন্দরের আমদানি-রপ্তানি, বোম্বাই-এর কার্পাস-শিল্প, মধ্যপ্রদেশের সিমেণ্টশিল্প প্রভৃতি ঐ রেলপথের উপর নির্ভরশীল।

(৮) **দক্ষিণ রেলপথ (Southern Railway)**—ইহার দৈর্ঘ্য ৯,৭৬০ কিলোমিটার ; সদর দপ্তর **মাদ্রাজ**। মহীশূর, কেরালা, অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ এই রেলপথের অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রধান লাইনসমূহ : মাদ্রাজ-নেলোর-ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ - রায়চুর, মাদ্রাজ - সালেম - কোঝিকোড-ম্যাঙ্গালোর ; মাদ্রাজ-রামেশ্বরম্, মাদ্রাজ-মাদুরাই-ত্রিবান্দ্রাম প্রভৃতি। তুলা, তৈলবীজ, লবণ, ইক্ষু, কাষ্ঠ, চা, কফি, মসলা, স্বর্ণ, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, চর্ম প্রভৃতি এই রেলপথে পরিবাহিত হয়। মাদ্রাজের কার্পাস-শিল্প, বাঙ্গালোরের বিমানপোত-নির্মাণ, ভদ্রাবতীর ইস্পাতশিল্প প্রভৃতি এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল। নেভেলীতে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইলে এই রেলপথের গুরুত্ব বাড়িয়া যাইবে।

(৯) **দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ**—১৯৬৫ সালে এই নূতন রেলপথটি সৃষ্টি হয়। ইহা ভারতের নবম রেলপথ। ইহার সদর দপ্তর **সেকেন্দ্রাবাদ**। মধ্য রেলপথের শোলাপুর ও সেকেন্দ্রাবাদ বিভাগ (পুনা-ধন্দ-মানমদ শাখা ব্যতীত) এবং দক্ষিণ রেলপথের হুবলী ও বেজওয়াড়া বিভাগ লইয়া এই নূতন রেলপথটি সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারত ক্রমশঃ শিল্পোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। শিল্পোন্নতির সঙ্গে

সঙ্গে পরিবহণ-ব্যবস্থার, বিশেষতঃ রেলপথের সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় শিল্পের চাহিদার তুলনায় রেলপথের সম্প্রসারণ হইতেছে না। কয়লা-উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও রেলপথের বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় কয়লা-পরিবহণে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। ভারতে রেলপথ-নির্মাণের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিদ্যমান। স্বাধীনতার পর সরকার রেলপথের উন্নতি-সাধনের জন্য সচেষ্ট আছেন। রেলপথের সম্প্রসারণ হইলেও চাহিদার তুলনায় ইহা কম। সেইজন্য আজকাল রাজপথে লক্ষ লক্ষ টন পণ্যদ্রব্য বহু দূরবর্তী স্থানেও প্রেরিত হইতেছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে **জন-প্রতি রেলপথের দৈর্ঘ্য** এখনও অনেক কম। প্রতি কিলোমিটার রেলপথ-প্রতি ভারতে ৪,৮৮০ জন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৮০ জন, কানাডায় ১৪০ জন এবং বৃটেনে ২ জন লোক বিদ্যমান। এইজন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রেলপথের উন্নতির জন্য নানাবিধ পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রেলপথে কয়লা ব্যবহৃত হয়। মোট কয়লার এক-তৃতীয়াংশ রেলপথের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলে কয়লা হইতে উপজাত দ্রব্যাদি বাহির করা যায় না। জাতীর পক্ষে ইহা ক্ষতিকারক। রেলপথে যতদূর সম্ভব বিদ্যুৎ সরবরাহ করা উচিত। বিভিন্ন পরিকল্পনার মারফত ভারতে ক্রমশঃ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে বোম্বাই-পুনা, কলিকাতা-বর্ধমান ও মাদ্রাজের শহরাঞ্চলে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনে রেলগাড়ী চালিত হয়। রেলপথের উন্নতির জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ২৫৮ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৮৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** রেলপথের উন্নতির জন্য ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে ১,২৭৫ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনায় শিল্পের চাহিদা মিটাইবার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ২৪.৫ কোটি টন মালপত্র পরিবহণের ব্যবস্থা এই পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। ৭টি ইস্পাত-কারখানার প্রয়োজনীয় কয়লা ও কাঁচামাল পরিবহণের সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ওয়াগন ও ইঞ্জিনের সংখ্যা বাড়াইয়া, অধিকতর রেলপথ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের আওতায় আনিয়া, লাইন পাল্টাইয়া এবং ১,৭২০ কিলোমিটার নূতন রেলপথ নির্মাণ করিয়া তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে বিভিন্নভাবে রেলপথের উন্নতি সাধন করা হইবে।

আভ্যন্তরীণ জলপথ (Inland Waterways)

ভারত নদীমাতৃক দেশ। নদী-উপত্যকায় ভারতের প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখানে নদীপথে ও খালপথে নৌকা, স্টীমার প্রভৃতির সাহায্যে পরিবহণ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। নদী হইতে বা বৃহদাকার জলাশয় হইতে সাধারণতঃ খাল কাটিয়া পরিবহণ-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা হয়। ভারতের পরিবহণ-ব্যবস্থায় রেলপথের পরেই আভ্যন্তরীণ জলপথের স্থান। এই দেশে বর্তমানে প্রায় ১২,৯০০ কিলোমিটার সুনাব্য নদীপথ এবং ১৯,৩০০ কিলোমিটার খালপথ বিদ্যমান। এখনও ভারতে জলপথে মালপত্র পরিবহণের পরিমাণ অনেক কম। তবে একথা ঠিক যে, জলপথে পরিবহণের জন্য অধিক সময় প্রয়োজন; কিন্তু জলপথ অত্যন্ত সুলভ। সেইজন্য ভারী পণ্যদ্রব্য সর্বদা সময় হাতে রাখিয়া জলপথে পাঠানো উচিত, তাহা হইলে একদিকে রেলপথের উপর চাপ কমিয়া যাইবে, অন্যদিকে জলপথের উন্নতি হইবে।

উত্তর ভারতের নদীসমূহ সারা বৎসর তুষার-গলা জলে ভর্তি থাকে বলিয়া সাধারণতঃ নৌ-চলাচলের উপযুক্ত। উত্তর ভারতের নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বর্তমানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গঙ্গা—ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৪০০ কিলোমিটার। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হইতে নির্গত হইয়া হরিদ্বারের নিকট এই নদী সমতলভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই নদী বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার একটি শাখা পূর্ব পাকিস্তানে পদ্মা নামে প্রবাহিত; পশ্চিমবঙ্গে ইহা ভাগীরথী নামে এবং কলিকাতার নিকট হুগলী নামে খ্যাত। যমুনা ও ইহার শাখানদী চম্বল ও বেতোয়া এবং শোণ নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। গঙ্গার শাখানদীসমূহের মধ্যে গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কুশী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গঙ্গানদী উত্তর ভারতের জলপথের প্রধান পরিবাহক। এই নদীর তীরে কলিকাতা, ভাগলপুর, পাটনা, বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর, হরিদ্বার প্রভৃতি শহর অবস্থিত। **যমুনা** নদীর তীরে দিল্লী, মথুরা, আগ্রা প্রভৃতি শহর অবস্থিত।

ব্রহ্মপুত্র—এই নদের দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৭০০ কিলোমিটার। তিব্বতের মানস সরোবর হইতে নির্গত হইয়া সাদিয়া নামক স্থানে আসামে প্রবেশ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই নদ বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

তিব্বতে সান্‌পো নামে, উত্তর-পূর্ব আসামে ডিহাং নামে এবং নিম্ন-আসামে ইহা ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। আসামের চা ও পাট এবং পূর্ব পাকিস্তানের পাট এই নদীপথে কলিকাতায় আনীত হয়। ইহার উপনদীসমূহের মধ্যে সুবর্ণশ্রী, তিস্তা, করতোয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই নদীর তীরে ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটি, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী প্রভৃতি শহর অবস্থিত।

দক্ষিণ ভারতের নদীসমূহ গ্রীষ্মকালে জলাভাবে শুকাইয়া যায় এবং বর্ষাকালে বৃষ্টির জল পাইয়া খুব খরস্রোতা হয়। সেইজন্য এখানকার নদীসমূহ নৌ-চলাচলের উপযোগী নহে। জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের পক্ষে এই সকল নদী খুবই কার্যকরী। **নর্মদা** নদী মহাকাল পর্বত হইতে এবং **তাপ্তী** নদী মহাদেব পর্বত হইতে নির্গত হইয়া আরব সাগরে পড়িয়াছে। অন্যান্য নদীসমূহ পশ্চিম-ঘাট পর্বত হইতে নির্গত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। **মহানদী** প্রধানতঃ মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার মধ্য দিয়া, **গোদাবরী** ও **কৃষ্ণা** মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র-রাজ্যের মধ্য দিয়া, **কাবেরী** মহীশূর ও মাদ্রাজের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। উপনদীসমূহের মধ্যে কৃষ্ণার উপনদী তুঙ্গভদ্রা এবং মহানদীর উপনদী ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণাংশে **পেন্নার** ও **পেরিয়ার** নামে দুইটি ছোট নদী আছে। গোদাবরীর তীরে রাজমহেন্দ্রী, কৃষ্ণা নদীর তীরে সাতারা ও বেজওয়াদা, কাবেরী নদীর তীরে ত্রিচিনাপল্লী ও কুম্ভকোণম্‌, নর্মদা নদীর তীরে জব্বলপুর ও ব্রোচ, তাপ্তী নদীর তীরে সুরাট এবং মহানদীর তীরে সম্বলপুর ও কটক অবস্থিত।

ভারতের বিভিন্ন নদীর সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি **খাল** কাটা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের ইস্টার্ন ও সার্কুলার খাল, হরিদ্বার ও কানপুরের মধ্যে গঙ্গানদীর খাল, মাদ্রাজে কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য বাকিংহাম খাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভারতের নদীপথের উন্নতির জন্য ভারত সরকার 'কেন্দ্রীয় সেচ ও শক্তি কমিশন' (Central Irrigation & Power Commission) নামে একটি সংগঠন সৃষ্টি করিয়াছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ১৯৫২ সালে 'গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র জলপথ বোর্ড' (The Ganga-Brahmaputra Water Transport Board) স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বাকিংহাম খাল, দক্ষিণ উপকূলের খাল এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র জলপথের উন্নতির জন্য ৩ কোটি টাকা খরচ করা হয়। তৃতীয়

পরিকল্পনায় জলপথের উন্নতির ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে ৭'৫ কোটি টাকা। ব্রহ্মপুত্র ও হুগলী নদীর জন্য ড্রেজারের বন্দোবস্ত করা, রাজস্থান খাল, কেরালার পশ্চিম-উপকূল খাল এবং উড়িষ্যার তালডাঙ্গা ও কেন্দ্রপাড়া খালসমূহের উন্নতিসাধন এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

সমুদ্রপথ (Ocean Transport)

প্রাচীনকালে ভারত সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিত। সেই সময় ভারতীয় জাহাজেই মালপত্রের আদান-প্রদান হইত। বৃটিশ রাজত্বের সময় ভারতের জাহাজ-ব্যবসায়ের বিলুপ্তি হয়। ১৯২০ সালে সিন্ধিয়া স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানী লিঃ সামুদ্রিক বাণিজ্যে অবতীর্ণ হইলেও বৃটিশ সরকারের চাপে এই ভারতীয় কোম্পানীটি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনক্রমে টিকিয়া থাকায় এই কোম্পানী ক্রমশঃ অল্প পরিমাণে পণ্য-পরিবহণের অনুমতি পাইতে আরম্ভ করে।

উপকূল-বাণিজ্য (Coastal Shipping)—ভারতের দীর্ঘ উপকূল-পথে জাহাজ চলাচলের বন্দোবস্ত আছে। ভারতের এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে যে বাণিজ্য চলে তাহাকে উপকূল-বাণিজ্য (Coastal Trade) বলা হয়। উপকূল-বাণিজ্যে দেশীয় নৌকা, স্টীমার ও জাহাজ ব্যবহৃত হয়। পূর্বে বিদেশী জাহাজ এই উপকূল-বাণিজ্য দখল করিয়া ছিল। স্বাধীনতা পাইবার পর এদেশের সিন্ধিয়া স্টীম ন্যাভিগেশন কোং ভারত সরকারের সহায়তায় এই সকল উপকূল-বাণিজ্যের মালপত্র পরিবহণ করিবার সুযোগ পায়। ১৯৫১ সাল হইতে উপকূল-বাণিজ্যে শুধু মাত্র ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইহাতে শত্রুর হাত হইতে উপকূল রক্ষণাবেক্ষণ করিবার সুবন্দোবস্ত হইবে, অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের সুবিধা হইবে এবং ভারতের জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। ১৯৬১ সালে ভারতের মোট জাহাজের মালবহনের ক্ষমতা ছিল প্রায় ৯ লক্ষ টন (GRT), তন্মধ্যে উপকূল-বাণিজ্যে নিযুক্ত জাহাজের পরিমাণ ছিল ২'৯২ লক্ষ টন (GRT)। বর্তমানে ভারতে ৮১টি জাহাজ উপকূল-বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে। ভারতের উপকূলের বন্দরসমূহের মধ্যে কলিকাতা, বিশাখাপত্তনম্, মাদ্রাজ, কোচিন, বোম্বাই, কাণ্ডলা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই দেশের জাহাজসমূহ এখনও

সম্পূর্ণভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। ভারতীয় বন্দর হইতে নিকটবর্তী দেশসমূহের (সিংহল, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি) সহিত যে বাণিজ্য চলে, তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ এবং দূরবর্তী দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের শতকরা ৯ ভাগ পণ্যদ্রব্য ভারতীয় জাহাজে পরিবাহিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এইজন্য ২০ লক্ষ টনের (GRT) জাহাজ প্রয়োজন। ভারত সরকার দুইটি কর্পোরেশনের মারফত এই সকল জাহাজ সংগ্রহের ও চালাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। এই কর্পোরেশন দুইটির একটি, **ইস্টার্ণ শিপিং কর্পোরেশন** সমুদ্রপথে ভারতের সহিত অস্ট্রেলিয়া ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের বন্দোবস্ত করিতেছে; অন্যটি **ওয়েস্টার্ণ শিপিং কর্পোরেশন** পারস্য উপসাগরের দেশসমূহ, পশ্চিম ইউরোপ, আফ্রিকা, রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের সহিত বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য পরিবহণ করে। এখনও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীগুলি (B. I. S. N. CO., P. & O. Co.) আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। ভারতীয় জাহাজ শিল্প এই সকল কোম্পানার আধিপত্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। দেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে এই সকল বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর আধিপত্য কিছুটা হ্রাস পাইতেছে।

সমুদ্রপথে (Ocean Routes) ভারতীয় জাহাজ নিম্নলিখিত পথে চলাচল করে :—(ক) ভারত-বৃটেন-ইউরোপের অন্যান্য বন্দর, (খ) ভারত-জাপান ও দূরপ্রাচ্য, (গ) ভারত-রেঙ্গুন-সিঙ্গাপুর, (ঘ) ভারত-পারস্য উপসাগর-কৃষ্ণসাগর-রাশিয়া, (ঙ) ভারত-অস্ট্রেলিয়া, (চ) ভারত-পূর্ব আফ্রিকা।

ভারতের উপকূল-বাণিজ্যে ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় জাহাজের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। সেইজন্য সৃষ্টি হইয়াছে **বিশাখাপতনমের** বিরাট-জাহাজ-নির্মাণ শিল্প। সিন্ধিয়া কোম্পানী প্রথমে এই শিল্পটি আরম্ভ করে। বর্তমানে ভারত সরকার ও সিন্ধিয়া কোম্পানীর যুগ্ম-মালিকানায় হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিমিটেড কর্তৃক এই শিল্পটি পরিচালিত হইতেছে।

বিভিন্ন পরিকল্পনায় সমুদ্রপথের ও জাহাজ সংগ্রহের উন্নতির জন্য নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রথম **পরিকল্পনায়** উপকূল-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ১৮'৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫২'৭ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ভারতে উপকূল-বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজের অধিকতর

অংশগ্রহণের বন্দোবস্ত করা হয়। এই পরিকল্পনায় ভারতীয় নৌবহরের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯ লক্ষ GRT। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** রপ্তানি-বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নৌবহরের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যে অধিকতর মালপত্র পরিবহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনায় জাহাজের সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য ৫৫ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ করা হয়; ইহার ফলে নূতন ৫৭ খানা জাহাজ (৩,৭৫,০০০ GRT) ক্রয়ের বন্দোবস্ত হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বে-সামরিক নৌবহরের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া প্রায় ১১ লক্ষ টন (GRT) করা হইবে।

সমুদ্রপথে জাহাজ-ব্যবহারের গতি ও লক্ষ্য (লক্ষ GRT)

	১৯৫০-৫১	১০৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬ (লক্ষ্য)
উপকূল-বাণিজ্যে	২·১৭	২·৪০	২·৯২	৩·২৫
বৈদেশিক বাণিজ্যে	১·৭৪	২·৪০	৬·১৩	৭·৬১
মোট	৩·৯১	৪·৮০	৯·০৫	১০·৮৬

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য জাহাজ একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়া রপ্তানি-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে ভারতীয় জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বৈদেশিক জাহাজ কোম্পানীসমূহ কখনই ভারতের স্বার্থে এবং তাহাদের দেশের স্বার্থের প্রতিকূলে এই দেশের রপ্তানি-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিবে না। সেইজন্য জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের উন্নতির জন্য কোচিনে একটি নূতন জাহাজ-নির্মাণের কারখানা স্থাপনের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। জাহাজের পরিমাণ-বৃদ্ধি বহুলাংশে বৈদেশিক মুদ্রা-সংগ্রহ ও শক্তিশালী বিদেশী শক্তিসমূহের সদাশয়তার উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য ভারতের ইচ্ছা থাকিলেও সর্বদা জাহাজ-সংগ্রহ আশানুরূপ হয় না।

বিমানপথ (Airways)

১৯১১ সালে ভারতে প্রথম বিমান-চলাচলের সূত্রপাত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে মাত্র ২টি কোম্পানী ছোটখাটো বিমান চালাইত। ১৯২৯ সালে বৃটেনের সঙ্গে ভারতের সাপ্তাহিক বিমানপথ খোলা হইল। ইহার পর ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বিমানপথের উন্নতি আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে সমগ্র ভারত বিমানপথে ছাইয়া গেল, বহু বিমানবন্দর

প্রতিষ্ঠা হইল, নূতন নূতন বিমানপথ-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইল। যুদ্ধের পরে উদ্‌বৃত্ত বিমান ক্রয় করিয়া বহু কোম্পানী নূতন নূতন বিমানপথ খুলিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিল। ১৯৩৮ সালে এই দেশে বিমানপথের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৮,৩০০ কিলোমিটার; ১৯৫০ সালে ইহা দাঁড়াইল ৩৫,৩০০ কিলোমিটারে।

এই দেশে বিশাল আয়তনের বিমানপথের প্রয়োজনীয়তা যে অত্যন্ত বেশী, ইহা বলাই বাহুল্য। দেশরক্ষার কাজে, শাসনকার্যের সুবিধার জন্য, দ্রুত যাতায়াত ও মালপত্র প্রেরণের জন্য বিমানপথ বর্তমান সভ্যজগতের পক্ষে

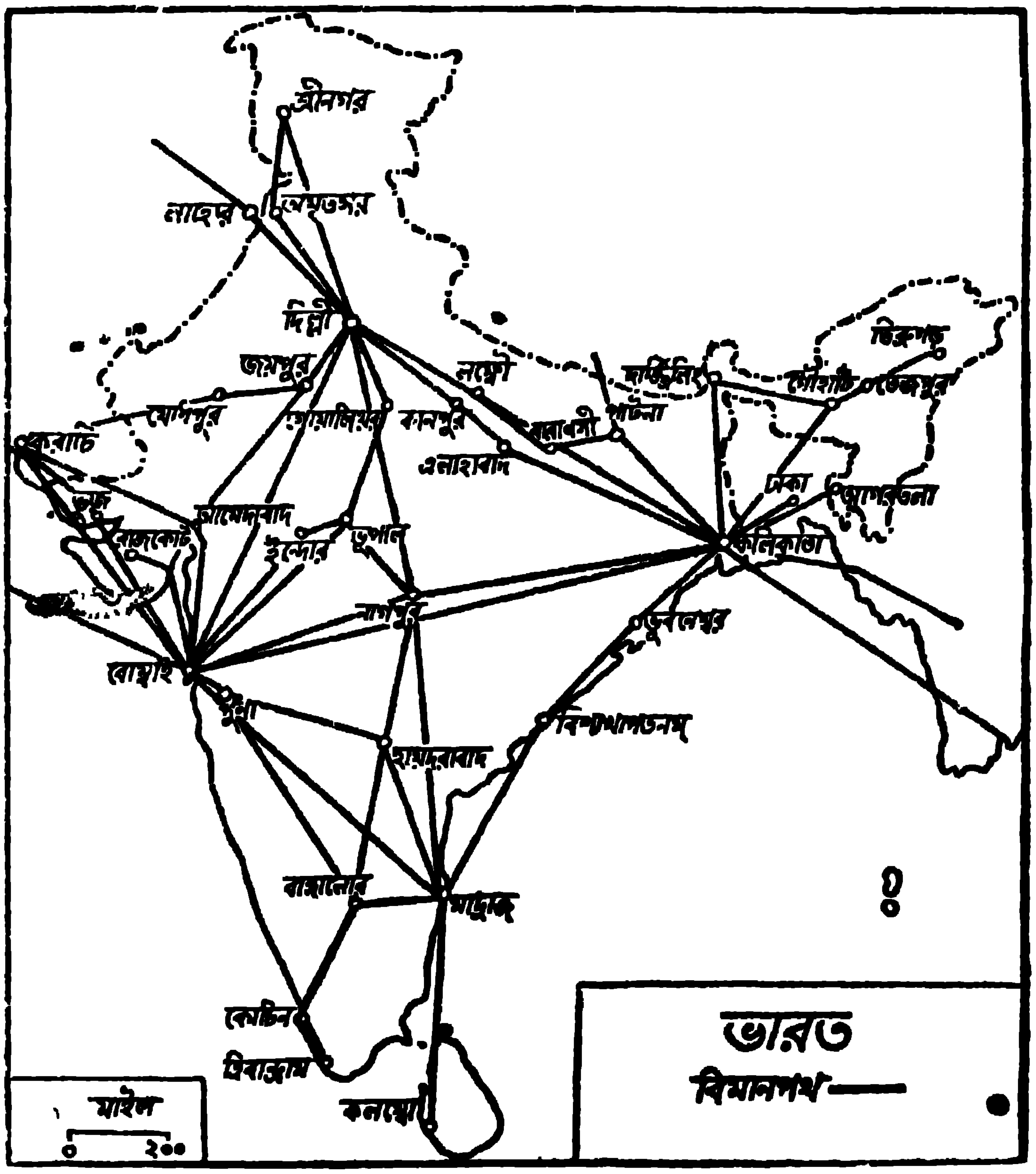

একান্ত প্রয়োজন। ভারত অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়ায় এবং স্বাধীনতার পর দেশরক্ষার গুরুদায়িত্ব এই দেশের উপর অর্পিত হওয়ায় বিমান-পথের গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইজন্য ১৯৫৩ সালে ভারতের বে-সামরিক বিমানপথ জাতীয়করণ করা হয়।

ভারতে তিনটি আন্তর্জাতিক **বিমানবন্দর** আছে—দমদম (কলিকাতা), সান্তা ক্রুজ (বোম্বাই) ও পালাম (দিল্লী)। ইহা ছাড়া আমেদাবাদ, মাদ্রাজ, নাগপুর, হায়দারাবাদ, বাঙ্গালোর, গৌহাটি, ত্রিচিনাপল্লী ও সাফদারজঙ্গে (দিল্লী) ৮টি প্রধান বিমানবন্দর আছে। ইহা ছাড়া ৭৪টি মাঝারি ও ছোটখাটো বিমানবন্দর এই দেশে বিদ্যমান। সম্প্রতি এই দেশে আরও ১৪টি নূতন বিমানবন্দর খুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৯৫৩ সালে বিমানপথ জাতীয়করণের পর আভ্যন্তরীণ চলাচলের জন্য ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ কর্পোরেশন এবং আন্তর্জাতিক চলাচল-ব্যবস্থার জন্য এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল নামে দুইটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ কর্পোরেশন (I. A. C.) ভারতের প্রসিদ্ধ শহর ও বন্দরসমূহের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। দ্রুত ডাক-চলাচলের জন্য নাগপুরের মাধ্যমে দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজের মধ্যে রাত্রিতে বিমানপোত চলাচল করে। বর্তমানে কলিকাতা, দিল্লী, হায়দারাবাদ, বাঙ্গালোর, ত্রিবান্দ্রাম, পুনা, অমৃতসর, শ্রীনগর, জয়পুর, যোধপুর, আমেদাবাদ, ভূপাল, ইন্দোর, নাগপুর, দার্জিলিং প্রভৃতি শহরের সহিত বিমানপথে ভারতের অন্যান্য বড় শহগুলির যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে।

এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল (A.I. I.) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতকে বিমানপথে যুক্ত করিয়াছে। কলিকাতা-বোম্বাই-কায়রো-লণ্ডন, কলিকাতা-ব্যাঙ্কক-সিঙ্গাপুর-জাকার্তা, কলিকাতা-হংকং-টোকিও, দিল্লী-তাসকেণ্ট-মস্কো, বোম্বাই-এডেন-নাইরোবি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বিমানপথে ১৭টি দেশে ভারতীয় বিমানপোত যাতায়াত করিতেছে।

ইহা ছাড়া ভারতের উপর দিয়া যাইবার জন্য কয়েকটি বৈদেশিক বিমান-প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইহারা সকলেই আন্তর্জাতিক বিমান-প্রতিষ্ঠান। ইহাদের মধ্যে British Overseas Airways Corporation (B. O A. C.), Trans-World Airlines (T. W. A.), Air France, Royal Dutch Airlines (K. L. M.), Pan-American World Airways, Scandinavian Airlines, Pakistan International Airways-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার পর ভারতে বিমানপথের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে বিমানপথের চাহিদা অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়া গিয়াছে।

মালপত্র প্রচুর পরিমাণে বিমানপথে পরিবাহিত হইতেছে। কিন্তু ভারতে বিমানপথের উন্নতিতে প্রধান অন্তরায় তৈলের অস্বাভাবিক উচ্চমূল্য। আমদানীকৃত তৈলের উপর নির্ভরশীল বলিয়া, ইহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। ভারতের বিমানপথের একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব রাত্রে ডাক-পরিবহণ; নাগপুরকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজের ডাক রাত্রিতে প্রেরিত হয়।

বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বর্তমানে বিমানপথের উন্নতি হইতেছে। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** বে-সামরিক বিমানপথের উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। বিমানবন্দরের উন্নতিসাধন, কর্মীদের ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত, গবেষণা প্রভৃতির জন্য এই পরিকল্পনায় নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

বন্দর ও পোতাশ্রয় (Ports & Harbours)

ভারতের উপকূলভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫,৬০০ কিলোমিটার হইলেও অধিকাংশ স্থানে ইহা অভগ্ন। **পশ্চিম উপকূলের** সন্নিকটে ইহার সমান্তরাল হইয়া পশ্চিমঘাট পর্বতমালা চলিয়া গিয়াছে; এই উপকূল সেইজন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ। উপকূল-সংলগ্ন এই সমুদ্র সাধারণতঃ অগভীর ও বালুকাময়। এইজন্য পশ্চিম উপকূলের অধিকাংশ স্থানে বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ করা কষ্টকর। এই উপকূলে মাত্র তিনটি স্বাভাবিক বন্দর রহিয়াছে—বোম্বাই, গোয়া ও কোচিন। বোম্বাই ও গোয়া ব্যতীত এই উপকূলের অন্যান্য বন্দর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের সময় মে হইতে আগস্ট মাস পর্যন্ত বন্ধ থাকে। পূর্ব উপকূল-সংলগ্ন সমুদ্র অগভীর ও তরঙ্গসঙ্কুল বলিয়া স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ করা কষ্টকর। এই উপকূলের অধিকাংশ পোতাশ্রয় কৃত্রিম। এখানকার বন্দরসমূহ অগভীর হওয়ায় সর্বদা ড্রেজারের সাহায্যে ইহা উন্মুক্ত রাখিতে হয়। এই প্রথা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। এইজন্য পূর্ব উপকূলের বন্দরসমূহ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

পোতাশ্রয়ের প্রকৃতি, আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ, পশ্চাদ্‌ভূমির প্রসার ও সমৃদ্ধি, বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতির তারতম্য অনুসারে ভারতের বন্দরসমূহকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়—প্রধান ও অপ্রধান বন্দর। পশ্চিম উপকূলের কাণ্ডলা, বোম্বাই ও কোচিন এবং পূর্ব উপকূলের মাদ্রাজ, বিশাখা-

পতনম্ ও কলিকাতা ভারতের প্রধান বন্দর (Major Ports)। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে ম্যাঙ্গালোর ও তুতিকোরিন বন্দরদ্বয় প্রধান বন্দরে পরিণত হইবে। প্রধান বন্দরসমূহের মারফত এই দেশের শতকরা ৯০ ভাগ বৈদেশিক বাণিজ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সকল প্রধান বন্দর ছাড়াও ভারতে ১৫০টির বেশী অপ্রধান বন্দর (Minor Ports) রহিয়াছে; ইহাদের মধ্যে ওখা, পোরবন্দর, সুরাট, মর্মুগাও, কোঝিকোড, পরাদিপ, কুইলন, তেলি-চেরী, নেগাপত্তন্, মসুলীপত্তন্, বেদী ও হলদিয়া বন্দর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বন্দরের কার্যকারিতা নির্ভর করে ইহার পশ্চাদ্‌ভূমির অর্থনৈতিক উন্নতির উপর। রপ্তানি ও আমদানিযোগ্য পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই বন্দরের উন্নতি হয়। স্বাধীনতার পর ভারত অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ায় এই দেশের বন্দরসমূহের কার্যকারিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পের উন্নতির জন্য যন্ত্রপাতি আমদানির পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেইজন্য ভারত সরকার বন্দরের উন্নতিসাধনের জন্য এবং নূতন বন্দরস্থাপনের জন্য বিভিন্ন **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার** মাধ্যমে নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথম পরিকল্পনার কার্যকালে করাচীর পরিবর্ত-বন্দর হিসাবে কাণ্ডলাকে প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত করা হয়, বোম্বাই বন্দর-সংলগ্ন তৈল-শোধনাগারসমূহের চাহিদা মিটাইবার জন্য এই বন্দরের আরও উন্নতি সাধন করা হয় এবং কলিকাতা, কোচিন ও মাদ্রাজ বন্দরের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হয় ৩১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে অপ্রধান বন্দরসমূহের উন্নতিসাধন, মালপে, পরাদিপ ও ম্যাঙ্গালোর বন্দরের পোতাশ্রয়ের উন্নতিসাধন সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং বাতিঘরের উন্নতির জন্য মোট ৭৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** প্রধান বন্দরসমূহের উন্নতি সাধন করিয়া ইহাদের পণ্য-পরিবহণের ক্ষমতা ৪.৯ কোটি টন পর্যন্ত বাড়ানো হইবে। কলিকাতা বন্দরের উন্নতির জন্য ফারাক্কাতে বাঁধ-নির্মাণ, হলদিয়াতে নূতন বন্দর-স্থাপন, ড্রেজারের সংখ্যাবৃদ্ধি, বোম্বাই, বিশাখাপতনম্, মাদ্রাজ, কাণ্ডলা ও কোচিন বন্দরের উন্নতিসাধন প্রভৃতি এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই পরিকল্পনার কার্যকালে ম্যাঙ্গালোর ও তুতিকোরিন বন্দরদ্বয়কে প্রধান বন্দরে পরিণত করা হইবে। তৃতীয় পরি-

কল্পনায় বন্দরের উন্নতিসাধনের জন্য ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে ১১৫ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ৮০ কোটি টাকা প্রধান বন্দরসমূহের জন্য, ২৫ কোটি টাকা ফারাক্কা বাঁধের জন্য এবং ১০ কোটি টাকা ম্যাঙ্গালোর ও তুতিকোরিন বন্দরের উন্নতিসাধনের জন্য ব্যয় হইবে।

অপ্রধান বন্দরসমূহের উন্নতির জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৫ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার জন্য ব্যয় হইয়াছিল যথাক্রমে ১·৫ কোটি ও ৫ কোটি টাকা। পরাদিপ বন্দরের উন্নতি সাধন করিয়া সুকিন্দা-দাইতেরী অঞ্চলের লৌহ আকরিক রপ্তানির বন্দোবস্ত করিবার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া দাক্ষিণাত্যের ছোটখাটো বন্দরের উন্নতিসাধন, ড্রেজারের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতিও এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

প্রধান বন্দর (Major Ports)

কলিকাতা (Calcutta)—বঙ্গোপসাগরের উপকূল হইতে প্রায় ১৮২ কিলোমিটার দূরে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত কলিকাতা ভারতের বৃহত্তম

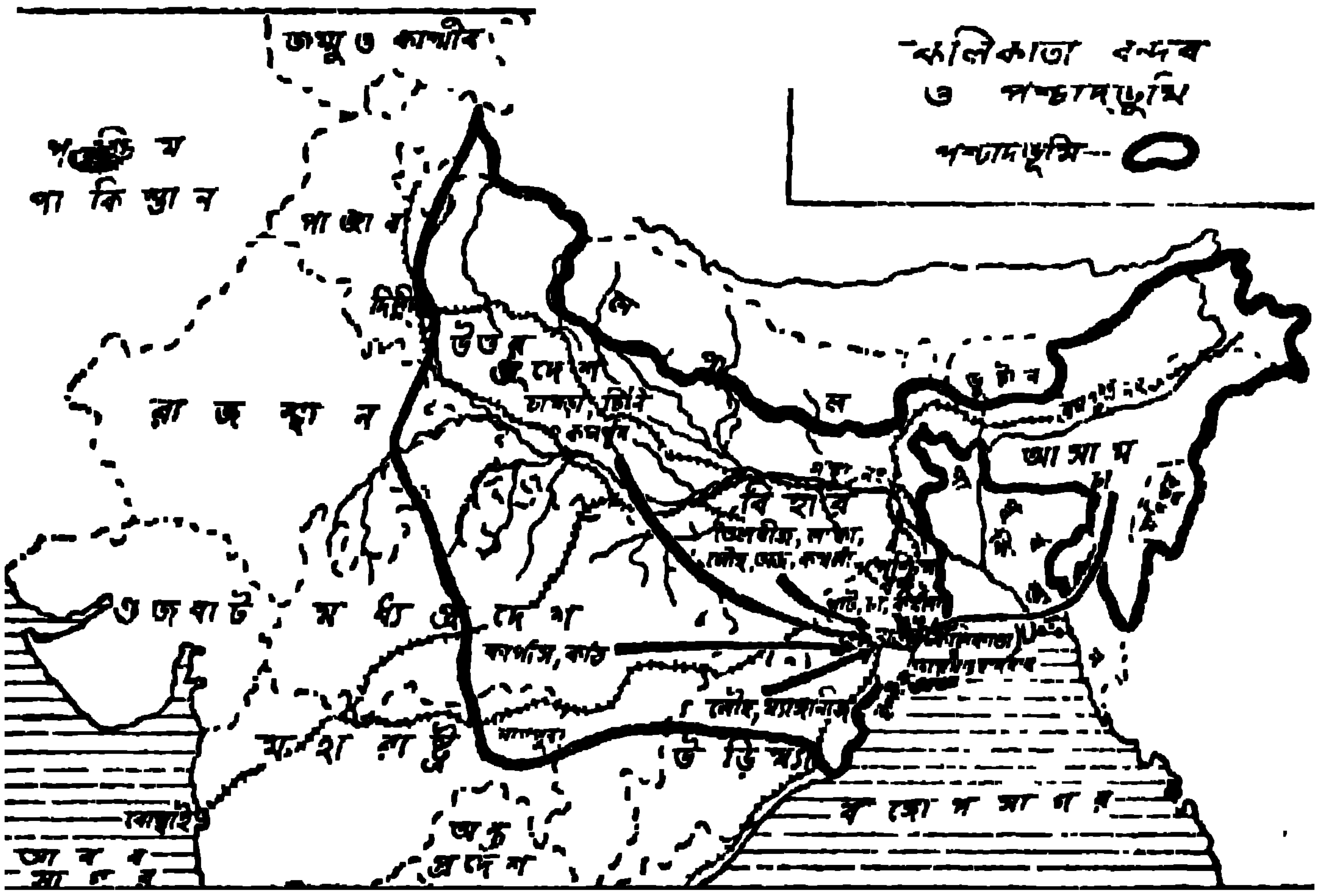

শহর ও দ্বিতীয় সর্বপ্রধান বন্দর। এখানে কৃত্রিম পোতাশ্রয় আছে। হুগলী নদীতে জলের গভীরতা কম থাকায় বন্দর হইতে সমুদ্র পর্যন্ত জলপথের নানাস্থানে বালুচরের সৃষ্টি হয়। এইজন্য সর্বদা ড্রেজার যন্ত্র দ্বারা নদীর মাটি কাটিয়া জাহাজ ভিতরে আনিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। নদীর সংকীর্ণতার

জন্য সুদক্ষ পাইলটের সাহায্যে জাহাজ বন্দরের মধ্যে লইয়া আসিতে হয়। এইজন্য এই বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে এই সকল অসুবিধা দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই বন্দরের বিস্তীর্ণ পশ্চাদ্‌ভূমি রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের কিয়দংশ ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। এই সকল রাজ্যের সহিত কলিকাতা রেলপথে যুক্ত। ইহা ছাড়া জলপথে এই বন্দর হইতে গঙ্গানদী মারফত উত্তর ভারতে ও ব্রহ্মপুত্র নদী মারফত পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়া আসামে যাওয়া যায়। এই পশ্চাদ্‌ভূমিতে প্রচুর কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কলিকাতার নিকট পাট, ইস্পাত, কাগজ, অ্যালুমিনিয়াম ও বয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের চা, কয়লা ও পাটজাত দ্রব্য, বিহারের তৈলবীজ, লাক্ষা, কয়লা, লৌহ আকরিক ও অভ্র, উত্তরপ্রদেশের তৈলবীজ, চামড়া, চিনি ও বস্ত্রাদি, উড়িষ্যার লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি এই বন্দরের মারফত রপ্তানি করা হয়। বিদেশ হইতে নানাবিধ সামগ্রী এই বন্দরে আমদানি করিয়া ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি-অঞ্চলে প্রেরিত হয়। ইহার মধ্যে গম, চাউল, নানাবিধ যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল, কাগজ, মোটর-গাড়ী, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যই প্রধান। কলিকাতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাটকেন্দ্র। ইহা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী।

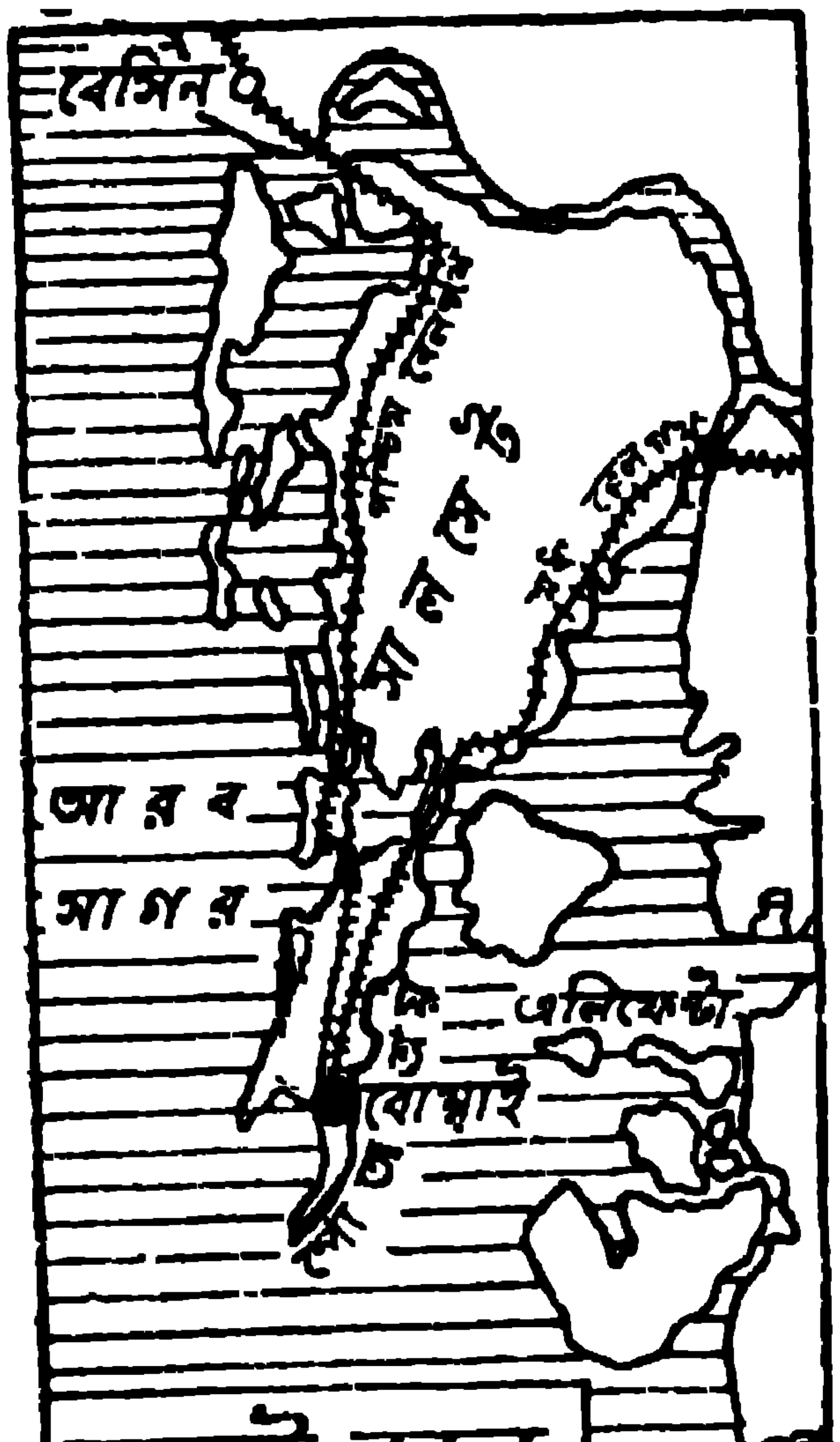

বোম্বাই বন্দর

বোম্বাই (Bombay)—আরব সাগরের তীরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে বোম্বাই বন্দর অবস্থিত। ইহা ভারতের সর্বপ্রধান বন্দর এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এখানে একটি উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। বড় বড় জাহাজ এখানে নিরাপদে থাকিতে পারে। সালসেট নামক অন্য একটি দ্বীপের মারফত এই বন্দর দেশের অভ্যন্তরভাগের সহিত রেলপথ দ্বারা যুক্ত। এই বন্দরের বিস্তীর্ণ পশ্চাদ্‌ভূমি রহিয়াছে। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান এবং মহীশূর ও অন্ধ্রের

কিয়দংশ ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। বোম্বাই শহরের নিকট ভারতের বিখ্যাত বয়নশিল্প-কেন্দ্র অবস্থিত। এখানকার কাপড় ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও বিদেশে প্রেরিত হয়। এই বন্দরের মারফত প্রধানতঃ তুলা, লৌহ আকরিক, ডিজেল, চিনি, তৈলবীজ ও বস্ত্রাদি রপ্তানি করা হয় এবং খনিজ তৈল, সিমেণ্ট, খাদ্যশস্য, ইস্পাত-দ্রব্য, তুলা, কোক-কয়লা, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও সার আমদানি করা হয়। বোম্বাই মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই বন্দরের উন্নতিসাধনের জন্য ২৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে।

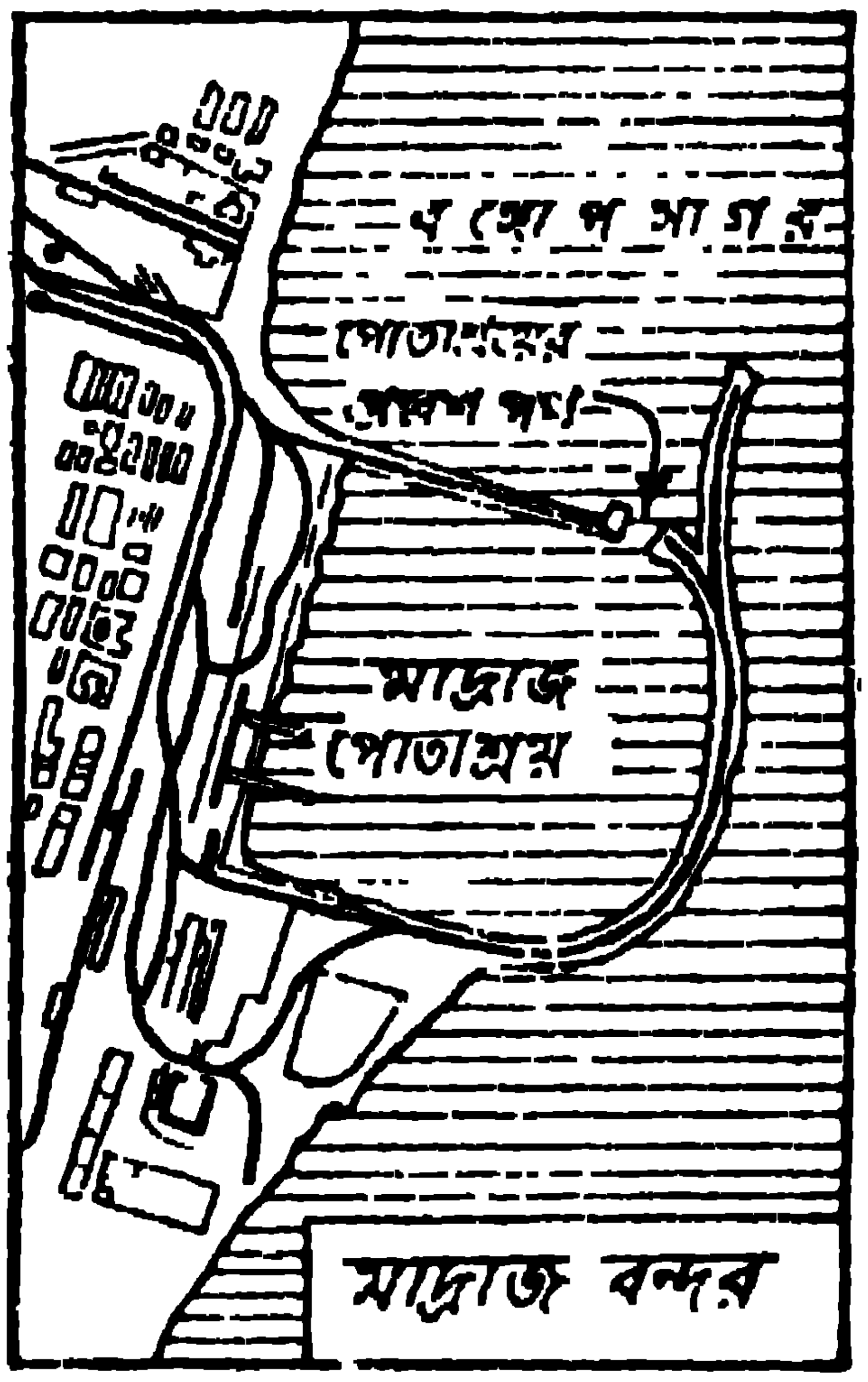

মাদ্রাজ বন্দর

মাদ্রাজ (Madras)—ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত মাদ্রাজ ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর ও শহর। এখানে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় না থাকায় তীরবর্তী সমুদ্রের মধ্যে ৮০ হেক্টর পরিমিত স্থান ঘিরিয়া কৃত্রিম পোতাশ্রয় তৈয়ার করা হইয়াছে। মাদ্রাজ, মহীশূরের কিয়দংশ, অন্ধ্র ও কেরালার কিয়দংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। মাদ্রাজের সহিত ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি রেলপথে যুক্ত। এই বন্দর মারফত চাউল, চামড়া, তৈলবীজ, তামাক, তেঁতুল, কফি, কাপড় ইত্যাদি রপ্তানি করা হয় এবং কয়লা, খনিজ তৈল, চাউল, কাগজ, মসলা, কাঠ, মদ্য, তুলা, মোটর-গাড়ী ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়। ইহা মাদ্রাজ রাজ্যের রাজধানী। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই বন্দরের উন্নতিসাধনের জন্য ৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বিশাখাপত্তনম্ (Vishakapatnam)—বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত অন্ধ্ররাজ্যের অন্তর্গত এই বন্দরে ভারতের জাহাজ-নির্মাণ শিল্প অবস্থিত। ইহা ভারতের চতুর্থ প্রধান বন্দর। এই বন্দরে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির কিছুটা অংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যসমূহের কিয়দংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত এই বন্দর রেলপথ দ্বারা যুক্ত।

এই বন্দর মারফত ম্যাঙ্গানিজ, তৈলবীজ, লৌহ আকরিক, মসলা, কাষ্ঠ প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং খাদ্যশস্য, খনিজ তৈল, বিলাসদ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়। এই বন্দরের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২০ লক্ষ টন লৌহ আকরিক রপ্তানি করিবার উদ্দেশ্যে তৃতীয়

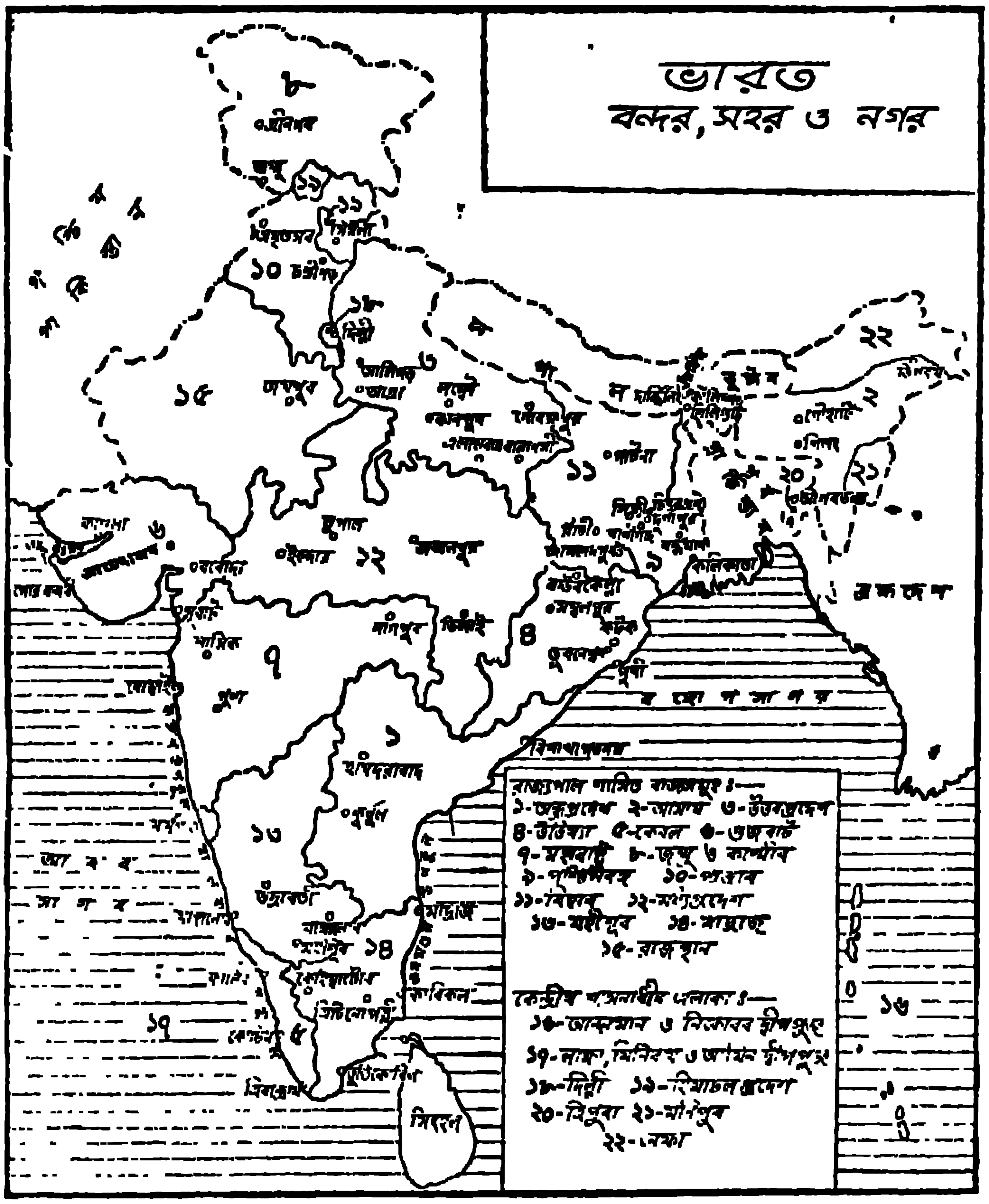

পরিকল্পনায় ইহার উন্নতি সাধনের জন্য ৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে।

কোচিন (Cochin)—মালাবার উপকূলে অবস্থিত কেরালা রাজ্যের এই বন্দরটি ভারতে প্রধান পাঁচটি বন্দরের অন্যতম। কেরালা ও মাদ্রাজ রাজ্যের কিয়দংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। রেলপথে পশ্চাদ্ভূমির সহিত

বন্দরটি যুক্ত। নারিকেল তৈল ও দড়ি, চা, রবার, কফি, মসলা প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য এবং খাদ্যশস্য, খনিজ তৈল, কয়লা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য ইহার প্রধান আমদানি-দ্রব্য। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই বন্দরে একটি জাহাজ-নির্মাণের কারখানা স্থাপনের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

কাণ্ডলা (Kandla)—কচ্ছ উপসাগরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত গুজরাট রাজ্যের এই বন্দর ভারত সরকার ১৯৫১ সালে নির্মাণ করে। এখানে একটি স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। করাচী বন্দর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই বন্দর-নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে। এখানে পানীয় জলের অভাব থাকায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে নলযোগে জল আনিতে হয়। গুজরাট, পাঞ্জাব, দিল্লী, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। রেলপথ নির্মাণ করিয়া এই পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত বন্দরটিকে যুক্ত করা হইয়াছে। এই বন্দরের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। ইহার মাধ্যমে খনিজ তৈল, তুলা, যন্ত্রপাতি, ঔষধ, কয়লা, বিলাসদ্রব্য প্রভৃতি আমদানি করা হয় এবং সিমেণ্ট, লবণ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়।

ম্যাঙ্গালোর (Mangalore)—মালাবার উপকূলে মহীশূর রাজ্যের এই বন্দরে বর্তমানে ছোটখাটো জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে। এই বন্দর মারফত চা, কফি, চাউল, কাজুবাদাম, মৎস্য, রবার ইত্যাদি রপ্তানি হইয়া থাকে। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে এই বন্দরটিকে একটি প্রধান বন্দরে উন্নীত করা হইবে এবং পোতাশ্রয় নির্মাণ করিয়া সারা বৎসর এই বন্দরে কাজকর্ম করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। চিতলদ্রুগ অঞ্চল হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ২০ লক্ষ টন লৌহ আকরিক রপ্তানির জন্যই প্রধানতঃ এই বন্দরের উন্নতি সাধন করা হইবে। মহীশূর এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি।

তুতিকোরিন (Tuticorin)—করমণ্ডল উপকূলে মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণাংশে অবস্থিত এই বন্দরের মাধ্যমে সিংহলের সহিত ব্যাপকভাবে বাণিজ্য চলে। দক্ষিণ মাদ্রাজ ও দক্ষিণ কেরালা ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। তুলা, পেঁয়াজ, লঙ্কা, গবাদি পশু ইহার রপ্তানি-দ্রব্য। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে ইহা একটি প্রধান বন্দরে উন্নীত হইবে।

অপ্রধান বন্দর (Minor Ports)

ওখা (Okha)—গুজরাট রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই বন্দরটিতে উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় আছে। কিন্তু ইহার প্রবেশপথ অত্যন্ত সংকীর্ণ

বলিয়া বিপদসঙ্কুল। গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। যানবাহনের বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় এই বন্দর বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। ইস্পাত-সামগ্রী, বিলাসদ্রব্য, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, কয়লা, খনিজ তৈল ইহার প্রধান আমদানি-দ্রব্য। তূলা, লবণ, সিমেণ্ট প্রভৃতি ইহার প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। **পোরবন্দর (Porbandar)**—আরব সাগরের তীরে অবস্থিত গুজরাট রাজ্যের এই বন্দরটি সাধারণতঃ উপকূলীয় বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। এই বন্দরের ভিতরে বড় জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে না। খেজুর, কাষ্ঠ, নারিকেল প্রভৃতি ইহার প্রধান আমদানি দ্রব্য এবং সিমেণ্ট, লবণ ইত্যাদি প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। **সুরাট (Surat)**—গুজরাট রাজ্যের এই প্রাচীন বন্দরটি ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। বোম্বাই ও কাণ্ডলা বন্দরের জন্য ইহার গুরুত্ব বর্তমানে বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। **মার্মুগাও (Murmugao)**—কঙ্কণ উপকূলে ভারতের পর্তুগীজ দখলীকৃত অংশে গোয়ার ৫ মাইল দক্ষিণে এই বন্দর অবস্থিত। মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের কিছু কিছু বাণিজ্যদ্রব্য এই বন্দর মারফত আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে। ম্যাঙ্গানিজ, বাদাম, তূলা নারিকেল ইত্যাদি ইহার প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। আমদানি-দ্রব্য অত্যন্ত নগণ্য। **কোঝিকোড (কালিকট) (Kozhikhode)**—মালবার উপকূলে কেরালা রাজ্যের এই বন্দরের নিকট বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার পোতাশ্রয় অগভীর। নারিকেল-দড়ি, রবার, কাজুবাদাম, চা, কফি প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। গবাদি পশু ইহার প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য এবং কয়লা, কাষ্ঠ, যন্ত্রপাতি, তালপাতা প্রভৃতি প্রধান আমদানি-দ্রব্য। **পরাদিপ (Paradip)**—বঙ্গোপসাগরের তীরে উড়িষ্যা রাজ্যে অবস্থিত এই বন্দরটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে নির্মিত হইয়াছে। এই বন্দর মারফত প্রচুর লৌহ আকরিক জাপানে প্রেরিত হয়। **হলদিয়া (Haldia)**—কলিকাতা বন্দর হইতে ৯০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এই বন্দরের উন্নতি সাধন করিয়া কলিকাতা বন্দরের উপর চাপ কমানো হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই বন্দরের নির্মাণকার্য সুরু হইবার কথা। ইহার জন্য মোট ব্যয় হইবে ২৫ কোটি টাকা: ইহার মধ্যে তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে খরচ হইবে ৭ কোটি টাকা। খড়্গপুর হইতে একটি রেলপথ এই বন্দর পর্যন্ত আনা হইবে। পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার বহুস্থান এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমিতে পরিণত হইবে।

ইহা ছাড়া ভারতের অন্যান্য বন্দরগুলির মধ্যে মালাবার উপকূলে অবস্থিত কুইলন ও তেলিচেরী, করমণ্ডল উপকূলে অবস্থিত নেগাপত্তন্ ও মসুলীপত্তন্ কচ্ছ উপসাগরের তীরে অবস্থিত বেদী বন্দর প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লোকবসতি (Distribution of Population)

লোকসংখ্যায় ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ; চীনের পরেই ভারতের স্থান। লোকবসতির উপর দেশের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। ভারতে মনুষ্য-সম্পদের অভাব না থাকায় কৃষিকার্যে, শিল্পে ও খনিজ সম্পদ আহরণে শ্রমিকের অভাব পরিলক্ষিত হয় না।

১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এই দেশের লোকসংখ্যা ৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ। মোট আয়তন ২৯,১৯,৮০০ বর্গ-কিলোমিটার ; সুতরাং প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে এই দেশের লোকসংখ্যা ১৫০ জন। কাগজ-পত্রে এই দেশে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ১৫০ জন লোক বাস করিলেও, কার্যকরী জমির অনুপাতে লোকবসতির ঘনত্ব আরও অনেক বেশী—প্রায় ২০০ জন। কারণ ভারতের বহুস্থান মনুষ্যবাসের অযোগ্য। যে সকল অঞ্চলে কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজাত উৎপাদনের পরিমাণ বেশী, সেখানে বসতি-ঘনত্বও বেশী। যেসকল স্থানে জমির উৎপাদিকা-শক্তি অধিক, সে সকল স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কৃষিকার্যের উপযোগী, যে সকল স্থানে ভূগর্ভ হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করা যায়, সেখানেই ঘনবসতি অঞ্চল পরিলক্ষিত হয়।

ভারতে জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫১ সালে এই দেশের লোকসংখ্যা ছিল ৩৫·৯ কোটি। ১৯৬২ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৪ কোটির অধিক হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার ছিল বৎসরে শতকরা ১·৯ জন এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় এই হার বৃদ্ধি পাইয়া ২·১৪ জনে দাঁড়াইবে। এই হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ১৯৬৬ সালে ভারতের লোকসংখ্যা হইবে ৪৯ কোটি এবং ১৯৭৬ সালে ৬২·৫ কোটি।

অনেক লোকসংখ্যাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, ভারতের লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। বর্তমান যুগে লোকবসতির আধিক্য শুধু সংখ্যা দিয়া বিচার করা হয় না। স্থানীয় সম্পদের কার্যকারিতা, স্থানীয় মানুষের সাংস্কৃতিক মান ও কর্মক্ষমতা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে মোট লোকসংখ্যার অনুপাত বিচার করিয়াই শুধু বলা যায় যে, কোন দেশে অত্যধিক লোকবসতি বিদ্যমান কিনা। ভারতে

যেভাবে অর্থনৈতিক সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, যেভাবে খনিজ সম্পদ ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে, এই দেশে অত্যধিক লোকবসতি বিদ্যমান বলিয়া মনে হয় না।

ভারতের লোকবসতি (১৯৬১)*

রাজ্য	আয়তন (সহস্র বর্গ-কিলোমিটার)	লোকসংখ্যা (লক্ষ)	প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে লোকবসতি
অন্ধ্র	২৭৪'৬	৩৫৯'৭	১৩১
আসাম	১২১'৯	১১৮'৬	৯৭
বিহার	১৭৪	৪৬৪'৬	২৬৭
গুজরাট	১৮৬'৮	২০৬'২	১১০
জম্মু ও কাশ্মীর	N.A.	৩৫'৮	N.A
কেরালা	৩৮'৮	১৬৮'৭	৪৩৪
মধ্যপ্রদেশ	৪৩৩'৪	৩২৩'৯	৭৩
মাদ্রাজ	১২৯ ৮	৩৩৬ ৫	২৫৯
মহারাষ্ট্র	৩০৭ ৯	৩৯৫	১২৮
মহীশূর	১৯১'৯	২৩৫'৪	১২৩
উড়িষ্যা	১৫৫'৮	১৭৫'৬	১১৩
পাঞ্জাব	১২১'৯	২০২'৯	১৬৬
রাজস্থান	৩৪২	২০১'৫	৫৯
উত্তরপ্রদেশ	২৯৩ ৮	৭৩৭'৫	২৫১
পশ্চিমবঙ্গ	৮৭'৮	৩৪৯'৬	৩৯৮'৬
নাগাল্যাণ্ড	—	৬'১	—
নেফা	—	১'৮	—
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৮'৩	'৬৩	৮
দিল্লী	১'৪	২৬'৪	১,০৮২
হিমাচলপ্রদেশ	২৮'১	১৩ ৪	৪৮
লাক্ষা, মিনিকয় ও আমিন দ্বীপপুঞ্জ	১০'৪	'২৪	৮৬১
ত্রিপুরা	—	১১'৪	১০৯
মণিপুর	—	৬'৪	—
মোট	২৯১৯'৮	৪,৩৮০	

লোকবসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণ (Factors for density and distribution of population)—উপরের পরিসংখ্যান হইতে দেখা যাইবে, ভারতে লোকবসতি-ঘনত্ব সর্বত্র সমান নহে। কেরালায় প্রতি

*Source—Monthly Abstract of Statistics, Central Statistical Organisation, September, 1961 & Third Five-Year Plan.

বর্গ-কিলোমিটারে ৪৩৪ জন লোক বাস করিলেও রাজস্থানে বাস করে মাত্র ৫৯ জন। বিভিন্ন কারণে বসতি-ঘনত্বের এই তারতম্য হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত কারণসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(ক) **জলবায়ু**—মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর জলবায়ুর প্রভাব অত্যন্ত বেশী বলিয়া অনুকূল জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে লোকসতির ঘনত্ব অধিক হইয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুর তারতম্য বিদ্যমান। রাজস্থানের বৃষ্টিহীন মরু অঞ্চল, আসামের অত্যধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত স্যাঁৎসেঁতে অস্বাস্থ্যকর অঞ্চল, গাঙ্গেয় উপত্যকার পরিমিত বৃষ্টিপাতযুক্ত কৃষি-অঞ্চল সবই এই দেশে বিদ্যমান। ভারত কৃষি-প্রধান দেশ। শতকরা ৭০ জন লোক প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকার্যের উপরনির্ভরশীল ; সেইজন্য যেখানেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কৃষিকার্যের উপযোগী সেখানেই ঘনবসতি পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য ভারতের বৃষ্টিপাতের মানচিত্রের (৩০০ পৃষ্ঠা) সঙ্গে লোকবসতির মানচিত্রের প্রভূত সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। পরিমিত ও নিশ্চিত বৃষ্টিপাতের অভাব না থাকায় অধিক লোকবসতি দেখিতে পাওয়া যায় কেরালা, মাদ্রাজ ও গাঙ্গেয় উপত্যকার রাজ্যসমূহে। অন্যদিকে রাজস্থানে বৃষ্টিপাতের অভাবে বসতি-ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা কম। বর্তমানে জলসেচের উন্নতি হওয়ায় পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে লোকবসতির ঘনত্ব ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইতেছে।

(খ) **ভূ-প্রকৃতি**—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমতলভূমি মানুষের বসবাসের উপযুক্ত স্থান। পার্বত্য অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন প্রায় অসম্ভব বলিয়া এখানকার লোকবসতি অত্যন্ত বিরল। এইজন্য হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্যাচলে এবং নেফা অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত বিরল। অন্যদিকে সমতলভূমিতে কৃষিকার্যের, শিল্পের ও যান-বাহনের উন্নতিসাধন সহজসাধ্য বলিয়া গাঙ্গেয় উপত্যকার সমভূমিতে (পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ), মহানদী-উপত্যকার সমতল-ভূমিতে (উড়িষ্যা) এবং শতদ্রু-উপত্যকার সমতলভূমিতে (পাঞ্জাব) ঘন লোকবসতি বিদ্যমান। এই সকল নদী-উপত্যকায় উর্বর জমি থাকায় কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। পার্বত্য অঞ্চলে রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ করা কঠিন, কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন করা কষ্টকর এবং এখানকার নদীসমূহ খরস্রোতা বলিয়া নৌ চলাচলের অনুপযোগী। এইজন্য পার্বত্য

অঞ্চলে (নেফা, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি) বিরল বা নাতিনিবিড় লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়।

(গ) **মৃত্তিকা**—উর্বর মৃত্তিকা কৃষিকার্যের বিশেষ উপযোগী সেইজন্য ভারতের উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যে ঘন-লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়।

(ঘ) **প্রাকৃতিক সম্পদ**—প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করে। খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই সকল সম্পদ-উৎপাদনকারী অঞ্চলে শিল্পের উন্নতি হওয়া স্বাভাবিক। ভারতের বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর খনিজ ও বনজ সম্পদ পাওয়া যায় বলিয়া বহু শিল্প এই সকল রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কাগজ শিল্প, যন্ত্রপাতি-নির্মাণ শিল্প, রেল-ইঞ্জিন-নির্মাণ শিল্প, রাসায়নিক শিল্প অধিকাংশই ভারতের এই চারিটি রাজ্যে অবস্থিত। শিল্পোন্নয়নের ফলে স্বভাবতঃই এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে লোকবসতির ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ঙ) **সাংস্কৃতিক উন্নতি**—প্রাচীনকালে ভারত সভ্যতার প্রধান বাহক হিসাবে জগতে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা প্রবর্তনের পূর্বেও যে এই দেশে ঘন-লোকবসতি বিদ্যমান ছিল, তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তন্মধ্যে ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা অন্যতম। আধুনিক যুগে বৃটিশ রাজত্বকালে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন না হওয়ায় সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি হয়। কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে ভারতে পুনরায় বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা প্রভৃতির চর্চা পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ফলে দেশের সাংস্কৃতিক মান-উন্নয়নে সাহায্য হইয়াছে, অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম হইয়াছে এবং ফলে লোকবসতিও বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহা সম্ভব হইয়াছে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে নূতন নূতন অঞ্চল সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে এবং এই সকল অঞ্চলের বসতি-ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। ভাকরা, মাইথন ও পাঞ্চেৎ অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণের পূর্বে কতজন লোক সেখানে বাস করিত? এখন এই সকল স্থানের লোকসংখ্যা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজস্থানের সুরতগড়ে

রাশিয়ার ইঞ্জিনিয়ারগণের সাহায্যে মরুভূমিকে শস্যশ্যামলা কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিবার পর ইহার লোকবসতি-ঘনত্ব শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বসতি-অঞ্চল (Density Zones)—লোকবসতির তারতম্যের ভিত্তিতে এই দেশকে তিনটি বসতি-অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়—(১) নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল, (২) নাতিনিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল এবং (৩) বিরল বসতিযুক্ত অঞ্চল।

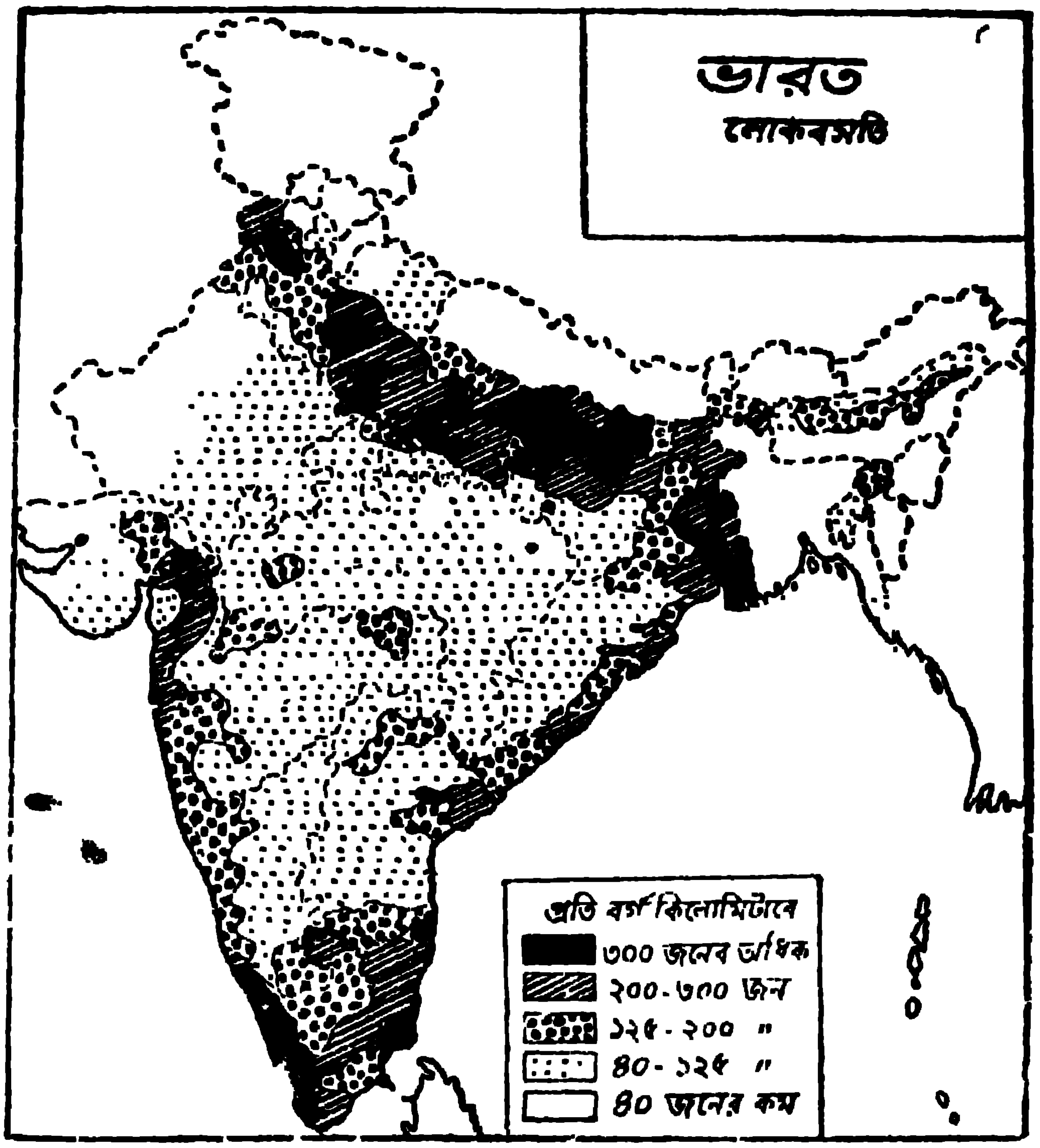

(১) নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল—গাঙ্গেয় উপত্যকা, মালাবার, কঙ্কণ ও উড়িষ্যার উপকূলভূমি এবং মাদ্রাজের উত্তরাংশে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ২০০ জনের বেশী লোক বাস করে। কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ ও দিল্লী এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের সকল স্থানে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কোন কোন স্থানে জলসেচের ব্যবস্থা বিদ্যমান। গাঙ্গেয় উপত্যকার মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান সমতলভূমি। সমতলভূমিতে কৃষিকার্য, শিল্প-বাণিজ্য

ও যানবাহনের উন্নতি হওয়ায় লোকবসতি ঘন হয়। গাঙ্গেয় উপত্যকার বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর খনিজ সম্পদ বিদ্যমান। কঙ্কণ উপকূলের বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর এবং বিহারের জামসেদপুর অঞ্চলে শিল্পোন্নতির জন্য লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। গাঙ্গেয় উপত্যকায় নদীর মারফত পরিবহণের সুবিধা আছে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বন্দর এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই সকল বন্দর ও ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলে লোকবসতি ঘন।

(২) **নাতিনিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল**—গুজরাটের পূর্বাংশ, পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি (অন্ধ্রের দক্ষিণাংশ, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ ও মহীশূরের কিয়দংশ) ও আসামের কিয়দংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বসতি প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ১২৫-২০০ জন। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে কৃষিকার্য করা হয়। ইহা শিল্পাঞ্চল হইতে দূরে অবস্থিত। মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া যানবাহনের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। কোন কোন স্থানে বৃষ্টিপাত কম বলিয়া কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন জলসেচের উপর নির্ভরশীল। কোন কোন অঞ্চলে (মহীশূর, আসাম) বনভূমি বিদ্যমান। খনিজ সম্পদের অপ্রতুলতা শিল্পের উন্নতিতে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। এই সকল কারণে এই অঞ্চলে নাতিনিবিড় লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। আসামের বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলে (গৌহাটি) ও চা-বাগান অঞ্চলের স্থানসমূহ (তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, কাছাড়, শিলচর, জোড়হাট) এবং ডিগবয়ের খনি অঞ্চলে লোকবসতি অপেক্ষাকৃত বেশী। আসামের অন্যান্য স্থান পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া এই সকল স্থানে বিরল লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়।

(৩) **বিরল বসতিযুক্ত অঞ্চল**—রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চল, হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, আসাম ও ছোটনাগপুরের বনভূমি অঞ্চল এবং মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্য পর্বত অঞ্চল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বন্ধুর ভূ-প্রকৃতির জন্য এখানে কৃষিকার্য ও পরিবহণের সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব নহে। কাশ্মীরের ভূ-প্রকৃতি বন্ধুর হওয়ায় এই রাজ্যের বসতি-ঘনত্ব অত্যন্ত কম। কোন কোন স্থানে নিবিড় অরণ্য বিদ্যমান। আসামের অধিকাংশ স্থান অরণ্যে পরিবৃত। এখানকার ভূ-প্রকৃতিও অসমতল। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের দরুন এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থান অস্বাস্থ্যকর। মরুভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম ; সেইজন্য কৃষিকার্যের অসুবিধা হয়। এই সকল কারণে এই অঞ্চলের স্থানসমূহে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে গড়ে ১২৫ জনের কম লোক বাস করে।

আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য
(Internal and Foreign Trade)

অর্থনৈতিক উন্নতির উপর কোন দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। অনুন্নত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশে বাণিজ্যের পরিমাণ অত্যন্ত কম এবং শিল্পোন্নত দেশে বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক বেশী। বৃটিশ রাজত্বে ভারতের অধিকাংশ স্থান অনুন্নত থাকায় বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত অল্প। কিন্তু স্বাধীনতার পর শিল্পের প্রসার হওয়ায় এবং কৃষিকার্যের উন্নতি হওয়ায় বাণিজ্যের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক এই দুইপ্রকার বাণিজ্যই সংঘটিত হইয়া থাকে। বিশাল আয়তনের দেশ বলিয়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক বেশী। সেই তুলনায় বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ এখনও ততটা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (Interal Trade)—ভারতে বর্তমানে মোট আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-দ্রব্যের মূল্য প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা। কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অধিকাংশ দ্রব্যই কৃষিজ দ্রব্য। ইহার মধ্যে গম ও ধান এই দুইটি প্রধান খাদ্যশস্য বহুলাংশে স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয়িত হয় বলিয়া ইহাদের বাণিজ্যের পরিমাণ খুব বেশী নহে। বর্তমানে শিল্প-নগরীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় **খাদ্যশস্যের** বাণিজ্যের পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। শিল্পোন্নত পশ্চিমবঙ্গকে সর্বদাই উড়িষ্যা ও অন্যান্য রাজ্য হইতে চাউল আমদানি করিতে হয়। বর্তমানে গমের বাজারেও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। গম ও ধান ভিন্ন অন্যান্য খাদ্যশস্যের অধিকাংশ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিশিষ্ট অংশ *গ্রহণ করে। ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতি শস্যের উৎপাদনের তুলনায় বাণিজ্যের পরিমাণ চাউল ও গম অপেক্ষা অনেক বেশী। কারণ কৃষকগণ নিজেরা এইসব শস্য খুব বেশী* পরিমাণে ভোগ করে না।

ভারতের **শিল্প-শস্যের** মধ্যে পাট, ইক্ষু, তুলা, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষকগণের ইহাই প্রধান অর্থপ্রসূ ফসল। কৃষকগণ এই সকল ফসল বিক্রয় করিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে।

ভারতে কৃষিজ দ্রব্য-বিক্রয়ের ব্যাপারে এখনও বহু **সমস্যা** বিদ্যমান।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষকগণ ন্যায্যমূল্য হইতে বঞ্চিত হয়। ফড়িয়াগণ শস্য তুলিবার পূর্বেই কৃষকগণকে টাকা ধার দেয় এবং শস্য উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কমমূল্যে তাহাদের নিকট শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য করে। ইহার ফলে কৃষকের পরিশ্রমের ফল আসলে ভোগ করে ফড়িয়াগণ। শিল্প-শস্যের ব্যাপারেও শিল্পপতিগণ ও তাহাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ শস্য উঠিবার সময় বাজারে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করে যাহাতে শস্যের বাজারদর কমিয়া যায়। ইহার ফলে কৃষকগণ শিল্প-শস্য অত্যন্ত কমমূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। প্রতিবৎসর ইক্ষু, তূলা, পাটের দর লইয়া কৃষকগণ ও মিলমালিকগণের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয় এবং সরকারকে এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য আগাইয়া আসিতে হয়। ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থান্বেষীদের কবল হইতে কৃষকদের মুক্ত করিতে না পারিলে কৃষির উন্নতিসাধন হওয়া কঠিন। সেইজন্য পরিকল্পনা কমিশন কৃষকগণকে সংগঠিত করিবার জন্য সমবায় আন্দোলনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। যদি কৃষকগণ সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিজ দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে পারে তবেই এই মূল্য-সমস্যার সমাধান সম্ভব।

ভারতে খনিজ দ্রব্য আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে না। শিল্পের মালিকগণ প্রচুর চুনাপাথর, ডোলোমাইট, তাম্র, বক্সাইট ও লৌহখনির মালিক। সুতরাং শিল্পের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ খনিজ দ্রব্য আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে না। কয়লা প্রায় সকল শিল্পে প্রয়োজন বলিয়া ইহার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সর্বাপেক্ষা বেশী। এই দেশের কয়লাখনি-সমূহ দেশের একপ্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার হইতে দেশের সকল অঞ্চলে কয়লা প্রেরিত হয়। লৌহ আকরিক আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে না। কারণ ইস্পাতশিল্পের মালিকগণের নিজস্ব লৌহখনি আছে; বাকি লৌহ অধিকাংশই রপ্তানিবাণিজ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

ভারতে শিল্পের প্রভুত উন্নতি হওয়ায় এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিল্পজাত দ্রব্যাদির আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার মধ্যে বস্ত্রের বাণিজ্য সর্বাপেক্ষা বেশী; কারণ অন্নের পরেই ভারতের ৪৪ কোটি লোকের প্রত্যেকের জন্য বস্ত্র প্রয়োজন। বোম্বাই, আমেদাবাদ, কোয়েম্বাটুর, কলিকাতা ও কানপুরের কাপড়ের মিল হইতে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তাঁতশিল্প হইতে ভারতের সকল স্থানে বস্ত্র প্রেরিত হয়। ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বস্ত্র সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

ইহা ছাড়া চিনি ও গুড়ের বাণিজ্যের পরিমাণও অত্যন্ত বেশী। বর্তমানে ইস্পাত-দ্রব্য, ঢালাই-লৌহ রাসায়নিক দ্রব্য, সার, কাগজ, সিমেণ্ট, মোটর-গাড়ী প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাণিজ্যের পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। পাটজাত দ্রব্যাদি ও চা-এর আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অপেক্ষা বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বেশী।

ভারতের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের কিছুটা উন্নতি হইতেছে বলিয়া মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই।

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)—বর্তমান যুগে মানুষের চাহিদার শেষ নাই। সেইজন্য কোন দেশই সকল প্রকার দ্রব্যাদির উৎপাদনে স্বাবলম্বী নহে। সকল দেশকেই অন্যদেশ হইতে কম-বেশী নানারকমের দ্রব্যাদি আমদানি করিতে হয়; এই সকল দ্রব্যের মূল্য মিটাইবার জন্য আবার রপ্তানিও করিতে হয়। আমদানি ও রপ্তানি লইয়াই বৈদেশিক বাণিজ্যের সৃষ্টি। ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া কোন দেশই এদেশ হইতে বহুদূরে নয়। ইহা ছাড়া ভারতের তিনদিকে জল। সেইজন্য পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করিতে ভারতবর্ষকে জলপথে অপেক্ষাকৃত কম ভাড়া দিতে হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির এইরূপ ভৌগোলিক সুবিধা বিদ্যমান থাকায় প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ (ভারত ও পাকিস্তান) বহির্বাণিজ্যে উন্নত ছিল। প্রাক্-বৃটিশযুগে সিংহল, চীন, জাভা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রচুর নজীর পাওয়া যায়। ঢাকার 'মস্‌লিন' ও কেরালার 'ক্যালিকো' পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হইত। চীন হইতে এদেশে চিনি আমদানির কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়।

বৃটিশ রাজত্বে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি ইংরেজদের স্বার্থে পরিবর্তিত হয়। ইংরেজগণের এদেশে রাজত্ব করিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সম্পদকে শোষণ করিয়া বৃটেনে লইয়া যাওয়া। সেইজন্য তাহারা এদেশের কাঁচামাল বৃটেনে লইয়া সেখানকার শিল্পে নিয়োজিত করিত এবং সেখানকার শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য এদেশে আনিয়া অধিকমূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠন করিত। তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের গতি সেইভাবেই নিরূপিত করিত। সেই সময় প্রচুর কাঁচামাল এদেশ হইতে বৃটেনে রপ্তানি হইত; কিন্তু ভারতীয় লোকদের বিদেশী শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার আর্থিক ক্ষমতা কম ছিল। ফলে ভারতবর্ষের

বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানি সর্বদাই আমদানি অপেক্ষা বেশী হইত।* এইভাবে ভারতবর্ষের উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের অর্থ বৃটেনে সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহাই ভারতবর্ষের স্টার্লিং ব্যালান্স (Sterling Balance)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষে যুদ্ধোপকরণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। ইহাতে স্টার্লিং ব্যালান্সের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং ১৬০০ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং-এ আসিয়া দাঁড়ায়। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষকে এই ঋণ বৃটেন বহুলাংশে পরিশোধ করিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারত মহাসাগরে জাপানী সাবমেরিনের ভয়ে বৃটিশ সরকারকে বিদেশ হইতে যুদ্ধোপকরণ ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য এদেশে আমদানি করিতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সেইজন্য যুদ্ধের সময় এবং পরে ভারতে কয়েকটি শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষ দুইভাগে বিভক্ত হয়—**ভারত** ও **পাকিস্তান**। ইহাতে দুই দেশের বাণিজ্যের গতিবিধির কিছুটা পরিবর্তন হয়। যেমন পূর্বে কলিকাতা বন্দর হইতে প্রচুর পাট ও চামড়া রপ্তানি করা হইত এবং বোম্বাই ও করাচী হইতে তূলা রপ্তানি করা হইত। কিন্তু দেশ-বিভাগের পর হইতে অধিকাংশ শিল্পকেন্দ্র ভারতে অবস্থিত হওয়ায় এদেশে এই সকল কাঁচামালের অভাব হইল। সেইজন্য ভারত এই সকল কাঁচামালের আমদানিকারক হইল।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের বর্তমান প্রগতি (Trend of India's Foreign Trade)—ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর দেশের বহির্বাণিজ্যে মূলগত পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমানে ভারতের বহির্বাণিজ্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (Features) রহিয়াছে। যথা—

(১) ভারতে বর্তমানে শিল্পের অগ্রগতি হওয়ায় ভোগ্যদ্রব্যের আমদানি কমিয়া যন্ত্রপাতির আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। যন্ত্রপাতির মূল্য বেশী বলিয়া বর্তমানে ভারতে বহির্বাণিজ্যের গতি অনুকূলে থাকিতেছে না, বরং ভারত বিদেশের নিকট প্রচুর দেনায় আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে।

(২) কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতের শিল্পোন্নতির ফলে এদেশের কাঁচামালের রপ্তানি কমিয়া আসিতেছে এবং ভোগ্যদ্রব্যের আমদানিও হ্রাস পাইতেছে।

(৩) পূর্বে ভারত কয়েকটি কাঁচামাল (পাট, তূলা) রপ্তানি করিত। পাকিস্তানের অংশে এই সকল কাঁচামাল-উৎপাদক অঞ্চলের কিয়দংশ চলিয়া

যাওয়ায় ভারত এই সকল দ্রব্য এখন রপ্তানি না করিয়া দেশীয় শিল্পের চাহিদা মিটাইবার জন্য আমদানি করিতেছে।

(৪) স্বাধীনতার পর ভারতের বহির্বাণিজ্যের সম্পর্কেরও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বৃটেনের সঙ্গে ভারতের অধিকাংশ বহির্বাণিজ্য সংঘটিত হইত। কিন্তু বর্তমানে দেশ স্বাধীন হওয়ায় ভারত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাহার বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেছে। বিশেষতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, জাপান, চীন, জার্মানী, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

(৫) পূর্বে ভারতের প্রায় সমগ্র বহির্বাণিজ্যই সমুদ্রপথে পরিচালিত হইত। বর্তমানে আফগানিস্তান, ইরান ও পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় স্থলপথেও উল্লেখযোগ্য বহির্বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

(৬) দেশের খাদ্যাভাব পূরণ করিবার জন্য এখনও প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইতেছে। খাদ্যশস্য ও যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ভারতে প্রতিবৎসর বহির্বাণিজ্যের গতি প্রতিকূলে যাইতেছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন (Reconstruction of Foreign Trade)—ভারতের আয়তন বিশাল হইলেও এবং এই দেশ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বহির্বাণিজ্য সংঘটিত করিলেও পৃথিবীর মোট বহির্বাণিজ্যের তুলনায় ভারতের স্থান এখনও নগণ্য। ১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১,৪৭০ কোটি ডলার, বৃটেনের ১,২৪৩ কোটি ডলার, পশ্চিম জার্মানীর ১,০১০ কোটি ডলার, ফ্রান্সের ৬২৮ কোটি ডলার, কানাডার ৫৬৬ কোটি ডলার এবং জাপানের ২৪১ কোটি ডলার; কিন্তু ঐ বৎসর ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১৯০ কোটি ডলার। পৃথিবীর মোট বহির্বাণিজ্যের শতকরা মাত্র ২'৫ অংশ ভারতের। ইহার প্রধান কারণ ভারত এখনও কৃষিপ্রধান দেশ এবং প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি এখনও এই দেশে কিছুটা চালু আছে। অবশ্য বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে যেভাবে এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই।

কয়েকটি সামগ্রীর রপ্তানি-বাণিজ্যে ভারত পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। তন্মধ্যে পাটজাত দ্রব্যাদি, চা, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, ইল্‌মেনাইট, মোনাজাইট, জিরকন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারত এখনও যন্ত্রপাতি-নির্মাণ শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ না করায় এবং কয়েকটি সামগ্রী এই দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন না হওয়ায়, এই সকল দ্রব্যাদির জন্য ভারত আমদানির উপর নির্ভরশীল। এই দেশের আমদানি-দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, খনিজ তৈল, ইস্পাত দ্রব্য, খাদ্যশস্য প্রভৃতি।

বর্তমানে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতে নূতন নূতন শিল্পস্থাপনের জন্য প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান্ যন্ত্রপাতি আমদানি হইতেছে। ইহা ছাড়া কৃষির উন্নতির জন্য বাঁধ-নির্মাণ প্রভৃতির জন্য বহু বিদেশী ইঞ্জিনিয়ার ও যন্ত্রপাতি আমদানি হইতেছে। ইহার ফলে আমদানির পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার তুলনায় রপ্তানি-দ্রব্যের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। সেইজন্য বর্তমানে ভারতে প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রগতি ও লক্ষ্য (কোটি টাকা)

	আমদানি	রপ্তানি	ঘাটতি
১৯৫১	৯৭০	৭৪২	২২৮
১৯৫৬	৮৪৯	৬২০	২২৯
১৯৫৯	৯৬১	৬৪০	৩২১
১৯৬১	১০৩৭	৬২৯	৪০৮
১৯৬১-৬৬ (বাৎসরিক গড় ; লক্ষ্য)	১২৭০	৭৪০-৭৬০	৫১০-৫৩০

বিভিন্ন **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার** মাধ্যমে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের এই ঘাটতি-পূরণের চেষ্টা হইতেছে। রপ্তানি-বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া ঘাটতি-পূরণের চেষ্টা করা হইলেও বৈদেশিক রাজনীতি এবং দেশীয় অর্থনীতির অক্ষমতার দরুন সর্বদা এই চেষ্টা সাফল্যে পরিণত হয় নাই। সেইজন্য মনে হয় যে, যদি ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের **পুনর্গঠন (Reconstruction)** করা না হয় তাহা হইলে বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি-পূরণ শেষপর্যন্ত সম্ভব হইবে না এবং ইহার ফলে দেশের অর্থনীতিতে এক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বহির্বাণিজ্যের পুনর্গঠনের কিছুটা চেষ্টা করা হয়। প্রথমতঃ চা, কার্পাস-বস্ত্র, রেশম, রেয়ন, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, তামাক, মসলা, কাজুবাদাম, চর্ম, প্লাস্টিক-দ্রব্য, অভ্র ও খেলাধুলার দ্রব্যাদির রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য এই সকল দ্রব্যাদির প্রত্যেকটির জন্য একটি করিয়া 'রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা' (Export Promotion Council) গঠিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ,রপ্তানি বীমার বন্দোবস্তের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে Export Risks Insurance Corporation। তৃতীয়তঃ, চা, কফি ও নারিকেল-দড়ির রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য এই সকল দ্রব্যাদির জন্য গঠিত বোর্ডসমূহের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, বিদেশে মেলার মাধ্যমে এবং প্রচারের দ্বারা ভারতীয় দ্রব্যাদির গুণাগুণ সম্বন্ধে এবং সুলভতা সম্বন্ধে বিদেশের ক্রেতাদের মন জয় করিবার চেষ্টা হইতেছে। পঞ্চমতঃ, রপ্তানি-শুল্কের হার কমাইয়া বা এই শুল্ক প্রত্যাহার করিয়া, রপ্তানি-দ্রব্যের উৎপাদন খরচের কিয়দংশ বহন করিয়া, রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির সুবন্দোবস্ত করিয়া,রপ্তানযোগ্য দ্রব্যাদির পরিবহণের সুবন্দোবস্ত করিয়া সরকার রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত করিতেছে। ষষ্ঠতঃ, সরকার নিয়ন্ত্রিত State Trading Corporation-এর সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানি নির্ধারিত হইয়াছে ৩৮০০ কোটি টাকা। এইজন্য রপ্তানি-বৃদ্ধির নানাবিধ পন্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির আভ্যন্তরীণ চাহিদা কমাইয়া রপ্তানির জন্য এই সকল দ্রব্য যতদূর সম্ভব ছাড়িয়া দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, রপ্তানির উপর লাভের পরিমাণ-বৃদ্ধির বন্দোবস্ত করিতে হইবে। নতুবা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অধিকতর লাভের আশায় ব্যবসায়িগণ রপ্তানির দিকে দৃষ্টি দিবে না। তৃতীয়তঃ, রপ্তানিযোগ্য শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন-খরচ কমাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, যাহাতে বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করা যায়; চতুর্থতঃ, বিদেশে সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া, ভারতীয়গণকে বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সাময়িকভাবে ত্যাগ স্বীকার করিতে বলিয়া, রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য গবেষণা চালাইয়া এবং জনসাধারণের সহযোগিতা চাহিয়া রপ্তানি-বাণিজ্যের উন্নতি-সাধনের বন্দোবস্ত করা হইবে। আশা করা যায়, তৃতীয় পরিকল্পনায় নির্ধারিত রপ্তানির লক্ষ্য পূর্ণ হইবে।

রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য উপরে বর্ণিত যে সকল পন্থা বিভিন্ন পরিকল্পনায় গৃহীত হইয়াছে, তাহা কার্যকরী হইলে ও সাফল্য লাভ করিলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বহুলাংশে পুনর্গঠিত হইবে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যে চিরাচরিত দ্রব্যাদি (চা, পাট, কার্পাস-বস্ত্র, লৌহ আকরিক প্রভৃতি ছাড়াও কয়েকটি **শিল্পজাত দ্রব্য** বিশিষ্ট

স্থান অধিকার করিয়াছে। যথা, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, পূর্তশিল্পজাত দ্রব্য, রসায়ণ দ্রব্য, রেশম বস্ত্র, নারিকেল দড়ির জিনিস প্রভৃতি বর্তমানে এই সকল রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্য প্রায় ৬৭ কোটি টাকা। আশা করা যায়, দেশের শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই সকল দ্রব্যাদির মধ্যে বাই-সাইকেল, সেলাইয়ের কল, বৈদ্যুতিক পাখা, ছোটখাটো যন্ত্রপাতি, ঢালাই-লৌহ, জুতা, প্লাস্টিকের দ্রব্য, রবার দ্রব্য প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রপ্তানি-বৃদ্ধি ছাড়াও ভারতে আমদানি-দ্রব্য যতদূর সম্ভব হ্রাস করিয়া এবং বাণিজ্যের গতি পরিবর্তন করিয়া এই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। পূর্বে এই দেশের অধিকাংশ বহির্বাণিজ্য সংঘঠিত হইত বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে। কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবৎ রাশিয়া,চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সংঘটিত করিয়া এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, এই সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে অনেক সুবিধাজনক শর্তে বাণিজ্য চালানো সম্ভব। এই সকল দেশ উন্নতিশীল ভারতকে সাহায্য করিবার জন্য তাহাদের রপ্তানিদ্রব্যের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় গ্রহণ করে। ইহাতে ভারতের রপ্তানিবাণিজ্যের সুবিধা হয়। সুতরাং এই সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে যতদূর সম্ভব বাণিজ্য সংঘটিত করিয়া ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারত এই সকল দেশের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত করিয়া বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেছে।

আমদানি (Imports)—ভারতের আমদানি-দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি, ধাতব দ্রব্যাদি ও খাদ্যশস্য উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। শিল্পায়নের জন্য যন্ত্রপাতি-আমদানি একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও, খাদ্যশস্যের জন্য প্রতিবৎসর প্রায় ৮১ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। কারণ ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং স্বাধীনতার ১৬।১৭ বৎসরের মধ্যেও সে খাদ্যে স্বাবলম্বী হইতে পারিল না, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ইহার আমদানি বন্ধ করা উচিত। বর্তমানে ভারতে ক্রমশঃ আমদানি হ্রাস করিবার চেষ্টা হইতেছে। নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী না হইলে, তাহার জন্য আমদানি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় না। ইহার ফলে আমদানির পরিমাণ সামান্য কমিয়াছে। কিন্তু এখনও রপ্তানি অপেক্ষা আমদানির পরিমাণ অনেক বেশী।

আমদানি (১৯৬৩-৬৪)*

আমদানি-দ্রব্য	মূল্য (কোটি টাকা)	রপ্তানিকারক দেশসমূহ
১। **খাদ্যদ্রব্য** (গম, চাউল, যব, ভুট্টা, ফল, তামাক, দুগ্ধজাত দ্রব্য, উদ্ভিজ্জ তৈল, মৎস্য, মসলা, পশুখাদ্য)	১৪৩	কানাডা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান।
২। **কাঁচামাল** (তূলা, পাট, কাষ্ঠমণ্ড, খনিজ দ্রব্য, পশম)	১০৩	কানাডা, সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড (কাষ্ঠমণ্ড), পাকিস্তান (পাট), মিশর, মাঃ যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান (তূলা)।
৩। **শিল্পজাত দ্রব্য** (লৌহ ও ইস্পাত, ধাতু-দ্রব্য, কাগজ, রবার)	১০১	বৃটেন, পঃ জার্মানী, রাশিয়া, বেলজিয়াম, জাপান, ফ্রান্স (ইস্পাত ও ধাতুদ্রব্য), কানাডা, সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড (কাগজ), সিংহল, মালয়, ইন্দোনেশিয়া (রবার)।
৪। **খনিজ তৈল** (খনিজ তৈল ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি)	১০৪	ইরাণ, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মাঃ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ।
৫। **পরিবহণ-দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি** (মোটর-গাড়ী, রেল-ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি, জাহাজ, বিমানপোত, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি)	৫০৫	বৃটেন, রাশিয়া, মাঃ যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, পঃ জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি, বেলজিয়াম চেকোশ্লোভাকিয়া।
৬। **রাসায়নিক দ্রব্য** (রাসায়নিক-দ্রব্য রং, ঔষধ, সুগন্ধি ও বিস্ফোরক দ্রব্য)	৯৬	বৃটেন, পঃ জার্মানী, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
৭। **অন্যান্য দ্রব্য** (জন্তুর চর্বি ও তৈল, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ঘড়ি, চশমা, রেশম)	৯১	
মোট	১,১৪৩	

* Source—Commerce, Annual Number, 1964

যে সকল দেশ হইতে ভারতে পণ্যদ্রব্য আমদানি হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী ও রাশিয়ার স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে জাপান, ইটালি, ফ্রান্স, সাউদি আরব ও কানাডা প্রধান।

রপ্তানি (Exports)—ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যের পরিমাণ আমদানির তুলনায় বৃদ্ধি পাইতেছে না। শিল্পের আরও উন্নতি না হইলে এবং ভোগ্য-দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলে রপ্তানি-বৃদ্ধির আশা সুদূরপরাহত। ভারতের রপ্তানিযোগ্য জিনিসের মধ্যে চা, পাটজাত দ্রব্য, কার্পাস-বস্ত্র এবং খনিজ ও কৃষিজ কাঁচামাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ শিল্পোন্নত দেশসমূহ ভারতের রপ্তানি-দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা।

ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য প্রধানতঃ ছয়টি **বাণিজ্যিক অঞ্চলে** সীমাবদ্ধ। প্রথমতঃ, বৃটেন, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া ও পর্তুগাল লইয়া গঠিত পশ্চিম ইউরোপের 'অবাধ বাণিজ্য এলাকার' (Free Trade area) দেশসমূহ ভারতীয় রপ্তানির শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে; ইহার অধিকাংশই বৃটেন ক্রয় করে। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের দেশসমূহ ভারতের মোট রপ্তানির শতকরা প্রায় ৭'৭ ভাগ গ্রহণ করে। এই সকল দেশের মধ্যে পশ্চিম জার্মানীর অংশ সর্বাপেক্ষা বেশী; ইহার পরেই ফ্রান্সের স্থান। তৃতীয়তঃ, 'ইকাফে' (ECAFE) অঞ্চলের দেশসমূহ ভারতীয় রপ্তানি-বাণিজ্যের শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ গ্রহণ করে। ইহার মধ্যে জাপানের অংশ শতকরা ৫'৫ ভাগ, সিংহলের অংশ ৩'৪ ভাগ এবং ব্রহ্মদেশের অংশ ২'১ ভাগ। 'ইকাফে'র অন্তর্গত অন্যান্য দেশ-সমূহের মধ্যে রহিয়াছে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয় ও আফগানিস্তান। চতুর্থতঃ, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের (রাশিয়া, চীন, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, কোরিয়া, ভিয়েটনাম প্রভৃতি) সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতেছে। বর্তমানে এই সকল দেশ ভারতের মোট রপ্তানির শতকরা ১০ ভাগ গ্রহণ করে। এই সকল দেশ ইহাদের রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্য টাকায় গ্রহণ করিতে রাজি হয় বলিয়া এই সকল দেশে ভারতীয় দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইতেছে। পঞ্চমতঃ, আফ্রিকার দেশসমূহের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের ক্রমশঃই উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে; বিশেষতঃ সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত ঘানা, আলজেরিয়া, গিনি, কঙ্গো,

সুদান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে নূতনভাবে বাণিজ্যিক লেনদেন হইতেছে। ইঁহারা ভারতের মোট রপ্তানির শতকরা ৫ ভাগ গ্রহণ করে। ষষ্ঠতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ল্যাটিন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশ ভারতের মোট রপ্তানির শতকরা ২১ ভাগ ক্রয় করে; ইহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ প্রায় ১৫'৩ শতাংশ।

রপ্তানি (১৯৬৩-৬৪)

রপ্তানি-দ্রব্য	মূল্য (কোটিটাকা)	আমদানিকারক দেশসমূহ
১। **চা** (কফি, কোকো, মসলা সমেত)	১৩১	বৃটেন, মাঃ যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, অস্ট্রেলিয়া, কানাড়া, পশ্চিম জার্মানী, ইরাক, রাশিয়া।
২। **পাটজাত দ্রব্য**	১৫৭	বৃটেন, মাঃযুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, কানাডা, মিশর, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, জাপান।
৩। **বস্ত্রাদি ও সূতা** (কার্পাস, পশম, রেশম ও অন্যান্য বস্ত্র ও সূতা)	৫৬	ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মিশর, ইরাণ, ইরাক, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স।
৪। **খনিজ দ্রব্য** (ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ আকরিক, অভ্র, কয়লা)	৫৮	জাপান, বৃটেন(লৌহআকরিক), পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইটালি (ম্যাঙ্গানিজ), ব্রহ্মদেশ। সিংহল ও পাকিস্তান (কয়লা), ব্রহ্মদেশ, সিংহল।
৫। **রাসায়নিক দ্রব্য**	৭	রাশিয়া, সিংহল, ব্রহ্মদেশ।
৬। **শিল্পজাত দ্রব্য** (চর্ম-দ্রব্য, প্লাস্টিক-দ্রব্য, কাগজ, ইস্পাত, সেলাই-কল, বৈদ্যুতিক পাখা, বাই-সাইকেল, যন্ত্রপাতি)	৪৭	মিশর, পাকিস্তান, পূর্ব আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়।
৭। **কাঁচামাল** (তূলা, তৈলবীজ, কাঠ, কাঁচা-চামড়া, কাঁচা-পাট, কার্পাস, সূতা)	৬০	মাঃযুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পঃজার্মানী, জাপান, ফ্রান্স (চামড়া ও পাট), বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালি, সিংহল, (তৈলবীজ), জাপান, বৃটেন(তূলা ও সূতা)।

রপ্তানি-দ্রব্য	মূল্য (কোটি টাকা)	আমদানিকারক দেশসমূহ
৮। **খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় দ্রব্য** (ফল, মৎস্য, তরকারী, পশুজাত ও উদ্ভিজ্জ তৈল, চিনি, তামাক)	১৮৮	সিংহল, বৃটেন (তামাক), কানাডা, সিংহল, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (মসলা), পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল (চিনি, ফল, মৎস্য তরকারী ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্য)।
৯। **অন্যান্য দ্রব্য** (গঁদ, লাক্ষা, রাসায়নিক দ্রব্য)	৮০	মাঃ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী (গঁদ ও লাক্ষা), সিংহল, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান (রাসায়নিক দ্রব্য)।
মোট	৭৮৪	

উপরে আমদানি-রপ্তানির যে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা হইতে আমদানি-রপ্তানির গতি, বিশেষতঃ কোন্ কোন্ দেশের সঙ্গে ভারতের জিনিসপত্র আমদানি-রপ্তানি হয় তাহাও বুঝা যাইবে। দেশ হিসাবে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি নিম্নে দেওয়া হইল :

(১৯৬৩-৬৪ সাল)

দেশসমূহ	আমদানি (কোটি টাকা)	রপ্তানি (কোটি টাকা)
বৃটেন	১৬৯	১৬১
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৯০	১২৮
পশ্চিম জার্মানী	৮৯	১৯
জাপান	৬৩	৫৯
রাশিয়া	৬৪	৫২
কানাডা	২৪	২১
অস্ট্রেলিয়া	১৭	১৮
সিংহল	৬	১৯
ফ্রান্স	১৪	৯
ব্রহ্মদেশ	৯	৬
মিশর	১৫	১৩
পাকিস্তান	৯	৭
চেকোশ্লোভাকিয়া	১৭	১৬
পূর্ব জার্মানী	১০	১০

প্রধান প্রধান দেশসমূহের সহিত ভারতের বাণিজ্য—উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সর্বাপেক্ষা বেশী।

(১) **ভারত বৃটেন বাণিজ্য**—বৃটেনের সহিত ভারতের বাণিজ্য সর্বাপেক্ষা বেশী। ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে এখনও ইংরেজ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির আধিপত্য বিদ্যমান। ইহাদের মারফত বৃটেনের সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যন্ত্রপাতি, মোটর-গাড়ী, রাসায়নিক দ্রব্য, সাইকেল, ইস্পাত-সামগ্রী, মদ্য, ঔষধ, পশম ও কার্পাস-দ্রব্য প্রভৃতি বৃটেন হইতে ভারতে **আমদানি** হয়। ইহার মধ্যে যন্ত্রপাতির মূল্য সর্বাধিক। পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, লৌহ আকরিক, কার্পাস ও কার্পাস-পশম, তামাক, কফি, রবার, লাক্ষা, দড়ি, মসলা প্রভৃতি এদেশ হইতে বৃটেনে **রপ্তানি** করা হয়।

(২) **ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য**—দেশ স্বাধীন হইবার পর এই দেশের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গম, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, তুলা, ঔষধপত্র, মোটর-গাড়ী, খনিজ তৈল, রবার, ইস্পাত-দ্রব্য, তামাক, কাগজ ও বোর্ড, কার্পাস-বস্ত্র প্রভৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে **আমদানি** হয়। লাক্ষা, অভ্র, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, ম্যাঙ্গানিজ, পশম, ইল্‌মেনাইট, ফল, মসলা, তৈলবীজ প্রভৃতি এদেশ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে **রপ্তানি** করা হয়।

(৩) **ভারত-পশ্চিম জার্মানী বাণিজ্য**—লৌহ ও ইস্পাত-দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, কাচ, যন্ত্রপাতি, প্লাস্টিক-দ্রব্য, কাগজ প্রভৃতি পশ্চিম জার্মানী হইতে ভারতে **আমদানি** হয় এবং পাটজাত দ্রব্য, চা, তামাক, তুলা লৌহ আকরিক, মসলা, চামড়া, ম্যাঙ্গানিজ, হরীতকী, অভ্র, দড়ি, পশম, কার্পাস-বস্ত্র, লাক্ষা, তৈলবীজ প্রভৃতি ভারত হইতে পশ্চিম জার্মানীতে **রপ্তানি** হয়।

(৪) **ভারত-রাশিয়া বাণিজ্য**—বৃটিশ রাজত্বকালে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে বৃটিশ সরকার ভারতের সহিত রাশিয়ার বাণিজ্য অনুমোদন করিত না। রাশিয়ার সঙ্গে ভারত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে বৃটেনের আর্থিক লোকসানের সম্ভাবনা ছিল এবং প্রতিযোগিতার ভয় ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের সহিত রাশিয়ার বাণিজ্য প্রতিবৎসর বাড়িয়া

যাইতেছে। রাশিয়া কর্তৃক সুবিধাজনক শর্তে পণ্যদ্রব্য দেওয়ার ফলে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া বাজার নষ্ট হইতে বসিয়াছে। খনিজ তৈল ও তজ্জাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, ইস্পাত-দ্রব্য প্রভৃতি রাশিয়া হইতে ভারতে **আমদানি** হইতেছে এবং ইহার পরিবর্তে পাটজাত দ্রব্য, চা, প্লাস্টিক-দ্রব্য, অভ্র, চর্মদ্রব্য প্রভৃতি নানাবিধ ভোগ্যদ্রব্য এদেশ হইতে রাশিয়ায় **রপ্তানি** হইতেছে।

ভারত-রাশিয়া বাণিজ্য (কোটি টাকা)*

বৎসর	ভারত হইতে রপ্তানি	ভারতে আমদানি
১৯৫৫-৫৬	৩'২৬	৬'২১
১৯৬০-৬১	৩০'৩৮	১৭'১৯
১৯৬৩-৬৪	৫২'২৫	৬৩'৯৯

(৫) **ভারতত-পাকিস্তান বাণিজ্য**—ভারতে মুদ্রামূল্য হ্রাস করিবার ফলে ১৯৪৯ সাল হইতে ভারতের সহিত পাকিস্তানের বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়। পরে চুক্তির মারফত বাণিজ্য সুরু হয়। ১৯৫৭ সালে তিন বৎসরের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এক চুক্তি হইয়াছিল। পুনরায় ১৯৬০ সালে নূতন এক চুক্তি হয়। পাট, তুলা, পশম, খাদ্যশস্য, চামড়া, ডিম, সুপারি, ফল, তরকারী, মৎস্য প্রভৃতি পাকিস্তান হইতে ভারতে **আমদানি** হয় এবং লৌহ ও ইস্পাত-দ্রব্য, চা, তামাক, চলচ্চিত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, সিমেণ্ট, কয়লা, কার্পাস-বস্ত্র, গুড়, চিনি, কাগজ পাকিস্থানে **রপ্তানি** হয়।

ভারতের আড়তদারী বাণিজ্য (Entrepot Trade of India)—ভারত মহাসাগরের উত্তরে ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। সেইজন্য এই দেশ সামুদ্রিক বাণিজ্যের মাধ্যপথে অবস্থিত। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে যে সকল দেশ আছে (নেপাল, ভুটান, চীনের তিব্বত, আফগানিস্তান, ইরাণ) তাহাদের পক্ষে সোজা সামুদ্রিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। এই সকল দেশের বহির্বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য ভারতের উপর দিয়া যায়। ইহাতে ভারতের কিছু লাভ (Middleman's profit) হয়। ইহা ছাড়া পশ্চিম গোলার্ধের দেশগুলি হইতে রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, ধাতুদ্রব্য প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ভারত আমদানি করিয়া পুনরায় ব্রহ্মদেশ, সিংহল,

* Source—Commerce, Annual, 1964

পূর্ব আফ্রিকা, আফগানিস্তান, চীন প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করে। বর্তমানে এইজাতীয় বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে। ভারত সরকার আড়তদারী বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।

সীমান্ত-পথের বাণিজ্য (Frontier Trade of India)—ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বত অবস্থিত হইলেও, ইহার মধ্য দিয়া যে গিরিপথ আছে, ইহা সীমান্ত-বাণিজ্যের সহায়ক। সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক হইতে **জেলেপ লা** ও **নাথুলা** গিরিপথে তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত যাওয়া যায়। এই পথে তিব্বত হইতে পশম, লবণ, স্বর্ণ, কস্তুরী প্রভৃতি এদেশে আসে এবং খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্রাদি, চিনি প্রভৃতি তিব্বতে যায়। এই পথে পশমের বাণিজ্য সর্বাপেক্ষা বেশী হয় বলিয়া ইহাকে 'পশম-পথ' বলে। উত্তরপ্রদেশ হইতে **নীতিপথে** তিব্বত যাওয়া যায়। গাড়োয়াল হইতে এই পথ সুরু হইয়াছে। এই পথে পশমের বাণিজ্য হইয়া থাকে। শ্রীনগর ও সোনমার্গ হইতে **জোজিলা** গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া লাডাকে যাওয়া যায়। লেহ্ হইতে **কারাকোরাম** গিরিরন্ধ্রের মধ্য দিয়া সিংকিয়াং পর্যন্ত যাওয়া যায়। ভামোর মধ্য দিয়া চীন ও ব্রহ্মদেশের সহিত বাণিজ্য চলে। পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্য দিয়া ঐ দেশের খাইবার, কুরম, গোমাল ও বোলান গিরিপথে আফগানিস্তান ও ইরাণের সহিত বাণিজ্য চলে। এই সকল পথে চাউল, ঘি, কাঁচা পশম, হিং, সোহাগা প্রভৃতি দ্রব্য আমদানি হয় এবং বস্ত্রাদি, লবণ, চিনি ও ধাতুদ্রব্য রপ্তানি হয়। স্থলপথে ও রেলপথে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিবৎসর প্রায় ১৭ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে। আফগানিস্তানের সঙ্গে ৭ কোটি টাকার, নেপালের সঙ্গে ১½ কোটি টাকার এবং ইরাণের সঙ্গে ১৯ কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য প্রতিবৎসর আমদানি-রপ্তানি হয়।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের প্রভাব (Impact of European Common Market on India's Foreign Trade)—পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ ও নেদারল্যাণ্ডস্ এই ছয়টি দেশ যুদ্ধোত্তর কালে নিজেদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য ১৯৫৭ সালে একটি অর্থনৈতিক সংস্থা গঠন করিয়াছে। ইহার নাম European Economic Community। এই সংস্থার দেশসমূহের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চলে, কোনপ্রকার শুল্কের

প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য করিবার সময় ইহারা একই শুল্ক-নীতি মানিয়া চলে। ইহার ফলে এই ছয়টি দেশ লইয়া যে বৃহত্তর বাজার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাকেই ইউরোপীয় সাধারণ বাজার (European Common Market) বলে। ভারতের সঙ্গে এই সকল দেশের বাণিজ্যের ব্যাপকতা খুব বেশী নহে; তা ছাড়া ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যের উপর ইহা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

সম্প্রতি **বৃটেন** এই সংস্থায় যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করায় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিয়াছেন। কারণ প্রায় ২০০ বৎসর যাবৎ ভারতের সঙ্গে বৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী হইয়া আসিতেছে। ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া ভারতের বহির্বাণিজ্য সর্বাদাই বৃটেনের অঙ্গুলিসঙ্কেতে চলিত। ভারত হইতে বৃটেন বিভিন্ন কাঁচামাল (তুলা, পাট, তৈলবীজ, লোহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, চর্ম প্রভৃতি) সুলভে ক্রয় করিয়া বৃটেনে লইয়া যাইত ঐ দেশের শিল্পোন্নতির জন্য। চা, কফি, তামাক প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে সুলভে বৃটেনে রপ্তানি হইত। বৃটেনের বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য ভারতে উচ্চমূল্যে আমদানি হইত। প্রকৃতপক্ষে ভারতের মতো বিরাট বাজারে বৃটেন একচেটিয়া বাণিজ্য চালাইত। এইজন্য বৃটেনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ আছে। স্বাধীনতার পরেও বৃটেনের সঙ্গে ভারতের সর্বাধিক বাণিজ্য সংঘটিত হইয়া থাকে।

ভারত-বৃটেন বাণিজ্য (কোটি টাকা)

	রপ্তানি	আমদানি
১৯৫২	১২৬ (২০·৫%)	১৫২ (১৮·৫%)
১৯৫৬	১৮৪ (২৯·৮%)	২০৬ (২৫%)
১৯৬০	১৭৪ (২৭·৫%)	২০১ (২০%)

(বন্ধনীর মধ্যে ভারতের মোট আমদানি বা রপ্তানির শতকরা অংশ দেখানো হইয়াছে।)

ভারতের চা, পাটজাত সামগ্রী, কার্পাস-বস্ত্র, তামাক, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, চর্ম প্রভৃতির প্রধান ক্রেতা বৃটেন। বর্তমানে ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রতিকূল অবস্থায় চলিতেছে। দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য প্রচুর যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানি হইতেছে এবং ইহার মূল্য দিতে হইলে রপ্তানি

বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু বৃটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগ দিলে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয়। কারণ বৃটেন সাধারণ বাজারের সভ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে বৃটেনে পণ্যদ্রব্য পাঠাইবার জন্য সাধারণ বাজারের ধার্য শুল্ক দিতে হইবে। বর্তমানে 'কমন্‌ওয়েল্‌থ প্রেফারেন্স' পাইবার জন্য চা, তামাক, পাটজাত দ্রব্যাদি প্রভৃতির রপ্তানির উপর বিশেষ কোন শুল্ক ধার্য হয় না। এই অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করিবার জন্য বৃটেনে ভারতের রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে চাহিদা হ্রাস পাইবে। অন্যদিকে যে সকল দ্রব্য সাধারণ বাজারের দেশসমূহে উৎপন্ন হয়, সেই সকল দ্রব্য সাধারণ বাজারের সদস্যগণ বিনাশুল্কে বৃটেনে রপ্তানি করিতে পারিবে। কিন্তু ভারতকে শুল্ক দিয়া ঐ সকল দ্রব্য বৃটেনে পাঠাইতে হইবে; যেমন, কার্পাস-বস্ত্র ভারত বৃটেনে রপ্তানি করে। ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী কার্পাসবয়নশিল্পে অত্যন্ত উন্নত। সুতরাং কার্পাস-বস্ত্রের ব্যাপারে এই দুইটি দেশ বৃটেনের বাজার হইতে ভারতকে সহজেই হটাইতে পারিবে। এইভাবে দেখা যায়, বৃটেন সাধারণ বাজারে যোগ দিলে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পাইবে।

কোন কোন অর্থনীতিবিদ্‌ মনে করেন যে, ভারত প্রথমে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হইলেও শেষপর্যন্ত ইহাতে ভারতের উপকার হইবে। কারণ, বৃটেনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের অর্থনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বৃটেন বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার নিরসনকল্পে সাধারণ বাজারে যোগ দিতেছে। ইহাতে বৃটেনের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্ত হইবে এবং ঐ দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে এবং শিল্পের আরও উন্নতি হইবে। ইহার ফলে ভারতীয় চা ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা শেষপর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। কারণ এই সকল দ্রব্যে ভারতকে সাধারণ বাজারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হইবে না। ইহা ছাড়া অনেকে মনে করেন যে, ভারত বৃটেন কর্তৃক অবহেলিত হইবার জন্য নিজে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিবে এবং আভ্যন্তরীণ বাজারেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত, বিশেষতঃ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সহিত, বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইবে।

ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের মত এই যে, বৃটেন সাধারণ বাজারে যোগ দিলে বৃটেনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য প্রায় এক-পঞ্চমাংশ কমিয়া যাইবে। এইজন্য ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ১৯৬২ সালের

জুলাই মাসে সাধারণ বাজারের সদস্যদের নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভারতের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু উপরে বর্ণিত কারণে দেখা যাইবে যে, ভারতের হয়তো শেষপর্যন্ত মোটেই ক্ষতি হইবে না।

বৃটেনের নিকট বা সাধারণ বাজারের সদস্যদের নিকট দয়া ভিক্ষা করিবার প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ভারতের উচিত নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া এশিয়া ও আফ্রিকার সকল দেশগুলিকে লইয়া একটি 'এশিয়া-আফ্রিকা বাজার' সৃষ্টি করা।

প্রশ্নাবলী

1. Divide India into natural regions. Describe the climate, products and industries in each region. [C. U. Inter, 1948]

উ:—'প্রাকৃতিক অঞ্চল' (৩০১ পৃ:—৩০৯ পৃ:) এবং 'কৃষিকার্য', 'খনিজ সম্পদ' ও 'শ্রমশিল্প', হইতে লিখ।

2. Explain fully the environmental features that help or hinder the economic development of the peninsular interior.
[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1962]

উ:—'দাক্ষিণাত্যের মালভূমি' (৩০৬ পৃ:—৩০৭ পৃ:) হইতে লিখ।

3. Comment on the distribution and nature of the rainfall in India and its influence on agriculture and transport, [C. U. B. Com. 1962]

উ:—'জলবায়ু' (৩১০ পৃ:—৩১৭ পৃ:) হইতে লিখ।

4. Show the relationship between the distribution of rainfall and the distribution of the different types of Forests in India. What are principal commercial products from these forests ? [C. U. B. Com. 1960]

উ:—'বনভূমির বণ্টন' ও 'বনভূমির ব্যবহার' (৩২৩ পৃ:—৩২৮ পৃ:) লিখ।

5. Give an account of the developments in the Damodar Valley during the last decade. [C. U. B. Com, 1962]

উ:—'দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা' (৩৪২ পৃ:—৩৪৫ পৃ:) এবং দুর্গাপুরের লৌহ ও ইস্পাত (৪৩৭ পৃ:) এবং অন্যান্য শিল্প বর্ণনা কর।

6. Why is there a need for irrigation in India ? Describe systems of irrigation found in the different parts of the country north of the Vindhya mountains. [C. U. Three-Year Degree Course, B. Com 1964]

উ:—'জলসেচ' (৩৩০ পৃ:—৩৩৭ পৃ:) হইতে লিখ।

7. Examine the benefits and the problems of inter-connection of power plants and of power systems. Illustrate your answer with reference to the South Indian conditions. [C. U. Three-Year Deg. 1963]

উ:—প্রথম খণ্ডের 'শক্তিসম্পদ' অধ্যায়ের 'বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার সংযোগ সাধন' (২২৯ পৃ:—২৩১ পৃ: লিখ।

8. Give an idea of geographical conditions under which rice and wheat are cultivated in different parts of India, What are the measures adopted that have resulted in the improvement of rice and wheat production in the country. [C. U. B, Com, 1955]

উঃ—'ধান' (৩৬৪ পৃঃ—৩৬৮ পৃঃ) ও 'গম' (৩৬৮ পৃঃ—৩৭০ পৃঃ) হইতে লিখ।

9. What is a plantation crop? What are the plantation crops of India? Give the conditions of growth and producing areas of the most important amongst them. [B. U. B. Com. 1962]

উঃ—চা, কফি, রবার ও তামাক ভারতের প্রধান আবাদী ফসল। 'চা'-এর চাষের উপযোগী অবস্থা এবং উৎপাদক অঞ্চল (৩৮০ পৃঃ—৩৮২ পৃঃ) লিখ।

10. Describe the conditions under which bast fibres grown bast in India Mention the areas where they are grown on a commercial scale.

[B. U. Three-Year Degree Course B. Com, 1964]

উঃ—'পাট' (৩৭৪ পৃঃ—৩৭৭ পৃঃ) এবং 'অন্যান্য তন্তুজাতীয় ফসল (৩৭৭ পৃঃ—৩৭৮ পৃঃ (লিখ।

11. Describe the development of the petroleum refinery industry in India. What is the present position and future prospects of this industry?

উঃ—'খনিজ তৈল' (৪০৫ পৃঃ—৪০৯ পৃঃ) হইতে লিখ।

12. Describe the gradual development of the heavy industries of India under the Five-Year Plans.

উঃ—'শ্রম শিল্প' (৪২৬ পৃঃ—৪৩২ পৃঃ) হইতে লিখ।

13. Analyse critically the locational set-up of the iron and steel industry of India. Indicate the present position of this industry.

[C. U. Dergee Course, B. Com. 1962]

উঃ—'লৌহ ও ইস্পাত শিল্প' (৪৩৩ পৃঃ—৪৪২ পৃঃ) হইতে লিখ।

14. Write an account of the iron and steel manufacturing industry of India and comment on their development during the five-year plan periods.

উ: 'লৌহ ও ইস্পাত শিল্প' (৪৩৩ পৃঃ—৪৪২ পৃঃ) হইতে লিখ।

15. Discuss the regional distribution, present position and future prospects of Iron and Steel industry of India,

[B. U, Three-Year Degree Course, B, Com. 1963]

উ: 'লৌহ ও ইস্পাত শিল্প' (৪৩৩ পৃঃ—৪৪২ পৃঃ) হইতে লিখ।

16. Discuss the factors which led to the localisation of Cotton-Textile industry of India in Bombay and Ahmedabad regions on the one hand and West Bengal on the other [B. U. B. Com. 1962]

উ: 'কার্পাসবয়ন শিল্পের' 'উৎপাদক অঞ্চল' (৪৪৬ পৃঃ ও ৪৪৭ পৃঃ) হইতে লিখ।

17. Analyse critically the locationl pattern of the cotton textile industry of India. Assess the present position of this industry.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1963]

উ: কার্পাসবয়ন শিল্পের 'উৎপাদক অঞ্চল' (৪৪৬ পৃঃ—৪৪৭ পৃঃ) হইতে লিখ।

18. Account for the location of the paper mills of India and discuss critically the present position and future scope of the paper industry.
[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1965]

উ: 'কাগজ-শিল্প' (৪৫৫ পৃ:—৪৬১ পৃ:) লিখ।

19. Give an account of the distribution and present condition of the Jute Industry of India and indicate its future prospects. [C. U. B. Com. 1962]

উ: 'পাট-শিল্প' (৪৫০ পৃ:—৪৫৫ পৃ:) হইতে লিখ।

20. Analyse the importance of cottage industries in the economy of the Indian Union. Discuss the measures that should be adopted for their revival.

উ: 'কুটীরশিল্প' (৪৭৯ পৃ:—৪৮৩ পৃ:) হইতে লিখ।

21. Describe the steps taken for the development of the transport system of India under the Five-Year Plans.

উ: 'পরিবহণ-ব্যবস্থা' হইতে (৪৮৪ পৃ:—৫০১ পৃ:) হইতে সংক্ষেপে লিখ।

22. Describe the pattern of railway communication in India and discuss the problems that arise in the light of her requirements of transport. What part do the roads play in easing the situation ?
[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উ: 'পরিবহণ ব্যবস্থার' (৪৮৪ পৃ:—৫০১ পৃ:) এবং 'রাজপথ' (৪৮৫ পৃ:—৪৮৮ পৃ:) ও 'রেলপথ' (৪৮৮ পৃ:—৪৯৩ পৃ:) হইতে লিখ।

23. Account for the uneven distribution of population in India.
[B. U, B. Com. 1962]

উ: 'লোকবসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণ' (৫১০ পৃ:—৫১৩ পৃ: হইতে লিখ।

24. Examine the recent trends in India's foreign trade. Do you think that the foreign trade of India requires reconstruction ? If so, on what lines ?
[C. U. Degree Course, B. Com, 1962]

উ: 'ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রগতি' (৫১৮ পৃ:—৫১৮ পৃ:) এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন' (৫১৯ পৃ:—৫২২ পৃ:) হইতে লিখ।

25. Examine the recent trends in India's foreign trade. Discuss about the impact of Britain's joining the European Common Market on India's foreign trade. [B. U. Three-Year Degree Course, B. Com 1963]

উ: 'ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রগতি' (৫১৮ পৃ:—৫১৯ পৃ:) এবং ভারতের বহির্বাণিজ্যের উপর ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের প্রভাব' (৫২৯ পৃ:—৫৩২ পৃ:) লিখ।

26. Give an account of the volume, composition and direction of the Foreign Trade of India. [C. U.B. Com. 1960 & B. U. B, Com, 1962]

উ: 'বৈদেশিক বাণিজ্য' (৫১৭ পৃ:—৫১৮ পৃ:) হইতে সংক্ষেপে লিখ।

27. Discuss about the impact of Britain's joining the European Common Market on India's Foreign Trade.

উ: 'ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের প্রভাব' (৫২৯ পৃ: —৫৩২ পৃ:) হইতে লিখ।

28. **Analyse the geographical conditions that have contributed to the location and development of the port of Calcutta. What are the navigational difficulties facing the port, and how can they be remedied ?**

[C. U. B. Com. 1960]

উ : 'কলিকাতা' (৫০৩ পৃঃ—৫০৪ পৃঃ) এবং 'গঙ্গা বাঁধ' (৩৪৮ পৃঃ—৩৫০ পৃঃ হইতে লিখ।

29. **Discuss the importance of the following ;—Bombay, Cochin, Mangalore, Tuticorin and Madras.**

উ : 'প্রধান বন্দর' (৫০৩ পৃঃ—৫০৭ পৃঃ) হইতে লিখ।

30. **Draw a full-page map of the Indian Union and .indicate there in :— (*a*) One Centre of ship-building industry. (*b*) One area of Iron ore mines. (*c*) One international Airport. (*d*) One Copper-mining area.**

[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1963]

উ : ৪৩৮ পৃঃ, ৪১২ পৃঃ, ৪৯৯ পৃঃ এবং ৪১৫ পৃষ্ঠার মানচিত্র অনুসারে দেখাও।

31. **Draw a full-page map of India and indicate therien :—(*a*) Areas of over 80″ and less than 20″ of rainfall. (*b*) Areas of Tea and Coffee production. (*c*) Areas of principal coalfields.**

[B. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1964]

উ : ৩১৬ পৃঃ, ৩৮৩ পৃঃ এবং ৪০৩ পৃষ্ঠার মানচিত্রের সাহায্যে দেখাও।

অষ্টম অধ্যায়

অর্থনৈতিক অঞ্চল

(Economic Zones)

বর্তমানে জটিল অর্থনৈতিক অবস্থায় পৃথিবীর মানুষ নিয়ত চেষ্টা করিতেছে কিভাবে নিজদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা যায়। বর্তমান সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে মানুষের এই চেষ্টা বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। পৃথিবীর সকল স্থানে সকল প্রকার সম্পদ পাওয়া যায় না। এইজন্য পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ কোন-না-কোন সম্পদের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মারফত বিভিন্ন দেশ অন্য দেশ হইতে জিনিসপত্র আমদানি করিয়া তাহাদের অভাব পূরণের চেষ্টা করে। শান্তির সময় এইভাবে অভাবপূরণ সম্ভব হইলেও, যুদ্ধের সময় যুদ্ধে লিপ্ত দেশসমূহ শান্তিপূর্ণভাবে তাহাদের অভাব পূরণ করিতে না পারায় যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধোত্তরকালে অর্থনৈতিক জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই বিশৃঙ্খলার অবসানের জন্য বিভিন্ন দেশ নিজেদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে আমরা দেখিতে পাই যুদ্ধোত্তরকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগের সৃষ্টি। কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকটি দেশের মধ্যে সমান শুল্ক-হার প্রবর্তন করিয়া বা শুল্ক রহিত করিয়া একটি সাধারণ বাজার-সৃষ্টির প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান পৃথিবীতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অঞ্চল বিদ্যমান; নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল:

(ক) ইউরোপীয় সাধারণ বাজার

(European Common Market)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি দেশের বহু শিল্প যুদ্ধের আগুনে ছারখার হইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধোত্তরকালে এই সকল দেশ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে লিপ্ত হয়। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ইহাদের শিল্প ও বাণিজ্য আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এইজন্য

প্রথমে ইহারা চেষ্টা করে ইস্পাত-শিল্পের পুনর্গঠনের জন্য। পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের ইস্পাত-শিল্পের একচেটিয়া পুঁজিপতিগণ একত্র হইয়া পৃথিবীর বাজারে ইহাদের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করে। ইহারই ফলে ১৯৫০ সালের মে মাসে 'ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত সম্প্রদায়' (European Coal and Steel Community) গঠিত হয়। ইহার সদস্য হইল **পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালি, নেদারল্যাণ্ডস্** ও **লুক্সেমবুর্গ**। ইহার ফলে এই কয়টি দেশের মধ্যে অবাধে কয়লা, লোহ ও ইস্পাতের বাণিজ্য চলে এবং ইহাদের ইস্পাত-শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করে। ইস্পাত-শিল্পের এই সাফল্যে উৎফুল্ল হইয়া এই ছয়টি দেশ নিজেদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য রোমে মিলিত হয় এবং ১৯৫৭ সালের ২৫শে মার্চ এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তি অনুসারে এই ছয়টি দেশ লইয়া **'ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায়' (European Economic Community)** গঠিত হয়:-

রোম চুক্তি (Rome Treatv) অনুসারে এই ছয়টি দেশ লইয়া একই শুল্ক-এলাকাভুক্ত একটি অর্থনৈতিক বাজারের সৃষ্টি হয়। ইহার নাম **'ইউরোপীয় সাধারণ বাজার' (European Common Market)**। এই সাধারণ বাজারের অন্তর্ভুক্ত ছয়টি দেশের মধ্যে বিনাশুল্কে অবাধ বাণিজ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। সাধারণ বাজার-বহির্ভূত দেশের সঙ্গে সমান শুল্ক-হারে এই ছয়টি দেশকে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে হয়। এই সাধারণ বাজারে মূলধন ও শ্রমিক এক দেশ হইতে অন্য দেশে অবাধে যাতায়াত করিতে পারে। এই ছয়টি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ইহারা একটি ইউরোপীয় লগ্নী ব্যাঙ্ক (European Investment Bank) গঠন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

রোম চুক্তি অনুসারে নিম্নলিখিত **উদ্দেশ্য** লইয়া ইউরোপীয় সাধারণ বাজার গঠিত হইয়াছে—(ক) অর্থনৈতিক সমন্বয়-সাধনের সাহায্যে ছয়টি দেশের উন্নতিসাধন; (খ) অর্থনৈতিক উন্নতির পরিমিত ক্রমবিকাশ; (গ) ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক স্থায়িত্বসাধন; (ঘ) জীবন-মানের দ্রুত উন্নতি; (ঙ) ছয়টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন-সৃষ্টি।

† European Economic Community : published by Deutsche Bank.

এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রোম চুক্তিতে নানাবিধ পন্থা অবলম্বনের কথা বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ, এই ছয়টি দেশ লইয়া যে একটি সাধারণ বাজার সৃষ্টি হইবে, তাহাদের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করিবার জন্য একই শুল্ক-নীতি এই ছয়টি দেশ মানিয়া চলিবে। দ্বিতীয়তঃ, এই ছয়টি দেশের মধ্যে অবাধে মূলধন ও শ্রমশক্তি স্থানান্তরিত হইতে পারিবে। তৃতীয়তঃ, কৃষি ও যানবাহনের ব্যবস্থা-সম্বন্ধে ইহারা একই নীতি মানিয়া চলিবে। চতুর্থতঃ, এই সকল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির সমন্বয় সাধন করা হইবে। পঞ্চমতঃ, সাধারণ বাজারকে কার্যকরী করিবার জন্য অসাধু প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হইবে এবং এই সকল দেশের আভ্যন্তরাণ আইনের সমন্বয় সাধন করা হইবে। ষষ্ঠতঃ, এই ছয়টি দেশের অন্তর্ভুক্ত পরাধীন দেশসমূহকে সাধারণ বাজারের সহযোগী সদস্য করা হইবে। সপ্তমতঃ, 'ইউরোপীয় সামাজিক তহবিল' (European Social Fund) এবং 'ইউরোপীয় লগ্নী ব্যাঙ্ক' (European Investment Bank) নামে দুইটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইউরোপীয় সাধারণ বাজার-সৃষ্টির পেছনে যে শুধু অর্থনৈতিক কারণ রহিয়াছে তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। এই অর্থনৈতিক সংস্থা-সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ **রাজনৈতিক** উদ্দেশ্যসাধন। পৃথিবীতে আজ যে দুইটি বিবদমান শক্তি বিদ্যমান, তাহা এই সাধারণ বাজার-গঠনের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। রাশিয়া এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির চরম শিখরে উঠিতেছে। ইহার পাশেই অবস্থিত পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি ও বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের উন্নতিতে শিহরিয়া উঠিতেছে। এইজন্য ইহারা একত্রিত হইয়া ইহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া রাশিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিবার চেষ্টা করিতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এইজন্য ইউরোপীয় সাধারণ বাজার-সৃষ্টির প্রধান উদ্যোক্তা ও সমর্থক। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকায়† আজ এই ছয়টি দেশ শুধু অর্থনৈতিক সমন্বয় সাধনের চেষ্টাই করিতেছে না, ইহাদের রাজনৈতিক মিলনের পথও সম্প্রসারিত করিতেছে। এইজন্য ইহারা সৃষ্টি করিয়াছে এই ছয়টি দেশের মিলিত European Parliamentary Association, Court of Justice, Council of Ministers ইত্যাদি।

† External Affairs Review, July, 1961, New Zealand.

ইউরোপীয় সাধারণ বাজার ও অন্যান্য শক্তিশালী দেশের তুলনা (১৯৫৯)

	ইউরোপীয় সাধারণ বাজার	মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	রাশিয়া
লোকসংখ্যা (কোটি)	১৭	১৭'৮	২১
আয়তন (লক্ষ বর্গ কিঃ মিঃ)	১১'৭	৯৩'৬	২২৪
ইস্পাত-উৎপাদন (লক্ষ টন)	৫৩২	৮৪'৮	৬০০
কয়লা-উৎপাদন (লক্ষ টন)	২,৩৮৮	৩,৯০০	৫'০৬৪
বিদ্যুৎ-উৎপাদন (কোটি KWH)	২৪,৩০০	৭৯,৪৫০	২৬,৪০০
মোটর-গাড়ী (লক্ষ)	৩৫	৬৭	৫
রপ্তানি (কোটি ডলার)	২,৫২০	১,৭৪০	৫৪০
আমদানি (কোটি ডলার)	২,৪৩০	১,৫০০	৫১০

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ এই বাজার-সৃষ্টির ফলে অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে সাফল্য লাভ করিবে সন্দেহ নাই। এই ছয়টি দেশ লইয়া যে অঞ্চল সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল। ইতিমধ্যে এই সকল দেশের বহির্বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এই সকল দেশের বাণিজ্যের উন্নতির হার ছিল শতকরা মাত্র ৫ ভাগ। কিন্তু সাধারণ বাজার-সৃষ্টির পরে ১৯৬১ সালে এই ছয়টি দেশের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯৬০ সাল অপেক্ষা শতকরা ২৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ বৎসর পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের বাণিজ্যের উন্নতির হার ছিল শতকরা মাত্র ৮ ভাগ। ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের অন্তর্ভুক্ত ছয়টি দেশের এই উন্নতির হার যে চিরকাল বজায় থাকিবে এবং এইভাবে যে ইহারা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহকে ছাড়াইয়া যাইবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাদন হয় পরিকল্পনা অনুসারে নিজেদের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া, কিন্তু ধনতান্ত্রিক এই ছয়টি দেশে শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইলে বাজারে মন্দা দেখা দিবে এবং শেষপর্যন্ত হয় যুদ্ধের আশ্রয় লইতে হইবে, অথবা অর্থনৈতিক অবনতি আসন্ন হইবে।

সম্প্রতি বৃটেন এই সাধারণ বাজারে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায়

†Source—European Economic Community" published by Deutsche Bank.

সারা পৃথিবীতে হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল। সাধারণ বাজার-সৃষ্টির সময় বৃটেন আমন্ত্রিত হইলেও যোগদান করে নাই। সাধারণ বাজার সৃষ্টির পরে বৃটেন পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহ লইয়া 'অবাধ বাণিজ্য সমিতি' (Free Trade Association) গঠন করে। (এই সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে) কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রায় লুপ্ত হওয়ায় এবং ইউরোপের শিল্পোন্নত বাজার কিয়দংশে হারাইবার ফলে বৃটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। বৃটেন ইহাতে যোগ দিলে সাধারণ বাজার আরও শক্তিশালী হইবে এবং রাশিয়ার সঙ্গে শক্তির প্রাত-যোগিতায় পশ্চিম ইউরোপ কিছুটা সাফল্য লাভ করিবে। বৃটেন সাধারণ বাজারে যোগ দিলে যে শুধু বৃটেন উপকৃত হইবে তাহা নহে, ইহার ফলে অন্যান্য ছয়টি দেশও অর্থনৈতিক উন্নতিতে আরও সাফল্য লাভ করিবে। বৃটেনের পক্ষে প্রধান অসুবিধা হইবে এই যে, কমন্‌ওয়েল্‌থের সদস্যদের সঙ্গে বৃটেনের বাণিজ্যের পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পাইবে। ভারতের সঙ্গে বৃটেনের বাণিজ্যেরও কিছুটা অবনতি হইবে (৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের (পঃ জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও লুক্সেমবুর্গ) অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে এই বাজার বহুলাংশে সাহায্য করিয়াছে। জার্মানী গত মহাযুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাতের সম্মুখীন হইয়াছিল; কিন্তু ইহার পার্শ্ববর্তী ফ্রান্সের ও লুক্সেমবুর্গের লৌহের সাহায্যে **পশ্চিম জার্মানীর** ইস্পাত-শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। পশ্চিম জার্মানীর রুঢ় শিল্পাঞ্চলের নিকটেই ফ্রান্সের ও লুক্সেমবর্গের লৌহখনিসমূহ অবস্থিত। শুল্কের অবসান হওয়ায় অত্যন্ত কমখরচে লৌহ আমদানি করা সম্ভব হয় এবং ইহার ফলে উৎপাদন-খরচ কমিয়া যায়। ইস্পাতের উৎপাদন-খরচ কম হইলে, ইহার প্রভাব অন্যান্য শিল্পের উপর বর্তায়। অন্যদিকে জার্মানীর কয়লা ফ্রান্স ও ইটালিতে রপ্তানি হওয়ায় উদ্‌বৃত্ত কয়লা হইতে পশ্চিম জার্মানী প্রভূত লাভ করে। ফ্রান্স উদ্‌বৃত্ত লৌহ আকরিক রপ্তানি করিয়া এবং কয়লা আমদানি করিয়া ইহার বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়াছে। কার্পাসবয়ন, রেশমবয়ন, মদ্য প্রভৃতি শিল্পের উন্নতি এখন আর কয়লার অভাবে ব্যাহত হয় না। **ইটালির** শিল্পোন্নতির প্রধান অন্তরায় ছিল কয়লা। বর্তমানে পশ্চিম জার্মানী ও বেলজিয়াম হইতে এই দেশে অনায়াসে বিনাশুল্কে কয়লা আমদানি করিতে পারে। সেইজন্য এই দেশের ইস্পাত

উৎপাদন ১৯৫৭ সালের তুলনায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখানকার রেশম-বস্ত্র রপ্তানির পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ, ফ্রান্স ভিন্ন সাধারণ বাজারের সকলেই এই দেশ হইতে রেশম-বস্ত্র ক্রয় করে। **বেলজিয়াম** বহুদিন যাবৎ একটি শিল্পোন্নত দেশ বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। সাধারণ বাজারে এই দেশের পক্ষে শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করা সহজ হইবে এবং ফ্রান্স হইতে লৌহ আমদানি করা যাইবে। আফ্রিকায় এই দেশের সাম্রাজ্য হারাইবার ফলে স্থানীয় উৎপাদনের উপর এই দেশ বহুলাংশে নির্ভরশীল হইয়াছে। সাধারণ বাজারে যোগ দিয়া এই দেশ বর্তমানে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা করিতে পারিবে। **লুক্সেমবুর্গের** খনিজ দ্রব্য প্রধানতঃ বেলজিয়ামের শিল্পের উন্নতিতে নিয়োজিত হইত। সাধারণ বাজারে যোগ দেওয়ায় এই দেশের দ্রব্যাদির চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইবে। **নেদারল্যাণ্ডস্** তাহার সাম্রাজ্য বহুলাংশে হারাইয়াছে। বিশেষতঃ ইন্দোনেশিয়া ইহার হাতছাড়া হওয়ায় এই দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সেইজন্য ইহাকে সাধারণ বাজারে যোগ দিতে হইয়াছে।

(খ) ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল
(European Free Trade Areas)

ইউরোপীয় সাধারণ বাজার সৃষ্টি হইবার পর বৃটেন প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী উইরোপীয় দেশসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ভারত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ঘানা, গিনি প্রভৃতি লইয়া গঠিত বিশাল সাম্রাজ্য সে হারাইতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে তাহার অর্থনৈতিক কাঠামো বহুলাংশে বিপর্যস্ত হয়। সেইজন্য ইউরোপীয় সাধারণ বাজার-সৃষ্টির এক বৎসর পরেই ১৯৬০ সালের মে মাসে বৃটেন পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ লইয়া **'ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সমিতি' (European Free Trade Association)** বা **EFTA** গঠন করে। বৃটেন, সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, পর্তুগাল, সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্ক এই সাতটি দেশ এই সমিতির সদস্য। এই সকল দেশের মধ্যে বিনাশুল্কে অবাধ বাণিজ্য চলে। কিন্তু অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য করিবার সময় এই সকল দেশ নিজস্ব শুল্ক-নীতি গ্রহণ করিতে পারে। যেমন, ভারত বৃটেনে অত্যল্প অল্পশুল্কে বা বিনা শুল্কে চা পাঠাইতে পারে, কিন্তু সুইডেনে চা পাঠাইতে হইলে ভারতকে সুইডেন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শুল্ক দিতে হইবে।

অবাধ বাণিজ্য এলাকা গঠিত হইবার পর ১৯৬০ সালে এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের বাণিজ্যিক উন্নতির হার হইয়াছে শতকরা মাত্র ৮ ভাগ; কিন্তু এই সময় ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের উন্নতির হার ছিল শতকরা ২৯ ভাগ। এই দুইটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের এই পার্থক্যের মূলে রহিয়াছে ইহার গঠনের উদ্দেশ্যের পার্থক্য। সাধারণ বাজার সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবে দাঁড়ানো। কিন্তু অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গঠনের মূলে এইরকম বিশেষ কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। ইহার ফলে যে উদ্দেশ্য ও উদ্দীপনা লইয়া সাধারণ বাজারের সদস্যরা কাজ করে, অবাধ বাণিজ্য সমিতির সদস্যদের মধ্যে ততটা উদ্দীপনা দেখা যায় না। ইহার ফলে অবাধ বাণিজ্য সমিতি আর কতদিন টিকিয়া থাকিবে তাহা খুবই সন্দেহজনক। এই সমিতির প্রধান কর্ণধার বৃটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করায় এই সমিতির সমাধি রচনার পথ যে প্রশস্ত হইয়াছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃটেন সাধারণ বাজারে প্রবেশ করিতে না পারায় পুনরায় এই অঞ্চলের উন্নতির কিছু সম্ভবনা আছে।

(গ) কম্যুনিস্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল
(Communist Economic Zone)

পুঁজিবাদী দেশসমূহে বিশেষতঃ পশ্চিম ইউরোপে যখন অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়িয়া উঠিতেছে, তখন পূর্বাংশের মানুষ তাহাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের চেষ্টায় পিছনে পড়িয়া নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন কম্যুনিস্ট দেশসমূহ একত্র হইয়া সৃষ্টি করিয়াছে নিজেদের একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যাহার মাধ্যমে উন্নত দেশসমূহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে সাহায্য করিতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানের নাম 'পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্যের কম্যুনিস্ট সংসদ' (Communist Council of Economic Mutual Aid বা COMECON)। রাশিয়া, পূর্ব জার্মানী, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, চেকো-শ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, চীন, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি এই সংসদের সদস্য। এই সকল দেশ প্রত্যেকে প্রত্যেককে অর্থনৈতিক সাহায্য দিবে বলিয়া ঠিক হইলেও, একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রধানতঃ রাশিয়া অন্যান্য সকল দেশকে বহুলাংশে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়া থাকে। এই সকল দেশের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী চুক্তি অনুসারে বাণিজ্য চলে। প্রতিযোগিতার

কোন মনোভাব ইহাদের মধ্যে নাই। ইহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় একমাত্র উন্নতির প্রতিযোগিতা। বর্তমানে এই সকল দেশ পুঁজিবাদী দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। ইহা ছাড়া এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দে হকে ইহারা কারিগরী ও অর্থসাহায্য দ্বারা উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার ফলে অনুন্নত দেশের সঙ্গে ইহাদের বাণিজ্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইতেছে। সকল কম্যুনিস্ট দেশের উন্নতির জন্য ইহারা যে-কোন ত্যাগস্বীকারও করিয়া থাকে। সেইজন্য ইহাদের বাণিজ্যের পরিমাণ প্রতিবৎসর অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইতেছে।

১৯৬২ সালের ৯ই জুন এই সকল দেশ মস্কোতে মিলিত হইয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ; ইহার মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে বিনা বাধায় বাণিজ্য-বৃদ্ধির জন্য একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন আহ্বান করিবার সিদ্ধান্ত অন্যতম। ইহারা আরও সিদ্ধান্ত করে যে, 'কমিকনের' দেশসমূহ একত্র হইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাইবে, কাঁচামাল ও শক্তি-সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি কবিবে এবং শিল্পের উন্নতিসাধন করিবে। এইভাবে যদি ইহারা সংযুক্তভাবে হাতে হাত মিলাইয়া চলে, তাহা হইলে এই সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকে রোধ করা কঠিন।

অন্যান্য অর্থনৈতিক অঞ্চল—উপরে বর্ণিত তিনটি প্রধান অর্থনৈতিক অঞ্চল ছাড়াও, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে **কলম্বো পরিকল্পনার** অন্তর্গত দেশসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কমন্‌ওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ ১৯৪৯-৫০ সালে কলম্বোতে একত্রিত হইয়া দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করে। ইহার মধ্যে কমন্‌ওয়েল্‌থের দেশসমূহ ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান প্রধানতঃ টাকা লগ্নী করিবার জন্য এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন দেশ অনুন্নত দেশসমূহকে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য দেওয়ায় ইহাদের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, কলম্বো পরিকল্পনা একটি অস্থায়ী সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র।

কমন্‌ওয়েল্‌থ (Commonwealth) অন্যতম উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অঞ্চল। কমন্‌ওয়েল্‌থের সদস্যদের মধ্যে রহিয়াছে বৃটেন, ভারত, সিংহল, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ঘানা, টাঙ্গানাইকা, কেনিয়া, উগাণ্ডা,

নাইজেরিয়া, রোডেশিয়া প্রভৃতি। এই সকল দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের বহু সুবিধা রহিয়াছে। নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য চালাইবার সময় এই সকল দেশ 'কমন্‌ওয়েল্‌থ প্রেফারেন্স' পায় বলিয়া বিনাশুল্কে বা অল্পশুল্কে বাণিজ্য সংঘটিত করিতে পারে। এই সকল দেশের বাণিজ্যের উপর বৃটেনের কর্তৃত্ব বিরাজমান। কিন্তু বৃটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগ দিলে এই কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে হারাইবে এবং কমন্‌ওয়েল্‌থ ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

ইহা ছাড়া এশিয়ার দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহ লইয়া গঠিত **'এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন'** (Economic Commisson for Asia & Far Fast বা ECAFE) নামে একটি সংস্থা এই অঞ্চলের দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিবার ফলে ইহাদের মধ্যে এবং সাহায্যকারী পশ্চিমা দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সম্প্রতি আফ্রিকার কয়েকটি দেশ সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহকে লইয়া নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য একটি **'আফ্রিকার সাধারণ বাজার' (African Common Market)** সৃষ্টি করিয়াছে। মিশর, গিনি, মালি, ঘানা, মরক্কো ও আলজেরিয়া এই বাজারের সদস্য। আশা করা যায় আফ্রিকার জাতীয়তাবাদ এই সংস্থার উন্নতিসাধনে সাহায্য করিবে।

প্রশ্নাবলী

1. What do you know about the European Common Market? Discuss about the present position and future prospects of E. C. M.

উঃ—'ইউরোপীয় সাধারণ বাজার' (৫৩৬ পৃঃ—৫৪১ পৃঃ) লিখ।

2. Divide the world into major commercial regions and indicate the pattern of trade existing between these regions.

[C. U. Three-Year Degree Course, B. Com. 1963]

উঃ—'ইউরোপের অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল' (৫৪১ পৃঃ—৫৪২ পৃঃ), 'কম্যুনিস্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল' (৫৪২ পৃঃ—৫৪৩ পৃঃ) ও 'অন্যান্য অর্থনৈতিক অঞ্চল' (৫৪৩ পৃঃ) হইতে লিখ।

BIBLIOGRAPHY

Zimmermann. E. W.: *World Resources and Industries.*

Bengston, Nels A. and Van Royen, William: *Fundamentals of Economic Geography.*

Chisholm, G. G. and Dudley Stamp, L: *A Handbook of Commercial Geography,*

Dudley Stamp, L.: *Intermediate Commercial Geography.*

Huntington, Williams and Valenburg: *Economic and Social Geography.*

Jones, C. E and Darkenwald, G. G.: *Economic Geography.*

Miller, G. J. and Parkins, A. E: *Geography of North America.*

Macfarlane, J.: *Economic Geography.*

Russell-Smith, J. R. and Ogden Phillips, M.: *Industrial and Commercial Geography.*

Renner, Durand, White, Gibson: *World Economic Geography.*

Spate: *India and Pakistan.*

Dasgupta, A.: *Economic and Commercial Geography.*

Balzak, Vasyutin and Feigin: *Economic Geography of the U. S. S. R.*

Planning Commission, Govt. of India: *Third Five-Year Plan.*

Zimmermann, E. W.: *Resources—An Evolving Concept.*

U. N. O.: *Monthly Bulletin of Statistics.*

F. A. O.: *Monthly Bulletin.*

E. C. A. F. E.: *Economic Bulletin.*

International Cotton Advisory Committee: *Monthly Bulletin.*

International Sugar Council: *Statistical Bulletin.*

Bowman, I.: *Geography in Relation to Social Sciences.*

SYLLABUS

ECONOMIC GEOGRAPHY

. Group A—*General Economic Geography*

1. Geography—A dynamic science—the field and function of Economic Geography.

2. Resource Aspects—Natural, Human and Cultural.

(*i*) Natural—(*a*) Some paradoxes of Nature—constant and changing—significant aspect of nature—distribution of natural endowment - animate and inanimate energy use. (*b*) Land—its changing role—two dimensional and three dimensional land—fixity of land and the dynamics of nature.

Cultivability of land—cultural and human limitation of cultivability—cultivability in an exchange economy.

(*ii*) Human—Role of man, Man-Land ratio and population density—distribution of population—settlement patterns and their associated features—the three worlds of space, people and industry—density zones.

Modern demographic pattern—optimum population and population density.

(*iii*) Culture—Culture a joint product of man and nature—culture and the machine—culture and agriculture.

Natural and cultural environment—direct and indirect adjustment—an example of cultural transfer.

3. Critical study of the world's resources—water, biotic soils and minerals and their conservation.

(*a*) The economic significance of sea-fisheries of the world—types of fisheries—factors of commercial developments—principal markets.

(*b*) Forest and forest products—forest belts (on the basis of climate)—lumber industry—Forest products and their utilisation. Problem of conservation.

(*c*) Major soils of the world.

(*d*) Minerals—Minerals of direct economic use—salt,

sulphur, commercial mineral fertilizers. Iron ore, Ferro-alloy metals—Manganese, chromium, nickel, Molybdenum, tungsten, vanadium. Non-ferrous metals—copper, lead, zinc, aluminium, tin, mica—their distribution and industrial importance.

Economic significance of power utilisation : Coal—a prime factor of modern industry—distribution. Petroleum—distribution—petroleum industry—petroleum in world affairs.

Natural gas—transportation problem and uses. Water-power resources—their distribution and industrial significance—electricity, a modern refinement of energy use. Atomic energy.

4. Critical study of world's farming and manufacturing—Types of farming—subsistence, commercial and mixed. Nature of agriculture—Agriculture in industrial world—modern farm problem—remedies.

Farming—(i) Animal and animal products—rearing of domestic animals (cattle, sheep and pigs)—principal areas where commercially reared—their products, industries and trade.

Agricultural products—Food-crops (i) wheat and rice—production processess and problem—markets—international trade agreement, (ii) Other food-crops—sugar-cane and sugar-beet. (iii) Beverage—tea, coffee, cocoa. (iv) Non-food crops—rubber and oil seeds. (v) Fibre crop—cotton, jute, flax, hemp, and silk. (iv) Tobacco. The condition of their growth and processing problems—agreements regarding control of production and marketing—international trade.

Manufacturing—Mechanical energy and its significance—basis of world's industrial location—effect of industrialisation—principal industrial regions—selected industries—iron and steel, engineering, heavy chemicals, textiles—location, raw materials—markets.

5. Transportation—evolution of transport. Transport pattern of the world—speed and cost—transport co-ordination and integration—transport cost and its impact upon world

distribution of productive activities—transportation and regional specialization. Ports, entrepots, trade centres of the world.

6. Trade—trade as an index of civilization—difference in the stage of industrial development—difference in available resources—trend of world trade—industrialisation and foreign trade—the changing world—economic nationalism in relation to economic progress—free market and controlled economy.

Group B—*Economic Geography—Regional*

Economic Geography of the principal* countries of the world—climate, soil, etc.—distribution of population—principal economic products—chief industries—ports and cities—communications—trade balance and trade relationship (Ref. to China, Japan, U. S. S. R., France, Germany, U. K., India, Union of South Africa, Canada, U. S. A., Brazil, Argentina and Australia *or*, such countries as may be prescribed by the Board from time to time) †

Economic Zones—their prospects and possibilities. Prospects of economic development of different countries.

Natural divisions of India—main physical features and the influence on man's economic activities. (Detailed study of soil, natural vegetation, rainfall and temperature)†

Location of chief agricultural, mineral and industrial products—

(*a*) Agricultural products—rice, wheat, sugar-cane, jute, cotton, tea, rubber, coffee, oilseeds tobacco. Main problems of production, marketing and trade. Forest and forest products—distribution—utilisation—conservation.

(*b*) Minerals—coal, petroleum, iron, copper, manganese, aluminium, gold, mica and limestone. Production and trade.

(*c*) Industries—(*i*) Iron and steel, cotton textiles, jute, paper, cement, chemicals, engineering (automobile, locomotive,

†The Board has prescribed the following countries only for the students appearing for examinations in 196. 31964 and 1965 ; U. K., U. S. S. R., U. S. A., Australia, Pakistan, Burma, Japan and India (to be studied in greater details.)

ship-building, aircraft) and aluminium, (ii) Cottage industries —problems of production and trade.

Principal irrigation systems—multi-purpose projects, Water-power.

Transport—(a) Roads, (b) Railways, (c) Inland waterways, (d) Coastal shipping, (e) Air-ways, (f) Ocean transport—their development and main problems—comparative advantages and disadvantages of each system. Ports and harbours—major and minor ports. Principal ports of India—their hinter-land and items of export and import.

The factors responsible for the density and distribution of population.

Internal and Foreign trade of India.

CALCUTTA UNIVERSITY

Three-Years Degree Course, B. Com.

ECONOMIC GEOGRAPHY

1962

Answer SIX *questions*, THREE *from* EACH GROUP

Group A

1. Analyse the functional theory of resources and indicate the modern trends in resources development

2. Explain fully the concept of *man-land ratio* and indicate how far population optima can be explained in terms of ideal man-land ratios.

3. Give an idea of the world distribution of mineral oil and the countries controlling its production. Discuss in particular the significance of the oil fields in the Middle-East in the context of rivalry in oil trade.

4. Compare and contrast the soil and climatic conditions under which cotton is cultivated in the Mississippi basin and in the Nile basin.

5. Explain fully the concept of *conservation of resources* and indicate briefly the need for the conservation of forest resources and their utilization in some countries of the world.

Group B

6. Discuss the geographical factors influencing the growth of Britain's prosperity and trade. Do you think Britain can still count on these factors ? Give reasons.

7. Comment on the geographical distribution of industries in the U. S. S. R. with reference to the raw material position.

8. Explain fully the environmental features that help or hinder the economic development of the Peninsular Interior of India.

9. Analyse critically the locational set-up of the iron and steel industry of India. Indicate the present position of this industry.

10. Examine the recent trends in India's foreign Do you think that the foreign trade of Indias requires re-struction ? If so, on what lines ?

BURDWAN UNIVERSITY, 1962

Answer any SIX *questions*

Illustrate your answers with sketches wherever possible.

1. Locate the principal soft-wood forest belt of the world and describe the various commercial uses of the products of these forests.

2. Describe the conditions of growth of sugar-cane and sugar-beet and indicate the principal regions of their production. Who are the important exporters of cane and beet-sugar?

3. Account for the location of principal sea-fisheries in temperate seas and discuss the prospects of the development of sea-fisheries in India.

4. Give a full account of world production and distribution of coal.

5. Discuss the comparative advantage of the localisation of Iron and Steel industry in the Lake Region of U.S.A. and Donetz basin of U.S.S.R.

6 Describe the advantages and disadvantages of inland water and air transport.

7. What is a plantation crop ? What are the plantation crops of India ? Give the conditions of growth and producing areas of the most important amongst them.

8. Account for the uneven distribution of population in India.

9. Discuss the factors which led to the localisation of Cotton-Textile industry of India in Bombay and Ahmedabad regions on the one hand and West Bengal on the other.

10. Give an account of the volume, composition and direction of the foreign trade of India.

অর্থনৈতিক ভূগোল

CALCUTTA UNIVERSITY, 1963

[*Answer any* SIX *questions,* THREE *from each group. Illustrate your answers by sketch-maps and diagrams, if necessary.*]

Group A

1. Explain fully how resources evolve out of the dynamic interaction of natural, human and cultural forces. Illustrate your answer by suitables examples.

2. Evaluate the land-use potentials in different parts of the world and discuss in this connection the agricultural limitations in terms of climate, soil, nature vegetation and landform.

3. Some industries are tied to the sources of their raw materials while others are not. Select any two manufacturing industries having these contrasting features and explain the reasons for the concentration in one case and wide diffusion in the other.

4. Do trade routes arise from economic activity, or does economic activity arise from trade routes? Take concrete examples and discuss.

5. Divide the world into major commercial regions and indicate the pattern of trade existing between these regions.

6. "Petroleum is an outstanding source of fuel, [illegible] and international friction."
Examine this statement fully.

Group B

7. Discuss the part played by cotton in the economic development of Egypt and describe the factors leading to the production of this raw material.

8. Comment on the agricultural possibilities of the Cotton Belt of the United States of America. Examine the progress of manufacturing in this region.

9. Examine how far it is true to say that in its long term programme for the geographical distribution of industries, Soviet planning has treated the fuel and power network as the basis of its industrial structure.

10. Examine the benefits and the problems [illegible] tion of power plants and of power systems. [illegible] answer with reference to the South Indian [illegible]

11. Analyse critically the locational pattern [illegible] textile industry of India. Assess the present posi[illegible] industry.

12. Comment on the distribution of coal-fields in India. Indicate the various measures that have been adopted during the last decade for orienting the coal-mining industry of India to serve the needs of growing industrialization of the country.

BURDWAN UNIVERSITY

1963

Answer any THREE *questions from each group.*

(Support your answer with sketches wherever necessary.)

Group A

1. What do you mean by Two-Dimensional and Three-Dimensional land ? Also describe how land has changed [illegible] role as a factor of production.

2. Give an idea of the world distribution of co[illegible] are the by-products of coal ?

3. What do you understand by Man-Land ratio ? How does it differ from population density ?

4. Describe the regions of soft-wood forests in the world and enumerate the geographical factors leading to the localisation of paper industry in their vicinity.

5. State the importance of the following metals in the metallurgical industries : Nickel, Vanadium, Copper and Tungsten. Where are these metals mainly found ? Is any one of them found in India ? If so, to what extent ?

6. Discuss the factors responsible for the concentration of Wool and Silk production in certain regions of the world. Explain why a few countries predominate in their exports.

Group B

7. Write an account of the Cotton Textile trade of Britain stating (a) the centres of manufacture (b) the raw materials, and (c) the markets to which Great Britain sends her products.

8. Discuss the regional distribution, present position and future prospects of Iron and Steel industry in india.

9. Give an account of the methods of cultivation and the crops cultivated in *Japan*, as related to the geographical condition of the country.

10. Examine the recent trends in India's foreign trade. Discuss about the impact of Britain's joining the European Common Market on *India's* foreign trade.

11. Draw a full-page map of the *Indian* Union and indicate therein :—

(a) One centre of ship-building industry.
(b) One area of Iron-ore mines.
(c) One international Air-port.
(d) One copper-mining area.

12. Give an idea of the economic resources of Burma and suggest the industries which she can develop.

CALCUTTA UNIVERSITY

1964

The questions are of equal value

Answer SIX *questions*, THREE *from each group.*

(*Draw sketches and diagrams wherever necessary*)

Group A

1. Examine the correlation between the physical and cultural environment on the one hand and man's economic-activity and living standard on the other.

2. Why is there a geographical separation of the typical areas of wheat and rice production ? Describe the contrasting nature of farming methods of the two crops.

3. What are the geographical conditions unde commercial sheep grazing has developed ? Explain woollen industry has not developed in the thre continents that are the principal producers of wool

4. Compare and contrast coal, petroleum electricity as sources of industrial power. Examine and economic factors favouring the production of hy electricity.

5. Locate the major fishing grounds of the world an give their characteristics. Explain why commericial fis is undeveloped in tropical waters.

6. Analyse the bases of industrial location and give examples of concentration of industries near raw materials, power and market.

Group B

7. Write an account of the soil and climatic conditi in the different agricultural regions of the Soviet Union an the chief agricultural products of each.

8. Account for the location of the iron and steel indust in U. K. with reference to the supply of coal and iron ore.

9. Examine the advantages and disadvantages of indus trial development of Japan and give a brief review of th most important manufacturing induslries of the country regard to sources of raw materials, items of manufac and market.

10. Why is there a need for irrigation in India ? Describe systems of irrigation found in the different parts of the country north of a Vindhya mountains.

11. Write an account of the iron and steel manufacturing industry of India and comment on their development during the five year plan periods.

12 Describe the pattern of railway communiation India and discuss the problems that arise in the light of he requirements of transport. What part do the roads play in easing the situation ?

অর্থনৈতিক ভূগোল

BURDWAN UNIVERSITY

1964

...ot any THREE *questions* from *each Group.*

The questions are of equal value.

Group A

1. ...ttempt a comparative analysis of the characteristic ...d the merits and demerits of animate and in... energy.

2. Describe and explain with the help of specific examples the physical as well as the cultural and human limitations of culturability.

3. What are the physical factors favourable for the ...evelopment of sea fisheries ? Describe the location of the ...hief marine fishing ground... of the world and discuss the ...odern methods ... ...a-fishing.

4. Discuss the geo-economic factors essential for the ...velopment of hydro-electric power. In what respects is ...dro electricity superior to other sources of power ?

5. What are the different types of farming ? Examine the ...ditions under which and the area where they are practised.

6. Discuss the factors for the location of manufacturing ...stries, with particular reference to the influence of raw ...terials in the location of industries.

Group B

7. Describe the conditions under which best fibres grow best in India. Mention the areas where they are grown on a commercial scale.

8. Account for the regional distribution of sugar industry in India and discuss its present position and future prospects.

9. Draw a full pages map of India and indicate therein :

(a) Areas of over 80″ and less than 20″ of rainfall.

(b) Areas of tea and coffee production.

(c) The principal coalfields.

10. Examine the geographical conditions und crops are cultivated in the different crop belts of th

11. Account for the industrial developm and write short accounts of two of the mo industries of the country.

12. Give an idea of the manufacturing industri principal industrial regions of U. S. S. R.

CALCUTTA UNIVERSITY

1965

Answer SIX *questions,* THREE *from* EACH GROUP

Group A

1. Define optimum population. Discuss the factors whic determine this with specific examples

2. Classify forests on the basis of climate and give t world distribution. Narrate the commercial uses of t products of temperate forests.

3. Describe the characteristics of tropical plantat farming with reference to rubber cultivation in the Sou East Asia.

4. Select one of the important natural fibres fr point of view of the volume of production. Discu geographical conditions necessary for its production point out the important areas of its cultivation.

5. What are the various uses and by-products of coal? Discuss how far is coal a localizing factor of industry.

6. Discuss with specific examples the influence of transport on the economic development of a region. What are the relative advantages and disavantages of water, over land and aerial transport?

Group B

7. Discuss the factors which have made the U. S. one of the leading exporters of agricultural commodities the world. Give a brief account of the products raised.

Wi. Indicate the principal industrial regions of *either* West ... or France and account for the location of the chief ... the regions.

... an account of the mineral resources of *either* ... *or* the Union of South Africa and indicate the chief ... areas of the country.

... ccount for the location of the paper mills of India ... scuss critically the present position and future scope the paper industry.

11. Give a picture of India's foreign trade with particular reference to the markets for India's exports and the ...ssibility of securing new markets for Indian goods.

12. Discuss the demand and supply position of the chief ...ood crops of India. What measures can be adopted for improving the do... supply of these crops?

BURDWAN UNIVERSITY

1965

Answer SIX questions, *three* from each group

[*Illustrate your answers by sketch-maps and diagrams wherever necessary*].

Group A

Analyse the functional theory of resources and indicate the modern trend in resource development.

2. Explain fully the concept of *man-land ratio* and indicate how far population optima can be explained in terms of ideal man-land ratios.

3. ...the fundamental issue of conservation is the ...oper rate of exploitation and utilisation of resources' (...mmerman). Discuss.

4. Discuss the factors responsible for the concentration of cotton, wool and silk production in certain regions of the world. Indicate the nature of world trade in these products.

5. Give a brief account of the different forest re the world and discuss the nature of their economi tion.

6. Divide the world into major commercia. indicate the pattern of trade existing between the.

Group B

7. Analyse critically the locational set-up of and steel industry of India. Indicate the present posi. this industry.

8. Examine the distribution of coal fields in India explain the nature and degree of utilisation of these field the development of local industries.

9. Discuss fully the international position of Ind manganese, mica and lac as it obtains at present and likely to obtain in the future.

10. What are the advantages of the U. S. A. for development of manufacturing industries ? Comment on th location of the major industries of the country.

11. Compare the mineral resources of the U. S. A. wi those of the U. S. S. R.

12. How is it that the cotton textile industry has gr up both in the U. K. and in Japan when both depend other countries for raw cotton and market ?